ISBN 81-7066-280-X

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৮০·০০

শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়
শ্রীমনীশচন্দ্র চক্রবর্তী
শ্রীপ্রদোষকুমার পালের
করকমলে—

এই লেখকের অন্যান্য বই

আবাস

উজান গঙ্গা

কালবেলা

কালপুরুষ

জনযাজক

দৌড়

বড় পাপ হে (গল্প)

শরণাগত

সুধারানী ও নবীন সন্ন্যাসী

হরিণ বাড়ি

সাতকাহন

॥ ১ ॥

আজ সারাটা দিন সূর্যদেব উঠলেন না। কাঠ-কয়লার মত মেঘ ভুটান পাহাড় থেকে নেমে সারা আকাশ জুড়ে অনড় হয়ে রয়েছে সেই শেষরাত থেকে। সারাটা দিন কেটে গেল গভীর আলস্য নিয়ে। শেষ বিকেলে বাতাস বইল ; কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হয়ে গেছে এমন আমেজ ছিল সেই বাতাসে। একটু শীতেল হয়ে উঠল চারপাশ।

চকোলেট মিলিয়ে যাওয়ার পরও জিভে যেমন তুলতুলে অনুভূতি ছড়ানো থাকে তেমনি এক আলো এখন মাঠের ওপরে, দেওদার গাছের মাথায়, কোয়ার্টার্সগুলোর টিনের চালের চুড়োয় চুড়োয় নেতিয়ে রয়েছে। মুখ তুলে আকাশ দেখলে মনে হয় মেঘেরা বুঝি হাওয়ার ধকল সইতে না পেরে এক ছুটে নেমে এল ; কিন্তু আজ বৃষ্টি হবে না। মেঘগুলো এই হঠাৎ-নামা শীতের দাঁত সইতে না পেরে কুঁকড়ে যাবে। এইভাবেই দু-তিনদিন সইবার পর জল ঝরবে চা-বাগানের ওপর, কোয়ার্টার্স, মাঠ, আসাম রোড ভিজবে তেমাথা বুড়ির মত অসাড়ে। এবং সেই পর্ব শেষ হলেই শীত নামবে জাঁকিয়ে। আজকের মেঘ যেন বুধুয়ার তরকারি কোটা, রান্নাঘরে মায়ের উনুনে কড়াই চাপানোর অনেক দেরি। মাঠের মাঝখানে চাঁপা ফুলের গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সিরসিরে হাওয়ায় একটু কেঁপে উঠে দীপা চিৎকার করল, 'তাড়াতাড়ি কর, আমার শীত করছে।'

ওপর থেকে কোন উত্তর এল না। যে উঠেছিল ডালে ডালে পা দিয়ে হাওয়া তার পাঁজরেও কাঁপন তুলেছিল। কিন্তু মরিয়া হয়ে সে হাত বাড়াচ্ছিল সদ্যফোটা সোনালী চাঁপার দিকে। এবছর ওই গাছে প্রথম কুঁড়ি ফুটেছে। লক্ষ্য করেছিল সে, আর তারপরই এই জেদ। অথচ ফুলটা কেবলই নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। পায়ের চাপে ডালটা দুলছে আর সেই সঙ্গে ফুলটাও। দীপা যখন দ্বিতীয়বার চিৎকার করল তখন তার মনোযোগ নষ্ট হল। চোখ তুলে আকাশ দেখে ভয় ঢুকল মনে। শাঁখ বাজছে কোয়ার্টার্সে কোয়ার্টার্সে। সে আবার মরীয়া হল। এবং এইবার পাতাশুদ্ধ ফুল চলে এল হাতে। তর তর করে দুটো ডাল নেমে এসে নিচে তাকিয়ে দেখল দীপা নেই।

মাঠটা একনিঃশ্বাসে দৌড়ে আসতেই শীত উধাও, ঘন ঘন নিঃশ্বাসে শরীর গরম। দীপা দাঁড়িয়ে গেল। এখন সামনের গেট দিয়ে ঢোকা মানে একশটা বকুনির সামনে দাঁড়ানো। ঠাকুমা যতটা না মা তার তিনগুণ। সে পায়ে পায়ে পিছিয়ে এল। দুটো কোয়ার্টার্সের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে চলে যাওয়া যায় পেছনে। যদিও ও-পাশটায় অযত্নে বেড়ে ওঠা জঙ্গল সাধারণ বিকেলেই গা ছমছমে হয়ে থাকে এবং আজ মেঘ আছে বলে আরও মারাত্মক তবু পেছনের বাগানের গেট খুলে ভেতরে ঢুকে একেবারে উঠোনে চলে গেলে অনেকের দৃষ্টি এড়ানো যাবে। দীপা দ্রুত পা চালাল। গলিটা পেরিয়ে কলাগাছের বনের মধ্যে ঢুকে যাওয়ামাত্র দ্বিতীয় চিন্তায় সে থেমে গেল। এখনও শীত পড়েনি। অতএব সাপেরা, রাত্রির বেলায় সাপ বলতে নেই, ঠাকুমা বলেন অন্ধকারে পথ চলতে গেলে তালি দিতে হয় এবং

সেইসঙ্গে আস্তিক আস্তিক বললে তেনারা সরে যান, দীপা সেইভাবে এগোতে লাগল। মাঠের ভেতর তবু কিছু দেখা যাচ্ছিল কিন্তু এখানে ঘাসগুলোও নজরে আসছে না। বাড়ির পেছনের পায়ে হাঁটা পথটায় এসে দীপা বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধ পেল। এদিকটায় খোকনদের বাড়ির কোণে তিন তিনটে বাতাবির গাছ আছে। পূর্ণিমার রাত্রে, সেই ডিসেম্বর জানুয়ারি মাসে, খোকনের ঠাকুমা আকাশ থেকে নেমে আসেন বাতাবি লেবুর রস খেতে। যখন বেঁচে ছিলেন তখন তিনি কিছুতেই ডিসেম্বরের পূর্ণিমার আগে বাতাবি খেতেন না। তাঁর ধারণা ছিল কালীপুজো পেরিয়ে যাওয়াব অনেক পরে বাতাবির বুকের রস ঘন হয়। মারা যাওয়ার পর এক ডিসেম্বরের পূর্ণিমায় মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে কোয়াটার্সের জানলা দিয়ে চাঁদ দেখতে গিয়ে খোকনের মা নাকি দেখেছিলেন তাঁর শাশুড়ি বাতাবিগাছের ডালে বসে রস চুষে খাচ্ছেন। তারপর থেকে ওই দুই পূর্ণিমার পরের সকালে গাছের নিচে পড়ে থাকা বাতাবিগুলো তুলে নদীতে ফেলে দিয়ে আসা হয়। গন্ধ নাকের মধ্যে দিয়ে শরীরের ভেতরে যেতেই পড়ি কি মরি করে ছুট দিল দীপা। খোকনের ঠাকুমাকে সে দেখেছে এই এ্যাট্টুকিনি বয়সে। ফোকলা দাঁতে হেসে বলতেন, 'হ্যারে বেটি, তোর বরের সঙ্গে আমার বে দিবি ?' শুধু এইটুকুনি মনে আছে কিন্তু তাতেই গায়ে কাঁটা উঠে এখন একাকার। টিনের দরজাটা একটা তারের হুকে আটকানো থাকে। হাতড়ে হাতড়ে সেটাকে খুলে তবে স্বস্তি। লক্ষ্মী ডাকছে গোয়ালঘরে। ঠাকুমা বলেন গরুটা কুকুরের কাজ করে। বাগানে কারো পায়ের আওয়াজ পেলেই হাম্বা হাম্বা ডাক শুরু করে দেয়। ওই ডাক কানে যাওয়ামাত্র দীপার মনে হল সে নিজের জায়গায় এসে গিয়েছে, আর কোন ভয় নেই। টিনের দরজাটা তারের জালের দেওয়াল কেটে বানানো। সেটাকে বন্ধ করতে গিয়ে দীপা পেছনেব অন্ধকারের দিকে তাকাল। ঝোপঝাড়ের পরই ছোট্ট নদীটা। এখনও জল আছে হাঁটু পর্যন্ত। চৈত্রমাসে পায়ের পাতায় নেমে যায়। বর্ষায় এক বুক। চওড়ায় আসাম রোডটার মতন। কিন্তু এখন তার বুকে কুন্দ ফুলের মত জোনাকি ফুটে রয়েছে। রাত যত বাড়বে সমস্ত চরাচরে তখন জোনাকিবা কুরুক্ষেত্র শুরু করে দেবে। কী মজা লাগে তখন চেয়ে দেখতে। দীপার হঠাৎ মনে হল একমাত্র মানুষ ছাড়া পৃথিবীতে আব কারও বোধ হয় শীত করে না।

রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠোনে ঢুকতেই সে হ্যারিকেনেব আলো দেখতে পেল। সর্বনাশ ! হ্যারিকেন জ্বালা হয়ে যাওয়া মানে মায়েব হাত এখন খালি। নিশ্চযই ইতিমধ্যে দীপার খোঁজ পড়েছে কয়েকবার। বিশুব ওপর প্রচণ্ড বাগ হয়ে গেল তার। লক্ষবার বলেছে আজ চাঁপা ফুল তোলার দরকার নেই তবু কথা শুনল না। কেউ ফুলের জন্যে গাছে উঠলে শেষপর্যন্ত না দেখে তাকে গাছের ডালে ফেলে রেখে চলে আসা যায় ? গাছের ডালের কথা মাথায় আসতে দীপা ফিক্ করে হেসে ফেলল। খোকনেব কাকা এক বিকেলে কুল পাড়তে গাছে উঠেছিলেন নদীর ধারে। কেউ নাকি বলেছিল ওই গাছের নিচের ডালের কুলগুলো যত টক ওপরের ডালে তত মিষ্টি। ওঠার সময় বুঝতে পারেননি। প্রায় মগ ডালে ওঠার পর মিষ্টি কুল খেয়ে সময়টা ভুলে গিয়েছিলেন। খেয়াল হল যখন তখন এই আজকের মত আঁধার নেমেছে। তড়মড়িয়ে নামতে গিয়ে ঠিক নিচের ডালটা গেল ভেঙ্গে। ওপরের ডালটা ধরা ছিল বলে রক্ষা। তখন আর নামার উপায় নেই। সেই ডালেই কোনমতে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করলেন। রাতটা ছিল অমাবস্যার। নদীর ধাবে বড় বড় গাছের জঙ্গল ভেদ করে কেউ অকাজেও যায় না সন্ধে নামলে। খোকনের কাকার চিৎকার শুনতে পাবে কেন কেউ ? ডেকে ডেকে গলা ধরে গেল। খিদে পেল এবং তারপরেই তাঁর মনে পড়ল গাছটা কুলের।

আশশ্যাওড়া আর কুলগাছে পৃথিবীর যত শাঁকচুন্নীরা গপ্পো করতে খুব ভালবাসে। বট অশ্বত্থ হলে তবু ব্রহ্মদৈত্যির দর্শন পাওয়া যেত। তেনারা ভালমানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না। কিন্তু শাঁকচুন্নিরা হল খুব খারাপ শ্রেণীর পেত্নী। তারা নাকি আইবুড়ো ছেলে দেখলেই আনন্দে ডিগবাজি খায়। আইবুড়ো ছেলের ঘিলু খেলে শাঁকচুন্নীদের আয়ু বেড়ে যায়। খোকনের কাকা যেই সেটা মনে করলেন তখনই রাম নাম করতে লাগলেন। ওই নদীটা যে পাশে সেই খেয়াল নেই তখন। নদী তো মেছোপেত্নীদের প্রিয় জায়গা। সেটা মনে পড়তেই তাঁর চিৎকার বেড়ে গেল। ভাগ্য ভাল ওপারের লাইনের একটা মাতাল কুলি সেই চিৎকার শুনতে পেয়ে নদীর ওপারে এসেছিল পেত্নী পড়েছে মনে করে। তার চেঁচামেচিতে সবাই খোকনের ছোটকাকাকে নামিয়ে আনে। পরে নাকি তিনি খুব আফসোস করেছিলেন, যদি মাতালটা না আসতো তবে সেইরাত্রে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা হত। এই বছর খানেক হল খোকনের ছোটকাকা জলপাইগুড়িতে চাকরি করতে গিয়ে বিয়ে করেছেন। ফর্সা লম্বা সুন্দর চেহারা। বিয়ের পর এখানে যখন বউ নিয়ে এলেন তখন ঠাকুমাকে বলতে শুনেছিল, 'কপালে যা লেখা আছে তা খণ্ডাবে কে বউমা! কুলগাছের শাঁকচুন্নীর হাত থেকে না হয় মাতাল বাঁচিয়েছিল কিন্তু শহরের শাঁকচুন্নী তো ঠিক ঘিলু চুষে নেবে। ছেলেটার হাড়ে দুর্বোঘাস গজিয়ে ছাড়বে, দেখো।' পরদিন দীপা সটান খোকনদের বাড়িতে গিয়ে ওর নতুন কাকিমাকে ভাল করে দেখেছিল। গায়ের রঙ কালো, মাথায় ঘোমটা নেই, বড্ড রোগা আর জোরে জোরে কথা বলেন কিন্তু শাঁকচুন্নী বলে মনে হয়নি। ওর কেবলই মনে হয়েছিল সবাই যখন জানেই তখন মাথায় ঘিলু ঠিক রাখার জন্যে খোকনের কাকুকে সাবধান করে দিচ্ছে না কেন?

চট করে বাথরুমে ঢুকে গেল দীপা। অন্ধকারেই। চৌবাচ্চার জলে হাত দিতেই মনে হল সেখানেও ঠাণ্ডা সেঁদিয়েছে। শিউলি ফুল ঘাসের ওপর পড়া মানেই শিশির জমা। কিন্তু ওই বৃষ্টিটা না নামা পর্যন্ত সোয়েটার পরতে হয় না। তাহলে জল এত ঠাণ্ডা হল কেন? কিছুদিন হল একটা কথা ওর কেবলই মনে হচ্ছে, আকাশ, মাটি, গাছপালা, চা-বাগান, নদী এমন কি পাখিদের মধ্যে কিরকম গোপন যোগাযোগ রয়েছে যা কেবল তারাই বুঝতে পারে। বাড়ির পোষা কুকুর বেড়াল গরুদের সঙ্গে ততটা যোগাযোগ নেই, বেড়ালের সঙ্গে তো একদম না।

এইসময় একই সঙ্গে ধারাপাত আর বর্ণপরিচয় পড়া আরম্ভ হল। দু'জন দু'গলায় সুর করে করে। আজ আর নিস্তার নেই। ওই মেঘটাও গোলমাল করে দিল। এমন ভাবে আকাশটাকে ঢেকে ঢুকে রেখেছিল যে আলো নেবার সময়টাকে ধরতে পারেনি। অথচ মায়ের কড়া হুকুম শাঁখ বাজার আগেই ঢুকতে হবে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দার তারে ঝোলানো গামছা টেনে পা মুছতে গিয়ে জবাকুসুমের গন্ধ পেয়ে আবার শক্ত হল দীপা। মায়ের গামছা টেনে নিয়েছে সে। মা কাউকে নিজের গামছা ব্যবহার করতে দেয় না। চটজলদি পা না মুছেই সেটাকে তারে টানটান করে মেলে দিল সে। তারপর লম্বা ঘরটায় উঁকি মারল। ঠাকুমা নেই, মাকেও দেখা যাচ্ছে না। কোণার দিকে মাদুর পেতে দুই ভাই পড়তে বসেছে। ওকে দেখামাত্র একজন একগাল হাসল, 'অ্যাই দিদি, বিশুদা তোকে ডাকছিল!' দীপা ঠোঁট কামড়াল। বিশু কেন এল? ও বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসেছে বটে কিন্তু এমন কিছু দেরি করেনি আর এরমধ্যেই বিশু এসে গেল? দ্বিতীয়জন আরও কচি গলায় বলল, 'তোর চাঁপা ফুল দিয়ে গিয়েছে।'

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপার। সে চাপা গলায় বলল, 'চুপ কর!' মনে মনে ঠিক করল কাল বিশুর সঙ্গে মোটেই কথা বলবে না। কিন্তু ফুলটা কার হাতে দিয়েছিল?

পাশের ঘরে ঢুকতেই সে থতমত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। মা ঠাকুরঘরের দরজা ভেজিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ওকে দেখতে পেয়েছে, 'কোথায় ছিলি ?'

'মাঠে।' দীপার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

'তা মাঠেই থাকলে পারতে। এত্ত করে বলেছি শাঁখ বাজার আগেই বাড়ি ফিরবি, কথা কানে যায় না, না ?' বলতে বলতে কয়েক পা এগিয়ে এসে বাঁ হাতে খপ করে চুলের মুঠি ধরে টান দিল অঞ্জলি। আর মাথাটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতেই তার ডান হাত এসে পড়ল মেয়ের গালে, 'ধিঙ্গি মেয়ে কোন কথা কানে যায় না ? ফুল তোলানো হচ্ছে ? মেরে তোমার বিষদাঁত ভেঙ্গে দেব আজ। বল, কেন শুনিসনি কথা ?'

দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাটাকে সামলালো দীপা। অভিজ্ঞতায় জানে এইসময় কোন প্রতিবাদ করা মানে প্রহার আরও বেড়ে যাবে। বেশ কয়েকবার মারার পর অঞ্জলি ওকে ঠেলে সরিয়ে দিল, 'আজ রাত্রে তোমার খাবার জুটবে না। এই তোমার শাস্তি।'

এইসময় ঠাকুমার গলা বাজল দরজায়, 'কানে মেরো না। মারতে হলে পিঠে মারবে।'

'আমি অত হিসেব করে মারতে পারব না। কানে লেগে কালা হয়ে যায় যদি যাক। এত বড় বেয়াড়া মেয়ে আমার কোন কথা শুনবে না ! শরীর বড় হচ্ছে অথচ দেখুন বুদ্ধি যেন দিন দিন কমে যাচ্ছে।' অঞ্জলি আবার মেয়ের হাত ধরে টান দিল, 'আয় তুই আলোর কাছে।' প্রায় হিড় হিড় করে হ্যারিকেনের কাছে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'পৃথিবী তো উদ্ধার করে এলে, পা ধুয়েছ ?'

ততক্ষণে এক পড়ুয়া বলে উঠল, 'মা, দিদির পায়ে জল।'

অঞ্জলির চোখ বাঁদিকে, পড়ামাত্র চিৎকারটা জোরালো হল, 'দেখুন মা, আপনার নাতনির কাণ্ড, পা ধুয়েছেন এমন করে যে হাঁটু পর্যন্ত ধুলোয় সাদা হয়ে আছে, মোছার সময় পর্যন্ত পায়নি।'

মনোরমা গম্ভীর গলায় বললেন, 'দীপু, যাও, ভাল করে হাত পা ধুয়ে এস।'

মায়ের হাতের বাঁধন আলগা হওয়ামাত্র দীপা আবার বাথরুমে চলে এল। জোরে জোরে মগের শব্দ তুলে জল তুলে পায়ে ঢালতে ঢালতে সে অমরনাথের গলা শুনতে পেল, 'আজ রাত্রে খুব ঢালবে মনে হচ্ছে ! আরে, কি হয়েছে তোমাদের ?'

অঞ্জলির গলা কানে এল, 'অনেকের তো দশ এগার বছরে মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, তুমি তোমার পেয়ারের মেয়ের ওরকম একটা ব্যবস্থা কর।' এরপর বারান্দা দিয়ে একজোড়া পা দুপদাপ শব্দ করতে করতে উঠোনে নেমে গেল। আর কথাগুলো কানে যাওয়ামাত্র দীপার বুক মুচড়ে একটা কান্না ছিটকে এল গলায়, সেইসঙ্গে চোখ ছাপিয়ে জল। সে কোনমতে কান্নাটাকে গিলতে চাইল। অমরনাথের গলা কানে এল, 'কি ব্যাপার ?'

'তোর মেয়েকে এবার শাসন কর অমর। বয়স হচ্ছে, এখন ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ঠিক নয়। সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফেরেনি বলে বউমা রাগ করে ঠিকই করেছে।'

'ছেলেদের সঙ্গে মানে ? ওর বন্ধু তো খোকন, বিশু , ওরাই।'

'হ্যাঁ, ওরা তো ছেলেই।'

'কি যে বল মা, তোমাদের মাথার ঠিক নেই। মারধর হয়েছে ?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। দীপার হাত আর চলছিল না। অন্ধকার বাথরুমে যদি অনন্তকাল থাকা যেত তাহলে যেন সে বেঁচে যেত। কিন্তু এসবের মধ্যেই হ্যারিকেনের আলোটা এগিয়ে এল। অমরনাথ সেটিকে নিচে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি করছিস ওখানে ? আয়, বেরিয়ে আয়।' দীপার চিবুক এবার বুকে মিশল। এবং কান্নাটা

ছিটকে বের হবার পথ পেয়ে গেল। সেই শব্দ উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে পৌঁছাতেই অঞ্জলি উঁচু গলায় বলে উঠল, 'নাও, আরম্ভ হল, বাপকে দেখে মেয়ে এবার গলে গেলেন

অমরনাথ সেদিকে কান না দিয়ে ডাকলেন, 'তোকে বেরিয়ে আসতে বলছি।'

প্রচুর জড়তা পায়ে নিয়ে দীপা বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় উঠে এল। অমরনাথ মেয়েব দিকে তাকালেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'মুখ তোল।'

পেছন থেকে মনোরমা নিচু গলায় বললেন, 'থাক, অনেক হয়েছে। আর কিছু বলিস না।'

'আমি মুখ তুলতে বলেছি।' অমরনাথের গলার স্বর বেশ কড়া।

দীপা মুখ তুলল চোখ বুজে। দুই গাল ইতিমধ্যেই চোখের জলে ভেজা, আর একপ্রস্থ জল উপচে নামল। অমবনাথ দুহাতে মেয়েকে বুকে টেনে নিতেই কান্নাটা বাঁধন-ছেঁড়া হল। বাবার বুকে মুখ চেপে পিঠটা বারংবাব ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ ওরা এইভাবে দাঁড়িয়ে বইল। কান্না যখন প্রায় থামো থামো তখন রান্নাঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এল, 'মা, ওকে হাতমুখ ধুয়ে নিতে বলুন, চা হয়ে গিয়েছে।'

অমবনাথ বললেন, 'কিছু খেয়ে নিয়ে পড়তে বস মা।'

দীপাব ফোঁপানি তখন স্থির। পেছন থেকে ঠাকুমা বললেন, 'ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরলেই তো হয়। বড় হচ্ছ তবু মাথায় বুদ্ধি হচ্ছে না কেন? তুই বিশুর কাছে চাঁপা ফুল চেয়েছিলি?'

দীপা কথা বলতে গিয়ে দেখল গলা শুকনো। সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল।

অমবনাথ হাসলেন 'চাঁপা ফুল তোব ভাল লাগে?'

মেয়ে দুবাব মাথা ওপব নিচ কবল। ঠাকুমা বললেন, 'ছেলেদেব কাছে কক্ষনো ফুলটুল চাইবি না।'

অমবনাথ মেয়েকে ছেড়ে নিজেব গামছা বারান্দাব তার থেকে টেনে নিলেন, 'তাহলে তো ও চাঁপা ফুল পাবেই না। তোমার নাতনি গাছে উঠতে চাইলে দুটো পা-ই ভাঙ্গবে।'

বান্নাঘব থেকে গলা ভেসে এল, 'নবাবনন্দিনীকে একটু এখানে আসতে বলুন মা।'

ঠাকুমা কিছু না বলে ঘরেব ভেতর চলে গেলেন। অমরনাথ ততক্ষণে বাথরুমে। দীপা দুহাতে চোখ মুছল। জোনাকিগুলো উঠোনেও ঢুকতে আরম্ভ করেছে। পা যেন চলতেই চাইছে না এমনভাবে সে বান্নাঘবেব দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। একটা ট্রেতে চায়ের কাপ ডিশ আব বিস্কুট বেখে গালে হাত দিয়ে বসেছিল অঞ্জলি। হ্যারিকেন জ্বলছে। কিন্তু পাশের কাঠেব উনুনের লকলকে শিখায় তাকে অন্যরকম লাগল এখন। দীপার মনে হল মায়ের মুখটা মুখেব ভেতব জিভ ঢুকিয়ে রাখলে মা কালীকে যেমন দেখাবে ঠিক সেইরকম দেখাচ্ছে। অঞ্জলি ট্রেটা তুলে ধরে বলল, 'দয়া করে বাইরের ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখ। এক ফোঁটা চা যেন চলকে ডিশে না পড়ে। মানুষকে চা দেবার সময় ডিশ শুকনো রাখতে হয়।'

দীপা হাত বাড়িয়ে দেখল সে-দুটো কাঁপছে। অঞ্জলি ট্রে নামিয়ে চোখে চোখ রাখতে চাইলেই মেয়ে চোখ নামাল। অঞ্জলি বলল, 'থাক। এখানে বস। আমি না আসা পর্যন্ত উঠবে না।'

'পড়ব।' গলা থেকে অনেক কষ্টে স্বরটা বের হল।

'পড়ে তো আমাকে উদ্ধার করে দিয়েছ। আমি না ফেরা পর্যন্ত বসে থাকবি এখানে।'

ট্রে নিয়ে অঞ্জলি বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে। উনুনে কাঠ ফাটার শব্দ হচ্ছে। ওপরে

একটা সসপ্যান চাপানো। দীপা বাইরে তাকাল। শোয়ার ঘরগুলো আর রান্নাঘরের মাঝখানে অন্ধকার উঠোন, ওপাশে ঠাকুমার ঘর। ঠাকুমার ঘরেই তাঁর ঠাকুরের আসন পাতা। মায়ের ঠাকুরঘরটা বড়। উঠোনে জোনাকিগুলো ছবি আঁকছে। বিশু তাকে একটা মজার মতলব বলেছে। জোনাকির পায়ে আঁঠা লাগিয়ে কপালে সেঁটে নিয়ে রাত্রে বের হলে লোকে অবাক হয়ে দেখবে আলোর টিপ। মায়ের ভয়ে সেটা করা হচ্ছে না। কালীপুজোর রাত্রে একবার চেষ্টা করবে সে। মাথার ওপরে টিনের চালে টপ টপ শব্দ হল। বৃষ্টি এল নাকি ? একটু হাওয়া উঠতেই রান্নাঘরের দরজাটা দুলে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কুঁকড়ে উঠল দীপা। চোরের মত আধ-খোলা দরজার দিকে তাকাল সে। ভূতেদের বিশ্বাস নেই। ঠাকুমা নিজের চোখে কত রাতে দেখেছে সাদা থানের মুণ্ডহীন পা-হীন মূর্তি উঠোন দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সারা গায়ে কাঁটা ফুটল দীপার। আগুনের কাছে সরে বসল সে। এইজন্যে একা রাত হলে রান্নাঘরে থাকতে চায় না সে। আর তখনই উঠোনে সাদা মূর্তিটাকে দেখতে পেল দীপা। সাদাটা তার দিকেই এগিয়ে আসছে। ভয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করে উঠল সে। প্রায় দৌড়ে চলে এল অঞ্জলি উঠোন পেরিয়ে। এসে দেখল মেয়ে দুই হাঁটুতে মুখ ঢেকে থর থর করে কাঁপছে। অঞ্জলি ওকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে, এই দীপু, চিৎকার করলি কেন ?' সঙ্গে সঙ্গে মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল মেয়ে। কাঁপুনি তার থামতেই চায় না। মাথায় পিঠে হাত বোলাল অঞ্জলি আর সমানে কারণটা জানতে চাইল। ওপাশের বারান্দায় মনোরমা এসে গেছেন, ততক্ষণে, 'কি হল বউমা ? ও চেঁচাল কেন ? ও বউমা ?'

অঞ্জলি নিচু গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি বল কি হঁয়েছে নইলে ঠাকুমা ঠিক আমায় বকবে।'

মুখ না তুলে হাত বাড়িয়ে অন্ধকার উঠোনটাকে দেখাল দীপা, 'ভূত।'

'ভূত ?' অঞ্জলি চমকে পেছনে তাকাল।

'সাদা থান পরে এগিয়ে আসছিল।'

'কি যাতা বলছিস।' লণ্ঠনটা এক হাতে তুলে উঁচু করে ধরল অঞ্জলি মেয়েকে অন্য হাতে সামলে, 'কিস্যু নেই। দ্যাখ না চেয়ে।' তারপরেই তার গলা পাল্টে গেল, 'এই, কে রে ?'

'হামি মাইজি!' উঠোন থেকে বুধুয়ার গলা ভেসে এল।

'কি করছিস ওখানে ?'

'কুছু না। দীপুদিদি হামাকে দেখে ডর পেয়ে গেল।' বুধুয়া হেসে উঠল।

ওপাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনোরমা ধমকে উঠলেন, 'ডর পেয়ে গেল! কি বেআক্কেলে কথা! তুই কেন রাতের বেলায় সাদা গেঞ্জি সাদা ধুতি পরেছিস। কালো শরীরে ওরকম পরলে অন্ধকারে চেনা যায় ? আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছে!'

অঞ্জলি বলল, 'দেখলি ? তুই বুধুয়াকে ভূত বলে ভেবেছিস! কি বোকারে তুই!'

দীপা ধীরে ধীরে মুখ তুলল। বুধুয়া এবার রান্নাঘরের বারান্দায়। খুব রাগ হয়ে গেল দীপার। তবু নিজের বোকামিটা স্বীকার না করতে বলল, 'ঠাকুমাও তো রাত্তির বেলায় থান পরা ভূতকে উঠোনে হেঁটে যেতে দ্যাখে।'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল বিরক্তিতে, 'ঠাকুমা বুধুয়াকে দেখে বুঝতে পারেনি।'

'তাহলে কাল তুমি ওকে অন্য রঙের গেঞ্জি ধুতি কিনে দিও।'

'ঠিক আছে। এখন ওঠ, মোয়া দিচ্ছি খেয়ে নিয়ে পড়তে বস। আর কক্ষনো সন্ধের পর বাড়ি ফিরবি না। অল্পবয়সী মেয়েদের সন্ধে হয়ে গেলেই কত কি হয়ে যায়!'

'কি হয়ে যায় মা ?'

'উঃ, আবার কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। যে কোন ছুতোয় গল্প ফাঁদতে পারলেই

্সে, না ?' অঞ্জলি উঠে পাশের খাওয়ার ঘরে চলে গেল। সেখানে বিভিন্ন রকমের টিনের বাক্সে বাড়িতে তৈরি করা খাবার রাখা আছে। দীপা বুধুয়ার দিকে তাকাল। তারপর নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'বুধুয়াদা, তুমি কখনো ভূত দেখেছ ?'

বুধুয়া মাথা নাড়ল, 'বহুৎ। কিন্তু চিল্লালে ভূতরা খুব ভয় পেয়ে যায়।'

সন্ধে গড়িয়ে গেলেই ঠাকুমা নিজের ঘরে চলে যান। পুরনো দিনের একটা চীনে সেজবাতি আছে তাঁর ঘরে। আহ্নিক সেরে তিনি রাতের খাওয়া সরে নেন। তারপর ঠাকুর নাম লি'তে বসেন। অঞ্জলির রান্নার পাট চুকলেই বাচ্চাদের খাওয়ার ডাক পড়ে। আটটা বাজার আগেই ছোট দুজনের বই গুটিয়ে ঢুলুনি শুরু হয়ে যায়। ডাকটা কানে আসামাত্র তারা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ায়। এই সময় দীপার সঙ্গে অঞ্জলির একপ্রস্থ মন কষাকষি চলে আজকাল। দীপা কিছুতেই খাবে না এ সময়ে, অঞ্জলি জেদ ধরবে তাকে খাওয়ানোর জন্যে। শেষ পর্যন্ত মনোরমার গলা ভেসে আসবে, 'ওর যখন খিদে নেই তখন কেন জোর করছ বউমা।'

আজ ছোট দুজনের পেছনে রান্নাঘরের দরজায় চলে এল দীপা, 'মা, আমি তো একটু আগে দুটো মোয়া খেয়েছি, এখনই কি ভাত খাব ?'

অঞ্জলি হাসি চাপল, 'ঘুমিয়ে পড়লে আর ডেকে খাওয়াবো না।'

দীপা ছুটে ফিরে এল একেবারে বসবার ঘরে। বিশাল হ্যারিকেনটা স্ট্যান্ডের ওপর জ্বলছে। দীপা অমরনাথের আরামকেদারায় পা তুলে বসল। আঃ কি আরাম। তারপর হাত ডিয়ে রেডিওটা খুলে দিল। কি সব বকর বকর করে বলছে। সে নব্ ঘোরাতে লাগল। হঠাৎ একটা বাজনা কানে আসতেই সে হাত সরিয়ে নিল। তারপর অমরনাথের রেখে যাওয়া কাগজখানা টেনে নিল। সামনেই জহরলাল নেহরুর ছবি। দীপা ছবিটাকে দেখল। বেশ দেখতে লোকটা। খোকনের চিবুকটা অনেকটা এই রকম। কাল বিশু মাছ ধরতে যাবে বলছে। দুপুরের পর। সেই সময়টায়, খাওয়া-দাওয়ার পর, যাওয়াই ভাল। কেউ খোঁজ করার সময় পাবে না। তবে যাই হোক না কেন সন্ধের আগেই ফিরতে হবে। সকালে ফড়িং ধরে রাখতে হবে দেশলাই-এর বাক্সে। বিশু নেবে কেঁচো। কলাগাছের পচা বাকলে থাকা ওইসব লিকলিকে কেঁচোগুলোকে দেখলেই গা ঘিনঘিন করে। বঁড়শি ঢুকিয়ে ওগুলোকে ছিঁড়তে মরে গেলেও পারবে না। আগামীকালের ব্যাপারটা ভেবে উত্তেজিত হল সে। দেশলাই-এর বাক্সের অভাব নেই। এখন বাড়িটা চুপচাপ শুধু টিনের ছাদে মাঝে মাঝে টপ টপ শব্দ হচ্ছে। বৃষ্টিটা পড়েও পড়ছে না। অমরনাথ গিয়েছেন তাস খেলতে। চা বিস্কুট খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছেন। ফিরবেন দশটা নাগাদ। দীপা কাগজটা রেখে দিল। তারপর উঠে বাবার বই-এর তাক থেকে রূপাঞ্জলি পত্রিকা টেনে নামাল। মায়ের সামনে এই পত্রিকায় হাত দেবার উপায় নেই। অঞ্জলির কড়া নিষেধ আছে। এখন কেউ এ-ঘরে আসবে না। কাননবালা। চন্দ্রাবতী। মেনকা। সন্ধ্যারাণী। এরা সব সিনেমা করে। সিনেমা জিনিস জানে না দীপা। এই বাগানে সিনেমা দেখায় না। দেখতে হলে আট মাইল দূরে যেতে হবে। খুব ভাল সিনেমা এলে কয়েকদিন জল্পনা করে অমরনাথ অঞ্জলি এবং আরও তিন চারটে পরিবার বাগান থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের রেখে সেখানে সিনেমা দেখতে যায়। প্রতিবার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বায়না করে বিফল হয়েছে দীপা। অঞ্জলির এক কথা, ছোটদের সিনেমা দেখতে নেই। বাবার চেয়ারে বসে দীপা ভাবতে বসল সে কবে বড় হবে ! আর এটা ভাবতে গেলেই কেমন ঘুম পেয়ে যায় তার। পত্রিকাটাকে

তার জায়গায় রেখে সে চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করতেই বাজনা বন্ধ হয়ে কি ঁ.
কথা চুং বুং করে বলা আরম্ভ হল। চটজলদি উঠে পড়ে রেড়িওটা বন্ধ করে দিল দীপা।

রাত্রের খাওয়া চুকিয়ে ঠাকুমার ঘরে এল সে। আর তখনই ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হল। টিনের চালে বৃষ্টির বড় ফোঁটা প্রচণ্ড আওয়াজ তুলছে। আর এইরকম আওয়াজ শুনলেই বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে দীপার। এক ছুটে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল সে।

মনোরমার তন্দ্রা এসেছিল। হাতের চাপে জেগে উঠে বললেন, 'দরজাটা বন্ধ করেছিস ?'

'না।' মনোরমার হাতে মুখ চেপে জবাব দিল দীপা।

'যা, বন্ধ করে আয়।'

'ভয় করছে।'

মনোরমা উঠলেন। তার ঘরে ডিমবাতি জ্বলছে। দরজা বন্ধ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাথরুম করেছিস তো ?'

দীপা মুখ তুলল না, 'হুঁ !'

'বাবা ফিরেছে ?'

'না।'

'রাত কত হল ?'

'জানি না।'

মনোরমা একটা চওড়া কম্বল বের করে নাতনির কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিলে
পাশে শুয়ে বললেন, 'মনে মনে তিনবার শিব শিব শিব বলবি রোজ ঘুমাবা৺

'কেন ?'

'তাতে খারাপ স্বপ্ন দেখবি না।'

'কি খারাপ স্বপ্ন ?'

'জানি না।' নাতনির এইরকম প্রশ্নকে খুব উল্টোপাল্টা বলে মনে হয় তাঁর। তিনি ও৻
মাথায় হাত দিলেন, 'শোন, তুই তো মেয়ে। মেয়েদের সবসময় শান্ত থাকা উচিত।'

দীপা কোন জবাব দিল না। মনোরমা বললেন, 'বিশু, খোকন, এরা সবাই
হচ্ছে, ওদের সঙ্গে আগের মত হৈ চৈ করবি না।'

'কেন ?'

'আবার প্রশ্ন ?'

'ওরা আমার বন্ধু। তোমার কোন বন্ধু নেই তাই বলছ।'

মনোরমা ঢোঁক গিললেন, 'মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদেরই বন্ধুত্ব হওয়া উচিত।'

'এখানে তো কোন মেয়ে নেই আমার বয়সী। ছেলেবেলায় তোমার বন্ধু ছিল না ?'

'ওমা, আমার যখন বিয়ে হয়েছিল তখন নয়ই পার হয়নি।'

'ধ্যাত !'

'হ্যাঁ রে। তোর মা এ-বাড়িতে এসেছিল পনের বছর বয়সে। তখনই সবাই বলত এ
মেয়ে ঘরে এল পোষ মানলে হয়। সেইসময় তো গৌরীদানের রেওয়া ছিল।

'গৌরীদান কি ?'

'খুব ছোটবেলায় বিয়ে দেওয়া। শিবঠাকুর যখন গৌরীকে বিয়ে করেছিলেন তখন তিনি ছিলেন এই এট্টুসখানি।' হাসলেন মনোরমা।

'আর শিবঠাকুর ?'

'তিনি যেমন থাকেন, তেমন।'

'ওমা, ওই বিরাট ভুঁড়িওয়ালা বাবার বয়সী লোকটার সঙ্গে এট্টুসখানি মেয়ের বিয়ে হল! তোমার বর কিরকম ছিল?'

'তোর ঠাকুর্দা ছিল সুপুরুষ। তোর বাবার থেকেও লম্বা। কি গায়ের রঙ! আমার বাবাকে সবাই বলত জামাইভাগ্য বটে!' হঠাৎ মনোরমার গলাটা কেমন হয়ে গেল।

'ঠাকুর্দা তোমাকে বকত?'

'খুব। রেগে গেলে তো কাণ্ডজ্ঞান থাকত না।' মনোরমা হাসলেন, 'আবার সেই রাগ ঠাণ্ডা হতে সময় লাগত না বেশী। যখন রেগে যেত তখন আমি আড়ালে পালিয়ে যেতাম। রাগ ঠাণ্ডা হলে ডেকে ডেকে সারা হত।'

'বাবা তখন কি করত?'

'তোর বাবা তখন হয়নি। যে মাসে তোর বাবা এল সেই মাসেই তো গঙ্গায় নৌকোডুবি হল। তিরিশজন মানুষ জলে ভেসে গেল। তাঁর শরীর তো জলে খুঁজে পাওয়া যায়নি। বাবা বলেছিলেন শরীর না পাওয়া গেলে আমায় শাঁখা ভাঙ্গতে দেবেন না। শেষ পর্যন্ত সাতদিন যখন পেরিয়ে গেল তখন আমি বিধবা হলাম।'

'তোমার বর যদি এখন হঠাৎ ফিরে আসে?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। নাতনিকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন। এই একটা চিন্তা তিনি দিনের পর দিন লালন করে গিয়েছেন। নৌকোডুবির পরও তো মৃত মানুষ জ্যান্ত হয়ে ফিরে এসেছিল। শরীর যখন পাওয়া যায়নি তখন তাঁর ভাগ্যেও এমন ঘটবে না কেন? একটার পর একটা বছর গেছে. চিন্তাটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অমরনাথ ম্যাট্রিক পাস করে গেল।

হঠাৎ দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাম্মা, তোমার কি মাছ মাংস খেতে ইচ্ছেও করে না?'

'চুপ। ওসব কথা মুখে উচ্চারণ করাও পাপ। আমি হিন্দুঘরের বিধবা। শুধু আলো চাল আর শাকসবজি খেয়ে থাকতে হয় বিধবাদের। পেঁয়াজ রসুন পর্যন্ত নয়।'

'কেন নয়?'

'যা খেলে শরীর উত্তপ্ত হয় তা বিধবাদের খাওয়া উচিত নয়।'

'উত্তপ্ত হওয়া মানে কি?'

'সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে নেই। নিজের জীবন দিয়ে বুঝতে হয়। এখন ঘুমিয়ে পড়।'

মনোরমার হাত একসময় নেতিয়ে পড়ল। ডুয়ার্সের বৃষ্টি তীক্ষ্ণধারায় পড়ে যাচ্ছিল টিনের ছাদের ওপর। দীপার চোখের সামনে একটি সুপুরুষ যুবক যে রাগ পড়ে যাওয়ার পর 'রমা' 'রমা' বলে ডেকে যাচ্ছে। ঠাকুমাই একদিন বলেছিল তাঁর ডাক নাম রমা। সেই মানুষটা, যাকে তার দেখার কোন সুযোগ ছিল না তার জন্যে আজ এই বৃষ্টির রাত্রে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

বর্ষার বৃষ্টির চরিত্রের সঙ্গে শীত বয়ে আনা বৃষ্টির তফাত হল, এখন রাতভোর জোর জল পড়লেও দিন ফোটার মুখেই তা থেমে যায়। আকাশের মুখ যতই ভার হোক সকাল আসে সকালের মতন। মনোরমা ঘুমাচ্ছেন। ঘড়ি দেখে দীপা উঠল। মাথার টিনে কোন শব্দ নেই, তার মানে বাইরে বৃষ্টি নেই। যদিও ঘরে এখনও অন্ধকার এবং ডিমবাতিটা সমানে জ্বলে যাচ্ছে।

নিঃশব্দে দরজা খুলে সে সতর্ক হাতে ভেজিয়ে দিল। রাত নেই কিন্তু দিনও আসেনি।

উঠোনে এক মায়াবী ঘনছায়া। অন্ধকারে আলো গুলে দেওয়ায় এমন ছায়া তৈরি হয় যাতে পৃথিবীর চেহারা অন্যরকম হয়ে যায়, কেমন আদুরে আদুরে। বড়বাড়ির ভেতর দরজা তো বন্ধ থাকবেই, এমন কি বুধুয়া যে রান্নাঘরে শোয় এখান থেকেই তার নাক ডাকার আওয়াজ পাওয়াযাচ্ছে। দীপা হেসে ফেলল। মা বলে, ওই নাক ডাকার জন্যেই চোর আসবে না বাড়িতে।

কাঁঠাল, লিচু গাছগুলোর মাথায় পাতলা অন্ধকার। পায়ের তলায় ঘাস জলে ভিজে একশা। দীপা দৌড়ে চলে এল উঠোন পেরিয়ে তারের বেড়ার ধারে। তারপর খুঁটিতে পা দিয়ে ওপরে উঠে এক লাফে চলে এল বাড়ির সামনে। এই দৃশ্যটা মা দেখলে পিটুনি খেতে হত। পড়ার সময় তার ফ্রকের প্রান্ত যে জায়গায় উঠে গিয়েছিল তাতে মায়ের প্রচণ্ড আপত্তি। যখন কোথাও বসতে হবে তখনও যেন হাঁটু ঢাকা থাকে! কেন? খোকন বিশু তো হাঁটুর অনেক ওপরে প্যান্ট পরে। জিজ্ঞাসা করলেই একটা উত্তর, তুমি মেয়ে। আরে বাবা, মেয়ে তো হয়েছে কি! এক দৌড়ে দীপা চলে এল শিউলি গাছটার নিচে। আরি বাব্বা! গাছের নিচটায় যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে কেউ। পা মুড়ে বসে ফ্রকের প্রান্ত তুলে তাতে শিউলি টপাটপ তুলতে লাগল দীপা। ঘোরের মধ্যে তার হাত সমানে ওঠানামা করতে লাগল। এখনও ছায়া ছায়া অন্ধকার চার পাশে। অথচ মোটেই ভয় করছে না। বাতাসে যে শীত শীত ভাব আলতো দাঁত বসাচ্ছে তাও যেন ধর্তব্যের মধ্যে নয়। হঠাৎ মাছ ধরার কথা মনে পড়তেই সে মাথা তুলে আকাশ দেখল। লক্ষ লক্ষ মোষ যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। মুখ নামাতেই সে দেখতে পেল সেই লম্বা ছেলেটা আসছে। মালবাবুর বাড়িতে গতকাল দুপুরে এসেছে। হয়তো ভোরে বেড়াতে বেবিয়েছে।

বছর আঠারো বয়স, ফুল প্যান্ট আর সোয়েটার পরনে, ছেলেটা দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ তাকে দেখে। দীপা আবার ফুল তোলায় মন দিল। হঠাৎ কানে এল, 'বিউটিফুল।'

সে না উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু বলছেন?'

'হুম।' কেমন কায়দা করল মুখ চোখে ছেলেটা। তোমাকে ঠিক সুচিত্রা সেনের মত দেখাচ্ছে। কি নাম তোমার?'

॥ ২ ॥

সকাল নটায় জলখাবার খেয়ে ধুতি আর পুরো-হাতা শার্ট পরে নিলেন অমরনাথ। এইসময় তাঁর খুব আরাম লাগে। একজোড়া বিদ্যেসাগরী চটি আছে। তিন বছর অন্তর কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে কলেজ স্ট্রীট থেকে কিনে আনেন। সপ্তাহে ছদিন তো কেডস আর হাফপ্যান্ট পরে কাটাতে হয় চায়ের বাগানে। সন্ধের পরে তাসের আড্ডায় যাওয়ার সময় ফুলপ্যান্ট পরেন। রবিবার একটু বাঙালি সেজে বের হলে মনটাও অন্যরকম লাগে।

চিরকালই ব্যাকব্রাস করেন অমরনাথ। আয়নাটা বেলজিয়ামে তৈরী। কুড়ি বছর আগে রবার্ট সাহেবের বউ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন দেশে ফিরে যাওয়ার সময়। নিজেকে দেখলেন অমরনাথ। চুয়াল্লিশ বছর বয়সেই শরীর ভারী হয়েছে, জুলপি পেকেছে, দ্বিতীয় চিবুক স্পষ্ট। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে মামার এক বন্ধুর কাঠের ব্যবসায় চাকরি নিয়ে গেদে থেকে তিনি এসেছিলেন উত্তর বাংলায়। মাতুলালয়ে যারা মানুষ হয় তাদের স্বাবলম্বী হতে হয় তাড়াতাড়ি। সেই কাঠের ব্যবসায় এসে রবার্টসাহেবের সঙ্গে আলাপ। তিনিই নিয়ে এলেন চা-বাগানের চাকরিতে। চব্বিশ বছর হয়ে গেল সময়টা।

তিনখানা পেল্লাই সাইজের ঘর, উঠোনের গায়ে আর একটি ঘর, ওপাশে রান্নাঘর, দু পাশে আমকাঁঠালের গাছ, শাকসবজি নিয়ে অমরনাথের এই কোয়ার্টার্স। উঠোনে নেমে অমরনাথ মনোরমার দর্শন পেলেন। উঠোনে মোড়া পেতে বসে আছেন চুপচাপ। রান্নাঘরে বাচ্চাদের কলরব। সম্ভবত জলখাবার খাওয়া হচ্ছে। অমরনাথ মায়ের সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বল কি আনতে হবে ?'

মনোরমা বললেন, 'কি আর আনবি ? সেই তো থোড়বড়ি। তা ছাড়া আজ যে রকম হয়ে আছে আকাশ তাতে ভাল করে বাজার বসবে বলে তো মনে হয় না।'

একদম সাদা থান পরেন মনোরমা। একবার অঞ্জলির বাপের বাড়ি থেকে নরুন প্যাড় ধুতি দিয়েছিল, উনি প'রেননি। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাঁকরোল আনবো ? গত হাটে খুব ছোট দেখেছিলাম, আজ মনে হয় বড় পাওয়া যাবে।'

'কাঁকরোল তো বাড়িতেই হয়েছে। তবে ওই বিচিওয়ালা বেগুন আনিস না। নতুন আলু উঠেছে কি না দেখিস। একবেলা তো রান্না করি, বেশী বাজারের কি দরকার ! আর হ্যাঁ, সেরখানেক কালানোনিয়া চাল আনিস তো আজ।' মনোরমা বললেন।

মাথা নেড়ে রান্নাঘরেব সামনে গেলেন অমরনাথ, 'হাটে যাচ্ছি, কি কি আনতে হবে ?'

রান্নাঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এল, 'বুধুয়াকে বলে দিয়েছি।'

'সে কোথায় ?' অমবনাথ গলা তুললেন, 'বুধুয়া ! এই বুধুয়া ?'

গোয়ালঘরের দিক থেকে কালো মদেশিযা ছেলেটা দৌড়ে এল। অমরনাথ বললেন, 'নে। ব্যাগট্যাগ নিয়ে চল।' পকেট থেকে নস্যি বেব কবতে গিয়ে সামলে নিলেন তিনি। কোনদিন মায়ের সামনে নস্যি নেননি। পা বাড়াতে গিয়ে ডাক শুনলেন, 'অমর', অমরনাথ পেছন ফিরলেন। মনোরমা বললেন, 'একটু কিসমিস আনিস আজ।'

'কিসমিস ?'

'পায়েস হবে। মেয়েব জন্মদিনের কথা বাপের মনে থাকে না। ছেলে হলে মনে বাখতিস।' মনোরমা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। হেসে ফেললেন অমরনাথ। কাল রাতে অঞ্জলি বলেছিল কিসমিসের কথা। মনোরমা মনে না করিয়ে দিলে নির্ঘাৎ একটা অনর্থ ঘটত আজ।

বাড়ির সামনের মাঠে পা রাখলেন অমরনাথ। আজ রোদ উঠবে না। গাছপালাগুলো পর্যন্ত ভিজে-ভিজে দেখাচ্ছে। ছাতি নেওয়ার দরকার হবে না। বর্ষাকাল নয় তো, মেঘ যতই ঘোরাফেরা করুক চট করে বৃষ্টি নামবে না। আর নামলেও সেটা সন্ধের পর। গত রাতে বাড়িতে ফেরাব সময় ছাতা থাকতেও ভিজে গিয়েছিলেন খুব। গরমজলে পা ডুবিয়ে তবে সর্দিটা বাঁচানো গেল। মাঠের ওপারে আসাম রোড ধরে এই মেঘলা দিনেও লোক যাচ্ছে হাটে। মাঝে একটা হাটবাস বেরিয়ে গেল বোঝাই লোক নিয়ে। আকাশ ভেঙে না পড়লে সপ্তাহের একটিমাত্র হাটবারে বেচাকেনা জমে উঠবেই। শীত পড়ার মুখে, লক্ষ্মীপুজো চলে গিয়েছে। বড়বাবুর বাড়ির সামনে গেটের ভেতরে চালা বেঁধে অনন্ত কালীঠাকুরে কাঠামোয় খড় বেঁধেছে। আগে লোকটা ওই একটি ঠাকুর গড়তো। এখন পাঁচ পাঁচটা বাগানের কালীর অর্ডার নিয়ে কর্মচারি দিয়ে করায়। তবে অন্য যেখানে যাই করুক, এই বাগানের ঠাকুরের রঙ আর চোখ অনন্ত করবেই নিজের হাতে। অমরনাথ দেখলেন বড়বাবুর কোয়ার্টার্সের তারের বেড়া ধরে শনিচর ধোপা খড়ের কাঠামোর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। চা বাগানের একমাত্র ধোপা। এই বাগানে চাকরি নেবার সময় থেকেই ওকে দেখছেন। বাগান থেকেই ওকে থাকার জায়গা দেওয়া হয়েছে। ও অশক্ত হলে ওর

ছেলে কাজ করবে এটাই নিয়ম। কিন্তু সেই ছেলে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে হঠাৎ সংসার ত্যাগ করেছে। ছেলেটাকে দেখেছেন তিনি। রবিবারের বিকেলে ইস্ত্রি করা কাপড় নিয়ে বাড়িতে আসত। সাদামাটা গোবেচারি বিহারী যুবকটির মাথায় এমন মতলব ছিল তা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি। শনিচর এখন ভয় পাচ্ছে অশক্ত হয়ে পড়লে তাকে এই বাগান থেকে বিতাড়িত হতে হবে। চিন্তাটা মাঝে মাঝে তাঁর নিজেরও হয়। দেশের বাড়িতে এখন কেউ নেই। কাকাদের সঙ্গে তো কোনদিন সম্পর্ক নেই। মামারবাড়িতে যে মানুষ তার সঙ্গে থাকবেই বা কেন ? বিষয়সম্পত্তি যা ছিল বাবার নামে তা একসময় কাকারা নিজেদের নামে আইনসম্মত করে নিয়েছে। দাদু মারা যাওয়ার পর মামারা খারাপ ব্যবহার করেনি। তবে তারা যে বাইরের লোক এটা ক্রমশ ব্যবহারে ফুটে উঠছিল। এখন এই চা-বাগানের চাকরিটা ছাড়া তার কোন সম্বল নেই। তবে সময় আছে হাতে। গঞ্জের ওপাশে শস্তায় একটা জমি কিনে রেখেছেন। ষোল বছর চাকরি আছে। একটু একটু করে গুছিয়ে নিতে হবে এখন থেকেই।

চাঁপা ফুলের গাছটার কাছে পৌঁছে উলটোদিক থেকে শ্যামলকে আসতে দেখলেন তিনি। পাতিবাবু হরিদাস চ্যাটার্জির বড় ছেলে। ম্যাট্রিক পাস করে বসে রয়েছে। ভাল ফুটবল খেলে। পাতিবাবু বড়বাবুকে ধরেছেন যাতে তিনি সাহেবকে বলে শ্যামলের চাকরির ব্যবস্থা করেন। ভদ্রলোক বোকামি করছেন। অমরনাথ জানেন বড়বাবু তাঁর শালার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

সাইকেল থামিয়ে শ্যামল দাঁড়িয়ে গেল, 'অমরকাকা, বাবা বলছিলেন আপনি যদি একবার আমাদের বাড়িতে আসেন তা হলে খুব ভাল হয়। বাবা নিজেই যেতেন, কিন্তু তালুইমশাই আছেন বলে যেতে পারছেন না।'

'কি ব্যাপার তুমি জানো ?'

'ও আপনি বাবার কাছেই শুনবেন। আমি আপনার বাড়িতেই যাচ্ছিলাম।'

'চল।' অমরনাথ আর কথা বাড়ালেন না। সাইকেল নিয়ে শ্যামল পাশাপাশি হাঁটছিল। কোয়ার্টার্সগুলো বাঁদিকে, ডানদিকে আসাম রোড। ধুতিতে চোরকাঁটা লেগে যাচ্ছে। শ্যামল বলল, 'কাল লঙ্কাপাড়া বাগানের সঙ্গে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন বড়সাহেব।'

'হ্যাঁ, তোমার দেওয়া গোলে আমাদের বাগান সেমিফাইনালে উঠেছে বলে শুনলাম।'

'সাহেব কিছু বলেছেন ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'এই আমার গোল দেওয়ার ব্যাপারে ?'

'জানি না। আমার সঙ্গে তো কথা খুব কম হয়।' অমরনাথ মনে মনে হাসলেন। একটা গোল দিয়েই ছোকরা ভাবছে চাকরি পেয়ে যাবে। বড়সাহেব গভীর জলের মাছ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাজার যাবে না ?' 'আমাদের বাজার খাওয়াদাওয়ার পর হয়।'

'কেন ?' অমরনাথ অবাক হন।

'তখন দাম কমে যায়।'

অমরনাথ চুপ করে গেলেন। মালবাবুর পাশেই পাতিবাবুর কোয়ার্টার্স। বাগানের সরু গলিতে গলিতে টহল মেরে পাতি তোলান হরিদাসদা। এই চা-বাগানের সবচেয়ে প্রবীণ কর্মী। সামনের মাসে অবসর নেবার কথা ছিল, সাহেবকে অনেক ধরেটরে এক বছরের এক্সটেনশন পেয়েছেন। অমরনাথ দেখলেন বাইরের বারান্দায় চেয়ার পেতে হরিদাসদা বসে গল্প করছেন তাঁর বেয়াই-এর সঙ্গে। জলপাইগুড়িতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া করে মেয়ের বিয়ে

দিয়েছেন। এখানকার নিমন্ত্রিতরা লরিতে চেপে জলপাইগুড়িতে গিয়ে সেই বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছে। অমরনাথের শরীর ভাল না থাকায় যাননি। খরচ কমানোর জন্যে এখানকার অনেকেই একটা বাহানা দেখিয়ে জলপাইগুড়িতে গিয়ে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। হরিদাসদার যা অবস্থা তাতে ওটা না করে উপায় ছিল না। এখানে বিয়ে দিতে আটগুণ মানুষকে খাওয়াতে হত। তবে হ্যাঁ, এই চা-বাগানের প্রথম দিকের সন্ধেগুলো তাঁর কাটতো এই হরিদাসদার কোয়ার্টার্সেই। পুরনো দিনের কলের গান আছে হরিদাসদার। কানা কেষ্ট, সায়গল, কাননবালার রেকর্ড বাজাতো সন্ধের পরে। হরিদাসদা একসময় কলকাতায় ছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁয়ের বাজনা শুনেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। ওঁর সঞ্চয়ের রেকর্ড আজকাল কেউ শোনে না।

হরিদাস চ্যাটার্জীকে বয়সের চেয়ে বেশী বয়স্ক দেখায়। রোগা ক্ষয়া লম্বা চেহারা। গরমকালেও গেঞ্জির ওপর সুতির চাদর জড়িয়ে রাখেন। কালীঠাকুরের মূর্তিতে অনন্ত হাত দিতেই গায়ে আলোয়ান আসে। অমরনাথকে দেখে হরিদাসবাবু উঠে দাঁড়ান চেয়ার ছেড়ে, 'এসো অমরনাথ। চা খাবে তো? শ্যামল, যাও তো মাকে বল চা দিতে।'

'না দাদা। এইমাত্র জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি। কি ব্যাপার বলুন!'

'আরে বসো বসো। বাজারে যাচ্ছ কিন্তু বাজার তো বসেইনি। এই বারান্দায় বসে কটা হাটবাস এল দেখে বুঝতে পারি বাজারের কি অবস্থা। এই বাদলায় বাজার বসতে সময় লাগবে। বসো।'

শ্যামল জিজ্ঞাসা করল, 'তা হলে সত্যি আপনি চা খাবেন না অমরকাকা?'

অমরনাথ মাথা নেড়ে না বলে তৃতীয় চেয়ারটিতে বসলেন।

হরিদাসবাবু বললেন, 'সেবার আমার বেয়াই-এর সঙ্গে তো তোমার আলাপ হয়েছিল।'

অমরনাথ নমস্কার করলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভাল আছেন তো?'

'আছি। বয়স হলে যেমন সবাই থাকে।' ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

হরিদাসবাবু বললেন, 'বেয়াইমশাই ব্যস্ত মানুষ, দু দুটো দোকানের ঝামেলা, মিউনিসিপালিটির কাজ, কংগ্রেসী করেন তা তো জানোই, তবু গত রাতে এদিকে এসেছিলেন বলে আমার কাছে একটু থেকে গেলেন। এমনিতে জলপাইগুড়ির বাড়িতেই ওঁকে ধরা যায় না।'

'ওসব ছেড়ে দিন।' ভদ্রলোক হাসলেন, 'জলপাইগুড়ি শহরে পুরনো কংগ্রেসী বলতে তো আমরা ক'জন। লোকে জিজ্ঞাসা করে আমি কেন এম· এল· এ হলাম না। বিধানবাবু অতুল্যবাবুরা তো আমাকে পছন্দ করেন। আমি বলি ওসব করার জন্যে তো খগেন দাশগুপ্ত মশাই আছেন। ওঁকে জেতাতে পারলেই আমাদের জিত।' হরিদাসবাবুর বেয়াই চুরুট ধরালেন।

হরিদাসবাবু বললেন, 'বেয়াইমশাই বোধ হয় একটু বেশী চুরুট খান।'

'তা খাই। আমি তো বলে রেখেছি চিতায় যখন তুলবে তখনও মুখে একটা চুরুট গুঁজে দিও।'

যেন বিরাট রসিকতা করেছেন এমনভাবে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার হরিদাসদা, কিছু বললেন না তো!'

হরিদাসবাবু বললেন, 'বেয়াইমশাই-এর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ওঁর ভাই-এর একটি সুপুত্র আছে। এবার ম্যাট্রিক দেবে। ভ্রাতৃবধূর ইচ্ছে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে ঘরে বালিকাবধূ আনবেন। ওকে আমি একবার দেখেছি। প্রকৃত সুদর্শন। বয়স কত হবে বেয়াইমশাই?'

"ভদ্রলোক বললেন, 'কত হবে। সেদিন তো জন্মালো। ধরুন, সতের।'

হরিদাসবাবু আবার শুরু করলেন, 'যা বলছিলাম, ওঁদের কোন দাবিদাওয়া নেই। শুধু মেয়েটিকে সুন্দরী হতে হবে, দশ বারো বছর হলেই চলবে। শুনেই আমার মনে পড়ল তোমার দীপার কথা। এই বাগানে ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তো আর কেউ নেই।'

অমরনাথ চমকে উঠলেন, 'সে কি ! দীপা তো আজ দশে পড়ল। এই বয়েসে বিয়ে দেবার কথা ভাবছিই না।'

হরিদাসবাবুর বেয়াই বললেন, 'গরমদেশের মেয়েরা বারোতেই যুবতী হয়ে যায়। আমার মায়ের বিয়ে হয়েছিল সাতে, আমি হয়েছিলাম তেরোতে। ওহো, আমার ভাইটিকে আবার কংগ্রেসী বলে ভাববেন না। সে কনট্রাক্টরি করে প্রচুর পয়সা জমিয়েছে। পুত্র বলতে ওই একটি, ছটি কন্যার একটি বিবাহিতা। আপনাকে শাঁখা সিঁদুর ছাড়া কিছুই দিতে হবে না।'

অমরনাথের বুকের পাঁজর যেন টনটন করে উঠল। ওইটুকুনি মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। তা ছাড়া কথাটা মুখ ফুটে বাড়িতে বলবেনই বা কি করে ? অঞ্জলি শুনলে প্রচণ্ড রেগে যাবে। অমরনাথ দেখলেন দু দুটো মুখ তাঁর দিকে জবাবের আশায় তাকিয়ে আছে। অমরনাথ বললেন, 'শুনলাম। কিন্তু হরিদাসদা, ইনি তো আমার মেয়েকে দ্যাখেননি। দেখলে যে পছন্দ হবেই তারও তো কোন মানে নেই।'

বেয়াইমশাই বললেন, 'দেখেছি। একটু আগে ওই মাঠ দিয়ে একটি ছেলের সঙ্গে বাজারের দিকে গেল। দূর থেকে যা দেখলাম তাতেই চোখ জুড়িয়ে গিয়েছে।'

অমরনাথ হতভম্ব। দীপা আবার কোন, ছেলের সঙ্গে বাজারের দিকে গেল ' তিনি ভেবেছিলেন রান্নাঘরে বসে জলখাবার খাচ্ছে। একটি ছেলে মানে কোন ছেলে ? অঞ্জলি যে রাগারাগি করে তা খুব ভুল করে না।

হরিদাসবাবু বললেন, 'বেয়াইমশাই সামনে রয়েছেন, তবু বলি। সুযোগ যখন পাচ্ছ তখন আর হাতছাড়া করো না। মেয়ে বড হলে সুপাত্র পাওয়া মুশকিল। তা ছাড়া আমরা যা চাকরি করি তাতে ভাল পাত্র পেতে গেলে যে বরপণ দিতে হয় তা যোগাড করতে পারব না। অতি বড় সুন্দরীও সেই কারণে বর পায় না হে।'

অমরনাথ বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সুপরামর্শই দিচ্ছেন। দেখি, ভেবে দেখি। বাড়িতে একটু আলোচনা করি।' তারপর হরিদাসবাবুর বেয়াই-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে কিছুদিন আছেন নাকি ?'

ভদ্রলোক দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'না না। আজই চলে যাব। তা আপনি ভেবে দেখুন। আজই যে জবাব দিতে হবে তা তো নয়।'

'একটা কথা। উনি এত অবস্থাপন্ন আর আমি চা-বাগানের সামান্য কেরানি। বিয়ে-থা সমান ঘরে হওয়া উচিত। আমার মত লোকের মেয়েকে কেন বউ করে নেবেন ওরা ?'

'না মশাই, আপনাকে নিয়ে পারা গেল না। আমাদের সমান ঘর হলে এরকম প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারতাম। বড়লোক বাপ কি দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেবে ? আমার ভাই চাইছে আপনাদের মত পরিবার থেকে মেয়ে আনতে। রুচি আছে, শিক্ষা আছে শুধু পয়সাটাই যা নেই।' ভদ্রলোক চুরুটে টান দিতে থাকলেন।

অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন, 'অর্থবান মানুষের পরিবারে দরিদ্র সংসারের মেয়েরা মানিয়ে নিতে পারে না তো সবসময়। তাই বলছিলাম আর কি !'

ভদ্রলোক বললেন, 'অর্থের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগ যাদের নেই সেই পরিবারগুলোতে হয়তো তেমন হয়। এই যে এখানে হরিদাসবাবু রয়েছেন, ওঁর অবস্থা ভাল নয়, মেয়েটিও

আহামরি সুন্দরী নয় জেনেও আমি আমার ঘরে নিয়েছি। কেন নিয়েছি জানেন? বড়লোকের মেয়ের কাছে আমরা শান্তি পাবো না তাই। তাই বলে কি সে খুব কষ্টে আছে? কি হরিদাসবাবু, বলুন না?'

'না না। এঁরা সেই প্রকৃতির মানুষই নয় অমরনাথ।' হরিদাসবাবু জানিয়ে দিলেন।

'ঠিক আছে, ভেবে দেখি।' বলে অমরনাথ মাঠে নামলেন। বুধুয়া দূরে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। তাঁকে চলতে দেখে সে এগিয়ে গেল। দীপার বিয়ে এই বয়সে তিনি কি সত্যি দিতে পারবেন? বুকের মধ্যে চাপটা রয়েই গেল। মেয়েটির মুখ মনে হতেই তিনি মাথা নাড়লেন, না। পাত্র যতই লোভনীয় হোক সম্ভব নয়।

গাছের গুঁড়ি কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে মাঠ থেকে তারের গেট পেরিয়ে আসাম রোডে নামতে। অমরনাথ ধুতি সামলে সেখানে পৌঁছে দেখলেন বুধুয়া একটা ডিমওয়ালাকে ধরেছে। কুলি লাইন থেকে সারা সপ্তাহের জমানো ডিম নিয়ে যাচ্ছে হাটে বেচতে। এখানে কিনলে কয়েক আনা শস্তা হয়। দাম দিয়ে তিনি ডিমওয়ালকেই বললেন কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দিতে।

পিচের রাস্তার দু পাশে পাইকাররা বসে গেছে পাট বিক্রি করতে আসা রাজবংশী কৃষকদের ধরতে। দরাদরি করে কেনা পাট চলে যাচ্ছে সদরে। ডুড়ুয়া নদী থেকে মাছ ধরে মদেশিয়ারা আসছে হাটে ঝুড়ি ঝুলিয়ে। বেশীর ভাগই ছোট মাছ। তাদের একজনকে দাঁড় করালেন অমরনাথ, 'কি আছে, দেখাও।' লোকটা দেখাল, বান আর পাথরঠোকরা। কবে বান মাছ খেয়েছেন মনে করতে পারলেন না অমরনাথ। ভাল করে রাঁধলে শুনেছেন মাংসের চেয়েও উপাদেয় হয়। চার টাকা সের শুনে জ্যান্ত কি না দেখতে চাইলেন। পেছন থেকে বুধুয়া জানাল ওই মাছ নিয়ে গেলে মাইজি খুব রেগে যাবে। অন্যদিন সাড়ে তিন টাকায় বিক্রি হয় তবু মাইজি নেয় না। বলে দেখলে সাপের কথা মনে হয়। অন্যদিন মাছ কেনে অঞ্জলি। দুপুরের খাওয়ার পাট চুকলে ওরা বারান্দায় এসে বসে। দূরে আসাম রোড দিয়ে মাছমারারা গেলে ডাকিয়ে এনে মাছ কেনে।

অমরনাথ মত পরিবর্তন করলেন। হাটে এসে চালানি মাছ কেনাই ভাল। অমরনাথ এগোলেন। আগে হাট বসত এই হাটতলাতেই। এখন চৌমাথা ছাড়িয়ে গিয়েছে। আসাম রোড দিয়ে গাড়ি যায় শামুকের মত। পাঁচ ছটা বাগান থেকে মানুষ ঝেঁটিয়ে আসছে বাজার করতে। ভিড়ে ভিড়ে একাকার। সপ্তাহের বাকি ছদিন তো মাছিও বসে না। দোকান বলতে হাজারির মুদিখানা, মুখার্জীদের মনিহারী দোকান, একটা হাজামখানা, কয়েকটা সিগারেট বিড়ির দোকান, সাইকেল সারাই-এর দোকান আর যাদবদের ভাটিখানা। এদের ওপর ভরসা করে থাকতে হয় তাঁদের। হঠাৎ কানে তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল। একটানা কঁকিয়ে যাচ্ছে শুয়োরটা। ডানদিকের মাঠের বুকে শুয়োর কাটা হচ্ছে। মদেশিয়াদের প্রিয় মাংস, শস্তাও। কিন্তু চিৎকারটা সহ্য করা যায় না। এই নিয়ে এককালে অনেক ঝামেলা হয়েছে কিন্তু বিক্রি বন্ধ করা যায়নি।

প্রথমে মাছ কিনলেন অমরনাথ। বরফচাপা বড় রুইমাছ। যেটাকে একটু সতেজ মনে হল তার ওজন তিন সের। কয়েকদিন চলবে। একবেলা মাছ খাওয়া হয়। বুধুয়াকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বাড়িতে। অঞ্জলির সুবিধে হয়, তাড়াতাড়ি রান্না বসাতে পারবে। বুধুয়া জানে ফিরে এসে কোথায় তাঁকে খুঁজতে হবে। হয় হাজারির মুদিখানা নয় পেট্রল পাম্পে তাঁকে পাওয়া যাবে। হাজারির দোকানের সামনে ভিড় বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন তিনি। নস্যি নেন কিন্তু মাঝে মধ্যে সিগারেটও চলে। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে

ছাড়তে ভিড় দেখতে দেখতে তাঁর মনে হল, তা হলে দীপারও সম্বন্ধ এল। এইসময় একটা স্টেশনওয়াগন এসে থামল সামনে। তেলিপাড়া চা-বাগানের মালবাবু সুনীল সেন ওয়াগন থেকে নেমে তাঁকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, 'যাক, একেই বলে বরাত, আপনাকে পেয়ে গেলাম, নইলে বাড়ি পর্যন্ত ছুটতে হত।'

'কি ব্যাপার?' অমরনাথের ভাল লাগল দীপার বিয়ে-ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে।

'পরশুদিন আপনাদের যে খেলাটা ছিল বানারহাট বাগানের সঙ্গে সেটা ওরা আজ খেলতে চাইছে। একজন পার্টনারকে মঙ্গলবার পাওয়া যাবে না। নিজেদের মধ্যে ব্যাপার, প্লিজ না বলবেন না।' সুনীল সেন হাত ধরলেন।

'কিন্তু আমার পার্টনারকে তো বলতে হবে।' ছুটির দিন বেরুতে ইচ্ছে করছিল না অমরনাথের। তেলিপাড়া ক্লাব অকসন ব্রিজ কম্পিটিশন করছে। এই বাগান থেকে দুটো টিম গিয়েছে। তাঁর পার্টনার মেজগুদামবাবু। ছোকরার একটা দোষ ভুল হলেই বলে আমি ভেবেছিলাম আপনার হাতে অমুক তাসটা আছে। যতবার বলেন তোমার এই ভাবাভাবি ব্যাপারটা ছাড়ো তবু শুধরোয় না। সুনীল সেন বললেন, 'ম্যানেজ করে নিন নইলে কম্পিটিশন শেষ করতে পারব না।'

আসাম রোডটা নদীর ওপর ছোট্ট সাঁকো ডিঙিয়ে চৌমাথার দিকে চলে গিয়েছে। এখানে বাঁদিকে কাটা কাপড়ের দোকান বসে। উলটোদিকে বেতের ঝুড়ি থেকে আরম্ভ করে তামাকপাতা, সাবান, রঙিন ফিতে থেকে মাছ ধরার সরঞ্জাম নিয়ে পসারীরা বসে। ডাক্তারবাবুর ছেলে বিশু। উবু হয়ে বসে কাপড়ের ওপর ছড়ানো নানা রকমের বঁড়শি দেখছিল। ঠিক তার পাশে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণু গলায় দীপা বলল, 'এত দেখার কি আছে? পুঁটি পাথরঠোকরার জন্যেও ছটা নিয়ে নে?' বিশু বলল, 'তুই কেন মেয়ে হলি রে? মেয়েদের এত অধৈর্য হতে নেই!'

দীপা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'মা যদি ডেকে না পায় তা হলে দুপুরে মাছ ধরতে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।'

বিশু দোকানদারকে বলল, 'বান মাছ ধরার সুতো আর বঁড়শি দাও।'

দীপা বিরক্ত হল, 'বান মাছ মা রাঁধবে না।'

'আমার মা রাঁধবে। তোরা ঘটি তাই ভাল জিনিস খাস না।' বিশু বলল।

বিশুর ওপর খুব রাগ হয়ে গেল দীপার। তখন থেকে বঁড়শি দেখছে তো দেখছেই। আবার ঘটি বলে ঠোকা হল। ঠাকুমা বলে বাঙালদের কোন বাছবিচার নেই। ঠিক বলে কি না বোঝা যাচ্ছে না বিশুর বঁড়শি কেনার ধরন দেখে। সে আগ বাড়িয়ে বলল, 'ওই আটটা বঁড়শির কত দাম হবে?' দোকানদার দেখে বলল, 'এক টাকা দিদি!'

'এমা! এ কি বলে রে? এখান থেকে নিস না বিশু।' দীপা এমন গলায় চিৎকার করে উঠল যে আশেপাশের অনেকেই এদিকে তাকাল। বিশু শেষপর্যন্ত অনেক ঘ্যানর ঘ্যানর করে দামটা বারো আনায় নামিয়ে আনল। দুজনের সঞ্চয়ে ছিল একটাকা, তার বারো আনাই বেরিয়ে গেল। গত চার রবিবারে বাবার কাছ থেকে দু'জনে দু'আনা করে সংগ্রহ করেছে।

কাগজে মুড়ে বঁড়শিগুলো পকেটে পুরে বিশু উঠে দাঁড়াল, 'এই, শোনপাঁপড়ি খাবি?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'শোনপাপড়িওয়ালা এবারের হাটে আসেনি। বৃষ্টি নামবে, তাড়াতাড়ি বাড়ি চল। আর খাওয়াদাওয়ার পর বৃষ্টি নামলে আমি কিন্তু মাছ ধরতে যাব না।'

'বেশ। তা হলে কদমা খাওয়া। ওই ওখানে বসে আছে।' বিশু আঙুল তুলে দেখাল।

'তুই কি পেটুক রে! কদমা খেলে পেটে কেঁচো হয় জানিস না?'

বিশু বলল, 'বাবা ঠিক বলে, মেয়েরা এক নম্বরের কিপটে হয়।'

অতএব কদমাওয়ালার কাছে যেতেই হল। দু'জনের চার আনা পয়সা বেঁচে আছে। বিশুর জন্যে তার পুরোটাই খরচা হয়ে গেল। কদমাটাকে কামড় দিতেই গিয়েই সে থমকে গেল। সেই ছেলেটা। মালবাবুর বাড়িতে এসেছে। সে চাপা গলায় বিশুকে বলল, 'অ্যাই বিশু, সেই ছেলেটা!'

বিশু বিরক্ত গলায় জানতে চাইল, 'কোন ছেলেটা?'

'যে আমাকে আজ সকালে সুচিত্রা সেন বলেছিল।'

বিশু সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ ঘুরে দেখতে চাইল ছেলেটাকে। যার কথা হচ্ছিল সে হাটে এসেছে ফুলবাবু সেজে। মাথায় টেরি বানিয়েছে। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এ দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। দীপার খুব রাগ হয়ে গেল। আজ সকালে ছেলেটার মুখে কথাটা শোনামাত্র সে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রকের প্রান্ত উঁচু করে তুলে ফুল রেখেছিল। হাঁটু দেখা যাচ্ছে বুঝতে পেরে ফুলগুলো ফেলে দিয়ে ফ্রক নামিয়ে গম্ভীরভাবে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়েছিল। সদর দরজা বন্ধ। তারের বেড়া পেরিয়ে বাইরে থেকে আসা ওই ছেলেটির সামনে অশোভন বলে পাশের গলির পথ ধরেছিল। ফুলগুলো আনা হল না বলে খুব কষ্ট হয়েছিল তার। এখন রাগ হল। সে হাত বাড়িয়ে ডাকল ছেলেটাকে। ছেলেটা বেশ খুশিমুখে এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপার?'

'কি দেখছেন এদিকে?' চেঁচিয়ে বলল দীপা।

সঙ্গে সঙ্গে বিশু জুড়ে দিল, 'আপনি ওকে সুচিত্রা সেন বলেছেন কেন?'

ছেলেটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। দীপা বলল, 'আবার যদি দেখি আপনি কাছে এসেছেন তা হলে রতনকাকুকে বলে দেব। কথাগুলো শেষ করে সে হাঁটা শুরু করল। বিশু তার সঙ্গ ধরে কয়েক পা হেঁটে বলল, 'উরি ব্বাস, তুই কি রাগীলোকের মত কথা বললি রে!'

দীপা অহঙ্কারী মুখে আকাশ দেখল। এই ভঙ্গীতে কথা বলতে পারবে কোনদিন কেন আজ সকালেই ভাবতে পারেনি। এখন খুব ভাল লাগছে। খোকন বিশুও তো ছেলে কিন্তু ওই ছেলেটার মত বদ চাহনি নেই। আচ্ছা বদ মনে হল কেন? একটা খটকা লাগল তার। কথাটা কাকে জিজ্ঞাসা করা যায়? সে বিশুকেই প্রশ্ন করল, 'ছেলেটার তাকানো দেখেছিস?'

বিশু মাথা নাড়ল, 'হুঁ। উত্তমকুমারের মত।'

'উত্তমকুমার? তুই উত্তমকুমারকে দেখেছিস?'

'পত্রিকায়। মা পড়ে। তাতে উত্তমকুমারের ছবি আছে।'

'যাই বলিস, ছেলেটা বদ। আমার একটুও ভাল লাগেনি।' দীপা এমন গলায় কথা বলল যে বিশু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল হাঁটার সময়। দীপা সেটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই, তুই আমার দিকে অমন করে কি দেখছিস?'

'তুই কেমন বড়দের মত কথা বললি।'

'মানে?'

'আমার সোনামাসীকে দেখেছিস তো, জলপাইগুড়িতে কলেজে পড়ে, একদিন আমার সামনে এক বন্ধুকে বলছিল ঠিক ওইভাবে।'

দীপার শরীরটা কেমন করে উঠল কথাগুলো শুনে। সে কি বড় হয়ে যাচ্ছে! সে গম্ভীর

গলায় বলল, 'আমি তো বড় হচ্ছি।'

বিশু বলল, 'ছাই। শাড়ি না পরলে মেয়েরা বড় হয় না।'

এই সময় সত্যসাধনবাবুর সঙ্গে দেখা হল তাদের। সত্যসাধনবাবু তাদের ক্লাসটিচার। ময়লা একটা চটের থলি নিয়ে বাজারে এসেছেন। দেখতে পেয়েই ডাকলেন, 'ও দীপা, তোমাগো বাড়িতে জাম্বুড়ার গাছ আছে না?'

দীপা মাথা নাড়ল, আছে।

সত্যসাধনবাবু খুশি হলেন, 'চল, একবার তোমাদের অখানে যাব।'

মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না দীপার। বিশুটা তাল বুঝে পিছিয়ে পড়েছে। হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, 'অঙ্ক করতেছ তো রোজ? অন্য সব সাবজেক্টে চিন্তা নাই, অঙ্কটাই তোমার গুলমাল। হাফ ইয়ার্লিতে কত পাইছিলা?'

'চল্লিশ।'

'ভেরি ব্যাড। মিনিমাম নাইনটি পাওয়া উচিত। তোমার বাবার লগে কথা বলা দরকার।' আপনমনে কথা বলতে বলতে হাঁটছিলেন সত্যসাধনবাবু। দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল বিশু আরও পিছিয়ে পড়েছে। অঙ্কে বিশু পঁয়ত্রিশ পেয়েছে।

হাজারির দোকানের সামনে এসে দীপা মুশকিলে পড়ে গেল। বাড়িতে যেতে হলে অমরনাথকে দেখা দিতেই হবে। হাটে আসার জন্যে কৈফিয়ত চাইতে পারেন এখানেই। কিন্তু কিছু করার আগেই সত্যসাধনবাবু বলে উঠলেন, 'নমস্কার অমরনাথবাবু, আছেন কেমন?'

অমরনাথ বুধুয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, বললেন, 'এই একরকম।' সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দিকে নজর গেল তাঁর। সত্যসাধন বললেন, 'দীপাকে কইলাম আপনার বাড়ি যাব। এ মেয়ে সব বিষয়ে ব্রিলিয়ান্ট, অনলি অঙ্কে একটু কম পায়। যদি ওই সাবজেক্টটা ইমপ্রুভ করন যায় তা হলে আর দেখতে হইব না। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশন পাইতে হলে এখন থিকাই তৈরী করন দরকার। কিছু একটা করেন।'

অমরনাথ বললেন, 'ভাল প্রাইভেট টিউটর পাচ্ছি না। মায়ের কাছেই পড়ে তো।'

অন্যান্য বিষয়ে দীপা ভাল একথা সত্যসাধনবাবু বলায় খুব খুশি হলেন তিনি। সত্যসাধনবাবুকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। সেটা লক্ষ্য করেই অমরনাথ বললেন, 'আপনি তো অনেক টিউশনি করেন, সময় পারেন কি?'

'দ্যাখেন, ভাল স্টুডেন্ট পাইলে টাইম করা অসুবিধা না।'

'তা হলে কবে কথা বলব?'

'বিকালে বাড়ি থাকবেন?'

'না। তেলিপাড়ায় যেতে হবে। আগামীকাল যদি আসেন তা হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। সেই কথাই থাকল। চল দীপা।'

শান্ত মেয়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, তোমার মাছ কেনা হয়ে গিয়েছে? তপসে মাছ উঠেছে আজ?'

অমরনাথ বললেন, 'দেখিনি। যাও, বাড়িতে যাও।'

রান্নাঘরের বারান্দায় বাজারের স্তূপ। অঞ্জলি তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। বুধুয়া মনোরমার বাজার আলাদা ব্যাগে এনে দিয়ে গেছে। অঞ্জলি শাশুড়িকে বলল, 'দেখুন মা, আপনার ছেলের কাণ্ড, কাল রাত্রে আমি বললাম, বেরুবার সময় আপনি মনে করিয়ে দিলেন তবু এখনও কিসমিস কিনে পাঠায়নি। আর এই হাঁদাগঙ্গারামকে প্রতিবার বলে দিই বিচিওয়ালা

বেগুন আনবি না তবু কাঁড়ি কাঁড়ি আনবেই।'

বুধুয়া একটা বেগুন তুলে বলল, 'বাহারসে দেখনে তো অচ্ছাই লাগতা হ্যায়। আউর, বাবু তো মেরা বাত শুনতাই নেহি। আজ বান মাছ কিননে মাংতা থা।'

'ওটা আনলে তুমি তোমার বাবুকে রেঁধে খাওয়াতে।' অঞ্জলি বলল, 'এখানে বসে না থেকে বাজারে যাও। বাবুকে বলো কিসমিস আনতে।'

বুধুয়া ছুটল। মনোরমা বললেন, 'দুপুরে খাওয়ার পর মরা আঁচে পায়েস বসিয়ে দিও বউমা।'

অঞ্জলি বলল, 'আপনি পায়েস রাঁধলে আপনার ছেলের বেশী পছন্দ হয়।'

'না। ছেলেমেয়ের জন্মদিনে মাকেই পায়েস রাঁধতে হয়। সে কোথায়?'

'কোনরকমে কয়েকটা লুচি মুখে গুঁজে কোথায় গেল কে জানে! রবিবারে তো বই নিয়েও বসে না।'

'এবার থেকে মেয়ের রাশ ধরো। রান্নাবান্না শেখাও।'

অঞ্জলি কিছু বলল না। বড় কাঁঠালগাছে একটা ঘুঘু গলা ফাটিয়ে ডেকে যাচ্ছে। মনোরমা আচারের বয়ামগুলো রোদে দিয়েছিলেন। কাকের ভয়ে মুখ খোলেননি একটারও। অঞ্জলি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'ও কি করেছেন মা! আচার রোদ পাবে কি করে? আকাশ জুড়ে তো মেঘ!'

'বলা যায় না, উঠতেও তো পারে।' মনোরমা ভুলটা স্বীকার করলেন না। তারপর বললেন, 'এবার দীপাকে একটু ঘরে আটকে রাখ। ছেলেদের সঙ্গে মেশে এটা ঠিক নয়।'

অঞ্জলি তরকারির ঝুড়িটা রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়ার মুখে বলল, 'কটা দিন তো মা! সারাজীবন তো ঘরে বন্দী হয়েই কাটাবে।'

মনোরমা অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি! তুমি তো কাল সন্ধেবেলায় এই নিয়ে রাগারাগি করছিলে। তোমাদের আমি বুঝতে পারি না বাবা।' কথা শেষ করামাত্রই তিনি দীপাকে দেখতে পেলেন, পাশের দরজা দিয়ে ঢুকছে। মনোরমা বললেন, 'এই যে এলেন তিনি রাজ্য জয় করে। চেহারা দ্যাখো, একদম শাকচুন্নী হয়ে এসেছে।'

দীপা দ্রুত ঠোঁটে আঙুল চাপা দিল। শাশুড়ির গলা শুনতে পেয়েছিল অঞ্জলি। তাই রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'অ্যাই, কোথায় গিয়েছিলি! দাঁড়া, আজ তোর মজা দেখাচ্ছি।'

দীপা অঞ্জলির কথা কানে তুলল না। একদৌড়ে মনোরমার কাছে পৌঁছে নিচু গলায় কিছু বলতে তিনি ঘোমটা টানলেন, 'ওমা, তাই নাকি? অ বউমা, তাড়াতাড়ি এসো। মাস্টারমশাই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

অঞ্জলি হলুদ হাতে বেরিয়ে এল, 'মাস্টারমশাই? কোন মাস্টারমশাই?'

'সত্যসাধনবাবু। আমি তো এতক্ষণ তাঁর কাছে ছিলাম।' গম্ভীর গলায় বলল দীপা।

'ও। তা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন? বাইরের ঘরে বসা।' অঞ্জলি ব্যস্ত হল।

'উনি বসবেন না। ভেতরে আসবেন।' বলে মেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সত্যসাধনবাবুকে নিয়ে ফিরে এল। সত্যসাধন মহিলাদের নমস্কার করলেন, 'পরিবারের হুকুম তাই আইলাম আপনাগো বাড়িতে। জাম্বুড়া দরকার একখান।'

অঞ্জলি বলল, 'জাম্বুড়া? ওহো! কিন্তু আমাদের বাড়িতে তো বাতাবি লেবু নেই।'

'সে কি? দীপা, তুমি কইলা না তোমাগো বাড়িতে জাম্বুড়া গাছ আছে?'

'হ্যাঁ। ওই তো।' দীপা হাত তুলে একটি যৌবনে পড়া বাতাবি লেবুর গাছ দেখিয়ে দিল। নিজের ভুলটা বুঝতে পারলেন সত্যসাধন, 'তাই কও। আমারই ভুল হইছে।

আপনাগো মাইয়াররসিকতাবোধ প্রবল। আমি ফল কই নাই গাছ কইছিলাম। সে ঠিকই কইছে। রিয়েল ইনটেলিজেন্ট গার্ল।' আদর করে দীপার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি।

অঞ্জলি লজ্জিত হলেন, 'না না। আপনার মত মানুষের সঙ্গে রসিকতা করা অন্যায়।'

হাত তুলে নিষেধ করলেন সত্যসাধন, 'আরে না না। আমি কিছু মনে করি নাই।'

হঠাৎ দীপা বলল, 'আপনি বসুন আমি এখনই বাতাবি লেবু এনে দিচ্ছি। খোকনদের বাড়িতে এত্তো বাতাবিলেবু আছে।' বলে ছুটে যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল। অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?' দীপা বলল, 'দিনের বেলায় খোকনের ঠাকুমা আসেন না, না ?'

অঞ্জলি স্থানকালপাত্র ভুলে হেসে ফেললেন। মনোরমা পর্যন্ত লজ্জিত। সত্যসাধন কৌতূহলী হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করলেন।

খোকনদের গাছে উঠতে হল না। ওর মা রান্নাঘরে রাখা দুটো বাতাবি লেবু দীপাকে দিয়ে দিলেন। সে দুটো নিয়ে বাড়ি ফিরে সে সত্যসাধনবাবুকে দিল। সত্যসাধনবাবু বললেন, 'শোন খুকি। ভূত পেত্নী দৈত্যদানব বইল্যা কিছু নাই। এ সবই মানুষের কল্পনা। আসল কথা হইল আমাদের সামনে যেসব মানুষ ঘুইর‍্যা বেড়ায় তারাই কেউ কেউ ভূত পেত্নী হইয়া যায় সময়সময়। এখন বোঝবা না এসব কিন্তু কক্ষনো কল্পনার ভয় পাইবা না।' মহিলাদের নমস্কার করে সত্যসাধনবাবু বিদায় নিলেন।

অঞ্জলি বলল, 'যাও ভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকো না। স্নান করে আমাকে উদ্ধার করো।' দীপা ফিক করে হেসে ফেলল, 'মা, আমি ভূত হব কি করে ? মেয়েরা কি ভূত হয় ?' অঞ্জলি নিজের হেসে ফেলার কারণে লজ্জিত ছিল, মেয়ের এই কথা শুনে মুহূর্তেই রান্নাঘরে ঢুকে গেল।

॥ ৩ ॥

এক দেশলাই বাক্স ফড়িং আর এক কৌটো কেঁচো নিয়ে ওরা তিনজন যখন কোয়ার্টার্সের পেছন দিয়ে নিজেদের লুকিয়ে চা-বাগানের ভেতর ঢুকে পড়ল তখন আকাশের মেঘের গায়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। সূর্যদেবের হদিশ নেই কিন্তু তিনি এখন মধ্যগগন অতিক্রম করেছেন সেটা বোঝা যাচ্ছে। যদিও চা-বাগানের ভেতর এখন একটা স্যাঁতসেতে গন্ধ, শেডট্রিগুলোতে ভিজে ছায়া জড়ানো তবু এখন দিনটার চেহারা একটু পাল্টাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল। সরু পায়ে চলা পথ দিয়ে ওরা হাঁটছিল। প্রথমে বিশু ছিপ হাতে, মাঝখানে খোকন, সবশেষে দীপা। খোকনকে বিশু বলেছে। ছিপ দুটো লোক তিনজন। দীপা ঠিক করল সে কিছুতেই ছিপ হাতছাড়া করবে না। খোকনের মাছ ধরার ইচ্ছে হলে বিশুরটা নিক।

মাথার ওপর এক ঝাঁক টিয়া শব্দ করে উড়ে গেল। দূরে বড় সাহেবের বাংলো দেখা যাচ্ছে। চা-গাছের সবুজ কার্পেটের ওপর নৌকোর মত। বাড়িটার আদল ওরকমই। ওরা তিনজন চটপট পায়ে চলছিল। দূরের আসাম রোড দিয়ে মদেশিয়া মেয়েরা সেজেগুজে হাটে চলেছে। তিনজন কোন কথা বলছিল না। ক্রমশ গভীর থেকে গভীর চা গাছের জঙ্গলে ঢুকে গেল ওরা। আর তখনই একটা বীভৎস শব্দ শুনতে পেয়ে বিশু দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে ?' বিশু ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করতে বলল।

শব্দটা হচ্ছে থেমে থেমে, গোঙানোর মত। দীপা খোকনের হাত জড়িয়ে ধরল। খোকন বলল, চল ফিরে যাই।' মাথার ওপর নানান রঙের পাখি সমানে চিৎকার করে যাচ্ছে ঝাঁকে

ঝাঁকে। মাঝে মাঝে শেডট্রি থেকে নেমে আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে।

বিশু পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল। একটু বাঁক নিয়ে সে হাঁ করে থেমে গেল। তারপর হাত নেড়ে ইশারায় ওদের ডাকল। শব্দটা একটু থামতেই ওরা ছুটে এল। বিশু দেখাল হাত তুলে। কয়েকটা চা গাছ তুলে নেওয়া হয়েছিল কোন কারণে। সেখানে একটা বিশাল পাইথন সাপ স্থির হয়ে তাদের দেখছে। সাপটা নড়ছে না কারণ ওর মুখের ভেতরে একটা বড়সড় হরিণ ঢুকে আছে। হরিণের সামনের পা দুটো আর শিংওয়ালা মাথাকে গিলতে পারছে না সাপটা। দীপা চিৎকার করে উঠতেই সাপটা নড়বার চেষ্টা করল। খোকন জিজ্ঞাসা করল, 'কি সাপ রে?'

বিশু বলল, 'অজগব। হবিণটাকে গিলতে পারছে না। কি বিরাট মুখ, না রে!'

খোকন বলল, 'আমাকেও গিলে ফেলবে।'

বিশু মাথা নাড়ল, 'এখন পাববে না। শিংদুটো আটকে গেছে না! চল, আমরা এদিক দিয়ে চলে যাই।' সে আবার হাঁটিতে শুরু করলে বাকি দুজন অনুসরণ করল। দীপা বলল, 'ফেবার সময় এই বাস্তা দিয়ে আমি মোটেই আসছি না বাবা।'

খোকন জায়গা অতিক্রম করে হালকা গলায় বলল, 'এই জন্যেই তুই মেয়ে।'

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ রাগ হয়ে গেল দীপার। সটান একটা চড় মারল খোকনের মাথায়। মেরে রুখে দাঁড়াল। আচমকা চড় খেয়ে চিৎকার করে উঠল, 'তুই আমাকে মারলি কেন?'

দীপা রাগত গলায় বলল, 'বেশ করেছি। আমি তোকে সাবধান করে দিচ্ছি কক্ষনো আমাকে মেয়ে বলবি না। মেয়ে তো কি হয়েছে? তুই যা পারিস আমি তা পারি না? ঢিসকল!'

'তুই আমাকে ঢিসকল বললি?' খোকন প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীপা ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। এবং পড়েই আবার উঠে এগোতে যাওয়ামাত্র পেছনে সাপটা সেই একই গলায় অনেকক্ষণ বাদে গোঙানি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল দীপা। খোকনের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বিশু দূরে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ওদের কাণ্ড দেখছিল। এবার বলল, 'চলে আয়!' ডাকটায় কাজ হল। ওর পেছন পেছন হাঁটিতে হাঁটিতে এরা দুজন কথা বলছিল না।

একসময় নদীটা দেখা গেল। চা-বাগান আর ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। চওড়ায় বড় জোর ফুট তিরিশেক। স্রোত খুব। ওপাশের ফরেস্টের ছায়া পড়ায় জলের রঙ কালো। মাঝে মাঝে ফুট পাঁচেক জল কিন্তু বেশীর ভাগটাতেই নুড়ি দেখা যাচ্ছে। বিশু নিজে বড় ছিপটা নিয়ে কেঁচো পরাতে বসল। দুটো ছিপই সে একসঙ্গে বয়ে এনেছে। খোকন খপ করে দ্বিতীয় ছিপ নিয়ে নিতেই দীপা চেঁচাল, 'অ্যাই বিশু, আমার ছিপ যেন আর কেউ না নেয়।'

খোকন ছিপ থেকে সুতো খুলতে খুলতে বলল, 'ছিপের গায়ে কারো নাম লেখা নেই।'

দীপা চেঁচাল, 'বিশু বলেছে বড়শি কিনতে আমি পয়সা দিয়েছি।'

কথাটা শোনামাত্র খোকন ছিপ ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর পকেট থেকে একটা মোটা কাঠি বের করল। দীপা দেখল কাঠির গায়ে বেশ খানিকটা সবুজ সুতো জড়ানো। খোকন বলল, 'বিশু আমাকে কেঁচো দে তো। বান ধরব। দেখি আর কেউ কেমন রুই কাতলা মারে!'

দীপা ছিপ তুলে নিয়ে সরে গেল একপাশে। নদীটার মূল স্রোত উল্টোদিকে তাই এপারের এখানটায় জল খানিকটা স্থির। সে দেশলাই বাক্স বের করে একটা ছোট্ট ফড়িং

বের করল। করে অসহায় চোখে দুজনের দিকে তাকাল। দুজনেই বড়শিতে কেঁচো গাঁথছে। ফড়িঙের শরীরের ভেতরে বঁড়শি ঢোকানোর সময় একটু লালচে রস বের হয়। কিরকম ঘিন ঘিন করে ওঠে শরীরটা তখন। এখন ওদের কাছে সাহায্য চাইলে খোকন নির্ঘাৎ হাসবে। মরীয়া হয়ে ফড়িঙটাকে বঁড়শিতে গাঁথল দীপা। বাঁকানো বড়শিটাকে ফড়িঙের শরীর ঢেকে দিতেই মন ভাল হল। এসব জায়গায় বেশী লোকজন আসে না। মাছ মারারা অবশ্য মাঝে মাঝে জাল ফেলে তবে সব জায়গায় নয়। ওরা যায় ডুডুয়া নদীতে। এখানে জাল ফেললে তা নদীর বুকে পাথরে আটকে থাকাই স্বাভাবিক। নদীর গা ঘেঁষে খানিকটা হেঁটে একটু গভীব জল দেখে ছিপ ফেলল দীপা। ফাৎনাটা সবে ডুবেছে কি ডোবেনি অমনি সেটা জলের তলায় তলিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতেই জোরে টান মারল দীপা। আর সঙ্গে সঙ্গে জলের ওপব রুপোলি ঝিলিক। দীপা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'দ্যাখ, আমিই প্রথম ধরলাম। সরপুঁটি। বড়শি থেকে ছাড়াতে গিয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা মাছটাব মুখ থেকে রক্ত বের হল। একটা চোরকাঁটা গাছ তুলে নিযে তার ডগা মাছেব কানকো দিযে ঢুকিয়ে মুখের ভেতর থেকে বের করে আনল সে। তারপব মাছটাকে ফেলে রাখল ঘাসের ওপর।

আধঘণ্টার মধ্যে বিশু আর দীপা টপাটপ মাছ তুলতে লাগল জল থেকে। দীপা আড়চোখে দেখেছে খোকন বারংবার জায়গা পরিবর্তন করেও কিছু পায়নি। সে পাড থেকে ঝুঁকে বড়শিটাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিচ্ছে যতক্ষণ না ফাৎনা ওপবে ভাসে। বড়শি থাকছে মাটির ওপর। এবার খোকন ওপব থেকে সুতো নাচাচ্ছে। খাদ্যবস্তুকে জীবন্ত ভেবে কোন জলচর প্রাণী এসে গিললেই ফাৎনা ডুববে এবং খোকন সেটাকে টেনে তুলবে। কিন্তু ব্যাপারটাই ঘটছে না। দীপা চিৎকাব করে বিশুকে বলল, 'আমার ন'টা হল, তোব কটা ?'

বিশু জবাব দিল, 'বারোটা।'

'রুই কাতলা না ধরতে পারি পুঁটিতো ধবছি!' দীপা হাসল।

খোকন চলে এল ওর নিজেব জায়গা ছেড়ে, 'এঃ, এই জায়গাটা পুঁটিতে পুঁটিতে ছেয়ে গেছে। সব তেতো পুঁটি। অন্ধও ধরতে পাবে।'

দীপা নিজের মনে বলল, 'নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা!'

খোকন সেই কথায় কান না দিয়ে বলল, 'বিশু, আমি ওপাশ দিয়ে নদী পার হয়ে ফরেস্টের দিকে যাচ্ছি। ওই জায়গায় ভাল মাছ আছে মনে হচ্ছে। অন্ধকার অন্ধকার।'

বিশু আর একটা মাছ তুলতে তুলতে বলল, 'অন্ধকারেই তো বান মাছ থাকে। তোর বানের বঁড়শি, পুঁটি উঠবে কেন? তাড়াতাড়ি করিস। সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে।'

খোকন নদীর উজান ধরে এগিয়ে গেল কিছুটা। তারপর নুড়ি দেখতে পেয়ে জলে নামল। দীপার খুব মজা লাগছিল। যেমন পেছনে লাগতে চাওয়া তেমন শাস্তি, জলে নামতে হল তো। সে দেখল কখনও কখনও জল খোকনের হাঁটুর অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে। হাফ প্যান্ট উঁচু করে ধরে পা মেপে মেপে শেষ পর্যন্ত পার হয়ে গেল সে। তারপর খানিকটা নিচে এসে ঠিক ওদের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে বঁড়শি ফেলল জলে। ওর পেছনদিকে গভীর জঙ্গলের অন্ধকার। দীপা আবার নিজের মাছ ধরায় মন দিল। এখানে বোধ হয় আর পুঁটি নেই। বিশুও সরে গেছে অনেকটা ফাৎনাটা নড়ছে অনেকসময় ধরে ভেসে থাকার পরে। হঠাৎ ওপার থেকে খোকন চিৎকাব করে উঠল। কিছু একটা টান দিয়ে ওপরে তুলেছে সে। তারপরেই বল, 'একটা ইয়া বড় কাঁকড়া, কি করব?' বিশু দূর থেকে উত্তর দিল, 'পা দাঁড় ভেঙ্গে রাখ।'

'অতবড় দাঁড় আমি ভাঙতে পারব না। খেপে গেছে।'

বিশু জবাব দিল না। খোকন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি করব বল না। জলে নেমে যাবে।'

অতএব দীপা কথা না বলে পারল না, 'পাথর দিয়ে মার ওটাকে।'

শোনামাত্র খোকন একটা পাথর তুলে কাঁকড়াটাকে আঘাত করল। দীপা খুশী হল। মেয়ে বলা হয়েছিল, নিজের ঘটে তো এক ফোঁটা বুদ্ধি নেই। কিন্তু সে আর মাছ ধরতে পারছে না। হঠাৎ মনে হল ওপারে গেলে হত। কিন্তু জল ডিঙিয়ে যেতে সাহস হল না। সে দেখল বিশু জলে নেমে গেল। স্রোতটা হাঁটুর নিচে। সে জিজ্ঞাসা করল গলা তুলে, 'জলে নাম'লি কেন?' 'পাথর ঠোকরা ধরব। স্রোতে পাথরের গায়ে লুকিয়ে থাকে।' বিশু জবাব দিল।

এইসময় খোকন আবার চেঁচাল, 'বান বান বান।' দীপা দেখতে পেল জলের ওপরে একটা মোটকা সাপের মত কিছু কিলবিল করছে। লম্বায় দু ফুট হবে। বান মাছ বাড়িতে আসে না। অতএব সে যদি মাছটাকে ধরত তাহলে কোন লাভ হতো না। দীপা নিঃশ্বাস ফেলল। আর তখনই তার চোখ বিস্ফারিত হল। খোকন যেখানে দাঁড়িয়ে বানমাছটাকে বঁড়শি থেকে খোলার চেষ্টা করছে তার হাত পনের দূরে একটা ছোট্ট হাতি শুঁড় দোলাচ্ছে। দেখতে মজার কিন্তু দীপা শুনেছে বাচ্চা হাতির কাছাকাছি মা হাতি থাকবেই। সে চিৎকার করে বলল, 'খোকন তাড়াতাড়ি চলে আয়।'

খোকন বঁড়শিতে গেঁথে থাকা মাছটাকে দেখিয়ে হাসল, 'এতবড় মাছ জীবনে ধরেছিস?'

আর্তনাদ করল দীপা 'তোর পায়ে পড়ি চলে আয়। হাতি।' সে হাত তুলে দেখাল জঙ্গলটা।

সঙ্গে সঙ্গে খোকন ঘাড় ঘোরাল। আর তারপরেই ওর শরীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। খোকনকে লাফাতে দেখে বাচ্চা হাতিটা যেন মজা পেল। ছুটে এল তরতর করে জলের ধারে। আর তখনই পেছন থেকে হুঙ্কার ভেসে এল। বিশু ততক্ষণে জল ছেড়ে উঠে এসেছে ডাঙায়, 'পালা দীপা, হাতির সঙ্গে দৌড়ে পারব না আমরা।'

দীপা ওর হাত ধরে কেঁদে ফেলল, 'খোকনের কি হবে। ও তো এখনও মাঝখানে। বাচ্চাটা জলে নেমে পড়েছে।' বিশু কি করবে বুঝতে পারছিল না। খোকন তখন দ্রুত চলার কারণেই বারংবার জলে আছাড় খাচ্ছে স্রোতের ধাক্কায়। আবার পড়ি কি মরি করে ছুটছে। বাচ্চাটার সেই অসুবিধে নেই। সে ব্যবধান কমিয়েছে। খুব মজা পাচ্ছে যেন। পেছনে তখন অন্ধকার পাহাড়ের মত মা হাতি এসে দাঁড়িয়েছে। শুঁড় তুলে সম্ভবত সন্তানকে এগোতে নিষেধ করছে। সন্তান সেই নিষেধ শোনার পাত্র নয় দেখে সে এবার জলে নামল। তখনই বিপর্যস্ত খোকন এপারে উঠে এল। দীপা ওর হাত ধরে টেনে বলল, 'দৌড়া।'

ছিপ ফেলে রেখে মাছের কথা ভুলে ওরা দৌড়াতে লাগল। একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে দীপা দেখল বাচ্চাটা উঠে এসেছে এপারে। কিন্তু কি করবে বুঝতে পারছে না। ওর মাটাকে সে তখন দেখতে পেল না। তিনটে শরীর প্রাণভয়ে দৌড়াচ্ছিল। শুধু খোকন পিছিয়ে পড়ছিল আর চিৎকার করছিল, 'আমাকে ফেলে যাস না। আমাকে ফেলে যাস না।'

প্রায় মিনিট দশেক দৌড়াবার পর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বিশু বলল, 'ওরা আসছে না।'

ফিরে তাকিয়ে নির্জন চা-বাগান দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না দীপার। নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলল, 'বলা যায় না। হাতির অনেক বুদ্ধি। হয়তো অন্য রাস্তা দিয়ে আসছে।'

বিশু চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'হাতি তো শুয়ে শুয়ে দৌড়াতে পারে না। এলে চা-গাছের ওপরে দেখা যেত।' আর তখন খোকন হাঁপাতে হাঁপাতে ওদের কাছে এসে পৌঁছাল, 'আমি আর পারছি না।' বিশু বলল, 'একটু দাঁড়িয়ে নে।'

আর সেইসময় দীপার নজর পড়ল খোকনের পেছনে। সে চিৎকার করল, 'ওটা কি ?'

খোকনের হাতে কাঠির সুতোটা জড়িয়ে আছে। আর তার আর এক প্রান্তে বানমাছটা এখনও বঁড়শিতে বিদ্ধ অবস্থায় রয়ে গেছে। অবশ্য তাকে আর বানমাছ বলে চেনা যাচ্ছে না। এতটা পথ খোকন যখন ছুটেছে তখন মাছটা মাটিতে ঘষতে ঘষতে এসেছে। মাটি লাগা একটা মোটকা দড়ি বলে মনে হচ্ছে।

বিশু বলল, 'সে কিরে ! তুই বানমাছটাকে নিয়ে দৌড়ে এলি, বুঝতে পারিসনি ?'

'না।' খোকন হাত থেকে সুতোর বাঁধন খুলল অনেক চেষ্টার পর। তারপর বানমাছটাকে সুতোয় ধরে তুলে বলল, 'ধুয়ে নিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

দীপা খিলখিল করে হেসে উঠল, 'তুই কিরে ! আমরা মরছি প্রাণের ভয়ে আর তুই মাছটাকে নিয়ে দৌড়ালি !'

'এতে প্রমাণ হল আমি মাছ ধরতে পারি তোরা পারিস না।' খোকন বলল, বিশু খেপে গেল, 'চমৎকার। তোর জন্যে আমরা ছিপ মাছ ফেলে দৌড়ে এলাম আর তুই এই কথা বলছিস ! তোকে আমার সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছিল।'

খোকন বলল, 'ঠিক আছে, ছিপ সুতো বঁড়শির দাম চল আমি দিয়ে দেব।'

বিশু চটপট বলল, 'তিন টাকা।'

দীপা সঙ্গে সঙ্গে ধবিয়ে দিল. 'কিন্তু মাছগুলো ?'

খোকন মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'ধরেছিস তো কয়েকটা পুঁটি. চাব আনাও হবে না।'

দীপা হাসল, 'পুঁটি মাছের দাম চার আনা কিন্তু ধরার আনন্দটার দাম ? বাতে যখন ভাজা খেতাম তখন ভাবতাম নিজের হাতে ধরা মাছ খাচ্ছি। সেইটের দাম ?'

খোকন হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল. 'ঠিক আছে. আমি ওখান থেকে নিয়ে আসছি।'

দীপা বলল, 'থাক, অনেক হয়েছে। তোর ঠাকুমা পুর্ণিমার রাতে বাতাবি লেবুর গাছে বসে বাতাবি খায়, ওখানে গেলে তুই অমাবস্যার রাতে গাছে বসবি। নাড়ুগোপাল ছেলেকে হারিয়ে মাসীমা কেঁদে অন্ধ হয়ে যাবে। লাগবে না ছিপ।'

ওরা ঘুর পথে আসাম রোডের দিকে হাঁটছিল। এই পথে ট্রাক্টর আসে পাতি নিয়ে যেতে তাই ঘাসের পথ বেশ চওড়া। সাপটাকে এড়ানো গেল হাতির তাড়া খেয়ে। কিন্তু বিশুর খুব মন খারাপ ধরা মাছ আর ছিপ ফেলে আসার জন্যে। দীপার চোখের সামনে কেবলই মা হাতিটা ভেসে উঠছিল। বুকের মধ্যে হিম ভাবটা ফিরে আসছিল। সে যদি না চেঁচাতো তাহলে খোকন বুঝতেই পারত না। তাহলে এতক্ষণে ওর শরীরটা নিয়ে হাতিরা ফুটবল খেলত। অথচ এমন অকৃতজ্ঞ একবারও সেটা স্বীকার করল না। ছেলেরা কি এমন অকৃতজ্ঞ হয় ? এইসময় চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খোকন বলল, 'এই, আমার খুব শীত করছে।'

দীপার খেয়াল হল। জলে নাকানি চুবুনি খেয়ে খোকনের জামা প্যান্ট ি .জ চপচপে হয়ে গিয়েছিল। এখনও জল ঝরছে টপটপ করে। শীত করাটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। সে বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা।'

খোকন বলল, 'আমি এই অবস্থায় বাড়িতে যেতে পারব না।'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'বাবা মেরে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।'

'কালো বাঁদর থেকে সাদা বাঁদর হবি, ক্ষতি কি!' দীপা হাসল।

'তোরা আমার বন্ধু নস। সবসময় আমার পেছনে লাগিস!' গাঢ় গলায় বলল খোকন।

'আর কখনও আমাকে মেয়ে বলে ঠাট্টা করবি?'

'না।'

'তিনবার বল।'

'না, না, না।'

দীপা খুব ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তুই বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে থাকবি, বিশু গিয়ে ওর প্যান্ট আর গেঞ্জি এনে তোকে দেবে। তুই তাই পরে বাড়িতে ঢুকে নিজেরটা পরে নিয়ে বিশুকে ফেরত দিবি। ঠিক আছে?'

'কিন্তু মা দেখেছিল আমি সাড়ি পরে বেরিয়েছি।'

'মাসীমার মনে নেই। আচ্ছা, সেইসময় আমি মাসীমার সঙ্গে গল্প করব।'

'তোর খুব বুদ্ধি!' খোকন আপ্লুত হল।

এইসময় বিশু ঠোঁটে আঙুল চেপে শব্দ করল, চুপ করার জন্যে। ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। না, কোন গোঙানি শব্দ কানে আসছে না। ওরা বিশুকে ইশারায় কারণ জানতে চাইল। বিশু বলল, চাপা গলায়। 'আমি যেন শুনতে পেলাম কেউ সামনে কথা বলছে!'

'ভূত, নয় তো!' ফিসফিস করে খোকন বলল।

'ভূত বলে কিছু নেই, মানুষেই ভূত।' সত্যসাধনবাবুর কাছে শোনা কথা উগরে দিল দীপা নিচু গলায়।

ওরা আর একটু এগোল। এবং তখনই আবার একটা চকচকে শব্দ শুনতে পেল। তারপরই একটি নারী কণ্ঠ বলে উঠল, 'তুমি আমাকে কবে বিয়ে করবে বল?'

পুরুষ কণ্ঠটি বলল, 'কি আশ্চর্য! চাকরি না পেলে বিয়ে করা যায়?'

'কবে চাকরি পাবে?'

'চেষ্টা তো করছি। বড় সাহেব যে কি ভাবছে কে জানে। পরশুদিন লক্ষ্মীপাড়া বাগানের সঙ্গে ম্যাচ আছে। যদি জিততে পারি, মানে গোল দিতে পারি তাহলে চাকরিটা হতে পারে।'

'আমি শ্মশানের কালীবাড়িতে গিয়ে মানত করব।'

'যা খুশী কর, এখন একটা চুমু দাও তো অনেকক্ষণ ধরে।'

'দেব। কিন্তু আমাকে ছেড়ে যাবে না তো!'

'মরে যাওয়ার আগে না।'

'যদি তোমার বাবা অমত করে?'

চাকরি পেয়ে গেলে কে বাবাকে তোয়াক্কা করে!'

আর একটা দীর্ঘস্থায়ী শব্দ হল। এবং তখনই মেয়েলি গলায় প্রতিবাদ বাজল, না!'

'কেন?'

'এসব করলে যদি বাচ্চা হয়ে যায়!'

'হবে না।'

'কি করে বুঝলে?'

বইতে পড়েছি।'

তারপর নিঃশব্দ। কথাগুলো ভেসে আসছিল ডানদিকের চা-গাছের ভেতর থেকে।

হঠাৎ দীপা দৌড়াতে লাগল। প্রাণপণে। অন্য দুজন ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকে অনুসরণ করল। একদমে ওরা চা-বাগান ছাড়িয়ে চলে এল আসাম রোডে। এসে দীপা বড় মুখ করে হাঁপাতে লাগল। খোকন জিজ্ঞাসা কবল, 'ওরা চা-গাছের ভেতরে ঢুকে কি করছে রে?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'জানিনা।'

খোকন আবার জিজ্ঞাসা করল, 'যদি সাপে কামড়ায়?'

দীপা বলল, 'কামড়াক।'

'ইস। শ্যামলদাকে সাপে কামড়ালে গোল দেবে কে?'

'আমি জানিনা।'

বিশু জানতে চাইল, 'মেয়েটা কে রে?'

খোকন বলল, 'মনে হল ললিতা মাসীর গলা।'

'কি করে বুঝলি?'

'বাঃ, ললিতা মাসী ওইরকম গলায় কথা বলে।'

'কিন্তু ললিতা মাসী আর শ্যামলদা কত জায়গা থাকতে চাগাছেব ভেতবে লুকিযে আছে কেন? ওরা তো একসঙ্গে মাঠেও হাঁটে না।'

'কি জানি! বড়দের ব্যাপার আমি বুঝতেই পাবিনা।'

দীপা কোন কথা বলছিল না। পিচের রাস্তাব দিকে তাকিয়ে সে হাঁটছিল। ললিতা মাসী দেখতে মোটেই সুশ্রী নয। অন্তত ছযজন পাত্র এসে দেখে গিয়েছে ওকে। মালবাবুব মেয়ে। যে ছেলেটা এসেছে ওদের বাড়িতে সে ললিতা মাসীর আত্মীয়। মুখ চোখ নেপালিব মত। মোটাসোটা। খুব রঙচঙে শাড়ি পবে। বিকেলবেলায চুলে টেবি কেটে বাবান্দায মোড়া পেতে বসে। বাগানেব কাবো সঙ্গে যেচে কথা বলে না। সেই ললিতা মাসী চা গাছের ভেতবে শ্যামলদাব সঙ্গে কি করছে? কিছুই বুঝতে পারছিল না দীপা কিন্তু সেই শব্দটা কানে যাওযামাত্র মুখে রক্ত জমছিল। মন বলছিল, ব্যাপারটা ভাল নয়। সে হঠাৎ বন্ধুদের বলল, 'এই, দৌড়াচ্ছি? কে আগে যায় দেখি'

ওর বন্ধুরা কিছু বলার আগেই সে আার দৌড শুরু কবল। খোকন একটু চেষ্টা করেই থেমে গেল। দীপা মুখ ফিবিয়ে দেখল না। তার এখন বন্ধুদেব সঙ্গে থাকতে ইচ্ছে কবছিল না। আকাশে আবার মেঘ আসছে।

বারান্দায় মোড়া পেতে মনোরমা বসেছিলেন। এখন বিকেল। অমবনাথ একটু আগে বেরিয়ে গেছে তাস খেলতে। হাট থেকে মানুযজন ফিরতে আবন্ত করেছে। মনোবমা চুপচাপ দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর ইচ্ছে হল অনন্তব সঙ্গে কথা বলতে। অনেককাল ধরে লোকটাকে তিনি দেখছেন। কি দক্ষতায কালীঠাকুর তৈবী কবে। ওব হাতে দেবী যেন জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

মনোরমা উঠলেন। সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতেই অঞ্জলির গলা পেলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন, মা?'

মনোরমা ইচ্ছেটা জানালেন। অঞ্জলি বলল, 'চলুন, আমিও দেখে আসি।'

'ওদিকে সব বন্ধ আছে?'

'হ্যাঁ।' খাওয়া-দাওয়ার পব পান মুখে অঞ্জলিকে বেশ সুখী সুখী দেখায়। মোটাসোটা বেঁটে অথচ মুখখানি লাবণ্যে টলটল। মালবাজারের পোস্টমাস্টাব ছিলেন ওর বাবা। চারজন ভাই বোন। এখানকার পোস্টমাস্টারের বউ একদিন সম্বন্ধ আনলেন। ছবি দেখে

পছন্দ হল। চোখ দেখে মনে হল এ মেয়ে আর যাই হোক নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে না। ছেলের বিয়ে দিয়ে এক পয়সা নেননি শুনে অনেকেই চোখ কপালে তুলেছিল। বউমার পরের বোনের বিয়ের সময় ওর বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। অনেককাল হয়ে গেল, এখনও এক দিনের জন্যেও বউমার সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ বন্ধ হয়নি। এটাও তো অনেকের কাছে বিস্ময়। নিজেকে পরিস্থিতি হিসেবে বদলে নিতে জানেন তিনি। খুব কষ্ট হয় কিন্তু শেষপর্যন্ত তো পেরে যান। অন্যের মতের ওপর নিজের মত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবিরত করে যাওয়ার ফলেই তো অশান্তি হয়। মনে না নিয়েও তো মেনে নেওয়া যায়। আর সেরকম করলে প্রথমে অস্বস্তি হলেও শেষপর্যন্ত পরিবেশ যদি শান্ত থাকে তাহলেই শান্তি। অন্যের ব্যাপারে নাক বেশী গলান না বলেই তাঁর ব্যাপারে কেউ নাক গলায় না। এটাও তো স্বস্তির। ধীরে ধীরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পায়েস হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, বাটিতে ঢেলে এলাম। সব না পড়লে তো আবার মনে ধরবে না।'

'সে গেল কোথায়?'

'আছে আশেপাশে কোথাও।'

'তুমি এবার একটু রাশ ধরো।'

'আপনি ওকে শাসন করুন মা। আমার মাথা গরম হয়ে যায়। এরকম [illegible] ছেলের মত মেয়ে আমি কখনও দেখিনি। কিছু বললেই জিজ্ঞাসা করবে, কেন কি জন্য [illegible] ছোট দুজন ওকে দেখে দেখে সেটা শিখছে।'

'তাদের ঘুম ভাঙেনি?'

'আমি ইচ্ছে করেই ডাকিনি। যতক্ষণ ঘুমায় ততক্ষণ শান্তি। ফিরে [illegible] ডাকব।'

বড়বাবুর বাড়ির বারান্দায় তাঁর বাবা বসেছিলেন। লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে [illegible] পঁচাত্তর বছর বয়স, চোখে ভারি চশমা। ওদের দেখামাত্র উঠে চলে গেলেন ভদ্রলোক ভেতরে। একসময় উনি এই বাগানের বড়বাবু ছিলেন। এখন ছেলের আশ্রয়ে আছেন। [illegible] কথা বলেন। অঞ্জলি চাপাগলায় বলল, 'বাঁচা গেল।'

অনন্ত চোখ বন্ধ করে কাঠামোর সামনে বসেছিল। মনোরমা বললেন, 'কেমন আছ অনন্ত?'

অনন্ত চোখ খুলল, 'ভাল মা। আমি ভাল আছি, ঠাকুর গড়তে যখন [illegible] তখন আমি খুব ভাল থাকি। আপনারা সবাই কুশলে তো?'

'এই আর কি। তোমার চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে যে।'

'তা বয়স তো এগোচ্ছে।'

'ওকথা বলোনা। তোমাকে তো সেই প্রথমদিন থেকে দেখছি।' মনোরমার নিজের কথা মনে হল। এখনও একটাও দাঁত পড়েনি, চুলে পাক ধরেনি। বরং অমরনাথের চুলের রঙ পাল্টাতে শুরু করেছে।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি ঠাকুরের মুখ পাল্টাবে?'

'সেই কথাই ভাবছিলাম। চোখ বন্ধ করে মুখ কল্পনা করছিলাম। [illegible] মনে হল এবার সেই ঠাকুর গড়ি যিনি শিবের গায়ে সবে পা দিয়েছেন কিন্তু তখনও স্বামী বলে বুঝতে পারেননি। মনে মনে সেই মুখটা কল্পনা করছিলাম।' অনন্ত হাসল।

'কি রকম?' অঞ্জলির কৌতূহল হল।

'ক্রোধ আছে অথচ তার প্রকাশ নেই, দুঃখ আছে অথচ সেটা রয়েছে চাপা। স্নেহ আছে

কিন্তু তা বুকের ভেতরে। তাঁর মুখ •অনিন্দ্য শ্রী, দেবী দুর্গা যাঁর কাছে ম্লান হয়ে যান। তিনি কোন অপরাধ করেছেন বলে বুঝতে পারেননি তাই লজ্জিত নন। আর সেই কারণেই তাঁর জিহ্বা বাইরে বেরিয়ে আসেনি। তিনি অগ্নিশিখার মত গতিময়ী। সেই দেবীকে কল্পনা করতে গিয়ে মা একটু থমকে গিয়েছি।'

মনোরমার খুব ভাল লাগছিল। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন অনন্ত ?'

'মা, যাঁকে আমি প্রতিমন গড়ি তিনি রণরঙ্গিণী. ঊর্ধ্বাঙ্গে বসন নেই, কোমর থেকে হাতের মালা তাঁর লজ্জা নিবারণ করছে। অথচ তাঁকে দেখে মোটেই আমাদের খারাপ লাগছে না কারণ তিনি জিহ্বা বের করে আছেন। তাকালেই সেই জিহ্বার দিকে প্রথমে চোখ যায়। ফলে কুভাবনা মনে আসেনা। দেবী যদি ঠোঁট টিপে থাকেন তাহলে মানুষের মন যে ছোট হয়ে যাবে। সমস্যাটা তো এখানেই। অথচ ওঁকে তো কোন পোশাকে বাঁধা যাবে না মা।' অনন্ত চিন্তিত গলায় বলল।

এইসময় বড়বাবুর বাবা বেরিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?'

মনোরমা দেখলেন উনি এর মধ্যে পাঞ্জাবি চাপিয়ে এসেছেন। অঞ্জলি বলল, 'লক্ষ্মীদি কি ঘুমাচ্ছেন মেসোমশাই ?'

'না, না। বউমাকে দেখলাম উঠোনে। যাওনা মা ভেতরে, যাও।'

অঞ্জলি চটপট মনোরমাকে বলল, 'মা, আমি একটু লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলে আসি।'

মনোরমা বুঝতে পারলেন অঞ্জলি বৃদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই ভেতরে চলে গেল। বড়বাবুর বাবার নাম তেজেন্দ্র। বিপত্নীক মানুষ। তেজেন্দ্র বললেন, 'আহা, আপনি এ বাড়িতে এসে বাইরে দাঁড়িয়ে থাবেন তা কি হয়! এখানে বসুন।' নিজেই একটা চেয়ার ভেতর থেকে টেনে বারান্দায় রাখলেন তিনি। অগত্যা মনোরমাকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠতে হল। সাদা থানের ঘোমটা আর একটু টেনে দিলেন। সন্তর্পণে চেয়ারে বসে মায়ের কাঠামোর দিকে তাকালেন। তেজেন্দ্র তাঁর ইজি চেয়ারে।

তেজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার শরীর কি রকম ?'

'এই আর কি !' মনোরমার কথা বলতে অস্বস্তি হচ্ছিল।

'সাবধানে থাকবেন। বয়স তো হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম করবেন না। আমাদের বয়সী মানুষের কাছে গেলেই তো শুধু অসুখের গল্প শুনতে হয়। আমার দেখুন, একদম ফিট। লাস্ট জ্বর হয়েছিল তিরিশ বছর আগে। তাও সেবার জন সাহেবের সঙ্গে শিকারে গিয়ে সারারাত বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম বলেই জ্বরটা এসেছিল। জনের বউ আমাকে বলত, বাবু, তোমার মত স্বাস্থ্য আমি ব্রিটিশদের মধ্যেও দেখিনি। তাতে জন খুব রেগে গিয়েছিল। বলেই হো হো করে হেসে উঠলেন তেজেন্দ্র।

মনোরমা চুপ করে রইলেন। তেজেন্দ্র একটু অপেক্ষা করেই আবার কথা শুরু করলেন, 'তা চাকরি যখন করেছি তখন একরকম ছিলাম। বউ চলে গেল কিন্তু অভাব বুঝিনি। সবাই বলেছিল ছেলের বয়স সতের হলেও তোমার বিয়ে করা উচিত। সময় পাইনি। এখন মনে হচ্ছে ভুল করেছি। ছেলের বিয়ে দিয়ে চাকরি থেকে অবসর নিয়ে আর সময় কাটতে চায় না। কেমন শূন্য লাগে চারধার। আপনার সেরকম মনে হয় না ?'

'মানিয়ে নিতে হয়।' এছাড়া অন্য জবাব মাথায় এল না মনোরমার।

'ঠিক। মানিয়ে নেওয়া। কিন্তু কতটা ? একটা মানুষ নেই যাকে মনের কথা বলি। আর সবাইকে কেমন যেন পর পর বলে মনে হয়। ধরুণ আমার কুঁচকিতে যদি একটা ফোড়া হয় তাহলে তো আর বউমাকে ডেকে বলতে পারি না সেঁক দিতে। এই বয়সে যদি

মনের সঙ্গী না থাকে তাহলে বড় কষ্ট।' তেজেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'কোথাও ঘুরে আসুন।' ভেতরের দরজার দিকে তাকালেন মনোরমা।

'এইই। হরিদ্বারে যাব ভেবেছি। কিন্তু কি হবে গিয়ে। মনে শান্তি পাব? মোটেই না। একা একা কোথাও শান্তি পাব না।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তেজেন্দ্র, 'আপনি কি হরিদ্বারে গিয়েছেন কখনও?'

মনোরমা মাথা নাড়লেন। তেজেন্দ্র ভালভাবেই জানেন মনোরমা যাননি। এই বাগানের কে কবে কোথায় যাচ্ছে তা সবাই জানে। তেজেন্দ্র বললেন, 'অমরনাথকে সেদিন বললাম, তোমার সংসারের জন্যে মা এত খাটছেন, ওঁকে তীর্থদর্শন করিয়ে আন। তা সে বলল বাড়ি ছেড়ে সবাই যাব কি করে! তা আপনি যদি যেতে চান আমার সঙ্গে যেতে পারেন। গুরুদেবের আশ্রম আছে সেখানে চমৎকার পরিবেশ। কোন অসুবিধে হবে না।'

'না।' মনোরমা হাসবার চেষ্টা করলেন, 'আমি ভালই আছি।'

'না না কোন সঙ্কোচ করবেন না। আমাদের যা বয়স তাতে একসঙ্গে গেলে কেউ কিছু মনে করবেন না। নিজেরটা তো ভাবতে হবে আর কতকাল সংসারে জড়িয়ে থাকবেন।'

তেজেন্দ্রর কথা শেষ হওয়ামাত্র মনোরমা নাতনিকে দেখতে পেলেন। আসাম রোড থেকে দৌড়ে মাঠে নামছে। যেন পেত্নী তাড়া করেছে ওকে। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'আমি আসছি। বউমাকে বলবেন। মানে দীপা এসে গেছে তো— ।' মনোরমা আর সেখানে দাঁড়ালেন না। দ্রুত গেটের বাইরে চলে এলেন। তাঁর কান গরম হয়ে যাচ্ছিল। মুখেও তাপ। অনেক অনেকদিন পরে। একি অস্বস্তি!

মনোরমাকে দেখে দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল। ভয়ার্ত মুখ চোখ সেই সঙ্গে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। মনোরমা কাছে এগিয়ে গেলেন ঘোমটা মাথায়, 'কি হয়েছে? কোথায় গিয়েছিলি?'

মনোরমার সামনে আর একটু কুঁকড়ে গেল দীপা, 'মাছ ধরতে।'

'ওমা! তুই কি করে গেলি? মা জানলে কি হবে জানিস না?' মনোরমা এই মুহূর্তে কঠোর হতে পারলেন না। তিনি জানেন তেজেন্দ্র তাঁর বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে তোর?'

'কিছু না।' খুব দ্রুত মাথা নাড়ল দীপা।

'মিথ্যে কথা বলিসনা।' মনোরমা একবার গেটের দিকে তাকাতে গিয়ে সামলে নিলেন, 'তুই একা মাছ ধরতে গিয়েছিলি? বিশু খোকন কোথায়?'

'পেছনে আসছে।'

'ওরা তোকে কিছু বলেছে?'

'না।'

'তাহলে?'

'শ্যামলদা— ।' ঢোঁক গিলল দীপা, 'শ্যামলদা আর ললিতা মাসী বাগানের ভেতরে লুকিয়ে বসে আছে। কিসব কথা বলছিল ওরা।'

মনোরমা সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। দীপার কাঁধ ধরে তিনি বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। কিছুটা যাওয়ার পর চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'মালবাবুর মেয়ে ললিতা?'

'হুঁ।'

'কি বলছিল ওরা?'

'খারাপ খারাপ কথা।

মনোরমা নিজেকে সামলে নিলেন, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও। কোন কথা খারাপ কোন কথা

ভাল তা বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

'তুমি বলেছিলে আমার বয়সে তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল ! বিয়ে হলেই কি সব বোঝা যায় ?' দীপা প্রশ্নটা করতেই মনোরমা চুপসে গেলেন।

॥ ৪ ॥

মেজাজ খুব খাবাপ হয়ে গিয়েছিল অমরনাথের।

শেষ হাতে নবনীর দোষে হেরে গেলেন তিনি। নবনী তাঁদের বাগানের মেজগুদামবাবু। খুব উৎসাহ তাস খেলার অথচ শেষ সময়ে মাথা ঠিক রাখতে পাবে না। মাত্র চারটে বঙ পেয়ে বারো পয়েন্টেই ডবল দিয়ে বসল থ্রি স্পেড্‌সে। প্রতিপক্ষ ওটি করে জিতে গেল। তা না হলে ওরা গেম করলেও অমবনাথই জিততেন। খেলা শেষ হলে নবনী মুখ কালো করে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম দাদা আপনার হাতে দুটো বঙ আব ডাযমন্ড-এর অনার্স কার্ড থাকবে।'

কঠোর মুখে অমবনাথ বলেছিলেন, 'যদি এইরকম ভাবা বন্ধ কবতে না পাব তাহলে আমার পার্টনার হয়ে খেলতে এস না। তোমার সঙ্গে খেলতে আমাব আর ইচ্ছেও নেই।'

এইসময় ঘ্যানব ঘ্যানব কবলে আবও বাগ হয়ে যায়। সুনীলবাবু বাত্রেব খাওয়া খেয়ে যেতে অনুরোধ কবছিলেন প্রতিযোগীদেব। অমবনাথ অজুহাত দেখিয়ে একাই বেবিয়ে পড়লেন সাইকেল নিয়ে। দূবত্ব বেশি নয়। বড জোব পাঁচ মাইল।

পূর্ণিমা চলে গেলেও এখন একটু বেশী বাতে চাঁদ ওঠে, অল্প জ্যোৎস্না নামে। কিন্তু আকাশ এখনও মেঘলা। দেবীপক্ষ হয়ে গিয়েছে। দুপাশে চা-বাগান। অন্ধকাব যেন আঁটোসাঁটো হয়ে আছে। মন খারাপেব ঘোবে মাইলখানেক আসাব পবে হঠাৎ খেয়াল হল একা একা এই পথে এত রাত্রে আসা ঠিক হয়নি। মানুষেব ভয় নেই, কিন্তু চিতা আছে দুপাশের চাযেব বাগানে। মাইল তিনেকেব মধ্যে কুলি লাইনও নেই। বাস্তাব দুপাশে ঝাপড়া হয়ে আছে আম কাঁঠালের গাছ, সাব সাব। বাঁ হাতে টর্চ জ্বেলে সাইকেল চালাচ্ছিলেন। তাগিদ থাকায় জোবে প্যাডেল ঘোবাচ্ছিলেন।

বিনাগুড়িব মোড ছাড়িয়ে বাস্তাটা বাঁ দিকে ঘোবামাত্র অমবনাথ টর্চেব আলোয় একটা পুরোন হুডওয়ালা অস্টিন গাড়ি দেখতে পেলেন। বাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অমরনাথ সেটাকে লক্ষ্য কবরেন না ঠিক কবে একই স্পিডে সাইকেল চালাতে গিয়ে দেখলেন গাড়ি থেকে কেউ একজন নেমে এসে চিৎকাব কবল, 'স্টপ, স্টপ, হেল্প, হেল্প।' গলাটা মেয়েদের বলেই অমবনাথ বাধ্য হলেন সাইকেল থামাতে। মধ্যবয়সিনী এক মহিলা তড়বড়ে ইংরেজিতে কিছু বলে গেলেন। সাহেবদেব সঙ্গে কাজ কবে অমবনাথ এখন ইংরেজিতে মোটামুটি অভ্যস্ত। কিন্তু তিনি কিছুই ধবতে পাবলেন না। অমবনাথ লক্ষ্য করলেন মহিলার পরনে শাড়ি। অতএব তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা কবলেন সমস্যাটা কি ?

মহিলা চোস্ত হিন্দীতে বললেন, 'আমার গাড়ি বিগড়ে গেছে। তখন থেকে বসে আছি অথচ এই রাস্তায় কেউ আসছে না। ভয়ে আমাব প্রাণ বেবিয়ে যাচ্ছিল।'

'আপনি এখানে এত রাত্রে কি করছিলেন ?'

'আশ্চর্য ! আমি কি করছিলাম সেটা বুঝতে পাবছেন না ? আমাকে আজ রাত্রেই শিলিগুড়িতে যেতে হবে। এখানে মেকানিক কোথায় পাওয়া যাবে ?' মহিলা এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করলেন।

'এখানে তো পাবেন না। গাড়িতে কি আপনি একা আছেন?'

'হ্যাঁ। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'এখান থেকে কয়েকমাইল দূরে এক চা-বাগানে আমি কাজ করি।'

'আচ্ছা! ওই বাগানে গেস্টহাউস আছে?'

'তা আছে। কিন্তু সেখানে থাকতে গেলে বড় সাহেবের অনুমতি লাগবে।'

'সেটা পেতে আমার কোন অসুবিধে হবে না। আপনি বাগানে গিয়ে একটা এসকর্ট গাড়ি পাঠিয়ে দিন চটপট।' মহিলা হুকুম করলেন।

'গাড়ি পাঠাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'আপনার বড় সাহেবকে বলুন একজন মহিলা গাড়ি নিয়ে অসুবিধায় পড়েছেন।'

'তাঁকে বলা যাবে না। কারণ ছুটির দিনে তিনি মদ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকেন।'

'এইসব পুরুষগুলোর জন্যে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। তাহলে কি করা যায়?' ভদ্রমহিলাকে চিন্তিত দেখাল, 'এই গাড়ি চুরি করার জন্যে এত রাত্রে এখানে কেউ আসবে মনে হয়?'

'না আসাই স্বাভাবিক।' অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কি করা উচিত।

ভদ্রমহিলা অমরনাথকে পেরিয়ে সরাসরি তাঁর সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে বসলেন, 'চলুন। এই জঙ্গলে পড়ে থাকলে কাল সকালে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না।'

প্যাডেল ঘোরাতে গিয়ে সাইকেলটা একটু নড়বড়ে হতেই ভদ্রমহিলা ধমকে উঠলেন, 'ঠিক ভাবে চালান, পড়ে যাওয়াটা আমার ভাল লাগবে না।' ডাবলক্যারি করার অভ্যাস নেই, চেষ্টা করে নিজেকে সামলে নিলেন অমরনাথ। এ জীবনে কোন মহিলাকে সাইকেলের পেছনে নিয়ে চালাননি তিনি। অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। কিন্তু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল, একে নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন? বড় সাহেবকে ডাকতে গেলে চাকরি যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। পি ডব্লু ডির বাংলোতে গিয়ে অবশ্য চৌকিদারকে অনুরোধ করা যায় এঁকে একরাত থাকতে দেবার জন্যে। কথাবার্তা এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সম্পন্ন ঘরের শিক্ষিতা মহিলা। কিন্তু চৌমাথায় পৌঁছাতে চেনা লোকজন যদি এই দৃশ্য দ্যাখে তাহলে আর চা-বাগানে টিকতে হবে না। অমরনাথ ঘামতে লাগলেন। পেছনে যিনি বসে আছেন তিনি আপাতত শব্দহীনা। মহিলার সাহস খুব। এই রাত্রে একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। মেমসাহেবদের গাড়ি চালাতে দেখেছেন অমরনাথ কিন্তু কোন ভারতীয় মহিলাকে এই প্রথম দেখলেন। তার ওপর একদম অপরিচিত একটি মানুষের সাইকেলের পেছনে কি অবলীলায় চড়ে বসলেন। অমরনাথ না হয়ে কোন কুমতলববাজও তো হতে পারত। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনা মাথায় এল। চা-বাগানের রাস্তায় অনেকেই রাত দুপুরে তেনাদের দর্শন পায়। অমরনাথের প্রতি তেনারা এখন পর্যন্ত দয়া করেননি। আজ সেটাই হল না তো! অমরনাথের সর্বাঙ্গে কাঁটা ফুটল। তিনি আরও জোরে প্যাডেল ঘোরাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত চৌমাথা এসে গেল। দোকানপাট বন্ধ। সারাদিন হাটের পর আর কেউ জেগে নেই। একেবারে নদী পেরিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সের সামনে এসে অমরনাথের মনে হল ইনি তিনি নন। হলে এতটা দূর এভাবে আসতে পারতেন না। নিজের বোকামির জন্যে লজ্জা পেলেন তিনি। কিন্তু এখন কি উপায় হবে? কোথায় রাখতে যাবেন এঁকে? চৌমাথায় নামিয়ে দিলে মুক্তি পাওয়া যেত। এখন তো ফিরে যাওয়া যায় না। বাবুদের কোয়ার্টার্সের আলো নিবে এসেছে। কেউ তাদের দেখতে পায়নি।

সাইকেল থেকে নেমে অমরনাথ বললেন, 'আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি, এবার আপনি ঠিক করুন কোথায় যাবেন।' ভদ্রমহিলা সহজ ভঙ্গিমায় নেমে পড়লেন

ক্যারিয়ার থেকে। এখন মাঠ আকাশ ঘুটঘুটে অন্ধকারে মোড়া। শুধু অমরনাথের বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে হ্যারিকেনের আলোর ফালি বাইরে পড়ছে। ভদ্রমহিলা সেই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওখানে আপনি থাকেন?'

'হ্যাঁ। ওটা আমার কোয়ার্টার্স।' অমরনাথ ঈষৎ শঙ্কিত হলেন।

'আপনার আত্মীয়স্বজন?'

'সবাই আছেন।'

'আপনি তো বাঙালি?' কথাবার্তা এতক্ষণ হিন্দিতে হচ্ছিল, কুলিকামিনদের সঙ্গে কাজ করতে করতে যে হিন্দী অমরনাথ শিখেছেন তাকে শিক্ষিত হিন্দী বলা যায় না। ভদ্রমহিলা সে-তুলনায় বেশ তুখোড়। হঠাৎ বাংলা ব্যবহার করলেন তিনি। অমরনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। আমার নাম অমরনাথ মুখোপাধ্যায়।' মহিলা চারপাশে নজর বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'তা এতক্ষণ এ কথা বলতে কি অসুবিধে হয়েছিল বুঝি না। চলুন আজ রাত্রে আপনার বাড়িতেই থাকব। মদোমাতাল সাহেবকে ডেকে তোলার ধকল আর নেব না।'

'আপনি আমার বাড়িতে থাকবেন?' অমরনাথ ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞাসা করলেন।

'রাস্তায় পড়ে থাকতে পারি না তো। আমার নাম রমলা সেন। কেশবচন্দ্র সেনের নাম শুনেছেন?'

'কেশবচন্দ্র?' চিনতে পারলেন না অমরনাথ।

'নববিধান, ব্রাহ্মসমাজ? বুনো জায়গায় থেকে কি অশিক্ষিত হয়ে আছেন বলুন তো!'

এবার অমরনাথ চিনতে পারলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো অনেককাল হল গত হয়েছেন। আপনি অমন হুট করে বললে আমি ঠাওর করব কি করে?'

'করা উচিত। যদি বলি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন তাহলে তো পাড়ার কোন রবির কথা নিশ্চয়ই ভাববেন না। আমি কেশব সেনের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। চলুন ভেতরে।'

প্রতিক্রিয়া কি হবে জানেন না। নিজেকে তিনি কিছুটা রক্ষণশীল বলে মনে করেন কিন্তু গোঁড়ামি নেই। সেটা আছে অঞ্জলির। চাল চলন বলনে। মনোরমা ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখবেন সেটাও একটা প্রশ্ন। কিন্তু এখন কিছু করার উপায় নেই। নবনীর ওপর আবার রাগ এল তাঁর। শেষ হাতটা যদি বোকার মত ডাবল না দিয়ে বসত তাহলে দুজনে একসঙ্গে ফিরে আসতেন। পথে রমলা সেনকে পেলে তিনি থেকে যেতেন নবনীর বাড়িতে। সে থাকে একা। বিয়ে থা করেনি। রমলা সেনের আপত্তি হলে নবনী তার বাড়িতে চলে আসতে পারত। কিন্তু এসব ভেবে আর লাভ কি। অমরনাথ দরজার কড়ার মৃদু আওয়াজ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জলির গলা ভেসে এল, 'কে?'

'আমি।' জানান দিয়েই সংশোধন করে নিলেন অমরনাথ, 'আমরা।'

ভেতরে অঞ্জলির গলা আর একটু উঁচুতে উঠল, 'কি তাস খেলার নেশা বাবা, রাত কত হল তাও খেয়াল করো না। কতক্ষণ এভাবে জেগে থাকা যায়!'

দরজাটা যখন খুলছে তখন রমলা সেন খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আপনি তাস খেলেন?'

অমরনাথ দেখলেন অঞ্জলি যেন একটু অপ্রস্তুত। সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। রমলা অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি জেগে থাকেন কেন? এই ভদ্রলোক নিজের শখ মেটাতে যদি শেষরাত করেন তাহলেও আপনি জেগে থাকবেন? না না অমরনাথবাবু, আপনি তাস খেলতেই পারেন, সারারাতও পারেন কিন্তু উনিও তখন ঘুমাতে পারেন।'

অমরনাথ তাড়াতাড়ি বললেন, 'এ সব কথা এখন থাক। আপনি ভেতরে এসে বসুন।'
অঞ্জলি দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকে রমলা বললেন, 'আপনাদের ইলেকট্রিসিটি নেই।'
'না। এখনও আসেনি।'
'চায়ের বাগান কিসে চলে, ইলেকট্রিক লাগেনা ফ্যাক্টরিতে?'
'ওখানে আছে। সাহেবদের কোয়ার্টার্সে আছে।'
'দিস ইজ ব্যাড।' রমলা বসে পড়লেন চেয়ারে, 'বসলাম। আপনার সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে শরীরে ব্যথা হয়ে গিয়েছে।'
অমরনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। সেই মুহূর্তে অঞ্জলি চোখ তুলল। অমরনাথ বুঝলেন এখনই সব কথা খুলে না বললে সমস্যা বাড়বে। তিনি সাইকেলটাকে বারান্দা থেকে তুলে ঘরের এক পাশে রেখে বললেন, 'তেলিপাড়া থেকে আসছিলাম। মাঝরাস্তায় দেখি এঁর গাড়ি খারাপ হয়ে আছে। জায়গাটা খারাপ, উনি সাহায্য চাইলেন। এত রাত্রে কোথায় নিয়ে যাব—।'
'আপনার স্ত্রী তো?' চেয়ারে বসেই হাত তুললেন রমলা সেন।
'হ্যাঁ। ওর নাম অঞ্জলি?'
'নমস্কার। আমার নাম রমলা সেন। কলেজে পড়াই। এসেছিলাম এক ভদ্রলোকের অনুরোধে তার চা-বাগানে। আজ সকালেই এসেছিলাম। সন্ধের পরে বুঝলাম লোকটা মোটেই ভদ্রলোক নয়। তাই ফিরে যাচ্ছিলাম। পথে গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। আজকের রাতটা তাই এখানেই থাকব। আপনার আপত্তি নেই তো?'
এতক্ষণে অঞ্জলি কথা বলল, 'না না। বেশ তো।'
'আমাকে নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। মশা আছে?'
অমরনাথ বললেন, 'হ্যাঁ। মশারি টাঙালে অসুবিধে হবে না।'
অঞ্জলি আবার স্বামীকে দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আসছি।'
এখন চা-বাগানে গভীর রাত। দুটো প্রায় ঘুমন্ত ঘর পেরিয়ে অঞ্জলি ভেতরের বারান্দায় চলে এসে মনোরমার দরজায় মৃদু অথচ দ্রুত আঘাত করল, 'মা, মা। উঠুন, একবার।'
মনোরমা খানিকটা অবাক হয়ে আঁচল সামলাতে সামলাতে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল, অমর ফেরেনি এখনও?'
অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'না-না। ফিরেছে। কিন্তু সঙ্গে একজন ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এসেছে। কলেজে পড়ায়। চোখে মুখে কথা বলেন। আজ রাত্রে এখানে থাকবেন। কিন্তু কি খেতে দেব বুঝতে পারছি না বলে আপনাকে ডাকলাম। আপনি একবার চলুন।'
'আমি গিয়ে কি করব!' মনোরমা জানতে চাইলেন, 'কোত্থেকে নিয়ে এল অমর ওকে?'
'রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে পড়েছিল। আপনার ছেলের কাছে সাহায্য চেয়েছিল।'
'ওমা। রাতবিরেতে অজানা অচেনা মেয়েমানুষ সাহায্য চাইলেই তাকে বাড়িতে বয়ে আনতে হবে। কবে ওর আক্কেল হবে বল দিকিনি! জীবনে একবার ভুল করলে তো মানুষের শিক্ষা হয়!' মনোরমার গলা ওপরে উঠছিল। অঞ্জলি হাত তাড়াতাড়ি ইশারা করতে সেটা নেমে এল। পাশেই কৌতূহলী চোখে বিছানা ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দীপা। অঞ্জলি তাকে কড়া গলায় বলল, 'অ্যাই শুতে যা। সারা পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে আর মেয়ের চোখ ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে।'
মনোরমা তখন সমস্যার ভেতরে ঢুকে গিয়েছেন, 'কি খায়—যদি একবার জিজ্ঞাসা করে

নিতে।'

অঞ্জলি বলল, 'আমার লজ্জা করছে।'

হঠাৎ দীপা প্রশ্ন করল, 'আমার লজ্জা করবে না। আমি জিজ্ঞাসা করে আসব?'

মনোরমা অবাক হয়ে বললেন, 'এমা! কি ব্যাপারে কথা বলছি তুই জানিস?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। তুমিই তো বল সবসময় চোখ খোলা আর কান খাড়া করে থাকবি।'

অঞ্জলি হাসি চাপল। তারপর বলল, 'তুই ঘুমের মধ্যেও তাই করিস বুঝি!'

'আমার তো ঘুম আসেইনি। যাব?' দীপা ছটফটিয়ে উঠল।

মনোরমা বললেন, 'দাঁড়াও।' তারপর অঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অমর ওখানে আছে?'

অঞ্জলি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। মনোরমা নাতনিকে বললেন, 'তুই গিয়ে তোর বাবাকে জিজ্ঞাসা করবি উনি ভাত না রুটি খাবেন?'

দীপা ছুটল। চারপা গিয়েই সে কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে ফিরে এল, 'আমার পিঠের বোতামটা লাগিয়ে দাও না।'

অঞ্জলি সেখানে হাত দিয়ে হতাশ হলো 'তুই আবার এই জামাটা পরে শুয়েছিস? তোকে বলেছিলাম না বোতাম না লাগানো পর্যন্ত এটা পরবি না।

একটা তো ছিল। আমার খুব আরাম লাগে শুতে—।'

'আরাম লাগে! এর মধ্যেই আরাম বুঝে গিয়েছ! যাও খুলে অন্য জামা পরে নাও। যে বোতামটা ছিল সেটিও হারিয়েছ।'

জামা শরীরে গলালেই চুলে চিরুনি বোলাতে হয়। কিন্তু আয়নার কাছাকাছি কোন হ্যারিকেন জ্বলছে না। নিজের আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজে চিরুনি চালিয়ে দীপা বাইরের ঘরের দরজায় চলে এল। অমরনাথ কিছু বলছিলেন মেয়েকে দেখে চুপ করে গেলেন। দীপা আর একটু এগোতেই ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। কিরকম করে শাড়ি পরা। মায়েদের বয়সী হবে। মুখটা সুন্দর কিন্তু খুব শক্ত শক্ত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রুটি না ভাত খাবেন?'

'আমি যে কিছু খাব তা ভাবলে কি করে?' রমলা সেন হাসলেন।

'সারারাত তো না খেয়ে কেউ থাকে না।'

'ইন্টারেস্টিং! তুমি কি শুনেছ পৃথিবীর অনেক লোক একবেলা খেয়ে থাকে?'

'শুনলাম।'

'বাঃ! কি নাম তোমার?'

'দীপাবলী মুখোপাধ্যায়। আপনার নাম?'

'রমলা সেন।' রমলা যেন একটু থমকে গেলেন।

'কি খাবেন বলুন?'

'যা তোমাদের সুবিধে। তোমার খাওয়া হয়ে গেছে?'

'কখন! বাবার জন্যে মা বসে থাকে, আজ আপনি এলেন।'

রমলা সেন উঠলেন, 'আপনার স্ত্রী কোথায় অমরনাথবাবু? কি যেন নাম! অঞ্জলি।'

রমলা দীপার পাশ কাটিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকে গলা তুললেন, 'ভাই অঞ্জলি! অঞ্জলি!' মেয়ের পেছন পেছন উত্তরটা শোনার জন্যে চলে এসেছিল অঞ্জলি অতএব একদম মুখোমুখি পড়ল। রমলা তাকে দেখামাত্র বললেন, 'শোন, তুমি যদি ব্যস্ত হও তাহলে ভাই

আমি খুব লজ্জায় পড়ব। তোমাদের দুজনের জন্যে যা আছে তাই ভাগ করে তিনজনে খাব। তোমাদের যদি কষ্ট হয় তাহলে একটু মেনে নাও, বুঝলে।'

অঞ্জলি বলল, এই বাড়িতে যখন এসেছেন তখন ব্যাপারটা আমাদের ওপর না হয় ছেড়ে দিন। আপনি বরং হাতমুখ ধুয়ে নিন।'

সঙ্গে সঙ্গে কমলা সেন গলা তুললেন, 'আচ্ছা জ্বালাতন তো। এই করেই বাঙালি মেয়েরা নষ্ট হয়ে গেল। এই রাতদুপুরে তুমি রাঁধতে বসবে? পাগল! আচ্ছা বাবা, যদি তোমাদের বেশী খাবার না থাকে তাহলে আমায় এক বাটি মুড়ি দাও। তাতেই চলবে।'

অঞ্জলি তো হতবাক। একদম অচেনা মানুষ এমন ধমক দিয়ে কথা বলতে পারে! এইসময় মনোরমার গলা ভেসে এল ভেতরের বারান্দায় যাওয়ার দরজা থেকে, 'উনি যা বলছেন তা তো ভালই। বাড়িতে যা আছে তাই ধরে দাও। অতিথি নারায়ণ, যত্নের সঙ্গে যা দেবে তাতেই তিনি খুশী হন।'

কমলা সেন এগিয়ে গেলেন, 'আপনি কে হন এদের?'

'অমর আমার ছেলে।' মনোরমা জানালেন।

'নমস্কার।' কমলা সেন হাত জোড় করলেন, 'আপনার কথা আমার খুব ভাল লাগল। তবে আমি নারায়ণ টারায়ণ বুঝি না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাদের ঘুম থেকে তুলে খুব অন্যায় করেছি।'

'তা কেন? এইসময় কোন আত্মীয়স্বজন তো দূরদেশ থেকে উপস্থিত হতে পারত। যাও বউমা, দাঁড়িয়ে থেকে রাত বাড়িও না।' মনোরমা ফিরে গেলেন নিজের ঘরে।

দীপার ঘুম আসছিল না। এইরকম কথাবার্তা কোন মহিলা বলতে পারে জেনে সে বারে বারে চমৎকৃত হচ্ছিল। কমলা সেন হাত মুখ ধুলেন। অমরনাথের সঙ্গে রান্না ঘরে পিঁড়ি পেতে বসে খেলেন। অঞ্জলিকে বারংবার বলতে লাগলেন একসঙ্গে খাওয়ার জন্যে। অঞ্জলি রাজি হচ্ছিল না। ব্যাপারটা তার অভ্যাসেই নেই। কিন্তু কমলা জেদ ধরলেন অঞ্জলি যদি না খান তাহলে তিনিও খাবেন না। বললেন, 'আমি কি মনে করব যে তুমি এক সঙ্গে খাচ্ছ না কারণ আমার ধর্মটা ব্রাহ্ম।' অঞ্জলি প্রতিবাদ করল। এবং শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে খাওয়া শুরু করল। যদিও দূরত্বটা ছিল অনেকটাই। রান্নাঘর থেকে খাওয়ার ঘর অন্তত হাত দশেক। দীপা পুরো ব্যাপারটা দেখল। তারপর মায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ব্রাহ্ম মানে কি? খ্রীস্টান?' ধন্দ ছিল অঞ্জলির। শব্দটা সে শুনেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন চেনাজানা মানুষকে ওই ধর্মাচরণ করতে দ্যাখেনি। অঞ্জলি চাপা গলায় বলল, 'চুপ করো।'

অমরনাথ কিন্তু অস্বাভাবিকমের চুপ করে গিয়েছিলেন। অঞ্জলি নিজে আলাদা না খেয়ে তাঁকে আলাদা দিলেই বেশী খুশী হতেন। এ বাড়িতে একটা বেশী ঘর আছে। সকালে ছেলে মেয়েরা সেখানে পড়ে। খাটও আছে। ভদ্রমহিলার শোওয়ার কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু এমন সৃষ্টিছাড়া মহিলার কথা তিনি গল্প উপন্যাসেও পড়েননি। আড় চোখে দেখলেন একবার। অন্ধকার রাস্তায় তাঁকে থামাবার পর যে রেটে প্রথমে ইংরেজি এবং পরে হিন্দী বলছিলেন তা এখন দেখলে অনুমান করা শক্ত।

খাওয়া শেষ হল আগে অঞ্জলিরই। রবিবার বলেই বাড়িতে মাছ ছিল। ভাগ করে নিতে অসুবিধে হয়নি। অঞ্জলি বাইরের ঘরে বিছানা করে দিয়ে নিজের দুটো ভাল শাড়ি বের করল। যা পরে আছেন কমলা সেন তা পরে নিশ্চয়ই রাত্রে শোবেন না।

ঘরে ফিরে এসে কমলা সেন বললেন, 'চমৎকার খেলাম। জঙ্গলে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল

বাঘের পেটে যেতে হবে নিজের পেট ভরাবার কথা চিন্তাতেও আসেনি। তোমার স্বামীটি ভাই খুব ভাল মানুষ। অন্ধকারে একা পেয়েও কোন বিরক্ত করেনি।'

অঞ্জলি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওমা, আপনাকে বিরক্ত করতে যাবে কেন ?'

'আচ্ছা মেয়ে তো তুমি ? পুরুষমানুষ মেয়েদের কেন বিরক্ত করে তা জানো না ? এই এতটা পথ এক সাইকেলে এলাম, একবার পেছন ফিরেও তাকায়নি যেন আমি একটা ভয়ঙ্কর জীব। স্ত্রী হিসেবে তুমি এই জন্যে গর্বিত হতে পার।'

অঞ্জলির কথাগুলো ভাল লাগল না। যত বিপদই হোক হুট করে একটা অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে সাইকেলে কেউ আসে ! অঞ্জলি বলল, 'আপনার সাহস তো খুব।'

'ওইটেই তো সম্বল।' রমলা সেন শাড়িদুটো দেখলেন, 'আরে একি করেছ ! না না তোমার শাড়ির দরকার নেই। এগুলো তুমি নিয়ে যাও।'

'আপনি রাত্রে ওইটে পরেই শোবেন ? নষ্ট হয়ে যাবে কাল সকালে !'

'সেটা আমি বুঝব। আমি অন্যের ব্যবহার করা শাড়ি পরে শুতে পারি না। শরীর কেমন করে। তাছাড়া এঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে তো সব ল্যাঠা চুকে গেল !'

অঞ্জলি হেসে ফেলল। দীপা দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়। সেদিকে নজর পড়তে অঞ্জলি বলল, 'তুমি এখনও ঘুমোওনি ? যাও, শুয়ে পড়গে।'

দীপা বলল, 'আমার চোখে ঘুমই আসছে না।'

রমলা সেন বললেন, 'বাঃ। খুব ভাল। এস, ততক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করি। ঘুম এলেই যে যার বিছানায় চলে যাব।'

অঞ্জলি কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন। রমলা সেন চেয়ারে বসলেন। বসে দীপাকে ডাকলেন, 'ওখানে কেন, তুমি বরং ওই খাটে উঠে বস।'

কৌতূহলে দীপার পেট ফেটে যাচ্ছিল। বিছানায় উঠে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, 'তোমার বাড়িতে আর কে কে আছে ?'

রমলা সেন হাসলেন, 'কেউ নেই শুধু একটা কাজের মেয়ে ছাড়া।'

'তুমি বিয়ে করোনি ?'

'হুঁ। করেছিলাম।'

'তোমার বর কোথায় থাকে ?'

'এখন তিনি আর আমার বর নন। তাই আমি আমার মত থাকি।'

'ওমা। একবার বর হলে আবার বর নয় হবে কেন ?'

'হয়। ধরো, তোমার কোন বন্ধু তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করল। তুমি তার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলে। সে কি আর তোমার বন্ধু থাকবে ? থাকবে না।'

'বর কি বন্ধু ?'

'হ্যাঁ। কিছু সম্পর্ক আছে যা মানুষ জন্মমাত্র পেয়ে যায়। যেমন মা বাবা দাদা বোন, মাসি পিসি এইসব। এগুলো পেতে মানুষকে কিছু অর্জন করতে হয় না। রক্তসূত্রেই এসে যায়। কিছু সম্পর্ক মানুষ বড় হতে হতে তৈরী করে নেয়, যেমন বন্ধু বান্ধবী, স্বামী। এগুলো নির্ভর করে মনের ওপর। তাই মন না মানলে পরিবর্তন আনা যায়।'

দীপা অবাক হয়ে শুনছিল। সত্যি তাই। বিশুর সঙ্গে তোতনের একসময় খুব বন্ধুত্ব ছিল। এখন ওরা কথাই বলে না। কিন্তু মা যদি কথা বন্ধ করে দেয় তবু মা-ই থাকে। কিন্তু বাবা কষ্ট পেলে মাকে ছেড়ে যেতে পারে, মা-ও তাই ? সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ব্রাহ্ম ? ব্রাহ্ম মানে কি খ্রীস্টান ?'

রমলা সেন মাথা নাড়লেন, 'না মা। ওটা একটা আলাদা ধর্ম। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টানের মত। এখন বললে তুমি বুঝবে না।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'বিয়ে হয়ে গেলে বুঝতে পারব।'

ওইটুকুনি মেয়ের মুখে এই কথাটি শুনে হকচকিয়ে গেলেন রমলা সেন, 'মানে ?'

'ঠাকুমা বলেছে আমি যেসব কথা এখন বুঝতে পারব না তা বিয়ে হয়ে গেলে পারব।'

দীপা হাসল, 'ঠাকুমা তো দশ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাই তখন থেকেই বুঝেছিল।'

রমলা সেনের খুব কষ্ট হল। হঠাৎই। সেই সঙ্গে একটু রেগেও গেলেন, 'শোন, তোমার ঠাকুমা তো অনেক আগে জন্মেছিলেন তাই তাঁর সময়ের নিয়ম ছিল আলাদা। বিয়ের সঙ্গে বোঝাবুঝির কোন সম্পর্ক নেই। পড়াশুনা যত করবে, যত নিজের জ্ঞান বাড়াবে, চারপাশের মানুষকে যত জানতে চাইবে তত সবকিছু বুঝতে পারবে। তুমি এখানকার স্কুলে পড় ?'

'হ্যাঁ।' পড়াশুনার প্রসঙ্গ তুলতে দীপার মোটেই ভাল লাগছিল না।

'এখানে কোন ক্লাস পর্যন্ত আছে ?'

'এইট'।

'তারপর সবাই কোথায় পড়তে যায় ?'

'বানারহাট, নয় বীরপাড়ায়। যাদের সুবিধে আছে তারা জলপাইগুড়িতে যায়।'

'তুমি কোথায় যাবে ?'

'জানি না।'

'শোন, তোমাকে অন্তত গ্রাজুয়েট হতে হবে। বি এ পাশ করলে গ্রাজুয়েট বলা হয়।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা মানে ? তুমি কি বুঝতে পারছ আমার কথা ? গ্রাজুয়েট না হলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। এই দ্যাখো, তোমার মা ঠাকুমা এখানে আছেন, যদি তোমার বাবা রেগে গিয়ে ওঁদের বাজার করে না দেন, টাকা পয়সা না দেন, খারাপ ব্যবহার করেন তাহলে ওরা কি খেয়ে পরে বাঁচবেন, বল ?'

'খাওয়াই হবে না।'

'ওঁরা যদি শিক্ষিত হতেন তাহলে চাকরি করে টাকা রোজগার করতে পারতেন। কারো দয়ার ওপর বাঁচতে হত না। এই দ্যাখো আমি, কলেজে পড়াই, মাইনে পাই, নিজের একটা গাড়ি আছে তাতে চড়ে যেখানে ইচ্ছে বেড়াতে যাই, আমাকে কারো দয়ায় বাঁচতে হয় না। তোমাকে আমার মত হতে হবে।'

'আর তোমার বর ?'

'তার মত সে আছে। আবার বিয়ে করে বউ নিয়ে ঘর করছে।'

'তুমি আবার বিয়ে করোনি কেন ?'

'ইচ্ছে হয়নি বলে।'

দীপা পূর্ণ-দৃষ্টিতে রমলা সেনকে দেখল। রমলা হাসলেন। তারপর নিজের ব্যাগ থেকে একটা কাগজ কলম বের করে কিছু লিখে সেটা দীপার হাতে দিলেন, 'এখানে আমার ঠিকানা লিখে দিলাম। তুমি প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি দেবে আমাকে মনে করে, বুঝলে ? আমরা চিঠিতে মনের কথা বলাবলি করব। তোমাকে আমার খুব মিষ্টি লাগছে দীপাবলী।

কাগজটা ভাঁজ করে উঠে পড়ল দীপা, 'তুমি এখন ঘুমাবে ?'

'চেষ্টা করব। তোমার ঘুম পেয়েছে বুঝি ? যাও, শুয়ে পড়। গুড নাইট।'

দীপা কাগজটা নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দেখল বাবা শুয়ে পড়েছে। মা গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে বিছানার পাশে। সে ভেজানো দরজা খুলে অন্ধকার বারান্দায় চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে উঠোনের গাছপালাগুলো বিচিত্র ছবি এঁকে ফেলতেই এক দৌড়ে ঠাকুমার দরজায় পৌঁছে জোরে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। মনোরমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর নাক মৃদু ডাকছিল। দীপা দরজা বন্ধ করে ঠাকুমার পাশে নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল। তারপর হাতের কাগজটা বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে মনে মনে বলল, 'গুড নাইট'। বলেই ফিক্ করে হেসে ফেলল।

দরজা বন্ধ করে পাশে শুতে শুতে অঞ্জলি বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি খাল কেটে কুমির আনলে।'

'কেন ?' অমরনাথের আজ কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না। এমন বিচিত্র মহিলা তিনি কখনও দ্যাখেন নি। কুমির শব্দটা শুনে অস্বস্তি হল। অঞ্জলি তাকে সন্দেহ করছে নাকি?

এতক্ষণ কানে তুলো দিয়ে বসেছিলে নাকি? পাশের ঘরে যেসব কথা হচ্ছিল শোনোনি?'

'শুনেছি।' স্বস্তিটা ফিরে এল অমরনাথের।

'মেয়েটার মনে একগাদা উল্টোপাল্টা ভাবনা ঢুকিয়ে দিলেন উনি।'

'কাল সকালেই সব ভুলে যাবে।'

'ভাল মন্দ বিবেচনা করছি না, হুট করে একজন অচেনা মহিলাকে নিয়ে এলে কি করে তাই ভাবছি। এই বাগানের আর কেউ নিয়ে আসত? কক্ষনো না।' অঞ্জলির গলায় এবার জ্বালা। ব্যাপারটা যে ঠিক হয়নি তা মনে মনে জানেন অমরনাথ। তাই চুপ করে থাকাই শ্রেয় বলে মনে করলেন।

অঞ্জলি জবাব না পেয়ে বলল, 'আজ সারাটা রাত জেগে বসে থাকতে হবে।'

'কেন?' অমরনাথ প্রশ্ন না করে পারলেন না।

'চমৎকার বুদ্ধি। তুমি না জেনে শুনে বাড়িতে এনেছ বলেই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তার কি মানে আছে। অমন গায়ে পড়ে পড়ে কথা বলা, স্বামীর সঙ্গে না থাকা মেয়ে আসলে যে কি তাই তো জানি না। সকালে উঠে যদি দেখি বাড়ি সাফ হয়ে গিয়েছে তখন কাউকে ঘটনাটা বলতে পারব? কেউ বিশ্বাস করবে?'

রমলা সেনকে আর যাই হোক চোর ভাবতে পারছেন না অমরনাথ। চোর কখনও গাড়ি চালায় না। চোর কখনও তিনটে ভাষায় অনর্গল কথা বলে না। বরং তাঁর মনে হচ্ছিল ভদ্রমহিলা এ বাড়িতে জোর করে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে আছেন। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল অঞ্জলি মালবাজারে বড় হয়েও একেবারে গেঁয়ো হয়ে আছে। সেই তুলনায় মনোরমা অনেক আধুনিক। তিনি রমলাকে গ্রহণ করতে কোন আড়ষ্টতা দেখাননি।

পাশ ফিরে শুতে গিয়েই সকালবেলার ঘটনাটা মনে পড়ল অমরনাথের। সারাদিন এমন ঝামেলায় কেটে গেল যে অঞ্জলিকে বলারই সময় পাননি। পাতিবাবুর বেয়াই দীপার জন্যে একটি সম্বন্ধ এনেছেন। অমরনাথের মনে হল প্রসঙ্গটি তুললে অঞ্জলির মন রমলা সেন থেকে সরে আসবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর অমরনাথ চাপা গলায় বললেন, 'আজ সকালে একটা কাণ্ড হয়েছে। কি করব বুঝতে পারছি না।'

অঞ্জলি কোন উত্তর দিল না। অমরনাথ আর একটু সময় কাটিয়ে বললেন, 'বাজারে যাওয়ার সময় পাতিবাবু ডেকে পাঠালেন। ওঁর বেয়াই এসেছেন জলপাইগুড়ি থেকে। গেলাম। ভদ্রলোক দীপাকে দেখেছেন। ওঁর ভাইপোর জন্যে গৌরী খুঁজছেন। বললেন, খুব পছন্দ হয়েছে দেখে। যদি আমাদের অমত না থাকে তাহলে শুভকাজটা করে ফেলতে

পারেন।'

অঞ্জলি বিছানা থেকে উঠে পড়ল। অমরনাথ ঈষৎ হতচকিত। এই বুঝি কোন কাণ্ড করে বসে। কিন্তু অঞ্জলি শুধু কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খেয়ে ফের বিছানায় ফিরে উল্টো মুখ করে শুয়ে পড়ল। অমরনাথ কি করবেন ভেবে পেলেন না। মনে হয়েছিল পাতিবাবুর বেয়াই-এর প্রস্তাব শুনে অঞ্জলি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে, এবং তাই নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চালাবে। অথচ এসবের কিছুই হল না।

কাজের দিন প্রায় অন্ধকার থাকতেই ঘুম থেকে উঠতে হয় অমরনাথকে। সাড়ে ছটায় তাকে পৌঁছে যেতে হয় অফিসে। শীত এখনও নামেনি কিন্তু দিন ছোট হয়েছে, সকাল হচ্ছে একটু দেরি করেই। কেডসের ওপর হাফপ্যান্ট আর মোটা হাওয়াই সার্ট পরে অঞ্জলির দেওয়া চা খেয়ে নিলেন তিনি। ছেলেমেয়েরা ঘুমাচ্ছে। এইসময় দীপা শিউলি তুলে ফিরল। আজ তার হাতে ছোট্ট বেতের সাজি। অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন। ঘরের হ্যারিকেন এখনও নেবানো হয়নি। নরম গলায় বললেন, 'কখন গিয়েছিলি ফুল তুলতে?'

'অনেকক্ষণ!' দীপা হাসল। এখনও মুখ ধোয়নি সে।

'ভয় করে না। বাইরে তো কেউ নেই!'

'ওমা ভয় পাবে কেন?'

অঞ্জলি খাটে বসে লক্ষ্য করছিল দুজনাকে, বলল, 'ফুলগুলো ঠাকুরঘরে রেখে এসে পাশের ঘরে ওঁর ঘুম ভাঙ্গাও।' দীপা মাথা নেড়ে অদৃশ্য হতেই অমরনাথের মন ভাল লাগল। কথাটা নিজের মুখে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো লাগছিল। ও ঘরের দরজা না খোলালে তিনি সাইকেল পাবেন না। এতটা রাস্তা সাইকেল ছাড়া, যাওয়াও অসম্ভব। আর তখনই অঞ্জলি চাপা গলায় বলল, 'বাইরের ঘরে যিনি আছেন তাঁর জন্যে কি কি করতে হবে?'

'কি আর করবে? ঘুম থেকে উঠলে এক কাপ চা করে দিও। কাজের মানুষ চলে যাবেন।'

'ওর গাড়ি নাকি কোথায় পড়ে আছে?' অঞ্জলির কথার মধ্যে একটু বাঁকা সুর।

'হ্যাঁ। সেটা উনি বুঝবেন। জিজ্ঞাসা করলে বলে দিও পেট্রল পাম্পে গিয়ে খবর নিতে।'

দীপার দরজা ধাক্কানোর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল রমলা সেনের। ইংরেজিতে তিনি অপেক্ষা করতে বলে বাঁ হাতে হাই তোলা মুখ ঢাকতে ঢাকতে দরজা খুলতেই দীপা অবাক হয়ে গেল। রমলা রায় শুধু শায়া আর ব্লাউজ পরে রয়েছেন। ওই অবস্থায় বললেন, 'গুড মর্নিং।'

দীপার মনে পড়ল কাল রাত্রে উনি তাকে গুড নাইট বলেছিলেন। গুড শব্দটা পাল্টায় নি শুধু নাইটটা মর্নিং হয়ে গেল। দীপা বলল, 'বাবা অফিসে যাবে তো, তাই—।'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় করে আঁতকে উঠলেন রমলা সেন। তারপর দ্রুত ফিরে গিয়ে শাড়িটাকে শরীরে জড়িয়ে নিলেন। এত দ্রুত শাড়ি পরতে কাউকে দ্যাখেনি দীপা। সে [illegible] মুগ্ধ হল। তিনি ভদ্রস্থ হওয়ামাত্র সে গলা তুলল, 'বাবা ওঁর হয়ে গিয়েছে। তুমি এখন আসতে পার।'

কয়েক সেকেন্ড বাদে অমরনাথ ঘরে ঢুকলেন, 'নমস্কার। রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো? আসলে আমার সাইকেলটা এখানে ছিল বলে আপনাকে বিরক্ত করা হল। ঠিক আছে আপনি চা-টা খেয়ে নিন, আমি চলি ডিউটি আর কি!'

'আপনি তো নিজেই সব বলে যাচ্ছেন, আমি তো সুযোগই পেলাম না।' রমলা হেসে ফেললেন, 'ঠিক আছে। আসুন। আশ্রয় দেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

দীপা দেখল বাবা কেমন একটা অদ্ভুত রকমের মুখের ভঙ্গী করে বাইরের দরজা খুলে সাইকেল নিয়ে মাঠে নেমে গেল। বারান্দায় রমলা এগিয়ে গেলেন। দীপা ওঁর পাশে দাঁড়াতেই মনে হল বাবা আজ একটু বেশী জোরে সাইকেল চালাচ্ছে। কেন?

শিশির ভেজা ঘাস, কুড়িয়ে নেওয়ার পরেও নতুন করে ঝরে পড়া শিউলি, চাঁপার গন্ধ মাখা বাতাস আর সূর্য-উঠব-উঠব সময়ের আকাশ দেখতে দেখতে রমলা সেন বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক!'

দীপা অবাক হয়ে তাকাল। ফ্যান্টাস্টিক কথাটার মানে কি? রমলা সেন তার পরেই বললেন, 'দীপা, একদিক দিয়ে তুমি খুব লাকি! এমন একটা জায়গায় বড় হচ্ছ যেখানে প্রকৃতি দুহাত ভরে মানুষের মন ভরানোর উপকরণ সাজিয়ে রেখেছে।'

এই সময় অঞ্জলি দরজায় এসে বলল, 'আপনি চায়ের সঙ্গে কি খান?'

'কিছু না। শুধু চা। আমি একটু বাথরুম থেকে ঘুরে আসি। দ্যাখো ভাই, কাল রাতে অন্ধকারে কোন অসুবিধে হয়নি, আজ আলো ফুটতেই—।' হেসে ফেলেন রমলা সেন, 'আমাকে একটা তোয়ালে দেবে? মানে, একটা গামছা হলেও চলবে।'

তাস খেলে প্রাইজ পাওয়া একটা বিরাট তোয়ালে আলমারি থেকে বের করে দিল অঞ্জলি।

আধঘণ্টা বাদে রমলা সেন বিদায় নিলেন। মনোরমাকে বললেন, 'মাসীমা, নিশ্চয়ই আপনাদের খুব অদ্ভুত লেগেছে কিন্তু কাল এখানে আশ্রয় পেয়ে আমি উপকৃত হয়েছি।'

মনোরমা বললেন, 'মানুষের বিপদে আপদে এটুকু না করলে কি চলে। কিন্তু তুমি একা একা ঘুরে বেড়াও কেন মা? এটা ঠিক নয়।'

রমলা কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিলেন, 'না। আপনার সঙ্গে তর্ক করব না।' তারপর অঞ্জলিকে বললেন, 'রাগ করা উচিত ছিল তোমারই। স্বামী যদি রাত বিরেতে একজন অচেনা মেয়েকে ধরে নিয়ে আসে তাহলে কোন বউই খুশী হতে পারে না। তবে বলি ভাই স্বামীটি সত্যি ভাল পেয়েছ। আর হ্যাঁ, এই মেয়েটাকে পড়াশুনা করতে দিও। ওর ভেতরে কৌতূহল আছে। ওকে চট করে বিয়ে থা দিয়ে দিও না।'

অঞ্জলি ঠোঁট টিপলেন। দীপা তাকে মাঠ পেরিয়ে আসাম রোড পর্যন্ত এগিয়ে দিল। অঞ্জলি অমরনাথের কথামত রমলাকে পেট্রল পাম্পের সন্ধান দিয়ে দিয়েছে। ওখানে গেলে তিনি এখন মেকানিক পেয়ে যাবেন। রমলা দীপার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এবার আসি। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। বড় হবে। আমার ঠিকানাটা লিখে দিয়েছি ওটা একটা খাতায় লিখে রাখবে আর প্রত্যেক মাসে একটা করে চিঠি দেবে আমাকে। বুঝলে? তোমাকে আমার কিছু দেওয়া উচিত ছিল। সঙ্গে তো নেই। আমি শিলিগুড়িতে গিয়েই পাঠিয়ে দেব তোমায়।'

আসাম রোড ধরে চৌমাথার দিকে যে শরীরটা চলে গেল তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দীপা। এতকালের চেনাশোনা কোন মানুষের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। বা ঠাকুমার থেকে অনেক অনেক তফাত।

দিন সাতেক বাদে দীপার নামে একটা পার্সেল এল। সবাই খুব অবাক। দীপা নিজে দারুণ উত্তেজিত। এই প্রথম তার নামে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কিছু এল। মোড়ক খুলতে, বইটা বেরিয়ে এল। দীপা নামটা পড়ল, 'লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু এ ডটার।'

কি শ্যামলদা যে দুবার সামনে দিয়ে চলে গেল তা চোখ ফিরিয়ে দেখলই না। খুব মজা লাগছিল দীপার। যারা চা-বাগানের গাছের ভেতরে লুকিয়ে কথা বলে তারা কেন সামনা-সামনি অপরিচয়ের ভান করে থাকে ' ব্যাপারটা বিশু বা খোকনের নজরেই পড়ছে না। দীপার মনে হল এইজন্যে ওদের রেজাল্ট খারাপ হয়। কিছুই মনে রাখতে পারে না।

সাড়ে আটটার সময় অঞ্জলির সঙ্গে বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল দীপা। মাথার ওপরে হিম পড়ছে। রাত্রে ঘুমানোর সময় সে মনোরমাকে অনুরোধ করেছিল ঠাকুরের চোখ আঁকার সময় যেতে দেওয়ার জন্যে। মনোরমা মত দেননি। অত রাত্রে যাওয়া ঠিক হবে না। অনেক বায়নার পরে বলেছিলেন, 'তিনটের সময় যদি ঘুম ভাঙে তখন ভেবে দেখব।' কিন্তু আজ দীপার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সবাই রাত জাগবে আজ আর সে-ই শুধু বাড়িতে পড়ে আছে। এর মধ্যে খোকন তাকে ঠাট্টা করেছে মেয়ে বলে। বুকের মধ্যে একটা অভিমানের উত্তাপ গোল হয়ে ঘুরছিল। মাঝে মাঝে ঘুম আসছিল বটে কিন্তু সেটা ভেঙে যেতে সময় লাগছিল না। শেষপর্যন্ত সে ঘড়িতে দুটো বাজতে দেখল। নিবু নিবু হ্যারিকেনের সামনে ঠাকুমার গোল ঘড়িতে একসময় আড়াইটে বাজল। দীপা আর বিছানায় থাকতে পারছিল না। পৌনে তিনটের সময় সে বিছানা ছাড়ল। সন্তর্পণে নিচে নেমে দেখল মনোরমা অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর মুখ সামান্য খোলা, দাঁত চিকচিক করছে। পা টিপে টিপে দীপা দরজার কাছে গেল। মনোরমার ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনাই নেই। সে সন্তর্পণে দরজাটা খুলল। হুড়কোটা নামাবার সময় সামান্য শব্দ হল কিন্তু মনোরমা তা টের পেলেন না। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই সময় অমাবস্যা নামবার কথা। বছরের সবচেয়ে কালো রাত। এই রাতে নাকি সব ভূতপ্রেত পৃথিবীতে নেমে আসে। দীপার সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল। কোন মতে দরজা ভেজিয়ে সে এক লাফে উঠোনে নেমে ছুটতে ছুটতে তারের বেড়ার কাছে পৌঁছে গেল। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে সেটা লাফ দিয়ে পেরিয়ে এসে শিশির ভেজা ঘাসে দাঁড়িয়ে দীপা চট করে নিজেদের কোয়ার্টার্সটাকে দেখে নিল। অন্ধকারে ভূত হয়ে আছে। গাছপালাগুলোকেও আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। আজ রাত্রেও অমরনাথ ফ্যাক্টরিতে গিয়েছেন। বাবাকে অসীম সাহসী বলে মনে হল দীপার। এই ভূতচতুর্দশীর অন্ধকারে বাবা চা-বাগানের ভেতর দিয়ে ফিরে আসবে একা। সে ছুটল। দূরে অন্ধকারে একটা হ্যাজাক জ্বলছে। ডায়নামোর আওয়াজ কানে এল না। আওয়াজটা হচ্ছে না বলেই ইলেকট্রিকের আলোও নেই। দীপার কানে কলের গান ভেসে এল। বাড়ি থেকে প্রতিবছর নিয়ে আসে শ্যামলদা। প্যাণ্ডেলের পেছনে এসে দাঁড়াল সে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান বাজছে, 'কোন এক গাঁয়ের বধূর কথা তোমায় শোনাই শোন রূপকথা নয় সে নয়।' চিনচিনে সরু গলায় গান বাজছে। অথচ রেডিওতে যখন গানটা বাজে তখন গলাটা ভরাট লাগে। একটু একটু করে দীপা ঘুরে গিয়ে প্যাণ্ডেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আঃ। ঠাকুরের গায়ে এখন চকচকে নীলচে কালো রঙ। মাথার চুল লাগানো হয়ে গেছে। যে আড়ালটা সামনে রাখা ছিল সারাদিন সেটা এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। শীতের জন্যেই সবাই ঠাকুরের সামনে চাদরমুড়ি দিয়ে বসেছে। এক কোণায় বিশু খোকনদেরও দেখতে পেল সে। কেউ এখন অন্ধকার মাঠের দিকে তাকাচ্ছে না। অনন্ত চুপচাপ বিড়ি খাচ্ছে। ওই মানুষটা এত সুন্দর ঠাকুর গড়তে পারে! ঠাকুমা বলেন অনন্তর ওপর নাকি ভগবানের ভর হয়। দীপা কালী ঠাকুরের মুখের দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে কাঁপুনি এল তার। দুই চোখ সাদা। কপালেও চোখ ফোটেনি। হঠাৎ শীত করতে লাগল এমন যে সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মণ্ডপের দিকে। তারপর কেউ লক্ষ করার আগে ঝুপ করে বসে পড়ল খোকন আর

বিশুর মাঝখানে। বসেই ফিসফিসিয়ে বলল, 'চাদরটা আমাকে একটু দে।'

ওরা দুজন খুব অবাক। খোকন বলল, 'কি করে এলি ? তোর মা কিছু বলেনি ?'

'কেউ জানে না। সবাই ঘুমোচ্ছে।' ফিসফিস করে জবাব দিল দীপা।

'এই রাত্রে একা একা এলি তুই ?'

'হুঁ।'

'কি সাহস রে। আমার ঘুম পাচ্ছে কিন্তু একা বাড়িতে যেতে সাহস পাচ্ছি না।'

'মায়ের কোলে বসে দুদু খা যা।' কথাটা বলে দুজনের চাদরের বাড়তি অংশ টেনে নিয়ে নিজের শরীরে জড়াল দীপা। এখন তিনটে শরীর পরস্পরের উত্তাপ পাচ্ছে।

শীত থেকে রেহাই পেযে দীপার আরাম লাগছিল। এইসময় শ্যামলদা বিরাট কেটলি আর কয়েকটা গ্লাস নিয়ে প্যাণ্ডেলে ঢুকল, 'নাও, অনন্তদা, গলা ভিজিয়ে নিয়ে তোমার কাজ শেষ কর।' চা দেখে বড়দেব মধ্যে উল্লাস দেখা গেল। শ্যামলদা এবাব এদিকে তাকিয়ে বলল, 'কি রে ! খুব বড়দের সঙ্গে তাল দিযে রাত জাগছিস ! তা খাবি নাকি !' তিনজনেই একসঙ্গে মাথা নেড়ে না বলল। ওদিকে তখন চোঙা গ্রামাফোনে রেকর্ড পাল্টানো হয়েছে, 'অন্ন দে !' সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলদা ধমকালো, 'অ্যাই। মাঝ বাতে আর অন্ন চাইতে হবে না। অন্য রেকর্ড বাজা।' রেকর্ড পাল্টানো হল। এবাব যে গান বাজল তা দীপার খুব ভাল লাগে, 'চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে।'

চা খেয়ে একটা বড় টুলের ওপর উঠল অনন্ত। খুব দ্রুত তুলিব আঁচড়ে মাযের দুটি চোখ আঁকা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানার চেহাবা পাল্টে গেল। সেদিকে তাকিযে হঠাৎ দীপা জিভ বের করল। বিশু সেটা লক্ষ্য করে ধমকালো, 'অ্যাই জিভ ঢোকা !'

'কেন ?' জিভটা টেনে নিল দীপা চটপট।

'মা কালীকে ভেঙাচ্ছিস ?'

'কপালের চোখ আঁকা না হলে মা কালী হয় না।' দীপা মাথা নেড়েই বিরক্ত হল, 'এই খোকন, ঠেলিস না। ঠিক হযে বস।' পাযের তলায় ত্রিপল তবু উঁচু হযে বসেছিল সে। হঠাৎ মনে হল পেটের ভেতরটা কেমন করে উঠল।

অনন্ত এবার গলা তুলল, 'গান বন্ধ কব ভাই। এবার মায়েব তৃতীয় নযন জাগ্রত হবে। খুব মনঃসংযোগ দরকার। কেউ কথা বলবে না। ভাই শ্যামল, কাঁসব ঘণ্টা আছে না, ঢাকীদের বল তৈরী হতে। যেই মাযেব চোখ আঁকা হয়ে যাবে অমনি বাদ্য বাজাবে।'

শ্যামলদা উত্তেজিত হল, 'একটু দাঁড়ান অনন্তদা। এই যে ঢাকী ভাই, ওঠ ওঠ। আমি ইশারা করা মাত্র বাজাতে আরম্ভ করবে।'

ঘুম ভাঙা মুখে বিরক্তি এনে ঢাকী ঠাকুবের পেছন থেকে বেবিযে এসে বলল, 'আমাকে আর ইশারা করতে হবে না। পঁচিশটা পুজো পার করলাম।'

শ্যামলদা বলল, 'মেয়েরা তো কেউ নেই। তোরা কেউ উলু দিতে পাবিস ?'

দু-তিনজন চেষ্টা করবে বলল। বিশু সামান্য চাপ দিল দীপাব গায়ে, 'তুই পাবসি না ?'

'চুপ। আমি আছি বলবি না।' দীপা চাদবটাকে মাথার ওপবে টেনে দিল।

অনন্ত হাত জোড় করে প্রণাম করল, 'মা, মা আমার। এই অধমের সব পাপ ক্ষমা কর মা। তুমি তোমার অলৌকিক দৃষ্টিতে সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখে নাও। মা গো।' ঝুঁকে সহকারীর বাড়ানো থালা থেকে রঙ তুলে নিল অনন্ত।

এখন চারপাশ নিস্তব্ধ। দীপার বুকের মধ্যে উত্তেজনাব মাদল বাজছে। সে উদগ্রীব হয়ে কালী ঠাকুরের কপালের দিকে তাকিয়ে। অনন্তর আঙুলের সঞ্চালনে একটু একটু করে

রেখা ফুটে উঠছে সেখানে। চোখের আদল ভেসে এল। দীপা আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল। শ্যামলদা মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে অবাক। এই মুহূর্তে কথা বলা বারণ বলে ইশারা করল দীপাকে বসে পড়ার জন্যে। দীপা সেটা লক্ষই করল না। অনন্ত এবার চোখের মণি আঁকছে। দীপা দম বন্ধ করল। তার পেটের অস্বস্তিটা এখন নিচে নামছে। কনকন করছে সেখানে। হঠাৎ অনন্ত চিৎকার করে উঠল, 'মা, মাগো'। আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাক বেজে উঠল। শ্যামলদা চিৎকার করল, 'কালী মা কি, জয়।' সেই প্রচণ্ড শব্দ তরঙ্গের মধ্যে দীপা অসহায় মুখে দাঁড়িয়েছিল। মায়ের মুখের চেহারা পাল্টে গিয়েছে একেবারে। তিনি তাঁর জ্যোতির্ময়ী রূপ নিয়ে দীপার দিকে তাকিয়ে যেন হেসে উঠলেন। ঢাক বাজছে, কাঁসর বাজছে। কালী মায়ের জয়ধ্বনি চলছে। অন্ধকার ভেদ করে তেজেন্দ্র চিৎকার করলেন, 'মায়ের তৃতীয় নয়ন আঁকা হয়ে গেল নাকি শ্যামল?'

'হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।' শ্যামলদা জবাব দিলেন।

লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে তেজেন্দ্র এসে দাঁড়ালেন মণ্ডপে, 'বাঃ চমৎকার। মা মাগো!'

তিনি নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নোয়াতেই দীপা চট করে বেরিয়ে পড়ল মণ্ডপ থেকে। এইসময় দূরে একটা সাইকেলের আলোকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। দেখামাত্র দৌড় লাগাল দীপা। পাগলের মত।

এখন অন্ধকার পাতলা। শুকতারা উঠে গেছে। আকাশের চেহারাটা পাল্টে গিয়েছে। সারা রাত ডিউটি করে ফেরার পথে মণ্ডপে দাঁড়াবেন ভেবেছিলেন অমরনাথ। ঢাকের আওয়াজেই বুঝেছিলেন মায়ের কপালের চোখ আঁকা হয়ে গেছে। অমাবস্যা পড়েছে। কিন্তু সাইকেলের তীব্র আলোর প্রান্তে ছুটে যাওয়া ফ্রক পরা শরীরটাকে দেখে তিনি খুব অবাক হয়েই সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। একদম বাড়ির কাছে এসে ধরলেন মেয়েকে। সাইকেল থেকে নেমে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকা দীপার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই? কার সঙ্গে এসেছিলি? কে আসতে বলেছে তোকে?'

দীপার চিবুক বুকে ঠেকল। সে জবাব দিল না। কথার উত্তর না পেয়ে মাথায় রক্ত উঠে যায় অমরনাথের। তিনি মেয়ের কান ধরলেন, 'পালিয়ে আসা হয়েছিল? বদমাস, অবাধ্য মেয়ে! কখন এসেছিলি মণ্ডপে?'

'একটু আগে।' কাঁপা গলায় মিনমিনিয়ে জবাব দিল দীপা।

'কেন এসেছিলি? আমি নিষেধ করিনি?' এক ঝটকায় মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতেই সে ব্যালেন্স হারিয়ে ঘাসের ওপর পড়ল। এবং তখনই ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, 'কপালের চোখ আঁকা দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল যে।'

'কপালের চোখ! দেখা হয়েছে চোখ মেলে?'

'হুঁ।' বলে উঠতে গিয়েই দীপা আবার গলা খুলে চেঁচিয়ে কাঁদল।

হতভম্ব অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আরে! কি হল তোর?'

তিনি সাইকেলের আলো ঘুরিয়ে মেয়ের ওপর ফেলতেই দেখলেন দীপা সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তার হাঁটু পর্যন্ত রক্তের ধারা নেমে এসেছে। কোন কিছুতে কি কেটে গেল। অমরনাথ দেখলেন দীপা ভয়ার্ত চোখে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে তার কাছ থেকে। তারপর এক ছুটে বাইরের বন্ধ দরজায় আঘাত করতে আরম্ভ করল, 'মা মা গো! ও ঠাকুমা! ঠাকুমা গো'।

এবার অমরনাথ নাড়া খেলেন। সাইকেলের আলো নিবিয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গাঢ় গলায় বললেন, 'শান্ত হ মা। এতে ভয়ের কিছু নেই। আমি তোর মাকে ডাকছি।'

॥ ৭ ॥

চারদিন পৃথিবীটাকে দ্যাখেনি দীপা। এই চারদিনে কালীপুজো হয়ে গেল, তার ভাসানও শেষ হল। অথচ একটি বারের জন্যেও দীপা যেতে পারেনি মণ্ডপে। মণ্ডপে কেন, দিনের আলোয় সে বেরিয়ে আসেনি মনোরমার ঘর থেকে। প্রথম দিন প্রচুর কান্নাকাটি, চিৎকার করেও যখন কাজ হয়নি তখন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল সে।

অঞ্জলি একটু আপত্তি তুলেছিল। এখন তো কেউ এসব মানে না। সে নিজেও এইসময় ঠাকুরঘরে যাওয়া ছাড়া প্রায় সব কাজই করে থাকে। শুভকাজ বা পুজোআর্চাতে সক্রিয় অংশ না নিলেই হল। কিন্তু মনোরমা এসব কথায় কান দেননি। তাঁর বক্তব্য হিন্দু মেয়েকে যে নিয়মটা মানতে হয় প্রথমবার থেকেই দীপাকে সেটা শেখানো উচিত। তাছাড়া বিয়ের পর যে বাড়িতে ও যাবে সেখানে যদি পুরোনো নিয়মকানুন মানা হয় তাহলে তা না জানলে মেয়েই বিপাকে পড়বে। অঞ্জলি আর কথা বাড়ায়নি। তবে সে নিজেও আর কালীপুজোর মণ্ডপে যায়নি এবার। মাটিতে কম্বল পাতা হয়েছে পাটি ছড়িয়ে। সন্ধের পর সে বাথরুমে যেতে পারে। স্নান করবে সেইসময় তেল সাবান না মেখে। এমন কি ক্ষুদে দুটোরও এই কদিন নিষেধ ছিল মনোরমার ঘরে ঢোকার। সত্যসাধন মাস্টার এসে এসে ফিরে যাচ্ছেন। আজ সকালে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কি ধরনের অসুখ মেয়েটার যে তাকে দেখাই যাচ্ছে না। কঠোর মুখে মনোরমা জানিয়েছিলেন, ওইটা মেয়েলি ব্যাপার। বয়স্ক মানুষটি বুঝে নিয়ে আর কথা বাড়াননি। কালীপুজোর গভীর রাত্রে অমরনাথ মনোরমাকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিলেন, 'এখন তো গভীর অন্ধকার। যদি অনুমতি দাও তাহলে ওকে নিয়ে দূর থেকে মাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। পুজো শুরু হয়ে গিয়েছে।'

মনোরমা মাথা নেড়েছিলেন, 'ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। হাঁটতে পারবে না।'

বিচলিত অমরনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যন্ত্রণা হচ্ছে! ডাক্তার ডাকব?'

'না, না। ও নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না।'

মনোরমা মুশকিলে পড়েছিলেন তার পরেই। দরজা থেকে বাবা চলে যাওয়ার পর সে প্রথম কথা বলল। সারাদিন অনেক কেঁদেছে, ঝামেলা করেছে কিন্তু তাতে মনোরমা একটুও বিচলিত হননি। বিছানায় উবু হয়ে বসে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুমা, আমার যা হয়েছে তা কি নিজের ইচ্ছেয় হয়েছে?'

'এসব কি ইচ্ছেয় হয়? বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করেছেন যেমন প্রকৃতিও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তোর যা হয়েছে তা না হলে নারী প্রকৃতি হয় না। ওটা হয় আপনা আপনি, সময় হলেই।' মনোরমা শান্ত গলায় বলে ঘুমাবার উদ্যোগ নিলেন।

'তাহলে আমাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হবে কেন? আমার তো দোষ নেই।'

'দোষগুণের ব্যাপার নয়। এইসময় রোদ হাওয়া শরীরে লাগা ঠিক নয়।'

'যাদের লাগে তাদের কি হয়?'

'শরীর খারাপ করে।'

'মার তো করে না।'

মনোরমা ঠোঁট কামড়ালেন, 'বড়দের কথা আলাদা।'

'আমাকে তেল সাবান মাখতে নিষেধ করেছ কেন?'

'ওগুলো মাখলে চিত্ত চঞ্চল হয়। এই সময় মন শান্ত রাখা দরকার।'

'চিত্ত-চঞ্চল মানে?'

॥ ৫ ॥

সত্যসাধন মাস্টার প্রতি সন্ধ্যায় দীপাকে পড়াতে আসবেন। মাসান্তে তাঁকে দশ টাকা দিতে হবে। ব্যাপারটা মনোরমার পছন্দ হয়নি। তাঁর স্মরণে পড়ে না কখনও পরিবারের কাউকে পড়ানোর জন্যে মাস্টার এসেছে কিনা। এমন কি অমরনাথের ছাত্রাবস্থায় মাস্টারের প্রয়োজন হয়নি। ব্যাপারটা তিনি সরাসরি অঞ্জলিকে জানিয়েছিলেন। যে মেয়ে পনেরতে পড়তেই গোত্রান্তরিত হবে তাকে মাস্টার রেখে বিদ্যাধরী করে লাভ কি। ওই টাকা প্রতি মাসে জমিয়ে রাখলে বিয়ের সময় কাজে দেবে। মনোরমা না বলে পারলেন না, 'তাছাড়া তোমরা একটু বাড়াবাড়ি করছ বউমা।'

অঞ্জলি ঠোঁট টিপে বসেছিল। দশ টাকা খরচ করতে তার সত্যি গায়ে লেগেছিল। কিন্তু তার কমে যে সব মাস্টার পাওয়া যায় তারা সবাই ছেলেছোকরা। সত্যসাধনের নাম আছে পড়ানোতে। কয়েকটা খরচ কমাতে হবে। আসাম রোড থেকে মাছমারাদের হুইহুই ডাকা যাবে না। কিন্তু পড়াশুনায় মাথা আছে মেয়েটার, সত্যসাধন ওর সম্পর্কে খুব আশাবাদী, যেটুকু করা যায় সেটুকু না করলে মনে খচখচে কাঁটা ফুটেই থাকবে। যদিও কমলা সেন মেয়েটাকে যেমন কথা বলে গিয়েছে তা শোনার পর—' অঞ্জলি মুখ নিচু করল।

ওরা বসেছিল বারান্দায়। একটু আগে দুপুরের খাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে অমরনাথ ফিরে গিয়েছেন কাজে। দীপার ফেরার সময় হয়নি স্কুল থেকে। ছোট দুটোকে নিয়ে ওর ফিরতে এখনও ঘন্টাখানেক দেরি। অবশ্য বুধুয়া যায় ওদের আনতে। আর এই নিয়ে দীপার সঙ্গে বুধুয়ার নিত্য লেগে আছে। এই সময়টায় অঞ্জলি মনোরমার সঙ্গে বারান্দায় বসে আসাম রোডের গাড়ি যাওয়া আসা দ্যাখে। মনোরমা বললেন, 'অনেকদিন বাদে লক্ষ্মী আসছে। ভেতর থেকে দুটো মোড়া নিয়ে এস।'

অঞ্জলি দেখল কদম গাছের পাশ কাটিয়ে পরিষ্কার সাদা শাড়ির ঘোমটা মাথায় তুলে আসছেন লক্ষ্মীবউদি। খুব ঠাণ্ডা মানুষ। পঞ্চাশ পেরিয়েছেন কিন্তু অসুখ বিসুখে বয়স আরও বেশী দ্যাখায়। লক্ষ্মীবউদি একা নন। বাগানের কোয়ার্টার্সগুলোতেই তিনি একা যাওয়া আসা করেন না। সম্ভবত আসবার সময় ছোট পাতিবাবুর স্ত্রী বীণাবউদিকে ডেকে নিয়েছেন। বীণা বউদিরও বয়স হয়েছে, শরীর ভারী, একটু বেশী কথা বলেন। অঞ্জলি ভেতর থেকে দুটো মোড়া তুলে নিয়ে আসতে আসতে শুনল মনোরমা বলছেন, 'কেমন আছ লক্ষ্মী, এতদিনে একটু সময় পেলে?'

লক্ষ্মীবউদি হাসলেন, জবাব দিলেন না। বীণাবউদি বললেন, 'তা মাসীমা, আমরা তো সংসারে বিনিপয়সার ঝি, খাটতে খাটতে চোখে ধুতরো ফুল দেখছি, পান থেকে চুন খসলে তো চোখ রাঙানি, আপনার তো ঝাড়া হাত পা, আপনি তো যেতে পারেন।'

অঞ্জলি হেসে ফেলল। মোড়া এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। মা অবশ্য গতকাল গিয়েছিলেন বড়বাবুর বাড়িতে ঠাকুর গড়া দেখতে।'

বীণাবউদি বললেন, 'ওমা! ঠাকুরের গায়ে তো এখন ভাল করে দড়ি বাঁধাই হয়নি। তা অতটা দূর যখন যেতে পারলেন তখন আর একটু এগিয়ে আমাদের বাড়িতে যেতে কি অসুবিধে ছিল? বিজয়ার পরেও তো যাননি।'

'বিজয়ার পরে কি তোমরাও এসেছ? লক্ষ্মীপুজো পেরিয়ে যেতেও না।' মনোরমা বললেন।

লক্ষ্মীবউদি আঁচল টেনে বসলেন, 'আপনি এখন কেমন আছেন মাসীমা?'

'আছি।' মনোরমা হাসলেন।

অঞ্জলি বলল, 'গতকাল যদি আপনারা মায়ের মুখ দেখতেন!'

বীণাবউদি অবাক হল, 'কেন কি হয়েছিল আপনার?'

অঞ্জলি বলল, 'আহা,, আমার কাছে শুনুন না। আমরা তো গিয়েছি ঠাকুর গড়া দেখতে। তা বড়বাবুর বাবা খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বসেছিলেন। দেখামাত্র ধড়মড় করে উঠে পাঞ্জাবি চাপিয়ে ফিরে বকর বকর আরম্ভ করলেন। আমি ওঁকে এড়াতে ভেতরে গেলাম ছোট লক্ষ্মীদির সঙ্গে কথা বলতে। গিয়ে দেখি তিনি কলঘরে। কি আর করি! ফিরে আসছি, ভেতর থেকেই শুনলাম বড়বাবুর বাবা মাকে বলছেন—।' মুখে আঁচল দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ল অঞ্জলি।

মনোরমা ধমকে উঠলেন, 'আঃ বউমা, বুড়োমানুষকে নিয়ে মশকরা করা ঠিক নয়।'

অঞ্জলি হাসতে হাসতেই বলল, 'না মা, উনি বুড়োমানুষের মত কথা বলেননি।'

বীণাবউদির আর তর সইছিল না, 'বল না অঞ্জলি কি বলছিল বুড়ো?'

অঞ্জলি বলল, 'হরিদ্বারে যাওয়ার বাসনা হয়েছে, কিন্তু একা যান কি করে, তাই মাকে সাধছেন সঙ্গে যেতে। মায়েরও তো কোথাও যাওয়া হয়না।'

বীণাবউদি উঁচু গলায় এমন হেসে উঠলেন যে সামনের মাঠে ঘাস খেতে খেতে একটা গরু মুখ তুলে তাকাল। লক্ষ্মী বউদি নরমগলায় বললেন, 'হয়তো সরল মনেই বলেছেন।'

'সরল মন?' বীণাবউদি হাসি থামালেন, নাম যাঁর তেজেন্দ্র তাঁর স্বভাবে নরম ভাব থাকবে কি করে! কাকীমা মারা যাওয়ার পর সেই তেজ সংবরণ করেছিলেন না তা অনেকেই জানে। আসলে পুরুষমানুষ চিতায় উঠলেও যদি চোখ মেলার সুযোগ পায় তবে সেটা মেলবে মেয়েমানুষের দিকে। একদম বিশ্বাস করবেন না মাসীমা!'

মনোরমা বললেন, 'আমি তোমাদের চেয়ে অনেক আগে পৃথিবীতে এসেছি বীণা।'

হাসি মস্করা একটু যেন থিতিয়ে গেল। লক্ষ্মীবউদি আবার আঁচল টানলেন, 'মাসীমা, আপনারা কি ভাবলেন? উনি দুপুরে যাওয়ার আগে বললেন আপনার সঙ্গে কথা বলতে।'

'কি ব্যাপার বল তো?'

'বেয়াইমশাই আপনার ছেলের সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন—!'

'তোমার বেয়াই? কি প্রস্তাব? কই, আমি জানি না তো!' মনোরমা অবাক হলেন।

লক্ষ্মীবউদি অঞ্জলির দিকে তাকালেন। অঞ্জলি বলল, 'কাল রাত থেকে এত ঝামেলা গেল যে ও সময় পায়নি। রাত্রে ঘুমানোর সময় কিসব বলছিল যেন!'

মনোরমা বললেন, 'কি বলছিল অমর?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'আমি ভাল করে শুনিনি।'

বীণাবউদি বললেন, 'পুরুষমানুষের যা বলার তা ওরা রাতে শোওয়ার সময় বলে। তখন তো মন দিয়ে শুনতে হয়। তুমি কী গো!'

অঞ্জলি বলল, 'ব্যাপারটা এমন যে আমি কান দিইনি।'

মনোরমা বিরক্ত হলেন। লক্ষ্মীবউদির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বল?'

লক্ষ্মীবউদি বললেন, 'বেয়াই মশাই এসেছিলেন হঠাৎই। একটা রাত ছিলেন। অমন নামী মানুষ, আমি কি করব কি করব না এই ভয়েই মরি। তা উনি সকালে ওঁর সঙ্গে বসেছিলেন বাইরের বারান্দায়। সেইসময় দীপাকে দেখতে পান বিশুর সঙ্গে বাজারে যেতে।'

অঞ্জলি হাঁ হয়ে গেল, 'দীপা আর বিশু বাজারে গিয়েছিল ?'

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন লক্ষ্মীবউদি। মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর ?'

'দীপাকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে বেয়াই মশাই-এর। উনি তখন শ্যামলকে দিয়ে আপনার ছেলেকে ডেকে পাঠালেন 'বেয়াই মশাই তখন প্রস্তাবটা করেছিলেন। গতকাল সকালেই তো ব্যাপারটা হল।'

লক্ষ্মীবউদি আঁচল তুললেন আবার। বীণাবউদি বললেন, 'ওমা ! দীপার বিয়েব সম্বন্ধ এল ? পাত্র কি করে কোথায় থাকে ?'

লক্ষ্মীবউদি হাসলেন, 'আমার বেয়াই-এব ভাই খুব অবস্থাপন্ন মানুষ। ব্যবসা করেন। ওঁর স্ত্রীর ইচ্ছে অল্প বয়সে ছেলেব বিয়ে দেন। বাড়িতে গৌরী আনেন। কিন্তু মেয়েকে হতে হবে খুব মিষ্টি দেখতে। তা বেয়াইমশাই-এর নজর দীপার ওপর পড়তেই তিনি আপনার ছেলেব সঙ্গে আলাপ কবতে চাইলেন। ওঁদেব মধ্যে তো অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়েছিল।'

মনোরমা চিন্তিত মুখে বললেন, 'সেকি কথা ! অমর তো আমায় কিছু বলেনি।'

বীণা বউদি বললেন, 'এ ভাবি অন্যায কথা। মেয়ের বিয়ে দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। বাড়ি বয়ে সম্বন্ধ এল আর তাকে গুরুত্ব না দেওযাটা ভাল কথা নয়। তা ছেলে করে কি ?'

লক্ষ্মীবউদি বললেন, 'শুনেছি এবাব ফাইন্যাল দেবে। অত বড় ঘবের ছেলে, অগাধ বিষয়-সম্পত্তি, সবই তো ছেলে পাবে, উনি বলছিলেন একেবারে হিরেব টুকরো।'

মনোবমা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ঠিক আছে। আজ অমব আসুক, আমি ওব সঙ্গে কথা বলি। আজকাল অবশ্য ওই বযসে কেউ মেয়েব বিয়ে দেয না। কিন্তু তেমন সম্বন্ধ এলে— !'

লক্ষ্মীবউদি বললেন, 'আপনাবা খোঁজ খবব নিযে দেখুন। জলপাইগুড়িতে তো এবেলায় গিয়ে ওবেলায আসা যায। তবে যা কববেন তাডাতাড়ি করুন।'

বীণাবউদি বললেন, 'পবেব ঘবে তো একদিন যাবেই, আগে যদি ভালোয ভালোয যায় তো মন্দ কি। মেয়ের ওপর বেশী মাযা বাখতে নেই নইলে মালবাবুর মেয়েব দশা হবে।'

অঞ্জলিব এসব কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগছিল না। হঠাৎ মালবাবুর মেয়েব প্রসঙ্গ এসে পড়তেই সচকিত হল, 'মালবাবুব মেয়ে ? ললিতা ?'

'হ্যাঁ।' বীণাবউদি মাথা নাড়লেন, 'দেখলে মনে হয দেবদারু গাছে নাক তুলে বসে আছেন। রোজ বিকেলে ফুলবিবিটি সেজে বারান্দায় বসে না থাকলে চলে না। এদিকে বেলা যে বয়ে যাচ্ছে। মেযেছেলে সকালবেলায় বেশ ভাল কিন্তু বিয়েব আগেই যদি দুপুব আসে তাহলেই বিপদ।'

মনোবমা এক মুহূর্ত চিন্তা কবলেন। শেষপর্যন্ত কথাটা বললেন, 'লক্ষ্মী, তোমার শ্যামলেব সঙ্গে ললিতা মেলামেশি করে ?'

লক্ষ্মীবউদি আবার আঁচল টানলেন, 'ওমা, এ কথা বলছেন কেন ?'

মনোরমা কথা ঘোরান, 'আমি ভুল দেখতে পারি, একদিন যেন ওদেব ওপাশেব রাস্তা দিয়ে আসতে দেখেছিলাম। যদি তেমন কিছু হয় তাহলে হয তোমবা দুঃখ পাবে নয় মেয়েটা কেঁদে মরবে। দ্যাখো বাবা, আমি ভুলও দেখতে পাবি, এই কথাটা উঠল তাই বলে ফেললাম।'

লক্ষ্মীবউদি ঠোঁট কামড়ালেন, বীণাবউদি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না না। শ্যামল সেরকম ছেলেই না। দিনরাত যারা খেলাধুলা নিয়ে থাকে তাদের মাথায় ওই বদমতলব আসার সময়ই হবে না। তুমি এ নিয়ে মন খারাপ করো না।'

লক্ষ্মীবউদি বললেন, 'তেমন কিছু যদি করে বসে তাহলে উনি ছেলের মুখ আর দেখবেন না। বাগানের চাকরিটাও যদি হয়ে যেত—।'

অঞ্জলি খুব অবাক। শ্যামলের সঙ্গে ললিতাকে যদি মনোরমা দেখে থাকেন তাহলে কথাটা তিনি তাকে বলেননি কেন ? এই বারান্দার বাইরে কদাচিতই নামেন মনোরমা। ওরা নিশ্চয়ই এই অবধি সবাইকে দেখিয়ে আসবে না। মনোরমা কি প্রসঙ্গ থামানোর জন্যে বানিয়ে গল্পটা বলেন। তা যদি হয় তাহলে খুব খারাপ করেছেন। বীণাবউদি এখন যতই শান্ত মুখ করে থাকুন না, ওঁর কাছ থেকেই গল্পটা ছড়াবে। শাশুড়ির এই স্বভাবটা অঞ্জলি কখনই মানতে পারে না। অনেকসময় স্রেফ অনুমানের ওপর নির্ভর করে এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। হয়তো ঘটনাটা বাস্তবে ঘটেইনি। সে বলল, 'শ্যামল ওরকম ছেলেই নয়। মা নিশ্চয়ই ঠিক দ্যাখেননি।'

এরপর কথা আর বেশী গড়ালো না। সেইসময় বুধুয়াকে দেখা গেল দুজনকে সামলাতে সামলাতে আসাম রোড থেকে বাড়ির দিকে আসছে। দুজনই সমানে দৌড়াচ্ছে, বুধুয়ার নিষেধ কানেই নিচ্ছে না। বীণাবউদি বললেন, 'নাও তোমার গৌর-নিতাই বাড়ি ফিরল। সে কোথায় ?'

যার কথা বলা হল সে উদয় হচ্ছে না তখনও। বীণাবউদি বললেন, 'আর একটা কথা। দীপা এখনও বাচ্চা কিন্তু আর কদিন বাদেই তো ঠিক বাচ্চা থাকবে না। বিশু খোকনদের সঙ্গে যেভাবে মেশামেশি করে তা ঠিক নয়। এইবার একটু রাশ টানো। সংসারের কাজকর্ম শেখাও। একেই চা-বাগানে থাকি বলে শহরের লোকজন আমাদের গেঁয়ো বলে ভাবে।'

বুধুয়া এসে পড়েছিল। বাচ্চা দুটো হই হই করে ভেতরে ঢুকে গেল। অঞ্জলি বুধুয়াকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি কোথায় ?'

বুধুয়া মাথা নাড়ল, 'ছুটি নেহি হুয়া। মাস্টারজী সাজা দিয়েছে।'

'সাজা দিয়েছে ? কেন ?' প্রশ্নটা মনোরমার।

'হামি জানি না।' বুধুয়া লাল দাঁত বের করে হাসল।

'যা গরুগুলোকে ঘাস দে।' অঞ্জলি ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। এর পরে কিছুক্ষণ কি কারণে দীপা সাজা পেতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা চলল। দুই ছেলেকে খাবার দিতে হবে এই অজুহাতে অঞ্জলি ভেতরে চলে এল। দুজনের হাত পায়ের ধুলো পরিষ্কার করিয়ে দুধ-মুড়ির বাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে অনর্গল প্রশ্ন করেও নতুন কোন তথ্য দীপা সম্পর্কে আবিষ্কার করতে পারল না অঞ্জলি। মেজাজটা খুব চড়ে গিয়েছিল। সামান্য বাঁদরামি করতে গিয়ে বড়টা বেদম মার খেল। দুজনকেই ভেতরের উঠোনের বাইরে খেলতে যেতে নিষেধ করে সে আবার বাইরের বারান্দায় এসে দেখল একা মনোরমা চুপচাপ বসে আছেন। অঞ্জলি দুটো মোড়া ভেতরে ঢুকিয়ে শাশুড়ির পাশে এসে বসল, 'ওরকম বানিয়ে বানিয়ে শ্যামলদের কথা বলা উচিত হয়নি মা।'

'বানিয়ে বানিয়ে ?' মনোরমা মুখ না ফিরিয়ে বললেন, 'আমি সত্যি বলেছি এটা ভাবছ না কেন ? হ্যাঁ, এটা বলতে পার আমি নিজের চোখে দেখিনি। তাই বলে ঘটনাটা মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না। লক্ষ্মীকে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেছি।'

'কিন্তু আপনাকে কে বলল কথাটা ?'

'দীপা।'

'দীপা ?' অঞ্জলি হতভম্ব, 'কবে বলেছে আপনাকে ?'

'গতকাল। ওরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সেই বাগানের ভেতর দিয়ে ফরেস্টের

পাশে। হাতি দেখে ভয় পেয়ে ফিরে আসছিল এমন সময় শ্যামল আর ললিতার গলা চা-বাগানের ভেতরে শুনতে পায়।' মনোরমা মুখ ফেরালেন।

'চা-বাগানের ভেতরে ? সেখানে ওরা কি করছিল ?' অঞ্জলি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল।

মনোরমা উত্তর দিলেন না। আব তার ফলে উত্তরটা পেয়ে গেল অঞ্জলি। তার দুই কান আচমকা গরম হয়ে উঠল। সে বলল, 'দীপা কি ওদের কথাবার্তা শুনছে ?'

'হ্যাঁ।' মনোরমা গম্ভীব গলায় বললেন।

'কি বলেছিল ওরা দীপা আপনাকে বলেছে ?'

'হ্যাঁ। কথাগুলোর অর্থ দীপা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। তবে অনুমান করেছে ওগুলো বলা ঠিক নয়। বউমা, শ্যামল আর ললিতা শারীরিক সম্পর্কের কথা বলছিল। ললিতা আপত্তি করেছিল। তোমাব মেয়ে এসব এখনও বোঝে না। তবে আর বেশীদিন ওকে তো না বুঝিযে বাখতে পাববে না। লক্ষ্মীকে এত কথা বলা উচিত নয। সে আবও ভেঙে পডবে। তবে বিশুবা যদি বাড়িতে এসব আলোচনা কবে তাহলে খবরটা আব চাপা থাকবে না। মালবাবুরও জানা উচিত। নইলে বিপদ আসতে বাধ্য।'

'অন্যের ব্যাপাবে আমাদের নাক গলিয়ে কি লাভ ?'

'অন্যের ব্যাপাব ? এই চা-বাগানেব কযেকটা পরিবাব সুখে দুঃখে একসঙ্গে আছি, অন্যের বিপদে যদি পাশে গিযে না দাঁডাই তাহলে কি চলে !'

'দেখুন, এই নিযে আবাব বদনাম না রটে।'

'তুমি বাপু বড্ড ভাবছ • কিন্তু মেযেটাকে সাজা দিচ্ছে কেন ? তুমি একবাব যা‘ ?'

'আমি যাব কেন : অঞ্জলিব গলায বাগ স্পষ্ট, 'নিশ্চযই অন্যায করেছে তাই ' স্তি পা;চ্ছে। আসুক বাড়িতে আজ।'

মনোবমা বললেন, 'ভাল কবে জিজ্ঞাসা না কবে মাবধর করো না।'

অঞ্জলি নিঃশ্বাস ফেলল। তাব কেবলই মনে হতে লাগল দীপা তাকে দূবে সবিয়ে বেখেছে। নইলে চা-বাগানেব ভেতবে যে কাণ্ডটা ঘটল তা মনোরমাকে বলতে পাবল, তাকে নয। ওইটুকুনি মেযে একেবাবে ঠোঁট টিপে বইল তাব কাছে! অদ্ভুত নির্জন চা-গাছেব ভেতব বসে শ্যামল কি কথা বলতে পাবে ললিতাকে ? অঞ্জলিব খুব বাগ হচ্ছিল। যে যাই বলুক তোব সেকথা শোনাব কি দবকার ? আবার ঘটা করে ঠাকুমাকে বলা হয়েছে। নিশ্চযই বাত্রে শোওযাব সময পুটুব পুটুব করে এইসব গল্প কবা হয। আর এনাকেও বলিহাবি, নাতনিব সঙ্গে এসব কথা আলোচনা কবতে একটু বাধে না। নাতনি বলল আর উনি হজম কবে গেলেন। বাইবেব লোকের সামনে তাকে কিরকম বেইজ্জত হতে হল। হঠাৎ অঞ্জলিব জেদ চেপে গেল। প্রাইভেট টিউটব বাখাব দবকাব নেই। পাত্র যদি ভাল হয এই বযসেই ওই মেযেকে বিদায় কবে দেওযা ভাল। একবাব যখন কানে গিযেছে কথাগুলো তখন উনিই কখন চা-বাগানের ভেতব কোন ছেলের সঙ্গে ঢুকে ওসব যে আওড়াবেন না তাব ঠিক কি!

অঞ্জলি বলল, 'লক্ষ্মীবউদিব কথাটা নিযে কিছু ভাবলেন ?'

মনোরমা বললেন, 'ওরা প্রস্তাব দিযেছে, অমর কি চিন্তা করছে সেটা আগে জানি।' অঞ্জলি মুখ ফেবাল, 'আপনাব ছেলেব এসব নিযে চিন্তা কবাব সময আছে ?'

মনোরমা বললেন, 'তুমি তো নিশ্চযই আপত্তি করবে। মেযেকে পড়াশুনা কবানোর দাবি তোমার। লোকে শুনলেও বলবে তাড়াতাড়ি দায নামাল কাঁধ থেকে। কিন্তু আমি বলি

বউমা, যদি পরিবার ভাল হয় তাহলে বিয়েটা দিয়ে দেওয়াই ভাল। আজকাল চারপাশে যা অবস্থা দেখছি— ! মেয়ের শরীরে যৌবন এলে পাঁচজনের চোখের আড়ালে রাখতে হিমসিম খেতে হয়। আর পড়াশুনার কথা যদি বল, তাহলে কথা বার্তা বলে নিলেই তো হয়, বিয়ের পর মেয়েকে পড়াতে হবে। জলপাইগুড়িতে থাকলে আরও ভাল পড়াশুনা হবে। এটা আমার কথা, তোমরা যা ভাব তা হবে।'

'আমি ভাবাভাবির মধ্যে নেই, আপনার ছেলেকে বোঝান।' অঞ্জলির মুখ দেখে মনোরমা বুঝতেই পারলেন না যে তাঁর মতামতে সে খুব খুশী হয়েছে। অঞ্জলি উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেল দীপা আসছে। একা একা, খুব ঝড়ো চেহারা। অঞ্জলির মনে হল মেয়েটা বেশ বড় হয়ে গিয়েছে।

'এত দেরি হল কেন ?' অঞ্জলির গলা এতটা জোরে যে হাত আটেক দূরেই দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল। সে মাটির দিকে তাকাল। মনোরমা বললেন, 'মা যা জিজ্ঞাসা করছে তার জবাব দে।'

দীপা মুখ না তুলে বলল, 'পানিশমেন্ট হয়েছিল।'

'কি করেছিলি তুই ?'

'আমি কিছু করিনি।'

'কিছু না করলে তোকে শাস্তি দেবে কেন ?'

'আমার খাতা দেখে বিশু লিখছিল বলে আমাকে আধঘণ্টা নিলডাউন করে রেখেছিল আর বিশুকে দেড়ঘণ্টা। আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম কিন্তু বিশু শোনেনি।'

'তুই বিশুকে তোর খাতা দিয়েছিলি ?'

'না। ও জোর করে নিয়েছিল।'

'কাল থেকে তোমার স্কুল যাওয়া বন্ধ।'

'বা রে ? আমি তো কোন অন্যায় করিনি।' প্রতিবাদ করে উঠল দীপা. 'তুমি স্কুলে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে দ্যাখো, আমি তো নকল করিনি।'

'কোন কথা শুনতে চাই না। তোমার খুব বাড় বেড়েছে। আমাকে না জানিয়ে মাছ ধরতে ফরেস্টের নদীতে গিয়েছিলে ? সাহস দেখে আমি হাঁ। সাপের পাঁচ পা দেখেছ তুমি ? বদমাস মেয়ে। সবাই জানল আমাদের বাড়ির মেয়ে শাস্তি পেয়েছে। এতে তোমার বাবার মুখ খুব উজ্জ্বল হবে, না ? যাও ভেতরে। আজ তোমার খাওয়া বন্ধ।' একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল অঞ্জলি। মনোরমা একটা কথাও বললেন না। দীপা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অঞ্জলি আবার বলল, 'কথাগুলো কানে ঢুকল না ? যা ভেতরে।'

'আমি আর মাছ ধরতে যাব না।'

'যাও না। আরও বেশী করে যাও। হাতির পায়ে চাপা পড়। আমার কি !'

'আমি আর যাব না।'

'আর কি কি করবে না লিস্টিটা শুনি।'

'আমি আর কাউকে নকল করতে দেব না।' দীপার চোখ উপচে জল এল, 'কিন্তু আমাকে স্কুলে যেতে দাও। মাস্টামশাই একটু পরে পড়াতে আসবেন।'

'আমি এখন তোমার সঙ্গে কোন কথা বলব না। দয়া করে সামনে থেকে বিদায় হও।' অঞ্জলির কথা শেষ হতে দীপা ভেতরে পা বাড়াল। চোখের আড়াল হতেই তার মনে হল সাপের কোন পা নেই। তাহলে মা কেন পাঁচটা পায়ের কথা বলল ? সাপের কি লুকোনো পা আছে ? সবাই দেখতে পায় না ? সেই পাঁচটা পা দেখতে পেলে কি হয় ? সে মাকে

একটা কথা বলেনি। বিশু খুব পিটুনি খেয়েছে আজ। তাকে শুধু নিল ডাউন হয়ে থাকতে হয়েছে। বইপত্র রাখতে রাখতে তার খেয়াল হল আজ মা খেতে দেবে না। কথাটা ভাবতেই খুব খিদে পেয়ে গেল। মনে মনে মতলব আঁটতে লাগল সে।

বিকেল আর সন্ধেয় বড় গলাগলি ভাব এখানে। কখন যে মিলে মিশে যায় তা পাখিরাও টের পায় না। চা-বাগানের বুক চেরা নুড়ি পাথরের রাস্তা বেয়ে সেইসময় সাইকেলগুলো ফিরে আসে কোয়ার্টার্সে। তাদের টর্চের আলোয় গাছের পাতাগুলো রহস্যময় হয়ে ওঠে। মদেশিয়া কুলি কামিনরা কাজ সেরে বাড়ি ফেরে রাঁচি-হাজারিবাগের গান গাইতে গাইতে। কয়েক পুরুষ ধরে এইসব গান মুখে মুখে চলে আসছে। একটু বাদেই কুলি লাইনে লাইনে মাদল বাজবে। হাঁড়িয়ার সঙ্গে সেই গান গুলো গাইবে যা একদা রাঁচি-হাজারিবাগের গ্রামে গাওয়া হত। তখন চা-বাগান ঘুমোবে নতুন পড়া হিম মাখতে মাখতে। পৃথিবীটা হয়ে যাবে শুধু তারা আর জোনাকিদের রাজত্ব।

অমরনাথ সাইকেল ঘুরিয়ে মাঠে চলে এলো। বড়বাবুর বারান্দায় হ্যাজাক জ্বলছে। শ্যামাপোকা ভিড় করেছে সেখানে। অনন্ত ঠাকুর এখনও কালীমূর্তি তৈরী করে চলেছে। নিজের কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছাতেই অমরনাথ সত্যসাধনবাবুকে দেখতে পেলেন। পাতলা অন্ধকারে ছোট টর্চ জ্বেলে আসছেন। সাইকেল থেকে নামতেই ভদ্রলোক টর্চের আলোয় তাঁকে দেখে নিয়ে নমস্কার করলেন, 'নমস্কার। আজ প্রথমদিন। ছাত্রী কোথায়?'

একটু ব্যস্ত হলেন অমরনাথ। সত্যসাধনকে দাঁড়াতে বলে তিনি বারান্দায় উঠে পাশের ঘরটির দরজা ধরে টান দিতেই সেটা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। সাইকেল এক পাশে রেখে তিনি ভেতরের ঘরের দরজা ঠেললেন। সেটাতেও খিল নেই। অনেকবার বলেছেন এই দুটো দরজা যেন ভাল করে বন্ধ রাখা হয় অথচ কারো খেয়াল থাকে না। উষ্ণ হতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। সত্যসাধনবাবু আজ প্রথম পড়াতে এলেন, এসেই যদি ধারণা করেন তাঁর মেজাজ খুব উগ্র তাহলে খারাপ লাগবে। বাইরের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। অমরনাথ সত্যসাধনকে আপ্যায়ন করে সেখানে বসালেন। তারপর দ্বিতীয় ঘরে পা দিয়ে গলা তুলে ডাকলেন, 'দীপা, দীপা, কোথায় গেলি।'

কেউ সাড়া দিল না। ভেতরের বারান্দায় পৌঁছে তৃতীয়বার ডাকতেই রান্নাঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এল, 'কেন, তাকে কি দরকার?'

'দরকার আছে। এত বার বলেছি একবার ডাকলেই সাড়া দিবি তবু অবাধ্য হবে। কোথায় সে?' প্রশ্ন করামাত্র পেছনের দরজায় শব্দ হল। অমরনাথ ঘুরে হ্যারিকেনের আলোয় দেখলেন মেয়ে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আর দাঁড়াবার ভঙ্গী দেখেই মনে হল একটা কিছু ঘটেছে। এখন সেটা শুনতে ইচ্ছে করছিল না। গম্ভীর গলায় তিনি বললেন, 'তোমাকে পড়াতে মাস্টারমশাই এসেছেন। যাও, বইপত্র নিয়ে। কোথায় ছিলে তুমি?'

অত্যন্ত মিনমিনে গলায় জবাব এল, 'ঠাকুর ঘরের সামনে।'

'দাঁড়িয়ে আছ কেন, যাও।'

'মা আমাকে আর পড়তে নিষেধ করে দিয়েছে। স্কুলে যখন যাব না তখন মাস্টারমশাই-এর কাছে পড়ার কি দরকার!' মাথা নিচু করে সেই একই স্বরে কথা বলল দীপা।

'তার মানে?' অবাক হলেন অমরনাথ, 'স্কুলে যাবে না মানে? যত্ত সব বাজে কথা।'

এইসময় মনোরমা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'বাড়িতে মাস্টার পড়াতে এসেছে

যখন তখন পড়তে যাও। তাঁকে আর বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখো না।'

'আমার যে খিদে লেগেছে। খিদে নিয়ে পড়া যায়?'

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্কুল থেকে এসে খাসনি?'

'না।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'ঠিক আছে। তুই পড়তে বস, মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তোরও খাবার যাবে।' কথা শেষ হওয়ামাত্র দীপা ছুটল। অমরনাথ এবার বেশ বিরক্ত হলেন, 'বাড়ির অবস্থা দিনদিন হচ্ছে কি! ওইটুকুনি মেয়েকে সকালে খাইয়ে স্কুলে পাঠিয়েছ আর তারপর কিছু দাওনি? যা করবে তা একটু ভেবেচিন্তে করলে খুশী হব।'

অঞ্জলি রান্নাঘরে বসেই গলা তুলে বলল, 'গুণধবী মেয়ে পুটুস পুটুস করে কি লাগাল আর তাতেই গলে গেলেন উনি। আমি যা করি তা ভেবেচিন্তেই করি।'

'তার নমুনা তো দেখলাম। বাইরের দরজা হাট করে খোলা। যেদিন সর্বস্ব চুরি যাবে সেদিন বুঝবে। হাজারবার বললেও তো হুঁস হয় না। ভেবেচিন্তে করি।' অমরনাথ ফিরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল অঞ্জলি, 'দেখলেন মা, গায়ে পড়ে ঝগড়া করছে। যা ইচ্ছে মুখে বলছে। কখনই আসল ঘটনাটা শুনতে চায় না।'

অমরনাথ বারান্দা থেকেই বললেন, 'আস্তে কথা বল, বাড়িতে মাস্টারমশাই আছেন।'

মনোরমা বললেন, 'বউমার সঙ্গে পরে আলোচনা করিস অমর।'

অমরনাথ বললেন, 'এ নিয়ে আলোচনা করার কি আছে। মেয়েটা হয়তো কোন অন্যায় করেছিল আর তাই উনি রেগে মেগে খাওয়া বন্ধ করেছেন, স্কুলে যেতে নিষেধ করেছেন।'

মনোরমা বললেন, 'দীপাকে আজ স্কুলেই শাস্তি দিয়েছে।'

'সেকি? কেন?' অমরনাথ এবার অবাক।

মনোরমা বললেন, 'বিশু ওর খাতা দেখে লিখেছিল বলে শাস্তি পেয়েছে দুজনেই।'

'নকল করছিল দীপা!' হতভম্ব হয়ে গেলেন অমরনাথ।

অঞ্জলি বলল, 'হয়ে গেল! তিলকে তাল ভাবতে শুরু করে দিলেন উনি।'

অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না। সোজা বাইরের ঘরে চলে এলেন। সেখানে হ্যারিকেনের সামনে সত্যসাধন বইখুলে বসেছেন। উল্টোদিকে দীপা সাগ্রহে বসে। অমরনাথকে দেখে সে যেন একটু গুটিয়ে গেল। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ স্কুলে কি হয়েছিল?'

সত্যসাধন জবাব দিলেন, 'কিছু হয় নাই তো।'

'শুনলাম দীপা নাকি শাস্তি পেয়েছে।'

'ওহো! ওর খাতা জোর জবরদস্তি দেইখ্যা বিশ্বনাথ নকল করতেছিল। অ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টারমশাই ব্যাপারটা না বুইঝাই শাস্তি দিছিলেন। পরে সব শুইন্যা দীপারে আদরও করছেন। কি দীপা, ঠিক না?' দীপা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়ল।

অমরনাথ আর রাগতে পারলেন না। শুধু বললেন, 'নিজের খাতা অন্যকে দেখাও কেন? এইসব বন্ধুদের-সঙ্গ এবার ছাড়ো। দেখুন মাস্টারমশাই, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করতে পারেন কি না।'

সত্যসাধনবাবু হা হা করে হাসলেন, 'কি যে কন। দীপা খুব ভাল ছাত্রী। দ্যাখেন, অরে ফাস্ট ডিভিশনে পাশ করাইয়া ছাড়ুম।' তারপর দীপার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'পাঠ্যপুস্তকের বাইরে তুমি কি কি বই পড় ?'

দীপা তার বই-এর স্তূপ থেকে রমলা সেনের পাঠানো বইটি বের করল। সেটা হাতে নিয়ে সত্যসাধন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'চমৎকার।' অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না।

আজ ভেতরের বারান্দায় মনোরমা ছেলেকে চা খেতে বললেন। মাস্টারমশাই আর ছাত্রীকে চা-জলখাবার পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। মোড়া টেনে ছেলের খানিকটা দূরে বসলেন মনোরমা, 'তোর সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।' ছেলেদুটোকে ভেতরের ঘরে পড়তে বসিয়ে অঞ্জলি এসে দাঁড়াল দরজায়। চায়ে চুমুক দিয়ে অমরনাথ বললেন, 'এখানে চা দিয়েছ যখন তখন বুঝতেই পেরেছি। কি ব্যাপার ?'

'তোর সঙ্গে হরিদাসবাবুর বেয়াই কথা বলেছেন ?'

'হ্যাঁ। অঞ্জলিকে তো বলেছি।

'বাঃ। ঘুমের ঘোরে কি বলেছ আমার কি খেয়াল আছে ?' অঞ্জলি বলে উঠল।

'আমাকে তো কিছু বলিসনি।' মনোরমার গলায় অভিমান বাজল।'

'ওটা কি কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ?' অমরনাথ হাসলেন, 'দীপাকে দেখে ওঁর খুব পছন্দ হয়েছে। ভাই-এর ছেলের জন্যে অল্পবয়সী পাত্রী খুঁজছেন। ওসব তোমাদের আমলে হত। এখন ওর বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছি শুনলে লোকে পাগল ভাববে।'

'তোমার মেয়ের যখন বিয়ের বয়স হবে তখন লোকে এসে বিয়ে দিয়ে যাবে ?'

'তার মানে ? তোমরা কি বলতে চাইছ ?'

মনোরমা ছেলের মন বুঝতে পারলেন, 'জন্ম-মৃত্যু বিয়ে কার কপালে কখন লেখা আছে তা কেউ কি বলতে পারে। মেয়ের তো এক দিন বিয়ে হবেই। চিরকাল তো আর এখানে রাখতে পারবি না। আমি বলি কি, খোঁজ খবর নে, পরিবার কেমন দ্যাখ।'

'ধর, পরিবার ভাল, ছেলে যেহেতু ছাত্র তাই ভাল, তখন কি করবে ?'

'সবই যদি ভাল হয় তাহলে আর আপত্তি করিস না।'

'তোমরা ভুলে যাচ্ছ দীপা এখনও বাচ্চা!'

'হ্যাঁ, তুমি ওই ভাবনা নিয়েই থাক।'

অমরনাথ হকচকিয়ে গেলেন। মেয়েরা কোন বয়সে নারী হয়ে যায় সে সম্পর্কে তাঁর একটা আন্দাজ আছে। দীপা তার অনেক নিচে। তাছাড়া মেয়েটার আচরণে কোন পার্থক্য দেখতে পাননি তিনি। একটু আমতা আমতা করে তাই বললেন, 'আমি অবশ্য কিছু জানি না।'

মনোরমা বললেন, 'না না সেসব কিছু না। তবে চেহারা তো ওর বড়সড।'

অমরনাথ বললেন, 'আমার এতে সায় নেই। মেয়েটা পড়াশুনায় ভাল। মাস্টারমশাই বললেন, ফার্স্টডিভিশন পেতে পারে। এখন বিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ বারোটা বেজে যাবে।'

অঞ্জলি বলল, 'তুমি কথা বল ওদের সঙ্গে। বিয়ের পর পড়াতে হবে।'

'তোমরা এসব জানলে কি করে ?'

'হরিদাসবাবুর বউ লক্ষ্মী এসেছিল।' মনোরমা জানালেন, 'তুই বিয়ে দিস না দিস একবার ওঁর সঙ্গে কথা বল। আগ বাড়িয়ে খবরটা দিয়েছেন আর তুই যদি চুপচাপ থাকিস তাহলে খারাপ দেখায়।'

চা শেষ করে অমরনাথ উঠে গেলেন। আজ ক্লাবে গিয়ে তাস খেলতেও তাঁর ইচ্ছে করছিল না। দীপার মুখটা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা টনটন করছিল। বাল্যবিবাহের

বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল। বিধবা বিবাহ এখনও সমাজ মেনে নেয়নি। কিন্তু ক্রমশ বাল্যবিবাহের সংখ্যা কমে আসছে। মনোরমা এটাকে সমর্থন করতে পারেন কিন্তু অঞ্জলির মুখে তিনি ওসব কথা আশা করেননি। অঞ্জলির কি খুব মেজাজ খারাপ ? সেই রমলা সেন আসার পর থেকেই ওর ধবনটা বদলে গিয়েছে। অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর ঠিক করলেন একদিন না হয় জলপাইগুড়ি যাবেন। ব্যবসায়ী লোকের খুঁত বের করতে বেশী কষ্ট করতে হবে না। সেই খুঁতটাকে বড় করিয়ে দেখে সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেই চলবে।

রাত নিশুতি হলে অঞ্জলি বিছানায় এল। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'এখনও ঘুমাওনি ?'

অমরনাথ বললেন, 'ঘুম আসছে না।'

'কেন ?'

'আমার ভাল লাগছে না।'

'কি ব্যাপার ?'

'মেয়েটাকে এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওযাটা পাপ হবে।'

'আজ যেটাকে পাপ বলছ কাল সেটাকে পুণ্য বলবে। তোমার মেয়ের অবস্থা যদি মালবাবুর মেয়ের মত হয় তাহলে শান্তি পাবে ? তাছাড়া এখানে থাকলে ওর ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেশা বন্ধ করতে পারবে ? হঠাৎ যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে ?' অঞ্জলি স্বামীর বুকে হাত রাখল।

তবু উশখুস করতে লাগলেন অমবনাথ। শেষপর্যন্ত চাপা গলায় বললেন, 'বিয়ে যদি দিতে হয় অঞ্জলি তাহলে ওর শ্বশুরকে সত্যি কথাটা বলতে হবে, এটা ভেবেছ তোমরা ?'

॥ ৬ ॥

বৃষ্টিটা চলে যাওয়ার পরেই ফিনফিনে শীতেব দিন শুরু হয়ে গেল। চা-বাগানেব গাছেব পাতা রঙ পাল্টাচ্ছে আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। একটা রুক্ষ ভাব মাখামাখি চারপাশে। এখন সূর্য ডুবলেই চোরা পায়ে ঠাণ্ডা নেমে আসে আকাশ থেকে। বাত নটাতেই সেটা টের পাইয়ে ছাড়ে। রোদে গরম করে রাখা লেপ কম্বল পৌঁছে যায় খাটে খাটে। এখন আব চাদরে কাজ হয় না। এই সময় বাগানে পাতি তোলার কাজটা বাড়ে। ফ্যাক্টবিব ওপর চাপ পড়ে। মাঝে মাঝেই রাতে কাজ হয় সেখানে। ভুটিয়া পুরো হাতা পুলওভার নিয়ে রাতে বের হন অমরনাথ। কারো কারো মাথায় ইতিমধ্যেই মাঙ্কিক্যাপ উঠে গেছে।

অনন্তর এখন নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। মায়ের শবীর এখন নিটোল। এক পোঁচ রঙ পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। মাঠের কোণে প্যাণ্ডেল বাঁধাব কাজ চলছে। বাগানেব বাবুরা ছুটির পর তার সামনে চেয়ার পেতে বসে নানান আলোচনা করছেন রোজ। পুজোর দাযিত্ব এবারও শ্যামলের ওপর। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি হবার সুযোগ তার নেই কিন্তু খেটে কাজ তুলতে তার জুড়ি নেই একথা সবাই স্বীকার করে। আজ বাত্রে ঠাকুরকে প্যাণ্ডেলে আনা হবে। পরশু পুজো। আগামীকাল সারারাত জেগে মায়ের সাজ শেষ করবে, চোখ আঁকবে অনন্ত।

আজ অমরনাথকে বাত নটায় ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে। বিকেলে অফিস থেকে ফিরে চা খেয়ে তিনি এলেন পুজো প্যাণ্ডেলে। সেখানে তেজেন্দ্র একাই আসব জমিয়েছেন। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সাধারণত সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে সারা বছর। কিন্তু এইসব বারোয়ারি ব্যাপার এলে তিনি মাতব্বরী করতে ছাড়েন না। তেজেন্দ্রর ছেলে, এখন যিনি

বড়বাবু তিনি রয়েছেন দূরে। পিতার সামনে থাকলে তাঁর ব্যক্তিত্ব কম হওয়ার সম্ভাবনা।
অমরনাথকে দেখে তেজেন্দ্র বললেন, 'এসো অমর। তুমি হয়তো কিছুটা মনে করতে পাববে। এদের বলছিলাম পুরনো দিনের কথা। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে যখন এই বাগানে এলাম তখন কালীপুজোব কথা ভাবতেই পারতাম না। কে পুজো করবে ? বাঙালি বলতে তো আমবা চারজন। না না হরিপদ তখনও জয়েন করেনি। চৌমাথায় কোন দোকান ছিল না হে। বিকেল হলেই ঘবের দরজা বন্ধ করতে হত। ওই যে তারের বেড়া দেখছ ওইখানে বসে বাঘ ডাকত। কুকুবের মত শেয়াল ঘুরে বেড়াত এই মাঠে।'

একটু দূরে দাঁড়িয়ে শ্যামল প্যান্ডেল বাঁধা দেখছিল। ত্রিপল বাঁশ সব বাগানেরই। যারা কাজ করছে তাদের পাঠানো হয়েছে ফ্যাক্টবি থেকেই। শ্যামলের কান ছিল এদিকে। তাই প্রশ্ন কবে বসল, 'তাহলে পুজোটা শুরু হল কিভাবে জ্যাঠামশাই।'

কেউ প্রশ্ন করলে তেজেন্দ্র খুশী হন। তাছাড়া এই সময়টাতেই চাকরিব পদ অথবা বয়সের বাদবিচাব কবা হয় না। তিনি পাকাচুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'একবাব বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। মিল্টন সাহেব। চাষ কবতে এদেশে আসেনি হে। পেটে বিদ্যে ছিল। মিল্টন সাহেব বললেন, 'বাবু, তুমি কি হিন্দু ?'

আমি বললাম, 'ইয়েস স্যাব। সেন্ট পার্সেন্ট হিন্দু। মুরগীও খাই না।'

মিল্টন সাহেব খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'তবে আদমসুমারিতে বলছে যে এ তল্লাটে কোন হিন্দু থাকে না। সবাই মুসলমান।'

আমি তো অবাক। মাঝে মাঝে মুসলিম লীগের লোকজন এসে চৌমাথায় ভিড় জমাতো বটে হাটেব দিনে কিন্তু আব কিছু খবব বাখতাম না। সাহেব বললেন, 'তোমাদেব তো অনেক ভগবান শুনেছি। তাদেব মধ্যে পছন্দ করে তুমি একটা ভগবানের নাম বল যার পুজো তোমবা কবতে পাব। আমি কোম্পানি থেকে সেই পুজোব খরচ দেব।'

আমি তো উৎফুল্ল হয়ে বললাম, 'দুর্গাঠাকুব আমাদের জননী।'

সাহেব জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তাব পুজো কবতে কত খবচ হবে ? বাজেট দাও।'

আমি দিলাম কাগজে লিখে। দেখে সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ, 'সে কি, তুমি বললে একজন আব এ যে দেখছি পুবো ফ্যামিলি। তাব ওপব চাব পাঁচ দিন ধবে পুজো। তার মানে এই কদিন নো ওযাক ? অসম্ভব। এই পুজো কবতে আমি অনুমতি দিতে পারি না। তোমাদেব মুশকিল কি জান কিছু চাইতে বললে তোমবা মাত্রা ছাড়িযে চাও। এমন একটা পুজো কব যাব সঙ্গে কোন ফ্যামিলি থাকবে না এবং একদিনেই শেষ হযে যাবে।' তখন সব দেবদেবীকে ছেড়ে শ্যামামাযেব কথা মনে পড়ল। বাজেট দিতেই অনুমতি পাওয়া গেল।'

তেজেন্দ্র গল্পটা তখনও শেষ কবেননি তা ওঁর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল।

ডাক্তাববাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কত বাজেট দিয়েছিলেন ?'

'পনেব। বড় সাহেব সেটা কমিযে বাবো করেছিলেন। তা সেই পুজো কবে প্রমাণ হল এই চা-বাগানে হিন্দুবা থাকে। বলতে পাব আমিই প্রথম মাযেব পুজো কবলাম।'

'চাবজনে মিলে এত বড় পুজো ?' শ্যামল যেন সন্দেহ দেখাল।

চারজন ? চা-বাগানেব সমস্ত মদেশিযা কুলিকামিনবা হাত মেলালো। সেই কদিন আর তারা গীর্জায় যায়নি। তা যা বলছিলাম, সাহেব এলেন ঠাকুব দেখতে মেমসাহেবকে নিয়ে। এক মিনিট দাঁড়িয়েই তাঁবা চলে গেলেন। আমাদেব মাথায় হাত। সাহেব কি কোন কারণে রেগে গেলেন আমাদের ওপরে ? শলাপরামর্শ করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটলাম চা-বাগানের কোণে মিল্টন সাহেবের বাংলোয়। সাহেব আমাকে দেখে বললেন, 'ছি ছি ! কি লজ্জার ব্যাপার।

তুমি তো আমাকে বলবে তোমার ভগবান জামাকাপড় পরে না। মেমসাহেবকে নিয়ে তাহলে যেতাম না। তাছাড়া হাজার হোক তিনি একজন নারী, তাঁকে অত বড়সড় করে তৈরী না করে স্বাভাবিক লম্বা করলেই তো পারতে।' সাহেবকে বোঝাতে আমার প্রাণান্ত। এসব তো আর তোমাদের ফেস করতে হচ্ছে না হে। এখন মোটা মোটা চাঁদা তুলছ সাপ্লায়ারের কাছ থেকে, কোম্পানিও কিছু দিচ্ছে, কাউকে জবাবদিহি দেবার নেই। আমাদের সেই সময়টাই ছিল আলাদা। সেইসময় যদি চেষ্টা না করতাম এখন তোমরা কি ফলভোগ করতে পারতে ?'

আজকাল তেজেন্দ্র যে কোন প্রসঙ্গ এইভাবে খোঁচা দিয়ে শেষ করেন। বুড়ো মানুষ, ভাসান পর্যন্ত তাঁর বকবকানি শুনতে হবে। অমরনাথ সরে যাচ্ছিলেন কিন্তু তেজেন্দ্র ছাড়বার পাত্র নন। চেয়ার ছেড়ে তিনি উঠে এলেন। অমরনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন দীপা মায়ের মূর্তির সামনে ছেলেগুলোর সঙ্গে দাঁড়িয়ে। তেজেন্দ্র বললেন, 'অমরনাথ, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।'

'বলুন।' অমরনাথ দেখলেন অন্য বাবুরা নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছেন। তেজেন্দ্র যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন তখন কেউ সাহস পেত না এমন করতে। প্রাক্তন বড়বাবু এবং বর্তমান বড়বাবুর বাবা হিসেবে এখন সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না। কিন্তু বেশী কথা বলার স্বভাব অবসর নেওয়ার পর তৈরী হওয়ায় লোকে ওঁকে নিয়ে আড়ালে মশকরা করে। মানুষ নিজেই নিজের সম্মান হারাতে সাহায্য করে।

তেজেন্দ্র বললেন, 'তোমার মায়ের বয়স হয়েছে। বউমা সংসারধর্ম নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তো অনেক দিন ধরে সেবাযত্ন করে এসেছেন, এখন বউমার পালা। তুমি তাঁর দিকে নজর দাও।'

অমরনাথ কিঞ্চিত অপ্রস্তুত, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

তেজেন্দ্র অমরনাথের কাঁধে হাত রাখলেন, 'সেদিন তোমার মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মনে হল তীর্থে যাওয়ার শখ খুব। একবার ওঁকে নিয়ে তীর্থে ঘুরে এস। এই কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার। হরিদ্বারে অবশ্য আমি যাচ্ছি। আমার সঙ্গেই যেতে পার তোমরা।'

অমরনাথ এবার অবাক। জ্ঞান হবার পর তিনি কোনদিন মনোরমার মুখে এমন অভিলাষের কথা শোনেননি। মনোরমা তাঁকে বা অঞ্জলিকে না জানিয়ে তেজেন্দ্রকে বলতে গেলেন কেন ? মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। তেজেন্দ্র বললেন, 'আর দ্বিতীয় কথাটি হল দীপাকে নিয়ে। যাদের সঙ্গে এতকাল খেলাধুলো করত, ছেলেমানুষ বলেই তা মানিয়ে যেত। কিন্তু এখন সতর্ক হবার সময় হয়েছে। সবই তো দেখি আমি ওই বারান্দায় বসে।'

'আপনি কি বিশেষ কিছু দেখেছেন ?' অমরনাথ বিরক্ত গলায় প্রশ্ন করলেন।

'না ঠিক তেমন নয়। তবে যেভাবে হুড়োহুড়ি করে তা উচিত নয়।' তেজেন্দ্রর কথা শেষ হওয়ামাত্র দীপা দৌড়ে এল কাছে, 'বাবা, কাল রাত্রে যখন ঠাকুরের চোখ আঁকা হবে তখন আমি মণ্ডপে আসব ?'

'কেন ?' অমরনাথ বিরক্তি এড়াতে পারলেন না।

'সবাই বলছে সেইসময় নাকি কালীঠাকুরের শরীরে ভগবান এসে যায়।'

'কখন চোখ আঁকা হবে তার ঠিক নেই। যাও বাড়ি যাও।'

'বল না, আসব কি না ! বিশু বলেছে চোখ আঁকার আগে আমাকে বাড়িতে গিয়ে ডেকে আনবে। তুমি হ্যাঁ বললে মা আর কিছু বলবে না।' দীপা খুব সাহস করে কথাগুলো বলে যাচ্ছিল। অমরনাথ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। চাপা গলায় ধমকে উঠলেন,

'বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। যাও, এখনই বাড়ি চলে যাও।'

দীপা অবাক চোখে অমরনাথকে একবার দেখে আচমকা ঘুরে নিজেদের কোয়ার্টার্সের দিকে দৌড়ে চলে গেল। অমরনাথ তেজেন্দ্রর কাছ থেকে সরে এলেন। এবং তখনই তিনি হরিদাসবাবুর সামনে পড়ে গেলেন। অমরনাথ বললেন, 'হরিদাসদা, আমি ভাইফোঁটার পরই জলপাইগুড়িতে যাব ওঁদের সঙ্গে কথা বলতে। আপনি যদি একটু জানিয়ে দেন তাহলে ভাল হয়।'

হরিদাসবাবু খুশী হলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভকাজে অকারণে দেরি করো না। এমন পাত্রের খোঁজ পেলে যে কেউ তো ছুটে যাবে হে দেরি করলে আবার আঙুল কামড়াতে না হয়।'

আলো নিবে এলে মণ্ডপে হ্যাজাক জ্বলল। তিনটে হ্যাজাক মাঠের চেহারাটা পাল্টে দিল লহমায়। বাবুরা চাদর মুড়ি দিয়ে এখনও আড্ডা মারছেন। তেজেন্দ্র ফিরে গেছেন কোয়ার্টার্সে হিম পড়ছে বলে! অনন্ত হ্যাজাকের আলোয় এখনও কাজ করে যাচ্ছে। একসময় সে হাঁকল, 'ঠাকুর তোল গো।'

অমরনাথের হঠাৎ একটা কাঁপুনি এল। চুপচাপ একপাশে বসে ছিলেন তিনি। অনন্তর হাঁকটা কানে যাওয়ামাত্র শরীরে শিরশিরানি ছড়িয়ে পড়ল। সব কিছুরই একটা সময় আসে আর তখন ঈশ্বর নীরবে হাঁক দেন। যে মানুষ সেটা শুনতে পায় তার চেয়ে সুখী কেউ নেই। সময়ের ডাক সময় পেরিয়ে গেলেই বা না এলেই আমাদের কানে আসে যে। পাশে বসা নবনী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল অমরদা? শরীর খারাপ করছে?' অমরনাথ চমকে উঠলেন, 'না তো।'

নবনী বলল, 'আপনি এমনভাবে কেঁপে উঠলেন যে আমার মনে হল কিছু একটা হয়েছে।'

অমরনাথ হাসার চেষ্টা করলেন, 'না হে। ওই অনন্ত আচমকা এমন হেঁকে উঠল যে—।' কথা শেষ করলেন না অমরনাথ। নবনী মুখ ঘুরিয়ে নিল। অমরনাথের মনে পড়ল লালাবাবুর কথা। বেলা যায় শুনে ভদ্রলোক একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কাঁপুনিটা তাঁর শরীরে যত তাড়াতাড়ি এল মিলিয়ে যেতে তার চেয়ে বেশী সময় নিল না।

মণ্ডপে নিয়ে আসা হল রঙবিহীন কালীঠাকুরকে। উদ্যোগটা শ্যামলেরই তারই হাঁকাহাঁকি সবাইকে ছাপিয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে ঘাস থেকে, দেওদার চাঁপার গাছ থেকে অজস্র শ্যামাপোকা ছুটে এসেছে হ্যাজাকগুলোর গায়ে। অমরনাথ প্রায় নিঃশব্দে চলে এলেন কোয়ার্টার্সে। বাইরের দরজা শক্ত করে ভেজানো ছিল। সামান্য চাপ দিতে খুলে গেল। বাইরের ঘরে জাম্বো হ্যারিকেন জ্বলছে। ভেতরের বড় ঘর থেকে অঞ্জলির গলা ভেসে এল, 'মা, কাল চৌদ্দশাকটা আপনি করুন। গতবার আপনার ছেলের আমার রান্না ভাল লাগেনি।'

মনোরমা বললেন, 'চোদ্দরকম শাক একসঙ্গে ভেজে নেবে। এর আবার রান্না কি আছে। চোদ্দটা প্রদীপ তোলা আছে। কাল সলতে পাকিয়ে নিলেই হবে। আর হ্যাঁ, শাকগুলো যখন বুধুয়া তুলবে তখন তুমি একটু দাঁড়িয়ে থেকো নইলে জংলা পাতা মিশিয়ে দেবে।'

অঞ্জলি বলল, 'না না। আমি ওকে বলেছি চোদ্দরকম শাক আলাদা করে ভাগ করে রাখবি আমি দেখার পর মেশাবি।'

ঘরে পা দিতেই অমরনাথের বিদ্যাসাগরী চটিতে মচমচ শব্দ উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ঘরের আলাপ থেমে গেল। অমরনাথ মুখ তুলে বড় ঘড়িতে সময় দেখে চেয়ারে গিয়ে বসলেন। খবরের কাগজটা টেনে হেডিং দেখলেন, বিধানচন্দ্র রায় জহরলাল নেহরুর সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বসবেন। কাগজ রেখে দিয়ে অমরনাথ ডাকলেন, 'মা'।

মনোরমার সাড়া এল, 'বল'।

'একবার এই ঘরে আসবে?' যতটা সম্ভব নরম গলায় প্রশ্নটা করলেন অমরনাথ।

মনোরমা উঠে এলেন দরজায়, 'কি হয়েছে?'

'তোমার সঙ্গে কথা ছিল।'

'কি কথা! বল।'

'না। মানে, আমি তো জানতাম না তোমার তীর্থ-দর্শনের বাসনা হয়েছে। তুমি কি ঠিক করেছ কোন কোন তীর্থে যেতে চাও?' মুখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন অমরনাথ।

'আমি? তীর্থদর্শন করতে চাই? কি আজেবাজে কথা বলছিস?' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মনোরমা।

'আমি তো তাই শুনলাম। ফেব্রুয়ারি মাসের আগে আমি তো ছুটি পাব না। তার ওপর যদি বিয়ের দিন স্থির হয়ে যায়—, মানে খরচটরচ তো হবে, তবু তোমাকে নিয়ে যেতে পারব ছুটি পেলে। আগে থেকে ব্যবস্থা করলে নিশ্চয়ই থাকার জায়গা পাওয়া যাবে।'

'আমি তীর্থে যেতে চেয়েছি এ কথা তোকে কে বলল?'

'পুরোন বড়বাবু।'

'কি বললেন তিনি?'

'এইসব কথাই। তোমার যাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে অথচ আমি খবর রাখছি না। উনি নিজেও নাকি হরিদ্বারে যাচ্ছেন। তোমাকে তো কখনই এসব কথা বলতে শুনিনি।' অমরনাথের কথা শেষ হওয়ামাত্র পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে অঞ্জলি প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠল। মুখে হাত চাপা দিয়েও সে নিজেকে সামলাতে পারছিল না। হতভম্ব অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?'

মনে হল মনোরমাও কিঞ্চিত অপ্রস্তুত। চাপা গলায় বললেন, 'আঃ বউমা।'

অঞ্জলি হাসি নিয়েই বলল, 'ওই বুড়োর মতিভ্রম হয়েছে। মা কিছুই বলেনি। উনিই গায়ে পড়ে নানান উপদেশ দিয়ে বললেন হরিদ্বারে যাচ্ছেন। বোধহয় খুব শখ হয়েছে মাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার। ব্যাটাছেলের জাতটাই এমন।'

মনোরমা এবার ধমকে উঠলেন, 'যা মুখে আসছে তাই বলছ তুমি।'

'ঠিক কথাই বলছি মা' আপনাকে একা পেয়ে বলে দেখল লাভ হচ্ছে না তাই আপনার ছেলেকে তাতাতে গেল। আর তুমিও এমন কানপাতলা মানুষ তাই বিশ্বাস করে ফেললে। আশ্চর্য!'

অমরনাথ মুখ নিচু করে বসেছিলেন। মায়ের দিকে তাকাতে তাঁর লজ্জা করছিল। তেজেন্দ্র চিরকালই চুকলিখোর, ধান্দাবাজ। যখন চাকরিতে ছিলেন তখন অনেক কষ্টে মানিয়ে ছিলেন অমরনাথ। তেজেন্দ্র অন্তত তিনজন বাবুর চাকরি খেয়েছেন সাহেবের কাছে লাগিয়ে। সেসব অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। কিন্তু এই বয়সে যে তিনি মনে মনে অমন ভাবনা পোষণ করেন তা ভাবতেই শরীর শক্ত হয়ে গেল অমরনাথের। মনোরমা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা অনুমান করলেন, 'আমার বাবা এখন কোথাও যাওয়ার বাসনা নেই। মরার আগে শুধু একবার জন্মস্থানটা দেখতে যাব। তাই দেখাস।'

অঞ্জলি বলল, 'সেটা তো মালবাজারে। এখান থেকে আব কতটুকু !'

মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'না। মালবাজারে আমার বাবা চাকরিতে বদলি হয়ে এসেছিলেন। ছেড়ে দাও এসব কথা। তুই তো গুদামে যাবি। বউমা খাবার দিয়ে দিক !'

'একটু পরে। দীপা কোথায় ?' অমরনাথ প্রসঙ্গ পাল্টাতে গিয়ে আর একটা অস্বস্তিতে পড়লেন। দীপার নামটা মুখে আনামাত্র মনে হল মেয়েটাকে যেন একটু বেশী বকেছেন তখন। অবশ্য তেজেন্দ্র মনোরমার সম্পর্কে বানিয়ে বললেও দীপা সম্পর্কে খুব কিছু বলেননি। বিশু খোকনদের সঙ্গে মেলামেশা ওঁর চোখে খারাপ লাগার আগে মনোরমারই লেগেছে। আর তো কদিন !

অঞ্জলি জবাব দিল, 'কিছুক্ষণ আগে ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল। বলল কিছু খাবে না শরীর খারাপ। একটু আগে দেখলাম মায়ের ঘরে বই নিয়ে বসেছে।'

'কাছে পিঠে নেই তো।'

অঞ্জলি মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না।'

অমবনাথ বললেন, 'বসো মা। একটু আগে হরিদাসদাকে বলে দিলাম পাত্রপক্ষকে জানিয়ে দিতে যে আমি ছেলে দেখতে যাব।'

দুদ্দাড় করে দুজোড়া কচি পা ছুটে গেল ভেতরেব বারান্দায়। দরজা ভেজানো। একটা গুনগুনানি আসছে, ঘরের ভেতর থেকে। সত্যসাধনবাবু আজ আসবেন না। পুজোর কদিন সকালে এসে পড়িয়ে যাবেন তিনি। তাঁরই দেওয়া হোমটাস্কের একটা অংশ মুখস্থ কবাব চেষ্টা কবছিল দীপা। অথচ মন কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। এই মুহূর্তে অভিমান নিয়ে নেমে এসে খিদে এবং পুজোর মণ্ডপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল এক সঙ্গে। পড়তে বসা শুধু জেদেব বশেই, যে জেদ জন্ম নিয়েছিল অভিমান থেকেই। এখন দরজায় শব্দ হতে দীপাব মনে হল ঠাকুমা এসেছেন মান ভাঙাতে। সে আবার পাঠে মন দেওয়ার চেষ্টা করতেই খিলখিল হাসি শুনতে পেল। চোখ কুঁচকে হ্যাবিকেনের আলোয় দীপা দেখতে পেল দুই ক্ষুদে বদমাস দাঁড়িয়ে আছে দবজায়।

'অ্যাই ' কি চাই এখানে ? পড়াশুনা নেই ?,' ধমকে উঠল দীপা।

বড়টা দাঁত বেব করে হাসল, 'এই দিদি। তোব বিয়ে !'

'বিয়ে ?' হকচকিয়ে গেল দীপা।

'হুঁ। জলপাইগুড়িতে বিয়ে হবে। কি মজা ! আমবা নেমন্তন্ন খাব।'

'মারব এক থাপ্পড়। ইয়ার্কি হচ্ছে, না ?' দীপা এবার চিৎকার করে উঠল।

এইসময় অঞ্জলির গলা পাওয়া গেল, 'এই ওখানে তোরা কি কবছিস ? পড়াশুনা করতে বললেই বুঝি পিঠে পাখা গজায়। আয়।' ক্ষুদেরা দরজা ছেড়ে ছুটে ফিবে গেল। আর তারপরেই সেখানে অঞ্জলিকে দেখা গেল, 'তুই চেঁচাচ্ছিলি কেন ?'

ঠোঁট টিপে চোখ বড় বড় করে দীপা মাকে দেখল। অঞ্জলি একটু গলা নামিয়ে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হযেছে তোর ?'

বই-এ মুখ নামাল দীপা, 'কিছু না। ওরা আমার কত ছোট অথচ আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারে।'

'কি বলেছে তোকে ?'

'আমার নাকি বিয়ে ! এরপর বললে আমি কিন্তু মারব।'

'মারবি কেন মেয়েদের তো একসময় বিয়ে হযই।'

'সেই সময় যখন আসবে তখন বলুক।'

'সময় কখন আসবে সেটা ঠিক করবেন তোমার বাবা।'

'মানে ?'

'এর আবার মানে কি। ভাল ছেলে পেলে তোমার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে।'

'না। আমি এখন বিয়ে করবই না।'

'তাহলে কি বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে।'

'আমি পড়ব। চাকরি করব।'

'বুঝেছি। ওই কমলা সেন তোমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে গেছে। এখন এস, একটু মুখে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করো। একটা কথা যদি তুমি আমার শোন আজকাল।' অঞ্জলি চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। দীপা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা কি হল। হঠাৎ আজ তার বিয়ের কথা উঠল কেন ? তার বয়সে এই বাগানে কারো বিয়ে হয়নি। ওই যে ললিতাদি, কত বড়, তবু তো বিয়ে হচ্ছে না। কিন্তু ক্ষুদে দুটো খামোকা তার সঙ্গে রসিকতা করতে যাবে কেন ? বইএর অক্ষরগুলো কেমন জড়িয়ে মিশিয়ে অদ্ভুত চেহারা নিচ্ছিল এখন।

রাত্রে সবার খাওয়া দাওয়ার পর মনোরমার পাশে শুয়ে সে মৃদুস্বরে বলল, 'ঠাকুমা, মা না আমাকে মিছিমিছি ভয় দেখিয়েছে।'

'কিসের ভয় ?' মনোরমা পাশ ফিরে শুয়েই জিজ্ঞাসা করলেন।

'বিয়ের।'

মনোরমা জবাব দিলেন না। দীপা একটু অপেক্ষা করে এবার আলতো নাড়া দিল মনোরমার বাজু ধরে, 'ও ঠাকুমা।'

'আঃ। জ্বালাস না বাপু। বড্ড ঘুম পাচ্ছে।' মনোরমা প্রসঙ্গটায় যেতে চাইলেন না।

আগামীকাল কালীপুজো। কোয়ার্টার্সের সামনের মাঠে এবার শুধু প্যান্ডেল বাঁধা হয়নি, সামনের অনেকটা জায়গা ঘিরে টব দিয়ে সাজানো হয়েছে। সাহেব একটা ডায়নামো পাঠিয়েছেন ফ্যাক্টরি থেকে। ঘেরা জায়গার সামনে ভেতরে যাওয়ার জন্যে যে গেট করা হয়েছে তাতেও রঙিন কাগজে মুড়ে বাল্ব ঝোলানো হয়েছে। এই প্রথম, আজ রাত্রে এই চা-বাগানের কোয়ার্টার্সগুলোর সামনে ইলেকট্রিক আলো জ্বলবে। এখন পুজোর আমেজ ছড়িয়েছে সর্বত্র। উৎসব উৎসব ভাব সারা মাঠে। সারাটা দুপুর মাঠে থেকে দীপা লক্ষ্য করল ললিতাদি একবারও এল না রাস্তা পেরিয়ে মণ্ডপে। অথচ দুপুর থেকেই নিজেদের কোয়ার্টার্সের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে ললিতাদি। আর শ্যামলদা সারাদিন ছুটোছুটি করে তদারকি করে যাচ্ছে এখানে। বিকেল ফুরিয়ে গেলে ডায়নামো চালু হতেই অন্ধকার মেখে যাওয়া মাঠের চেহারা বদলে গেল। তেজেন্দ্র চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'একেবারে ইন্দ্রপুরী করে ফেললে হে।'

কালীপুজোর আগের রাত্রেই এমন ভিড় কখনও হয়নি। ইলেকট্রিকের আলোয় সাজানো প্যান্ডেল দেখতেই কোয়ার্টার্সগুলো থেকে তো বটেই চৌমাথার লোকজনও আসতে লাগল এখানে। অবশ্য প্রতিমার সামনে বিরাট একটা পর্দার আড়াল রেখেছে শ্যা   া। মায়ের চোখ আঁকা শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণের চোখের আড়ালে থাকবেন তিনি। বিশু অনন্তর কাছ থেকে খবর এনেছে চোখ আঁকা হবে রাত তিনটের সময়।

একসময় মায়ের সঙ্গে ললিতাদি এল মণ্ডপে। ওর মা যখন পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলছিল তখন ললিতাদি এমন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়েছিল যেন অজানা জায়গায় এসেছে। এমন

'সে তুই বুঝবি না।'

'মা তো সারামাস তেল সাবান মাখে, মায়ের চিত্ত-চঞ্চল হয় না?'

'এত কথা আমি বলতে পার না। এবার ঘুমাতে দাও।'

'তুমি আমকে নিরামিষ খেতে দিচ্ছ কেন?'

'এখন খেতে হয়।'

'কেন খেতে হয়?'

'শরীর ঠাণ্ডা থাকে।'

'আমার শরীরকে ঠাণ্ডা করার কোন দরকার নেই।'

'সেটা আমি বুঝব।'

'আমার শরীর আর তুমি বুঝবে?'

'যদ্দিন তুমি বড় না হও তদ্দিন বুঝব।'

'আমি বড় হয়ে তোমার এইসব নিয়মকানুন একদম মানব না। সব বাজে। খুব খারাপ।'

পঞ্চম দিনে মেয়ে যখন স্নান করল তখন অমরনাথ খুব অবাক হলেন। এই কদিনের অন্ধকার ঘরে বাস করে মেয়েটা যেন নিস্তেজ হয়ে গিয়েছে। মুখে একটা কালচে গাম্ভীর্য এসে গেছে ওর মধ্যে। হাঁটা চলায় ছটফটানি উধাও। রাত্রে অঞ্জলির মুখে শুনলেন আজ সত্যসাধানবাবু পড়াতে এসে খুব বকাঝকা করেছেন দীপাকে অন্যমনস্ক হবার জন্যে। আর বিকেল বেলাতেও মেয়ে বারান্দা থেকে নামেনি। ওর বন্ধুরা মাঠে বসেছিল, একবারও যায়নি তাদের কাছে। অঞ্জলি বলল, 'এত তাড়াতাড়ি মেয়েটা পাল্টে যাবে ভাবিনি। তোমার মা বাপু খুব বাড়াবাড়ি করেছেন। আমার নিজের ব্যাপারটা এত সাধারণ ছিল যে তখন কি ঘটেছিল আজ মনেই নেই। এ যেন জোর করে ওইটুকুনি মেয়ের মনে সব ঠেসে দেওয়া।'

অমরনাথ মুখ ফেরালো, 'ওইটুকুনি মেয়েকে বিয়ে দিতে তো তোমার আপত্তি নেই।'

হকচকিয়ে গেল অঞ্জলি, 'আমি ওর ভাল চাই। পরে বড় হলে ভাল বিয়ে যে হবেই তা তুমি নিশ্চয় করে বলতে পার? তখন মনে হবে আমরাই ওর ক্ষতি করলাম।'

'এখনই বিয়ে দিয়ে যে উপকার করবে তাই বা বলছ কি করে? যা হোক কাল সকালে একবার ফ্যাক্টরি থেকে ঘুরে এসে আমি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছি।' অমরনাথ চোখ বন্ধ করলেন বিছানায় শুয়ে।

অঞ্জলি আর একটা কথা বলতে গিয়ে কিন্তু কিন্তু করল খানিক। তারপর বলেই ফেলল, 'যদি আমি তোমার সঙ্গে যাই খুব অসুবিধে হবে?'

'তুমি যাবে মানে?'

'নিজের চোখে দেখে আসি। তুমি তো একটা দেখলে আর একটা দেখবে না।'

সাইকেল থেকে নেমে সেটাকে স্ট্যান্ডে রেখে অমরনাথ ফ্যাক্টরির দরজায় পৌঁছে দেখলেন তুলকালাম কাণ্ড চলছে। কুলিকামিনরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে দূরে। সাহেব চিল-চিৎকার করছেন। তাঁর সামনে একটা চৌদ্দ-পনের বছরের মদেশিয়া মেয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। ওপাশে ইঞ্জিন চলছে তাই সাহেবকে চিৎকার করতে হচ্ছে আরও জোরে।

অমরনাথকে দেখে সাহেব গলা তুলেই বললেন, 'কাম হিয়ার। এই মেয়েটা চা চুরি করে বাড়ি যাচ্ছে। শরীর খারাপ বলে ছুটি নিয়েছিল। তোমার ফ্যাক্টরিতে রোজ এসব হচ্ছে আর

তুমি খবরই রাখছ না। পুরো ব্যাপারটার জন্যে তোমাকে দায়ী করব আমি।'

সাহেব সেটা করতে পারেন। বিশাল ফ্যাক্টরির পূর্ণ দায়িত্ব অমরনাথের ওপর। তিন শিফটে কাজ হচ্ছে এখন অমরনাথের পক্ষে চব্বিশঘণ্টা পাহারা দেওয়া সম্ভব না। তার জন্যে দুজন অ্যাসিস্টেন্ট আছে, দারোয়ান আছে। অমরনাথ তার সহকারীর দিকে তাকালেন। মনে হল বেচারা কিছু বলতে চাইছে কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। অমরনাথ মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই চা চুরি করেছিস। তুই তো বয়রার মেয়ে, না?'

মেয়েটা মাথা নাড়ল। সাহেব বললেন, 'ওর বাবাকে ডাকো।'

এই সময় সহকারী ছুটে এসে অমরনাথের কানে কানে বলল, 'সাহেব ভুল বুঝেছেন। মেয়েটা পেটে চা বাঁধেনি। ও গর্ভবতী।

চোখ কুঁচকে মেয়েটাকে দেখে অমরনাথ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'সাহেবকে বলনি কেন?'

'কি করে বলব। গর্ভবতীর ইংরেজিটা এতক্ষণ মনেই আসছিল না। এইমাত্র এল।'

অমরনাথ সাহেবের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, 'স্যার। কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। এইমাত্র শুনলাম মেয়েটি প্রেগন্যান্ট। ওর পেটে চা বাঁধা নেই।'

'ইম্পসিব্‌ল। তাহলে এই লোকগুলো এতক্ষণ বলত।' সাহেব মাথা নাড়লেন।

অমরনাথ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই, তোর বাচ্চা হবে?'

মেয়েটা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অমরনাথ রেগে গেলেন, 'জবাব দে।'

এবার মেয়েটা মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল।

অমরনাথ সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোরা এতক্ষণ সাহেবকে বলিসনি কেন ওর বাচ্চা হবে?'

লোকগুলো প্রশ্নটা শুনে ফ্যাক ফ্যাক করে হাসতে লাগল। সাহেব কিন্তু তখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, 'নো মিস্টার মুখার্জি, এরা সবাই আমাদের ব্লাফ দিচ্ছে। শী শুড বি একজামিনড্‌বাই দ্য ডক্। আমি হাত দিলে তো অপমান করা হবে। তুমি কি বলতে চাও ওইটুকুনি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে?'

হঠাৎ অস্বস্তি শুরু হল অমরনাথের। দীপা যদি বছর দুই তিনের মধ্যে সন্তানসম্ভবা হয়? মন থেকে চিন্তাটা সরাবার জন্যেই তিনি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর স্বামীর নাম কি? এই তোরা বলতো কে ওর স্বামী।'

একটা বুড়ি কামিন খ্যান খ্যান গলায় বলে উঠল, 'ভাগলবা।' জানা গেল মেয়েটির বিয়েই হয়নি। একজন পরবের সময় এসেছিল অন্য বাগান থেকে। সে প্রেমের নামে মেয়েটির সঙ্গে এইসব কাণ্ড করে সরে পড়েছে। পরে যখন জানাজানি হল তখন বয়রা গিয়েছিল ছেলেটার বাবার কাছে। ছেলেটার বাবা অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত অনেক তর্কাতর্কির পর স্থির হয়েছে বাচ্চাটা হোক। তারপর ওর মুখ দেখে যদি পাঁচজনে সাব্যস্ত করে ছেলেটার মুখের সঙ্গে মিল আছে তাহলেই বিয়ে দেওয়া হবে।

হিন্দী মেশানো মদেশিয়া বুঝতে সাহেবের অসুবিধে হয় না। শুনে ফিসফিস করে বললেন, 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ওইটুকুনি মেয়ে কারো সঙ্গে শুতে পারে অ্যাণ্ড দিজ পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং দ্যাট।'

অমরনাথ জনতাকে কাজে ফিরিয়ে দিলেন জোর করে। মেয়েটার শরীর সত্যি খারাপ করছিল। তাকে ছুটি দেওয়া হল। সাহেব বললেন, 'আই অ্যাম সরি বাট আই ফিল পিটি ফর দ্য গার্ল।'

অঞ্জলির সঙ্গে বাসে চেপে বার্নিশঘাটে যাওয়ার সময় অমরনাথের কথাটা কেবলই মনে হচ্ছিল। 'মেয়েটার জন্যে আমার অনুকম্পা হচ্ছে।' দাঁতে দাঁতে চাপলেন তিনি। আজ সাহেবের কাছে ছুটি নিয়েছেন অন্য কথা বলে। মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে জলপাইগুড়ি যাচ্ছেন বলার সাহস হয়নি। বিয়ে ঠিক হলে জানাতেই হবে। নেমন্তন্নও করবেন। তখন সাহেবের,কি প্রতিক্রিয়া হবে ? এইভাবেই কি বলবেন, 'মেয়েটার জন্যে আমার অনুকম্পা হচ্ছে।' চা বাগান ছাড়িয়ে ডুড়যাব ব্রিজে উঠল গাড়ি। অমবনাথ অঞ্জলির দিকে তাকালেন। ইস্ত্রিভাঙ্গা শাড়ির বঙ হালকা নীল হলেও ওকে শাশুড়ি বলে কিছুতেই মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। এমনিতে অঞ্জলিব শরীরের বাঁধুনি ভাল। সামান্য সাজলেই বয়সটা আরও কমে যায়। কেবলই মনে হচ্ছে ঠিক করছেন না কাজটা। চোখ বন্ধ করলেন অমরনাথ। আব তারপরই শিউরে উঠলেন। দীপা দিন রাত ছেলেগুলোব সঙ্গে মেশে। এখন কদিন পরিবর্তনের ধাক্কায় না হয ব্যাপারটা চাপা আছে। আবার যে শুরু হবে না তা কে বলতে পারে। হঠাৎ যদি খবর পান ওব বাচ্চা হবে তাহলে . মাথাব ভেতবটা গরম হয়ে গেল। বয়রাব মত তাঁকেও যদি ছেলেব বাবা বাচ্চার জন্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে ফ্যাক্টবির দরজায দাঁড়ানো মাথা নিচু করা মেয়েটার ভঙ্গী মনে পড়ে গেল তাঁব। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হযে বসলেন। দিনরাত বারুদ আগলে বসে না থেকে বাক্সে পুরে দেওযাই বুদ্ধিমানেব কাজ হবে। এবকম মনে হতেই মন অনেক হাল্কা হযে গেল।

বাসগুলোর ছোটা শেষ হয় বার্নিশঘাটে। একপাশে কিছু অস্থাযী হোটেল. চায়েব দোকান আর বাসেব ভিড। নদীর জল যেমন কমে বাড়ে তেমন ঘাট পাল্টায। বালিতে পা দিয়ে অঞ্জলি বলল. 'শুনেছি এখানকাব বসগোল্লা খুব ভাল। খালি হাতে তো যাব না. এখান থেকেই না হয মিষ্টি নিয়ে নাও।'

অমরনাথ মাথা নাডলেন, 'না না। এখানকাব রসগোল্লা লালচে। দিশি গন্ধ। বডলোক কুটুমেব বাডিতে হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায না। মিষ্টি নেব কাঁটালতলা থেকে।'

নৌকোয পাশাপাশি বসতে গিযেও উঠে দাঁড়ালেন অমরনাথ। সিগাবেট ধবানোর নাম কবে খানিকটা সবে গেলেন। রাজবংশী কিছু মহিলা অঞ্জলিব পাশে জায়গা নিল। এখনও এই অঞ্চলে স্বামীস্ত্রী পাশাপাশি নৌকোয় চেপে যাচ্ছে দেখলে অনেকের নজব টাটাবে। কি দবকার। অস্বস্তিটা অঞ্জলিবও হত। অমবনাথ সবে যাওযায় সে গ্রাম্য বাজবংশী মহিলাদের মধ্যে রাজেন্দ্রানীব মত বসে বইল। তিস্তায এখন টান ধবেছে। জল আর ভয় জাগায় না। দুই মাইল চওডা নদী এখন দু শো গজেই শেষ। তাবপব বিশাল চর হয় হেঁটে নয় পক্ষীরাজে চেপে পেরিয়ে যাও। উপায ছিল না বলে পক্ষীরাজে পাশাপাশি বসতে হল তাদেব। যেখানে ছযজন আবামে যেতে পারে সেখানে মানুষ তুলেছে পনেরজন। লম্বা পাদানিতেও দাঁড়িযে যাচ্ছে। শব্দ করছে কানে তালা ধবিযে। সিটগুলোয় গদি নেই। বসতে অস্বস্তি। তার ওপব মানুষের চাপে অমরনাথ দরজাঠাসা করে দিয়েছেন অঞ্জলিকে। স্বামীর শরীরেব সঙ্গে মিশে গিয়েও এক ফোঁটা আবেগেব বদলে একবাশ বিরক্তি আসে তা এব আগে এত ভাল করে বোঝেনি অঞ্জলি। পুবোন আমলের জান্তব গাডি চলার সময় যে পরিমাণ ধুলো ওড়াচ্ছে তাতে ভাবী কুটুমেব বাডিতে পৌঁছাবাব সময কাপডেব অবস্থা কিরকম থাকবে তাই ভেবে উদ্বিগ্ন অঞ্চলি। অমরনাথেব সেই চিন্তা নেই। দেখে মনে হচ্ছে যাওযাটা উপভোগ কবছে যেন।

কাঁটালতলা থেকে দশটাকায় বড বড কুডিটা সন্দেশ কিনে সাইকেল রিক্সায চেপে ওরা যখন হাকিমকপাড়ায় এলেন তখন ঘডিতে বাবোটা। ভেবেছিলেন এগাবোটার মধ্যে পৌঁছে

যাবেন কিন্তু সময়টা এমন যে অচেনা ভদ্রলোকের বাড়িতে যাওয়া অশোভন। শেষ বাস বার্নিশঘাট থেকে সাড়ে চারটায়। অন্তত আড়াইটের সময় শহর থেকে রওনা হতে হবে। বারোটা আর দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভদ্রতার কথা না ভেবে দেখা করবেন বলে ঠিক করলেন অমরনাথ। অঞ্জলি বলল, 'শোন, ভরদুপুরে যাচ্ছি। হয়তো ওঁরা খাওয়ার কথা বলবেন কিন্তু তুমি কিছুতেই রাজি হবে না।'

'আমার কিন্তু এর মধ্যে খিদে পেয়ে গেছে।' অমরনাথ হাসলেন।

'থাক। বলবে ভাত খেয়ে বেরিয়েছি। যাওয়ার সময় ঘাটের হোটেলে খেয়ে নেব না হয়।'

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি বলতেই রিক্সওয়ালা বলেদিল, 'কোন চিন্তা করবেন না বাবু। ঠিক পৌঁছে দেব।'

হাকিমপাড়ায় পৌঁছে একটা পাঁচিল দেখিয়ে রিক্সওয়ালা যখন বলল, 'এসে গেছি, ওইটে হল ওঁর বাড়ি।' দেখে অঞ্জলির চক্ষু চড়কগাছ। বাড়ি কোথায়? শুধু আম কাঁঠাল জামরুলের বন পাঁচিলের এপাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। প্রায় দু শো গজ রাস্তা ঘিরে থাকা পাঁচিলের মাঝখানে এসে ওঁরা গেট দেখতে পেলেন। সাদা গেট বন্ধ। রিক্সাটাকে ওখানেই ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন অমরনাথ। কিন্তু রিক্সাওয়ালা বলল, যে গেট খুলে ভেতরে যাওয়ার অভ্যেস তার আছে। গেটের মুখে শ্বেতপাথরের দুটো ফলক। একটায় লেখা লক্ষ্মীধাম, হাকিমপাড়া। অন্যটায় প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভেতরে ঢোকার পর কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছ দেখতে পেলেন অমরনাথ। বড়লোক বললে কম বলা হবে। প্রতুলবাবুর দাদাকে দেখে মনেই হয়নি তাঁর ভাই এত অবস্থাপন্ন। শুধু টাকা নয়, রুচিও আছে নইলে বাগানটাকে কেউ এত যত্নে সাজায় না। বাড়িটাকে দেখতে পেলেন এবার। একতলা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে একটা গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ অঞ্জলি বলল, 'ঠিক বাড়িতে এসেছি তো?'

অমরনাথ বললেন, 'গেটে তো নাম দেখলে।'

'চল ফিরে যাই। এত বড়লোকের বাড়ি, আমার খুব ভয় করছে।'

'বড়লোক তো বটেই। আমার মত একশোজন লোক কর্মচারী রাখতে পারে।'

'মালিকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করতে যাওয়া ধৃষ্টতা।'

'এসেছি যখন দেখা করেই যাই। এই কথাটাই না হয় বলব।'

রিক্সাওয়ালাকে বসিয়ে রাখলে পয়সা দিতে হবে বেশী। কিন্তু তবু অমরনাথ রাজি হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে কথা শেষ করে যখন বেরুবেন তখন গেট পর্যন্ত এতটা পথ অঞ্জলিকে নিয়ে হেঁটে যেতে খারাপ লাগবে।

ওদের দেখে ধুতি সার্ট পরা কর্মচারী গোছের একটি লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকে চাইছেন?'

'আজ্ঞে, শ্রীযুক্ত প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই আছেন?'

'হ্যাঁ, আছেন। কি প্রয়োজন?'

'আমাদের আসার কথা ছিল। ওঁর দাদা বলে রেখেছেন।'

'উনি তো এখন আহারে বসেছেন।'

'ও। আহার শেষ হলে বলবেন, আমার নাম অমরনাথ মুখোপাধ্যায়।'

কর্মচারীটি ওদের বাঁ দিকের একটা ঘরে বসাল। সেখানে কয়েকটা কাঠের চেয়ার এবং

বেঞ্চি পাতা। লোকটা চলে গেলে অমরনাথ বললেন, 'সত্যি অসময়ে এসে পড়েছি।'

অঞ্জলি ঘরটা দেখছিল। একপাশে টেবিলের ওপর কাগজের স্তূপ। আর একটি টেবিলে একজন বৃদ্ধ একমনে কাজ করছেন। এত বড়লোকের বাড়ির বৈঠকখানা একদম সাজানো নয়। বাগানে দু-তিনটে ঘুঘু একসঙ্গে ডেকে যাচ্ছে।

মিনিট কুড়ি পরে একজন কেউ চিৎকার করে বলতে বলতে এলেন, 'ছি ছি ছি। করেছ কি ? অফিসঘরে বসিয়ে রেখেছ ওঁদের ? মানুষ দেখে চিনতে পার না। খাচ্ছিলাম তো কি হয়েছে! তখনই গিয়ে বললে না কেন ?'

মানুষটি হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দামী পাঞ্জাবি, ধুতি। গোটা ছয়েক আংটি আঙুলে। গায়ের রঙ বেশ কালো। মোটাসোটা, মাথায় ঈষৎ টাক। বিশাল দুটো হাত জোড় করে অমরনাথের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, 'মার্জনা করুন। আমার কর্মচারীটি বুঝতে না পারায় আপনাদের অনাবশ্যক কষ্ট করতে হল। লজ্জায় মরে যাচ্ছি আমি। ছি ছি ছি। আসুন আসুন।'

আপ্যায়নের বহর দেখে অমরনাথ অভিভূত। অঞ্জলি মাথার আঁচল আরও টেনে দিল। প্রায় হাত ধরে প্রতুলবাবু অমরনাথকে নিয়ে এলেন যে ঘরে সেটি অবশ্যই বসবার ঘর এবং বিত্তবান বাড়িওয়ালার সব পরিচয় সেখানে ছড়ানো। অমরনাথের বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রতুলবাবুর অমায়িক আচরণে। বারংবার ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার পর বললেন, 'এখন কোন কথা নয়। আপনারা হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া-দাওয়া করুন তারপর আলাপ করব।'

অমরনাথের শক্তি সঞ্চয় করতে হল কথা বলতে, 'আজ্ঞে, আমরা খাওয়া-দাওয়া করে এসেছি।'

'অ্যাঁ। সেকি ? না, না। এ আপনার ঠিক করেননি। অতিথি নারায়ণ। নারায়ণের সেবা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন ? পাপ হবে যে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে ? আমার গৃহিণী আপনার সঙ্গে আলাপ করবেন বলে ব্যস্ত হয়েছেন শোনা মাত্র।'

অঞ্জলি কি করবে বুঝতে না পেরে অমরনাথের দিকে তাকাল। প্রতুলবাবু সেটা লক্ষ করেই বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে। ভেতরের ভার যাঁর ওপর তাঁকেই ডেকে আনাচ্ছি। আসলে এখনও আমরা কয়েকটা পুরনো নিয়ম মেনে চলি; বাড়ির মেয়েরা চট করে পরপুরুষের সামনে বেরুতে চান না। অবশ্য আপনাকে পরপুরুষ তো বলা যাবে না। আজ বাদে কাল আমরা তো আত্মীয় হয়ে যাচ্ছি।' প্রতুলবাবু ব্যস্ত ভঙ্গীতেই ভেতরে চলে গেলেন।

অমরনাথ এবার কথা বলার শক্তি ফিরে পেলেন, 'কি অমায়িক ব্যবহার দেখেছ!'

অঞ্জলি কিছু বলল না। নিজেকে নিয়েই যেন সে বিব্রত হচ্ছিল। যে সোফায় বসেছে তা যেন শরীরটাকে ভেতরে টানছে। এত বৈভবের মধ্যে কিছুক্ষণ থাকলেই অস্বস্তি হয়। দীপা কি এদের সঙ্গে মানিয়ে থাকতে পারবে ?

অমরনাথ আবার বললেন নিচু গলায়, 'কি করা যায় বল তো ? খাওয়ার কথা বলছেন, না খেলে দুঃখ পাবেন—'

'আমি আজ খাব না।' চাপা গলায় অঞ্জলি বলল।

সেই সময় ফিরে এলেন প্রতুলবাবু, 'আসছেন তিনি। আপনার সামনে আসতে হবে বলে সাজতে বসে গেছেন। মেয়েমানুষের যা হয়। আহা, আপনি আবার কিছু মনে করবেন না।'

প্রতুলবাবু বসলেন আরাম করে। এবার অমরনাথ বললেন, 'আপনারা তো এখনও মেয়েকে দ্যাখেননি, চোখে দেখে কথা বলে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা নিয়েও ভাবতে হবে

তো।'

'আপনার মেয়ের বয়স কত ?'

'আজ্ঞে এগার হয়ে গেছে।'

অঞ্জলি চাপা গলায় বলল, 'এগাব বছর পনেরদিন।'

'গুড। চোখ মুখ ,?' প্রতুলবাবু হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন।

অমরনাথ জবাব দিলেন, 'পাঁচজনে তো ভালই বলে।'

'গায়ের রঙ ?'

'ধবধবে ফর্সা নয়, উজ্জ্বল বর্ণ বলতে পারেন।'

'হয়ে গেল। দেখুন অমরনাথবাবু, আমার দাদাকে আমি চিনি। নিজের ব্যাপারে উদাসীন কিন্তু অন্যের ব্যাপারে পান থেকে চুন খসবে না। বছর খানেক আগে ওঁকে বলেছিলাম যে ঘরে গৌরী আনব। এতদিন কিছু বলেননি। হঠাৎ চা-বাগান থেকে ঘুরে এসে বললেন, প্রতুল, তোর ছেলের বউকে দেখে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি লোক পাঠালাম। সে ঘুরে এসে বলল ডানাকাটা নয় তবে ভারী মিষ্টি মেয়ে। আর কি দরকার বলুন ?'

অমরনাথ বললেন, 'তবু আপনারা নিজেরা চোখে না দেখে— ।'

'দেখব। যদি তাতে আপনারা শান্তি পান তাহলে দেখতে আপত্তি কি ' আমি মশাই ব্যবসায়ী মানুষ। সব তো চোখে দেখা যায় না, কানেও দেখতে হয়। সেই দেখাটা যাতে ভুল না হয় তাই দুবার যাচাই করে নিই। তবু যখন বলছেন— ।'

অমরনাথ এবাব কথাটা বলেই ফেললেন, 'প্রতুলবাবু, আমি সামান্য চাকবি করি। ভাত কাপড়ের অভাব হয় না বটে কিন্তু— ! আপনার তুলনায় আমার অবস্থা, তুলনা কবাই যায় না। এই অসম অবস্থায় সম্পর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুনেছিলাম আপনি ব্যবসা করেন কিন্তু চোখে দেখার পর— ।'

হো হো কবে হেসে উঠলেন প্রতুলবাবু। যেন এমন মজাব কথা খুব কম শুনেছেন। তারপব গাঢ় গলায় বললেন, 'আবে মশাই, টাকা পয়সা বিষয় সম্পত্তি এই আছে এই নেই। কিন্তু মনুষ্যত্ব ভদ্রতা আন্তরিকতা এসবের মৃত্যু নেই। মানুষকে এই জন্যেই মানুষ মনে বাখে। আর এগুলো তো টাকা পয়সা থাকা না থাকার ওপরে নির্ভর করে না।'

এইসময় ভিতরের দরজার বাইবে শব্দ বাজল চুড়িব। প্রতুলাবু বললেন, 'এসো।'

যে মহিলা ঘরে এলেন তাঁর বয়স বোঝা যাচ্ছে না। ঘোমটা কপালের ওপর। শাড়ি দেখেই অবাক হয়ে গেল অঞ্জলি। বাড়িতে যে শাড়ি ইনি পরেছেন তার অর্ধেক দামের শাড়ি পরে এসেছে সে। দুটো হাত ভর্তি সোনার চুড়ি, আঙুলেব হীরের আঙটি থেকে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তবে মহিলার গায়ের রঙ কালো। মোটাসোটা চেহাবায় গিন্নীভাবটি স্পষ্ট। অমরনাথ নমস্কার করছে দেখে অঞ্জলিও করল। মহিলা বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়েব ছবি আছে সঙ্গে ? দেখার বড় ইচ্ছে হচ্ছে।'

অমরনাথ উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে গিয়েও সামলে নিলেন, 'না মানে, এখনকার ছবি তোলা হয়নি তাড়াহুড়োয়। তবে বছর খানেক আগে ওদের তিনজনের ছবি তুলেছিলাম আমি। পকেট থেকে একটা হাফ সাইজের ফটোগ্রাফ বের কবলেন তিনি। ক্যামেরা কেনার পর বই পড়ে পড়ে ডার্করুমের কাজ শিখে ছবির প্রিন্ট বের করেছেন বাড়িতেই। নেহাতই শখ ছিল। কিন্তু খরচের জন্যে সেই শখ আপাতত ঘুচেছে। ছবির প্রিন্ট খুব উচ্চ মানের নয়। প্রতুলবাবু তাই মনোযোগ দিয়ে দেখলেন তারপর স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিলেন। প্রতুলবাবুর স্ত্রী ছবি দেখে বলে উঠলেন, 'ওমা, এ তো দেখছি গায়ের রঙ কালো !'

অমরনাথ তড়িঘড়ি জবাব দিলেন, 'না, না। প্রিন্টের দোষে এমন হয়েছে। দুধে আলতা নয় তবে মেয়েকে কালো বলবে না কেউ।'

প্রতুলবাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মাথায় চুল আছে তো?'

প্রশ্নটা অঞ্জলির উদ্দেশ্যে তাই সে কোনমতে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

প্রতুলবাবুর যেন মনে পড়ে গেল, 'ও হ্যাঁ, আর একটা চাহিদা আছে আমাদের, মেয়েকে লক্ষ্মীময়ী হতে হবে। যা বলব শুনবে। দস্যিপনা চলবে না। অবাধ্যতা আমি সহ্য করতে পারি না। মেয়ের মত থাকবে, বুকে করে রাখব।'

অমরনাথ বললেন, 'ছেলেমানুষ তো, তবে বিয়ের পর নিশ্চয়ই যা চাইবেন তা করবে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'শোন, এঁরা চাইছেন আমি মেয়েকে একবার চোখে দেখি। দাদা দেখার পর আর আমার দেখার কি দরকার তাই এঁদের বোঝাতে পারছি না।'

অমরনাথ বললেন, 'আর একটা কথা, বিয়েতে কি দিতে হবে?'

প্রতুলবাবু সোজা হয়ে বসলেন, 'আরে মশাই, বাড়িতে এসে আমাকে অপমান করবেন না। আপনি কি দেবেন সেটা আমি ঠিক করব? আমি কি ভিক্ষুক যে আপনার কাছ থেকে দান গ্রহণ করব? আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী যা পারবেন তাই দেবেন। শাঁখা সিঁদুরটা অবশ্য চাই।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'আমার সাধ্যমত সব দেব তবে সেটা আপনার সম্মানের তুলনায় অতি অল্প।'

প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন, 'সে আমি বুঝব। হ্যাঁ, বিয়েটা হবে কিন্তু আপনার চা-বাগানে। জলপাইগুড়ি থেকে যাবা যাবে তারা সেইরাত্রে ফিরে আসবে। যদি তিস্তার ফেরি বন্ধ হয়ে যায় সেবক হয়ে ঘুরে আসবে। আমি বাসি বিয়ে এ বাড়িতেই করব।'

'সেকি!' অঞ্জলির মুখ ফসকে বেরিয়ে এল।

'কিছু মনে করবেন না। আমাদের পরিবারে এই বাসি বিয়ের সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। পাত্র ফিরে এসেছিল কনেকে দাহ করে।'

'কিন্তু হরিদাসদার মেয়ের বাসি বিয়ে তো ওভাবে হয়নি।'

'ও, আপনি জানেন না যিনি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি আমার মামাতো ভাই। নিজের ভাই-এর চেয়ে যদিও অনেক কাছের তবে বংশ তো এক নয়।' প্রতুলবাবু হাসলেন, 'এটা অবশ্য এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বিয়ের পরেই সিঁদুর পরিয়ে দিলেই চলবে। বরযাত্রী বেশী হবে না। এসব পরে আলোচনা করা যাবে।'

অমরনাথ বললেন, 'আমার মেয়ের বড় পড়াশুনার শখ।'

'বেশ তো। তাকে এখানে সংসারের কাজ করতে হচ্ছে না। গাড়ি করে গার্লস স্কুলে যাবে। আমি যা ডোনেশন দিই তাতে বছরের যে-কোন সময়ে ভর্তি করে নেবে। অবশ্য আমার কথা যদি বলেন তাহলে বলব, মেয়েছেলে বেশী পড়াশুনা করুক তা আমি চাই না। তাতে সংসারে শান্তি থাকে না। আপনি যখন বলছেন, তখন না হয়—।'

অমরনাথ মিষ্টির প্যাকেটটা কিন্তু কিন্তু করে তুলে ধরলেন।

প্রতুলবাবু স্ত্রীকে বললেন, 'নাও নাও ভালবাসার দান নিতে হয়।'

প্রতুলবাবুর স্ত্রী সেটি নিয়ে অঞ্জলিকে বললেন 'আপনি একটু আসবেন?'

অঞ্জলি উঠলে তিনি পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু ঘরের সংখ্যা অনেক। যে ঘরে ওকে বসতে বলা হল সেটি সাধারণ। একটা তক্তাপোশের ওপর বিছানা পাতা। আলনায় অনেকগুলো শাড়ি ঝুলছে। মিষ্টির প্যাকেট

কাজের মেয়ের হাতে দিয়ে কিছু নির্দেশ দিলেন প্রতুলবাবুর স্ত্রী। তারপর ফিরে এসে অঞ্জলির মুখোমুখি বসলেন।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলে কোথায় ?'

'ঘুমাচ্ছে। পড়াশুনা না থাকলেই ঘুমোয় পড়ে পড়ে। আমার তো ওই একটাই আপনার শুনেছি তিনটে। ওনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পরেরটা নষ্ট হয়ে যেতে আর হয়নি। বাড়িতে মেয়ে বলতে আমি একা, খুব খারাপ লাগে।'

অঞ্জলি বলে ফেলল, 'দেখুন দিদি, মেয়ের বিয়ে দেব বলে ভাবিনি এখন। সম্বন্ধটা আসতে সব এলোমেলো হয়ে গেল। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোন তুলনাই হয় না। আমার ভয় এখানেই। মানিয়ে নেওয়া যদি মুশকিল হয়— !'

প্রতুলবাবুর স্ত্রী হাসলেন, 'এঁদের ধরণটাই এই। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের স্কুলেব মাস্টার। অবস্থা বুঝতেই পারছেন। এঁরা কিছুতেই সমান ঘব থেকে মেয়ে আনে না।'

'ওমা, কেন ?'

'কি জানি বাবা। হয় তো যে মেয়ে আসবে সে বেশ সঙ্কোচে থাকবে তাই এঁবা চায়। আজকালকার মেয়েরা ডানা উঠলে বিয়ে করে। সমান ঘব হলে সে পোষ মানবে কেন ? একটা কথা জিজ্ঞাসা কবতে আপনাকে ডেকে আনলাম। মেয়ের কি ঋতু হতে দেরি আছে ?'

অঞ্জলির মুখে রক্ত জমল। সে ঘাড নাডল, 'না। এই কালী পুজোব আগেব বাত্রে প্রথম হল।'

প্রতুলবাবুব স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, 'ওইটে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন উনি।'

অঞ্জলিব মনে পড়ল ভদ্রমহিলা যখন তাকে ভেতরে আসতে বলছিলেন তখন প্রতুলবাবু তাঁকে কিছু ইশারায় বলছিলেন। সম্ভবত এটিই জানতে বলেছেন।

অঞ্জলি বলল, 'আমার তো আর আসা সম্ভব হবে না। একবাব ছেলেকে দেখা যাবে না ?'

প্রতুলবাবুব স্ত্রী একটু ভাবলেন। তারপর উঠে দরজাব দিকে যেতে যেতে বললেন, 'বড লাজুক দেখি আসতে চায় কি না।'

তিনি বেরিয়ে গেলে অঞ্জলি একা বসে ছিল। এইসময় কাজেব মেয়েটি এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে ফিরল। অঞ্জলি দেখল তাঁদের আনা মিষ্টি প্লেটে নেই। সে মাথা নাডল, 'এত মিষ্টি আমি খেতে পারব না ভাই। আমি বরং একটা তুলে নিচ্ছি।'

কাজেব মেয়েটি বয়স্কা। সে মাথা নাডল, 'তা কি হয। এত বড কুটুম হতে যাচ্ছেন— ।'

অঞ্জলি হাসল, 'এখনও তো হইনি।'

মেয়েটি এপাশ ওপাশ তাকিয়ে বলল, 'না হলেই কি নয় !' বলে প্লেট নামিয়ে বেখে চলে গেল ঘর ছেড়ে। অঞ্জলি হতভম্ব। মেয়েটি কথাগুলো বলেছিল চাপা গলায়। এবং বলার সময় একটা ঝাঁঝ চাপা ছিল না। বুকের মধ্যে দুম করে লাগল যেন। একি কথা ! মেয়েটা কি কোন ব্যাপারে তাকে সাবধান করে দিচ্ছে ? এইসময় প্রতুলবাবুর স্ত্রী ফিবে এলেন, 'লজ্জায় মরে যাচ্ছে। ছেলে না হয়ে মেয়ে হওয়া উচিত ছিল। আসছে।' তারপরেই প্লেটের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওমা, সব যে পড়ে রয়েছে। খেয়ে নিন।'

অঞ্জলি হাতজোড করল, 'খেয়ে এসেছিলাম। এখনও পেট ভারী। আমি একটা তুলে নিচ্ছি।' মনের ভেতর সদ্য ঢোকা কাঁটাটাকে কিছুতেই সরাতে পারছিল না সে। মিষ্টিটা

দাঁতে কেটে জিজ্ঞাসা করল, 'আজকাল তো এই বয়সে কেউ ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেয় না। আপনারা কেন স্থির করলেন ?'

প্রতুলবাবুর স্ত্রী বললেন, 'ওই যে বললাম একা থাকি। উনি কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করছেন, ব্যবসার কাজে প্রায়ই বাইরে থাকেন, আমি কি করি তখন ? ঘরে তাই বাচ্চা মেয়ে আনতে চাইছি যার সঙ্গে খুনসুটি করে বেশ সময় কেটে যাবে।' এইসময় সেই কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাইরে বেযাই মশাই বসে আছেন, তাঁকে খাবার পাঠিয়েছিস ?'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল, 'প্লেট এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।'

'খোকাকে একটু তাড়া দে। বল আমরা বসে আছি।'

কাজের মেয়েটি চলে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল অঞ্জলির অমরনাথের ওপর। এমন পেটুক হবে কেন মানুষ। বারংবার বলে দেওয়া সত্ত্বেও প্রথমদিনেই ভরা প্লেট খালি করে দিল। কি ভাবে বলল মেয়েটা! যেন একটা ভিখিরীকে খাবার দেওয়া হয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটি বুঝি অনেক দিন ধরে আছে এখানে ?'

'কে ? ও, আনা! হ্যাঁ, খোকার জন্মের আগে থেকে আছে। কেন, কিছু বলেছে নাকি ?'

'না, না। এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।'

এইসময় দরজায় একটি তরুণ এসে দাঁড়াল। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রঙ শ্যামলা, মুখটি মিষ্টি, চোখ দুটি বড় বড় কিন্তু বড় রোগা, বেশী মাত্রায় রোগা। চোখে একটু বিস্ময়।

প্রতুলবাবুর স্ত্রী বললেন, 'এই আমার ছেলে।'

অঞ্জলি দেখল ছেলেটি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। এ যদি জামাই হয় তাহলে কেমন লাগবে তা সে বুঝতে পারছিল না। জামাই না ভেবে ছেলে ভাবলেই আরাম লাগত। সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নামটা যেন কি ?'

'অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়।' মেয়েদের মত গলার স্বর, মোলায়েম, সরু।

প্রতুলবাবুর স্ত্রী বললেন, 'যাও, ঘুমাও গিয়ে। দেখা হয়ে গিয়েছে।' ছেলেটি আবার ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল। এবার তিনি অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বড় অভিমানী। মেয়েকে বুঝিয়ে দেবেন। কেমন লাগল ?'

'বড় রোগা।' সত্যি কথাটা বলেই ফেলল অঞ্জলি।

'বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের পরেই দেখবেন আর চেনা যাচ্ছে না। আমি যখন এ বাড়িতে এসেছিলাম তখন হাওয়ার ধাক্কায় পড়ে যেতাম। আর এখন দেখুন, তিনটে বাঘেও খেতে পারবে না। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না।'

ব্যানার্জি বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে ওরা যখন রিক্সায় চেপে ঘাটের দিকে এগোচ্ছে তখনও অঞ্জলির মাথায় কাজের মেয়েটির কথা ছোবল মারছে। অমরনাথ বললেন, 'বেলা পড়তে বেশী দেরি নেই। তুমি কি কিছু খাবে ?'

সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল অঞ্জলি, 'তোমার লজ্জা বলে কিছু নেই ? এত করে বললাম তবু গণ্ডেপিণ্ডে খেলে ?'

অমরনাথ বললেন, 'প্রতুলবাবু যে জোর করে খাওয়ালেন। বড়লোক কিন্তু মানুষ খুব ভাল। একটুও অহঙ্কার নেই। প্রথম যে অস্বস্তি ছিল সেটা কেটে গেল। দীপা এখানে এলে সুখী হবে, বুঝলে। আহা খেয়েছি বলে রাগ করছ কেন ?'

'আসল কথাটা বললে কি রূপ ধরবেন তা কে জানে ?'

'বলেছি।' অমরনাথ হাসিমুখে বললেন।

'বলেছ ?' অঞ্জলি সন্দেহের চোখে তাকাল।
'হুঁ। শুনে বললেন, এ কোন সমস্যাই নয়। সীতা কার মেয়ে ? না দশরথের।'

॥ ৮ ॥

প্রথম দিন জল পর্যন্ত ছুঁয়ে দ্যাখেনি মেয়ে, খাবার তো দূরের কথা। কেঁদে কেটে গলা ভেঙেছে। তখন বাড়িতে ঢুকলে মনে হত সদ্য কারো বিয়োগ ঘটেছে। এখন চুপচাপ। বলা যায় বেশী রকমের চুপচাপ। একমাত্র প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মনোরমার ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছে না সে। ক্ষুদে দুটো কথা বলতে চেষ্টা করে ফিরে এসেছে। স্কুল তো একদম বন্ধ। এমন কি অঞ্জলিরও মনে হচ্ছিল হয়তো ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলেই চলত। মনোরমা বলেছেন, 'একটু বাদলা হয়েছে বলে কি রোদ উঠবে না ? ওসবে নজর দিও না। মেয়েছেলের গতি স্বামীর ঘরে না গেলে হয় না। বাড়ি ঘরদোর ভাল, অবস্থাপন্ন, ছেলেটিও মিষ্টি চেহারার, বিয়ের সাতদিন পরে দেখবে এসব ওর মনেই থাকবে না।'

অমরনাথ কিন্তু বাড়িতে ফিরেই গোঁজ হয়ে থাকেন। পাঁচজনে তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে ছাড়ছে না যে তিনি দায় নামাচ্ছেন কাঁধ থেকে। এমন কি সত্যসাধনবাবু খবরটা শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে অমরনাথের নিজেরই খুব খারাপ লাগছিল। জবাবদিহি দেবার ভঙ্গীতে বলেছিলেন, 'হঠাৎই সম্বন্ধটা এসে গেল। ওরা খুব চাইছে—।'

সত্যসাধনবাবু বললেন, 'অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। সেই কবে বিদ্যাসাগর মশায় আন্দোলন করছিলেন বাল্যবিবাহ বন্ধ যাতে হয় তার লাইগ্যা। কি লাভ হইল ! আপনার মত শিক্ষিত মানুষ যদি না বোঝেন—, ঘোরতর অন্যায়। আমার দুঃখ কি জানেন, এখানে ভাল ছাত্রছাত্রী পাই না, এই মেয়েটার মধ্যে পসিবিলিটি ছিল, আপনারা সেইডা শ্যাষ কইর‍্যা দিলেন। এখনও তো সে চঞ্চল, বুদ্ধিসুদ্ধি পোলাপানের মত—।'

অমরনাথ বললেন, 'না না যা ভাবছেন তা নয়। ওর পড়াশুনা বন্ধ হবে না। প্রতুলবাবু, মানে ছেলের বাবা, আমাকে কথা দিয়েছেন যে ওকে পড়ার সুযোগ করে দেবেন।'

'দ্যাখেন !' নিঃশ্বাস ফেললেন সত্যসাধন।

'আপনার একমাসের মাইনেটা—।'

'না না না। মাস তো পূর্ণ হয় নাই। টাকা আমার লাগব না। শুধু একবার দীপারে একটু দেইখতে পাইলে খুশী হইতাম।'

অমরনাথ উঠে ভেতরে এলেন। অঞ্জলি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। মুখোমুখি হতেই অমরনাথ বললেন, 'দীপাকে একবার বাইরের ঘরে আসতে বল।'

'ও আসবে না। মাস্টারমশাই এসেছেন শুনে আমি ওকে ডেকেছিলাম—।'

'ভাল করে বুঝিয়ে বল। উনি দেখতে চাইছেন।'

'না শুনলে আমি কি টেনে আনব। আমি জানতাম লোকে আমাদের দোষ দেবে।'

অঞ্জলি চলে যেতেই অমরনাথ ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। একটু বিব্রত গলায় বললেন, 'মাস্টারমশাই, মেয়েটা খুব অভিমানী। হয়তো আপনার সামনে এখন আসতে লজ্জাও পাচ্ছে। পরে একসময়—। অবশ্য বিয়ের দিন তো আপনি আসছেনই !'

'না, না, আমারে আপনি নিমন্ত্রণ কইরেন না। আমি এই বিয়ায় আইতে পারুম না। সে

যখন আইতে চায় না আমিই যাই চলেন। যাওয়ার আগে দেখা হইব না এ কেমন কথা।'

সত্যসাধনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। অগত্যা অমরনাথ তাঁকে পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে এলেন। এখন লোকটার ওপর রাগ হচ্ছিল তাঁর। ব্যাপারটা নিয়ে যেন বাড়াবাড়ি করছেন খামোকা। মনোরমার দরজার সামনে এসে তিনি বললেন, 'ওই ঘরটি আমার মায়ের। ওখানেই আছে সে।'

ঘরের দরজা আধা ভেজানো। সত্যসাধন সেখানে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'দীপা, ও দীপা মা!'

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। সত্যসাধন মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মা ঘরে নাই তো?'

বারান্দা থেকে মনোরমার গলা ভেসে এল, 'না। ও একাই আছে।'

সত্যসাধন চাপ দিতেই দরজাটা খুলে গেল। তিনি এক পা ভেতরে গিয়ে বললেন, 'কেমন আছ মা? শুনলাম তুমি আমাদের ছাইড়্যা জলপাইগুড়ি যাইবা। আর তো দেখা হইব না। তাই কই, সুযোগ পাইলে মন দিয়া পড়াশুনা করবা।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র তীরের মত ছুটে এল দীপা খাট ছেড়ে। দুহাতে সত্যসাধনকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

অমরনাথ দৃশ্যটি দেখলেন। তাঁর বুক টনটন করতে লাগল। এই কান্নাটা দীপা যদি তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদত তাহলে কি করতেন তিনি জানেন না। কিন্তু এখন সত্যসাধনবাবুকে তিনি ঈর্ষা করতে লাগলেন।

চিৎকার করতে করতে দীপা বলছিল, 'ও মাস্টারমশাই, আমি পড়ব, আমি বিয়ে করব না, আপনি বাবাকে বলুন, আমি সমস্ত মুখ কথা শুনব, দেখবেন ঠিক ফার্স্ট ডিভিসন পাব, ও মাস্টারমশাই।' চোখের জল দীপার সমস্ত মুখ সপসপে।

সত্যসাধনকে খুব অসহায় দেখাল। তাঁর লংক্লথের পাঞ্জাবি ভিজে গেছে চোখের জলে। তিনি কথা বলতে চাইলেন। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল, 'আমি কে মা? আমি তো কেউ না। আমি শুধু তোমারে কই পড়াশুনা ছাড়বা না। যে যাই বলুক এইটা মনে রাখবা।'

কোনমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যসাধনবাবু হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। অমরনাথ তাঁর পেছন পেছন এসেও ধরতে পারলেন না। মানুষটিকে যেন ভূতে তাড়া করেছে এমনভাবে মাঠের ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

মন খারাপ হয়ে গেল অমরনাথের। আজ শ্যামল পর্যন্ত তাঁকে বলেছে, 'কাকাবাবু, বাবা সম্বন্ধ এনেছেন ঠিক কিন্তু আপনি রাজি না হলেই পারতেন। দীপা তো নেহাৎই বাচ্চা।'

'তোমার বাবা যদি সম্বন্ধ না আনতেন তাহলে কথাই উঠত না শ্যামল।'

'তা ঠিক। আজ বড় সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বলেছেন ছয়মাসের জন্যে তিনি আমাকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ দেবেন। সেই সময় বড়বাবু সেখানে ছিলেন। হঠাৎ আপনার কথা উঠল। দীপার ব্যাপারটা দেখলাম সাহেব শুনেছেন। উনিও খুব বিরক্ত দেখলাম।' শ্যামল আগ বাড়িয়ে এসব কথা বলে গেল। আজ অবশ্য বড় সাহেবের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। যদিও কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে বড় সাহেবের কিছু বলার অধিকার নেই কিন্তু তিনি কথা তুললে তাঁর ভাল লাগবে না। বাইরের ঘরে বসে তিনি অঞ্জলিকে ডাকলেন, 'মাকে নিয়ে এ ঘরে এসো। একটু কথা বলব।'

অঞ্জলি অবাক হল, 'কি ব্যাপার?'

'যা বলছি তাই কর।' গম্ভীর গলায় বললেন অমরনাথ।

মনোরমা এলেন। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অমরনাথ। মনোরমা বসলে তিনি বললেন, 'মা, ব্যাপারটা এমন হয়ে যাচ্ছে যেন আমরা খুব খারাপলোক। ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে চাই।'

মনোরমা বললেন, 'এ কথা মনে হচ্ছে কেন ?'

'পাঁচজনে তাই বলছে। আব আমারও খুব ভাল লাগছে না।' অমরনাথ মুখ নামালেন।

মনোরমা অঞ্জলির দিকে তাকালেন। সে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'তোমার ?'

অঞ্জলি জবাব দিল না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনোরমা বললেন, 'তাহলে বিয়ে ভেঙ্গে দাও।'

কেউ কোন কথা বলল না। অমরনাথ শেষ পর্যন্ত বললেন, 'মুশকিল হল প্রতুলবাবু বিয়ের দিন পর্যন্ত ঠিক করেছেন। এই অবস্থায় বিয়ে ভেঙে দিতে একটা যুক্তি দেখাতে হবে।'

মনোরমা হঠাৎ উষ্ণ গলায় বললেন, 'তোমাদেব আক্কেল দেখে মাথা গরম হয়ে যায়। তোমার বিপদে তো কেউ ঝাঁপিয়ে পড়বে না। এখন যাবা ফুট কাটছে তারা কেউ পরে তোমার মেয়ের বিয়ে দিতে আসবে না। কে কি বলছে তাতে তোমাদের কি, মেয়েটাব খারাপ হবে এমন কাজ তো তোমরা কবছ না।'

'সবাই বলছে এই বয়সে বিয়ে দিলে ভাল হয় না।'

'কিসের ভাল ? ধিঙ্গি করে কোনমতে একটা পাত্র জুটিয়ে বিয়ে দেওযাব পব মেয়ে যে সেখানে শান্তিতে সংসার করতে পারবে এমন কথা জোব গলায় কেউ বলতে পারে ? জন্ম মৃত্যু বিবাহ নিয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী উচ্চাবণ কবা যায় না অমব। ওব কপালে যেখানে লেখা আছে সেখানেই বিয়ে হবে। মেয়েটা কান্নাকাটি কবছে, আবে বাবা কোন মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আগে পা ছড়িয়ে কাঁদে না ?' মনোরমাব গলায় বিবক্তি স্পষ্ট।

অঞ্জলি বলল, 'মা ঠিকই বলেছেন। কে কি বলছে তা নিয়ে ভেবে কিছু লাভ নেই। তবে আমরা একটা কাজ করতে পাবি। তুমি আর একবাব প্রতুলবাবুব কাছে যাও। গিয়ে বল, কথাবার্তা সব পাকা হয়ে রইল, ইচ্ছে করলে তিনি মেয়েকে আশীর্বাদও কবে বাখতে পারেন। এর মধ্যে ও একটু বড হোক, মানে স্কুল ফাইন্যালটা পাশ করে নিক তাবপব অনুষ্ঠান কবা যাবে। এর জন্যে তো আর এক যুগ অপেক্ষা করতে হবে না।'

মনোরমা বললেন, 'তা যদি ওঁরা অপেক্ষা করতে পাবেন ভাল কথা। তবে বাপু আমাব একটা ব্যাপারে কেমন খটকা লাগছে। লোকে গাই গরু পর্যন্ত যাচাই করে কেনে, ওঁবা এসে একবার মেয়ের মুখও দেখলেন না। খোঁড়া বোবা তো হতে পাবত।'

অমরনাথ বললেন, 'প্রতুলবাবু লোক পাঠিয়ে দীপাকে দেখেছেন।'

'নিজের চোখে তো দ্যাখেননি। তোর ছেলের বিয়েব সময় এমন করবি ?'

'বড়লোকদের ব্যাপার আমি ঠিক বুঝি না।'

'ওইখানেই ভয়। আজ মত হয়েছে, মিষ্টি কথা কয়েছে, দু তিন বছব অপেক্ষার পব দেখলে বেমত হয়ে গেল। তখন তাঁরা সরে দাঁড়ালে মেয়ের নামে দুর্নাম ছড়[illegible]। একবার বাগ্‌দত্তা মেয়ের অন্য কোথাও বিয়ে হওয়া মুশকিল। যা ভাল বোঝ কব।'

মুখোমুখি কথা না বলে লোক মারফত চিঠি পাঠালেন অমরনাথ। সবিনয়ে সমস্ত ব্যাপারটা জানিয়ে প্রস্তাব রেখেছিলেন কয়েক বছর অপেক্ষা করার। পত্রবাহককে বসিয়ে

তৎক্ষণাৎ উত্তর লিখেছিলেন প্রতুলবাবু। অমরনাথের অসুবিধে তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু সেই কারণে তাঁর নিজস্ব ভাবনার পরিবর্তন করার কোন কারণ তিনি দেখছেন না। এই অবস্থায় যদি অমবনাথ অপারগ হন তাহলে তিনি দুঃখিত হবেন কিন্তু সিদ্ধান্ত বদল করবেন না। পুত্রের বিবাহ তিনি এখনই অন্যত্র দিতে দ্বিধা করবেন না।

তার পরের দিনই ফ্যাক্টরিতে হরিদাসবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। হরিদাসবাবুর বেয়াই জলপাইগুড়ি থেকে আজ সকালে লোক পাঠিয়েছিলেন। হরিদাসবাবু বললেন, 'একি শুনছি অমবনাথ? লোকে কি বলছে তাই বড় হল আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ দেখলে না। ও বাড়িতে বিয়ে হলে বাজরাণী হয়ে থাকবে সে। কি বিশাল বাড়ি। পাঁচিল পেরিয়ে ঢুকতেই ভয় হয়। একমাত্র ছেলে, যা কিছু বিষয় সম্পত্তি সবই তো তোমার মেয়ে পাবে।'

প্রতুলবাবুর উত্তর পাওয়াব পব মুষড়ে গিয়েছিলেন অমরনাথ। তিনি মাথা চুলকাতে লাগলেন।

হবিদাসবাবু বললেন, 'আর পাঁচ ছয় বছর পরে কেউ এ নিয়ে কথা তুলবে। আজ যাবা বলছে তাদের হিংসেতে বুক ফেটে যাচ্ছে বলেই বলছে। তুমি সম্মতি দাও।'

অমবনাথ বললেন, 'বেশ, আপনি আমার হয়ে যোগাযোগ করুন। আমাব আপত্তি নেই। তবে ওঁবা এসে মেয়েকে দেখে যাক আগে। বিয়েটা ঠিক বিয়েব মত হোক।'

অস্টিন গাড়িতে চেপে প্রতুলবাবু এলেন একা। তাঁকে বাইরের ঘরে সমাদর কবে বসানো হল। হরিদাসবাবুও ছিলেন। প্রতুলবাবু বললেন, 'এ ঘবের জিনিস ও ঘরে যাচ্ছে। তাই নিয়ে এত চিন্তা করাব কি আছে? তাছাড়া হিল্লি দিল্লীব ব্যাপার নয়, এখান থেকে ওখানে।'

অমরনাথ জিজ্ঞাসা কর্লেন, 'আপনাব স্ত্রীকে নিয়ে এলেন না?'

'নাঃ। এতদিন ঘব কবছি, আমাব রুচির ওপব যদি তাঁর আস্থা না থাকে তাহলে আর অর্ধাঙ্গিনী হবেন কি করে! আমিও দেখতে চাইতাম না, আপনি জোর করলেন, তাই। নিয়ে আসুন মেয়েকে। চটপট সেরে নি।'

'একটু বিশ্রাম করুন। খাওযা দাওযা হোক, তারপর—।'

'না মশাই। খাওয়া-দাওযা চলবে না। আপনারা আমাব বাড়িতে গিয়ে কিছু খাননি। মিষ্টিমুখ কবা খাওয়া নয়। আমিও তাই আজ ওই একই ব্যবহার করব। আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ কিন্তু একটি খাব।'

অমরনাথ বিষণ্ণ হলেন। তিনি বুঝলেন প্রতুলবাবুকে পীড়াপীড়ি করে কোন লাভ হবে না। অতএব ঘর ছেড়ে ভেতবে এলেন। অঞ্জলি আব মনোরমা চুপচাপ খাটে বসেছিলেন। সব কথাই তাঁদের কানে আসছে। অমরনাথ বললেন, 'ওকে নিয়ে এস।'

অঞ্জলি বলল, 'জোর কবে সাজিযে দিয়েছি কিন্তু উঠতে চাইছে না।'

অমরনাথ বড় বড় পা ফেলে মনোরমার ঘরের দরজায় এলেন। দরজা খোলা। অমবনাথ গম্ভীব গলায ডাকলেন, 'দীপা, এদিকে এস।'

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন তিনি। তারপর দরজায় পৌঁছে গলা তুললেন, 'কথা কানে যাচ্ছে?'

মনোরমার খাটে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল সে এবার চোখ না তুলেই ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দরজা থেকে সামান্য সরে দাঁড়িয়ে অমরনাথ বললেন, 'উনি যা যা জিজ্ঞাসা করবেন ভালভাবে জবাব দেবে। ভয়ের কিছু নেই। মুখ বন্ধ করে যেন থেকো না।'

মেয়ে সামনে হাঁটছে, অমরনাথ পেছনে। শোওয়ার ঘরে পৌঁছে অমরনাথ বললেন, 'তোমরা কেউ সঙ্গে এস।'

অঞ্জলির যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। এর মধ্যেই চুল নষ্ট করেছে মেয়ে ; সে দ্রুত ঠিক করে দিচ্ছিল,

মনোরমা বললেন, 'তুমিই যাও বউমা।'

অমরনাথ ফিরে এলেন বাইরের ঘরে। প্রতুলবাবু কিছু বলতে যাচ্ছিলেন দরজায় অঞ্জলিকে দেখে চুপ করে গেলেন।

হরিদাসবাবু বললেন, 'এসো বউমা। কোথায় সে ? এসো, সামনে এসো।'

মাটিতে চোখ রেখে দীপা সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রতুলবাবু প্রায় সেকেণ্ড বিশেক চুপচাপ দেখে গেলেন। তারপর গলার স্বর নরম করার চেষ্টা করলেন, 'নাম কি তোমার ?'

দীপার নিজের ঠোঁট দাঁতে ঘষা খেল। অঞ্জলি চাপা গলায় বলল, 'নাম বল।'

'দীপাবলী।'

'বাঃ সুন্দর নাম। দীপাবলী মানে তো দেওয়ালি ! বাঃ বাঃ। একটু সামনে এসে তো !'

অঞ্জলি মেয়েকে আলতো করে ঠেলে দিতেই সে কয়েক পা চলে এল।

প্রতুলবাবু বললেন, 'এবার একটু ঘুরে দাঁড়াও।'

দীপা পিছন ফিরল।

প্রতুলবাবু বললেন, 'বেশ বেশ। শাড়ি পরেনি কেন ?'

অঞ্জলি বলল, 'এতদিন তো শাড়ি ধরেনি। আজ চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পরতে চাইল না ?'

'না না। আমার স্ত্রীর আবার ইচ্ছে সবসময় শাড়ি পরিয়ে রাখবে, আজ পরেনি তা একপক্ষে ভালই হয়েছে। তা কি পড় তুমি ?'

'এইটে উঠব।' খরখরে গলায় জবাব দিল দীপা।

'হুঁ ! রান্না বান্না জানো ? জানো না। ওটা যে শিখতে হবে মা। বাঙালির ঘরে তো আর মেমসাহেবের দরকার নেই, রান্না করে সবাইকে খাইয়ে তবে তোমাদের আরাম। অবশ্য আমার বাড়ি ভর্তি ঠাকুর চাকর তবু ওটা শিখে নিতে হবে চটপট। চুল কেমন ?'

অঞ্জলি চটপট দীপার মাথার চুল খুলে দিল। কোমরের কাছাকাছি তার প্রান্ত পৌঁছাল। অঞ্জলি বলল, 'নিজে সামলাতে পারে না বলে প্রতি মাসে কেটে দিই।'

'গোছ তো খুব মোটা নয়। যাই বলুন মেয়েমানুষের মাথায় চুল না থাকলে শরীর উর্বরা হয় না। কথাটা খারাপ লাগল হয়তো কিন্তু আমার ঠাকুমা তাই বলতেন। যাও, ভেতরে যাও। আজ থেকে আর চুল ছেঁটো না।'

প্রতুলবাবুর কথা শেষ হওয়ামাত্র দীপা দ্রুত ভেতরে চলে গেল। অঞ্জলির মুখে রক্ত জমেছিল। সে আর দাঁড়াল না। ভেতরে ঢুকে মনোরমার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'শুনলেন ?'

মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'মনে হচ্ছে মুখ খুব আলগা।'

হঠাৎ দীপা দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'উর্বরা তো মাটি হয়। শরীর উর্বরা মানে কি ?'

অঞ্জলি দ্রুত তার কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'সব কথার মানে থাকে না। মায়ের ঘরে যা তুই।'

'যে কথার মানে থাকে না সে কথা বলে কেন ?' দীপা আর দাঁড়াল না।

বাইরের ঘরে তখন অমরনাথ জিজ্ঞাসা করছেন, 'কেমন দেখলেন—মানে—।'

'ঠিক আছে। আর একটু ফরসা হলে, বংশধরদের কথা ভেবেই বলছি। যাক, কি আর করা যাবে। বিয়ের জল গায়ে পড়লে শুনেছি রঙ ফরসা হয়। না মশাই, আপনাদের মেয়েকে আমার অপছন্দ হয়নি। বিয়ের দিনটা পাকাই রইল। এ বাড়ি থেকেই বিয়ে দেবেন ?'

প্রতুলবাবু সিগারেট ধরালেন। হরিদাসবাবু হাসিমুখে বললেন, 'জলপাইগুড়িতে গিয়ে বাড়ি ভাড়া নিয়ে দেওয়া যায় অবশ্য, যেমন আমি দিয়েছিলাম—।'

'না না এখান থেকেই দিন। শহরে সবাই আমাকে চেনে। চোখের ওপর দেখবে কি রকম ব্যবস্থায় বিয়ে হচ্ছে। মানুষের মুখ তো জানেন, নিন্দে করতে পেলে আব কিছু চায় না। আপনি এখানে আপনার মত ব্যবস্থা করুন। বরযাত্রী তো বেশী হবে না। তারা কেউ অভদ্র ব্যবহার করবে না। আর একটা কথা, আমার স্ত্রী এটা বলতে বলেছেন, পঁচিশটা নমস্কারি শাড়ি আপনাকে দিতে হবে। এদের মধ্যে আটজন বিধবা। এদেব জন্যে অবশ্য শাড়ি নয়, থানই দিতে হবে। তবে সবগুলোই একটু উচ্চমানেব হওয়া উচিত। তা আমিই কিনে সবাইকে পাঠিয়ে দেব না আপনি ব্যবস্থা করবেন ?'

অমরনাথ বললেন, 'সেকি ! নমস্কারি শাড়ি থান আপনি কিনবেন কেন ? আমিই ব্যবস্থা করব। এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'ভাল কথা। তাহলে আজ আমি উঠি।' প্রতুলবাবু সিগারেট নেবালেন অ্যাসট্রেতে।

হরিদাসবাবু বললেন, 'আরে উঠব বললে চলে ! একটা মিষ্টি খাওয়াব কথা ছিল !'

প্রতুলবাবু বললেন, 'বেশ, আনুন মিষ্টি।'

কথা শেষ হবাব আগেই অঞ্জলি দুটো প্লেট ভর্তি মিষ্টি নিয়ে ঢুকল। প্রতুলবাবু একটি তুলে নিয়ে বললেন, 'আপনারা ভাল বুঝবেন কিন্তু এই বিয়ে নিয়ে কোন সমস্যা হবে না তো ? আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন ?'

'সমস্যা ?' অমবনাথ জিজ্ঞাসা কবলেন।

'আপনাব ভগ্নিপতি পুনর্বিবাহ করেছেন। আপনাদেব সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। এসব আমি যাচাই করে নিয়েছি। কিন্তু সেই ভদ্রলোকেব অনুমতি নেওয়া দবকার কি ?'

জবাবটা অঞ্জলি দিল, 'আমাব বোন মাবা যাওয়ার পর জামাইবাবু দায়িত্ব নিতে চাননি। সেই কথা তিনি চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিটা চাইলে আপনি দেখতে পাবেন। ওরও উপাধি ছিল মুখোপাধ্যায। উনি লিখেছিলেন কোনদিন পিতৃত্বের দাবি নিয়ে সামনে আসবেন না। সেই একমকসেব বাচ্চাকে বুকে করে মানুষ করেছি। আমবাই ওব বাবা মা। পেটে না ধবলেও যে মা হওয়া যায় তা আমিই বুঝেছি। আপনি নিশ্চিত থাকুন এ নিয়ে ভবিষ্যতে কোন সমস্যা হবে না।'

বিয়ের দিন দুপুরে দুর্ঘটনাটা ঘটল। ব্যাপারটা এমন আচমকা যে মন খারাপ হয়ে গেল অমবনাথের। এই চা-বাগানেব প্রতিটি মানুষ পরস্পরেব সঙ্গে একটা ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা কবে যতই ভেতরে ভেতরে মন কষাকষি হোক। মন খারাপ সেইজন্যে। শুভকাজের আগে বিঘ্নটা ঘটল। বাড়ি সাজানো হয়ে গিয়েছে। ভেতরের উঠোনে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ছাদনাতলার ব্যবস্থা সেখানেই। বাড়ির বাইরে মাঠে প্যাণ্ডেল খাটিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। ভোরের আগেই ভিয়েন বসে গেছে। ঠাণ্ডা জমেছে খুব। নিমন্ত্রিতরা তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। চা বাগানের কেউ বাদ নেই, বাজারের অনেকেই আছেন, আশেপাশের যেসব চেয়ে চা-বাগানে অমরনাথ খেলতে যান তাদের অনেকেই

নিমন্ত্রিত। সাহেবের কাছ থেকে ডায়নামো চেয়ে এনেছেন আজকের রাতটার জন্যে। সকালে জলপাইগুড়ি থেকে গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসেছে। চা-বাগানের সব কোয়ার্টার্সে আজ দুপুর থেকেই রান্না বন্ধ। অঞ্জলি নিজে সবাইকে বলে আসায় মেয়েরা ভিড় করেছে সাতসকালেই। গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখে সবাই উচ্ছ্বসিত। মাছটাই প্রায় বিশ সের হবে। বেনারসী শাড়ির সঙ্গে চারটে যে শাড়ি এসেছে তা অঞ্জলি কখনও গায়ে তোলে নি। ঝুমকো দুল এসেছে ভেলভেটের বাক্সে। বীণা বউদি দেখেই বললেন, 'এ নিশ্চয়ই তরুণ জুয়েলারি থেকে গড়ানো।' মিষ্টি কত রকমের। ঘড়ায় করে সরষের তেল পাঠানো হয়েছে ঘানি থেকে ভাঙিয়ে। প্রসাধনের জিনিসপত্র সবই বিদেশী। রুপোর বাটিতে বাটা হলুদ আলাদা করে রাখা। সবাই বলতে লাগল এই চা-বাগানে এমন তত্ত্ব এর আগে কারো বিয়েতে আসেনি। হরিদাসবাবু বললেন, 'দ্যাখো অমর, কিরকম সম্বন্ধ করেছি। শুধু পয়সাই নেই, নজরটা আকাশছোঁয়া। আমার মেয়েও গায়ে হলুদে এই তত্ত্ব পায়নি।'

এসব নিয়ে সকালটা ভালই কেটেছিল। দুপুরে যখন ছেলেরা খেয়ে উঠেছে, বীরপাড়ার রহমত আলি যখন সানাইটা ঝালিয়ে নিচ্ছে তখনই চিৎকার শুরু হল মালবাবুর বাড়ি থেকে। মালবাবুর স্ত্রী খেতে বসতে যাচ্ছিলেন মেয়েদের সঙ্গে এমন সময় ওদের চাকব চিৎকার করতে করতে ছুটে এল। ললিতা নাকি কেমন করছে। সে যে খেতে আসেনি দুপুরে সেটা খেয়াল করেনি কেউ। খবরটা শুনে অনেকের সঙ্গে অমরনাথও ছুটে গেলেন মালবাবুর বাড়িতে। গিয়ে দেখেন ললিতা তার ঘরের মেঝেয় শুয়ে ছটফট কবছে। মুখ শক্ত হয়ে যাচ্ছে, পেট চেপে আছে। ডাক্তারবাবুও সঙ্গে ছিলেন। সামান্য পরীক্ষা করেই বুঝতে পারলেন মেয়েটা বিষ খেয়েছে। সাহেবকে বলে গাড়ি আনতে একটু সময় লাগল। এর চিকিৎসা বাগানের হাসপাতালে হবে না। ওষুধ যা দেবার দিয়ে মালবাবু আর ডাক্তারবাবু ললিতাকে নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে ছুটলেন জলপাইগুড়ি। ডাক্তারবাবুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আশা খুব একটা নেই। ললিতার টেবিলে একটা কাগজ পাওযা গিয়েছিল, তাতে লেখা, 'আমি চললাম, তোমার পথেব কাঁটা, তুমি ভাল থেকো।' ললিতা চলে যাওয়ার পর আর্তনাদ করতে লাগলেন মালবাবুর স্ত্রী। আর সেই আর্তনাদের মধ্যে যে কথাগুলো উচ্চারিত হল তাতে সবাই জানতে পারল ললিতা বিষ খেয়েছে শ্যামলেব জন্যেই। বিষ না খেয়ে ললিতার উপায ছিল না। আজ সকালে তিনি ললিতাকে বমি করতে দ্যাখেন। ভেবেছিলেন দীপার বিয়ে চুকে যাওয়ার পর হরিদাসবাবুর সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু ওই বোকা মেয়েটা যে ফস করে বিষ খেয়ে বসবে তা কে জানত!

ভিড়টা আস্তে আস্তে সরে এল আসাম রোডের এপাশে বিয়ে বাড়ির সামনে। নানান জল্পনা চলছে এখন। ললিতা যদি না বাঁচে তাহলে থানা পুলিশ নিশ্চয়ই হবে। একটু একটু করে মেয়েটার পক্ষে বিপক্ষে অনেক কথা উঠতে লাগল। শ্যামলের সঙ্গে কে কবে কখন চা-বাগানের মধ্যে দেখেছে অথচ বদনামের ভয়ে বলেনি, মেয়েটার স্বভাব চরিত্র কেমন গোলমেলে ছিল। এর মধ্যেই শ্যামলের খোঁজ পড়েছে। তাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

অমরনাথ বললেন, 'শ্যামলকে আমি বীরপাড়ায় পাঠিয়েছি দই আনতে।'

হরিদাসবাবু মাথা নিচু করে বসেছিলেন পাথরের মত। তাঁর স্ত্রী দু-পা পেছনে। সবাই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। আবহাওয়া ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে। অমরনাথ পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'হরিদাসদা, আপনি শক্ত হন।'

হরিদাসবাবু বললেন, 'সারাজীবন তো সন্তানদের ব্যাপারে একবারও নরম হইনি অমর, তবু শেষ বয়সে আমাকে এসব শুনতে হল! সে যে প্রেম করছে তাও কেউ আমায়

জানায়নি। তাতে আর যাই হোক মেয়েটার সর্বনাশ হতো না। মরে গেলে কি হবে অমর?'

অমর বললেন, 'চিকিৎসা শুরু হয়েছে, ওসব ভাবছেন কেন? আজ দীপার বিয়ে। সব দায়িত্ব আপনার ওপরে। আপনি যদি ভেঙ্গে পড়েন—।'

'না হে অমর। আমার যাই হোক, তোমার মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো পর্যন্ত আমি ঠিক থাকব। শুধু খেয়াল রেখো, সেই শয়তান যেন আমার সামনে না এসে দাঁড়ায়।'

একটা কি হয় কি হয় ভাব সমস্ত মানুষের মনে। বিয়ে বাড়ির কিছু মহিলা রয়ে গেছে মালবাবুর স্ত্রীকে সামলাতে। এবং তখনই একটা কথা উঠল। অমরনাথ যে অল্প বয়সে দীপার বিয়ে দিচ্ছেন এ ঢের ভাল। মেয়েকে বড় করে যদি বাপ মায়ের মুখ পোড়ায় তাহলে সেই মেয়ের না জন্মানোই ভাল ছিল। আর তা ছাড়া, ললিতা বাচ্চা মেয়ে নয় কিসে কি হয় তা জানে, সে কি করে শ্যামলকে প্রশ্রয় দিল? ক্রমশ আবহাওয়াটা অমরনাথের অনুকূলে ঢলে পড়ল। যারা এতদিন বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিল তারাও চুপ করে গেল। অমরনাথ প্রার্থনা করছিলেন মনে মনে, জলপাইগুড়ি থেকে মৃত্যু সংবাদটা যেন আজ রাতের মধ্যে না আসে।

তিনটে নাগাদ ভ্যানে মিষ্টি এবং দই-এর হাঁড়ি চাপিয়ে শ্যামল ফিরল। সোজা বিয়ে বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমে সে অমরনাথকে বলল, 'খুব ভাল দই হয়েছে আজ, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' অমরনাথ জবাব দিলেন না। শ্যামল অবাক হল। ভিড়টাকে সে বিয়ে বাড়িতে আনন্দ করতে আসা মানুষের জমায়েত বলেই ভেবেছিল। এখন দেখল কেউ কথা বলছে না অথচ তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। সে খুব সরল গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? কিছু হয়েছে নাকি?'

সঙ্গে সঙ্গে হরিদাসবাবু উঠে এলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পায়ের জুতো হাতে উঠেছে। শ্যামল কিছু বোঝার আগেই পাগলের মত তিনি জুতো দিয়ে আঘাত করতে লাগলেন ছেলের মুখে।

শ্যামল কয়েকবার আঘাত খেয়ে খপ করে বাবার হাত ধরে ফেলে চিৎকার করল, 'কি করছ তুমি?'

'কি করছি? কিছুই করিনি এখনও। তুই আমার ছেলে নস। তুই আমার কাছে মরে গেছিস। গলায় দড়ি দে, গলায় দড়ি দিয়ে তুই আমাকে বাঁচা।' আর এই প্রথম হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন হরিদাসবাবু। তাঁর শরীর কাঁপছিল।

ছুটে গিয়ে অমরনাথ তাঁকে ধরলেন। অমরনাথ বললেন, 'আপনি কথা দিয়েছিলেন হরিদাসদা, ভুলে যাচ্ছেন।'

কাঁদতে কাঁদতে হরিদাসবাবু বললেন, 'এই কুলাঙ্গারটাকে চোখের সামনে থেকে সরাও।'

অমরনাথ প্রায় টানতে টানতে হরিদাসবাবুকে বাইরের বারান্দায় এনে বসালেন। শ্যামল হতভম্ব। সে এগিয়ে গেল তার মায়ের কাছে। লক্ষ্মী বউদি পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলেন ঘোমটার প্রান্ত দাঁতে চেপে। শ্যামল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'ললিতা বিষ খেয়েছে।' প্রায় ফিস ফিস করে বললেন লক্ষ্মীবউদি।

চমকে পেছন ফিরে আসাম রোডের ওপাশে ললিতাদের কোয়ার্টার্সের দিকে তাকাল শ্যামল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় সে?'

লক্ষ্মীবউদি বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে।'

সঙ্গে সঙ্গে তীরের মত ছুটে গেল রাস্তায়। একটা স্টেট বাস আসছিল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিপজ্জনকভাবে সেটাকে থামিয়ে উঠে পড়ল। চোখের পলকে বাসটা মিলিয়ে গেল

চা বাগানের আড়ালে। জনতা এবার গুঞ্জন করতে লাগল। শ্যামলের প্রতিক্রিয়া দেখে এর মধ্যেই কারো কারো ভাল লেগেছে। সত্যিকারের ভালবাসা নিয়ে আলোচনা হল। এত বড় ছেলেকে সবার সামনে জুতো পেটা করা উচিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে দ্বিমত তৈরী হল। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তেজনা থিতিয়ে এল। আর বীরপাড়ার রহমত আলি সেই সুযোগে সানাই-এর সুর ধরল। অঞ্জলি মাঠে নেমে এসে লক্ষ্মীবউদিকে ভেতরে নিয়ে গেল। আর আজ যার বিয়ে সে বাগানে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনা চুপচাপ দেখে গেল। বীণা বউদির নজর সেদিকে পড়তেই তিনি আঁতকে উঠলেন, 'ওমা, বিয়ের কনে গায়ে হলুদ মেখে খোলা আকাশের নিচে চুল খুলে দাঁড়িয়ে আছে দ্যাখো। আক্কেল বলে কিছু নেই নাকি?'

শক্ত মুখ ঘুরিয়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'শ্যামলদা কোথায় গেল?'

'কোথায় গিয়েছে আমাকে বলে গিয়েছে নাকি?' বীণাবউদি অবাক, 'চলে আয় ভেতরে। একটু বাদে তোকে সাজাতে বসতে হবে।'

বিয়ে বাড়ি জমজমাট। সন্ধের মুখে মুখে বর নিয়ে এসে গেছেন প্রতুলবাবু। বরযাত্রীদের সংখ্যা মাত্র বারো। তাঁদের আপ্যায়ন করছিলেন অমরনাথের সঙ্গে হরিদাসবাবু। এখন মানুষটার দিকে তাকিয়ে বোঝাই যাচ্ছে না যে অপরাহ্নে অত বড় আঘাত পেয়েছেন। কর্তব্যের খাতিরে হরিদাসবাবু মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করছেন এবং সেটা মনের কষ্ট চাপা দিতেই, অমরনাথ বুঝেও বাধা দিচ্ছিলেন না। পাত্র অতুলকে বসানো হয়েছিল যে ঘরে সেখানে মেয়েদের ভিড় স্বাভাবিক। তাতে একদল ক্ষুদে যেমন আছে তেমন বীণাবউদির মত বয়স্কাও বাদ যাননি। কিন্তু খোদ প্রতুলবাবু যখন ছেলের পাশে বসলেন তখন আমোদে বাধা পড়ল। বয়স্কা মহিলারা আড়াল থেকে দেখতে লাগলেন। বাচ্চারা জুলজুল করে দেখল ধুতি পাঞ্জাবি পরা বর আঙুলে হিরের আংটি নিয়ে পাশ বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছে। হরিদাসবাবু ছুটে এসে প্রতুলবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কিছু বলতেই তিনি সজোরে বলে উঠলেন, 'তাতে কি হয়েছে। এখনও আমার ছেলের বয়স আঠারো হয়নি যে তাকে জলে জঙ্গলে ছেড়ে দেব। আগলে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন হার হাইনেস। আদেশ অমান্য করতে বাপ মা শেখায়নি। হ্যাঁ, অমরনাথবাবুকে বলুন, আশীর্বাদটা সেরে নিতে। আগে আপনারা করুন তারপর আমি।'

এইসময় দরজায় সুভাষচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন। আজ সকালে কলকাতা থেকে এসেছেন তিনি এই বিবাহ উপলক্ষে। সুভাষচন্দ্র অঞ্জলির একমাত্র ভাই। মালবাজারের পাট চুকিয়ে এখন তিনি কলকাতায় বাস করেন। ট্রেন যাত্রার কারণে সারাদুপুর ঘুমিয়েছেন। এখন পাত্র ও পাত্রের পিতাকে এক ঝলক দেখে বরযাত্রীদের সামনে দাঁড়ানো অমরনাথের সামনে গিয়ে বললেন, 'ও জামাইবাবু। আপনার জামাই কে? ছেলে না ছেলের বাবা?'

'কি যাতা বলছ সুভাষ?' অমরনাথ বিরক্ত হলেন।

'দেখুন গিয়ে, ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে আর বাপ আসর জমাচ্ছে।'

'দূর! বিয়ে করতে এসে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে?'

অমরনাথের কথা শেষ হতেই হরিদাসবাবু ছুটে এলেন, 'আশীর্বাদটা করে নিতে হবে অমর। কি দিয়ে আশীর্বাদ করবে তা নিয়ে এস। আমরা তো ধানদুব্বা।'

আগে দীপার আশীর্বাদ হল। জবুথবু হয়ে বসে আছে সে। সবাই দেখল একটা জড়োয়ার সেট দিলেন প্রতুলবাবু। বললেন, 'এখনই এটা পরিয়ে দেবেন কেউ দয়া করে?'

সযত্নে পরিয়ে দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'বাঃ। চমৎকার।'

প্রতুলবাবু যখন এদিকে ব্যস্ত তখন সুভাষচন্দ্র অতুলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে, তোমার কি ঘুম পাচ্ছে খুব ?'

যাওয়ার সময় প্রতুলবাবু সঙ্গীদের ছেলের পাশে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁদেব একজন বললেন, 'খুব পরিশ্রম হচ্ছে তো।'

অতুল জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করল। সুভাষচন্দ্র বলেই ফেললেন, 'শরীর খাবাপ নাকি ? জ্বর এসেছে মনে হচ্ছে !'

অতুল এবার হাসতে চাইল। কোনমতে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

সুভাষচন্দ্রের মনে হল ছেলেটির গলার স্বর বড় মেয়েলি। তিনি অমরনাথেব কাছে গিয়ে বললেন, 'জামাইবাবু, আপনার জামাই কিন্তু সুস্থ নয়।'

'হ্যাঁ, একটু রোগা বটে, তবে নেহাতই অল্প বয়স।' অমরনাথ আজই প্রথম জামাইকে দেখেছেন। গাড়ি থেকে নামবার সময় প্রতুলবাবু ছেলেকে যেভাবে ধরেছিলেন তা ওঁর ভাল লাগেনি। যতই রোগা হোক একা হাঁটতে কষ্ট হবে কেন ?

অতুলকে আশীর্বাদের আগে সুভাষচন্দ্র ফস্ করে বলে বসলেন, 'আপনাব ছেলে কি অসুস্থ ?'

চমকে ফিরে তাকালেন প্রতুলবাবু। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে ?

হরিদাসবাবু পরিচয করিয়ে দিলেন, 'আমাদের অমরনাথের শ্যালক।'

'ও। আপনার যদি সন্দেহ হয় তাহলে ডাক্তার ডাকতে পারেন।'

'না না। সন্দেহ কেন হবে ! মুখ চোখে কি রকম একটা ভাব দেখে—।'

'তাকেই সন্দেহ বলে। না না, আপনারা ডাক্তার ডাকুন। এখন বুঝতে পাবছি আমি বলা সত্ত্বেও আগে কেন ছেলেকে আশীর্বাদ করলেন না আপনারা। ডাক্তার ডেকে প্রমাণিত হোক ও সুস্থ তারপর আশীর্বাদ হবে।'

হরিদাসবাবু বলে বসলেন, 'ডাক্তারবাবু তো এখানে নেই। জলপাইগুড়িতে গিয়েছেন।'

'তাহলে অপেক্ষা করুন।'

কেউ একজন অমরনাথের কাছে ছুটে গিয়ে ব্যাপারটা জানাতেই তিনি চলে এলেন। বেশ কয়েকবার ক্ষমা চাইবার পর প্রতুলবাবু শান্ত হলেন। কিন্তু আশীর্বাদের পর অতুল হাত বাড়িয়ে প্রণাম করল না। ঘড়ি আংটি নিয়ে একপাশে রাখল। প্রণাম নেবার জন্যে দাঁড়িযে ছিলেন অমরনাথ। প্রতুলবাবু বললেন, 'সরে আসুন মশাই। সন্ন্যাসীর নিষেধ। একমাত্র গর্ভধারিণী ছাড়া কোন মানুষকে যেন ও প্রণাম না করে। নইলে প্রতি প্রণামেব জন্যে একবছর করে আয়ু কমে যাবে। এই আমাকেই ও বিজয়াদশমীর রাতে প্রণাম করতে পাবে না।'

অমবনাথ হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলেন। তাঁর মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা তিরতিরিয়ে উঠল। চারপাশের হৈচৈ, সানাই-এর সুর, মানুষের উজ্জ্বল মুখ সেই ভাবনাটাকে চাপা দিতে পারল।

ছাঁদনাতলায় বরকে নিজে নিয়ে গেলেন প্রতুলবাবু। তিনি সঙ্গে পুরোহিত এনেছেন। এই বাড়ির পুরোহিতের সঙ্গে সেই পুরোহিতের মতান্তর শুরু হয়ে গেল বিবাহবিধি নিয়ে। প্রতুলবাবুর পুরোহিতের বয়স হয়েছে। তিনি হুঙ্কার দিলেন, 'এইসব বাঙালপনা চলবে না।' অবস্থা সামলাতে শেষ পর্যন্ত তাঁকেই সব দায়িত্ব দেওয়া হল। শেষ পর্যন্ত সিঁদুর পরানোও সাঙ্গ হল।

বর কনেকে যখন বাসরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন প্রতুলবাবু বললেন, 'দাঁড়ান। রাত

অনেক হয়েছে। আমি তিস্তার খেয়াঘাটে বলে এসেছি মাঝিদের, এগারটার মধ্যেই ফিরব। তারা অপেক্ষা করছে। বাসর আজ রাত্রে জলপাইগুড়িতেই বসবে।'

অমরনাথ কাকুতিমিনতি করতে লাগলেন, 'একটাই তো রাত। আপনাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। কোন অসুবিধে হবে না। এখানকার পি ডব্লু ডি বাংলোয় আপনার জন্যে ঘর বুক করেছি। দয়া করে আজকের রাতটা থেকে যান এখানে।'

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন প্রতুলবাবু, 'অসম্ভব। কথার নড়চড় আমি পছন্দ করি না।'

অসহায় অবস্থায় অমরনাথ হরিদাসবাবুর খোঁজ করলেন। বিয়ে বাড়িতে হরিদাসবাবু নেই। কেউ দ্যাখেনি তাঁকে কোথাও যেতে। কি মনে হতে অমরনাথ ছুটলেন তাঁর কোয়ার্টার্সে। আজ সমস্ত মানুষ ভিড় করেছে বিয়ে বাড়িতে। নির্জন কোয়ার্টার্সের দরজা খোলা। উঁকি মেরে আঁতকে উঠলেন অমরনাথ। হরিদাসবাবুর দুটো পা মাটি থেকে অনেক উঁচুতে ঝুলছে। খবরটা চিৎকার করে দিতে গিয়েও গিলে ফেললেন তিনি। প্রতুলবাবুরা দীপাকে নিয়ে আগে চলেই যাক, ভালয় ভালয়।

॥ ৯ ॥

মেয়েটা এক ফোঁটাও কাঁদল না। অঞ্জলি যখন তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল তখন সে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরনে বেনারসীতে সে বেশ জবুথবু, মাথার মুকুট সাইজের চেয়ে সামান্য বড় হওয়ায় একটু বেঢপ লাগছে। কিন্তু এসবে তার কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল বলে মনে হল না। ওপাশে মনোরমা কাঁদছিলেন মুখে আঁচল চেপে। অমরনাথ ধারে কাছে ছিলেন না। জিনিসপত্র যা দেবার উঠে গেছে গাড়িতে।

কেউ একজন বলল, 'ঋণশোধ করিয়ে দাও চটপট। দেরি হয়ে যাচ্ছে—।'

অঞ্জলি কাঁদতে কাঁদতেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কিসের ঋণ ? না ওসব করতে হবে না।'

হঠাৎ মেয়ে কথা বলল, 'আমি করব।'

যেন বাজ পড়লেও কেউ এত চমকে যেত না। যে বলেছিল তার দিকে শক্ত মুখে তাকিয়ে আছে মেয়ে। অঞ্জলি বাধা দিল, 'আমি বলছি দরকার নেই। আমার কাছে তোর কোন ঋণ নেই যে শোধ করবি। আমি শুধু চাই তুই ভাল থাকিস, ভালভাবে থাকিস।'

'আমি ঋণ শোধ করব।' হঠাৎ মেয়েটার বয়স যেন এক লাফে অনেক বেড়ে গেছে।

খোকনের মা ছোট থালাটা এগিয়ে ধরলেন। পোয়া খানেক চাল, একটা রুপোর টাকা, দুর্বো ধানে সেটা ভর্তি। দীপা হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। খোকনের মা বললেন, 'অঞ্জলি আঁচল পাতবে আর তুমি এসব সেখানে ঢেলে দিয়ে বলবে, 'এতদিন যা খেয়েছি তা আজ শোধ করে গেলাম।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র অঞ্জলি দৌড়ে ভেতরে চলে গেল মেয়েকে ছেড়ে দিয়ে। মনোরমা নাতনির দিকে তাকালেন। সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে।

দীপা ধীরে ধীরে থালাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। তারপর স্পষ্ট গলায় বলল, 'এতদিন এই বাড়িতে যা পেয়েছি তা—।' হঠাৎ সে থেমে গেল।

সবাই দেখল মেয়েটা টলছে। মনোরমা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন, 'কি হল ? শরীর খারাপ লাগছে ? মাথা ঘুরছে ?' দীপা মাথা নেড়ে না বলল।

ছেলেকে আগেভাগেই গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছিলেন প্রতুলবাবু। বাগানের সমস্ত মানুষ সার দিয়ে দাঁড়িয়ে। দীপাকে নিয়ে সুভাষচন্দ্র এগিয়ে আসছেন ঘরের পর ঘর ডিঙ্গিয়ে।

বারান্দায় এসে তিনি বললেন, 'ঠাকুমাকে প্রণাম কর।'

মনোরমা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দীপা ঝুঁকে তাঁকে প্রণাম করল। সুভাষচন্দ্র বারান্দা থেকে ওকে নিয়ে মাঠে নেমে ডাকলেন, 'অমরদা! অমরদা কোথায়? এদিকে আসুন, দীপা আপনাকে প্রণাম করে গাড়িতে উঠবে।' সবাই এপাশ ওপাশ তাকাতে লাগল কিন্তু অমরনাথ এগিয়ে এলেন না। মিনিট দুয়েক ডাকাডাকি চলল। শেষ পর্যন্ত প্রতুলবাবু বললেন, 'মেয়ের যাওয়ার সময় সামনে থাকতে পারবেন না বলছিলেন একটু আগে। পরশু তো আমার ওখানে দেখা হবেই। আর দেরি করিয়ে দেবেন না। ঘাট থেকে মাঝিরা চলে গেলে বিপদে পড়ব।'

অতএব সুভাষচন্দ্র দীপাকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগোলেন। চারপাশে তখন উলুধ্বনি দিচ্ছে বাগানের মহিলারা, শঙ্খ বাজাচ্ছে। হঠাৎ মেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তার নজর বিশু আর খোকনের দিকে। গাড়ির সামনে দুই বন্ধু হাত ধরে দাঁড়িয়ে দীপাকে দেখছে। গত কয়েকদিন ওরা দীপার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়নি। একটি বারের জন্যেও দীপা বাড়ির বাইরে আসেনি। আজ ওরা অদ্ভুত চোখে যে মেয়েটাকে দেখছে সে যেন তাদের অচেনা। শাড়ি এবং মুকুটে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে মেয়েটা। অনেক বড়, তাদের চেয়ে অনেক বড় লাগছে এখন। চোখাচোখি হতেই বিশু হাসতে চেষ্টা করল। করে কেঁদে ফেলল। খোকন তাকে আঁকড়ে ধরল। সুভাষচন্দ্র গাড়ির খোলা দরজায় দীপাকে আলতো করে ঠেলে দিলেন। দীপা গাড়িতে উঠে বসল। তার পাশে এসে বললেন প্রতুলবাবু। অন্য পাশে অতুল সিটে মাথা হেলিয়ে বসেছিল, এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। প্রতুলবাবু নির্দেশ দিলেন গাড়ি চালু করতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল দীপা। তার কানে ইঞ্জিনের শব্দ, শঙ্খধ্বনি, উলুর আওয়াজ। সে বুঝতে পারল গাড়ি এখন মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছে। এই গাড়ি মাঠ ছেড়ে আসাম রোডে উঠল। চোখ বন্ধ করে সে জানল বাঁ দিকে কুলি লাইন, ডান দিকে অনেকটা দূরে চা-বাগানের ভেতর ফ্যাক্টরি, এইবার বাঁ দিকে বাঁক নিতেই অংরাভাসা নদী এগিয়ে আসছে। এখান থেকেই ওরা হাতির তাড়া খেয়ে চা-বাগান ছেড়ে রাস্তায় উঠেছিল। ওই চা-বাগানের ভেতরেই শ্যামলদা ললিতাদির সঙ্গে,—সমস্ত শরীরে কাঁটা ফুটল তার। ললিতাদি কি এখনও বেঁচে আছে? এই সময় প্রতুলবাবুর চিৎকারে কেঁপে উঠল সে, 'শুয়োরের বাচ্চা, এটা কি গাড়ি চালানো হচ্ছে? দূর করে দেবো চাকরি থেকে। জোরে চালা।'

নিস্তব্ধ রাত্রের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকারটা এত জোরে এবং অশ্লীল শোনাল যে এই প্রথম কান্না পেল দীপার। গত রাত থেকে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর কখনও কাঁদবে না। গত রাত্রে সে পাগলের মত কান্নাকাটি করেছে। মনোরমা আর অঞ্জলি ওর সামনে বসে এক এক করে সব কথা বলে যাওয়ার পর সে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'যাঃ, বিশ্বাস করি না আমি তোমাদের কথা।'

মনোরমা বলেছিলেন, 'তোর এসব কথা জানা দরকার। এসবই সত্যি কথা।'

অঞ্জলি তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, 'তোর জন্মের গল্প সত্যি কিন্তু তার চেয়ে সত্যি তুই আমাদের মেয়ে।'

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দীপা। তারপর বিড়বিড় করেছিল, 'সত্যি বলছ?'

ওঁরা কেউ জবাব দেননি। দীপা আবার জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি আমার মা নও? আমার মা মরে গেছে? বল, তুমি আমার মা নও?'

'তোকে পেটে ধরিনি বলে আমি তোর মা হব না?'

সেই সময় চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিল দীপা। মনোরমা আর অঞ্জলি কিছুতেই সামলাতে পারছিলেন না মেয়েকে। কান্না শুনে অমরনাথ ভেতরে এসেছিলেন। দীপা ছুটে গেল তাঁর সামনে, 'তুমি সত্যি কথা বল, তুমি আমার বাবা নও ?'

অমরনাথ মাথা নিচু করেছিলেন। তাঁর হাত জড়িয়ে ধরে দীপা পাগলের মত জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছিল, 'বল, চুপ করে আছ কেন ? তুমি আমার বাবা নও ? বল ?'

অমরনাথ হাত ছাড়িয়ে সেই সময় চলে গিয়েছিলেন। অনেক সময় লেগেছিল অঞ্জলির মেয়েকে আপাত শান্ত করতে। অনেক দিন আড়ালে রাখা দীপার মা-বাবার বিয়ের ছবি ট্রাঙ্ক থেকে বের করে মেয়ের হাতে দিয়েছিল অঞ্জলি, 'সে চলে গিয়েছে তোর জন্মের ঠিক পরেই। কিন্তু তোর শরীরে তার রক্ত আছে। ছবিটা চিরকাল নিজের কাছে রাখবি।'

অনেক রাত্রে মনোরমা যখন বড় ঘরে অঞ্জলির সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন তখন নিঃশব্দে অমরনাথ মেয়ের বিছানার পাশে এসেছিলেন। দীপা উপুড় হয়ে শুয়েছিল। তখনও অমরনাথের মনে হয়েছিল বিয়েটা না দিলেই হত। মেয়েটাকে শুধু গোত্রান্তর করে দেওয়া হচ্ছে না, ওর আশৈশব লালিত ধারণাকে আজ এক লহমায় ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হল। এই মুহূর্তে ও যদি ভাবে পৃথিবীতে ওর কেউ নেই তাহলে দোষ দেওয়া যায় ? অথচ তিনি নিজেই স্ত্রী এবং মাকে বলেছিলেন বিয়েব আগে দীপাকে সত্যি কথাটা জানিয়ে দিতে। মেয়ের পাশে বসতেই দীপা চোখ মেলেছিল পাশ ফিরে। তারপর অমরনাথের কোলের ওপর মুখ তুলে বাঁধভাঙ্গা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল। কয়েক মিনিট স্থির থেকে অমরনাথ বলেছিলেন ভারী গলায়, 'আমি আছি। আমিই তোর বাবা। যে তোকে জন্মমাত্র দায়িত্ব অস্বীকার করে চলে গেছে সে তোর জন্মদাতা হতে পারে কিন্তু বাবা নয়। আমি তোকে বলছি তুই কাঁদিসনে, মনে রাখবি সবসময় তোর একফোঁটা চোখেব জল একশ ফোঁটা রক্তের চেয়ে দামী।'

প্রতুলবাবু পাশ ফিরতেই দীপার শরীরে চাপ পড়ল। হেঁ হেঁ করে হাসলেন তিনি, 'তুমি তো দেখছি বেশ শক্ত মেয়ে। কান্নাকাটির মধ্যে নেই। ভাল, খুব ভাল। তবে কথাটা কি জানো, লজ্জার মত কান্নাও' মেয়েমানুষের ভূষণ। মেয়েদেব কাঁদতে দেখলে ছেলেদেব ভাল লাগে।'

উথলে আসা কান্নাটাকে ভেতরে পাঠিয়ে দেবাব শক্তি পেয়ে গেল দীপা।

মধ্যরাতে দুটো গাড়ি এসে থামল বার্নিশের ঘাটে। প্রতুলবাবুর গাড়িব পেছনে ছোট ভ্যানে আসছিল বরযাত্রীরা। তারা নিচে নেমে চিৎকার করে মাঝিদের ডাকতে লাগল। শাল এবং টুপিতে নিজেকে মুড়ে প্রতুলবাবুও নামলেন। অন্ধকাব গাড়িতে এখন দীপা এবং অতুল। মুখ তুলে দীপা নদীব দিকে তাকাল। গাড়ির কাঁচ তোলা। ঝাপসা নদীর বুকে অন্ধকার। বরযাত্রীদেব টর্চের আলোয মাঝে মাঝে চকচকে আলো দেখা যাচ্ছে। দীপা তার ডান দিকে তাকাল। শাল মোড়া একটা শীর্ণ শরীর কুঁকড়ে পড়ে আছে মাথা হেলিয়ে। নিঃশ্বাসের যে শব্দ উঠছে তাতে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে ঘুম কত গভীর। মনোরমা বলেছেন চিরকাল মনে রাখতে, পতি পরম দেবতা। এই লোকটা তার পতি। এতক্ষণ পাশে বসে আছেন তা প্রতুলবাবু তাকে নানান ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যতক্ষণ গাড়ি চলছিল ততক্ষণ একের পর এক প্রশ্ন করে গেছেন। বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে সে হুঁ হ্যাঁ বলে। শেষ প্রশ্ন ছিল দীপা যখন গাড়িতে উঠছিল তখন যে ছেলেটা ডুকরে কেঁদে উঠেছিল সে তার কে হয় ? বন্ধু বলতে গিয়ে ঢোঁক গিলেছিল। মনোরমা তাকে পই পই করে বলে দিয়েছিলেন যে সে ছেলেদের সঙ্গে মিশতো একথা যেন শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গল্প না করে,

ঘুণাক্ষরে। সে মাথা নেড়েছিল, 'কেউ না।'

'কেউ না হলে কাঁদবে কেন ?' প্রতুলবাবু তীক্ষ্ণ গলায় জানতে চেয়েছিলেন।

'আমি জানি না।' দীপা মুখ নিচু করে জবাব দিয়েছিল।

'হুম্।' আর কিছু বলেননি তিনি। কিন্তু তাঁর ছেলে যে পাশে বসে আছে তা একবারের জন্যেও টের পায়নি দীপা। এই মুহূর্তে ওর ইচ্ছা করল খোঁচা মেরে ওকে ঘুম থেকে তুলে দিতে। এইসময় লণ্ঠন হাতে মাঝিরা বেরিয়ে এল। ড্রাইভার হেডলাইট জ্বালালে সামনে জোড়া নৌকো দেখা গেল। সাবধানে জোড়া নৌকোর ওপর পাতা পাটাতনের ওপর গাড়ি দুটো উঠে এল পর পর। চাকার তলায় কাঠ দিয়ে সামাল দেওয়া হলেও প্রতুলবাবু গাড়িতে উঠলেন না। তিস্তার ওপর হু হু বাতাস বইছিল। তিনি একবার ছেলের নাম ধরে ডাকলেন, 'অতুল, এখন গাড়ি থেকে নেমে এস। নদীতে নৌকো চললে গাড়ির ভেতর বসে থাকা ঠিক না।'

দীপা কথাগুলো অবাক হয়ে শুনল। প্রতুলবাবু তাকে ডাকছেন না কেন ? এখন গাড়ি যদি গড়িয়ে নেমে যায় নদীতে তাহলে সেও তো মারা যাবে ! কিন্তু যাকে ডাকা হল তার ঘুম ভাঙ্গার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে তখন নৌকো ছেড়েছে ঘাট। মাঝিরা বড় বড় লগি নিয়ে চিৎকার করে নৌকো চালাচ্ছে। প্রতুলবাবুর মুখ গাড়ির কাঁচে ঝাপসা দেখাল। কি ভাবলেন তিনি। তারপর গাড়ির দরজা সামান্য ফাঁক করে ছেলের শরীরে হাত রেখে গাড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবখানা এমন যদি গাড়ি গড়িয়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ ছেলেকে টেনে বের করে নেবেন। কাঁটা হয়ে বসে রইল দীপা। তারপর ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়িয়ে রাখল অতুলের শরীরের কাছে। নৌকো থেকে যদি গাড়ি গড়িয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে অতুলকে আঁকড়ে ধরবে। প্রতুলবাবু ছেলেকে বের করতে চাইলে তাকেও সেইসঙ্গে বের করতে বাধ্য হবেন। নয়তো সে একা কিছুতেই মরবে না। মরতে যদি হয় এই ঘুমন্ত লোকটাকে সঙ্গে নিয়েই মরবে।

ভালয় ভালয় এপারে চলে এল নৌকো। গাড়ি এবার তিস্তার চর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বালির ওপর স্পীড বেশী তোলা যাচ্ছে না। প্রতুলবাবু বললেন, 'থাক, আর কেরামতি দেখাতে হবে না। বাড়ির কাছে এসে ড্রাইভিং দেখাচ্ছে। চাকা যদি বালিতে ফাঁসে তবে তোকে আমি ফাঁসাবো।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'এরকম বিয়ে বাপের জন্মে দেখিনি। শীতে হাড়ে মরচে পড়ে গেল। কত করে বললাম আটটার মধ্যে ছাড়তে তা না যত ন্যাকামি।' শেষ কথাটা যে অমরনাথের উদ্দেশে তা স্পষ্ট বুঝতে পারল দীপা। মনোরমা বলেছেন এখন থেকে এই লোকটাকে বাবা বলে ডাকতে হবে। অমরনাথ কখনও এমন গলায় কথা বলেন না। তিনি কি ধরনের ন্যাকামি করেছেন তাও সে বুঝতে পারছিল না। শেষ সময়ে বাবা কেন সামনে ছিলেন না ? অভিমানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতেই দীপার খুব অস্বস্তি হল। বাঁ দিক থেকে একটা তীব্র কটু গন্ধ ভেসে এল তার নাকে। প্রতুলবাবু যখন মুখ ফেরাচ্ছেন তখনই গন্ধটা আসছে। তিনি তিস্তার ঘাটে নামবার আগে এই গন্ধটা একবারের জন্যেও পায়নি দীপা। গন্ধে গা গোলানি ভাবটা বেড়ে যাওয়ায় অভিমান কার্যকরী হল না। তার মনে পড়ল অমরনাথের কথা, এক ফোঁটা চোখের জল একশ ফোঁটা রক্তের চেয়ে দামী।

কখন শহরে গাড়ি ঢুকেছিল, গেট পেরিয়ে আলো ঝলমলে বাড়ির সামনে গাড়িটা কিভাবে চলে এল তা টের পায়নি দীপা। ড্রাইভার ইঞ্জিন বন্ধ করতেই উলুধ্বনি বাজল। মাত্র দুই কি তিনটি গলায় উলু দেওয়া হচ্ছে। প্রতুলবাবু গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করলেন

সব শব্দ ছাপিয়ে, 'মাঝ রাত্রে সব আলো জ্বেলে রেখেছো কেন ? যত্তসব !' একটি মহিলাকণ্ঠ যেন কিছু বলল কথার জবাবে। প্রতুলবাবু চলে গেলেন ভেতরে। শঙ্খ বাজছে। বরযাত্রীদের কেউ কেউ বলে উঠল, 'বরকনে নামাও, বরণ কর। ছেলেমানুষ ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে সব।' অত রাত্রেও গাড়ির সামনে যারা ভিড় করেছিল তারা সাজগোজ করেছিল সব। একটি পুরুষ কণ্ঠ জোরে বলে উঠল, 'ছেলেরা সরে যাও। এটা মেয়েদের ব্যাপার, ওদের করতে দাও।'

একজন মহিলা দীপাকে ধরে নামাল গাড়ি থেকে। নামিয়ে বলল, 'বাঃ, খাসা বউ হয়েছে, লক্ষ্মী ঠাকুরূণের মত দেখতে লাগছে। না গো।'

আর একজন বলল, 'লক্ষ্মী না সরস্বতী তা কে বলবে ? ঘুমে তো ঢুলছে।'

'ঢুলবে না ? কতদূর থেকে আসছে ?'

'আজ তো ঢুললে চলবে না। আজ বাসর রাত। রাত জাগতে হবে।'

'সর সর। এসো গো, বউ ঘরে তোল।'

যাবতীয় মেয়েলি আচার অনুষ্ঠান শেষ হবার পর দীপাকে একটি সাজানো ঘরে যখন নিয়ে যাওয়া হল তখন সেখানে তাকিয়ায় মাথা রেখে অতুল চোখ মেলার চেষ্টা করছে। দীপাকে তার পাশে বসিয়ে একজন বলল, 'তোমার নাম তো দীপাবলী, তা ইনি হলেন তোমার শাশুড়ি, আজ থেকে তোমার মা। ও নলিনী, বউ-এর মুখ তো দেখলে, কিন্তু কিছু দিলে না যে ?'

শাশুড়ি যিনি তাঁর নাম নলিনী। নলিনী বললেন, 'সব যার জন্যে তাকে আর আলাদা করে কি দেব ? এবার তোমরা সর তো, ও হাত মুখ ধুক, বাথরুম করুক। রাত তো শেষ হতে চলল, যাও না সবাই, এই বেলা গড়িয়ে নাও।'

'ওমা ! সে কি কথা ? আজ বাসর জাগতে হবে না ? ঘুমাবো কি ?'

'না বাবা ! আমার ছেলে জাগতে পারবে না। অনেক পরিশ্রম হয়ে গেছে ওর।'

'পরিশ্রমের তো অনেক বাকি। ফুলশয্যে আসুক, তখন থেকেই তো পরিশ্রম।'

'আঃ নতুনদি, তোমার মুখ বড় আলগা !'

'ওমা, আমি কি শ্রাদ্ধবাসরে এসেছি নাকি যে মুখে কুলুপ আঁটবো ? মেয়ে মানুষের মুখ খোলার জায়গা হল আজ, এই বাসর রাতে।'

'তোমার বরের বুঝি খুব পরিশ্রম হত নতুনদি ?' আর একটি গলা জিজ্ঞাসা করল।

'তা হত। আমার চেহারা তো দেখছিস তোরা, তিনটে বাঘে খেতে পারবে না, আর তাকে, একটা টিকটিকিও সাবাড় করে দেবে।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসির ফোয়ারা উঠল। নলিনী বললেন, 'এই যে মেয়ে, তোমার নাম দীপাবলী ? এ বাড়িতে অত শৌখিন নাম চলবে না বাপু। তোমাকে আমরা আজ থেকে আশা বলে ডাকব। বুঝলে ? দীপাবলীকে পাল্টে আশা করলাম।'

'শুধু আশা বড় ন্যাংটো ন্যাংটো লাগছে গো।' নতুনদি বলে উঠলেন, 'যেন ব্লাউজ পরালে কিন্তু ভেতরের জামা পরাওনি। আশার সঙ্গে কিছু জোড়।'

নলিনী হাসলেন, 'সেটাও ভেবেছি। আশালতা। খুব মিষ্টি নাম, কি বল ?'

সবাই এবার প্রশংসা করতে লাগল। নতুনদি দীপার চিবুক ধরে মুখ সামান্য তুলে বললেন, 'শুনলে তো ? এখন থেকে তুমি আমাদের আশালতা। দীপাবলী নিবিয়ে ফেল। আশার লতা হয়ে অতুলচন্দ্রকে জড়িয়ে ধর।'

'জড়াবে কি, সে তো ঘুমিয়েই কাদা।'

'বাথরুমে যাবে ?' নলিনী জিজ্ঞাসা করলেন।

দীপা মাথা নাড়ল, না। তার খুব ঘুম পাচ্ছিল। ওরা কেউ তাকে ঘুমাতে বলছে না কেন ?

এই ঘরে কেউ শোয় না। তবে বিয়ে উপলক্ষে যারা এসেছে তাদের কেউ কেউ ছিল গত রাতে। মেয়েলি আচার অনুষ্ঠান সেরে আজ যে যার বাড়িতে ফিরে গিয়েছে। বেশীর ভাগ আত্মীয়স্বজন এই শহরেরই। নলিনী দুপুরের খাবারের পর দীপাকে নিয়ে এলেন সেই ঘরে, 'নাও, যদি খুব ঘুম পেয়ে যায় এখানে গড়িয়ে নাও। আজ তো কাল রাত্তির।' কাজের মেয়েটি বলে উঠল পেছন থেকে, 'ঘুম পেয়ে যায় বলছ কি, সকাল থেকে তো ঢুলছে সমানে। একটু ঘুমাতে দাও।'

'তুই বড্ড কথা বলিস আনু। আমি কি ওকে এখানে এনেছি জাগিয়ে রাখতে।' নলিনী তেড়ে উঠলেন। এইসময় আর একজন কাজের লোক এসে বলল, 'মা তোমাকে বাবু ডাকছে। খুব মেজাজ খারাপ।'

'মেজাজ খারাপ ! ও আনু, কি হল রে ?'

'আমি জানব কি করে ? আশ্চর্য।' আনু নামের কাজের মেয়েটি মুখ বাঁকালো। নলিনী প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর ছেড়ে। অন্য কাজের মেয়েটি তাঁর সঙ্গ নিল।

আনু এবার দীপার দিকে তাকাল, 'পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলে শরীর আরাম পাবে ? শুয়ে চোখ বন্ধ কর না।' দীপা আনুর দিকে তাকাল। মধ্যবয়সী মানুষটিকে খুব রাগী বলে মনে হল তার। আনু এগিয়ে এসেছিল কাছে, 'যা হবার তা তো হয়ে গেছে। সময়ে নিষেধ করলেও যদি মানুষ না শোনে তাহলে তাদের জন্যে দুঃখ করে কোন লাভ হয় না। আর দুঃখ করতেই বা যাব কেন ? বয়েই গেছে। যেমন খাবে তেমন হাগবে। তোমার মা যদি কালা হয় তো আমি কি করব। শুয়ে পড।' প্রায় জোর করেই কনুই ধরে তাকে খাটের ওপর বসিয়ে আনু চলে গেল। বিছানায় বসামাত্র শরীর টানতে লাগল সেটা। বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল সে। সমস্ত শরীরে ম্যাজম্যাজানি, একটু জ্বরো জ্বরো ভাব। চোখ বন্ধ করেই দীপার মনে পড়ল এদের রান্নার কথা। কি মিষ্টি দেয়। ডাল তরকারি সব কিছুতেই। মা বা ঠাকুমার রান্নার পরে এসব খাওয়াই যায় না। মা এবং ঠাকুমা শব্দদুটো মনে পড়তেই সে ঠোঁট কামড়ালো। ওরা তার মা ঠাকুমা নয় ? মাসী আর মাসীর শাশুড়ি ? অসম্ভব। একদিনের জন্যেও তার যাঁদের অন্য কিছু বলে মনে হয়নি আজ দুম করে বলে দিলেই হল ? এই যেমন এ বাড়িতে পা দিতে না দিতেই এরা নামটা পাল্টে দিল। কি নামের ছিরি, আশালতা। যত বুড়ি বুড়ি নাম। আচ্ছা, এভাবে নাম বদলালে সে ভুলে যাবে নিজেকে ? আমি দীপা দীপা দীপা। বড় জোর দীপাবলী। আমি কখনই আশালতা নই। চোখ বন্ধ করল সে। আশ্চর্য ঘুম আসছে না তার। হঠাৎ গালের পাশটা ভিজে ভিজে লাগল। আঙুল, দিয়ে স্পর্শ করতেই জল এবং তার উৎস টের পেল। সে কখন কাঁদল ? না কাঁদতেই চোখ দিয়ে জল গড়ায় নাকি ? তার মনে হল এই জলের দাম নিশ্চয়ই একশ ফোঁটা রক্তের চেয়ে বেশী নয়।

নলিনী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্ষিপ্ত প্রতুলবাবু দ্রুত পায়চারি করছিলেন ঘরে। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন, 'লোকটা আত্মহত্যা করল আর বাগানের কেউ জানল না এ হতে পারে ? নিশ্চয়ই আমার কাছে চেপে গিয়েছিল ওরা। এখন দাদা বলছেন

যে তিনি বউভাতে আসতে পারবেন না। বেয়াই মারা গেছে আর তিনি উৎসবে এসেছেন জানলে তাঁর পাবলিক ইমেজ খারাপ হবে। অন্যসময় হলে কে কেয়ার করত ! কিন্তু দাদা না আসা মানে কি হবে জানো ?'

নলিনী মুখ তুলে বললেন, 'দিদি আসবে না, ছেলেমেয়েরা— !'

'নিকুচি করেছে। তাদের জন্যে যেন আমি হাপিত্যেস করে বসে আছি। বি সি রায় আসছেন জলপাইগুড়িতে। দাদাকে বলে রেখেছিলাম খগেন দাশগুপ্তকে বলে রাখতে। খগেনবাবু ইচ্ছে করলে বি সি রায়কে নিয়ে বউভাতে আসতে পারেন পাঁচ মিনিটের জন্যে হলেও। এদিকে দাদা যদি নিজেই না আসেন, উঃ ! আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। একবার চিফ মিনিস্টারকে যদি আনতে পারা যায় তাহলে আর দেখতে হবে না। সব প্ল্যান ঠিকমত এগোচ্ছিল। গত ইলেকশনে দশ হাজার দিয়েছিলাম, এবার তিরিশ পর্যন্ত উঠতাম, সেই পাতিবাবুটা মরে গিয়ে ভেস্তে দিল সব ।'

নলিনী বললেন, 'মরল কি করে ?'

'গলায় দড়ি দিয়ে। কি না, তার ছেলে নাকি কোন আইবুড়ো মেয়েকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। সেই মেয়ে বিষ খেয়ে এখন জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ধুঁকছে। ব্যাস। পাতিবাবুর প্রেস্টিজে লেগে গেল আর তিনি দড়িতে লটকে পড়লেন। কিন্তু কথা হল নলিনী, লোকটাকে আমি খাওয়ার পরও দেখেছি। আশীর্বাদ ফাসির্বাদের সময় সঙ্গে ছিল। হেঁ হেঁ করে বাজে কথা বলে যাচ্ছিল। এসব যে করে সে কখনও প্ল্যান মাফিক আত্মহত্যা করতে পারে ? নিশ্চয়ই ডাল মে কুছ কালা হ্যায় ।' প্রতুলবাবু আবার পায়চারি করতে লাগলেন, 'বাগানের একটা মেয়ে বিষ খেয়েছে সেকথা কেউ আমাকে জানায়নি। আমরা চলে আসার পর দাদার বেয়াই-এর ডেডবডিকে ঝুলতে দেখেছে সবাই। আমি পুলিশকে বলেছি এটা আত্মহত্যা বলে মনে হচ্ছে না। যদি মার্ডার কেস হয় তাহলে দাদার শোকটা একটু কমে গেলেও যেতে পারে, কি বল ?'

'মার্ডার ?'

'মার্ডার মানে খুন !'

'ওমা, কে খুন করবে ?'

'সেটা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আমরা যখন বাড়ি ছেড়ে বের হলাম তখন তোমার বেয়াই অমরনাথবাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরে বাবা নিজের মেয়ে না হোক, এতদিন ধরে তুই পালছিস, সে যখন চিরদিনের জন্যে চলে যাচ্ছে তখন একবার সামনে এসে দাঁড়াবি না ?'

'সে কি ? বেয়াই মশাই খুন করেছেন ?' নলিনী চমকে উঠল।

'সেটা আমাদের জানার কথা নয়। তবে চাকরি করে তো চা-বাগানে। মাইনে কত পায় তা সবাই জানে। খাওয়া পরার কষ্ট নেই, থাকার জায়গা ফ্রি। কিন্তু সারা বাড়ি আলো করা, সানাই বাজানো, মাছ মাংস দই মিষ্টি খাওয়ানো, এসব তো মুফতে হয়নি। ধার করেছে নিশ্চয়ই। সেটা কার কাছে করেছে তা পুলিশ বের করুক।'

'তুমি না জেনে এসব বলছ বুঝি !'

'আমি কিছুই বলছি না। এখন আগামী কাল যদি লোক এসে বলে চা-বাগানে একজন মরে গেছে বলে কেউ বউভাতে আসতে পারবে না তাহলে বাঁচোয়া।'

'সে কি ? কনেপক্ষর লোক আসবে না ?'

'আমি মানা করিনি। নিজে হাত জোড় করে নেমন্তন্ন করেছি। না এলে কি করব। ও হ্যাঁ, মাথার ঠিক নেই, মেয়েটা একটু টিটিয়া টাইপের আছে বলে মনে হল তোমার ?'

টিটিয়া টাইপ ? কই না তো ! যা বলছি শুনছে তো !'

'হুম ! আর কেউ যেন জানতে না পারে মেয়েটা অমরনাথের নিজের নয়।'

'না। আমার পেট থেকে বেরুবে না।'

'সে তো জানি। পেট থেকে একটি যা বেরিয়েছে তার জন্যে সারাজীবন জ্বলতে হবে ?'

কথা শেষ করে নিজের অফিসঘরে চলে এসে টেলিফোন তুললেন প্রতুলবাবু। জেলার উচ্চপদস্থ এক কংগ্রেসী নেতাকে ধরতে পারলেন তিনি, 'নমস্কার দাদা, প্রতুল বাঁড়ুয্যে বলছি। আরে না, না। আপনাকে আসতেই হবে। বউদিকেও নিয়ে আসবেন। চিঠি আমি বউদির হাতে দিয়ে এসেছিলাম। খগেনদা কোথায় এখন ? ও, আচ্ছা আচ্ছা। চীফ মিনিস্টার আসছেন ? তারপর ? ডুয়ার্স থেকে ফিরবেন কখন ? সন্ধের আগেই। মিটিং শেষ কখন ? আমি যাচ্ছি একটু বাদে। আপনাকে একটা উপকার করতে হবে। কোন কথা শুনতে চাই না। আপনি তো জানেন আপনাদের জন্যে আমি সবসময় আছি। গিয়েই বলব। বাখছি দাদা।' রিসিভার নামিয়ে প্রতুলবাবু দেখলেন হরদেব ঘোষাল ঢুকছে। হরদেবকে নিয়ে একদা ব্যবসা শুরু করেছিলেন তিনি। লোকটা এত অলস যে পরিশ্রম করতে চাইত না। ওর টাকা মিটিয়ে দিয়ে ব্যবসাটাকে নিজের করে নিতে দেরি করেননি। হরদেব তবু মাঝে মাঝে আসে। দশ বিশ টাকা ধার নিয়ে যায়। লোকটাকে এখনও তিনি সহ্য করেন কারণ মাঝে মাঝে ওর মাথা চমৎকার খুলে যায়। ভাল পরামর্শ দেয় তখন। এক গাল হেসে তিনি বললেন, 'এস হরদেব, পেয়েছ তো ?'

'পেয়েছি মানে ? তুমি আমাকে নেমন্তন্নর চিঠি পাঠিয়েছ যে পাব ?' পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বের করেও হরদেব পিটপিটিয়ে প্রতুলবাবুর সিগারেটের প্যাকেট দেখতে থাকে। একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিয়ে প্রতুলবাবু বললেন, 'উঃ, কি ভুলই না হয়ে যাচ্ছে। এই একটু আগে জলধরদা ফোনে বললেন তিনিও চিঠি পাননি। আরে তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক যে চিঠি না পেলে ছেলের বিয়েতে খেতে আসবে না ? বল, খবর কি ?'

'বিশ টাকা দাও।'

'দাও ? একেবারে দাও ?'

'বাঃ। তোমার বউ-এর মুখ দেখতে কিছু কিনতে হবে না ?'

'বেশ নেবে। কিন্তু হরদেব, একটা উপায় বাতলাও তো। চীফ মিনিস্টার কাল জলপাইগুড়িতে আসছেন। কি করে তাঁকে একবার বউভাতে আনা যায় ?'

হরদেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট মুঠোয় নিয়ে টান দিতে লাগল। এটা নাকি বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া। প্রতুলবাবুর খুব রাগ হচ্ছিল কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। লম্বা ছাইটা হাতের তুড়িতে ফেলে দিয়ে হরদেব বলল, 'আরও পঞ্চাশটা টাকা দাও।'

'ইয়ার্কি পেয়েছ ?'

'মোটেই না। ফুল কিনতে হবে।'

'ফুল ?' প্রতুলবাবু হতবাক।

'চীফ মিনিস্টার আসছেন আর ফুল দেবে না ? তবে তার সঙ্গে দশ হাজার টাকা চাই। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে বিধান রায় হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। ফুলের তোড়া আর দশ হাজার টাকা তুমি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন তহবিলে দান করবে। টাকাটা দিতে হবে চীফ

মিনিস্টারের হাতে। তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন।' হরদেব সিগারেটে টান দিল।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন প্রতুলবাবু, 'কোথায় গিয়ে দেব ?'

'উনি এ বাড়িতে এলে নতুন বউ-এর হাত দিয়ে দিলেই ভাল হয়।'

'কিন্তু যদি না আসেন ?'

'বিধান রায় মানুষ হিসেবে সাধারণের চেয়ে অনেক বড় । নতুন বউ বউভাতের রাতে দেশের উদ্বাস্তুদের জন্যে দশ হাজার টাকা দিতে চাইছে জানলে তিনি না এসে পারবেন না। মনে রেখ, তুমি দিচ্ছ না, নতুন বউ দিচ্ছে। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সারা দেশে এই খবর পাঠাবে।'

'নতুন বউ দেবে মানে ? টাকাটা আমার নামে দিতে হবে।'

'তোমার নামে দিলে তুমি তো সার্কিট হাউসে গিয়ে ওঁর হাতে দিয়ে আসতে পার। নতুন বউ বউভাতের সময় বাড়ির বাইরে যেতে পারে না বলে তিনি এ বাড়িতে আসবেন।'

'অসম্ভব ! নতুন বউ দিলে নাম হবে তার। আমার কি ?'

'তুমি বলেছিলে কি করলে চীফ মিনিস্টারকে এ বাড়িতে আনা যায় তার উপায় বাৎলাতে। আমি সেটা বলে দিলাম। টাকাটা দাও।' হাত বাড়াল হরদেব।

কালরাত্রি কেটে গেল। জানলা দিয়ে এ বাড়ির গাছপালা আর আকাশ দেখে সকালটা কাটল দীপার। এ বাড়িতেও কয়েকটা বাতাবি লেবুর গাছ আছে। জলপাইগুড়িতে চা-বাগানের মত ঠাণ্ডা পড়ে না। শাড়ি পরে থাকায় শীত কম লাগছে। ফ্রক পরলে হাত পা খালি থাকে। কিন্তু এতক্ষণ শুধু শাড়ি পরে জীবনে সে থাকেনি। ট্রাঙ্ক গোছাবার সময় যে অঞ্জলি ফ্রক দেয়নি তা সে লক্ষ্য করেছে। দীপার খুব ইচ্ছে করছিল ফ্রক পরে বাগানে ছুটে যেতে। ওর মনে হল একমাত্র গাছেরাই সবসময় খুব চেনাজানা হয়।

আজ বিকেলে অমরনাথ আসবেন। অঞ্জলি আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ অবধি কোন মা নাকি মেয়ের বউভাতে যায়নি বলে মনোরমা তাকে নিষেধ করেছেন। বলেছেন, 'বাপ গেলে মেয়ে একটু কান্নাকাটি করবে মাত্র, তার বেশী কিছু হবে না। হাজাব হোক বাপ হল ছেলে। তার সঙ্গে দূরত্ব থাকেই। কিন্তু মাকে দেখলে নিজেকে সামলাতে পারবে না মেয়ে। এই কারণেই মায়েরা মেয়েব বউভাতে যায় না।' এসব কথা দীপার সামনেই হয়েছে। যদি গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অমবনাথের সঙ্গে বাগানের কয়েকজন বাবু আসবেন। না হলে অমরনাথ একা এসে বউভাত খেয়ে হোটেলে রাত কাটাবেন। মেয়ের বিয়ের তিন বছরের মধ্যে নাকি কুটুম বাড়িতে রাত কাটাতে নেই। দীপার মনে হল সে যেন অনেকদিন এখানে রয়েছে। বাবা মা ঠাকুমা আর ক্ষুদে দুটোকে দেখার জন্যে তার মন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

এই সময় নলিনী এলেন, 'তুমি নাকি সকালে দুধ খাওনি। এটা খাব না ওটা খাব না মেয়েরা বলে বিয়ের আগে, বিয়ের পরে না। এসব কথা কি তোমার মা ঠাকুমা শিখিয়ে দেয়নি ?'

জানলার ধারে মুখ নিচু কবে দাঁড়িয়ে রইল দীপা। নলিনী ডাকলেন, 'আ দুধটা নিয়ে আয়।'

আনু দুধের গ্লাস নিয়ে এল, 'নাও, খেয়ে নাও। জল হয়ে গিয়েছে।'

'জলই খাবে। ধরো গ্লাসটাকে। শোন, তোমার স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে।'

দীপা প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল, 'আমি কখনও দুধ খাই না।'

'আহারে! দুধ খাই না! তোমার শ্বশুর শুনলে মজা টের পাইয়ে ছাড়বে। খাও।'

ধমকটা এত জোরে হল দীপা গ্লাসটা নিল। সমস্ত শরীর গুলিয়ে দুধটা গলা দিয়ে নামল। আঁচলে মুখ মুছল। নতুন শাড়ির আঁচল খরখরে লাগল ঠোঁটে।

নলিনী বললেন, 'তোমার বাবা আজ আসবেন তো? শুনেছি কে যেন মরে গেছে ওখানে?'

'কে মরেছে?' প্রশ্নটা করেই ঝট করে ললিতাদির মুখটা ভেবে ফেলল সে।

'একটা লোক। দেখো বাপু, তিনি না এলে লোকে নিন্দে করবে। শহরের কেউ তো বাকি নেই, সবাই আসবে। তার ওপর শুনছি বিধান রায় আসবেন। বিধান রায়ের নাম শুনেছ? দেশের রাজা। কলকাতায় থাকে।'

'রাজা নয়, মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী।' মাথা নিচু করেই শুধরে দিল দীপা।

'ওই হল। এবার স্নানটান করো। দুপুরে ভাত পরিবেশন করতে হবে তোমাকে। জ্ঞাতি ভাইদের পাতে ভাত দিয়ে তবে আমাদের সংসারের মানুষ হবে।'

নলিনী চলে গেলেন আনুকে সঙ্গে নিয়ে। দীপার মুখে তখন ঠাণ্ডা দুধের বিস্বাদ।

নতুন বউ ভাত পরিবেশন করবে কিন্তু বাড়িতে ফেরার সময় পাচ্ছিলেন না প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। চীফ মিনিস্টার টাউনে এসে গিয়েছেন। কম্যুনিস্ট পার্টি থেকে বিক্ষোভ দেখাতে পারে এই আশংকায় সার্কিট হাউসের সামনে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তবু প্রতুলবাবু একবার সার্কিট হাউস আর একবার কংগ্রেস অফিস করে বেড়াচ্ছেন। নেতারা কথা দিয়েছেন যেমন করেই হোক পাঁচ মিনিটের জন্যেও চীফ মিনিস্টারকে নিয়ে যাবেন বিয়েবাড়িতে। সাংবাদিকরা জেনে গিয়েছেন প্রতুলবাবু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন তহবিলে দশ হাজার টাকা প্রদান করবেন। চীফ মিনিস্টার এখন ডুয়ার্সে। ফিরে এসে মিটিং করবেন প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে। প্রতুলবাবু সার্কিট হাউস ছেড়ে আসতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। যেভাবে দ্রুত সব কিছু পাল্টে যাচ্ছে তাতে চোখের আড়াল হলে নেতাদের চাপের মধ্যে রাখা যাবে না। দাদা নেই। তিনি খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের সঙ্গে ডুয়ার্সে গিয়েছেন আগেই। এদিকে ঘড়িতে এখন তিনটে বাজে। বাড়ি থেকে লোক এসে দু'বার ঘুরে গিয়েছে। বউ বসে আছে ভাত নিয়ে। তিনি না খেলে বউভাত হতে পারছে না। চুলোয় যাক বউভাত। একদিন ভাত না খেলে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু চীফ মিনিস্টারকে নিয়ে যদি আজকের রাতের অনুষ্ঠানে যাওয়া যায় তাহলে দু'দুটো বড় কন্ট্রাক্ট পকেটে এসে যাবে। তখন খাও না কত ভাত খাবে। দশ হাজার টাকা অনেক গুণ হয়ে ফেরত আসবে। তিনি বলে পাঠালেন যার খিদে পেয়েছে সে যেন খেয়ে নেয়। তাঁর ফিরতে দেরি হবে।

চীফ মিনিস্টার এলেন বিকেল পাঁচটায়। লম্বা স্বাস্থ্যবান মানুষটি সার্কিট হাউসে এখনই মিটিং-এ বসবেন। একজন বড় নেতা প্রতুলবাবুকে সেই ফাঁকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন, 'ইনি এখানকার একজন বিখ্যাত ব্যবসাদার। আমাদের সমর্থক। উদ্বাস্তুদের জন্যে দশ হাজার টাকা দিতে চান।'

'খুব ভাল কথা। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি চেকটা জেলাশাসকের মাধ্যমে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন। আপনাদের মত মানুষ যত এগিয়ে আসবেন তত সমস্যার মোকাবিলা করা সহজ হবে আমার।'

আর একজনের দিকে ফিরে কথা শুরু করতেই নেতা প্রতুলবাবুকে ইশারা করলেন বেরিয়ে যেতে। প্রতুলবাবু তাঁকে ফিসফিস করে বিয়েবাড়িতে যাওয়ার কথা বললেন।

নেতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি তো আজ রাত্রে জলপাইগুড়িতেই থাকছেন ?'

'না হে। শিলিগুড়িতে চলে যাব এখনই। কই, মিটিঙের ব্যবস্থা হয়েছে ?'

ছটার সময় খেতে বসলেন প্রতুলবাবু। আজ বাড়ির বেশীর ভাগ মানুষ অভুক্ত। খিদেয় ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপা। তাকে তুলে আনা হল। বাইরে আলো জ্বলছে। সানাই বাজছে। রাতের নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু করেছে এর মধ্যে। নলিনীর নির্দেশে এক হাতা ভাত গামলা থেকে তুলে শ্বশুরের পাতে দিল দীপা। ঠাণ্ডায় ভাত ডেলা পাকিয়ে গিয়েছিল। সেটা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে দাঁতে দাঁত চাপালেন প্রতুলবাবু, 'অপয়া'।

॥ ১০ ॥

নটা বাজতে না বাজতেই বিয়েবাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। একেই শীতের রাত তার ওপর শহরটার নাম জলপাইগুড়ি। গরমকালে এখনও রাত্রে রিকশা পাওয়া যায় কিন্তু শীত পড়লেই সন্ধে গড়ালে তারা উধাও হয়ে যায়। আর রিকশা ছাড়া ঘোরাফেরার অন্য কোন যান এখানে নেই। শহরে চীফ মিনিস্টারের উপস্থিতিও খুব একটা কাজ দেয়নি এ ব্যাপারে। স্টেশনের কাছে ওয়েসিস নামের একটা হোটেলে উঠেছেন অমরনাথ। খাওয়া-দাওয়ার পর সেখানে যেতে হবে হেঁটে। মাইলখানেক রাস্তা।

সন্ধে নাগাদ তিনি এসেছেন বিয়েবাড়িতে। বাগান থেকে সুভাষচন্দ্র আর নবনী ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে আসেনি। হরিদাসবাবুর মৃত্যুর পর কাউকে বলতেও ইচ্ছে হয়নি। এরকম একটা ঘটনায় সমস্ত বাগান একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। মেয়ের বউভাতে না এলেই নয় তাই আসা। দুঃখ তিনিও কম পাননি। তার চেয়ে বড় কথা কাউকে বলতে পারেননি যে দীপা বাড়িতে থাকতে থাকতেই তিনি হরিদাসবাবুকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখেছেন। শুভযাত্রায় বিঘ্ন ঘটবে বলে পালিয়ে থেকেছেন। স্বার্থপরের মত কাজ করেছেন নিশ্চয়ই তবে সেটা মেয়েটার মুখ চেয়ে। কিন্তু সেইসঙ্গে মনে খুঁতখুঁতানি শুরু হয়ে গেছে অঞ্জলির। এই বিয়েতে একটার পর একটা অশুভ ইঙ্গিত ধরা পড়ছে। আজ বউভাতে এসে মন হালকা হল তাঁর। মেয়ের বিয়ে হয়েছিল তার সাধ্যমত। কোথাও কার্পণ্য করেননি। কিন্তু এ বাড়িতে এসে বুঝতে পারলেন সেটা কত সামান্য। নতুন বউ বসে আছে রাজেন্দ্রাণীর মত। উপহারের পাহাড় তার পাশে।

সুভাষচন্দ্র পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'জামাইবাবু, এবার চলুন।'

'হ্যাঁ। একবার দীপার সঙ্গে—।'

'না। আর যাবেন না। সন্ধেবেলায় অনেক কষ্টে নিজেকে সামলেছে মেয়েটা। এখন চলে যাচ্ছেন জানলে ভেঙ্গে পড়তে পারে। তাছাড়া আমার এখানে থাকতেও ভাল লাগছে না।'

'কেন সুভাষ ? কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে আপনি বুঝতে পারছেন না ?'

বুঝতে পারলেও এতক্ষণ মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন অমরনাথ। যতটা না এরা করছে তিনি তা অনেক বাড়িয়ে ভাবছেন। সন্ধেবেলায় তাঁরা যখন বিয়েবাড়িতে এসেছিলেন তখন কেউ তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করেনি। প্রতুলবাবু ছিলেন না। বরযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ চিনতে পারায় বসার জায়গা মিলেছিল। সুভাষচন্দ্র অনুরোধ করেছিলেন, 'একবার দীপার সঙ্গে দেখা করতে চাই। মানে, ওর বাবা এসেছেন তো!'

খবর নিয়ে যে ভেতরে গিয়েছিল সে ফিরে এসে অপেক্ষা করতে বলেছিল। একঘণ্টা কেটে গেলেও কেউ ভেতরে নিয়ে যায়নি। ইতিমধ্যে দুবাব তাগাদা দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র। তখন প্রতুলবাবু বেরিয়ে এলেন, 'ও আপনাবা এসে গিয়েছেন। ভাল হল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?'

অমরনাথ হাতজোড় করে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে না। আগে একবাব দীপাকে দেখতে চাইছি।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন আপনাবা আমাব সঙ্গে। তবে সে আব দীপাবলী নেই। এখন তো তার পুনর্জন্ম। নামটাও পাল্টে গিয়েছে। আমার স্ত্রী নাম রেখেছেন, আশালতা। আপনি ওকে আশা বলে ডাকলে সুবিধে হয়।'

নবনীও সঙ্গে ছিল। সুন্দর সাজানো ঘরে সিংহাসনের ওপর বসে আছে মেয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে অমরনাথেব মনে হল তিনি যেন এক মহারাণীর দর্শন পাচ্ছেন। মাথায় মুকুট, সাবা শবীরে গহনা, ফুলেব মালা, লাল বেনারসীব চাকচিক্য—সব মিলিয়ে ও যেভাবে বসে আছে তাতে মনেই হচ্ছে না ওকে কখনও দেখেছেন। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে প্রতুলবাবু বললেন, 'ভেতবে মেয়েদেব ভিড। বিয়েব ব্যাপাব হলেও মেয়েরা তো মেয়েই। আপনি এখান থেকেই দেখাসাক্ষাৎ করুন।'

প্রতুলবাবুব গলাব স্বর শুনে ঘবেব মেয়েরা চুপ কবে গিয়েছিল। সবাই এদিকে তাকিয়ে। মাথা নিচু কবে বসেছিল দীপা। ঘব চুপচাপ হয়ে যেতেই বিস্ময়ে মুখ তুলল। তাব নজর দবজায় আসতেই অমরনাথের চোখাচোখি হল। অমরনাথ কি কববেন বুঝতে না পেবে হাসবার চেষ্টা কবলেন। দীপাব শবীরটা যেন সিংহাসন ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে নতুনদি ব[illegible] উঠলেন, 'ওমা, করছ কি! নতুন বউ আসন ছেড়ে ওঠে নাকি?'

দীপা ধীরে ধীবে শরীরটাকে ছেড়ে দিল। অমবনাথেব কথা বলতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু সুভাষচন্দ্র বললেন, 'চলুন জামাইবাবু, বাইবে গিয়ে বসি।'

এসব অনেকক্ষণ আগেব কথা। খাওয়া-দাওয়া হযেছে এবং সেইসময প্রতুলবাবু একবাব সামনে এসে দাঁড়িয়েও ছিলেন। কিন্তু যে যত্ন তিনি ওঁকে চা-বাগানে করেছিলেন তাব সিকিভাগও এখানে পাননি। অতএব সুভাষচন্দ্র কি বলতে চা[illegible] তা তিনি ভালভাবেই বুঝতে পাবছেন। মেয়েটা সুখী হোক, দীপা মবে গিয়েছে, আশালতা রাজেন্দ্রাণীব মত সুখে বেঁচে থাকুক। নবনী খেয়ে দেয়ে হাসপাতালে চলে গিয়েছিল। ললিতার অবস্থা বিকেলেও ভাল ছিল না। শ্যামল বাবার মুখাগ্নি করেই হাসপাতালে ফিরে এসেছে। চা-বাগানে ওর এই আচবণে ঢি ঢি পড়ে গেছে। গলায় কাছা ঝুলিয়ে সে ললিতার জন্যে রাত জাগছে তা মালবাবুও পছন্দ কবছেন না। নবনীকে তিনি তাই বলেছেন। কিন্তু ছেলেটার সাহায্য কাজে আসছে। তাছাড়া যে কাবণে ললিতা বিষ খেয়েছিল সেই কাবণটা এখনও থেকে গিয়েছে। ললিতার জন্যেই তাই শ্যামলকে প্রয়োজন। নবনী বিয়েবাড়ি থেকে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল হাসপাতাল থেকে খবরটা নিয়ে সে এখানেই চলে আসবে। হাকিমপাড়া থেকে ধড়ধড়া নদী ডিঙ্গিয়ে হাসপাতালে যেতে তিন মিনিট লাগে। অমবনাথ সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'নবনী তো এখনও এল না। ওর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। হোটেল পর্যন্ত বেচারা একা একা যাবে, এটা ভাল দেখায় না, আমাদের সঙ্গেই তো এসেছে।'

সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন জামাইবাবু একটা অজুহাত খুঁজছেন এখানে আরও কিছুক্ষণ কাটানোর। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন আমরা বাস্তায় গিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করি। যদি রিকশা পেয়ে যাই তাহলে দাঁড় করিয়ে রাখব।' অমরনাথের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই

তাঁকে নিয়ে বাইরে আসতেই নবনীকে দেখতে পাওয়া গেল। ওঁদের দেখেই নবনী চিৎকার করে উঠল, 'সুসংবাদ আছে দাদা। ললিতার জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার বলল বিপদ কেটে গেছে।'

নতুনদি জোর করে খাইয়ে দিলো দীপাকে, 'না বললে চলে আশা! এখন থেকে শরীরটাকে ঠিকঠাক রাখতে হবে। এতদিন কার সঙ্গে শুতে তুমি?'

এইভাবে পাঁচজনের সামনে কেউ হাতে খাবার তুলে খাইয়ে দিচ্ছে, খুব রাগ হচ্ছিল দীপার। সে খাবে না বলেছিল এইটেই তার অপরাধ। এতক্ষণে বুঝে গিয়েছে বাবা আর এবাড়িতে নেই। বাবার সঙ্গে মামা আর নবনীকাকু এসেছিল। ওরাও নিশ্চয়ই চলে গিয়েছে।

নলিনী খাওয়া দেখছিলেন, ধমকে উঠলেন, 'প্রশ্ন করলে জবাব দাও না কেন? বাপ মা কি তোমাকে সহবৎ শেখায়নি? নাকি এই বাড়ির লোকজনকে পছন্দ হচ্ছে না?'

'ঠাকুমার সঙ্গে।' ঠোঁট খুলে জবাব দিল দীপা।

নতুনদি বললেন, 'হুম্। তিনি তোমাকে খুব ভালবাসতেন?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়ের পর কি কি করতে হবে বুঝিয়ে বলেছেন?'

'হ্যাঁ।'

নলিনী ছাড়া সবাই গলা খুলে হেসে উঠল। নতুনদি কোনমতে হাসি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলেছেন তিনি? আহা, লজ্জা কি, বল না?'

দীপা গড়গড় করে বলে গেল, 'এবাড়ির সবাইকে নিজের বাড়ির লোক ভাবতে হবে, গুরুজনদের আদেশ মান্য করতে হবে, শ্বশুরমশাইকে বাবা শাশুড়িকে মা বলতে হবে, ছুটোছুটি করা চলবে না, চেঁচিয়ে কথা বলা নিষেধ, এইসব।'

সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকাল। নতুনদি বললেন, 'খুব ভাল। এসব তো করতেই হবে। তোমার ঠাকুমা অতুলের ব্যাপারে কিছু বলে দেননি?'

দীপার কপালে ভাঁজ পড়ল। সবাই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কয়েক সেকেন্ড চলে গেলে একজন বলল, 'অতুল কে জানো তো? তোমার বর।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'হুঁ। ঠাকুমা বলেছে দেবতার মত মনে করতে হবে।'

'দেবতার মত? অ্যাঁ?' নতুনদির গলা থেকে শব্দ তিনটি ছিটকে উঠল সেই সঙ্গে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল। নতুনদিকে নলিনী ধমক দিলেন, 'আঃ, তোমরা শুধু হেসেই মরছ। ওদিকে আমার ছেলেটা জেগে জেগে কাহিল হয়ে পড়ল। যা বলার ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে নিয়ে চল। ফুলশয্যা কি রাত পোয়ালে হবে?'

নতুনদি বললেন, 'শোন আশা, আজ তোমার ফুলশয্যা। মেয়েদের জীবনে একবার মাত্র এই রাতটা আসে। আজকের রাত্রে বরের সঙ্গে তোমার আলাপ হবে। সে যা যা বলবে তাই করবে। যা যা করতে বলবে তাই মান্য করবে। কোন কাজে বাধা দেবে না। বুঝলে? আজকের রাত্রে সে যদি খুশি হয় তোমার ব্যবহারে তাহলে সারাজীবনে তোমাকে আর দুঃখ পেতে হবে না। মাথায় ঢুকেছে? তোমাকে আজ থেকে বরের পাশে শুতে হবে।'

দীপা শক্ত হয়ে বসে রইল। নতুনদি সেটা লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন, 'কি হল?'

নলিনী বললেন, 'কি আবার হবে। শরীরে তেল আছে, না শুকানো পর্যন্ত ওইরকম করবে। নাও, ওঠো সবাই। আমারই ঘুম পাচ্ছে তো খোকার দোষ কি!'

তাকে বাথরুম সেরে আসতে বলা হল। দীপা ব্যাপারটা বুঝতেই পারছিল না। সবার মুখ চোখে কেমন যেন রহস্যময় হাসি। ঘুমের কথা হচ্ছে অথচ তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করছে না ঘুম পাচ্ছে কিনা। তাকে আজ থেকে বরের পাশে শুতে হবে। ওই কথাটা বলার জন্যে ওরা কত কি না বলে গেল।

মেয়েরা যখন দীপাকে নিয়ে ফুলশয্যাব ঘবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তখন প্রতুলবাবু এলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহিতদেব মাথাব ঘোমটা বড হল। সম্পর্কে যাঁরা দিদি বা বোন তাঁরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালেন। প্রতুলবাবু দীপাব সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলেন, 'হুম। নলিনী, কালীবাড়িতে পুজো দিয়েছ?'

'দিয়েছি। তুমি আবাব এখন এলে কেন?' নলিনীর গলায় মৃদু প্রতিবাদ।

'একশবার আসব। এই বাড়ি আমার। ওর বাপ আমাকে না জানিয়ে চলে গিয়েছে। ভদ্রতা বলে কিছু নেই! তোমবা সব একে বলে টলে দিয়েছ তো?' প্রতুলবাবুব গলাব স্বর অন্যরকম শোনাচ্ছিল। তাঁব মুখ থেকে ভেসে আসা গন্ধ চাপা ছিল না।

'সব কবেছি। তুমি যাও, বিশ্রাম নাও গে।'

'বিশ্রাম আমি একবারে নেব নলিনী। চীফ মিনিস্টারকে আজ এবাড়িতে আনতে পাবলাম না এ যে কত বড পবাজয় আমার— ! উফ্।' চোখ বন্ধ করলেন তিনি।

প্রতুলবাবু বাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে, তিনি না সবলে এঁরা এগোতে পারছিলেন না।

নতুনদি বললেন, 'ছেলেব বিয়ে দিয়ে তাডাতাডি বউ আনলেন চীফ মিনিস্টারেব জন্যে তো নয়। যে জন্যে এনেছেন তা হলেই তো সব সমস্যার সমাধান।'

'ঠিক। তুমি যা বোঝ নলিনী তা বোঝে না।' পকেট হাতড়ালেন প্রতুলবাবু। তারপর একটা কাগজেব মোড়ক বের কবলেন। মোড়কেব ভেতব মোড়ক। সেটি তিনি এগিয়ে দিলেন, 'খোকাকে আমি এক পুরিয়া খাইয়ে দিয়েছি। দেবী চৌধুবাণীব কালীবাড়ির সন্ন্যাসী দিয়েছেন আমাকে। পবীক্ষিত সত্য। খোকাকে যা বলাব একটু আগে বলে এলাম। তুমি এই মেয়েটাকে ইচ্ছে কবলে পুবিয়াটা খাইয়ে দিতে পার।' এবাব পা টলল প্রতুলবাবুব।

নলিনী বিবক্ত হলেন খুব, 'সে হবেখন। এখন সবো তো। এত করে বললাম এসব নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে না অথচ। যাও, যেখানে ইচ্ছা।'

পুরিয়াব মোড়ক পকেটে বেখে দিয়ে ঘুবে দাঁড়ালেন প্রতুলবাবু, 'ঠিক হ্যায়। যাচ্ছি। তবে আমি কাজে বিশ্বাস কবি না। ফল দেখতে চাই।' প্রতুলবাবু হন হন করে বেরিয়ে গেলেন। দলটা আবার এগোল। এসব কথাব অর্থ দীপাব মাথায় ঢুকছিল না। সে শুধু একটা অভিমানে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। অমরনাথ যে তাকে না বলে চলে গিয়েছেন এটা সে ভাবতে পাবছে না। বাবা কি চা-বাগানে ফিবে গেল। বাবা তাব সঙ্গে একটাও কথা বলল না। হঠাৎ সে ফুপিয়ে উঠল সশব্দে।

নলিনী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবে কি হল আবাব?'

নতুনদি দীপাব মাথায় হাত বোলালেন, 'আহা। ঘাবড়ে গিয়েছে বেচারা ওইসব কথা শুনে। আশা, ও আশা, ওর কথায় কিছু মনে কব না। চুপ কবো।'

চুপ সে কবে গেল। ফুলশয্যার ঘবে ঢুকল সবাই। জলপাইগুড়িতে ফুলের দোকান নেই। সবরকমেব ফুল সাবা বছর পাওয়া যায় না। এ বাড়ির বাগানে যে ফুল ফুটেছিল তাই দিয়ে ফুলশয্যার খাট সাজানো হয়েছে। নেটেব মশারিব মধ্যে অতুলচন্দ্র শুয়ে আছে লেপ চাপা দিয়ে।

নতুনদি নলিনীকে বললেন, 'ছেলের ফুলশয্যাব ঘবে মায়ের থাকতে নেই। যাও এখন।'

নলিনী আড়চোখে ছেলের দিকে তাকালেন. তার চোখ পিটপিট করছে। নলিনী বললেন, 'যাচ্ছি বাবা। তা তোরাও চল এখান থেকে। এদের ফুলশয্যায় আড়িপাতার দরকার নেই। উনি নিষেধ করেছেন।'

নতুনদি বললেন, 'তা আমি বুঝেছি। খাটের তলায় কেউ আছে কিনা দ্যাখো।'

শুধু খাট না, আলমারির পেছন থেকেও দুজন বের হল। সবাইকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে নতুনদি বললেন, 'দরজায় খিল তুলে দাও। ওইখানে সুইচ আছে। ইচ্ছে হলে আলো নিবিয়ে দেবে। মশারি বেশী ফাঁক করে উঠো না, মশা ঢুকে যাবে। কোন ভয় নেই। বুঝলে ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল। নতুনদি ওর চিবুকে আঙুল ছুঁইযে চুমু খেলেন। তারপর দীপাকে দরজা পর্যন্ত টেনে এনে নিজেই সেটাকে ভেজিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ঝটপট খিল তুলে দিল দীপা। শব্দটা হওয়ামাত্র বাইরে হাসির আওয়াজ উঠল। দীপার কপালে ভাঁজ পড়ল। ওরা এমন হাসাহাসি করছে কেন ? শব্দটা মিলিয়ে গেলে সে ঘুরে দাঁড়াল। বিছানায় কেউ শুয়ে আছে তা বুঝতে ভাল করে নজব দিতে হয়। কিন্তু এই মুকুট, এইসব গযনাগাটি পবে তাকে শুতে হবে নাকি ? কেউ তো বলে দেয়নি ফুলশয্যার রাত্রে এসব খুলে ফেললে অন্যায় হয় কিনা। সে মুকুটটা খুলে টেবিলে বাখল। তাবপর আলোর দিকে তাকাল। না, আলো নিবিয়ে অচেনা জায়গায় সে শুতে পাববে না।

মশারিটা সামান্য ফাঁক কবে সে বিছানায় উঠে বসল। পাশাপাশি দু'জোড়া বালিশ। গোলাপ ফুলের পাপড়িতে প্রায ঢাকা। সে বিছানায় উঠতেই অতুলচন্দ্র চোখ ফেবাল। দীপা ঠোঁট মোচড়াল। তার পায়ের কাছে লেপ তো দূবের কথা একটা চাদর পর্যন্ত নেই। সে মুখ ঘোরাল, 'আমি কি গায়ে দেব ?'

অতুলচন্দ্র মিনমিনে গলায় বলল, 'এই লেপের তলায় তোমাকে শুতে হবে।'

'কেন ? আমার আলাদা লেপ নেই কেন ?'

'আমি জানি না।'

'তোমাদের বাড়িতে আমি এসেছি। তোমাব লেপটা আমাকে দাও।'

'না। আমি কাউকে কিছু দিই না। সবাই আমাকে দেয়। তুমি তাড়াতাড়ি তোমাব জামাকাপড খুলে ফেল। আমি আর জেগে থাকতে পারছি না।' অসহিষ্ণু গলায় বলল অতুলচন্দ্র। তার গলার স্বর শেষদিকে ক্যানকেনে শোনাল।

'কি ?' প্রায় চিৎকার করেই উঠল দীপা।

'চেঁচামেচি কবলে আমার মাথায় লাগে। আমি কিন্তু বাবাকে বলে দেব। তাড়াতাড়ি সব জামাকাপড় খুলে আমার পাশে এসো।' একটানা বলে গেল অতুলচন্দ্র।

'এম্মা ! একি কথা ! জামাকাপড় খুলব কেন ?'

'স্বামীর পাশে বউকে ওইভাবে শুতে হয়।'

'বাজে কথা। আমার মা বাবা তো স্বামীস্ত্রী। আমি কোনদিন ওদেব জামাকাপড় খুলে শুতে দেখিনি। যদি তোমার একথা মাকে বলি না মেরে হাড় ভেঙে দেবে।'

'আমাকে আমার বাবা বলেছে।'

'কি বলেছে ?'

'আঃ, আমি কথা বলতে পারছি না। এসো।'

'তোমার বাবা মা জামাকাপড় না পরে শোয় ? ছি ছি ছি। আমি বাবা এসব খুলতে পাবব না। খুললে আমার ঘুমই আসবে না।' উল্টোমুখ করে শুয়ে পড়ল দীপা। দুজনের

মাঝখানে ব্যবধান বড় জোর এক হাত। তার ঠাণ্ডা লাগছিল। অনেকক্ষণ কুঁকড়ে শুয়ে থেকেও তার ঘুম এল না। ঠাণ্ডাটা এবার বাজনা বাজাচ্ছে দুপাটি দাঁত নিয়ে। সে মৃদু গলায় ডাকল, 'অ্যাই ?'

ওপাশ থেকে কোন জবাব এল না। দীপা আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার লেপটা কি খুব বড় ?' এবারও সাড়া মিলল না। দীপা উঠে বসল। একদম আপাদমস্তক লেপে ঢেকে ঘুমাচ্ছে যে তার ওপর প্রচণ্ড রাগ হল। সে ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছে জেনেও ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। লেপের একটা প্রান্ত ধরে সে টানতে লাগল। অতুলচন্দ্র প্রতিবাদের সুর গলায় তোলায় চেষ্টা করে পাশ ফিরে শুতেই অনেকটা লেপের অধিকার পেয়ে গেল দীপা। এই লেপটা কি বাগান থেকে এসেছে ? নতুন নতুন গন্ধ। ওয়াড় পরানোর পর বুঝতেই পারছে না সে। যদি আসে তাহলে বাবারও ভুল হয়েছে। দুটো ছোট লেপ পাঠালেই পারত তাহলে তাকে এভাবে টানাটানি করতে হত না। লেপের উত্তাপে এখন আরাম হল দীপার। ওপাশে কোন সাড়া নেই। হঠাৎ মনে হল সে কোন অন্যায় কথা বলে ফেলেনি তো যার জন্যে অতুলচন্দ্র রেগে গিয়ে কথা বলছে না। এরা আজ থেকে বর যা বলবে তাই করতে উপদেশ দিয়েছে। কিন্তু জামাকাপড় কেন খুলে শুতে যাবে সে ? বর যদি পাগল হয় তাহলে বউ তার কথা শুনবে ? অসম্ভব ! জামাকাপড় খুলে যে শুতে বলে সে তো পাগল।

নিজের আচরণের সমর্থনে যুক্তি খুঁজে পেয়ে কিছুক্ষণ ভাল থাকল দীপা। কিন্তু অতুলচন্দ্র চুপচাপ থাকায় আবার অস্বস্তি হল। সে ডাকল 'অ্যাই'

অতুলচন্দ্রর সাড়া মিলল না। দীপার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি চাপল। সে ধীরে ধীরে লেপ ধরে টানতে লাগল। ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলেও লেপ সরে গেলেই কথা বলতে বাধ্য হবে। এই ঠাণ্ডায় গায়ে চাপা না দিয়ে কেউ শুতে পারবে না। লেপটা সরে আসছিল হড়হড়িয়ে। অতুলচন্দ্রের কাছ থেকে বাধা আশা করছিল দীপা। পুরোটা সরে আসা মাত্র গলা থেকে ছিটকে আসা চিৎকার গোঙানি হয়ে গেল। কোনমতে লেপেই মুখ চোখ চেপে ধরল সে। সমস্ত শরীরে কাঁপুনি। সেই অবস্থায় দুই হাতের সমস্ত শক্তি দিয়ে লেপটাকে ছুঁড়ে ফেলল অতুলচন্দ্রের ওপর। একটা হাড়জিড়জিড়ে সম্পূর্ণ নগ্ন শরীর কুঁকড়ে পড়ে আছে,—চোখের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এই ছবিটাকে সে কিছুতেই সরাতে পারছিল না। কি রকম গা গোলানি ভাব চলে এল শরীরে। সে বিছানার এককোণে চলে এল। অতুলচন্দ্র ঘুমাচ্ছে। এই কাণ্ড ঘটল তবু তার ঘুম ভাঙেনি।

পা মুড়ে বসে দীপা লেপের স্তূপটাকে দেখল। অতুলচন্দ্রকে লোক বলে ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। খোকন কিংবা বিশু যখন ফুটবল খেলতে খেলতে গেঞ্জি খোলে অথবা নদীতে স্নান করতে খালি গায়ে জলে ঝাঁপ দেয় তখন তার মাথায় কোন ভাবনাই আসত না। গা গুলিয়েও উঠত না। এই ছেলেটার শরীর দেখে হল কেন ? সম্পূর্ণ নগ্ন মানুষের চেহারা কি এমন বীভৎস হয় ? কিন্তু না। মশারির ভেতরও ছেলেটার শরীরে শুধু কয়েকটা হাড় দেখতে পেয়েছে সে। বিজ্ঞান বইতে যে নরকঙ্কালের ছবি ছাপা আছে তাকে যদি বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবিকল এমন দেখাবে। দীপার মনে পড়ল অতুলচন্দ্র তাকে জামাকাপড় ছেড়ে শুতে বলেছিল। নিজে আগেভাগেই জামাকাপড় খুলে লেপের তলায় চলে গিয়েছিল। ওকে নাকি ওর বাবা এই কাজ করতে বলেছে। এ বাড়ির নিয়ম নাকি এটা ? কি বিশ্রী নিয়ম। দীপা হাঁটুতে চিবুক রেখে বসে রইল। মশারির ভেতরেও ঠাণ্ডায় বসে থাকা ক্রমশ কষ্টকর হয়ে উঠল তার। ঘুমের কোন বালাই নেই।

বাইরের পৃথিবীতে কোন শব্দ নেই। চা-বাগানে এইসময় জেগে থাকলে বেতালা মাদল

বাজতে শোনা যায়। জলপাইগুড়িতে নিশ্চয়ই কেউ মাদল বাজায় না। দীপা আর পারছিল না। খাটের একপাশে অতুলচন্দ্রের নগ্ন শরীরের দিকে পেছন ফিরে লেপের প্রান্ত টেনে শরীর ঢেকে শুয়ে পড়ল সে। একটু একটু করে ঘুম জড়িয়ে নিল তাকে।

হঠাৎ বুকের পাঁজরে প্রচণ্ড চাপ পড়তেই নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল দীপার। চটকে যাওয়া ঘুম এবং নিঃশ্বাসের কষ্টে সে ককিয়ে উঠল, 'বাবাগো।' এবং এখনই দুটি শীর্ণ হাত প্রাণপণে তার জামা ছিঁড়ে ফেলতে চাইল, 'খোল, খোল, জামা। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে কথা শোননি। খোল।'

দীপা অতুলচন্দ্রকে বুঝতে পারল। কিন্তু সে নিজের জামা দুহাতে আঁকড়ে ধরেও চোখ খুলল না। সে জানত চোখ খুললেই অতুলচন্দ্রর নগ্ন শরীর দেখতে হবে। এই কয়েকবারের চেষ্টাতেই হাঁপিয়ে উঠেছিল অতুলচন্দ্র। এবার সে দীপার পেটের কাছে গোঁজা শাড়ির প্রান্ত ধরে টান দিল। দীপা প্রতিবাদ করল চোখ বন্ধ করে, 'আঃ, কি হচ্ছে? আমার জামাকাপড় ধরে টানছ কেন?'

'আমি আবার ওষুধ খেয়েছি। বাবা বলেছে তোমাকে আনা হয়েছে বাচ্চা দেওয়ার জন্যে। কাপড় না খুললে তোমার বাচ্চা হবে কি করে?' ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল তার। দীপার কাপড় কোমর থেকে খুলে এলেও গিঁটটা আলগা হয়নি। কয়েক বার সেটাকে খোলার চেষ্টা করে হাল ছাড়ল অতুলচন্দ্র, 'আমি ওষুধ খেয়েছি। বাবা বালিশের নিচে রেখে গিয়েছিল। আবার ঘুমিয়ে পড়লে বাবা বকবে।'

'কিসের ওষুধ?'

'আমি রোজ যে ওষুধ খাই সেটা না। এই ওষুধ খেলে বাচ্চা তৈরী করা যায়। আমি তো বেশীদিন বাঁচবো না তাই বাবা—উঃ, খোল না কাপড়।' ঝাঁপিয়ে পড়ল নগ্ন শরীরটা দীপার ওপর। আর নিজের অজান্তেই প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল দীপা দুই হাতে। সঙ্গে সঙ্গে অতুলচন্দ্রের শরীরটা ছিটকে চলে গেল খাটের প্রান্তে। মশারির ছত্রির আওয়াজ উঠল। একটা ককানির শব্দ কানে এল। এবং সেই সঙ্গে কান্নার স্বর উঠল, 'তুমি আমাকে মারলে? উঃ বাবা। তুমি মারলে? আজ অবধি কেউ আমাকে মারেনি, জানো?'

দীপা উঠে বসেছিল। প্রচণ্ড রাগে তার শরীর কাঁপছিল। এবং এখন অতুলচন্দ্রের নগ্ন শীর্ণ দেহ তার দৃষ্টিতে ছিল না। সে চাপা গলায় বলল, 'আবার যদি আমার গায়ে হাত দাও তাহলে মেরে তোমার হাড় ভেঙ্গে দেব।'

'হাড় ভেঙ্গে দেবে?' কাতর বিস্ময় অতুলচন্দ্রের গলায়।

'হ্যাঁ।'

'আমি বালিশে মাথা রেখে শোব? আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'শোও।'

প্রায় কাঁপতে কাঁপতে লেপটার প্রান্ত শরীরে টেনে নিয়ে অতুলচন্দ্রকে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়তে দেখল দীপা। তারপর থেকে একটা কুঁই কুঁই শব্দ বেজে গেল সমানে। অনেকক্ষণ দীপা পাথরের মত বসে রইল। কি শুনল সে? তাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে বাচ্চা দেবার জন্যে? চকিতে চা-বাগানের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ললিতার গলা বেজে উঠল কানে। ললিতা শ্যামলদার কাজে প্রতিবাদ করছিল। সেই ললিতা বিষ খেয়েছে। বিয়ের দিন সবাই এই নিয়ে কথা বলছিল তার সামনেই। ললিতার পেটে বাচ্চা এসেছে। দীপার বুঝতে অসুবিধে হয়নি পেটে বাচ্চা এসেছে বলেই সে বিষ খেয়েছে। ওটা আসুক তা চায়নি বলেই চা-বাগানের ভেতরে প্রতিবাদ করেছিল সেদিন। শ্যামলদা যা

করেছিল তাই করতে চেয়েছে অতুলচন্দ্র। কিন্তু ওষুধ খেয়েছে কেন? শ্যামলদা কি ওষুধ খেয়েছিল? বাচ্চা করতে গেলে কি ওষুধ খেতে হয়? মাথায় কিছু ঢুকছিল না তার। শুধু বুঝতে পারছিল খুব একটা গর্হিত ব্যাপার করতে যাচ্ছিল অতুলচন্দ্র। কিন্তু ও বলল কেন বেশীদিন বাঁচবে না! বর মরে গেলে বউ বিধবা হয়। বিধবা মানে—দীপার চোখের সামনে চট করে মনোরমা চলে এলেন। মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজহীন আলোচালের ভাত আর নিরামিষ তরকারি নিয়ে খেতে বসেন মনোরমা। অসম্ভব! সে বিধবা হতে পারবে না। অতুলচন্দ্রের দিকে তাকাল সে। লেপমুড়ি দিয়ে সমানে কুঁই কুঁই করে যাচ্ছে। ওই ছেলেটা মরে গেলেই তাকে বিধবা হতে হবে। খুলে যাওয়া কুঁচিগুলো কোমরে গুঁজল সে। তারপর একটু সরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'অমন করছ কেন?'

'আমার কষ্ট হচ্ছে।'

'কিসের কষ্ট?'

'নিঃশ্বাসের।'

'তোমার বাবা মাকে ডাকব?'

'না। কিছুতেই না।'

'কেন?'

'বাবা খুব রেগে যাবে।'

'তোমার কষ্ট হচ্ছে শুনলে রেগে যাবে?'

'না। দুদুবার ওষুধ খেয়েও আমি যেটা করার কথা সেটা করতে পারলাম না বলে রেগে যাবে। বাবা বলেছে একজন বংশধর চাই আমি মরে যাওয়ার আগে। আমি সবটা জানতাম না. বাবার কথায় আনা আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছে। ওষুধ না খেলে আমার শরীর শক্ত হয় না বলে আনা বাবাকে ওষুধ আনতে বলেছিল। তুমি মারলে আমাকে। এখন আমি বাবাকে কি বলব?' গলার স্বর ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে অসছিল।

'এসব করতে হবে জানলে বিয়ে করতামই না।'

'বিয়ে এসব করার জন্যেই মানুষ করে। আমার রক্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। বুকের ভেতর ব্যথা করে। কোন ওষুধে কমে না। শুধু ঘুম পায়। সেদ্ধ ছাড়া কিছু খেতে পারি না। মরে তো যাবই তাই বাবা বলেছে আমার যদি ছেলে থাকে তবে তার মধ্যে আমি বেঁচে থাকব। তুমিও একা থাকবে না। তোমার ছেলে থাকবে।'

'আমি এখন পড়ি। এইসময় কেউ মা হয়?'

'ও। আমি ওসব জানি না। আমাকে যা করতে বলেছিল তা করে ছিলাম। এখন পারিনি জানলে যে কি হবে? কি আবার হবে! মরে যাব। তার বেশী কিছু হবে না তো। তুমি বিধবা হবে। এখন তো তুমি রাজি হলেও আমি কিছু করতে পারব না। এই ওষুধটা খাওয়ামাত্র শরীরটা কেমন হয়ে যায়। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে আবার ঘুম পেয়ে যায়। তুমি আমাকে মারলে বলে ঘুম পাচ্ছে না কিন্তু আর ওষুধ তো নেই। শোন. তুমি মিথ্যে কথা বলতে পার?'

'মিথ্যে কথা?'

'হুঁ। আমি বলব যা যা করার করেছি। তুমি সায় দেবে। এখন তাহলে আর কেউ কিছু বলবে না। বাচ্চা তো দশ মাস আগে হয় না।' অতুলচন্দ্র চুপ করে গেল। তার শরীর কাঁপছিল কারণ লেপটা নড়ছে। কুঁই কুঁই শব্দটা শেষপর্যন্ত বন্ধ হল। দীপা পাথরের মত বসে রইল। তার এখন শীতবোধও ছিল না।

দরজায় খুব জোরে জোরে আঘাত হতে ঘুম ভাঙ্গল দীপার। খাটের একপাশে কুঁকড়ে শাড়িতে মুখ মাথা ঢেকে শুয়েছিল সে। মাথা তুলে ঘরটাকে দেখল। বুঝল সকাল হয়ে গেছে। সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। ওপাশে অতুলচন্দ্র তখন লেপের তলায় চাপা পড়ে আছে। দীপা খাট থেকে নামতে গিয়ে আবিষ্কার করল সমস্ত শরীরে আড়ষ্টতা, গা ব্যথা করছে, দরজায় আবার আঘাত হল এবং নলিনীর গলা পাওয়া গেল, 'ভর দুপুর পর্যন্ত ঘুমাচ্ছে যে। এ কি রকম বউ! বাড়ি থেকে বলে-টলেও দেয়নি?'

দীপা খিল খুলতেই ওপাশের চাপে দরজা হাট হয়ে গেল। নলিনী আর আনা দাঁড়িয়ে আছে। নতুনদি বা অন্য মেয়েদের দেখতে পেল না সে। আর তখনই মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে উঠল আনা, 'ও মা, নতুন বউ-এর মুখখানা দ্যাখো, সিঁদুরে যে গোবব লেপা হয়ে রয়েছে। প্রথম রাত, সাতসকালে কি ঘুম ভাঙ্গে!'

'হুম্। বুঝেছি। সে এখনও ঘুমাচ্ছে?' নলিনী ঘবে ঢুকলেন। তাঁব চোখ মশাবির ভেতরটা দেখতে চাইছে। গম্ভীর গলায় তিনি হুকুম করলেন, 'চটপট মশাবিটা তোল আনা। কাকভোরে উঠে তিনি খববটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আগে তাঁকে শান্ত করি।'

'আর চিন্তা করাব কি আছে! সিঁদুব দেখে বুঝতে পারছ না। তোমাব ছেলেব মাথায় শমন এলে কি হবেএকেবারে ব্যাসদেবেব ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে গো!' মশারি তুলতে তুলতে কথাগুলো বলল আনা।

নলিনী দীপার দিকে ফিরলেন, 'কাল রাত্রে কোথায় শুয়েছিলে আশা?'

মাথা না তুলে দীপা জবাব দিল, 'বিছানায়।'

'আহা। বিছানায় না শুয়ে কি মাটিতে শোবে! বিছানাব কোনখানে?'

নলিনীর কথাব অর্থ বোধগম্য হল না দীপার। সে হাত তুলে দ্বিতীয় বালিশটাকে দেখাল। নলিনী বললেন, নানা, খোকাকে না জাগিযে ওখানকাব লেপ সবা। বিছানাব চাদব দেখব আমি। সেইটেই আসল।'

মশারি তোলা হয়ে গিয়েছিল। আনা ওপাশে সবে গিযে সতর্ক হাতে লেপের প্রান্ত তুলে অতুলচন্দ্রের দিকে সরিযে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল। এগিযে গিযেছিলেন নলিনী, বিছানা দেখতে দেখতে তাঁর মুখ থমথমে হয়ে যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত আনাব সঙ্গে তাঁব চোখে চোখে কথা হল। আনা ফিসফিসিয়ে বলল, 'আগে জিজ্ঞাসা কবতো, সেখানে খুব দৌড ঝাঁপ কবত কিনা। সেরকম বেশী কবলে নাকি আগেই ওসব চুকে যায়। মাথা গবম করো না।'

নলিনী ঘুরে দাঁড়ালেন, 'আশা, এদিকে এসো।' দীপা এগিয়ে গেল।

'বিয়েব আগে তুমি কি দৌড়াদৌড়ি কবতে?' নলিনী জানতে চাইলেন।

সত্যি কথা বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে পাবছিল না দীপা। বিয়েব পব বউ-এব দৌড়ঝাঁপ কবা উচিত নয় কিন্তু বিয়ের আগে? নলিনী রেগে গেলেন, 'কি ঘাঁটা মেয়েরে বাবা, প্রশ্ন করলে জবাব দেয় না। আমার কথা কানে ঢুকছে?'

ভয়ে ভয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেলল, 'আমবা মাঠে খেলতাম।'

'হুঁ! তোমাব মাসিক কবে হয় প্রথম?'

মাসিক শব্দটার অর্থ আন্দাজে ধরে নিল সে। ঠাকুমা বলেছিলেন ঋতু। মা বলেছিলেন পিরিয়ড। প্রতি মাসে হয় মেয়েদের বয়স হলে। তাই বোধহয় ইনি মাসিক বলছেন। সে মাথা নাড়ল, 'একবার হয়েছিল। এ মাসেই।'

'তারপরেও দৌড়েছ?'

'না।' এটাও সত্যি কথা।

নলিনী আনার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, 'কি বুঝছিস ?'

'জিজ্ঞাসা কব না সরাসবি ।' সে উপদেশ দিল ।

নলিনী আডচোখে ছেলেব দিকে তাকিয়ে আবার ফিরলেন, 'কালরাত্রে খোকা কিছু করেছে ? মেয়েমানুষ, মাসিক হয়ে গিয়েছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ কি বলছি ?'

দীপাব মাথা নিম্নগামী হল । চিবুক ঠেকল বুকে । আনা সেটা লক্ষ্য করে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'খোকা কি ওষুধ খেয়েছিল ?'

নীরবে একবাব মাথা নেডে দীপা জানাল, হ্যাঁ । সঙ্গে সঙ্গে আনা হেসে উঠল, 'ব্যাস । উত্তব পেয়ে গেছ । যাও তেনাকে নিশ্চিন্ত কব ।'

'খোকাকে ডাক । তাব শরীব কেমন আছে দেখি । সেটাও তো বলতে হবে । ওসব ওযুধ খেলে শুনেছি পবে শরীর খারাপ হয় ।' নলিণী এগিয়ে গেলেন নিজেই ।

'ও খোকা, খোকা ' খোকাবে !' লেপটা সরাতে যাচ্ছিলেন তিনি আনা বাধা দিল, 'করছ কি । লেপ সবিও না, ঠাণ্ডা লেগে যাবে ।' সে সন্তর্পণে মুখ থেকে লেপেব প্রান্ত সরিয়ে দিল, 'খোকা । খোকা !'

অতুলচন্দ্র চোখ মেলল । লাল টকটকে চোখ । তাবপব বিডবিড করে বলল, 'আমি আর ওই ওষুধ খাব না ।'

আনা খপ করে তাব গলায় বুকে হাত রাখল, 'মাগো কি ঠাণ্ডা ! তুমি তাড়াতাড়ি দাদাবাবুকে ডাক্তাব ডাকতে বল । নলিনী আর্তনাদ করে ছুটলেন । আনা অতুলচন্দ্রের মুখ ধরে বলল, 'ও খোকা, কি হয়েছে ?'

অতুলচন্দ্র বিডবিড করে বলল, 'মিথ্যে কথা বলবে । আমি যে পাবিনি, তুমি যে মেরেছ তা কাউকে বলবে না

সঙ্গে সঙ্গে আনা উঠে দাঁডাল । তাব চোখ দীপাব দিকে, 'তোমাব সঙ্গে ওর কাল রাত্রে কিছু হয়নি ?'

দীপা এবাবও সত্যি কথা বলল, 'না ।'

১১

সাবাটা সকাল একা এই ঘবে, দুপুব এখন খানখান ।

দীপাব কাছে কেউ আসেনি । এমন কি মুখ ধুতে অথবা বাথরুমে পৌছে দিতেও না । পুবো বাডিটাই যেন মৃক হয়ে রয়েছে সেই সকাল থেকে যখন অতুলচন্দ্রকে ওরা হাসপাতালে নিয়ে গেল । ঘরেব এক কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল দীপা । প্রথমে প্রতুলবাবু ছুটে এসেছিলেন । আব সেই সময অতুলচন্দ্র কথা বন্ধ করেছিল । গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠে চোখ ঘুবিয়ে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 'কখন থেকে এমন হয়েছে ?'

নলিনী ঠেস দিয়ে বলেছিলেন, 'উনি তো ঘুমে কাদা, খেয়াল করলে তো ?'

'তোমাব সঙ্গে শেষ কখন কথা বলেছিল ?' বাজখাঁই গলায় ঘব কেঁপে উঠল ।

অজান্তেই গলা থেকে স্বব বেবিয়ে এসেছিল, 'বাত্রে ।'

নলিনী বললেন, 'শরীরের সুখ নিলেই হয় না ছুঁড়ি যার   কাছ থেকে   নিলি তার শরীরটাকেও যত্নে রাখতে হয় । এখন কি হবে গো ? ডাক্তার এল না এখনও !'

প্রতুলবাবু আনাকে বলেছিলেন, চটপট কিছু একটা পরিয়ে দাও । হাসপাতালে নিয়ে যাব ।'

ওরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। বোধ হয় এই প্রথম নলিনীও আনাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন এক মাথা ঘোমটা দিয়ে। যাওয়ার আগে কেউ ডাকেনি দীপাকে। তারপর থেকে কেউ আসেওনি এ ঘরে। বাসীমুখ, বাথরুমের জন্যে ভার হয়ে যাওয়া শরীর আর সেই সঙ্গে খিদে বোধ হওয়া এবং মিলিয়ে যাওয়া, এই নিয়ে চুপচাপ বসেছিল দীপা। সে বুঝতে পারছিল না অতুলচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার সময় ওরা ওর দিকে অমন জ্বলন্ত চোখে তাকাচ্ছিল কেন। অতুলচন্দ্র কি মারা যাবে? মরে গেলে তাকে বিধবা হতে হবে। বিধবা হবার পর ওঁরা তাকে এ বাড়িতে রাখবে? নাকি চা-বাগানে পাঠিয়ে দেবে? সিদ্ধান্তটি সে আন্দাজ করতে পারছিল না।

খাটের অবস্থা একই আছে। কেউ বিছানা তোলেনি। দীপার একবার মনে হয়েছিল কিন্তু সাহস পায়নি। শুধু ফুলের পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেছে। শরীরের চাপে সেগুলোর অবস্থা খুব করুণ। সে খুঁটে খুঁটে সবকটাকে এক জায়গায় জমা করে রাখল। বিশ্রী দেখাচ্ছে ওগুলোকে। চোখের আড়াল করার জন্যেই সে একটা বালিশ চাপিয়ে রাখল ওপরে। এইসময় গাড়ির আওয়াজ হল। আর তার কিছুক্ষণ বাদেই প্রতুলবাবু ঘরে ঢুকলেন, 'ডাক্তাররা বলে দিল তোমার স্বামীর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। কথাটা তুমি বুঝতে পারছ?'

দীপা মুখ নিচু করল। প্রতুলবাবু বললেন, 'গতরাত্রে খোকার সঙ্গে তোমার শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল কিনা জবাব দাও।'

দীপার মুখ বুকে ঠেকল। প্রতুলবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন এই সময় আনার গলা পাওয়া গেল, 'এখন ওসব বলে কি হবে? কত করে বললাম একটু বড় সড় মেয়ে আনতে যার নিজেরই তাগিদ আছে। তা না, একটা কুঁড়িকে তুলে আনল। বাড়িতে একটা গৌরী ঘুরে বেড়াবে আবার সে পেটে বাচ্চাও ধরবে। এখন যা হবার হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ওনার আবার দাঁতকপাটি লেগেছে।'

প্রতুলবাবু জুতোয় শব্দ করে অন্যঘরে চলে যেতে আনা জিজ্ঞাসা করল, 'বাথরুম হয়েছে?' দীপা মাথা নাড়ল, না। আনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বলল, 'এসো।' পাশের ঘরে নলিনী ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। আনা বাথরুম দেখিয়ে দিল। সহজ হয়ে ফিরে আসার সময় শুনল সে নলিনী কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'তুমি ছেলেটাকে মেরে ফেললে। এত তাড়াতাড়ি ও মরত না। তুমি একটা রাক্ষসীর কাছে জোর করে ওকে ঠেলে দিলে! আমি কি নিয়ে থাকব। আমার যে কোনদিন ছেলে হবে না। ও মা গো!'

ঘরে ফিরে আনা বলল, 'চটপট ওই জামাকাপড় খোল। এই সময় অত সাজগোজ করে কেউ থাকে না। আটপৌরে জামাকাপড় তো ওই স্যুটকেসে আছে। কথা শেষ করে নিজেই সে স্যুটকেস খুলে জামা শাড়ি বের করল, 'শাড়ি পরিয়ে না দিলে তো ভাল করে পরতেও পারো না। সকালে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল আমার। খোকাকে বলেছিলাম শাড়ি খুলে নিবি। খুলে নিলে অত মজবুত করে পরা থাকে কি করে।' ঝটপট শাড়ি খুলে আটপৌরে শাড়ি পরিয়ে দিল আনা। তারপর বলল, 'জামাটা নিজে পরে নাও। একবার চোখেও দেখল না শরীর ডাঁটো হয়েছে কিনা ফট করে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এল। শোন আশা, আজ আর খাবারের নাম মুখেও নিও না। তিনি খাবি খাচ্ছেন হাসপাতালে আর তুমি ভাতমাছ খাচ্ছ এটা কেউ ভাল চোখে দেখবে না। তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে এ বাড়ি থেকে তোমার ভাত উঠল বলে।' আনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তখনই জুতোর শব্দ উঠল। প্রতুলবাবু এলেন, 'ভাল করে জিজ্ঞাসা করেছ? ডাক্তার কিন্তু অন্য রিপোর্ট দিয়েছে। ওর শাশুড়ি সকালে যা বলেছে তা ঠিক নয়। তুমি যাচাই

কর। আমাব হাতে বেশী সময় নেই। যেমন করেই হোক আমি উত্তরাধিকারী চাই।' প্রতুলবাবু একটু থেমে বললেন, 'আমি আবার হাসপাতালে চললাম আনা। সন্ধের পর ফিবব।'

জুতোব শব্দ মিলিয়ে গেল। গাড়ি বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। আনা মুখে আঁচল দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই অবস্থায় বলল, 'তোমার মাকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম, কথাটা তিনি কানেই নিলেন না। নিজেব মেয়ে হলে ঠিক নিতেন।'

এই সময় আলুথালু অবস্থায় নলিনী এসে দাঁড়ালেন, 'আনা, ওকে বুঝিয়ে দে কি সর্বনাশ হতে যাচ্ছে ওব। ওব মুখে চোখে তার কোন ছাপ নেই বে।'

'বুঝতেই পাবছে না বেচাবা।'

'বুঝতে পাবছে না? হুম। বাত্রে বুঝেছিল কি কবে?'

'বাত্রে কিছুই বোঝেনি।' ঠাণ্ডা গলায় জানিয়ে দিল আনা।

'অাঁ?' চোখ বড় হয়ে গেল নলিনীব।

'ও এখনও কুমাবী আছে।'

টলতে টলতে ছেলেব ফুলশয্যাব বিছানায় বসে পড়লেন নলিনী। আনা বলল, 'খোকা এখনও বেঁচে আছে। তিনি বলে গেলেন উত্তরাধিকারী চাই। তোমাব কি মত?'

নলিনী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কেঁদে উঠলেন। আনা বলল, 'যা বলার তা চটপট বলে ফেল। মতলব একটা কিছু করতে হবে।'

'তুই বল। আমাব মাথায় কিছু ঢুকছে না।' ফ্যাসফেসে গলায় বললেন নলিনী।

'মেয়েটাকে ওব বাপেব বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এক্ষুনি।'

'সে কি? উনি জানলে, মানে ওকে না বলে—।'

'উনি জানলে অন্তত আজ বাত্রে পাঠাতে দেবেন না। মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ করবে?'

'সর্বনাশ?'

'সর্বনাশ নয়? খোকাব পরে তোমাব গর্ভ নষ্ট হয়েছিল। আব কোনদিন পারোনি মা হতে। কিন্তু আমি তো তোমাব মুখ চেয়ে নিজের সর্বনাশ সহ্য করে [illegible] এতদিন। আজ তাই মুখ খুলছি। তুমি মুখ বন্ধ করে থাকবে?' আনাকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। তাব দিকে তাকিয়ে নলিনী বললেন, 'বেশ। তাই কব।'

সুটকেসটা এক হাতে তুলে নিয়ে দীপার হাত ধবে টেনে ভেতরেব বারান্দায় নিয়ে এল আনা। কিছু লোক এপাশে ওপাশে কাজ করছে। বারান্দা থেকে এপাশে সরে এল আনা। তাব হাতেব মুঠো দীপাকে ছাড়েনি। এদিকটায বড় বড় নাবকেল সুপাবির গাছ। তার ভেতব দিয়ে সে প্রায ছুটে চলল দীপাকে নিযে। ঘুবে ঘুবে পেছনেব একটা ছোট দরজা খুলে সে পাঁচিলেব বাইবে চলে এল। এপাশ ওপাশ দেখে বলল, 'তুমি একা বাপের বাড়িতে যেতে পাববে?'

কিছু না বুঝেই দীপা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। আনা তার মুখের দিকে তাকাল। তাবপব হাত নেড়ে দূবে দাঁড়ানো একটা বিকশাকে ডেকে জামার ভেতব থেকে একটা দু-টাকাব নোট বের করে দীপাব হাতে দিল, 'এই নাও গাড়িভাড়া। এই বিকশাওযালা, জলদি একে ঘাটে নিয়ে যাও। ওঠ। বাড়িতে গিয়ে যা দেখলে সব বলো। যাও।'

বিকশায উঠে পেছন দিকে যখন তাকাল দীপা তখন ছোট দরজাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আনা নেই। তিন চাকার রিকশায আড়ষ্ট হয়ে বসে হঠাৎ দীপাব সমস্ত শবীরে কাঁটা দিল।

কোনদিন সে একা যাওয়া-আসা করেনি। কবে শেষ জলপাইগুড়িতে এসেছিল তাও তার মনে নেই। যদি সে হারিয়ে যায় ? শহরে নাকি আজেবাজে লোক থাকে অনেক, তারা যদি তাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে কোনদিন কাউকে দেখতে পাবে না। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না আনা কেন তাকে এভাবে বাড়ি থেকে বের করে দিল। কেন নলিনীও তাতে সম্মতি দিলেন। সে স্যুটকেসটা সিটের পাশে চেপে ধরে কাঁটা হয়ে বসে রইল যতক্ষণ না রিকশাওয়ালা বলল, 'দিদি ঘাট আ গিয়া।' কখন শহরটাকে পার হয়ে এসেছে তা টের পায়নি দীপা। রিকশা থেকে নেমে সে বুঝতে পারছিল না কি করবে। রিকশাওয়ালা বলল, 'ঘাট ওহি দিকে আছে দিদি। হামাকে এক সিকি দিন।'

দুটো টাকা এগিয়ে দিল দীপা। লোকটা সেটাকে ভাঙিয়ে এক টাকা বারো আনা ফেরত দিল। স্যুটকেসটা তুলতে গিয়ে দীপার মনে হচ্ছিল হাত ছিঁড়ে যাবে। ঘাটের দিকে কোনমতে এগিয়ে গেল সে। এর মধ্যে অনেকেরই নজর পড়ছে তার ওপর। যে-কেউ এক-নজরে ভেবে নিতে পারছে তার সবে বিয়ে হয়েছে এবং সঙ্গে কেউ নেই বলে বিস্মিত হচ্ছে। দীপা দেখল সবাই একটা ছোট কাঠের ঘর থেকে টিকিট কিনে নৌকায় উঠছে। স্যুটকেস রেখে সে দু আনা দিয়ে টিকিট কিনে আনল। বিয়ের রাত্রে দু-দুটো নদী পার হতে হয়েছিল তাদের। প্রায় হিঁচড়ে হিঁচড়ে স্যুটকেসটাকে টেনে নৌকোয় উঠল সে। প্রচুর লোকজন উঠেছে। তারা সবাই এখন দীপাকে দেখছে। দীপা জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। সে ঠিক যাচ্ছে তো ? তার পাশে দাঁড়ানো একজন গলা নামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছ দিদিভাই ?' দীপা জবাব দিল না।

নৌকো ওপারে পৌঁছাল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হচ্ছে। এখন বিরাট চর পার হতে হবে। পক্ষীরাজ ট্যাক্সিগুলো চিৎকার করে লোক ডাকছে। যারা এই পয়সা খরচ করতে চায় না তারা হণ্টন দিয়েছে। কাশ গাছ আর বালিয়াড়ি ভেঙ্গে বার্নিশের কাছে পৌঁছে আবার নৌকোয় চাপবে তারা। দেখতে দেখতে জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেল। দীপার খুব কান্না পাচ্ছিল। সে এখন কি করবে ? স্যুটকেস বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না সে। শেষ পক্ষীরাজটা দাঁড়িয়েছিল। মোট দশ জন প্যাসেঞ্জার নেয় ওরা। কিন্তু পাঁচজন জুটেছে তার। ওপারের যাত্রী নিয়ে নৌকো ফিরে গিয়েছে।

'কোথায় যাবে খুকী ? বার্নিশে ?'

দীপা মুখ তুলে দেখল ময়লা সার্ট প্যান্ট পরা একটা আধবুড়ো লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে। সে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

লোকটা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে একটা টাকা আছে ? তাহলে আমার গাড়িতে উঠতে পার। পাঁচ জন আছে, ছয় জন হলেই ছাড়ব।'

দীপা হাতের মুঠো খুলে এক টাকা দশ আনা দেখাল।

লোকটা এবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবে বল তো ?'

দীপা চা বাগানের নাম বলল। তার হাত এখনও বাড়ানো। লোকটা সেখান থেকে একটা আধুলি নিয়ে স্যুটকেস তুলে নিল, এসো।'

গাড়িতে আড়ষ্ট হয়ে বসল দীপা। কোন গদি নেই। স্প্রিংগুলোর ওপর দুটো বস্তা পেতে দেওয়া হয়েছে। বসামাত্র লাগছিল। গাড়ি চলা শুরু করলে অসহ্য হয়ে উঠল। দীপার পাশে বসা লোকটা বলল, 'একটু রবার লাগাতে পারো না ভাই। পাছা গেল !' গাড়িটা থেমে গিয়েছিল। স্টার্ট নিচ্ছিল না। ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে একটা কাশগাছ ছিঁড়ে বনেট খুলে ইঞ্জিনের একটা জায়গায় ঢুকিয়ে দিল। ফিরে এসে একবার চেষ্টা করতেই স্টার্ট নিল

গাড়ি। একমুখ থুতু বাইরে ফেলে লোকটা বলল, 'এক টাকায় বস্তাই হয়। রবার চাইলে দেড় টাকা দিতে হবে।'

ঘাটে নামিয়ে দিতেই সবাই ছুটল দাঁড়িয়ে থাকা নৌকো ধরতে। লোকটা দীপাকে জিজ্ঞাসা করল, 'যাচ্ছ যেখানে সেখানে কে থাকে ?'

'বাবা-মা। ভাই। ঠাকুমা।'

'শ্বশুরবাড়ি থেকে পালাচ্ছ মনে হচ্ছে। আমার কি ! বাসুদেব বলে বাসটায় উঠবে। চল।'

লোকটা স্যুটকেস তুলে দিল নৌকোয়। শীত শীত করছিল দীপার। এখন রোদ ছড়ানো রয়েছে আকাশে। কিন্তু চওড়া নদীর ওপর দিয়ে বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। দুটো হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখেও কনকনানি থামাতে পারছিল না। সারাটা দিনের অস্নাত অভুক্ত শরীরটা টলছিল। নৌকোয় যাত্রীরা নিঃশব্দে ছিল শুধু মাঝিরা চিৎকার করে গুণ টানছে। হাওয়ার বিপরীতে যাওয়ায় ঠাণ্ডাটা লাগছে জব্বর। পাশে বসা এক মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'গরম জামা আনোনি সঙ্গে ?'

দীপা মাথা নেড়ে না বলল। মহিলা বললেন, 'সঙ্গে তো দেখছি কেউ নেই। যাচ্ছ কোথায় ? বাপের বাড়ি না শ্বশুর বাড়ি ?'

দীপা গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'বাপের বাড়ি।'

'কবে বিয়ে হয়েছে ?'

'তরশু।'

'ইয়ার্কি মারছ ? এটুকুনি মেয়ে, নাক টিপলে দুধ বের হবে, ইয়ার্কি মারছ ?'

দীপা জবাব দিল না। সে কঠিন মুখে বসে রইল। মহিলা তাঁর পাশের সঙ্গীর সঙ্গে ফিসফিস করে কিছু বললেন। দীপা শুনল লোকটা বলছে, 'পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত।'

মহিলা ধমকালেন, 'তোমার কি ! পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা। যে পালাচ্ছে তাকে পালাতে দাও। থাক, ওদিকে আর তাকিও না তুমি।'

মাঝি হাত না লাগালে টলায়মান নৌকো থেকে স্যুটকেস নিয়ে নামতে পারত না দীপা। ঘাটের দোকানগুলোতে খদ্দেরদের ঢোকার জন্যে হাঁকাহাঁকি চলছে। গত রাত্রে এই ঘাটেই ওরা জোড়া-নৌকোতে উঠেছিল। তখন অন্ধকারে কিছুই নজরে আসেনি। এখন দেখল গোটা পাঁচেক বাস দাঁড়িয়ে। কন্ডাক্টার খালাসিরা চিৎকার করে যাত্রী ডাকছে। শহরে যাওয়ার যাত্রীতে ভরে গেল নৌকো। বাসুদেব বাসটা কোথায়। কোয়ার্টার্সের সামনে দাঁড়িয়ে বা স্কুলে যাওয়ার সময় ওই নামের বাসটাকে দেখেছে। পেটের কাছে বড় করে লেখা থাকে বাসুদেব। দীপা স্যুটকেসটা তুলল। একটানে যতটা সম্ভব হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। একটা কুলি ছুটে এল তার কাছে, 'কোথায় যাবেন দিদি ? কোন বাস ?' দীপা জবাব দিল, 'বাসুদেব।'

'দ্যান আমারে। দু আনা দিবেন। আসেন জলদি। বাস ছাড়বার টাইম হইছে।'

দীপা দেখল লোকটা অবলীলায় স্যুটকেস তুলে দৌড়াতে লাগল। বালির ওপর দিয়ে শাড়ি পরে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল। চটিতে বালি ঢুকে যাচ্ছে, কাপড়ে টান পড়ছে। সে দেখল চারপাশের লোকজন, মায় খাবারের দোকানের বেঞ্চিতে বসেও সবাই তার দিকে হাঁ করে দেখছে। এবং তখনই তার খেয়াল হল বাঁ হাতের মুঠোয় ঘোমটার আঁচল ধরা আছে। সেই যে ফুলশয্যার ঘরে ঘোমটা দিয়ে আঁচল ধরেছিল আর তা খোলা হয়নি। এতক্ষণ মনেও ছিল না। সে চট করে হাত নামাতেই ঘোমটা সরল এবং কানে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার ঘোমটার প্রান্ত মুঠোয় ধরল দীপা। যে যাই ভাবুক, এতে তার ঠাণ্ডা কম লাগবে।

খালাসিটা স্যুটকেস বাসের মাথায় তুলে দিচ্ছে। দীপা বাসুদেব লেখাটা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ যে উদ্বেগ বুকের পাঁজরায় ভার বাড়াচ্ছিল সেটা উধাও হয়ে গেল। এই বাস রোজ তাদের কোয়ার্টার্সের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করে যখন তখন সে ঠিকঠাক পৌঁছে যাবে। লোকটাকে দু আনা দেওয়ার পর তার হাতে একটা টাকা রইল। গাড়ি ভাড়া কত? দীপার গলা শুকিয়ে গেল। এক টাকায় হয়ে যাবে? মনে পড়ল ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়া চেয়েছিল একটা টাকা কিন্তু তার হাত থেকে নিয়েছিল আট আনা। ওপর থেকে নেমে এসে খালাসিটা ধমকাল, 'এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? গাড়িতে উঠুন। কোথায় যাবেন?'

দীপা চা-বাগানের নাম বলল। খালাসি বলল, 'উঠুন জলদি। লেডিস সিটে বসে পড়ুন। গাড়ি এখনই ছাড়বে।'

শাড়ি সামলে বাসের সিড়ি ভাঙতে বেশ কসরত করতে হল। খুব ভিড় নেই। লেডিস লেখা একটা খালি সিটে বসে পড়ল সে। এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই ঝিমুনি এল। বাস যখন চলতে শুরু করল, যখন ঠাণ্ডার কামড় আরও বাড়ল, যখন রোদ্দুর টুপ করে সরে গিয়েই অন্ধকার নামল ময়নাগুড়ির ওপর, তখন কণ্ডাক্টার এসে দীপার পাশের জানলা বন্ধ করে দিল। দীপা চোখ মেলল। তার খুব কাঁপুনি আসছিল। ঠোঁট শুকনো। গলার ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তার দুটো হাঁটু কাঁপছিল। সে ঝাপসা দেখল। কণ্ডাক্টার একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

দীপার ঠোঁটে হাসি ফুটল। কি আশ্চর্য। আজ সবাই তাকে আপনি বলছে কেন? সে কি দুদিনেই এত বড় হয়ে গেল! দীপা হঠাৎ কণ্ডাক্টারকে ঝাপসা দেখল। কণ্ডাক্টার বলল, 'আরে, সঙ্গে কেউ নেই নাকি! চোখ দেখে মনে হচ্ছে জ্বর হয়েছে খুব। যাবেন কোথায়?'

দীপা কোনমতে চা-বাগানের নামটা উচ্চারণ করল। গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা মনে হল। উচ্চারণ করেই সে মুঠো খুলে টাকাটা তুলে ধরল। কণ্ডাক্টার সেটা খপ করে তুলে নিয়ে একটা টিকিট গুঁজে দিল। জানলায় মাথা হেলিয়ে দিল সে। বড্ড শীত করছে। বুকের পাঁজর পর্যন্ত কেঁপে উঠল। অন্ধকার চিরে ছুটে যাওয়া বাসে চোখ বন্ধ করতেই একটি নগ্ন হাড়জিরজিরে শরীর দেখতে পেল সে। কি বীভৎস ভঙ্গীতে হাঁপাচ্ছে সে। দীপা কেঁদে উঠল। কণ্ডাক্টার মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখল। যাত্রীরাও। কেউ কিছু বলল না।

প্রায় কানের কাছে মুখ এনে কণ্ডাক্টার কিছু চেঁচিয়ে বলতে চোখ খুলল দীপা। লোকটা আবার বলল, 'চা-বাগান আসছে। কোথায় নামবেন?' জিজ্ঞাসা করেই পেছনের জানলা খুলে দিল দেখার জন্যে। শীতল বাতাসের স্পর্শে কুঁকড়ে গেল দীপা। কোনমতে মুখ ফিরিয়ে সে বাইরে তাকাতেই ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। কণ্ডাক্টার জিজ্ঞাসা করল, 'বাগানে না চৌ-মাথায়?'

দীপা জবাব দিতে পারল, 'বাগানে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরের দড়ি ধরে টান দিল লোকটা। বেল বাজল এবং বাসটা গতি কমিয়ে থেমে গেল। দীপা উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াতেই মনে হল সে পড়ে যাবে। কণ্ডাক্টার সেটা বুঝতে পেরে খপ করে কনুই ধরল। লোকটার সাহায্যে সে কোনমতে নিচে নামতে পারল। খালাসি স্যুটকেস নামিয়ে দিলে আলোটুকু নিয়ে চলে গেল বাসটা। মুহূর্তেই চারধার অন্ধকারে একাকার। দীপা দাঁড়াতে পারছিল না। এরই মধ্যে মনে হল সে ঠিক জায়গায় এসেছে তো? ওরা তাকে ভুল করে অন্য কোথাও নামিয়ে দেয়নি তো? সে যে

কিছুই চিনতে পারছে না। সমস্ত শরীর টলতে লাগলে। স্যুটকেসের ওপর বসে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল দীপা। এইসময় তার শীতবোধও ছিল না।

বাস্তার দুপাশে লম্বা লম্বা দেওদার গাছ আকাশ ঢেকে রয়েছে। এইসব গাছে বাদুড়েরা আরামে ঝোলে। কুলি লাইনের মদেশিয়া ছেলে-মেয়েরা টর্চ আর গু লতি নিয়ে চলে আসে সন্ধে পার হলেই। একজন টর্চ ধরে রাখে বাদুড়েব শরীবে আব একজন গুলতি ছোঁড়ে তাক করে। ঝুপ শব্দ হয়। বাদুড়টা পড়ে যায় মাটিতে। সেটাকে ভরে নেয ওরা ঝোলায়। ওদেরই দুজন কান্নাটা শুনল। শুনে ছুটে এল। টর্চের আলো ফেলে তারা কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে বইল। আলোব স্পর্শ পেয়ে দীপা চোখ খুলল। তার কান্না রাগ মানছিল না। কিন্তু টর্চের ওপাশে কে আছে তা সে বুঝতে পাবছিল না।

নিজেদেব মধ্যে কথা বলাবলি করে ছেলেদুটো দৌড়ে সিঁড়ি টপকে মাঠে নামল। দীপার খুব ভয করতে লাগল। কাপডটাকে ভাল করে জড়িয়ে মাথা তুলে সে উঠে দাঁড়াল। আর তাবপরেই যেন দেখতে পেল দূরে আবছা আলো পর পর কয়েকটা। এবং তখনই সে শিউলি ফুলের গন্ধ পেল। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে বাজনা বাজতে লাগল যেন। শিউলির গন্ধটা তাকে উল্লসিত করল। ছুটতে গেল সে। এবং দু পা যাওয়ামাত্র আছাড় খেয়ে পড়ল মাটিতে।

ঠিক সেইসময় অমরনাথ বারান্দায় দাঁড়িয়ে মদেশিয়া ছেলেদুটোর সঙ্গে কথা বলছিল। তাঁব কোযার্টার্সের মুখোমুখি মাঠ পাব হলেই সিঁড়িটা। ছেলেদুটো তাই তাঁকে দরজা খুলতে বাধ্য কবেছিল। ওবা জানিয়েছে একটি মেয়ে স্যুটকেস নিয়ে রাস্তায় বসে একা কাঁদছে অঞ্জলি পেছনে এসে দাঁডিয়েছিল, 'ওমা, এই বাত্রে আবার কে কাঁদবে ?'

অমবনাথ জ্যাম্প্রো হ্যারি কেনটা একটি ছেলেব হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'চল দেখি।'

কৌতূহল নিয়ে অঞ্জলি দাঁডাল বারান্দাব প্রান্তে। ভেতরের ঘর থেকে সুভাষচন্দ্রের গলা ভেসে এল, 'এসব ফালতু ঝামেলায় কেন যে যায় !' অঞ্জলি জবাব দিল না। সে দেখল হ্যারিকেনটা সিঁড়ি পেবিয়ে আসাম রোডেব কাছে চলে গেল। এবং তারপরেই অমরনাথের আর্তচিৎকাবে সমস্ত চরাচর জেগে উঠল। দূর থেকেই অঞ্জলি অস্পষ্ট দেখল অমরনাথ মাটিতে বসে পড়েছেন। সব বিস্মৃত হয়ে সে তীরের মত অন্ধকার মাঠ ডিঙিয়ে ছুটে এল। অমবনাথ তখন দু-হাতে দীপাব শরীর আঁকডে ধরেছেন, 'দীপা, দীপু, দীপুমা, তুই এখানে ? দীপা তুই কথা বল। ও দীপু !'

অঞ্জলি ঝাঁপিয়ে পডল। স্বামীর হাত থেকে মেয়েকে টেনে নিল, 'কি হল ! ও এখানে কেন ? জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে ! চিৎকার করে না কেঁদে তোল ওকে। ঘরে নিয়ে চল।'

দু-হাতে মেয়েকে বুকে তুলে নিয়ে অমরনাথ দৌড়ালেন। তার বুক হাত যেন উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছিল। খোলা দবজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে হতবাক সুভাষচন্দ্রেব সামনে এক মুহূর্ত দাঁডালেন। তারপব ভেতরের ঘবে নিজেদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে চিৎকার করলেন, 'মা, তাডাতাড়ি এস। আমরা কি করেছি নিজের চোখে দ্যাখো !'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল অঞ্জলি, 'আঃ। পাগল হয়ে গেলে নাকি। মাথা ঠাণ্ডা কবে ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনো।' এই সময় মনোবমা প্রায় দৌড়েই ঘরে ঢুকলেন। অমবনাথ তখন লেপ টেনে দিচ্ছিলেন দীপার শরীরে। মনোরমার গলা থেকে শব্দগুলো ছিটকে এল, 'ও এখানে কেন ?' অমরনাথ মাথা নাড়লেন উন্মাদের মত, 'জানি না। বাস রাস্তায় স্যুটকেস নিয়ে বসেছিল। দ্যাখো তোমরা, আমি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি।' অমরনাথ টর্চ তুলে নিয়ে ছুটলেন। মনোরমা ততক্ষণে বিছানায় বসে পড়েছেন। বিকেলের পর তিনি

অমরনাথের বিছানায় সচরাচর বসেন না। ঝুঁকে পড়ে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে, তুই কার সঙ্গে এলি ? ও দীপা ! ওমা, এ যেন শরীরে উনুন জ্বলছে। ও বউমা, জল আনো, তাড়াতাড়ি জল আনো।'

অঞ্জলি ততক্ষণে একটা বাটিতে জল নিয়ে ন্যাকড়া ভিজিয়ে ফেলেছিল। তাই ভাঁজ করে শাশুড়ির হাতে তুলে দিল। মনোরমা সেটি দীপার কপালে চেপে ধরলেন। এপাশ ওপাশ করতেই পট্টি শুকিয়ে গেল। মনোরমা ক্রমাগত জল পট্টি দিয়ে চললেন। মাথার পেছনে বসে অঞ্জলি পাখা নিয়ে বাতাস করতে লাগল। এই ঠাণ্ডায় বাতাস কবা উচিত হচ্ছে কি না বুঝতে না পেরে সে একবার শাশুড়ির দিকে তাকাল। মনোরমা ঠোঁট টিপে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর মুখ এখন কঠিন দেখাচ্ছে। ছোট দুই ছেলে দূরে আলোয়ান গায়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছে। এমন কি উঠোনের বারান্দার দরজায় বুধুয়া কখন এসে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিট পাঁচেকের পর অমরনাথ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ফিরে এলেন। সুভাষচন্দ্র গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। ব্যাগটি তিনিই বহন করছিলেন।

অমরনাথ একটা চেয়ার এনে বিছানার পাশে রাখলে ডাক্তারবাবু সেটায় বসে প্রথমে নাড়ি দেখলেন। বুকে স্টেথো দিয়ে পরীক্ষা করলেন কয়েকবার। তারপর থার্মোমিটার বেব করে ঠোঁট ফাঁক করে জিভের তলায় ঢুকিয়ে মুখ চেপে ধরলেন। ঘবে কেউ কোন কথা বলছিল না। পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে ডাক্তাববাবু সোজা হয়ে বসলেন। তাঁকে খুব ভাবিত দেখাচ্ছিল। অমরনাথ বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কত জ্বব দেখলেন ?'

'একশ চার। নার্ভ খুব উইক। মনে হয় পেটে কিছু নেই। বুকে ঠাণ্ডা বসেছে বেশ। আমি ওষুধ দিচ্ছি। এখনই খাইয়ে দেবেন। ঘুমাতে দিন ওকে। রাত্রে বাড়াবাড়ি হলে আমাকে ডাকবেন। আর মাথাটা ভাল করে ধুইয়ে দিন।'

'মাথা ধোয়াতে গেলে ঘুম ভাঙবে না ?' অঞ্জলি জিজ্ঞাসা কবল।

'এখন ভাঙ্গুক। অবশ্য বেহুঁস হয়ে আছে। টের পাবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, এক বালতি জল আর মগ নিয়ে আসুন।'

বুধুয়া ছুটল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল বালতি আর মগ নিয়ে। তোয়াল গলায় চেপে ডাক্তারবাবু নিজেব হাতে মাথা ধুইয়ে দিলেন। অঞ্জলি মুছিয়ে দিচ্ছেন যখন তখন ডাক্তারবাবু বললেন, 'মনে হচ্ছে মেয়েটার ওপর দিযে বিরাট ঝড় বয়ে গিয়েছে। শুধু ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এলে নার্ভ এত উইক হয় না। একজন কেউ আসুন, আমি ওষুধ দিযে দিচ্ছি।' ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। অমরনাথ তাঁকে অনুসরণ করলেন।

শীতের রাতটা কেটে গেল। সুভাষচন্দ্রকে জোর করে ঘুমাতে পাঠিয়েছিল অঞ্জলি। এক ফাঁকে তাকে খাবারও এনে দিয়েছিল সে। কিন্তু বাকি তিনজনেব খাওযা তো দূরেব কথা কেউ বিছানায় শরীরও এলাতে পারেনি। ডাক্তারবাবু অমরনাথকে বলে দিযেছিলেন ঘুম না ভাঙ্গিয়ে দু ঘণ্টা পরপর জ্বর দেখে লিখে রাখতে, ঘড়ির কাঁটা ধরে ওষুধ খাওযাতে। এসবই ঠিকঠাক চলেছিল।

এখনও এ বাড়ির চারপাশে বিযের গন্ধ ছড়ানো। তিনদিন আগে যাকে ঘিবে সবাই হইচই করেছে, শঙ্খ বেজেছে, খাওযা-দাওয়া নিয়ে হাঁকাহাঁকি হয়েছে সে প্রায় অসাড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। একশ চার ছাড়িয়ে যখন থার্মোমিটারের কাঁটা উঠল তখন মনোরমা কথা বলেছিলেন, 'ডাক্তারকে খবর দাও। আমার ভাল ঠেকছে না। শরীর গবম অথচ হাত-পায়ের তলা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তিন রাতেই মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেল।'

মধ্যরাত্রে অমরনাথ শাল মুড়ি দিয়ে আবার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে দৌড়ে গিয়েছিলেন। জ্বর বেড়েছে শুনে ভদ্রলোক ছুটে এসেছিলেন বিছানা ছেড়ে। দ্বিধা সরিয়ে রেখে ইঞ্জেকশন দিয়েছিলেন। আধঘণ্টা বাদে জ্বর সাড়ে তিনে নামতে বলেছিলেন, 'তিনজনে একসঙ্গে রাত জাগলে রোগীর সেবা করবে কে ? পালা করে ঘুমিয়ে নিন।'

কথাটা কারো কানে ঢোকেনি। বাইরের ঘরে এসে সিগারেট ধরিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। তারপর আচমকা প্রশ্ন করেছিলেন, 'ওর ফুলশয্যা যেন কবে ছিল ?'

'গত রাত্রে।'

'হুম ! কি হয়েছিল কিছুই বুঝতে পারছেন না ?'

'না। আমি কাল সকালে জলপাইগুড়িতে যাব।'

'একটা কথা, আপনার মেয়ের পিরিয়ড শুরু হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'মনে হচ্ছে ওর ওপর একটা সেক্স-অ্যাটেম্প হয়েছিল। ঠাণ্ডা যতটা নয়, মনের ওপব চাপ বেশী, খুব বেশী। নার্ভ মনে হচ্ছে শ্যাটার্ড। অবশ্য এসবই আমার অনুমান। এর ওপর ভিত্তি করে কিছু করা যায় না। ওর সেন্স না এলে বোঝাও যাবে না। একজন বিয়ে হচ্ছে না বলে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল আর একজনকে বিয়ে দিয়ে হত্যা করা হচ্ছিল। অদ্ভুত জীবন। চলি।'

অমরনাথ চুপচাপ দাঁড়িযে রইলেন। টর্চ জ্বেলে অন্ধকার কাটতে কাটতে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। বিয়ে দিয়ে হত্যা কবা হচ্ছিল ! হঠাৎ ভেতর থেকে একটা কাঁপুনি এবং সেইসঙ্গে বুক মুচডে একটা কান্না ছিটকে এল গলায। প্রাণপণে শব্দটাকে চাপতে চেষ্টা করলেন অরমনাথ। তিনিই হত্যাকারী। যে মেয়ে ধূপগুড়ি পর্যন্ত একা কখনও যায়নি সে অতবড় স্যুটকেস নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে একা এল কি করে ? অসুখটা নিশ্চয়ই এখানে নামাব পব হয়নি। প্রতুলবাবুও তাঁর পুত্রবধূকে ছাড়লেন কি করে ? এইসময় অঞ্জলি তার পাশে এসে দাঁডাল। বাইরের দবজাটা তখনও খোলা। দ্রুত বন্ধ করে অঞ্জলি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাডিতে আর একটা রোগী বাড়িযে তোমার কি লাভ বলতে পার ? তুমি শুয়ে পড ওদের বিছানায়। আমরা জাগছি।'

কিন্তু অমবনাথ কথা শোনেননি। সকাল হল। হযতো ডাক্তারবাবুর বাড়ি থেকেই খবরটা ছড়িযেছে চা-বাগানে। প্রথমে এলেন বড়বাবুর বাবা তেজেন্দ্র। তারপর একে একে সবাই, শুধু পাতিবাবু বা মালবাবুর বাড়ির লোকজনের অবশ্য আসার মত অবস্থা ছিল না। প্রত্যেকেব কৌতূহল, মেয়েটা কেন ফুলশয্যার পবের বাত্রে একা ফিরে এল ? অমরনাথ যতই বলেন তিনি কিছুই জানেন না তবু তেজেন্দ্রের কৌতূহল শেষ হয় না। তিনি বললেন, 'আগে এমন হত শুনেছি। ফুলশয্যায় স্বামীর চেহারা দেখে কচি বউ পরের দিন ধানক্ষেতে লুকিয়ে বসে থাকত। সে রকম ঘটনা কি না বলতে পার ?'

নবনী অফিসে যাওয়ার আগে সাতসকালেই খবর পেয়ে এসেছিল এবার না বলে পারল না, 'কিছু মনে করবেন না আপনি কিন্তু সীমারেখা অতিক্রম করছেন।'

তেজেন্দ্র হতভম্ব, 'কি ! তুমি, তুমি আমাকে বললে একথা ?'

'না বলে পারলাম না।'

'কি আস্পর্দা। সেদিনের ছেলে, সবে এই বাগানে এসেছ, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেই জায়গাটাকে আমি তৈরি হতে দেখিছি, জানো ? আমাকে সীমা দেখাচ্ছ।'

নবনী বিচলিত না হয়ে বলল, 'জন্মদাতাও যখন অপ্রকৃতিস্থ হন তখন তাঁকে সতর্ক করে

দেওয়া দরকার। অমরদা, আপনার পক্ষে তো আজ যাওয়া সম্ভব নয়। আমি সাহেবকে বলে দেব। তবে বাইরের লোকের এত ভিড়ও ঠিক নয়। বুঝতেই পারছেন সবাই, কাল সারারাত এঁদের ওপর ঝড় বয়ে গিয়েছে। যান সবাই এখান থেকে।' কথাগুলো বলে সে আর দাঁড়াল না। সাইকেলে চেপে ফ্যাক্টরির দিকে চলে গেল। ভিড়টা এর পরই কমতে আরম্ভ করল। এমন কি তেজেন্দ্রও গজগজ করতে করতে নিজেদের কোয়ার্টার্সে ফিরে গেলেন।

ঘরে ঢুকে অমরনাথ দেখলেন অঞ্জলি নেই, তার জায়গায় সুভাষচন্দ্র বসেছেন। সারারাত ঘুমিয়ে এখন সুভাষচন্দ্রকে তরতাজা দেখাচ্ছে। মনোরমা পাথরের মত বসে আছেন দীপার পায়ের পাশে। অমরনাথ বললেন, 'মা, এবার তুমি ওঠো। সারারাত একভাবে বসে আছে। শরীর খারাপ হয়ে গেলে—'

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'হ্যাঁ। আপনি যান। জ্বর তো কমে এসেছে।'

মনোরমা গম্ভীর স্বরে বললেন,'ওর সঙ্গে কথা না বলে আমি কোথাও যাব না!'

অমরনাথ অসহায়ের মত সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকালেন। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'বাড়িতেই তো আছে। কথা তো বলতেই পারবেন। কিন্তু ওর জ্ঞান কখন ফিরে আসবে, কথা বলার মত জোর কতক্ষণে হবে তার তো ঠিক নেই।'

'এ ব্যাপারে কথা বাড়িও না। কাল রাত্রে ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যতক্ষণ ওর মুখে কথা না শুনব ততক্ষণ এখান থেকে উঠব না।'

সুভাষচন্দ্র অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কিন্তু আপনি কলটলে যাবেন তো ?'

'ওটা আমাকে বুঝতে দাও। অমর, ডাক্তারবাবু কী সকালে আসবেন বলেছেন ?'

'হ্যাঁ মা।'

শুকনো মুখ প্রায় সাদা। গলা পর্যন্ত কম্বল টানা। নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত। চোখ বন্ধ। সিঁথি সিঁদুরে লাল। মনোরমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। এখন অঞ্জলি তাঁর পাশে বসে। অমরনাথকে জোর করে শুতে পাঠানো হয়েছে ডাক্তার চলে যাওয়ার পর। ভদ্রলোক নাড়ি দেখেছেন। ঘুম ভাঙ্গাননি। বলেছেন, 'যতক্ষণ ঘুমাতে পারে ঘুমিয়ে নিক। ঘুম ভাঙ্গলে একটু গরম দুধ আর বিস্কুট দেবেন। খেতে চাইবে না তবু যেটুকু পারেন খাওয়াবেন। আব আজ কোনো প্রশ্ন করবেন না। কিছু জানতে চাইবেন না।'

অঞ্জলি বলল, 'মা আপনি সত্যি উঠবেন না ?'

মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'মানত করেছি বউমা।'

একটু ইতস্তত করে অঞ্জলি বলল,'ও আজ জলপাইগুড়িতে যেতে চাইছে।'

মনোরমা বললনে, 'কেন ?'

অঞ্জলি জবাব দিল, 'কি ঘটেছিল তা জানতে। মেয়েকে তো বিশ্বাস নেই। যা ডানপিটে। হয়তো শরীর খারাপ করতেই এখানকার কথা মনে এসেছিল আর তাই কাউকে না বলে চলে এসেছে। আমার তো এরকমটাই মনে হচ্ছে।'

'তাহলে স্যুটকেস আনতে যাবে কেন ? না, অমরনাথের যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বরং ওকে বল, চিঠি লিখে কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে। সকাল নটা বেজে গেছে। বাড়ির বউ না বলে চলে গেলে নিশ্চয়ই ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে এতক্ষণ খবর এসে যেত। একটা রাত জ্বর গায়ে বউ বাড়িতে থাকল না আর ওরা চুপ করে বসে থাকবে ?' কথা বলতে বলতে মনোরমার চোখ দীপার মুখের ওপর স্থির হল। ঠোঁট নড়ছে। মুখ হাঁ হল। অঞ্জলি মেয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল, 'দীপা, দীপা ! এই মেয়ে !'

দীপা ধীরে ধীরে চোখ মেলল। চোখে এখনও লালচে ভাব। ঠোঁট চাটল সে। দৃষ্টি ছাদ থেকে ধীরে ধীরে নামল। মনোরমার মুখের ওপর আসামাত্র তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখনই বুঝতে পারলেন মেয়েটা তাঁব দিকে তাকিয়ে আছে বটে তবে দেখছে না কিছুই। তিনি ডাকলেন, 'দীপু!'

সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ হল। আর তারপরেই ডান চোখেব বন্ধ পাতার ভাঁজ গলে একটা জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল কানের লতির দিকে। সেইসময় বুধুয়া এসে দাঁড়াল, 'এক আদমি আয়া হ্যায় জলপাইসে। বাবুকো মাংতা হ্যায়।'

অঞ্জলি একবার মেয়েকে দেখে দৌড়ে বাইরের ঘবে চলে এল। বারান্দায় একটি লোক দাঁড়িয়ে। মনে পড়ল একেই তারা প্রথম দিন প্রতুলবাবুর অফিসে দেখেছিল। লোকটি হাত জোড করল, 'আমি জলপাইগুডির প্রতুলবাবুর বাড়ি থেকে আসছি। একটা দুঃসংবাদ আছে। গতরাত্রে অতুলচন্দ্র, মানে ওঁর একমাত্র পুত্র দেহ রেখেছে। উনি পরে আপনাদের চিঠি দেবেন। নমস্কার।'

পাথরের মত দাঁড়িযে রইল অঞ্জলি। ভেতরের ঘরে তখন মনোরমা পরম যত্নে দীপার চোখের কোল থেকে শেষ জলের দাগটি মুছে দিচ্ছিলেন।

॥ ১২ ॥

'স্নেহের দীপাবলী, তোমাব চিঠি পেয়েছি। তোমাকে আমি ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলেছিলাম। অথচ সেটা পেযে আমি বাংলায কেন লিখছি তাই ভেবে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। সেইটে আগে বুঝিযে বলি। আমাদেব সময আমরা ইংরেজিটা বাংলার চেয়ে ভাল শিখতাম। কোন কিছু বানিযে লিখতে বললে বাংলাব বদলে ইংরেজিতে লিখলে সুবিধে হত। নেসফিল্ডের গ্রামাববই সেই ছোট্টবেলায় এমন গিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ইংরেজি বাক্য ভুল লিখতেই পাবতাম না। এতে উপকার হয়েছে দুটো। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বই ইংবেজি ভাষায পাওযা যায়। পিতৃভাষায় দক্ষতা থাকায় সেগুলোতে ডুবে যেতে অসুবিধে হয না। দ্বিতীয়ত জিভেব আডষ্টতা চলে গেলে কথা বলতে সুবিধে হয়। মনে বেখ বাংলার বাইবেই কেউ বাংলাভাষাটা বোঝে না। বড জায়গায় পৌঁছাতে হলে নিজেকে আন্তর্জার্তিক কবতেই হবে। শুনেছি রাশিয়ান বা ফরাসীরা ইংরেজি বলে না। পৃথিবীর ইতিহাসে যদি কখনও বাশিযান বা ফবাসীদের মত জায়গা দখল করতে পারি তখন না হয় শুধু বাংলা ব্যবহার কবব। তোমাব ইংরেজি বিদ্যে কতটুকু তা জানার জন্যেই ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলেছিলাম। খুব ভাল লাগল, কারণ একটি বানান ভুল পাইনি, ছোট ছোট বাক্যে মনের কথা লিখতে পেরেছ। আমি বিশ্বাস করছি কেউ তোমাকে ওই চিঠি লিখতে সাহায্য করেনি। চা-বাগানে থেকে অমন স্কুলে পড়েও যে তুমি ওই চিঠি লিখতে পেরেছ তার জন্যে তোমার মাস্টারমশাইকে আমার শ্রদ্ধা জানালাম।

এখন কেমন আছ? পরীক্ষা তো দরজায়। যদি জলপাইগুড়ির বদলে শিলিগুড়িতে তোমাদের সিট পড়ত তাহলে আমার এখানে থেকে পরীক্ষা দিতে পারতে। দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাও। তোমাকে সাফল্য পেতেই হবে। মনে রেখ আমি যখন পাশ করেছিলাম, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তখন মেয়েদের হাতে গোনা যেত। এখনও ছবিটা বড় বেশী পাল্টায়নি। আমাকে ঘোড়ামুখো মেয়ে বলা হত। আমাদের সমাজ আমার এই ঔদ্ধত্য মেনে নেয়নি। বয়েই গেছে আমার। তুমিও যা ন্যায় মনে করবে তাই সত্য বলে

ভাববে। সেই সত্যের জন্যে কিছুর সঙ্গে আপোষ করো না।

মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরীক্ষা দেবে। যে প্রশ্নটিকে কঠিন মনে হবে তার উত্তর আগে লিখবে। কারণ তখন তোমার মাথা তাজা থাকবে এবং তুমি কিছু একটা ভেবে বের করতে পারবে। সহজ উত্তরগুলো লিখে ফেলার পর কঠিনটা নিয়ে আর ভাবার অবকাশ পাবে না। যেন তেন করে সারতে হবে তখন, নম্বরও কমে যাবে। কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে সহজটাকে ধরা মানে পালিয়ে যাওয়া। সহজ যা তা তো পরেও সহজ থাকে। তাই না?

এ চিঠির উত্তর আমি এখন চাই না। সব পরীক্ষা শেষ হলে একটা লম্বা চিঠি লিখে আমাকে জানিও। তোমার এগিয়ে যাওয়ার পথে আমার শুভেচ্ছা সব সময় থাকবে। ইতি, রমলা সেন।'

চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দীপা। রমলা সেনের চিঠি এলেই মন ভাল হয়ে যায়। বয়স্কা মানুষটা কেমন বন্ধুর মত কথা বলেন। গত দুবছর ধরে প্রতি মাসে দুটি করে চিঠি লেখে দীপা, জবাব পায়। চিঠিটা অমরনাথ সকালে জলখাবার খেতে আসবার সময় ফ্যাক্টরি থেকে এনেছিলেন। বাগানের সবার চিঠি ফ্যাক্টরিতে জমা হয়। জলখাবার খেয়ে আবার কাজে যাওয়ার সময় তিনি পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। আগে যেটা বসার ঘর ছিল সেটা বাড়িয়ে পার্টিশন দিয়ে দীপার পড়ার ঘর করে দেওয়া হয়েছে অনেকদিন। পায়ের আওয়াজ থেমে যেতে দীপা মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার চিঠি? রমলা সেনের?

দীপা মাথা নাড়ল। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি লিখেছেন?'

দীপা বলল, 'পড়বে? আমার কি করা উচিত তাই লিখেছেন!'

অমরনাথ কথা না বলে হেসে নিচে নেমে গেলেন। দীপা দেখল বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া সাইকেল টেনে নিয়ে তিনি ফ্যাক্টরির দিকে রওনা হলেন। দীপা জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাল। সকালের রোদে মাঠ, চাঁপা ফুলের গাছ মাখামাখি। আসাম রোড দিয়ে বাস ছুটে যাচ্ছে। পাখি ডাকছে গাছে গাছে। পৃথিবীটা কি শান্ত! দীপা চিঠিটাকে আর একবার দেখল। ভোর চারটের সময় পড়তে বসেছে। আজকাল পাঁচটার পরেই সকাল হয়ে যায়। সারাদিনে পনের ঘণ্টা না পড়লে খুব খারাপ লাগে। টেস্ট পেপারটা নিয়ে আবার অঙ্ক কষতে বসতেই বারান্দায় শব্দ হল। সাধারণত বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ রাখে পড়ার সময়। দীপা দেখল খবরের কাগজ পড়ে আছে। সে উঠে আজকের কাগজটা তুলে নিল। জহরলাল নেহেরু কি বলেছেন, বিধানচন্দ্র রায় কি করেছেন, কম্যুনিস্টরা কোথায় আন্দোলন করেছে, এইসব। প্রথম পাতাটা পড়তে মোটেই ভাল লাগে না। দ্বিতীয় পাতা খুলতে সুচিত্রা-উত্তমের ছবি দেখতে পেল সে। গত কালীপূজোয় মাঠে সিনেমা দেখানো হয়েছিল। অগ্নিপরীক্ষা। গানে মোর ইন্দ্রধনু। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে বেজে যায় সর্বক্ষণ। তখন সুচিত্রা উত্তমকে দেখেছিল সে। যেতে চায়নি প্রথমে। অঞ্জলি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তখন অনেক রাত। মাথায় চাদর জড়িয়ে সবার পেছনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপলের ওপর বসে দেখেছিল। সুচিত্রা সেনের ছবি দেখলেই মালবাবুর বাড়ির সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে। সেই কতবছর আগে শিউলিফুল তুলছিল সে ভোরবেলায়। ছেলেটি সামনে এসে বলেছিল তোমাকে দেখতে ঠিক সুচিত্রা সেনের মত। খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আজ হাসি পেল। ছেলেটাকে তারপর আর কখনও দ্যাখেনি সে।

খবরের কাগজ বাইরের ঘরের টেবিলে রেখে দিয়ে সে ভেতরে এল। এখন সবাই রান্নাঘরে। বারান্দা দিয়ে উঠোনে নামার সময় মনোরমার গলা ভেসে এল, 'সুজিটা খেয়ে

যা।' দীপা মুখ ভেংচালো, 'রোজ রোজ সুজি ভাল্লাগে না!'

'আর কি করব বলে দে। লুচি বেগুন ভাজা ভাল লাগে না, পরোটায় অরুচি হয়ে গিয়েছে, দুধ-রুটি দিলে বলবি রুগীর খাবার। আমার হয়েছে জ্বালা।' মনোরমার গলায় অসন্তোষ। দীপা এগিয়ে গিয়ে দরজা থেকে বাটি তুলে নিল, 'একটা চামচ দাও।' মনোরমা নিজে কখনও চামচ ব্যবহার করেন না। কিন্তু তিনি এগিয়ে দিলেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে সবে এক চামচ সুজি মুখে পুরেছে দীপা অমনি ছোট ভাই বলে উঠল, 'এই দিদি, আমাকে দিবি?'

দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে না বলতেই রান্নাঘর থেকে অঞ্জলি ধমকে উঠল, 'এ্যাই, কি হ্যাংলারে তুই! একটু আগে ডিমসিদ্ধ খেলি এখন সুজি চাইছিস!' দিদি কি ডিম খায় যে তোকে সুজি দেবে? একদম দিবি না ওকে দীপা!'

মনোরমা সুজিতে বড্ড বেশী মিষ্টি দেন কিন্তু সেকথা বললে রেগে যান। আজ তেজপাতা এবং এলাচ থাকা সত্ত্বেও সুজিটাকে বিস্বাদ লাগল দীপার। ছোট ভাই ততক্ষণে সরে গিয়েছে সামনে থেকে। আর একটু হেঁটে বাড়ির পাশের লিচু গাছের তলায় এল সে। তারপর এক চামচ সুজি ছুঁড়ে দিল মাটিতে। অমনি দুটো পাতিকাক লাফিয়ে পড়ল সেখানে। দুই ঠোকরে সেটা সাবাড় করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে লাগল দীপার দিকে। একটু একটু করে কাকদুটোকে সুজি খাওয়াতে লাগল সে।

তার মায়ের রান্নাঘরে বসে খাওয়ার পাট চুকেছে সেই বড় অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর থেকেই। মনোরমার রান্নাঘরে এখন তার জন্যে রান্না হয়। আলোচালের ভাত, ডাল, তরকারি, ভাজা। চাটনিটা অবশ্যই। আগে মনোরমা একবেলা রান্না করতেন। এখন রাত্রে রুটি করেন। ওঁর শরীর খারাপ হলে অঞ্জলি এখানে এসে রান্না করে দিয়ে যায়। এই নিয়ে অমরনাথের সঙ্গে মনোরমার প্রচণ্ড তর্ক হয়েছিল। মায়ের মুখের ওপর সচরাচর কথা বলেন না অমরনাথ। সেবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ওইটুকুনি মেয়ে মাছ-মাংস ডিম পেঁয়াজ খাবে না এটা মানতে পারেননি। এই বয়সে শরীরে প্রোটিন দরকার। কিন্তু মনোরমা এসবে কান দিতে চাননি। হিন্দু মেয়ে বিধবা হলে বয়স কোন ব্যাপারই নয়। বিধবার যা করণীয় তাই তাকে করতে হবে। তা যদি না মানো তাহলে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলে কেন? প্রায় ছয়মাস কোন বাক্যালাপ ছিল না মা-ছেলের মধ্যে। খুব কষ্ট হত দীপার। প্রথম প্রথম বাড়িতে মাছ-মাংস আসা বন্ধ হয়েছিল। দীপা খাবে না অথচ তাঁরা খাবেন, অমরনাথ ভাবতে পারতেন না। ফলে ছোট দুটো প্রায়ই অর্ধভুক্ত থাকত। মাছ ছাড়া ওদের চলে না। এইসময় একজন খুব অসুখে পড়ল। ডাক্তারবাবু হুকুম করলেন সিঙ্গি মাছের ঝোল খাওয়াতে। ফলে আবার মাছ এল বাড়িতে। সেইসময় একদিন একা পেয়ে অমরনাথ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যারে, ঠাকুমার সঙ্গে নিরামিষ খেতে তোর খুব কষ্ট হয়, না? দুর্বল লাগে?' বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে সত্যি কথা বলতে পারেনি, 'না তো! ঠাকুমা তো খুব ভাল রান্না করে।' তারপর থেকেই আবার অমরনাথের সঙ্গে মনোরমার সম্পর্ক সহজ হয়ে গেল।

'সুজিটা খেলি না কেন?'

দীপা চমকে ফিরে দেখল অঞ্জলি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এমনি।'

অঞ্জলি ওর কাঁধে হাত রাখল, 'খেতে ভাল হয়নি?'

'খারাপ হয়নি।' কথাটা বলেই অঞ্জলির দিকে তাকাল সে। মা এখন কিরকম ভারী ভারী হয়ে গিয়েছে। আগের মত হই চই করে না। চেঁচামেচিও কমে গেছে। অঞ্জলি যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল চুপচাপ। শাড়ির আঁচলে কপাল মুছল দীপা। শীত চলে যেতে না যেতেই ঘাম হচ্ছে। সাদা আঁচলটা অবশ্য ভিজল না। এখন সে নিয়মিত কাপড় পরে। কালো সরু পাড় সাদা শাড়ি, সাদা জামা। মনোরমা বলেছেন বিধবাদের রঙিন শাড়ি পরতে নেই। মন চঞ্চল হয় এমন কোন কাজ করতে নেই। ঈশ্বরের দেওয়া এই শরীরটাকে পবিত্র রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত। আর এই কাজ সহজতর হবে যদি উপযুক্ত কোন গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায়। সব মেনে নিলেও এই একটা ব্যাপারে বেঁকে বসেছিল দীপা। দীক্ষা মানে নিয়মিত পুজো করে যাওয়া। যেটা সে কিছুতেই পারবে না। অমরনাথ মেয়ের সমর্থনে কথা বলেছিলেন বলেই বোধ হয় মনোরমা এ নিয়ে জোর করেননি। সুবিধে হল ক্লাশ নাইনে উঠলেই স্কুলে মেয়েদের শাড়ি পরতে হয়। স্কুলের ইউনিফর্ম হল কালো সরু পেড়ে সাদা শাড়ি আর সাদা জামা। অতএব স্কুলে গিয়ে কোন অসুবিধে হয় না দীপার। চার পাঁচজন মেয়ে যখন ওই একই পোশাকে বাড়ি ফেরে তখন কয়েকবার দেখেছেন অমরনাথ, কষ্টটা কমে গিয়েছিল।

এসব কথা রমলা সেনকে একসময় লিখেছিল দীপা। ভদ্রমহিলা চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পরনির্ভর মেয়েদের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করা অনুচিত কাজ নয়। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজের দায়িত্ব নিতে না পারছ ততক্ষণ গুরুজনদের মতামত মান্য করতেই হবে। তোমার বাবা-মায়ের মতামত যদি ঠাকুমা না শোনেন তাহলে তাঁর অবাধ্য হলে বাড়িতে শুধু অশান্তিই চলবে। মনে রেখ তুমি বিধবা নও। একটি রোগগ্রস্ত তরুণের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল। তার সঙ্গে মানসিক বা শারীরিক সম্পর্ক হবার আগেই সে চলে গিয়েছে। সংস্কৃতে ধব মানে স্বামী। যে তরুণ তোমার ধব হতে পারেনি সে চলে গেলে তুমি কেন বিধবা হবে? তা সত্ত্বেও তোমাকে এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে কিছু দিনের জন্যে। নিরামিষ খেয়ে ভালভাবে বেঁচে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নেই। আর পোশাক? ওটা তো বাইরের ব্যাপার। পোশাক কখনও মানুষের ভেতরটাকে তৈরী করে না। তোমার সামনে একটা পুরো জীবন পড়ে আছে। সাময়িক এই ব্যবস্থাটা মেনে নাও। এতে তো তোমার কোন ক্ষতি হচ্ছে না।

চিঠিটা অমরনাথকে দেখিয়েছিল দীপা। পড়ে তিনি হেসেছিলেন নিজের মনে। তারপরে বলেছিলেন, 'এই মহিলার সঙ্গে সারা জীবন যোগাযোগ রাখবে। উনি ঠিক কথাই লিখেছেন। এসব আমারই বলা উচিত ছিল অথচ কিভাবে বলব বুঝতে পারিনি। তবে এই চিঠি তোমার ঠাকুমাকে দেখিও না।'

উঠোন থেকে ফিরে এল দীপা পড়ারঘরে। টেস্ট পেপার নিয়ে বসতে গিয়ে জানলায় নজর গেল। বিশু আর খোকন সাইকেলে চেপে আসাম রোড দিয়ে যাচ্ছে। এক নিমেষেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল। কতকাল আর ওদের সঙ্গে গল্প করা হয়নি। এ ব্যাপারে আর কেউ তাকে নিষেধ করেনি। কিন্তু নিজের থেকেই আর যেতে চায় না সে। মজার ব্যাপার হল ওরাও তাকে ডাকতে আসে না। স্কুল থেকে ফেরার সময় মাঝে মাঝে দেখা হয়। ওরা এমন ভাব করে চলে যায় যেন কোনদিন আলাপ ছিল না। কোন বাড়িতে যায় না সে। তার কোন বন্ধু নেই। হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে কান্না এল দীপার। টেস্ট পেপারে মুখ চেপে সে চুপচাপ কেঁদে গেল কিছুক্ষণ। তারপর একঝটকায় উঠে বসে আঁচলে মুখ মুছে পড়তে বসল।

গত কয়েক বছরে জায়গাটার চেহারা খুব দ্রুত বদলেছে। চৌমাথাকে কেন্দ্র করে এক নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে। কাঠের ব্যবসায়ীরা ছিলেন কিন্তু এখন তাঁদের সংখ্যা বেড়েছে। বেশ কয়েকটা সরকারি অফিস চালু হওয়ায় তাদের কর্মচারিরাও বাসা নিয়েছে। সেইসঙ্গে বাজার এলাকায় ব্যাঙ্ক, ফরেস্ট অফিস, পি ডব্লু ডি-র অফিস বসে যাওয়ায় জায়গাটার রমরমা বেড়েছে। সেলুন, রেস্টুরেন্ট, ছোট হোটেল থেকে শুরু করে দু-দুটো লন্ড্রি চালু হয়ে গেছে চৌমাথায়। আর সেই কারণে একমাত্র স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বেড়েছে। গত বছর থেকে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসছে। চারজন ছেলে গিয়েছিল, দু'জন থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে, দু'জন পারেনি। এবাব সংখ্যাটি বেড়েছে। মোট ছাত্রছাত্রী বাবোজন। স্কুলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত টিম্বার মার্চেন্ট অনিল চ্যাটার্জীর মেয়েও এই দলে আছে। সত্যসাধনবাবুর ইচ্ছে ছিল না তাকে ফাইন্যাল পরীক্ষায় বসতে দিতে। টেস্টে সে তিনটি বিষয়ে পাস করতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগও ছিল। সে ছাত্রীর মত আচরণ করে না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস হেডমাস্টারমশাই-এর ছিল না। সত্যসাধনবাবুর এখন একমাত্র বাসনা এই যে দীপাকে তিনি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করাবেনই। এই স্কুল থেকে যদি কেউ ফার্স্ট ডিভিসন পায় তাহলে কে ফেল করল তা নিয়ে লোকে আলোচনা কববে না।

স্কুল থেকে এবারও সত্যসাধনবাবু পরীক্ষার সময় জলপাইগুড়িতে যাবেন। প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীব সেখানে থাকাব ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে কিন্তু দীপার ব্যাপারে অমরনাথ মনঃস্থিব কবতে পারেননি। এমন কোন নিকট আত্মীয় সেখানে নেই যার বাড়িতে দীপাকে নিয়ে ওঠা যায়। সত্যসাধন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতি জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ায় থাকেন, তাঁদেব ওখানেই তিনি দীপাব ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। অমরনাথ কোন উত্তর দেননি। অথচ যাওযার সময হয়ে এল। বিকেলবেলায় সত্যসাধনমাস্টার চা-বাগানেব দিকে আসছিলেন হনহন করে। আসাম রোড দিয়ে একটা জিপ পাশ কাটিয়ে যেতে গিযে ব্রেক কষল। সত্যসাধন ঘুরে দাঁড়াতেই অনিলবাবুকে দেখতে পেলেন। ড্রাইভারের পাশে বসে অনিল চ্যাটার্জী নমস্কার করলেন, 'ভাল আছেন তো? এরকম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন কোথায়?'

সত্যসাধন বিনীত গলায বললেন, 'এই একটু অমরনাথবাবুর কোয়ার্টার্সে।'

'ও। ওঁর মেয়ে নাকি খুব ভাল ছাত্রী। বিধবা মেয়েকে পড়িয়ে ভদ্রলোকের কি লাভ হচ্ছে বুঝি না। যে জন্যে দাঁড়ালাম, জলপাইগুড়িতে তো যাচ্ছেন, দেখবেন আমার মেয়েটা যেন ভাল ভাবে পরীক্ষা দেয়। মোটামুটি থার্ড ডিভিসন পেলেই হবে। মানে ডিভিসনের কোন দরকার নেই আমার। পাস করলেই একটা খুব ভাল পাত্র পাওয়া যাবে। ছেলেটির ইচ্ছে মেয়েকে অন্তত স্কুল ফাইন্যাল পাস হতে হবে, বুঝুন।' অনিলবাবু হাসলেন।

'মন দিয়া পরীক্ষা দিতে কন— !'

'আরে মশাই মন দিলেই যদি পাস করা যায় তো আমিও করতাম। পরীক্ষাব সময় যদি গার্ডরা ওকে একটু সাহায্য করে এটা দেখবেন। আমিও থাকব সে-সময়। কোন অসুবিধে হলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবেন, আমি ব্যবস্থা করব। চলি।' জিপটা আবাব গতি নিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন সত্যসাধনমাস্টার। বাবা হয়ে মানুষটা কি মেয়েকে অসৎ উপায়ে পাস করাতে চান? সময় কি ভাবে পাল্টে যাচ্ছে! সত্যসাধনমাস্টারের মনে হল অশিক্ষিত কিছু মানুষ ব্যবসায়ের দৌলতে হাতে কাঁচা পয়সা পাচ্ছে বলেই মানুষের মেরুদণ্ডটি দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজ থেকে তিরিশ বছর

আগেও কেউ একথা বলতে পারত না। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা যেন দ্রুত বেড়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না পেলে কোন জাতির মেরুদণ্ড গঠিত হতে পারে না। অর্থ যদি কয়েকটি অশিক্ষিত মানুষের হাতে সীমাবদ্ধ হয় তাহলে তো তারা তার বলে বলীয়ান হয়ে বেপরোয়া হবেই। আবার হাঁটতে শুরু করলেন সত্যসাধনমাস্টার। এবং তখনই তাঁর খেয়াল হল কথাগুলো ঠিক এইরকমভাবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তো ? আজকাল এর কথা ওর মুখে, অথবা কখনও কখনও নিজের মনের কথা পছন্দসই মানুষের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন তিনি আজকাল। এটা ঠিক নয়। ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হবে।

বারান্দায় মোড়া পেতে অঞ্জলি বসেছিল। সত্যসাধনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, 'আসুন মাস্টারমশাই, আপনার ছাত্রী এখনও পড়ার ঘরে।'

'সে কি ! কি মুশকিল কথা। এই বিকাল বেলায় সে পড়তেছে, এটা ঠিক না।'

'কি বলব বলুন। এত করে বলি, কিন্তু কিছুতেই শুনবে না। এত পড়লে কি মাথা ঠিক থাকবে ? আপনি তো জানেন ও মাছ-মাংস খায় না। শরীরে শক্তি পাবে কি করে তা বুঝি না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।' অঞ্জলি একপাশে সরে দাঁড়াল। সত্যসাধন বারান্দায় উঠে এসে পড়ারঘরের বন্ধ দরজাটা খুললেন। দীপা বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়েছিল। সত্যসাধনবাবু বললেন, 'দিস ইজ ভেরি ব্যাড। কাম হিয়ার।'

দীপা উঠল। লজ্জিত মুখে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ সত্যসাধনবাবু তার মাথার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার উচ্চতা কত ?'

দীপা একটু অবাক হল, 'জানি না তো !'

'মাইপা দ্যাখ। এখনই।'

মাপা হল। দীপা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। একটা স্কেল দিয়ে মাথার সমান্তরাল দেওয়ালে দাগ দেওয়া হল। অঞ্জলির লম্বা ফিতে দিয়ে মাটি থেকে সেই দাগ পর্যন্ত মাপা হল। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। সত্যসাধনবাবু মাথা নাড়লেন, 'ইম্পসিব্‌ল। দ্বিতীয়বার মাপ।' এবারেও একই অঙ্ক পাওয়া গেল। সত্যসাধনবাবু বললেন, 'অবাক কাণ্ড ! তুমি কখন এত লম্বা হইলা ? আমি কত জানো ? পাঁচ ফুট ছয়। অনলি তিন ইঞ্চি বেশী লম্বা। সত্যি অবাক কাণ্ড।'

দীপা বলল, 'আপনি আমার চেয়ে এক জীবন বেশী লম্বা।'

'আঁ ? তুমি এখনও কবিতার বই পড়তেছ ? তোমারে নিষেধ করি নাই বিফোর ফাইন্যাল নো কবিতার বই ! কি কাণ্ড।'

'আমি ছ'মাস আগে পড়েছিলাম।'

'কার কবিতা ?'

'আপনি একটা পত্রিকা দিয়েছিলেন। তাতে ছিল।'

'বেশ। কিন্তু খুকী, এইরকম সুন্দর বিকালে তুই বই নিয়া বইস্যা থাকবা না। ঘাসে পা রাখবা। আকাশের নিচে একটু ঘুইর‍্যা বেড়াইবা। বুঝলা ?'

অঞ্জলি বলল, 'উনি আসছেন মাস্টারমশাই।'

দেখা গেল অমরনাথ মাঠ পেরিয়ে সাইকেল নিয়ে চলে এসেছেন কোয়ার্টার্সের সামনে। মাস্টারমশাইকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন সাইকেল থেকে নেমে, 'কখন এলেন ?'

'এই তো। অমরনাথবাবু, আপনে কি জানেন আপনার দীপার উচ্চতা কত ?'

অমরনাথ অবাক হলেন সামান্য সময়ের জন্য। তারপর সপ্রতিভ গলায় জবাব দিলেন,

'উনত্রিশ হাজার তিনশ ফুট।'

দীপা চিৎকার করে উঠল, 'এম্মা!'

অমরনাথ বললেন, 'হিমালয়ের থেকে একটু বেশী। তাই না দীপা?'

সত্যসাধন সশব্দে হেসে উঠলেন। দীপা লজ্জা পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। মনোরমা আসছিলেন, ওকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে হাসছে রে ওরকম ষাঁড়ের মত?'

দীপা আঙুল তুলল, 'দাঁড়াও, মাস্টারমশাই-এর সামনে বলব।'

'অ্যাঁ! ও বাবা। মাস্টারমশাই? তা এত হাসির কি হল?'

'জানি না। গিয়ে জিজ্ঞাসা কর।'

মনোরমা একটু বিরক্ত হয়েই বাইরে এলেন। অঞ্জলি মাথার ঘোমটা টানল। তখন অমরনাথ বলছিলেন, 'সমস্যা অনেক মাস্টারমশাই। আপনার আত্মীয়ের বাড়িতে ওকে একা রেখে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পাবব না। কি রকম পরীক্ষা দিচ্ছে—, বুঝতেই পারছেন?'

'তা ঠিক। কিন্তু দীপাবে একটা ভাল জায়গায় রাখা দরকার। ওয়েসিস কিংবা রুবি বোর্ডিং-এ ঘর পাওয়া মুশকিল।'

'সেটা শুনলাম। কাল নবনীর বন্ধু এসেছিল জলপাইগুড়ি থেকে। সে বলল পবীক্ষার্থীরা নাকি ওই দুটো হোটেলে অ্যাডভ্যান্স টাকা জমা দিয়ে প্রায় দখল করে নিয়েছে। মুশকিল হোল হোটেলেও দীপাকে নিয়ে ওঠা যাবে না।'

'আমার আত্মীযর বাড়িতে আপনাদেব প্রব্লেম হইতে পারে কিন্তু হোটেলে না থাকার কি কারণ তা বোঝলাম না।'

মনোরমা এবাব মুখ খুললেন, 'এটা তো খুব সহজ কথা মাস্টারমশাই। মেয়েটা বিধবা। হোটেলে পাঁচভূতেব ব্যাপার, মাছ-মাংসের ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই, ওখানে ও খাবে কি? ওর জন্যে তো আলাদা বাসনপত্রে কেউ রান্না করে দেবে না!'

সত্যসাধনমাস্টারের থতমত ভঙ্গীটি লক্ষ করল অঞ্জলি। ভদ্রলোক বোধ হয় আজ পর্যন্ত জানতেন না যে মনোরমা দীপাকে চিবাচরিত বৈধব্যজীবনের খানিকটা মানতে বাধ্য করেছেন। তাঁকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখল অঞ্জলি। শেষপর্যন্ত তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনাবা যা ভাল মনে করেন তাই করুন। অন্তত দীপা যেন আনডিস্টার্বড পরীক্ষা দিতে পারে সেইটা দেখবেন।'

অমরনাথ বললেন, 'জলপাইগুড়িতে একটা বাড়ি কদিনের জন্যে ভাড়া নিতে চেয়েছিলাম আমি। নবনীর বন্ধু বলল অন্তত মাসখানেকের নিচে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয না। গায়ে লাগছে খুব। তবু ওকে বলেছি তাই ব্যবস্থা করতে।'

'যদি ব্যবস্থা না হয়?' সত্যসাধনমাস্টার মুখ তুললেন, 'কিছু মনে কইরেন না, আপনি কিন্তু দায়িত্ব পালন করতেছেন না। আজ বাদ কাল তার পরীক্ষা আর এখনও কোন ব্যবস্থা হয় নাই! নো, ইট্‌স নট ডান। সে আমার প্রিয় ছাত্রী তাই এত কথা কইলাম। আসি, নমস্কার।' সত্যসাধন ফিরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন। অঞ্জলি তাঁকে ডাকল, 'মাস্টারমশাই, আপনাব বোন তো ওখানে আছেন. উনি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন না?'

'দায়িত্ব যদি দ্যান তাহলে—।'

'ও তো আপনারই মেয়ে। আপনি না থাকলে আজ পরীক্ষা দেওয়া কি সম্ভব হত ওর পক্ষে? আপনি চলে যাবেন না। ওঁর সঙ্গে কথা বলুন। আমি চা আনছি।'

সত্যসাধনমাস্টারের মুখ প্রসন্ন হল এখন। অমরনাথ বললেন, 'দীপা কোথায়? ওকে ডেকে দাও, ওর চিঠি আছে।'

'শিলিগুড়ি থেকে ?' অঞ্জলির প্রশ্নের মধ্যে ঈষৎ বক্রতা ছিল।

অমরনাথ বললেন, 'খুলে দেখিনি।'

অঞ্জলি ভেতরে চলে গেলে মনোরমা বললেন, 'এটা ভাল করিস না অমর। মেয়ের যথেষ্ট বয়স হয়েছে। কে না কে চিঠি দিচ্ছে আর তুই তা বয়ে এনে ওকে দিচ্ছিস। বদমায়েস ছেলে ছোকরাও তো লিখতে পারে!'

'সেরকম কেউ লিখলে দীপা নিশ্চয়ই আমাকে বলবে।'

'বাঃ কি বুদ্ধি! শুনলেন মাস্টারমশাই ? ওই বয়সে মতিভ্রম হতে আর কতক্ষণ সময় লাগে। মেয়ে তখন বাপকে বলবে আমার মতিভ্রম হয়েছে ?'

সত্যসাধনমাস্টার বললেন, 'মা। একটা কথা কই। অমরনাথবাবু ঠিক কাজই করতেছেন। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।'

এইসময় দীপা এসে দাঁড়াল। অমরনাথ তাকে খামটা এগিয়ে দিলেন। সে সবার সামনেই খামের মুখ খুলে দুটো কাগজ বের করল। প্রথমটা পড়ে নিয়ে দ্বিতীয়টা বাবার দিকে এগিয়ে দিল, 'এই চিঠিটা তোমাকে লিখেছেন উনি।'

অমরনাথ চিঠিটা পড়লেন। তাঁর মুখে হাসি ফুটল। একবার সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে সামান্য ভাবলেন তারপর বললেন, 'মাস্টারমশাই, একেই বলে যোগাযোগ। আপনি তো রমলা সেনের নাম শুনেছেন। দীপাকে খুব ভালবাসেন মহিলা!'

'শুনছি। তবে ওঁর সাজেশন ঠিক না। আগে ইজি অ্যানসার লিখলে ব্রেন ট্যাক্সড় হয় না। কি লিখছেন তিনি ?'

অমরনাথ বললেন, 'জলপাইগুড়ির কোন হোটেলে পড়াশুনার আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নিয়ে ওঁর সন্দেহ আছে। ওঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের অফিসের গেস্ট হাউস আছে বাবুপাড়ায়। আমরা সেখানে থাকতে পারি ইচ্ছে হলে। গেস্ট হাউসে দুটো ঘর আছে, নিজেরাও রাঁধতে পারি আবার চৌকিদারকে বললে সে করে দিতে পারে। সময় বেশী হাতে নেই বলে তিনি তাঁর বন্ধুকে বলে দিয়েছেন চৌকিদারকে জানিয়ে দিতে। আমাদের যদি অন্য কোথাও ব্যবস্থা হয়ে থাকে তাহলে একবার চৌকিদারকে খবরটা দিলেই হবে। নইলে সরাসরি ওখানে উঠতে পারি।' অমরনাথ থামতেই মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু মানে ? কিরকম বন্ধু ?'

অমরনাথ চট করে গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'সেটা লেখেননি উনি।'

'অত বড় মেয়েছেলের আবার বন্ধু হয় কি করে! গেস্ট হাউস মানে কি ?'

'অতিথিদের থাকার জায়গা।'

'ও বাবা। সেটা নিশ্চয়ই কোন মেয়ে বন্ধু রাখবে না। আমার ভাল ঠেকছে না। যতই ভাল চিঠি মেয়েকে লিখুক, যে মেয়েছেলে এত বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেনি তাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। তার আবার বন্ধুও আছে।'

হঠাৎ দীপা প্রতিবাদ করল, 'মেয়েছেলে মেয়েছেলে বলো না তো!'

মনোরমা আকাশ থেকে পড়লেন, 'মানে ?'

'মেয়েছেলে আবার কি কথা! মহিলা বলবে।'

'কেন ? মেয়েছেলে বললে জাত যায় নাকি ? জন্মভর লোকে আমাদের মেয়েছেলে বলে এল, কই আমার তো কখনও গায়ে লাগেনি। তোর যেন ফোসকা পড়ল!'

অমরনাথ বললেন, 'দ্যাখ, উনি ভদ্রতা করেছেন। আমাদের যখন থাকার জায়গা ঠিক হয়নি তখন ওই ভদ্রতার খাতিরে একবার সেখানে গিয়ে দ্যাখা দরকার। নইলে

আগরওয়ালারা নতুন ধর্মশালা করেছেন সেখানেই উঠব।'

সত্যসাধনমাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'গেস্ট হাউসের চার্জ কত ?'

'ওটা নাকি ভাড়া দেওয়ার জন্যে নয়। তাই লিখেছেন উনি।'

অঞ্জলির যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে গেলে ছেলে দুটো সঙ্গে যাবে। তাদের সামলানো মনোরমাব পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব মনোরমাই সঙ্গে যাবেন। দুখানা ঘর যদি পাওয়া যায় তাহলে একটিতে নাতনি ঠাকুমা থাকবে অন্যটিতে অমরনাথ। কিন্তু যাওয়ার আগের দিন মনোরমা বেঁকে বসলেন। তিনি যেতে পারবেন না। ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন তিস্তায় নৌকো ডুবি হচ্ছে এবং সেই নৌকোতে তিনি দীপার সঙ্গে বসে আছেন। অঞ্জলি বোঝাতে চাইল, স্বপ্নেব সঙ্গে জীবনের মিল এক লক্ষে একবার হয় কিনা সন্দেহ। মনোরমা বললেন, 'না বউমা। একটা নৌকোডুবি আমার জীবনটাকে ছারখাব করে দিয়েছিল। স্বপ্নটা যখন দেখেছি তখন আব পা বাড়াচ্ছি না। তোমাকে কি বলব, আমি আর দীপা পাশাপাশি বসে জল দেখছি হঠাৎ মুখ তুলে দেখি তিনি। দু হাত দূরে নৌকোয় বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছেন। সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল নৌকো।'

অঞ্জলির সমস্ত শবীরে কাঁটা ফুটল। মৃত মানুষেরা মাঝে মাঝে ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখিয়ে হুঁশিযার করে দিয়ে যায় এমন গল্প সে অনেক শুনেছে। অমরনাথ চিন্তিত হলেন। নিজে কখনও উনুনেব পাশে যাননি তিনি। খাবার আনতে হলে হোটেলে যেতে হবে। সেটা মনোরমা জানলে কুরুক্ষেত্র বাধবে। জলপাইগুড়িতে অবশ্য নৌকো এড়িয়েও যাওয়া যায়। তাতে প্রচুর সময লাগে। বানারহাট থেকে ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি, সেখান থেকে আবার ট্রেন পাল্টে জলপাইগুড়ি। পুরো একদিনের পথ। পরীক্ষার দুদিন আগে মেয়েটাকে এতখানি পবিশ্রম কবানো উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি জানাল সে-ই যাবে। বাঁদব দুটোকে এমন শাসনে সেখানে রাখবে যে ওরা দিদিকে বিরক্ত করাব সাহস পাবে না। মনোবমার মুখে হাসি ফুটল।

মনোরমা আজ মাঠে নেমে এসেছিলেন। বুধুয়া বাসের মাথায় মালপত্র তুলে দেওয়ার পর আসনে বসে অঞ্জলি তাকে শেষবার বলল বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যেতে। তারপরই তার নজবে পড়ল বড়বাবুব বাবা তেজেন্দ্র নিজেদেব কোয়ার্টার্স ছেড়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এসেছেন। ওর হাসি পেল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'হাসছ কেন ?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'এমনি।'

দীপার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। লেডিস সিট খালি থাকার দৌলতে তারা বসতে পেরেছে কিন্তু অমরনাথ মাথার ওপরে রডে হাত রেখে চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাকে দাঁড় কবিয়ে রেখে তারা বসে আছে এমন কাণ্ড কখনও ঘটেনি। সে মায়ের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা অঞ্জলির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটায়নি। সে খুব খুশী মুখে চা বাগান পিছিয়ে যেতে দেখছে। এই সময় ছোট ভাইটা জিজ্ঞাসা করল, 'অ্যাই দিদি, এই নদীটার নাম কিরে ?'

দীপা গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'আঙরাভাসা।'

নৌকোয় বসেছিল অঞ্জলি কাঠ হয়ে। বালিতে পা দিয়ে বলল, 'বাঁচলাম বাবা।'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

'তোর ঠাকুমা স্বপ্ন দেখেছিল না ?'

'ঠাকুমার আসার ইচ্ছে ছিল না বলে বানিয়ে বলেছে।'

'সে কি ! কি করে বুঝলি ?'

'বাঃ। আমি তো ঠাকুমার পাশেই শুয়েছিলাম। খারাপ স্বপ্ন দেখলেই ঠাকুমা ঠেলে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। কাল তো ভাঙায়নি।' কথা বলতে বলতে লোকটার ওপর নজর পড়ল তার। পক্ষিরাজ ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, 'পাঁচ সিকে পাঁচ সিকে।' জিনিসপত্র ততক্ষণে অন্য একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিলেন অমরনাথ। দীপা ছুটে গেল তাঁর কাছে, 'বাবা, আমাকে একটা আধুলি দেবে ?'

'আধুলি ? কি করবি ?'

'দাও না। পরে বলব।'

অমরনাথ পকেট থেকে খুচরো পয়সার দঙ্গল থেকে একটা আধুলি বের করে দিতেই দীপা ছুটে গেল লোকটার কাছে। ততক্ষণে সেই ট্যাক্সিতেও যাত্রী বোঝাই হয়ে গিয়েছে। ড্রাইভার স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল। দীপা পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটা নিন।'

'নিন মানে ? আট আনায় তো যাওয়া যায় না ভাই। আর জায়গাও নেই।'

'না। আমি যাব না। আপনি আমার কাছে আট আনা পান।'

'আমি ? তোমার কাছে ?' অবিশ্বাসে লোকটা যাত্রীদের দিকে তাকাল। তাঁরাও এখন কৌতূহলী হয়েছেন। দীপা আঁচলটা টেনে ধরল 'হ্যাঁ। অনেকদিন আগে আপনি আমাকে আট আনায় জলপাইগুড়ি থেকে এই ঘাটে এনেছিলেন।'

খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে লোকটা নেমে এল গাড়ি থেকে, 'তোমার হাতে একটা ভারী স্যুটকেস ছিল ? বিকেল হয়ে গিয়েছিল। তোমার সঙ্গে কেউ ছিল না, তাই তো ?'

দীপা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'কিন্তু সেদিন তোমার মাথায় সিঁদুর ছিল, হাতে শাঁখা ছিল। নতুন বউ মনে হচ্ছিল। এই গল্প আমি অনেকের কাছে করেছি। কিন্তু—।'

'এখন আর আমি বউটউ নই। আপনি আমার খুব উপকার করেছিলেন। এটা নিলে আমার ভাল লাগবে।' দীপার কথা শেষ হওয়ামাত্র অমরনাথ তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ড্রাইভার তাঁকে দেখল, 'আপনার— ?'

'মেয়ে।'

'ও। শোন, তুমি খুব ভাল। আমি কিছুই জানি না তোমার। কিন্তু এত বছর পরে তো আর ওই আধুলি নিতে পারব না। সেদিন যদি তোমার কাছে বাস ভাড়া ছাড়া বেশী পয়সা থাকত অবশ্যই নিতাম। আমরা কশাই লোক। কাউকে একটা পয়সাও ছাড়ি না। কিন্তু সেদিন আধুলিটা কম নিয়েছিলাম বলে আজও মনে মনে সুখ পাই। তুমি যদি সেটা আজ শোধ করে দাও তাহলে আর সুখ থাকবে না।'

'তা হলে আপনার কাছে আমি ঋণী থাকব ?'

'না। সেদিন কি তোমাকে বলেছিলাম পরে দিয়ে দিও ? বলিনি। তাহলে আর ঋণ বলছ কেন ? মনে করো তোমার জন্যে আট আনাই ভাড়া ছিল। আচ্ছা, যেদিন তুমি আবার শাঁখা সিঁদুর পরে স্যুটকেস নিয়ে একা এই ঘাটে এসে আমার পক্ষিরাজে উঠবে সেদিন সুদ সমেত শোধ করে দিও। কথা শেষ করেই লোকটা গাড়িতে উঠে বসল। তারপর বেশ রাগী মুখে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বালির ওপর ছুটে চলল কিং সাহেবের ঘাটের দিকে। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে যে ধুলো উড়লো তাতে মুহূর্তেই গাড়িটা ঢাকা পড়ে গেল। অমরনাথ মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন, 'চল।'

দুটো রিকশা করতে হল। ছেলেদের নিয়ে অমরনাথ সামনের রিকশায় বসেছিলেন। পেছনে বিষণ্ণ মুখে মায়ের পাশে দীপা। কোর্টকাছারি ছাড়িয়ে ডানদিকে সুভাষ বোসের মূর্তিটাকে রেখে রিকশা করলা নদীর ওপর কাঠের ব্রিজে উঠতেই ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল, 'ও মশাই, দাঁড়ান দাঁড়ান। আপনার নাম অমরনাথ, না ?'

॥ ১৩ ॥

অমরনাথ রিকশাওয়ালাকে থামতে বললো। তিনি লোকটাকে চিনতেই পারছিলেন না। রোগা লম্বা প্রৌঢ় এবং পোশাকে অসাচ্ছল্যর ছাপ স্পষ্ট। কাছে এসে লোকটি দুই হাত যুক্ত করে মাথায় ঠেকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভুল করেছি কি ? আপনি অমরনাথবাবু ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার ভুল হয়নি।'

'তা যাচ্ছেন কোথায় ? সঙ্গে পরিবার রয়েছে দেখছি। এখনই এলেন মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ের ফাইনাল পরীক্ষা। এখানেই সিট পড়েছে, ক'দিন থাকতে হবে।'

'মেয়ে ? উইটে বুঝি ? বাঃ, অনেক বড় হয়ে গেছে। হুম। কোথায় উঠবেন ?'

'বাবুপাড়ায় একটা গেস্ট হাউসে।'

'বাবুপাড়ায় গেস্ট হাউস ? তিনটে আছে। রায়দের, মিত্তিরদের আর গুপ্তদের। কোনটায় উঠছেন ? ঠিকানা আছে ?'

'মিস্টাব এস কে মিত্র ভদ্রলোকেব নাম।'

'বুঝেছি। ঠিক আছে. আর আটকাবো না। পরে দেখা হবে।'

'আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না।'

'পবিচয দিলেই পারবেন। আমিই যাব দেখা করতে। না, না, পরিবারের সবাইকে রাস্তায় দাঁড করিযে রাখা ঠিক হচ্ছে না। আসি, নমস্কার।'

চলন্ত রিকশায় বসে চিন্তিত হলেন অমরনাথ। লোকটি নিজের পরিচয় এড়িয়ে গেল কেন ? কখনও একে দেখেছেন বলে মনে পড়ছে না অথচ এমনভাবে কথা বলল যে সব খবর জানে। পেছনের রিকশায় বসে অঞ্জলি দীপাকে বলল, 'তোর বাবা[illegible]টা দেখলি। চেনাজানা নেই একটা উটকো লোককে গড়গড় করে সব কথা বলে গেল। কার মাথায় কি মতলব আছে কেউ বলতে পারে ?'

দীপা বলল, 'বাবা কি এমন বলেছে !'

'বাঃ, কোথায় উঠব কেন এসেছি বলার কি দরকার ! এমনও তো হতে পারে লোকটা ওদের কোন আত্মীয় কিংবা খুব চেনা।' অঞ্জলির কথা শেষ হতেই মুখ থমথমে হয়ে গেল দীপাব। জলপাইগুড়িতে আসতে হবে জানার পর থেকেই সেই রাত-দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। দম বন্ধ হয়ে আসে। রাত্রে এসেছিল বলে কিছুই দ্যাখেনি আবার দুপুর পেরিয়ে যখন চোরের মত ফিরে যাচ্ছিল তখন কোনদিকে তাকাবার মত মন ছিল না। এতদিন হয়ে গেল, বাড়িতে কেউ ভুলেও ওই কথা তোলে না। কিন্তু তার আচরণ বিধবাছাপ মেরে নিয়ন্ত্রিত করে রাখা হয়েছে এমন ভাবে যে সেই কথা ভুলে যাওয়ার উপায় নেই। এই লোকটি যদি ওদের লোক হয় তাহলে ?

এস· কে· মিত্রের গেস্ট হাউস খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না। সুন্দর ছিমছাম বাগানওয়ালা বাড়িটা করলা নদীর ধারেই। চৌকিদার নিজেই এগিয়ে এল, সে ইতিমধ্যে নির্দেশ পেয়ে গেছে। ঘরদোর দেখে অমরনাথ খুশি। রমলা সেনের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেন

তিনি। আজই একটা চিঠি লিখবেন ঠিক করলেন। বাড়ি দেখে অঞ্জলির মেজাজ শান্ত হল। নইলে অজানা লোককে সব খবর দেওয়ার জন্যে স্বামীর সঙ্গে তার একপ্রস্থ হয়ে যেত। চৌকিদার চলে গেলে বলল, 'শোন, তোমাকে একটা কথা বলছি। আমরা এখন শত্রুপক্ষের এলাকায় এসেছি। সাবধানে চলবে। সবাইকে আগবাড়িয়ে বিশ্বাস করবে না। ওই লোকটা যদি আসে তাহলে বেশি কথা বলবে না।'

দীপা পড়তে বসে গেল। অঞ্জলি ছেলেদের নিযে করলা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বিয়ের পর এই প্রথম সে অমরনাথের সঙ্গে বাইরে একা এল। একা শব্দটা ভাবা মাত্র হেসে ফেলল সে। ছেলেদুটোকে কড়া গলায় বলল, 'সাবধান করে দিচ্ছি, কেউ যেন এই নদীর ধারে খেলতে আসবে না। বড় বড় কুমির আছে। গপ্ করে গিলে নেবে তোমাদের।'

সন্ধের মধ্যে অমরনাথের অনেকগুলো কাজ হয়ে গেল। দীপার যে স্কুলে সিট পড়েছে সেখানে যাওয়ার সহজ পথটি দেখে এলেন। বাজার থেকে আহার্য জিনিস কিনলেন। গেস্ট হাউসে ফিরে দেখলেন সত্যসাধনমাস্টার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছেন। অঞ্জলি বলল, 'কি ঝামেলা বাধালে বল তো!'

অমরনাথ বললেন, 'কি হয়েছে?'

'সেই লোকটা এসেছিল। তুমি নেই শুনে বলেছে ঘুরে আসছে।'

'লোকটা কে তাই তো বুঝতে পারছি না। মাস্টারমশাই-এর খবর ভাল?'

'মন্দ না। এখন পরীক্ষাটা ভালয ভালয শেষ হইলেই হয়। একটা কথা কই। এখন দীপারে একদম ডিস্টার্ব কইরেন না। ওর যেমন পড়নের ইচ্ছা তাই পড়তে দিবেন। আর পরীক্ষার অন্তত এক ঘণ্টা আগে নিয়া যাইবেন সেন্টারে।'

'আপনি নিশ্চিত থাকুন, আপনার ছাত্রীর কোন অসুবিধে হবে না।'

সত্যসাধন মুখে হাত বোলালেন একটু। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'দ্যাখেন অমরনাথবাবু, আমি ব্যাকডেটেড মানুষ। কখনও ভাবি নাই মাইয়ামানুষের মেধা পুরুষদের চেয়ে বেশি। কিন্তু দীপারে দেইখ্যা আমার ভুল ভাঙছে। এই মেয়েটি অনেক উপরে উঠবে। হয়তো ঈশ্বরের বাসনা ছিল না সে সংসার করে। আজ উঠি।'

অঞ্জলি বলল, 'রোজ যদি একবার এখানে ঘুরে যান মাস্টারমশাই—'

সত্যসাধন বললেন, 'বলার দরকার নেই। স্বার্থ আমার, আমি আসব।'

গেট খুলে যখন সত্যসাধন বেরিয়ে যাচ্ছেন তখন অঞ্জলি অমরনাথের কিনে আনা জিনিসপত্রের ব্যাগ নিয়ে ভেতরে গেল। একটা ঘর দীপাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এ বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আছে। ফলে দ্বিতীয় ঘরটিতে ছেলে দুটো হুটোপুটি করছে। ইলেকট্রিক আলোয় রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম হচ্ছে ওদের। অঞ্জলি ধমকালো, 'আস্তে। বারংবার বলেছি এই ক'দিন দিদি বাড়িতে থাকলে গলা তুলে কথা বলবি না।'

বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল। অমরনাথ তার একটায বসলেন। খুব শান্ত এই বাড়িটা। রমলা সেন যেচে যদি ব্যবস্থাটা না করে দিতেন—' অঞ্জলি ভদ্রমহিলাকে কখনই পছন্দ করেনি। কিন্তু এখন আর মুখ ফুটে কিছু বলে না। এক কাপ চা হলে মন্দ হত না। অঞ্জলিকে ডেকে বলতে ইচ্ছে হল না। আজকাল মাঝেমাঝেই ক্লান্তি লাগে। ...-বাগানের কাজে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে যে তার বাইরের জীবনের সঙ্গে খাপ খাওযাতে পারেন না। ছেলে দুটোকে হয়তো মানুষ করে যেতে পারবেন। কিন্তু মেয়েটা?

অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেললেন। শেষপর্যন্ত দীপা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিচ্ছে। তাদের বংশে কোন মেয়ে এই অবধি পড়েনি। বংশ! দীপা কি তাঁর বংশের? উত্তরটা ভাবতেই

ভাল লাগে না। যে মেয়েটিকে জন্মের পরই মাকে হারাতে হয়েছে, যার বাবা স্ত্রীর মৃত্যুর পরই সম্পর্ক অস্বীকার করেছে সেই মেয়েটিকে যখন বুকে তুলে নিতে পেরেছিলেন, তিল তিল করে বড় করে তুলতে পেয়েছিলেন তখন— ! অমরনাথ মাথা নাড়লেন। মতিভ্রম ! মতিভ্রম না হলে হরিদাসদার কথা শুনে বিয়েতে তিনি রাজী হয়ে যেতেন না। মনোরমা যদি সেসময় চাপ না দিতেন। এত কিছু করা নষ্ট হয়ে গেল একটা ভুলের জন্যে। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত কথা। লোকে বলে ছেলে হলে পড়াশুনার পেছনে খরচ করার মানে হয়, মেয়ের পেছনে এত টাকা ঢালছেন কেন ? তার ওপর বিধবা মেয়ে। কোন ভবিষ্যৎ নেই। কবে বিদ্যাসাগরমশাই বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন কিন্তু কে মানছে ? কেউ না। দেশে লক্ষ লক্ষ কুমারী পড়ে থাকতে সাধ করে কেউ বিধবাকে বিয়ে করে ! সুভাষচন্দ্র গত দু-বছরে কলকাতা থেকে অবশ্য একটার পর একটা সম্বন্ধ পাঠিয়ে যাচ্ছে। কেউ দুবার বিয়ে করেছে কেউ তিন সন্তান নিয়ে বিপত্নীক। দ্বিতীয়বার ভুল করবেন না অমরনাথ। সেই কথা জানিয়েও দিয়েছেন সুভাষচন্দ্রকে। স্কুল ফাইনালটা পাস করলে চা-বাগানের স্কুলে একটা কাজ হয়েও যেতে পারে।

অঞ্জলি চায়ের কাপ নিয়ে পাশে এসে দাঁড়াল, 'কি ভাবছ ?'

অমবনাথ খুশি হয়ে কাপ নিলেন। কথা বললেন অন্য গলায়, 'কেমন লাগছে জলপাইগুড়ি ? তোমারও একটু চেঞ্জ হল !'

'তা হল। আমি ঠিক করেছি দীপা যখন পরীক্ষা দিতে যাবে তখন বাইরে ঘুরতে যাব। পরীক্ষা শেষ হলে ওকে নিয়ে ফিরব।'

'তাই হবে।'

'আর পবীক্ষা যেদিন শেষ হবে সেদিন সবাই মিলে একটা সিনেমা দেখতে যাব। একটু আগে রিকশায় করে মাইকে বলতে বলতে গেল কাল থেকে রূপশ্রী সিনেমা হলে উত্তমকুমারের সিনেমা হবে। কুহক !'

'ভালয় ভালয় পরীক্ষা হোক।'

'কেউ আসছে।' অঞ্জলি গেটের দিকে তাকিয়ে বলল। গেট খুলে যিনি আসছিলেন তিনি খুব জোরেই হাঁটছিলেন। একেবারে কাছে এসে বললেন, 'নমস্কার মশাই, এই এলেন বুঝি ? আমি অবশ্য এর আগে খোঁজ নিয়ে গিয়েছি।'

অঞ্জলি চটপট ভেতরে চলে এল। অমরনাথের চা তখনও অর্ধেক। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু এখনও আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'খুব স্বাভাবিক। কয়েক মিনিটের জন্যে দেখা হয়েছিল। আমার আবার মুশকিল হল যাকে ভাল লাগে তাকে কিছুতেই ভুলে যেতে পারি না। তা কি বলব মশাই, বয়স তো কম হল না, ভাল লাগাব মত মানুষ তো কম দেখলাম না, তাঁরা সবাই মাথার মধ্যে যাকে বলে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকেন। আমাকে এখনও বুঝতে পারছেন না ? মেয়ের বউভাতে জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন। প্রতুলবাবুর বাড়িতে আমি আপনাকে আপ্যায়ন করে বসতে বলেছিলাম। এখন মনে পড়ছে ?'

অমরনাথ শক্ত হলেন। একটু ভাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় এই লোকটিকে দেখেছিলেন কিনা মনে করতে পারলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার নাম ?'

'হরদেব ঘোষাল। প্রতুলবাবুর প্রথম জীবনের ব্যবসার পার্টনার ছিলাম। যেই তিনি লাভের মুখ দেখতে লাগলেন অমনি হাত ধুয়ে ফেললেন ! তা একটু নিশ্চয়ই বসতে বলবেন। হাঁটতে হাঁটতে হাঁটু ব্যথা হয়ে গেল।'

অমরনাথ ইতস্তত করলেন। যে সম্পর্কটি একেবারেই চুকে গিয়েছে তারই জের ধরে উদয় হয়েছেন হরদেব। নতুন জায়গায় একেবারে অভদ্র হতেও পারছেন না। চা-বাগান হলে যে ব্যবহার করতেন এখানে তা পারলেন না। বললেন, 'বসুন।'

আধ-খাওয়া চা সুদ্ধু কাপটি মাটিতে নামিয়ে রাখলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ?'

হরদেব আরাম করে বসলেন, 'এই মেয়ে তো সেই মেয়ে যে বিধবা হয়েছে ?'

অমরনাথ জবাব দিলেন না। হরদেব একটু অপেক্ষা করে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। অবশ্য বিয়েবাড়িতে কনের বেশে দেখেছি, এখন তো ডাগর হয়েছে, মিল তেমন নেই, তবু শুনেছিলাম মেয়েটিকে আপনি পড়াচ্ছেন। তা সে যে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার মত উপযুক্ত হয়ে গেছে তা কি করে ভাবব ! খুব ভাল, খুব ভাল।' পকেট থেকে কৌটো বের করে নস্যি নিলেন হরদেব।

'আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন এখনও বললেন না !'

'বলছি। দেখুন অমরবাবু, প্রতুল ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনল। যে ছেলে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে তার মাধ্যমে বংশধর চাইল সে। আপনার মেয়ে সেদিন পালিয়ে বেঁচেছিল। ছেলেও মরল প্রতুলের। তারপর—'

'এসব তো আমাদের জানা। পুরনো গল্প। এখন কেন ওসব তুলছেন ?'

'বলছি। আপনার মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর প্রতুল তার পুত্রের মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিল। কেন জানেন ? জানিয়েছিল এই জন্যে যার সম্পর্কে সম্পর্ক সে নেই তাই তোমার মেয়েকে আর পাঠিও না। সে ঠিকই করেছিল। কারণ আপনি আর আপনার মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়িতে ফেরত পাঠাননি।'

'কে কি চেয়েছিল জানি না আমি পাঠানো উচিত বলে মনে করিনি।'

'হ্যাঁ। এটাই সে চেয়েছিল। প্রতুলের বিশাল সম্পত্তি। এসবের উত্তরাধিকারী কে বলুন তো ! জানেন ? জানেন না ! আপনার মেয়ে।' শেষ শব্দ দুটো নিচু গলায় বললেন হরদেব ঘোষাল। অমরনাথের চোখ ছোট হল, 'কি করে ?'

'পুত্রবধূ। ছেলে নেই মেয়ে নেই অতএব সম্পত্তি তো পুত্রবধূই পাবে।' হরদেব হাসলেন, 'প্রথম ছয়সাত মাস খুব উদ্বিগ্ন ছিল সে। না, না, পুত্রশোকে নয়, আপনি যদি খবর পাঠান যে মেয়ে গর্ভধারণ করেছে এবং সন্তানসম্ভবা তাহলে কি হবে ? শেষ পর্যন্ত তার লোকজন যখন জানাল কিছুই হয়নি তখন নিশ্চিন্ত হল।'

'কিন্তু আপনি বললেন তিনি উত্তরাধিকারী আনার জন্যে ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন। সেরকম কিছু হলে তাঁর তো খুশি হবার কথা।' অমরনাথ আপত্তি করলেন।

'না। একটু চা হবে ? আচ্ছা থাক। তিনি খুশি হতেন না। কারণ তিনি ভাল করেই জানতেন যে তাঁর পুত্রের পিতা হবার ক্ষমতা নেই। তবু তিনি বিয়েটা দিয়েছিলেন। কিন্তু যদি তাঁর অনুমান ভুল হয়, পুত্র যদি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে, উদ্বিগ্নতা সেই কারণে !'

'আপনি যা বলছেন তা আমার কাছে দুর্বোধ্য। আর এইসব কথা কি করে জানতে পারলেন আপনি ?' অমরনাথ বিরক্ত হলেন।

'জানি। এখন আমি প্রতুলের অনেক নিচের স্তরের। তার অর্থ আছে, নাম হয়েছে, রাজনৈতিক দলে টাকা খাটায়। আমার কিছুই নেই। তার সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা আমার নেই। মাঝে মাঝে দয়া করে সে টাকা দেয় আমাকে। কেন দেয় জানেন ? মানুষ যতই ওপরে উঠুক তার পাছায় যদি ঘা থাকে তাহলে সে সোজা হয়ে বসতে পারে না।

অপকর্মগুলো নিয়ে আলোচনা করার সঙ্গী, বিশ্বস্ত সঙ্গী নেই তার। এখন যারা তাকে চেনেজানে তারা অন্য চেহারা জানে। একমাত্র আমার কাছে তার অতীত বাঁধা। তাই আমাকে দরকার হয় তার। ঘর বন্ধ করে কুমতলব বলে পরামর্শ চায়। আমিও দিই বদলে টাকা নিই। ফেল কড়ি মাখ তেল, আমি কি তোমার পর!' হাসলেন হরদেব ঘোষাল। তারপর বললেন, 'ছেলের বিয়ে ঠিক করছে আমাকে বলেনি। জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়েটাকে মারছ কেন? সে বলল, এক পয়সা যৌতুক নেব না, রাজরানীর মত থাকবে এতে মারাটা কি দেখলে?' তারপর গলা নামিয়ে বলেছিল, "আমার বংশধর দরকার। এ ছেলে মরে গেলে আর সুযোগ পাব না।" আমি চমকে উঠলাম। বিশ্বাস করুন, আমি যোগাড় করে আনলাম এক ধরনের পাউডার যা খেলে শরীরের তেজ বাড়ে। প্রতুলকে রাজী করালাম ছেলেকে খাওয়াতে। প্রতুল রাজী হল কেন জানেন? অন্তত মেয়েটার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা একটা হোক সে চেয়েছিল। কিন্তু তার পরের দিন ছেলে গেল হাসপাতালে আর বউ গেল পালিয়ে। প্রতুল খবর পেল সন্ধে বেলায়। তখন ঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নইলে যেমন করেই হোক সেই রাত্রে সে বউকে ফিরিয়ে আনত। হয়তো সেই রাত্রে ছেলে না মরলে পরদিন নিজে আপনার বাড়িতে চলে যেত। অমরনাথবাবু, অতুল মরে গিয়ে আপনার মেয়েকে বাঁচিয়ে গেছে।'

অমরনাথ চকিতে দ্বিতীয় ঘরের দিকে তাকালেন। মেয়েটা পড়ে চুপচাপ। বাইরে থেকে বোঝা যায় না কখনই। জোরে পড়তে পারে না সে কিছুতেই। এই মুহূর্তে সে কি করছে বোঝার উপায় নেই। কিন্তু হরদেব ঘোষালের কথাবার্তা যদি তার কানে যায় তাহলে একটা গোলমাল হতে বাধ্য। হয়তো এত কষ্টের পড়াশুনা নষ্ট হয়ে যাবে, পরীক্ষা দিতে পারবে না মেয়েটা। তিনি সোজাসুজি বললেন, 'হরদেববাবু, আপনি আমার অপরিচিত। প্রতুলবাবু আপনার বন্ধু। তাঁর ব্যক্তিগত কথা আমাকে বলা অন্যায় হচ্ছে। তাছাড়া ওই সম্পর্কের কথা আমরা ভুলে যেতে চাই।'

হরদেব বললেন, 'এসব কথা আপনাকে আমি বলতাম না অমরনাথবাবু। আপনার চা-বাগানের বাসায় দিনে গিয়ে দিনেই ফিরে আসা যায়। কিন্তু আমি তো কখনও যাইনি। কিন্তু সম্প্রতি আমি প্রতুলের দ্বারা চরম অপমানিত হয়েছি। আমাকে সে তার বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করেছে। আমি গরীব, প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা আমার সীমিত। কিন্তু মনে রাখবেন সীমিত, একেবারে যে নেই তা নয়। আপনাকে আজ আচমকা দেখতে পেয়ে মনে হল সেই প্রতিশোধ আমি নিতে পারি। আপনি কি জানেন প্রতুলবাবুর স্ত্রী বিকৃত মস্তিষ্ক? পাগল?'

'না তো।' অজান্তেই বলে ফেললো অমরনাথ।

'হ্যাঁ। এক বছর হল সে উন্মাদ। প্রতুল তাকে সম্প্রতি উন্মাদাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে পাঠালে হয়তো সুস্থ হতে পারত কিন্তু এখন কোন সম্ভাবনা নেই। বাড়ির কর্ত্রী হয়ে আছে আনা।' আবার নস্যি নিলেন হরদেব।

'আনা? শুনেছি ওদের পরিচারিকার নাম আনা।'

'সঠিক শুনেছেন। এই রমণীটির সঙ্গে প্রতুলবাবুর দীর্ঘকালের সম্পর্ক। ওঁর স্ত্রীও সেকথা জানতেন। আনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী। প্রতুলবাবুর অনেক কুকর্মে সে মন্ত্রণা দিয়েছে। এখন সে বিবাহিতা স্ত্রীর মর্যাদা চায়। প্রথমা স্ত্রী উন্মাদিনী, পুত্র মৃত, প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু যার বাড়িতে ডি সি-এস পি আসেন, নেতারা আসেন, তিনি কি করে ঝি-ক্লাসের একটা মেয়েকে বিয়ে করবেন? তার ওপর মেয়েটি যাকে বলে

যৌবনের শেষ প্রান্তে। প্রতুল আমাকে বলেছিল আনাকে বুঝিয়ে বলতে। একশটি টাকা নিয়ে আমি রাজী হয়েছিলাম। কিন্তু আনা আমাকে নাকানি চুবুনি খাওয়াল। সে বলল আপনার মেয়েকে লুকিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে সে নিজে কারণ তার স্বার্থ ছিল। সে যখন জানতে পারল.অতুল বাঁচবে না তখনই তার মাথায় বুদ্ধিটা খেলল। আপনার মেয়েকে প্রতুলের খপ্পড় থেকে বের করে দিতে পারলে পুরো সম্পত্তি দখল করতে তার কোন অসুবিধে হবে না। কারণ প্রতুলের ঔরসে তার গর্ভে একটি পুত্র সন্তান জন্মেছে। না, না, জলপাইগুড়ির কোন লোক একথা জানে না। ছেলেটি রয়েছে হাওড়ায় আনার গ্রামে। প্রতি মাসে প্রতুলবাবু আনার নাম করে তার খরচ পাঠায়। মানি অর্ডারের রসিদগুলো আমায় দেখিয়েছে আনা। এসব খবর নলিনীর অজানা নয়। কিন্তু যেই আনা বিয়ের কথা তুলল অমনি তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আনা বুঝেছে প্রতুল বিয়ে না করলে সে ওই সম্পত্তির অধিকারিণী হবে না। কি বোঝাবো আমি ? প্রতুলকে বললাম যা ন্যায্য তাই করতে। আপনার মেয়ের নামে সম্পত্তি লিখে দিতে। সে ক্রুদ্ধ হল। আমাকে অপমান করল প্রচণ্ড ভাবে। তারপর থেকে ওই বাড়িতে আমি আর যাই না। কিন্তু জ্বলে যাচ্ছে ভেতরটা। আপনি আমার সঙ্গে হাত মেলান।'

'কি ভাবে ?'

'প্রতুলের পরিবারে এখন মালিক দু'জন। প্রতুল আর তার স্ত্রী। কিন্তু স্ত্রী উন্মাদিনী। সে আর কখনও ভাল হবে না। অতএব রইল প্রতুল একা। আনা যতই চাপ দিক তার পক্ষে জলপাইগুড়িতে বাস করে ঝিকে বিয়ে করা সম্ভব হবে না। সে জানে তাহলে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। গতকাল শুনলাম সে রক্তচাপে ভুগছে। এই অবস্থায় ওর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী আপনার মেয়ে।'

'তাও যদি হয় আপনি কি চাইছেন ?'

'আপনার মেয়েকে তার শ্বশুরবাড়িতে পাঠিয়ে দিন।'

'মানে ?'

'এখন প্রতুলের যা অবস্থা শুনছি তাতে নখ দাঁত খসে পড়তে বেশি দেরি নেই। এইসময় মেয়ে গিয়ে ওখানে কায়েম হলে আনার সাধ্য নেই কিছু হাতিয়ে নেয়। প্রতুল যদ্দিন আছে তদ্দিন একটু সইতে হবে কিন্তু তারপর— !'

'হরদেববাবু, এবার আপনি আসুন।'

'মানে ?'

'আমার মেয়ে এখানে এসেছে পরীক্ষা দিতে। আমরা এসব ব্যাপারে মাথা গলাতে চাই না। তা ছাড়া যে সম্পর্ক অস্বীকার করেছি সেখানে আমার মেয়ে ফিরে যেতে পারে না। আপনি এখন আসুন।' অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

হরদেব মাটির দিকে মুখ করে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লেন, 'ভাল। তবে কথাটা মনে রাখবেন। মন পরিবর্তিত হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। কথায় বলে পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা, এ তো রাজার সম্পত্তি।' হরদেব টুক টুক করে গেট খুলে বেরিয়ে গেলেন।

অমরনাথ ধীরে ধীরে দীপার ঘরের দরজায় পৌঁছালেন। টেবিলে ঝুঁকে বসে মেয়েটা লিখে যাচ্ছে। ওখানে বসলে কি বারান্দায় বলা কথাবার্তা শোনা যায় ? বুঝতে পারলেন না তিনি। কিন্তু হঠাৎ তাঁর অস্বস্তি শুরু হল। যে ভঙ্গিতে দীপা লিখে যাচ্ছে তাতে মোটেই ওকে আর কিশোরী মনে হচ্ছে না। ও কি আর কিশোরী আছে ? অনেক পোড খাওয়া

লড়াকু মেয়ের আদল এসে গেছে ওই ভঙ্গিতে। অমরনাথ চট করে সরে এলেন। পাশের ঘরে ছেলে দুটো বিছানায় শুয়ে গল্প করছে। দরজার পাশে একটা চেয়ারে পাথরের মত অঞ্জলি বসে। অমরনাথ দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল চাপা গলায়, 'ও কি করছে?'

'লিখছে।'

'শুনতে পেয়েছে বলে মনে হল?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'আমি এই ভয় পাচ্ছিলাম।'

'হয়তো শুনতে পায়নি।'

'লোকটাকে আব এখানে ঢুকতে দেবে না।'

'মনে হয় নিজেই আর আসবে না।'

প্রায় ঝড়ের মত পরীক্ষার দিনগুলো কাটল। প্রথম দিন দুপুরে খুব লজ্জা পেয়েছিল অঞ্জলি। টিফিনের সময় অমরনাথের সঙ্গে পরীক্ষার হলে গিয়ে দীপার সঙ্গে দেখা করেছিল সে। ঘণ্টা পড়ার আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। আর তখন দেখতে পেয়েছিল ছাত্রীদের বাবা-মা হাতে ডাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল সকাল দীপাকে ভাত খাইয়ে পৌঁছে দিয়েছিল অমরনাথ। এত অল্প সময়েব মধ্যে খিদে পায় না দীপার। কিন্তু মেয়েরা যখন হল থেকে বেব হল, গার্জেনবা যখন তাদের হাতে কাটা ডাব তুলে দিয়ে প্রশ্ন কবতে লাগল তখন মনে হল খালি হাতে আসা ঠিক হয়নি। একটা পরীক্ষা দিয়েই মেয়ের মুখে ঘাম, চুল উস্কোখুস্কো। আঙুলে কালির দাগ। দুটো কলম দিয়েছিলেন অমরনাথ। অনেককাল আগে কেনা পার্কার কলমটা তোলা ছিল। সেটার সঙ্গে নিত্য ব্যবহৃত কলমটাও নিয়ে এসেছিল দীপা। বোঝা যাচ্ছে পার্কাব কলমটা ব্যবহাব করেনি। নিশ্চয়ই লিক করছে সস্তার কলম থেকে। অমবনাথ আঙুলটা দেখিয়ে বললেন, 'আঙুলটার কি অবস্থা করেছিস। পার্কার দিয়ে লিখলে সুবিধে হত না।' দীপা মাথা নাড়ল, 'পুরনো কলমে সুবিধে হয়। লিখে লিখে অভ্যাস হয়ে গেছে তো। মা, আমার না, কি ভয় করছিল যখন খাত, [illegible]ল। কোয়েশ্চন পেপার হাতে নিয়ে মনে হল আমি একটা প্রশ্নেরও উত্তর লিখতে পারব না। কিন্তু যেই রোল নম্বরটা খাতায় লিখলাম সব ঠিক হয়ে গেল।'

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'অ্যাডমিড কার্ড দেখে নম্বরটা লিখেছিস তো?'

'আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।'

এবার অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'তুই ডাব খাবি?'

'ডাব?' দীপা মুখ ঘুবিয়ে চারপাশে তাকাল। তারপব হেসে বলল, 'খামোকা ডাব খেতে যাব কেন? আমার কি পেট খারাপ?'

অঞ্জলির মনে হল মান বাঁচল। তারপর থেকে এক রুটিন। সকালে অমরনাথ মেয়েকে পৌঁছে দিয়ে আসে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে অঞ্জলি দুই ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পরীক্ষার হলে টিফিনের শেষে মেয়ে ঢুকে গেলে ওরা শহর দেখতে বের হয়। দেবী চৌধুরানীর কালীবাড়িটি তার খুব ভাল লেগেছে। পরীক্ষার শেষ দিনে অমরনাথ উত্তমকুমারের "কুহক" ছবির টিকিট কিনে এনেছেন। পরীক্ষার পর বাড়ি এসে বিছানায় লাফিয়ে উঠে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল দীপা, 'আঃ। কতদিন ভাল করে ঘুমইনি মা।'

অঞ্জলি বলল, 'চা-বাগানে গিয়ে কাল থেকে যত খুশি ঘুমাস। একটু বাদে তৈরি হয়ে

নে। আমরা সবাই কুহক দেখতে যাব।'

'আমার ভাল লাগছে না মা। তোমরা যাও?'

'শরীর খারাপ লাগছে তোর?

'না। শুধু ঘুম পাচ্ছে।'

'ক'মাস ধরে যা পড়া পড়লি। সিনেমাটা উত্তমকুমারের ছিল তাই ভাবলাম দেখি।'

'সুচিত্রা সেন আছে?' মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল দীপা।

'কেন?'

'থাকলে আমি যাব।'

অঞ্জলি জানত যে ছবির নায়িকা অন্য। তবু সে ঠোঁট ওলটালো, 'জানি না। হয় তো! উত্তমকুমার থাকলেই তো সুচিত্রা সেন থাকে।

দীপা উঠে বসল। বসে হাসল, 'জানো, অনেকদিন আগে একটা ছেলে আমাকে বলেছিল আমি নাকি সুচিত্রা সেনের মত দেখতে। তারপর অনেক সিনেমা পত্রিকায় আমি তার ছবি দেখেছি কিন্তু কোন মিলই খুঁজে পাইনি।'

'কোন ছেলে বলেছিল?' অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হল।

'তুমি চেনো না। অনেক বছর আগে মালবাবুর বাড়িতে এসেছিল।'

'আমাকে বলিসনি কেন?'

'আমি কথাটার মানেই বুঝিনি তখন।'

'এখন বুঝেছিস?'

'বাঃ, আমি কি আর ছোট আছি?'

সিনেমা দেখার পর অঞ্জলির মন খুব ভাল হয়ে গিয়েছিল। ছেলেদের নিয়ে অমরনাথ আগে আগে যাচ্ছিলেন। পেছনে দীপার পাশে অঞ্জলি। অঞ্জলি বলল, 'হেমন্তকুমারের গানগুলো কি সুন্দর। শহরের লোকদের কি সুবিধে, ইচ্ছে হলেই সিনেমা দেখতে পারে।'

দীপা আঁচল টানল। রিকশার দঙ্গল, সিনেমা ফেরত মানুষের ভিড় সামলে ওরা হাঁটছিল। অঞ্জলি হাসল, 'কথা বলছিস না যে। তোর নায়িকা না দেখে মন খারাপ হয়ে গিয়েছে?' তারপরেই মনোরমার মুখ মনে পড়ে গেল তার। চাপা গলায় বলল, 'শোন, বাড়িতে গিয়ে ঠাকুমাকে বলার দরকার নেই যে আমরা সিনেমা দেখলাম

'কেন?'

'বুঝেছিস না?'

'বুঝেছি।'

'কি?'

'আমার সিনেমা দেখা ঠিক নয়।'

'দ্যাখ, কেউ যদি মনে করেন এই করা উচিত ওই করা উচিত আর তিনি যদি বয়স্ক হন এবং বোঝালেও না বোঝেন তাহলে খামোকা সত্যি কথা আগ বাড়িয়ে বলে দুঃখ দিয়ে লাভ কি!'

'সামনে যারা বাবার সঙ্গে যাচ্ছে তারা যদি বলে দেয়?'

'ওদের মনে থাকবে না। আর মনে থাকলেও না হয় বলব ভগবানের সিনেমা দেখেছি।'

'এর চেয়ে না দেখলেই হত। না দেখলে তো কোন ক্ষতি হত না।' দীপা খুব নিস্পৃহ গলায় কথাগুলো বলল। অঞ্জলি এবার গম্ভীর হয়ে গেল। আজকাল দীপার অনেক কথাই

সে ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। বড্ড ধাক্কা দিয়ে কথা বলে সে।

গেস্ট হাউসে পৌঁছাতেই চৌকিদার বলল, 'এক বাবু আয়া থা মিলনেকে লিয়ে।'

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম বলেছে ? মাস্টারমশাই ? রোজ যিনি আসেন ?'

'নেহি। ইয়ে দুসরা আদমি।'

অঞ্জলি অমরনাথের দিকে তাকাল, 'আবার এসেছিল সেই লোকটা !'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কে মা ?'

অঞ্জলি ভেতরে ঢুকল, 'তুই চিনবি না। আয়।' ওরা চলে গেলে অমরনাথ চৌকিদারের কাছে জানতে চাইলেন, 'কি রকম দেখতে হে সেই বাবুকে ?'

'বুড্ডা। গাড়িমে আয়াথা।'

গাড়িতে এসেছিল ? খুব অবাক হলেন অমরনাথ। হরদেব ঘোষালকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না তার গাড়ি আছে। গাড়ি থাকলে কেউ রাস্তায় হেঁটে বেড়ায় না। তাছাড়া হরদেবকে দেখে সচ্ছল বলে মনেই হয় না। তাহলে কে এল ? অমরনাথ ভেবে পেলেন না। চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করেও তিনি নতুন কিছু জানতে পারলেন না। যাঁর গেস্ট হাউস তিনি একবারও আসেননি। আব তিনি তো চৌকিদারের মালিক।

ঘরে এসে অঞ্জলিকে এই কথাগুলো বললেন অমরনাথ। অঞ্জলি বলল, 'এত ভাবার কি আছে ! যে আসে আসুক। আমরা তো কাল সকালেই চলে যাচ্ছি।'

রাত বাড়ল। যিনি এসেছিলেন তিনি আর এলেন না। অমবনাথের ঘুম আসছিল না। কেমন যেন ভয় ভয় করছিল। মানুষেব ওপর আর বিশ্বাস রাখা যাচ্ছে না। যিনি এসেছিলেন তিনি যদি প্রতুলববাবু হন তাহলে তো ভয়ের কারণ রয়েছে। হরদেব ঘোষাল যা বলেছেন তা যদি সত্যি হয় তাহলে দীপা ওদেব পথের কাঁটা। আনা নামক সেই পরিচাবিকাটি কি চাইবে দীপা বেঁচে থেকে সম্পত্তি ভোগ করুক ! প্রতুলবাবু নিজে থেকে কি দীপাকে সম্পত্তি দিতে চাইবেন ? মুশকিল হল এই ধরনের মানুষ এরকম বিশাল সম্পত্তি কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানকে মৃত্যুর পব দান করেও যেতে পারেন না। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত নিজে আগলে থাকতে চান। হঠাৎ মনে হল, প্রতুলবাবু তো এতদিন কোন বিরক্ত করেননি তাঁদের। পুত্রবধূ হিসেবে যে দাবি আছে তাতে তিনি দীপাকে [illegible] করে নিয়ে যেতে চাইলে কতটা বাধা দিতে পারবেন অমরনাথ। এক্ষেত্রে যদি হরদেব ঘোষালের কথা জানিয়ে তিনি যদি প্রতুলবাবুকে লিখে দেন যে তাঁর সম্পত্তির ওপর দীপা কোনদিন দাবি জানাতে যাবে না তাহলে তো ভদ্রলোককে নিশ্চিত করা যায়। অন্তত কোন আতঙ্কের সম্ভাবনা থাকে না।

অমরনাথ ঘুমন্ত ছেলে দুটোব পাশ থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বারান্দার আলো নিবিয়ে দিয়ে গিয়েছে চৌকিদার। অথচ দীপাদের ঘরে আলো জ্বলছে। দীপা আর অঞ্জলি শুচ্ছে ওখানে। নতুন জায়গায় আলো না জ্বেলে ঘুমাতে পারে না অঞ্জলি। অবশ্য দীপাও রাত জেগে পড়ত। মাঝেমাঝেই অমরনাথ তাকে সতর্ক করতেন, 'অনেক রাত হয়েছে। আর পড়তে হবে না, এবার শুয়ে পড়।' আজ তো কোন পড়াশুনা নেই।

রাত নিশুতি। শহরের কোথাও কোন শব্দ নেই। চারধার ছায়া ছায়া। বাবুপাড়ার রাস্তার আলো নিস্তেজ। হঠাৎ অমরনাথের মনে হল তিনি অনর্থক চিন্তা করছেন। আজকের রাত তো মধ্য পর্যায়ে। কাল ভোরেই শহর ছাড়ছেন। চা-বাগানে পৌঁছে গেলে কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। তিনি কেন খামোকা প্রতুলবাবুকে চিঠি দিতে যাবেন ! দেখাই যাক না। ঈশ্বর কার কপালে কি লিখেছেন তা কে জানে ! আগ বাড়িয়ে নিশ্চয়ই সম্পত্তি দাবি করতে

যাচ্ছেন না তিনি। কিন্তু যদি জল সেদিকে গড়ায় তাহলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকার কোন যুক্তি নেই। গা ঝাড়া দিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎই তিনি ডাকলেন, 'দীপা, ঘুমসনি ?'

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'হ্যাঁ। ঘুমচ্ছি।'

'কি করছিস ?'

'চিঠি লিখছিলাম।'

'ও। কাকে ?'

'শিলিগুড়িতে।'

'খুব ভাল করেছিস। আমি লিখব ভেবেছিলাম, তুই ধন্যবাদ দিয়ে দিস।' অমরনাথ নিজের ঘরে ঢুকে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

নিজের নাম লিখে মায়ের ঘুমন্ত শরীরটাকে দেখল দীপা। জলপাইগুড়িতে এসে মায়ের হাবভাব অনেক বদলে গিয়েছে। যেন বয়স কমেছে হঠাৎই। দীপা চিঠির ওপর নজর রাখল, 'শ্রদ্ধাষ্পদেসু, আজ আমার পরীক্ষা শেষ হল। কোন প্রশ্নের উত্তব লিখতে আমার অসুবিধে হয়নি। জানি না রেজাল্ট কিরকম হবে। তবে এব চেয়ে ভাল আমি লিখতে পারতাম না।

'আজ আমি ভেবেছিলাম আপনি আসতে পারেন। হয়তো সময় পাননি। কিন্তু আপনাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল আমার।

'মা জোর করায় আজ পরীক্ষার পরে একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমি। ফেরাব পথে মা বললেন ব্যাপারটা যেন ঠাকুমাকে না জানাই'। এটা আমাব খুব খাবাপ লেগেছে। নিজেকে বিধবা বলে ভাবতে আজকাল মোটেই ইচ্ছে করে না। যে লোকটা আমাকে বিয়ে করেছিল তার স্মৃতি বলতে হাড়জিড়ে রুগণ নগ্ন শবীব ছাড়া আমার কিছু মনে পড়ে না। ঠিক করেছি এবার চা-বাগানে গিয়ে এতদিন যা মেনে এসেছি তা আব মানব না। আপনি লিখেছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত ওটা মানা উচিত। কিন্তু লেখেননি প্রাপ্তবযস্কতা শরীরের না মনের ? তাড়াতাড়ি চিঠি দেবেন ? প্রণাম নেবেন। দীপাবলী।'

॥ ১৪ ॥

চাবাগানের আশেপাশে যে-সমস্ত সরকাবি জমি খালি পড়েছিল সেগুলোব দিকে কেউ নজর দিত না। বার্নিশঘাট পেরিয়ে লঙ্কাপাড়া অথবা হয় ময়নাগুড়ি লাটাগুড়ি নয় বানারহাট হয়ে সেবক পর্যন্ত আর ওদিকে কুচবিহাব আলিপুরদুয়াবে যাওযার পথে দুপাশে তাকালে হয জঙ্গল নয় বুনো ঝোপ আর ফাঁকা মাঠ চোখে পড়বে। সেইসব মাঠেব সর্বত্র লাঙ্গলও পড়ে না। মদেশিয়ারা তো চা-বাগানের কাজেই অভ্যস্ত—বাজবংশী সম্প্রদায়, যাঁদেব ভূমিপুত্র বলা যায়, তাঁরাও বিচ্ছিন্নভাবে বাস করেন। সরকারের মনের অবস্থা এইবকম, চা-বাগান তার সীমানার মধ্যে স্থির থাক, আমরা আমাদের মত আছি। এখনও চা-বাগানে মাঝেমধ্যে বাঘ বের হয়। সাপ তো আছেই। হাতিব দল বেখেয়ালে চলে আসে রাজবংশীদের গ্রামে, মদেশিয়াদের কুলি লাইনে। তবে এরকম ঘটনা বেশী ঘটে না। এখনও গঞ্জে গঞ্জে শিকারীরা আছেন যাঁরা পুরোনো বন্দুক নিয়ে বাঘ কিংবা হরিণ মারতে বেব হন। চা-বাগানের ম্যানেজাররা অবশ্য এ-ব্যাপাবে অনেক সুবিধে ভোগ করেন।

দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় দক্ষিণবঙ্গ যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিল ঠিক

সেইভাবে প্রথমদিকে চা-বাগানগুলো হয়নি। পূর্ব-বাংলার মানুষেরা এইরকম আদিম পরিবেশে চট করে আসতে চাননি। এখানে জীবিকার সম্ভবনা খুব কম ছিল। চা-বাগানের বাবুর চাকরি সীমিত। যাঁরা করছেন তাঁরা প্রায় বংশানুক্রমেই করে যাচ্ছেন। চা-শ্রমিকদের কাজে পূর্ব-বাংলার মানুষ নিজেকে নিয়োগ করার কথা ভাবতেই পারতেন না। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অন্য কোন শিল্প অথবা অর্থ-উপার্জনের পথ না থাকায় এদিকটায় মানুষের ঢল প্রথমে নামেনি।

কিন্তু জলের সঙ্গে মানুষের স্বভাবের কিছুটা মিল আছে। অবরুদ্ধ হলেই একটা পথ খুঁজে নিতে দেরি হয় না। স্বাধীনতার সাত আট বছর পর থেকেই ঢলটা নামল্। যে যার মত গরুছাগল চাষের জমি কিনে নিয়ে ডুয়ার্সের বিশাল ফাঁকা এলাকায় চলে আসতে আরম্ভ করলেন। ফলে প্রথমেই কাঠের ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বাড়ল। এবং সেইসঙ্গে জমি জবরদখল করে গঞ্জ এলাকার কাছেই কলোনি তৈরি শুরু হয়ে গেল। এই ব্যাপক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা সরকারের ছিল না। এতদিন মদেশিয়া নেপালি পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষা ইতস্তত শোনা যেত। কিন্তু এখন তাদের সবাইকে ছাপিয়ে পূর্ববাংলার ভাষা এল। কিন্তু মুশকিল হল যেহেতু পূর্ববাংলার জেলাভিত্তিক ভাষার চেহারা আলাদা, চট্টগ্রামের মানুষের সঙ্গে যশোবের মানুষ একই গলায় কথা বলতে পারে না তাই এখানে এসে একটি শঙ্কর ভাষা তৈরি হল। ডুয়ার্সে যেসব মানুষ বেশী এসেছিলেন তাঁদের বাড়ি ছিল রঙপুর রাজসাহী ইত্যাদি জেলায়। ঢাকার কিছু মানুষও দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিকে চলে এসেছিলেন। এই শঙ্কর ভাষার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রথমে মিলতে না চাইলেও শেষপর্যন্ত আলাদা হয়ে থাকতে পারলেন না।

চা-বাগানের গায়েই এখন প্রায় ঘনবসতি। অবশ্য তা বাজার এলাকাকে ঘিরেই। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়তে লাগল। ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়াল যে স্কুলবাড়িতে আর জায়গা কুলোচ্ছিল না। ফলে নতুন স্কুলবাড়ি তৈবী হল। নবাগতদের মধ্যে যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন কোনমতে তাঁদের কেউ কিছু করার না পেয়ে মাস্টারিতে যোগ দিলেন।

চা-বাগানের মানুষেরা প্রথমে পূর্ববঙ্গের মানুষদের পছন্দ করেননি। কিন্তু সংখ্যায় নবাগতবা এমনই বিপুল ছিল যে প্রতিবাদ মনে মনেই থেকে গেল. ওরা প্রতি মুহূর্তে পূর্ববঙ্গের মানুষের জীবনযাপনের পদ্ধতিতে ছিদ্র অন্বেষণ করতেন। এ-ব্যাপারে মনোরমার সঙ্গে বড়বাবুর বাবা তেজেন্দ্রর কোন মত পার্থক্য ছিল না। ব্যাপারটা অমরনাথের মধ্যেও অসংক্রমিত ছিল না। ছেলেদের কথার মধ্যে পূর্ববঙ্গের ভাষা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে। একা সত্যসাধন মাষ্টার এতদিন ছিলেন কিন্তু এখন তো হাজার হাজার সতাসাধন ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। একমাত্র বাঁচোয়া তাঁরা চা-বাগানের এলাকায় ঢুকতে পারেননি। বাজার এবং বাস রাস্তার দুপাশে তাঁরা বসতি স্থাপন করে ফেললেন। প্রচণ্ড সংগ্রামের সময় কে তাদের অপছন্দ করছে সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। খুব অল্পদিনেই বাজার এলাকার যা কিছু সামাজিক কাজকর্ম তা ওঁদের দখলে গেল। পুজো পার্বণ বেড়ে গেল এবং সেইসঙ্গে বঙ্গে বর্গী, সিরাজ, দুইপুরুষ ইত্যাদি নাটকের অভিনয় শুরু হয়ে গেল সেই সময়। এখন আর বোঝাই যায় না এঁরা পূর্ববাংলা ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন, বাস ট্যাক্সি লরি থেকে পানবিড়ি সিগারেটের ব্যবসায় তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন। অতি স্বাভাবিকভাবেই এঁদের হাতে কাঁচা পয়সা আসতে লাগল। প্রথম দিকে জীবন ধারনের পক্ষে তা অতি সাধারণ হলেও কেউ কেউ ক্রমশ অর্থবান হয়ে উঠলেন। মুখার্জী রায়েদের শ-মিলের পাশাপাশি পালেদের শ-মিল চালু হল। কিন্তু অনুপ্রবেশ হওয়া সত্ত্বেও চা-বাগান তার অতীত ঐতিহ্য এক

জায়গায় ধরে রাখতে পেরেছিল। নবাগতদের মধ্যে শিক্ষার ছাপ ছিল খুবই কম। জীবনসংগ্রামে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় শিক্ষার দিকে তাঁরা নজর দিতে পারেননি। ফলত, তাঁদের পরিবারের মহিলারাও পূর্ববঙ্গ থেকে বয়ে আনা সংস্কার এবং ধর্মান্ধতা আঁকড়ে ছিলেন। মেয়েদের বিয়ের আগে বা পরে চা-বাগানের রাস্তায়, গঞ্জের পথে দেখা যেত না। অন্তত যৌবন এলে তো নয়ই।

একমাত্র ললিতা এ-ব্যাপারে ব্যতিক্রম। কোয়ার্টার্সের সবাই অবাক হয়ে দেখত শ্যামলকে বিয়ে করার পর ললিতা তাকে নিয়ে সন্ধের আগে আসাম রোড ধরে চা-বাগানের দিকে বেড়াতে যায়। তেজেন্দ্র নিজের চোখে দেখেছেন কোয়ার্টার্সের এলাকা ছাড়িয়ে গেলেই ললিতা শ্যামলের কনুই ধরে হাঁটে। এইসময় ললিতা পরিপাটি করে চুল বাঁধে, ভাল শাড়ি কায়দা করে পরে, মাথায় ফুলও গোঁজে। এই নিয়ে প্রথমদিকে সবাই খুব হাসাহাসি করেছিল। যে মেয়ে বিষ খেয়ে যমের বাড়িতে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল সে এত গদগদ প্রেম দেখাবে—এটা মুখ বুজে সইতেই হবে এমন ভাবা অন্যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকেই উষ্ণ হয়ে উঠলেও এ ব্যাপারে কেউ সরাসরি শ্যামলকে কিছু বলতে পারলেন না। হরিদাসবাবুর মৃত্যুর পর শ্যামল স্বাভাবিকভাবেই চাকরিটা পেয়েছিল। সাহেব নিজে শ্যামলকে ডেকে চাকরি দিয়েছিলেন একটাই শর্তে, ললিতাকে বিয়ে করতে হবে। শ্যামল এক পায়ে খাড়া ছিল। বিয়ে হয়ে গেল কিন্তু একবছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও যখন ললিতা মা হল না তখন সবাই হতভম্ব। বীণা বউদি গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, 'ওমা, পেটে পেটে এত। এই শুনলাম পেটে বাচ্চা এসেছে বলে মেয়েটা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সেটা গেল কোথায় গো!' কেউ বলল, জলপাইগুড়ির হাসপাতালে ললিতা যখন ছিল তখনই নাকি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আবার কারো মতে ওসব কিছু নয়। বিষ খেয়েছিল মনের জ্বালায়। মেয়ের দোষ ঢাকার জন্যে সেইসময় মালবাবুর বউ কেঁদে-কেটে গল্পটা ফেঁদেছিলেন। ললিতা যদি মরে যেত তাহলে ওই কারণে শ্যামলকে হয়রান করা যেত। বেঁচে থাকলে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। তা চালটা খুব ভাল কাজ করেছে। কিন্তু যাদের নিয়ে এত কথা তারা যেন গ্রাহ্যই করছে না শ্যামল কাজে যায়। ফিরে এসে বাড়িতেই থাকে অথবা ললিতার সঙ্গে বেড়াতে বেরোয়। ফুটবল ছেড়েছে, লাইব্রেরির দায়িত্ব নিচ্ছে না। ললিতা আগেও কারো সঙ্গে কথা বলত না, এখন তো তার নাক আরও উঁচু হয়েছে।

দীপার কিন্তু ললিতাকে ভাল লাগে। কেমন সাহসী। কিন্তু সেইসঙ্গে শ্যামলের ওপর একধরনের শ্রদ্ধা তৈরি হয়েছে তার। চা-বাগানের ভেতর ললিতা যখন ভয় পেয়েছিল তখন শ্যামল তাকে ভরসা দিয়েছিল। সেই কথাটা অন্তত রেখেছে। অবশ্য লক্ষ্মীজেঠিমা যখন এসে ঠাকুমার কাছে ললিতামাসী সম্পর্কে অভিযোগ করে তখন ভাল লাগে না। চেনাজানা পৃথিবীতে একমাত্র তার মা এবং ঠাকুমা ছাড়া কোন শাশুড়ি বউমার মধ্যে সদ্ভাব দেখতে পায়নি সে। বিছানায় শুয়ে সে মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করল! 'তুমি তোমার বউমাকে সহ্য কর কি করে ঠাম্মা?'

মনোরমা চাল বাছছিলেন। অবাক হয়ে তাকালেন। জলপাইগুড়ি থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার দুদিন পরে ইনফ্লুয়েঞ্জাতে পড়েছে দীপা। আজ সকাল থেকে জ্বর নেই। মোটেই ইচ্ছে নেই তাকে ভাত দেবার। অমরনাথকে বলেছেন ডাক্তার জলখাবার খেয়ে যখন ডিসপেন্সারিতে যাবে তখন যেন দীপাকে দেখে যায়।

দীপা হাসল, 'তোমার সংসারে একটি অন্য বাড়ির মেয়ে কর্তৃত্ব করছে তা তুমি সহ্য করছ কি করে ভেবে পাই না।'

মনোরমা হাসলেন, 'তোর মা তো খুব ভাল মেয়ে।'
'খারাপ কে বলেছে। তোমার সঙ্গে সব ব্যাপারে বনে?'
'সব ব্যাপারে বনতে পারে?'
'তাহলে মেনে নেয় তোমাকে, এই তো। কিন্তু মনে মনে খুশী নিশ্চয়ই হয় না। উল্টো ব্যাপার হলে তুমিও হও না। তোমরা ঝগড়া করো না কেন বল তো?'
এই, আজ তোর আজ কি হয়েছে বল তো?'
দীপা জোরে জোরে হেসে উঠল, 'মা বলছিল ইচ্ছে হলে ভাত খেতে পারি। তুমি বলছ রুটি খেতে, তোমরা ঝগড়া করে ঠিক করে নাও না।'
মনোরমা গম্ভীর হলেন, 'সেটা ডাক্তারবাবু এসে ঠিক করবেন।'
দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার শাশুড়ি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতেন?'
মনোরমা হেসে ফেললেন, 'দ্যাখ ঝগড়া হয় দুজনে মিলে। এক পক্ষ বকে যাচ্ছে অন্য পক্ষ চুপ করে আছে, এতে ঝগড়া হয়? বাপের বাড়ি থেকে আমাদের শেখানোই হয়েছিল গুরুজনদের মুখের ওপর কথা না বলতে। উনি বকতেন যাতে আমার শিক্ষা হয়। জীবনের অনেক কিছুই তো জানতাম না তখন।'
'তোমার আড়ালে অন্যদের কাছে নিন্দে করতেন না?'
'আড়ালে কেন, সামনেই বলতেন। বাঁধতে জানে না, কাজকর্মে ছিরিছাঁদ নেই, দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমায়। তা আমি তো সত্যি বাঁধতে ভাল জানতাম না আর ঘুমোতেও ভাল বাসতাম খুব। সেটা তো সত্যি কথা।'
'খোঁটা দিত না?'
'তা দিত। তোর শাশুড়ি যদি সুযোগ পেত তাহলে ছাড়ত?'
'আমার শাশুড়ি! তোমাকে বারবার বলেছি সেই মহিলা আমার কেউ নয়। ওদের বাড়ির কেউ আমার কিছু নয়। তুমি ও বাড়ির কথা আমার কাছে বলবে না।' আচমকা গলা বেড়ে গেল দীপার।
মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'সাত পাকে বাঁধা পড়েছিল অগ্নিসাক্ষী করে, সম্পর্ক কি আর এ জীবনে অস্বীকার করতে পারবি?'
এইসময় অঞ্জলির গলা শোনা গেল, 'আসুন ডাক্তারবাবু।'
মনোরমা চাল রেখে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানলেন। ডাক্তারকে দরজায় দেখা গেল, 'কি খবর? পরীক্ষা কেমন হল?'
দীপা মাথা নাড়ল, 'ভাল।'
'তোমাকে আর জলপাইগুড়িতে যেতে দেব না। ফিরে এলেই একটা না একটা অসুখ বাধাও। জ্বর আছে?' ভদ্রলোক হাত রাখলেন কপালে। অঞ্জলির সঙ্গে মনোরমার গোপন চোখাচোখি হল। ডাক্তার মাথা নাড়লেন, 'নাঃ, জ্বর নেই। খুব ভাল।'
দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি খাব আজকে?'
'যা ইচ্ছে। শুধু আচার ছাড়া।'
এইসময় মনোরমা বললেন, 'ওকে আজ ভাত দেব না ডাক্তারবাবু।'
'কেন দেবেন না? জ্বর নেই যখন তখন ভাত খাবে না কেন? ভাত খাবে।'
হঠাৎ দীপা বলল, 'ঠাকুমা এক গ্লাস জল খাবো।'
অঞ্জলি সেটা আনতে যাচ্ছিল, মনোরমা তাকে নিষেধ করে নিজেই বেরিয়ে গেলেন। তিনি চোখের আড়াল হওয়ামাত্র দীপা বলল, 'আমার না খুব খিদে পায়, দুর্বল দুর্বল লাগে,

মাথা ঘোরে। শুধু নিরামিষ তরকারি খেতে একদম ইচ্ছে করে না।
'মাথা ঘোরে ? প্রেসার ঠিক আছে তো ?' ডাক্তার যন্ত্র খুলতে লাগলেন।
দীপা ফিসফিস করে বলল, 'ডিম খেলে তো শরীরে জোর আসে। আমাকে দেখে-টেখে আপনি বলুন রোজ একটা করে ডিম খেতে।'
'খুব ইচ্ছে করছে ?' ডাক্তার গলা নামালেন।
'হুঁ'।
'দিচ্ছে না ?'
'হুঁ। বিধবা বলে।'
'সেকেণ্ড ডিভিসন থাকবে ?'
'থাকবে।'
'খোকাটা পাস করবে কি না সন্দেহ। কিন্তু সেকেণ্ড ডিভিসন না থাকলে আমি কিন্তু সব ফাঁস করে দেব।' প্রেসার দেখে অনেক কষ্টে হাসি চাপলেন তিনি। এতক্ষণ কথাবার্তা হচ্ছিল চাপা গলায়।
মনোরমা এইসময় কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে ঢুকলেন, 'কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?'
'খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রেসারটাও। শুনুন ওর শরীরে শক্তি হওয়া দরকার।'
'দুধ খেতে চায় না যে। একটু বলে দিন তো।' মনোরমা বললেন।
'দুধে মোটা হয় শক্তি বাড়ে না।' দীপা জলের গ্লাস নিল।
'ওর শরীরের যা অবস্থা তাতে ডিম খাওয়া দরকার। রোজ একটা।'
'ডিম ?' প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মনোরমা।
ডাক্তার বললেন, 'কি হল ?'
'ও ডিম খাবে কি ? ওর ব্যাপার তো সব জানেন।'
'জানি। কিন্তু ওর শরীরের জন্যেই খাওয়া দরকার। আরও দুর্বল হয়ে পড়লে আমার চিকিৎসায় কোন কাজ দেবে না।' কোনরকমে হাসি চেপে ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন।
দীপা গ্লাস রেখে শুয়ে পড়ল, 'উঃ মাথাটা কি ঘুরছে।'
অঞ্জলি বলল, 'শুয়ে থাক কিছুক্ষণ।'
মনোরমা ঘুরে দাঁড়ালেন, 'বউমা, দীপাকে কি করে ডিম দেব ?'
অঞ্জলি বলল, 'এ ব্যাপারে আমি কি বলব বলুন। আপনি যা ভাল মনে করেন তাই হবে। ডাক্তাররা তো এরকম বলেই।'
মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'যুগ যুগ ধরে বাঙালি বিধবারা নিরামিষ খেয়ে এল কারো শরীর খারাপ হল না, বৈষ্ণবরা মাছ-মাংস খায় না তাদের শরীর ঠিক থাকে আর তোমার মেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছে।'
'এ কথা আমাকে বলছেন কেন ?' অঞ্জলি জানতে চাইল।
'অমরের প্রশ্রয়ে এসব হচ্ছে।'
'কি বলছেন আপনি ! আপনার ছেলে কখনও আপনাকে অস্বীকার করে না।'
'করত না। কিন্তু দিন পাল্টাচ্ছে। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসেই ও অন্যরকম হয়ে গেছে এবার।' মনোরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁকে খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল।
অঞ্জলি মেয়ের দিকে তাকাল। দীপার মুখটা এবার বেশ সহজ। সে বলল, 'যা খুশী কর তোমরা। আমাকে কিছু বলতে এসো না।'
দীপা হেসে ফেলল, 'এ ব্যাপারটা নিয়ে শাশুড়ি বউমার ঝগড়া হতে পারে না ?'

'মানে ?' অঞ্জলি হতভম্ব।

'তুমি ঠাকুমার অনেক কিছু পছন্দ করো না, অনেক কিছু ওঁকে বলতে চাও না আবার ঠাকুমাও তোমার অনেক কিছু মানতে পারে না অথচ তোমারা কেউ কারো নামে নিন্দে করে বেড়াও না, ঝগড়া করা তো দূরের কথা। এরকম তো দেখা যায় না।'

'বড্ড বেশী পেকে গেছিস তুই, না ?' অঞ্জলি ঝাঁঝিয়ে উঠল। আর তখনই মনোরমা ফিরে এলেন দরজায়, 'তখন থেকে বলে যাচ্ছে মায়ের সঙ্গে কেন ঝগড়া করো না তুমি ? কি মতলব বল তো ? আমার তো মাথায় ঢুকছে না।'

'কুবুদ্ধি আর কাকে বলে। ফাজলামি করছে। খবরদার ওকে ডিম দেবেন না মা ? ডাক্তার যতই বলুক দিতে !' অঞ্জলি বলে যাচ্ছিল। দীপা তাকে পেছন থেকে ডাকল, 'এম্মা ! তুমি ঠাকুমাকে খবরদার বললে ?'

মনোরমা এবাব হেসে ফেললেন, 'তুই সত্যি পারিস বাবা !'

ডাক্তারের নির্দেশ এ-বাড়িতে মানা হল না। ডিম মাছ মাংসের জন্যে দীপা প্রথম প্রথম টান অনুভব করত তাবপর সেটা চলে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে আসার পর এবার, পবীক্ষা চুকে যাওয়া আলস্যের সময় তার বারংবার মনে হতে লাগল একমাত্র ওই তিনটে খেলেই বিদ্রোহ কবা যায়। অথচ চুরি করে খেতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। বোঝা গেল মনোরমা কিংবা অঞ্জলি তার পাতে আমিষ তুলে দেবেন না।

দুপুর পেরিয়ে গেলে অঞ্জলির আলমারির হাতলে হাত দিল দীপা। তালা না দেওয়া মায়ের স্বভাব এটা সে জানত। ওটা খুলতেই দুই আর তিন নম্বর তাকটায় শাড়ির মিছিল দেখল সে। এর অনেকগুলোও অঞ্জলি এক বছরের বেশী পরেনি। চা-বাগানের নিস্তরঙ্গ জীবনে কেউ ভাল শাড়ি পরে বসে থাকে না। আর ওই দুর্ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই বঙিন শাড়ি এড়িয়ে চলে। সেগুলো পাশাপাশি পড়ে রয়েছে আলমারিতে। এইসময় মনোবমা আর অঞ্জলি বাইরের বারান্দায় মোড়া পেতে বসে। অতএব নিশ্চিন্তে শাড়ি বাছতে লাগল সে। রঙিন শাড়ির গায়ে হাত দিতেই অদ্ভুত একটা শিরশিরানি এল শরীরে। ব্যাপারটা এমন যে সে নিজেই অবক হল।

একটা হলুদ শাড়ি বেছে নিল দীপা। অঞ্জলির জামা তার গায়ে আঁটবে না। নিজের বিয়ের বাক্স খুলে অনেক যাচাই করে হলুদের কাছাকাছি একটা জামা বের করে নিল। বাথরুমে পোশাক পাল্টে শোওয়ার ঘরের আয়নার সামনে এসে থমকে গেল সে। তার চেহারা এইরকম ! নিজেকেই চিনতে পারছে না এখন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অনেকবার। তারপর হেসে ফেলল। আয়নায় দীপাকে মুহূর্তে লাজুক দেখাল।

বাইরের ঘর পেরিয়ে আসতে সময় লাগল। পা দুটো যেন খুব ভারী হয়ে গেছে। জোর করে নিজেকে সচল করল সে। মনোরমা আর অঞ্জলি রাস্তার দিকে মুখ করে বসে গল্প করছিলেন। মনোরমা বলছিলেন, 'দুধ না খাক, ছানাও তো খেতে পারে। ডাক্তারের যেমন বুদ্ধি !'

অঞ্জলি কিছু বলতে গিয়ে চোখের কোণে হলুদ রঙ দেখল। খুব দ্রুত মুখ ফিরিয়েই সে অবাক হয়ে গেল। তার মুখ দেখে আরও লজ্জা পেল দীপা। ততক্ষণে মনোরমাও চোখ ফিরিয়েছেন। কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না তিনি।

দীপা হাসবার চেষ্টা করল, 'তোমার শাড়ি। আলমারিতে নষ্ট হচ্ছিল। পরে ফেললাম। কেমন দেখাচ্ছে বল তো ?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, ভাল। শেষ পর্যন্ত তার মুখে হাসি ফুটল। মনোরমা মুখ ফিরিয়ে নিলেন গম্ভীরভাবে। দীপা চোখের ইশারায় তাঁকে দেখাল অঞ্জলিকে। অঞ্জলি বলল, 'আট বছর হয়ে গেল শাড়িটা। দেখিস ফেঁসে না যায়।'

'তুমি কি এটা পরবে?'

'আমি আজকাল ওসব শাড়ি পরি?'

'আমি একটু ঘুরে আসছি।' নেতানো রোদ মাখা মাঠের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল দীপা। দুই মহিলা কোন কথা বললেন না। পাশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামল সে। প্রতিমুহূর্তেই মনে হচ্ছিল মনোরমা বাধা দিতে পারেন। কিন্তু কোন কিছু ডাক সে শুনল না। খানিকটা এগিয়ে চারপাশে তাকিয়ে ভারি ভাল লাগল তার। কত বছর বিকেলে এভাবে বাইরে আসেনি সে। দূরে মাঠের মাঝখানে বাচ্চারা ফুটবল খেলছে। আজকাল বিশু, খোকন ফুটবল খেলে না। মনে হওয়া মাত্র ওদের দেখতে পেল দীপা। আসামরোড দিয়ে পাঁচটা সাইকেল অলস গতিতে যাচ্ছে। বিশু খোকন তার সঙ্গে পড়েছে। একই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে গিয়েছে। ছেলেদের সিট পড়েছিল অবশ্য আলিপুরদুয়ারে। কিন্তু তার বিয়ের পর আর ওরা নিজে থেকে কথা বলতে আসেনি। যেভাবে দীপা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল তাতে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করছিল ওরা। আজ দীপার ইচ্ছে হল ওদের সঙ্গে কথা বলতে।

অবশ্য এই কয় বছরে ওরা অনেক বড় হয়ে গেছে। দুজনেরই গোঁফ বেরিয়েছে, দাড়ি গজিয়েছে হালকাভাবে। হাফ প্যান্ট পরা ছেড়ে দিয়েছে এখন। তার ওপর বাজার কলোনি এলাকার পূর্ববঙ্গের কিছু ছেলে এখন ওদের বন্ধু হয়েছে। এই এখন যে তিনজন ওদের সঙ্গে সাইকেলে আছে তারা চা-বাগানের কেউ নয়। দুজনই তাদের এক ক্লাস নিচে পড়ে। দেখে মনে হয় পড়াশুনা ছাড়া সবকিছু করে। তিনজন সঙ্গে থাকায় একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু সেটাকে কাটিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। চটপট পা চালিয়ে সিঁড়ি টপকে সে চিৎকার করল। 'এই বিশু!'

প্রায় একই সঙ্গে থেমে গেল পাঁচটা সাইকেল। বিশু আর খোকন পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করল। বাকি তিনজনের চোখে কৌতূহল। আসাম রোডের দিকে পা বাড়িয়ে দীপার খেয়াল হল অনেক পেছনে বারান্দায় বসে থাকা দুই মহিলার কথা। অঞ্জলির যতটা হবে না মনোরমার বুকের মধ্যে নিশ্চয়ই এতক্ষণে ঝড় উঠে গেছে।

এইসময় দূরে একটা বাস দেখা গেল। দীপা গলা তুলেই বলল, 'একপাশে সরে আয়, বাস আসছে, চাপা পড়বি।' স্পষ্টত দুটো ভাগ হয়ে গেল দলটা।

নতুন তিনজন চলে গেল ওপাশে, খোকন আর বিশু দীপার কাছে এসে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল।

খোকনই প্রথম কথা বলল, 'তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলছিস?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। কেমন পরীক্ষা দিলি তোরা?'

'একরকম'। খোকন জবাব দিল।

'তুই?' বিশুর দিকে তাকাল দীপা।

'কিছু বলবি তুই?' বিশু বেশ কঠোর মুখে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল দীপার মাথায়। সে বলল, 'অনেকদিন থেকেই একটা কথা খুব ভাবছিলাম। আচ্ছা বলতো, বিয়ের পর আমি যখন শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলাম তখন তোরা ওরকম কেঁদে উঠলি কেন?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র কেমন বোকা হয়ে গেল বিশু। খোকন হেসে ফেলল। শেষপর্যন্ত বিশু বলল, 'অনেকদিন আগের কথা, ভুলেই গিয়েছি।'

'ওমা, তাই ? আমাকেও ভুলে গিয়েছিস তোরা ?'

'তোকে কি করে ভুলব ! তুই স্কুল ছাড়া বাড়ি থেকে বের হতিস না। আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলতিস না, তাই।' খোকন কথা শেষ করল না।

এবার বিশু বলল, 'ডাকলি কেন ?'

'এমনি। হঠাৎ ভাবলাম আজ জিজ্ঞাসা করি সেই রাত্রে কেঁদেছিলি কেন ? ভুলে গিয়েছিস যখন তখন আর মনে করে কি লাভ !'

এইসময় খোকন বলল, 'অ্যাই দ্যাখ, সবাই দেখছে।'

শোনামাত্র দীপা এবং বিশু মুখ ঘুরিয়ে দেখল মাঠের ওপাশে কোয়ার্টার্সগুলোর বারান্দায় বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে এদিকে দেখছে। যেন এরকম অবাক কাণ্ড অনেকদিন তাবা দ্যাখেনি। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা ?'

খোকন জবাব দিল, 'এমনি ঘুরছি।'

রাস্তার ওপারে তিনটি ছেলে তখনও দাঁড়িয়ে। ওদের ভঙ্গীতে নায়ক নায়ক ভাব। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোদেব বন্ধু ওরা ?'

খোকনই জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ও হল সুভাষ, মাঝখানে গোবিন্দ আর ডানদিকে অজয়। তুই ওদের আগে দেখিসনি ?'

দীপা জবাব দিল না। ওর খুব ইচ্ছে করছিল এদের সঙ্গে আসাম রোড ধরে বেড়াতে। কিন্তু তিনটি অপরিচিত ছেলে থাকায় যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না। তার ওপর একইদিনে রঙিন শাড়ি পরে রাস্তায় বেরিয়ে এদের সঙ্গে কথা বলাটাই অনেকখানি হয়ে গিয়েছে। মনোরমা এবং অঞ্জলির পক্ষে আর হজম করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। সে বলল, 'যা তোবা। কাল সকাল দশটায় আসব। মাঠে থাকিস।' কথা শেষ করেই দীপা ফিবল। এবং সত্যসাধন মাস্টারকে দেখতে পেল। তাঁকে দেখেই সম্ভবত বিশুরা আর দাঁড়াল না। দীপা অপেক্ষা করল মানুষটির জন্যে।

কাছে এসে সত্যসাধনের চোখ বড় হয়ে গেল, 'তুমি রঙিন শাড়ি পরছ ?'

কথা না বলে দুবার মাথা নাডল দীপা। বিস্ময়টা কেটে গিয়ে হাসি ফুটল সত্যসাধন মাষ্টাবেব মুখে 'বিদ্রোহীর জয় হইল নাকি ?'

'এখনও বোঝা যাচ্ছে না। আজই প্রথম পরলাম। দেখছেন না, ওপাশের কোয়ার্টার্সগুলোর বারান্দায় ভিড় জমে গিয়েছে।'

তাই তো। আসলে কি জানো, অভ্যাস। অভ্যাসের চাকর মানুষ। আমিও তার ব্যতিক্রম না। সত্যি কথা বলি, আমিও খুব কনজারভেটিভ। এক একটা থিওরি মাথার মধ্যে এমন বইস্যা যায় যে অন্য চিন্তা আসে না। কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যদি সেই প্রব্লেম আসে তাহলে দেখি থিওরিটা ভুল। এক্কেবারে ভুল। শোন দীপা, এখন বলি পোশাক হইল মনের প্রতিফলন। তোমার মন চাইলে রঙিন পরবা, না চাইলে পরবা না।'

'আপনি আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন ?'

'হুঁ। একটু আর্লি আইস্যা পড়ছি। তোমার বাবা তো আসে নাই এখনও ?'

'না। তাতে কী আছে চলুন না।' দীপা মাস্টারমশাইকে ছাড়তে চাইছিল না। তিনি সঙ্গে থাকলে আর যাই হোক মনোরমা কিংবা অঞ্জলি আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে থাকবেন। বাইরের লোক বাড়ির লোক ব্যাপারটা মনোরমা খুব মানেন। আর এই সময় যদি অফিস

থেকে অমরনাথ ফিরে আসেন তাহলে দীপা ম্যানেজ করে নিতে পারবে।

সিঁড়ি টপকে মাঠে নামতে নামতে সত্যসাধন বললেন, 'এই ছেলেগুলা তোমারে কি কইতেছিল ? অত্যন্ত বদ। থার্ড ডিভিসন পাইবে কি না সন্দেহ।'

দীপা হেসে ফেলল। সত্যসাধন রেগে গেলেন, 'হাস কেন ?'

'বদ বললেন কেন ?'

'বদ না ? লেখাপড়ায় মন নাই শুধু বাপের পয়সায় সিগারেট ফোঁকে।'

'ওরা সিগারেট খায় ?' অবাক হয়ে গেল দীপা।

মাথা নাড়লেন সত্যসাধন, 'এ ম্যান ইজ নোন বাই দ্যা কোম্পানি হি কিপস। খারাপ আলুর সঙ্গে ভাল আলু রাখলে সেইটাও পইচ্যা যায়। ভাল মানুষের সঙ্গ পাইলে জ্ঞান বাড়ে, মন বড় হয়।'

দীপা কিছু বলল না। কিন্তু ও দৃশ্যটা ভেবে পুলকিত হল। বিশু খোকন বসে সিগারেট টানছে। ওরা এত বড হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে ! খোকনটা এখনও তেমনি বোকা বোকা কথা বলে কিন্তু বিশু যেন বেশ পাল্টে গিয়েছে। গলার স্বরটাও অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। ভাল না মন্দ তা বুঝতে পারছিল না সে।

অঞ্জলি উঠে দাঁড়িয়েছিল, সত্যসাধন মাস্টারকে মোড়াটা এগিয়ে দিয়ে মনোরমা ভেতরে চলে গেলেন। তাঁর মুখে এখন ঘোব অমাবস্যা। কিছুক্ষণ কথা বলে অঞ্জলি চা বানাতে চলে গেলে সত্যসাধন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার জ্বর সারল কবে ?'

'আজই।'

'আছো কেমন ?'

'খুব দুর্বল লাগে। ডাক্তার ডিম খেতে বলেছেন।'

'ডিম ?'

'গায়ে জোর হবার জন্যে।'

'তোমাব ঠাকুমায়— ?'

'মানতে চাইছেন না।'

একটু চুপ কবে থাকলেন সত্যসাধন। তারপর বললেন, 'তুমি নিশ্চযই জানো না যে আমি নিরামিষাশী। দীক্ষান্তে আমিষ ত্যাগ করছি আজ সাত বৎসর। কোন অসুবিধা হয না। পৃথিবীব অনেক মানুষ আমিষ খায না। অ্যানিমাল প্রোটিনে যা কাজ হয় তা ভেজিটেবিল প্রোটিনেও হইতে পাবে। যে সংস্কার তোমার ক্ষতি করে না তা মান্য করলে কেউ যদি সুখী হয তাই তো তোমাব করা উচিত।'

দীপার মনে পড়ল রমলা সেনেব কথা। তিনিও প্রায় একই কথা লিখেছেন। জলপাইগুড়ি থেকে সে যে চিঠি দিয়েছিল তার উত্তর এখনও পায়নি কিন্তু আগের অনেক চিঠির ভাষা মাস্টাবমশাই-এব মতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু সে বিদ্রোহ করতে চায়। আব তা কবতে গেলে কেউ না কেউ তো দুঃখ পাবেই। দীপা জবাব দিল না।

এইসময় চা-বাগান থেকে সাইকেলগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল। গরম পড়ে যাওযায় দিনের আয়ু বেড়েছে। সন্ধ্যে হতে বেশ দেবি। অমরনাথ কোয়ার্টার্সের স" .ন সাইকেল থেকে নেমে যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন মেয়েকে দেখে। দীপা হাসল। সাইকেল বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার ?'

'পরলাম।' দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল।

'বেশ ভাল দেখাচ্ছে তোকে। কেউ কিছু বলেনি ?'

'এখনও সুযোগ পায়নি।'

সত্যসাধন হেসে ফেললেন তারপর বললেন, 'অমরনাথবাবু, আপনার লগে কিছু কথা ছিল। ভোরবেলায় একটা স্বপ্ন দেখছি।'

'বলুন।' অমরনাথ অঞ্জলির মোড়ায় বসলেন।

'দেখলাম দীপা মা ডাক্তার হইছে। তখনই চিন্তাটা মাথায় ঢুকল। ওরে কি পড়াইবেন? সায়েন্স না আর্টস?'

'আগে পাস করুক।' অমরনাথ হঠাৎ আড়ষ্ট হলেন।

'সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। জলপাইগুড়ি এ সি কলেজ ভাল তবে খুব ভাল না। সবচেয়ে ভাল ওকে কলকাতায় পাঠানো। বেথুনের কলেজে ভাল হস্টেল আছে কি না জানি না, থাকলে ওর চেয়ে ভাল কিছু হয় না।'

'দেখি।' অমরনাথ গম্ভীর গলায় বললেন।

রাত্রে শোওয়ার সময় অমরনাথ স্ত্রীর কাছে প্রসঙ্গ তুললেন। ছেলেদুটো বড় হচ্ছে। স্কুল ফাইনাল পর্যন্ত দীপাকে তিনি যথেষ্ট যত্নে পড়িয়েছেন। কিন্তু তারপর পড়তে গেলে যে অর্থব্যয় করতে হবে তা কতটা সম্ভব? বাড়িতে থেকে পড়া এক কথা আর কলকাতা কিংবা জলপাইগুড়িতে গেলে ওর থাকা খাওয়ার খরচ লাগবে। অঞ্জলি নিচু গলায় জবাব দিল, 'তুমি যা পারবে তাই করবে।'

'করতে গেলে কষ্ট করতে হবে। মেয়ে পাশ করে চাকবি নেবে এবং আমাদের খাওয়াবে এতটা আশা করি না। আর লোকেই বা বলবে কি! এইজন্যেই 'অমরবাবু ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে।'

'তোমার ছেলেরা বড় হয়ে চাকরি করলে তুমি তাদের কাছে থাকবে না?'

অমরনাথ জবাব দিলেন না। তিনি উশখুশ করতে লাগলেন। আজ আর একটা ঘটনা ঘটেছে। বিকেলের ডাকে দুটো চিঠি এসেছে। একটা রমলা সেনের। সেটা মেয়েকে দিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়টি প্রতুলবাবুর। জলপাইগুড়ি থেকে লিখেছেন। তিনি অসুস্থ। অতীতের সব ঘটনার জন্য মার্জনা চেয়েছেন। তিনিই গিয়েছিলেন গেস্ট হাউসে দেখা করতে। পরদিন সকালে গিয়ে শুনেছেন যে তাঁরা চলে গেছেন। তিনি কথা বলতে চান। অমরনাথ যদি জলপাইগুড়িতে যেতে পারেন তাহলে খুব ভাল হয়। ব্যাপারটা অঞ্জলিকে বলতে সাহস পেলেন না অমরনাথ। চিঠি পাওয়ার পর থেকেই হরদেব ঘোষালের কথা মনে পড়ছে তাঁর। অত বড় সম্পত্তি দীপার হাতে আসতে পারে। আর কিছু না হোক, মেয়েটা যদি পাস করে তাহলে ওই বাড়িতে থেকে কলেজে পড়তে পারে। এতে প্রচুর খরচ বাঁচবে। এখন প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই তার আগের গোঁ আঁকড়ে বসে থাকবেন না। ভুল বুঝে যে মানুষ অনুশোচনা করে তার সঙ্গে বিরোধ জিইয়ে রেখে লাভ নেই।

মনোরমার পাশে চুপচাপ শুয়েছিল দীপা। মনোরমা উল্টো দিকে মুখ করে শুয়েছিলেন। খানিক আগে শোওয়ার সময় রঙিন শাড়ি ছেড়ে নিজের আটপৌরে সাদা শাড়ি পরে এসেছে দীপা। সেদিকে তাকিয়ে প্রথম কথা বলেছিলেন মনোরমা, 'যাক, তাহলে আর নিষেধ করছি না। ভেবেছিলাম রঙিন শাড়ি পরলে আমার পাশে শুতে দেব না।'

দীপা উত্তর দেয়নি। বিকেলে অমরনাথের দেওয়া রমলা সেনের চিঠি পড়ে তার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। ছোট্ট চিঠি লিখেছেন তিনি। 'পরীক্ষা ভাল হয়েছে জেনে খুব খুশি হলাম। রেজাল্টের জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি। আর একটা কথা, লিখেছ বিদ্রোহ করবো, বিদ্রোহ করতে গেলে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হয়। নিজেকে প্রশ্ন কর তুমি তার

কতটা উপযুক্ত।' দূরে কুলি লাইনে মাদল বাজছে। রাত নিশুতি। দীপার বুক মুচড়ে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

॥ ১৫ ॥

আসাম রোড যেখানে চা-বাগানের সীমা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছে সেখানে গতরাত্রে বাঘ এসেছিল। দু-তিনঘর মদেশিয়া সেখানে বাসা বেঁধেছিল। এরা এককালে চা-বাগানেই কাজ করত। চাকরি শেষ হবার পর সাহেব দয়া করে ওই জমিতে তাদের ঘর তুলতে দিয়েছিলেন। তাদেরই একজনের দুধেল গরুকে মেরে চলে গেছে বাঘটা। বিশু খোকনরা সেই জায়গাটা দেখতে যাচ্ছিল।

এ অঞ্চলে বাঘ বলতে চিতাকে বোঝায়। গঞ্জের শিকারিরা এবং সাহেব নিজে সকালে ঘুরে এসেছেন। নির্দেশ দিয়ে এসেছেন গরুটা যেভাবে পড়ে আছে সেইভাবেই থাকবে। বাঘ নিশ্চয়ই আছে ধারেকাছে। দিন ফুরালেই সে শিকার খেতে আসবে। সেইসময় তাকে হত্যা করা হবে। কিছুদিন আগে একটা হরিণকে আধখাওয়া অবস্থায় চা-বাগানের ভেতর পাওয়া গিয়েছিল। সাহেব খবর পেয়ে পৌঁছবার আগেই যারা দেখেছিল তারা হরিণের অবশিষ্টাংশ তুলে নিয়ে গিয়েছে রান্না করে খেতে। সেটাও বাঘের কীর্তি প্রমাণিত হয়েছে তাই এবার সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। চা-বাগানে অজগর ধরা পড়ে, বুনো শুয়োর, হরিণের ছানা, খরগোস মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়। কিন্তু চিতাবাঘকে কব্জা করা খুব শক্ত। থাবা দেখে সাহেবের সন্দেহ হয়েছে এ চিতা খুব বড়সড়। গঞ্জের শিকারিরা বলছে চিতা ন. সাক্ষাৎ রয়েল বেঙ্গল টাইগার। যাই হোক না কেন খবরটা নিস্তরঙ্গ চা-বাগান আর বাজার এলাকাকে গরম করে তুলেছে। দিন থাকতে থাকতেই লোক যাচ্ছে সেই জায়গাটা একবার স্বচক্ষে দেখতে। বিশুরাও যাচ্ছিল।

বিশু খোকনের সঙ্গে আজ অজিত ছিল। ওঁরা হেঁটেই যাচ্ছিল। এখন দুপুর। সবে খাওয়া শেষ হয়েছে। অঞ্জলি মনোরমা যে যাঁর রান্নাঘরে। অমরনাথ আহারান্তে দুপুরের ঘুম দেবার তোড়জোড় করছেন। ঠিক একঘণ্টা ঘুমিয়েই তিনি আবার ফ্যাক্টরিতে চলে যান। স্নান করার আগে তিনি নতুন একটা খবর দিলেন, কাল রাত্রে যখন বাঘ গরুটাকে ধরেছিল তখন একজন নাকি বল্লম ছুঁড়ে মেরেছিল। বাঘ সেই বল্লম শরীরে নিয়েই উধাও হয়েছে। আহত বাঘ খুব সাংঘাতিক হয়। অতএব সন্ধের মধ্যেই গোয়ালঘরের দরজা ভাল করে বাঁধতে তো হবেই, কেউ যেন বাড়ির বাইরে না যায়।

অথচ আসাম রোডে মানুষের মিছিল দেখে দীপার মনে হল কেউ তেমন ভয় পাচ্ছে না। যেভাবে লোকে মেলা দেখতে বা রামলীলার গান শুনতে যায় সেইভাবেই সাইকেলে হেঁটে চলেছে। এইসময় সে বিশুদের দেখতে পেল। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে সে চিৎকার করল, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

বিশু জবাব দিল, 'সিনেমা দেখতে।'

দীপা হেসে ফেলল। তারপর শাড়ি সামলে রাস্তায় এসে বলল, 'চল, আমিও দেখে আসি। একাই যাব কিনা ভাবছিলাম, তোদের পেয়ে ভাল হল।'

খোকন অবাক হয়ে বলল, 'তুই যাবি?'

দীপা বলল, 'যাব বলেই তো এলাম।'

'বাড়িতে বলে এসেছিস?'

'নাঃ।' দীপা হাঁটতে শুরু করে আড়চোখে দূরে নিজেদের কোয়ার্টার্সের সামনেটা দেখে

নিল। কেউ বাইরে নেই। এখন অন্তত ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কেউ তার খোঁজ নেবে না।
বিশু গম্ভীর গলায় বলল, 'সবাই দেখবে তুই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিস। ব্যাপারটা ভাব।'
'তার মানে? আমাকে সঙ্গে নিচ্ছিস নাকি তোরা? আমি যাচ্ছি আমার মত। কথা বললে যদি মানে লাগে তাহলে সেটা খুলেই বল।' রাগী মুখে তাকাল দীপা।
'আশ্চর্য! মানে লাগার কথা কে বলেছে। অ্যাদ্দিন তো আমাদের সঙ্গে মেশা দূরের কথা কথাও বলতিস না। নিশ্চয়ই তোকে বাড়ির লোকজন মানা করেছিল। কিছু হলে আমাদের কি! আমরা ছেলে! তোকেই সামলাতে হবে।' বিশু কড়া গলায় বলল।
'ছেলে বলে সাতখুন মাপ?'
ওরা জবাব না দিয়ে হাঁটতে লাগল। এইসময় অজিত গায়ে পড়ে কথা বলল, 'কোন মেয়েছেলে তো যাচ্ছে না, তাই বোধ হয়— !'
দীপা চট করে বলে উঠল, 'এই যে, তোমার নাম অজিত, তাই তো?'
হকচকিয়ে গেল অজিত, 'হ্যাঁ।'
'আমাকে তুমি মেয়েছেলে বলবে না।'
'আচ্ছা!' অজিত মুখ ঘুরিয়ে নিল।
খোকন হাসল, 'তুই খুব পাল্টে গিয়েছিস দীপা।'
'বড় হলে সবাই পাল্টে যায় একটু আধটু। এনিয়ে কথা বলার কি আছে।'
কোয়ার্টার্সের সীমা ছাড়িয়ে বাঁ দিকে কুলি লাইন আর ডানদিকে চা-বাগান রেখে ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যে বাজার এলাকার যেসব মানুষ আগে পেছনে যাচ্ছিল তারা দীপাকে খুব লক্ষ্য করছে। দুপাশে আম-কাঁঠালের সারি, মাঝখানে পিচের সরু রাস্তা। অনেকদিন বাদে দীপার হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। হঠাৎ খোকন বলল, 'এ্যাই, তোর মনে আছে, আমরা হাতির তাড়া খেয়ে এই জায়গাটা দিয়ে চা-বাগান ছেড়ে উঠে এসেছিলাম।'
দীপা ঘাড় নাড়ল, 'মনে আছে। যাবি সেখানে?'
বিশু বলল, 'না।'
দীপা জানতে চাইল, 'কেন?'
'এখন তুই বড় হয়ে গিয়েছিস। তোকে নিয়ে চা-বাগানের ভেতর ঢোকা ঠিক হবে না। তোর মাথা মোটা তাই বুঝতে পারছিস না।'
'সত্যি পারছি না। ছেলেবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে খেলেছি, বড় হয়ে গেছি বলে সেসব বেঠিক হয়ে যাবে কেন? তুই ঠাকুমার মত কথা বলছিস।'
বিশু জবাব দিল না। বাঁক অবধি পৌঁছনোর আগে চিৎকার চেঁচামেচি আর মানুষজনকে ছুটে আসতে দেখা গেল। বিশু বলল, 'কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। একপাশে সরে দাঁড়া।'
ব্যাপারটা জানা গেল। আঙরাভাসা নদীর জঙ্গলে বাঘের ডাক শোনা গেছে। আহত বাঘ যখন হুঙ্কার দেয় তখন বুঝতে হবে সে খুব মরীয়া হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় শিকারিরা সবাইকে জায়গাটা ছেড়ে চলে যেতে বলছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আসাম রোড ফাঁকা হয়ে গেল। ভয় মানুষের কৌতূহলকে মৃত করে ফেলে। একমাত্র চলন্ত বাস আর কিছু গাড়ি ছাড়া দুপুর গড়ানো আসাম রোডে এখন মাঝে মাঝে টিয়াপাখির ঝাঁকের চিৎকার আর ঘুঘুর ডাক শোনা যাচ্ছে। খোকন বলল, 'চল, ফিরে যাই।'
বিশু ধমকে উঠল, 'ভ্যাট। আঙরাভাসা এখানে নাকি? আর বাঘটা গরু ছেড়ে তোকে খেতে এ্যাদ্দূরে আসবে ভেবেছিস?'
অজিত বলল, 'শুনেছি এক রাতে বাঘ তিরিশ মাইল যেতে পারে।'

বিশু একটু ভাবল, 'আমার খুব ইচ্ছে করছে যেখানে গরুটা মরে পড়ে আছে তার কাছাকাছি কোন গাছে উঠে রাতটা কাটাতে। বাঘটাকে দেখা যেত তাহলে।'

খোকন বলল, 'আমি নেই।'

চা-বাগানের তারের বেড়া ডিঙিয়ে রাস্তায় আসার জন্যে সিঁড়ির ধাপ করে দেওয়া হয়েছে। দীপা তার চূড়োয় উঠে বসতে ওরাও চলে এল। এবার অজিত বলল, 'খাবি তো ?'

বিশু আড়চোখে দীপাকে দেখে নিল, জবাব দিল না। খোকন ইশারা করে না বলল। অজিত একটু বিরক্ত হল, 'তাতে কি হয়েছে। ও তো বলল মেয়েছেলে না বলতে। মেয়েছেলে না হলে নিশ্চয়ই মেয়েছেলের মত ব্যবহার করবে না।'

দীপা কথাবার্তার অর্থ ধরতে পারছিল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

বিশু উত্তর না দিয়ে অজিতকে বলল, 'দে সিগারেট।'

অজিত পকেট থেকে একটা কাঁচি সিগারেটের প্যাকেট বের করল। তাতে পাঁচটা সিগারেট আছে। দীপা দেখল খোকন তাব দিকে চোরের মত তাকাচ্ছে। দুটো দেশলাই কাঠি নিভিয়ে সিগারেট ধরাল বিশু। তারপর অজিত। খোকন বলল, 'আমি পুরো খাব না, আমাকে পরে একটা টান দিতে দিস।' বিশু ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি দিতে পারব না।'

দীপা বলল, 'লজ্জা করছিস কেন ? খেতে ইচ্ছে করলে পুরোটাই খা।'

খোকন সিগারেট নিল, 'বাবাকে বলে দিবি না তো ?'

কথাটা শোনামাত্র একসঙ্গে বিশু আর অজিত হেসে উঠল। খোকন লজ্জিত মুখে সিগারেট ধরাল। দীপা বলল, 'তাহলে তোরা এখন বড় হয়ে গেছিস।'

বিশু মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আশ্চর্য !'

দীপা দুপাশের রাস্তা দেখতে দেখতে বলল, 'এইজন্যে সত্যসাধনবাবু তোদের বদ বলছিল।' কথাটা শেষ করে হেসে ফেলল সে।

অজিত বলল, 'ওই বুড়োটাকে মাইরি একদিন টাইট দিতে হবে। সবসময় আমার পেছনে লেগে থাকে। মুখের ওপর বলল থার্ড ডিভিসনও পাব না।'

'চুপ কর। পেয়ারের ছাত্রী বসে আছে।' বিশু ফুট কাটল।

'সত্যি কথা তোদের খারাপ লাগবেই। নিজের পয়সায় সিগারেট খাচ্ছিস না কেন ? তাহলে কেউ তোকে কিছু বললে জবাব দিতে পারতিস।'

'নিজের পয়সা না তো কার পয়সা ?'

'ইস্। তুই রোজগার করিস ?'

'নিশ্চয়ই। বাবা বাজারের টাকা দেয়। লিখে দেয এই আনবে সেই আনবে। নিজে ওজন দেখে নেয় মাঝে মাঝে। বাজার দর যাচাই করে বাজারে ঘুরে ঘুরে। এক পয়সা মারার উপায় নেই। আমি যদি দোকানদারকে পটিয়ে দু-চার আনা দাম কমাই সেটা আমার কৃতিত্ব। বাবা ঠকছে না, আমি রোজগার করছি।'

'তাহলে তুই বাজার থেকে টাকা চুরি করিস।'

'ফালতু জ্ঞান দিবি না। বিয়ে হয়ে গেলেই মেয়েরা কেমন জ্ঞান দিতে শুরু করে।' বিশু চোখ বন্ধ করে সিগারেটে টান দিল। আর শক্ত হয়ে গেল দীপা। তার চোখ স্থির হল বিশুর মুখের ওপর। সে খুব শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করতে চাইল, 'তোদের সঙ্গে আমার আর বন্ধুত্ব নেই, নারে ?'

বিশু থতমত হয়ে গেল, 'আমি কি তা বলেছি ?'

খোকা বলল, 'আমরা তোর জন্যে খুব কষ্ট পেতাম দীপা। তোর বিয়ের পরদিন দুপুরে আমি ভাত খাইনি, জানিস ?'

বিশু বলল, 'কিছু মনে করিস না দীপা, তোর বাবা লোক খুব খারাপ।'

'মানে ?'

'খারাপ লোক না হলে একটা অসুস্থ ছেলের সঙ্গে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় ? স্রেফ টাকাপয়সা লাগবে না বলে পাব করে দিয়েছে। সেই রাত্রে আমরাই বরকে দেখে বুঝতে পেরেছিলাম অসুখ-বিসুখ আছে।' বেশ চড়া গলায় বলল বিশু।

'তুই বুঝতে পেরেছিলি ?' খোকন জানতে চাইল।

মাথা নেড়ে না বলল দীপা। সেটা লক্ষ্য করে খোকন জিজ্ঞাসা করল 'মারা গেল কি করে ? বিয়ের পরের পরদিনই তো মরেছে !'

'জানি না।'

'মরে যাওয়ার আগেই তুই জ্বর গায়ে চলে এসেছিলি কেন ?' খোকন প্রশ্ন শেষ করছিল না। তার যেন অনেক কৌতূহল জমা আছে।

'এসেছিলাম।' দীপা নিঃশ্বাস ফেলল।

বিশু উঠে দাঁড়াল, 'চমৎকার। তুই জিজ্ঞাসা করছিলি বন্ধুত্ব নেই কিনা ? থাকবে কি করে ! তোব ব্যাপারটা যদি আমাদের বলতে না চাস তাহলে আমরা কি করে তোকে বন্ধু বলে মনে করব ?'

'আমি ওসব ঘটনা ভুলে যেতে চাই।'

'তোর বাড়ির লোক তো ভুলতে দিতে চাইছে না। তুই নিরামিষ খাস না ? বিধবাদের মত কাপড় পরিস না ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'করতে হচ্ছে। কারণ আমি নাবালিকা নই। এখনও যাদেব ওপরে নির্ভর কবতে হচ্ছে তাদের আমি অপছন্দের কথা বলতে পারি কিন্তু অবাধ্য হতে পারি না।'

বিশু অবাক হযে তাকাল। তারপর জানতে চাইল, 'তুই যে আজ আমাদের সঙ্গে এখানে এলি, বাড়ির লোক তো জানে না, তার বেলায় ?'

দীপা চুপ করে বইল। ওরাও কথা বলল না। বিশু আবার সিঁড়ির নিচের ধাপে বসল। হঠাৎ খোকন বলল, 'তোকে বাবা ডিম খেতে বলেছে ?'

দীপা উত্তর দিল না। ডাক্তারবাবু কি বাড়িতে গিয়ে গল্প করেছে ? তাহলে তো খবরটা ঘুরে ঠাকুমার কানেও আসতে পারে। ওর অস্বস্তি হল। এইসময় বিশু বলল, 'যাঃ শালা, এবার ঝামেলা করবে।' তার সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। চট করে পেছনে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'সিগারেট ফেলে দে খোকন।'

খোকন বলল, 'সর্বনাশ। চল পালাই।'

'পালানো যাবে না। সোজা রাস্তা। দেখতে পাবেই।' বিশু জবাব দিল।

'চা-বাগানে ঢুকবি ?' খোকন জানতে চাইল।

এবার দীপা কথা বলল, 'তোরা তো কোন দোষ কবিসনি, ভয় পাচ্ছিস কেন ?'

বিশু বলল, 'আজেবাজে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলবে। কোথায় যাচ্ছে বল তো ? বাঘ বেরিয়েছে জানে না ? নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে ?'

যাঁকে নিয়ে ওরা কথা বলছিল তিনি ততক্ষণে আসাম রোড ধরে কাছাকাছি এসে গিয়েছেন। দূর থেকেই যে দেখেছিলেন তা এখন মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এবার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার ? পঞ্চপাণ্ডবের বাকি দুজন কোথায় ?'

ওরা জবাব দিল না। চারজন চারদিকে তাকিয়ে রইল। তেজেন্দ্র পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যিমাখা রুমাল বের করে নাক মুছলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায় ছিল যেন ?'

প্রশ্নটি অজিতের দিকে তাকিয়ে। সে সরাসরি জবাব দিল, 'কলোনিতে।'

'সেটা তো দেখেই বুঝতে পেরেছি। দেশ কোথায় ছিল ?'

'যশোর। মাইকেল মধুসূদন দত্তর গ্রামে।'

'যশোর ? সেখান থেকে এতদূরে কেউ এসেছে বলে শুনিনি।'

'আমরা তো এসেছি।'

'মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামটা বলার কি দরকার ছিল ? খুব গর্বের বিষয় নাকি ? সারাজীবন নকল ইংরেজ সেজে একটার পর একটা মেম বিয়ে করে যাওয়া খুব কৃতিত্বের কথা ? ফট করে একটা নাম বলে দিলেই হল ?'

'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি।'

'কবি ? চার লাইন কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় ? আর কবি যদিও বা বলা যায় চরিত্র ঠিক না থাকলে কিসের কবি ? দিনরাত শুনেছি মদ গিলত। হ্যাঁ, কবি হলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক। নাম শুনেছ ? বর্ধমানের মানুষ।' তেজেন্দ্র আবার নাক মুছলেন। তাঁর চোখ দীপার ওপর থেকে সরছিল না।

'তুমি এদের সঙ্গে কি মনে করে ? ক' বছর দেখিনি তো ?' তেজেন্দ্র প্রশ্ন করে গলায় জমে থাকা কফ শব্দ করে ছুঁড়ে দিলেন একপাশে। দীপা জবাব দিল না। তাব মুখ অন্যপাশে ফেরানো ছিল। বিশু বলল, 'দীপা তোকে বলছেন উনি।'

দীপা মুখ ফেরাতে বাধ্য হল। তেজেন্দ্র ডাকলেন 'এদিকে এস। নেমে এস।'

'কেন ?' দীপা জানতে চাইল।

'তুমি একে যুবতী তায় বিধবা। এইসময় উঠতি বয়সের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে নেই। লোকে বদনাম করবে। বিধবার বদনাম হলে খুব খারাপ হয়।' তেজেন্দ্র আঙুল নেড়ে ডাকলেন। দীপার মুখ লাল হয়ে উঠল, 'কোথায় যাব ?'

'বাড়িতে। তোমার ঠাকুমাকে আমি কতটুকু দেখেছি, তোমার বাবার বিয়ে দেখলাম। আমার একটা কর্তব্য তো আছে।' তেজেন্দ্র রুমাল পকেটে বাখলেন।

'আমি বাঘ দেখতে এসেছিলাম।'

'তা দ্যাখো। কিন্তু এইসব বকাটে ছোকরাদের সঙ্গে মোটেই আড্ডা দেবে না।'

'আপনি আমাকে বাঘ দেখাবেন ?' দীপা সরল গলায় জানতে চাইল।

'বাঘ ?'

'হ্যাঁ। ওই আংরাভাসার নদীর ধারে বাঘ বেরিয়েছে জানেন না ?'

'তা শুনেছি।'

'আপনি এদিকে এসেছিলেন কেন ?' বিশু জিজ্ঞাসা করল।

'বারান্দায় বসে দেখলাম দীপা তোমাদের সঙ্গে এদিকে এল। তোমাদের ওপর আমাব কোন ভরসা নেই। এইসব নির্জন জায়গায় আগে কত কি কাণ্ড হয়েছে !'

দীপা নেমে আসছিল সিঁড়িতে পা দিয়ে বিশুদের শরীর বাঁচিয়ে। তাকে জায়গা দেওয়ার জন্যে অজিত উঠে দাঁড়াতেই কাঁচি সিগারেটের প্যাকেটটা দেখা গেল। অজিত সেটাকে পকেটে ঢোকাবার সুযোগ পেল না আর। তেজেন্দ্রর নজর পড়ল প্যাকেটটার ওপর। তিনি দীপাকে বললেন, 'ওই প্যাকেটটা নিয়ে এস তো !'

দীপা বলল, 'এটা অজিতের প্যাকেট।'

তেজেন্দ্র মাথা নাড়লেন, 'জানি জানি। বাঙালরা এসেই তো দেশের সর্বনাশ করছে। গোঁফ উঠতেই সিগারেট ফুঁকতে শুরু করেছে আজকাল আমাদের ছেলেরা কেন করছে তা জানি না ভেবেছ? নিয়ে আসতে বলেছি যখন তখন নিয়ে এস।'

বিশু কথা না বাড়িয়ে প্যাকেটটা তুলে দীপার হাতে তুলে দিল। দীপা সেটাকে নিয়ে এগিয়ে এসে তেজেন্দ্রর হাতে দিল। তেজেন্দ্র প্যাকেট খুলে দেখলেন, 'দুটো পড়ে আছে। তার মানে আটটা খতম। তুমিও খেয়েছ নাকি?'

মাথা নেড়ে না বলল দীপা। তেজেন্দ্রর চোখ ছোট হল। তিনি প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, 'চল।' দীপা বলল, 'কিন্তু আমি যে বাঘ দেখতে এসেছিলাম। আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না?'

তেজেন্দ্রকে চিন্তিত দেখাল। তিনি মাথা ঘুরিয়ে আসাম রোডের ওপাশটা দেখলেন। দীপা বলল, 'চলুন না। এরা খুব ভীতু, এরপর আর এগোতে চাইছে না। আপনি এসে ভাল হল। আমাকে নিয়ে চলুন না।'

তেজেন্দ্র মাথা নাড়লেন, 'বেশ, বলছ যখন। বাঘকে আমি মোটেই ভয় পাই না। এখন যেখানে চাঁপাফুলের গাছ, কালীপুজো হয়, সেখানে একসময় সন্ধে হলেই কেঁদো কেঁদো বাঘ আসত। এই শর্মা টর্চ জ্বেলে একা ফিরে আসত কোয়ার্টার্সে। বুঝলে? বাঘ-টাঘ আমাকে দেখিও না। চল।

দীপা অবলীলায় হাঁটতে লাগল। তেজেন্দ্র তার পাশে। পেছনে বসে থাকা তিনজন কোন কথা বলল না। একবার মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখল ওরা সিঁড়ি ছেড়ে উঠে যায়নি। সে বলল, 'জানেন, ডাক্তারবাবু না আমাকে ডিম খেতে বলেছেন। আমার শরীর খুব দুর্বল হয়ে গিয়েছে তো!'

'দুর্বল? তুমি?' তেজেন্দ্র লুঙ্গি ধরে হাঁটছিলেন।

'বাঃ! আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল না?'

'ও। বিধবার তো ডিম খাওয়া ঠিক নয়। না, তুমি এক কাজ করতে পার। রোজ সকালে এস আমাদের বাড়িতে। বউমা একটা মুরগী পুষেছেন, সেটা মোরগ ছাড়া রোজ একা একাই ডিম দেয়। সেই ডিম খেতে পারো তুমি। মোরগ ছাড়া মুরগী যখন ডিম দেয় তখন তাকে আর আমিষ বলে না! এসব যাদের বিয়ে হয়েছে তারা ছাড়া কেউ বুঝবে না। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।' তেজেন্দ্র হাসলেন।

'মুরগী মোরগ ছাড়াই ডিম দেয়?' অবাক হল দীপা।

'দেয়। তবে সেই ডিমে বাচ্চা হয় না। তুমি কাল আমাদের বাড়িতে এসো না। তবে আমি ভাবতে পারছি না তোমার ঠাকুমা এই ডিম খাওয়া মেনে নেবেন কিনা। আমি তো অনেকবার ওঁর সঙ্গে কথা বলেছি, ভদ্রমহিলা খুব গোঁড়া।' তেজেন্দ্র পকেটে হাত দিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা অনেকটা দূর চলে এসেছিল। আসাম রোড যেখানে বাঁক নিয়ে চা-বাগান ছাড়িয়ে চাষের ক্ষেত ভেদ করে আংরাভাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে জিপটা দাঁড়িয়েছিল। জিপে বসেছিলেন বড়সাহেব। তিনি নেমে এলেন রাস্তায়। ইংরেজিতে বললেন, 'আপনারা এখানে কেন?'

তেজেন্দ্র জবাব দিলেন, 'এই মেয়েটি বাঘ দেখতে চায়।'

বড়সাহেব বললেন, 'সরি। এটা চিড়িয়াখানা নয়। আপনারা ফিরে যান। কোথায় থাকেন আপনারা?' তেজেন্দ্র বললেন, 'আপনার বড়বাবুর বাবা আমি। এই চা-বাগান আমার হাতেই তৈরি হয়েছিল।'

'ও, আচ্ছা।' বড়সাহেব হাসলেন, 'মনে পড়েছে। কিন্তু আপনারা এখানে আর থাকবেন না। উন্ডেড্ চিতা খুব ভয়ঙ্কর হয়।'

তেজেন্দ্র বিচলিত হলেন এবার, 'উন্ডেড ? সর্বনাশ। চল, ফিরে চল। চলি স্যার'। আপনার প্রশংসা আমার ছেলের মুখে খুব শুনি। এখন বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি কিন্তু সারাজীবন ব্রিটিশ ম্যানেজারদের কাছে কাজ করে অ্যাপ্রিসিয়েট করার ক্ষমতা পেয়েছি। আমিও আপনার সাহসের প্রশংসা করছি। চল হে।' দীপার হাত ধরে পিছু ফিরলেন তেজেন্দ্র।

দীপা হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করল, 'বাঘ দেখা হবে না ?'

তেজেন্দ্র একটু হাঁপিয়ে পড়েছিলেন, 'উন্ডেড বাঘ দেখতে নেই। উন্ডেড বাঘরাই ম্যান-ইটার হয়ে যায়। দৌড়োদৌড়ি করে শিকার ধরতে পারে না তো ! সাহেবটাব চেহারা দেখলে ? শুঁটকি মাছের মত। আমাদের সময়ে যেসব সাহেব আসবেন তাঁদের কি চেহারা ছিল ! বাপস। যেমন লম্বা তেমন চওড়া। নাইনটিন টোয়েন্টি ওয়ানে লুইস নামের একটা সাহেব এল। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, ছাতি অন্তত বাহান্ন ইঞ্চি, হাতের কব্জি ইয়া মোটা। চারটে মুরগি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করত। স্কচ খেত জল না মিশিয়ে ঢক ঢক করে। আর যা খাটতে পারত তা না দেখলে বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ওই চেহারাটাই বেচাবার কাল হয়েছিল।' নিঃশ্বাস ফেললেন তেজেন্দ্র।

কৌতূহলী হল দীপা, 'কেন ?'

কোন মেমসাহেব ওকে বিয়ে করতে চায়নি। যোগ্য পার্টনার খোঁজে তো ওরা। অতবড় চেহারার সঙ্গে পাল্লা দেবে কে ? তেলিপাড়া বাগানের ম্যানেজার হেস্টিংস সাহেবের বোন ছিল খুব লম্বা, বাঁশের মত। তবে সাদা চামড়া বলে কথা। দেখে অবশ্য আমার হিজড়ে বলে মনে হত। হিজড়ে বোঝ ? ওই যে যারা বাচ্চা হলে কি হোল গো বলে মাদল বাজিয়ে পয়সা নিতে আসে ! তা হেস্টিংস সাহেবের বোন এল লুইসের সঙ্গে কোর্টশিপ করতে। রাত বারোটায় সেই বাঁশনি তেলিপাড়ায় ফিরে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। একেই চা-বাগানে ব্রিটিশ মেয়ে অবিবাহিত অবস্থায় বেশি থাকে না তার ওপর খবরটা চাউর হল। একেবারে আসাম থেকে দার্জিলিং। লুইসের ভাগ্যে আর মেয়ে জোটে না। তা এতদূরে একটা হুমদো গোরা কি একা থাকতে পারে। অতএব হুকুম হল কুলি লাইন থেকে কামিন চাই রাত কাটানোর জন্যে। তখন অবশ্য এটা রেওয়াজের মধ্যেই ছিল। তিন তিনটে কামিন অসুস্থ হয়ে পড়ল এমন যে তারা মাসখানেক বিছানা থেকে উঠতেই পারল না। শেষ পর্যন্ত তুরা বলে একটা কামিন সাহেবের সঙ্গে থেকে গেল। তার তিনটে সাহেব বাচ্চা হল। এখনও দু-একটা লোককে দেখবে গায়ের রঙ সাদা। তারা সব তুরার বংশধর। লুইস আমাকে একদিন বলেছিল, বাবু, ইন্ডিয়ান ওমেন আর ফার বেটার দ্যান ব্রিটিশ গার্লস। তা সেরকম লোক আর কোথায়, সেইসব মেয়েছেলেও তো নেই।' তেজেন্দ্র আর একবার ফোঁত করে নিঃশ্বাস ফেললেন। দীপার খুব রাগ হচ্ছিল। ঠাকুর্দার বয়সী লোকটা তাকে এসব গল্প শোনাচ্ছে কেন ? ওরা ততক্ষণে সেই জায়গায় চলে এসেছিল যেখানে একটু আগে বিশুদের ছেড়ে গিয়েছিল। তেজেন্দ্র সেখানে দাঁড়ালেন, 'ছোঁড়ারা কোথায় ?'

'আমি কি করে জানব ?'

'হুম্। ভেরি ব্যাড। ওরা তোমাকে কি বলছিল ?'

'মানে ?'

'খারাপ কথা কিছু বলছিল ? লাভ টাভের কথা ?'

'না।' দীপা ঠোঁট কামড়াল তারপর ফট করে মিথ্যে কথা বলল, 'ওরা আপনাকে নিয়ে

আলোচনা করছিল। আমি নিষেধ করছিলাম।'

'আ-আমাকে নিয়ে?' তেজেন্দ্র এবার অবাক।

'হ্যাঁ। ওরা একটা ক্লাব করবে। প্রেসিডেন্ট কাকে করা হবে এনিয়ে তর্ক হচ্ছিল। খোকনকে আমি বললাম আপনাকে প্রেসিডেন্ট করতে।'

'প্রেসিডেন্ট? আমি?' নিজের বুকে হাত রাখলেন তেজেন্দ্র।

'হুঁ। অজিত রাজি হচ্ছিল না। ও তো বাইরের লোক, এসেই আপনার সম্পর্কে আজেবাজে কথা শুনেছে। সেসবই বলছিল।'

'আজেবাজে কথা! কি কথা?'

'আমি বলতে পারব না।'

'আহা, বল না। এখানে তো কেউ নেই।'

'আপনার বউ মারা যাওয়ার পর আপনি কিসব করেছিলেন সেসব কথা। বিশু অবশ্য খুব আপত্তি করেছে। বলেছে প্রেসিডেন্ট আপনাকেই করতে হবে।'

'ক্লাবটা কিসেব?'

'সাংস্কৃতিক ক্লাব।'

'ছেলেমেয়ে একসঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'আমার অবশ্য আপত্তি নেই প্রেসিডেন্ট হতে। তবে ওই অজিতটাকে দলে রাখবে কিনা ভেবে দ্যাখো। বাঙালগুলো এদেশে আসার পর ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যাচ্ছে মানুষের। নিয়মশৃঙ্খলা বলে কিছু থাকছে না আর। স্বাধীনতা! এ স্বাধীনতা কে চায়? তোমাদের জন্যে খুব দুঃখ হয়, তোমরা ব্রিটিশ আমলে বড় হলে না। তাহলে দেখতে পেতে ডিসিপ্লিন কাকে বলে? সাধে কি ওরা এত বড় হয়েছে। ওরা যদি ভারতবর্ষে না আসত তাহলে এই চা-বাগান হোত? এত ব্রিজ, এত শহর, এত কলকারখানা তৈরি হোত? কিস্যু না। আমরা সেই সিরাজৌদ্দলার যুগেই থেকে যেতাম। ব্রিটিশদের তাড়িয়ে আমরা আমাদের সর্বনাশ করলাম। তা বলে দিও ওদের, আমার কোন আপত্তি নেই প্রেসিডেন্ট হতে। তোমাদের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা যাবে। তাতে তোমরাই লাভবান হবে।' তেজেন্দ্র আবার নিঃশ্বাস ফেললেন।

দীপা হাসার চেষ্টা করল, 'খুব ভাল হল। ওদের বলব। কিন্তু দাদু, আমার একটা কথা আপনি রাখবেন? এখন তো আপনি আমাদের প্রেসিডেন্ট!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। বলে ফ্যালো।'

'ওই সিগারেটের প্যাকেটটা দিন। ওদের মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে।'

তেজেন্দ্র কপালে আরও ভাঁজ ফেললেন। দীপা সেটা লক্ষ্য করে বলল, 'ওরা খুব ভয় পাচ্ছে যে আপনি নিশ্চয়ই বড়দের বলবেন ওরা সিগারেট খাচ্ছিল।'

'সেটা তো বলার মত কথাই। খুব অন্যায়।'

'কিন্তু আপনি প্রেসিডেন্ট হয়ে ওদের নিন্দে করবেন?'

তেজেন্দ্র আকাশের দিকে তাকালেন একটু। তারপর বললেন, 'কিন্তু তোমাকে নিয়ে এই যে ওরা হুটহাট জঙ্গলে চলে আসছে এটা করা আর চলবে না। তোমার যদি এদিকে আসতে ইচ্ছে করে তাহলে আমার সঙ্গে আসবে।'

দীপা চটপট নিপাট ভালমানুষের মত ঘাড় নাড়তেই তেজেন্দ্র পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিলেন। সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে বললেন, 'যাঃ, এবার তোমার কথায় ওদের ছেড়ে

দিলাম। আচ্ছা, তুমি সিগারেট খাও না তো?'

'না।' দীপা ঘনঘন ঘাড় নাড়ল।

'গুড। মেয়েছেলে সিগারেট খেলে ঠোঁট কালো হয়ে যায়।'

দীপার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েছেলে শব্দটা শুনে। সে হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল। তারপর তেজেন্দ্রর সঙ্গে কোয়ার্টার্সের দিকে হাঁটা শুরু করল। কয়েক পা হেঁটে তেজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, তোমার মুখ এত গম্ভীর কেন?'

'আপনি আমাকে কখনো মেয়েছেলে বলবেন না।'

'মানে? তুমি তো মেয়েছেলে।'

'না। আমি মেয়ে। মেয়েছেলে শব্দটার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য আছে।'

'তাচ্ছিল্য? তুমি খুব গল্পের বই পড় বুঝি?'

দীপা জবাব দিল না। ওরা যখন আসাম রোড ছেড়ে মাঠে নামল তখন অঞ্জলি আর মনোরমাকে দেখা গেল। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন ওরা। দীপা বলল, 'তাহলে আমরা সব ঠিকঠাক করে আপনাকে প্রেসিডেন্টের ব্যাপারটা জানিয়ে দেব।'

তেজেন্দ্র বললেন, 'তাড়াতাড়ি করবে। বয়স হয়ে যাচ্ছে তো।' কিন্তু তেজেন্দ্র নিজের কোয়ার্টার্সের দিকে গেলেন না। দীপাকে নিয়ে অঞ্জলিদের সামনে পৌঁছে বললেন, 'মেয়ের খুব সাধ হয়েছিল বাঘ দেখবার। খুব সাহসী, বুঝলেন।' কথাগুলো মনোরমার উদ্দেশ্যে। তাঁদের দুজনের মাথায় এখন ঘোমটা। অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই না বলে চলে গিয়েছিলি যে বড়। লোকজন দৌড়ে দৌড়ে এল অথচ তোর পাত্তা নেই। কি ভেবেছিস কি তুই?'

তেজেন্দ্র বললেন, 'উত্তেজিত হয়ো না বউমা। আমি তো সঙ্গে ছিলাম। নদীতে যখন বর্ষার জল এসে মেশে তখন তার আচরণ কি শীতের মত হয়। তবে তখন বাঁধ দেওয়া দরকার গতি নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্যে। সেইজন্যেই আমি সঙ্গে ছিলাম।' আরও খানিক বকর বকর করে তেজেন্দ্র চলে গেলেন তখন মনোরমা মুখ খুললেন, 'তুই ওই হতচ্ছাড়া বুড়োটার সঙ্গে নির্জনে গিয়েছিলি?'

'বুড়োমানুষ তো! তোমার থেকেও বড়। অনেক বড়।'

'তাতে কি হয়েছে? খবরদার ওর সঙ্গে কোথাও যাবি না। চিতায় উঠলেও ওরকম পুরুষকে বিশ্বাস করা যায় না। অনেক তো বড় হয়েছ। আর কবে বুঝবে?'

গতকাল রেজাল্ট আসার কথা ছিল। কিন্তু আসেনি। আজ সকালে সত্যসাধন-মাস্টার জলপাইগুড়িতে গিয়েছেন। গতকাল সারাদিন ধরে উত্তেজনা ছিল স্কুলে। বিকেলে অঞ্জলির সঙ্গে দীপা এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে গিয়েছিল। রাত্রে ঘুম আসেনি তেমন। অমরনাথ অবশ্য বলেছিলেন, 'তুই যা পড়েছিস আমি তার অর্ধেক পড়িনি। আমি যদি পাশ করে থাকি তাহলে তুইও করবি। এত চিন্তার কি আছে?'

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর সে একাই স্কুলে যাচ্ছিল। আসাম রোড ধরে যাওয়ার সময় বিশুদের দেখতে পেল। পাঁচটা সাইকেল পাশাপাশি যাচ্ছে রাস্তা জুড়ে। দীপা দাঁড়িয়ে পড়তেই অজিত বলল, 'এখনও কোন খবর নেই। প্রেসিডেন্ট সাহেব স্কুলে গিয়ে বসে আছে?

সঙ্গে সঙ্গে বাকি চারজন হেসে উঠল। তাদের সেই সাংস্কৃতিক ক্লাব আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। পরের দিন সিগারেটের প্যাকেট ফেরত দিয়ে বানানো গল্পটা বিশুদের বলতেই ওরা

রেগে গিয়েছিল খুব। কিন্তু ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে হয়েছে অনেক চেষ্টা করে। তেজেন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে যে প্রেসিডেন্ট হতে পারেন বাগানের বড়বাবু, যিনি তাঁরই ছেলে। সেটাই উচিত। নিজের ছেলের বিরুদ্ধে যেহেতু তেজেন্দ্র যেতে পারেন না তাই ওরা আপাতত ক্লাবটা করছে না। এই দুই আড়াই মাস দীপা তেজেন্দ্রকে এড়াতেই বাড়ির বাইরে খুব একটা আসেনি। বিশুদেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কদাচিত হয়েছে। এখন সে বলল, 'আমি স্কুলে যাচ্ছি। আমার মন বলছে আজ রেজাল্ট আসবে।' অতএব সাইকেলগুলো ঘুরল।

ঠিক চারটের সময় বাস থেকে নেমে দৌড়তে দৌড়তে এলেন সত্যসাধন মাস্টার। তাঁর হাতে কাগজপত্র। সবাই ভিড় করে দাঁড়াতেই তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'না, না, এইভাবে না। আগে হেডমাস্টার মশাই-এর সঙ্গে কথা কই তারপর অ্যানাউন্স করব।' তিনি প্রায় জোর করেই ভেতরে চলে গেলেন। একটা দমবন্ধ করা পরিবেশ। কেউ কথা বলছে না। দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল অমরনাথ সাইকেল চেপে স্কুলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই অসময়ে তাঁকে এখানে দেখে সে ছুটে গেল। অমরনাথ তার কাঁধে হাত রাখতেই সত্যসাধন মাস্টার বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। তারপর চিৎকার করে নাম আর ডিভিসন বলে যেতে লাগলেন। দীপা নিজের নাম শুনতে পেল না। সবার নাম ডাকা শেষ হয়ে গেলে সত্যসাধন মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন, 'শোন সবাই, আমাগো দীপা চারটা লেটার নিয়া ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করছে। সে কুথায়?'

আর তখন সবাইকে ছাপিয়ে অমরনাথ সশব্দে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'মাগো! মা আমার।'

॥ ১৬ ॥

না দেখলে ভাবতেই পারতেন না অমরনাথ। একটি মানুষের চেহারা কয়েক বছরে এত পাল্টে যেতে পারে? প্রতুল বন্দোপাধ্যায় অবশ্যই অসুস্থ। কিন্তু তাঁর গলার স্বরও রুগ্ণ হয়ে গিয়েছে। গাল বসে গিয়েছে, চুলেও সাদা ছাপ পড়েছে।

হরদেব ঘোষাল দরজা থেকে ফিরে এলেন, 'না। আমার আর এখানে বসে থাকা ঠিক হবে না। তোমরা দুই বেয়াই অনেকদিন বাদে একসঙ্গে বসেছ। তোমরা মনের কথা বল। আমি থাকলে নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে। আমে দুধে মিশে যাক, আমি আঁটি কেটে পড়ি।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'বড্ড বাজে কথা বল। বয়স হয়েছে অথচ— !' হাত তুললেন তিনি, 'বসো। বসো ওখানে।'

হরদেব যেন এমনটাই চাইছিলেন, হুকুম হওয়া মাত্র চট করে বসে পড়লেন, 'বাড়িটার কি অবস্থা! আহা, খাঁ খাঁ করছে।'

অমরনাথ চুপচাপ বসেছিলেন। সকালের বাস ধরে তিনি এখানে পৌঁছেছেন সকাল দশটা নাগাদ। তাও প্রায় পনেরো মিনিট হয়ে গেল। হরদেব ঘোষাল আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন বাইরের গেটে। তাঁর মারফত যোগাযোগ হয়েছে। যে বাড়িতে আর কখনও পা দেবেন না বলে তিনি স্থির করেছিলেন সেই বাড়িতে ঢোকার পর থেকেই একটা অস্বস্তি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এখানে আসার ব্যাপারে তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেননি। আসলে দীপার পাসের খবর পাওয়ার পর থেকে ক'দিন যা শুরু হয়েছে তাতে অঞ্জলির কাছেও ব্যাপারটা তোলা সম্ভব হয়নি। তিনি এসেছেন কৌতূহল নিয়ে। একটা মানুষের সবই যে খারাপ তা হতে পারে না। প্রতুলবাবু যদি নিজের ভুল বুঝতে পারেন তাহলে

আখেরে দীপারই লাভ।

হরদেববাবু তাঁকে নিয়ে অফিসঘরে বসে খবর পাঠিয়েছিলেন নিজের নাম বলে। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলেছিলেন, 'আপনি আসছেন সেটা কাল বলে গিয়েছি। এখন আপনার নাম বলে পাঠালাম না তার কারণ খবরটা তো আগে দাসীরাণী শুনবেন। অত্যন্ত ধড়িবাজ মেয়েছেলে। ঠিক বুঝতে পারবে আর তারপরেই প্যাঁচ কষতে শুরু করবে।'

অমরনাথ কিছু বললেন না। সেই দাসীটির নাম আনা। এতদিন মনে মনে তাঁদের সমস্ত পরিবার এই আনার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। ছিলই বা কেন, যা সে করেছে, যে স্বার্থেই করে থাক, মেয়েটা তো বেঁচে গিয়েছে। তিনি যদি সেই ঘটনার পরেও আজ এ বাড়িতে আসতে পারেন তাহলে আনাকে নিয়ে কোন বিরূপ মন্তব্য করার অধিকার তাঁর নেই।

প্রতুলবাবু এসেছিলেন মিনিট পনেরো বাদে। হাতে লাঠি। অফিসঘরে ঢুকে দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন, 'নমস্কার। আপনার মেয়ের খবর পেয়েছি। এত বড় একটা কৃতিত্বের অধিকারী আমাদের বাড়ির বউ হবে তা আমি কল্পনাও করিনি।'

হরদেব ঘোষাল বলেছিলেন, 'তোমাদের বাড়ির বউ মানে ? সে অমরনাথবাবুর মেয়ে।'

'কিন্তু পরীক্ষার ফর্ম ভর্তি করার সময় কি নাম লিখেছিল ? মানে কোন উপাধি ? বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেনি ? যতক্ষণ ওই বিয়ের বাঁধনে থাকবে ততক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতেই হবে। কি অমরনাথবাবু, ঠিক বলছি কিনা ?'

অমরনাথ নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়েছিলেন কথাটা সত্যি। আর তারপরেই হরদেব দরজার কাছে চলে গিয়ে ভান করেছিলেন চলে যাওয়ার।

প্রতুলবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'অমরনাথবাবু, আমার বিরুদ্ধে আপনাদের নিশ্চয়ই অনেক অভিযোগ আছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। না, আগে আপনাদের কথা শুনি। তারপরে আমার কথা বলব।'

অমরনাথ বললেন, 'আমাদের কোন কথা নেই তো।'

'কোন অভিযোগ নেই ?'

'না। আমরা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি।'

'পাপ ?'

'হ্যাঁ। একটি বালিকাকে বড়লোকের বাড়িতে কোন খোঁজখবর না নিয়ে বিয়ে দিয়েছি নিতান্তই লোভে পড়ে। নিজের মেয়ে হলেও অনেক সময় সেই লোভ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। লোভ তো পাপই।' অমরনাথ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন।

'আপনার কোন অভিযোগ নেই ?'

অমরনাথ প্রতুলবাবুর মুখের ওপর দৃষ্টি রাখলেন, 'আপনি কেন মেয়েটার এই সর্বনাশ করলেন ? আপনি জানতেন যে ওই ছেলের আয়ু বেশী দিন নেই। তবু তাকে দিয়েই বংশরক্ষার অবাস্তব পরিকল্পনা করেছিলেন আপনি। হরদেববাবুর কাছে শুনেছি আপনি তাকে ওষুধ ব্যবহার করতে দিয়েছেন। হয়তো সেটা খেয়েই তার মৃত্যু এগিয়ে এসেছিল। শুধু তাই নয়, আপনি সেই রাত্রে—।'

'ওটা বানানো গল্প। আর যাই হোক আমি উন্মাদ নই। ওটা আনা বানিয়ে বলেছিল যাতে বউমা আমার সম্পর্কে বেশী ভয় পায়।' প্রথম প্রতিবাদ করলেন প্রতুলবাবু।

'কিন্তু আপনি আমার বাড়িতে রাত কাটাতে চাননি পাছে ছেলের ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়। আমি মূর্খ, আমি লোভী, কিন্তু মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি!'

প্রতুলবাবু বললেন, 'সত্যি কথা। এখন বলুন, এ জন্যে আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করব ?'

'মানে ?' অমরনাথের কপালে ভাঁজ পড়ল।

'আমি যা করেছি তার জন্যে আপনার মেয়ে বিধবা হয়েছে। এখন ও ব্যাপারে তো কিছু করার নেই। আমরা শুধু পারি ওর ভবিষ্যৎ যাতে সমস্যামুক্ত হয় তার ব্যবস্থা করতে।'

হরদেব ঘোষাল এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। এবার বললেন, 'আরে সবচেয়ে ভাল হয় সসম্মানে ঘরের বউকে ঘরে ফিরিয়ে এনে সুখে ঘর কর।'

'সুখে ঘর করা আর এ জীবনে হবে না হরদেব। যৌবনের প্রাবল্যে সব কিছু নস্যাৎ করেছিলাম। এখন তার মাশুল দিতে হচ্ছে। এ বাড়িতে বউমা ভাল থাকবে না। তাকে ভাল থাকতে দেওয়া হবে না।'

'একথা ভাবছ কেন ? তোমার বাড়িতে একটা ছোট্ট মেয়ে এসেছিল। সে আজ কত বড় হয়ে গেছে। ফার্স্ট ডিভিসনে স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছে। এ বাড়িতে এসে সে নিজের সুখ নিজে তৈরি করে নিতে পারে। তুমি হয়তো অনর্থক ভয় পাচ্ছ।' হরদেব খুব আন্তরিকভাবে কথাগুলো বললেন। নিঃশব্দে হাত নাড়লেন প্রতুলবাবু। তারপর হেসে বললেন, 'ঈর্ষা, সন্দেহ, হিংসা মানুষকে যত ছোট করে দেয় অধিকার পাওয়ার পর সেটা হাতছাড়া না করার চেষ্টায় মানুষ অনেক নিচে নামে। আমি আমার নিজের জালে জড়িয়েছি।'

অমরনাথ বললেন, 'আপনার শরীরে কি হয়েছে ?'

'নানা রকম। সুগার, ব্লাডপ্রেসার, বুকের ব্যামো কি নেই ? মাথাটা এখনও ঠিক আছে এই রক্ষে। তিন মাস কোন ব্যবসার কাজকর্ম করিনি। আর হবেও না। যা আছে তাতে মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবেই থাকতে পারব।' প্রতুলবাবুর হাতের দশটা আঙুল পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল।

'তোমার পর ?' হরদেব সরাসরি জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। একটা কিছু ব্যবস্থা করে যাওয়া উচিত। নইলে পাঁচ ভূতে লুটেপুটে খাবে।'

'পাঁচ ভূত না ওই এক পেত্নীই যথেষ্ট।' হরদেব বললেন, 'সত্যি কথা বল তো, আরে অমরনাথবাবু সব কথা জানেন, ও কি তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয় ?'

'এসব কথা আলোচনা করতে ভাল লাগে না হরদেব। অমরনাথবাবু, বউমা অত ভাল পাস করল, এ জেলায় ছেলেদের মধ্যেও যে দ্বিতীয় হয়েছে, ওর উচ্চ শিক্ষার কি ব্যবস্থা করলেন ? চা-বাগানে তো আর কলেজ নেই।' প্রতুলবাবু ফিরে তাকালেন।

'সমস্যা এখানেই। আমার অবস্থা তো জানেনেই। দু-দুটো ছেলে আছে, তাদের মানুষ করতে হবে। মাইনে যা পাই তাতে এখনও কোনমতে চলে যায়। ওকে পড়াতে গেলে হয় জলপাইগুড়ি নয় কলকাতায় পাঠাতে হয়। কলকাতার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি না। শুনছি ও নাকি সরকার থেকে কিছু ভাতা পাবে। স্কলারশিপ। তার কি পরিমাণ তাও জানি না। হয়তো কলেজের বেতন লাগবে না। কিন্তু থাকা-খাওয়ার জন্যেও তো অনেক খরচ।'

'এই খরচটা যদি আমি করি ? আপনি কলকাতার বড় কলেজে ওকে ভর্তি করুন। যা নম্বর পেয়েছে সব কলেজই ওকে ডেকে নেবে। সেখানকার ভাল হোস্টেলে রেখে দিন। পড়ুক। যদ্দুর পড়তে চায় পড়তে দিন। তারপর একদিন হয়তো নিজের পথ খুঁজে পাবে। আর সেইটেই হবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'তা সম্ভব নয়।'

'কেন ?' প্রতুলবাবু অবাক হলেন।

'আমার মেয়েকে আমি চিনি।'

'মেয়েটি আপনার শালিকার।'

'জন্ম সূত্রে। কিন্তু আমার দুই ছেলের থেকে সে কম নয়। দীপা যদি জানতে পারে আপনার টাকায় সে পড়াশুনা করছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ করবে। ক'বছর আমার মা ওকে জোর করে বিধবা সাজিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এখন সে ওসব মানতে চাইছে না। রঙিন শাড়ি পরছে, যে-কোন দিন মাছমাংস খাওয়া শুরু করবে।'

'এটা ঠিক নয়।' হরদেব ঘোষাল বলে উঠলেন, 'আপনারা প্রতিরোধ করুন।'

'এতদিন করেছি। কতদিন পারব জানি না। সে আপনাদের ঘেন্না করে।'

'খুব স্বাভাবিক।' প্রতুলবাবু চোখ বন্ধ করলেন। ঘরে নিস্তব্ধতা নেমে এল। একটু বাদে হরদেব ঘোষাল বললেন, 'আমি বলি কি, তুমি একটা উইল কর। যদ্দিন জীবিত থাকবে তদ্দিন তুমি এসব সম্পত্তি ভোগ করবে। তোমার অবর্তমানে তোমার বউমা সব পাবে।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'তুমি শুনলে না, বউমা আমাকে ঘেন্না করে। শুনুন অমরনাথবাবু, টাকাটা যদি আমি আপনার নামে পাঠাই। মানে, আমি যে পাঠাচ্ছি তা যদি বউমা টের না পায় তাহলে তো আর কোন ঝামেলা হবে না।'

'তা হবে না।'

প্রতুলবাবু হাসলেন, 'তাহলে এই তঞ্চকতাটুকু আমরা করি ?'

'কিন্তু একটা সমস্যা হবে।'

'বলুন।'

'দীপা আমার আর্থিক পরিস্থিতির কথা জানে। কলকাতায় পড়তে পাঠাতে যে টাকা দরকার তা যে আমি দিতে পারব না একথাও তার অজানা নয়। সে তাই নিজে শিলিগুড়িতে পড়তে চেয়েছে। সেখানে আমাদের পরিচিতা এক অধ্যাপিকার বাড়িতে থেকে সে পড়তে চায়। এই অবস্থায় কলকাতায় পড়তে পাঠালে সে সন্দেহ করবে। মেয়ে তো খুব বুদ্ধিমতী।' অমরনাথ সব কথা খুলে বললেন।

'আপনি আমার এখানে এসেছেন সে জানে ?'

'আজ্ঞে না।'

'ভাল। না, শিলিগুড়িতে পড়তে পাঠানোর দরকাব নেই। পাঁচ ভূতের শহর, কোন ঐতিহ্য নেই। আপনি জলপাইগুড়ির কলেজেই ভর্তি করুন। হোস্টেলে রাখুন। আজ বাড়ি ফিরে বলবেন এস সি রায় মশাই ওর সব খরচ বহন করবেন।'

'এস সি রায় ?'

'দুর মশাই। এস সি রায় হলেন ফাদার অফ টাউন।'

'তা জানি। কিন্তু—।'

'কিন্তু টিন্তু না। আমরা যখন দু হাতে পকেট ভরছি তখন রায়সাহেব ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে এই শহরে নানান জনহিতকর কাজ করে গিয়েছেন। শুধু স্পোর্টস নয়, কত গরীব মেধাবী ছাত্রকে পড়ার সুযোগ দিয়েছেন, চাকরির ব্যবস্থা করেছেন তার ঠিক নেই। আপনি ওঁর নাম ব্যবহার করবেন।'

'যদি কোনদিন দীপা রায়সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যায় ?'

'ঘটনাটা আমি ওঁকে বলে রাখব।'

প্রস্তাব মনঃপূত হল অমরনাথের। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি প্রতি মাসে ওর নামে মানি অর্ডার করবেন ?'

'না। আমি ব্যাঙ্কে আপনার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা রাখব। প্রতি মাসে দুশো টাকা সুদ ওরা বউমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।'

'দুশো টাকা মাসে ? এত কি হবে ?' অমরনাথ চমকে উঠলেন।

'অত লাগবে না বলছেন ?'

'না, না। একশো টাকাতেই সব হয়ে যাবে ওর।'

'বেশ। তাই হবে। টাকাটা থাকবে ওর নামে। কিন্তু অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে ওর সই চাই। সেটা আপনি কোনভাবে করিয়ে নেবেন।'

হরদেব ঘোষাল বললেন, 'আপনার মেয়ে কি আইনের চোখে সাবালিকা হয়েছে ?'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, না। হরদেব হাসলেন, 'তাহলে মেয়ের সঙ্গে নিজের নামটাও অ্যাকাউন্ট খোলার সময় দেবেন অমরনাথবাবু। নাবালিকার নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না। অভিভাবক চাই।'

কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। প্রতুলবাবু বললেন, 'গ্লানি কিছুটা কমল মশাই। আপনি পাঁচটা টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে নম্বরটা আমাকে জানিয়ে দেবেন। চিঠি লিখলে ইংরেজিতে লিখবেন। তাতে অন্য কেউ মাথা গলাবে না।'

হরদেব ঘোষাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা কি করছ ?'

'দেখি !' প্রতুলবাবু আবাব চোখ বন্ধ করলেন।

'তুমি যদি ফট্ করে চিতায ওঠো তাহলে আইনত সম্পত্তি কে পাবে জানো ?'

'যার কথা বলছ সে পেলে তো খুশিই হতাম। না অমবনাথবাবু, আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আপনি ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলবেন, আমাকে জানাবেন, তাতে অনেক সময় লাগবে। আমি আর অপেক্ষা করতে চাইছি না। আজই একটা পঞ্চাশ হাজাব টাকার চেক আপনাকে দিচ্ছি, আপনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিয়ে দিন। ব্যাপারটা আজই চুকে যাক।

'কিন্তু অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে দীপার সই লাগবে যে।'

'তা অবশ্য।' আবার চিন্তিত হলেন প্রতুলবাবু, 'ঠিক আছে ব্যাঙ্ক থেকে আজ কাগজপত্র নিয়ে যান, কাল মেয়েকে দিয়ে সই করিয়ে জমা দেবেন । একটু বসুন, আমি আসছি।' লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চেয়াব ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রতুলবাবু। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন হবদেব ঘোষাল, 'হ্যান্ড শেক করুন মশাই।'

না বুঝেই করমর্দন করলেন অমরনাথ। হরদেব বললেন, 'এক কথায় পঞ্চাশ হাজার। এই তো সবে শুরু। আমার যা আন্দাজ তাতে প্রতুল অন্তত দশ-বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বানিয়েছে। হবে, সব হবে। জল যখন আপনার দিকে গড়াতে শুরু করেছে এক সময় টাকার বন্যায় ভেসে যাবেন মশাই। আমার কমিশন শতকরা দশ টাকা। এটুকু দযা করে খেযালে রাখবেন তাহলেই চলবে।'

'কমিশন ?'

'ওই দালালি যাকে বলে। ব্যবসার প্রথম নিয়ম হল একটা ভাল দালাল যোগাড় কর যে তোমার জন্যে ব্যবসা আনবে যার বিনিময়ে তুমি তাকে সন্তুষ্ট রাখবে। এ তো এক ধরনের ব্যবসা। পঞ্চাশের পাঁচ আমার রইল। না না তাড়াহুড়ো কিছু নেই। ধীরেসুস্থেই দেবেন। তদ্দিনে আমি দেখি আরও কয়েক লাখ বের করতে পারি কিনা।'

'প্রতুলবাবু যদি জানতে পারেন ?'

'দুর মশাই, টাকা পয়সা হল যতক্ষণ পকেটে থাকে ততক্ষণ আমার। পকেট বদল হলেই আমি কে ? প্রতুলের খেয়েদেয়ে কাজ নেই যে খোঁজখবর করতে যাবে।'

এই সময় প্রতুলবাবু ফিরে এলেন। পাঞ্জাবির পকেট থেকে চেকবই বের করে অনেক

সময় নিয়ে লিখে নিজের নাম সই করলেন। হরদেব বললেন, 'আর একটা সই করে দাও প্রতুল, তোমার হাত কাঁপছে।' প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন। তারপর দ্বিতীয় সইটি করলেন। চেকের পাতা ছিঁড়ে অমরনাথের দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, 'গ্রহণ করুন—।'

অমরনাথ চেক নিলেন, পে টু দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যান্ড অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। পঞ্চাশ হাজার টাকা। এ জীবনে এত টাকা একসঙ্গে দ্যাখেননি অমরনাথ। তাঁর সমস্ত শরীরে কাঁপুনি এল। জিভ শুকিয়ে গেল। পাঁচ এবং তার পাশের চারটে শূন্য বিশাল হয়ে গেল আচমকা। অমরনাথের কপালে ঘাম জমল। তাঁর দশ বছরের মাইনে। এটা যদি হারিয়ে যায়.? অবশ্য এককোণে অ্যাকাউন্ট পেয়ি কথা দুটো লিখে দিয়েছেন প্রতুলবাবু। যে কেউ চট করে ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাঙ্গাতে পারবে না। তিনি সন্তর্পণে চেকটা পকেটে পুরলেন।

প্রতুলবাবু বললেন, 'এ বাড়িতে এসে কিছু না খেয়ে চলে যাবেন এটা আমার ভাল লাগল না। সরবত আসছে। সেটা খেয়ে যান।'

হরদেব বললেন, 'সরবত ? আমাকে তো তিনি কখনও সরবত খাওয়ান না।'

'কুটুম এসেছেন বাড়িতে হরদেব। তাই না ?'

'তাহলে তো খবর পৌঁছেছে।'

দরজায় ছায়া পড়ল। একটু শব্দ। তারপর অল্প বয়সী একটি কাজের মেয়ে ট্রে নিয়ে ঢুকল। দু'জনের হাতে সরবতের গ্লাস তুলে দিয়ে মেয়েটি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। প্রতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে, কিছু বলবি ?'

'হুঁ। উনি কি দুপুরে ভাত খাবেন ?' মেয়েটি মুখ নামিয়েই জিজ্ঞাসা করল।

'না না। আমাকে এখনই বেরুতে হবে।' অমরনাথের কথা শেষ হওয়ামাত্র মেয়েটি বেরিয়ে গেল। হরদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি আবার কবে আমদানি হল ?'

'দিন তিনেক। কাউকেও তো মাসখানেকের বেশী রাখে না।'

হরদেব হাসলেন, 'কেন জায়গা দখল হবার ভয়ে ?'

'আঃ, হরদেব। বড্ড বাজে কথা বল তুমি। নিন, খেয়ে নিন অমরনাথবাবু। এখন তো আর তেমন বাধা রইল না। জলপাইগুড়িতে যখন মেয়ে থাকবে তখন শহরে আসতেই হবে আপনাকে। মাঝে মাঝে দর্শন দিলে ভাল লাগবে।' প্রতুলবাবু বললেন।

পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক বুকে নিয়ে হাকিমপাড়ার রাস্তায় যখন অমরনাথ হাঁটছিলেন তখন হরদেব ঘোষাল তাঁর পাশে ছিলেন। হরদেব বলছিলেন, 'দোষগুণ মিশিয়েই তো মানুষ। প্রতুলের যদি ওই ব্যাপারটা না থাকত তাহলে এতদিনে মিনিস্টার হয়ে যেত।'

'কোন ব্যাপার ?'

'ওই মেয়েছেলে সংক্রান্ত আকর্ষণ আর সন্দেহ। সেই সঙ্গে মানুষকে অবজ্ঞা করা।' হরদেব হাসলেন, 'নইলে আমরা জলপাইগুড়িতে আর একজন আলামোহন দাস পেয়ে যেতাম।'

অমরনাথ কথা বললেন না। আলামোহন বা চিত্তরঞ্জন, তাঁর কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওই ব্যাপারটা বলে যে তিনটে কারণ দেখালেন তা একটি সাধারণ মানুষেরও থাকলে সে খুব নীচ হয়ে যায়। প্রতুলবাবু অবশ্য বললেন তিনি কিছুটা গ্লানিমুক্ত হলেন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক দিয়ে। হয়তো যতটা নীচ ছিলেন ততটা আর রইলেন না। চেকটার কথা মাথায় আসতেই তাঁর খেয়াল হল হরদেব এখনও পাশাপাশি হেঁটে চলেছেন। এখন তাঁরা ঝুলনাপুলের কাছে এসে গেছেন। এখান থেকে সোজা রাস্তা ধরে টাউন ক্লাবের মাঠ বাঁ

দিকে রেখে কাছারির ঘাটে গিয়ে নৌকো ধরা যায়। তাঁকে দাঁড়াতে দেখে হরদেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ? যাবেন না ?'

'কোথায় ?' অমরনাথের মনে হল লোকটাকে বিদায় করতে পারলে বাঁচেন।

'ব্যাঙ্কে। সেখানে গিয়ে ফর্মটর্ম নিতে হবে। ফর্মে একজনের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের পাড়ার একটা ছোকরা সেখানে কাজ করে। বললে সে সই করে দেবে। ব্যাঙ্ক থেকে আমাকে আবার শ্মশান কালী মন্দিরে যেতে হবে।'

'কালী মন্দির ?'

'হ্যাঁ মশাই। মানত ছিল। যেদিন থেকে প্রতুলেব সাম্রাজ্যের ইঁট খসাতে মা সাহায্য করবেন সেদিনই সোয়া পাঁচ আনার পুজো দেব। ওই যাঃ, তাড়াহুড়োতে পয়সা না নিয়েই বেরিয়ে এসেছি। সোয়া পাঁচ আনাটা দিন তো। আপনারই মঙ্গল হবে।' হাত বাড়ালেন হরদেব। কেউ যখন মানত করে তখন পুজোর পয়সাটা আলাদা তুলে রাখে বলেই জানতেন অমরনাথ। কিন্তু আপাতত সোয়া পাঁচ আনা দিয়ে মুক্তি পেতে চাইলেন তিনি। পয়সাগুলো পকেটে পুরে ব্যস্ত হলেন হরদেব, 'চলুন চলুন বেলা বাড়ছে।'

'বাসুদেব' বাসে বসে যখন আঙরাভাসা নদী পেরিয়ে এলেন অমরনাথ তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম, তাতে হরদেবের পরিচিত ছেলেটির সই করানো হয়েছে, কলেজে ভর্তি হবার ফর্ম এবং একটি পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক। আচ্ছন্নের মত বসে ছিলেন তিনি। কাজটা কি রকম হল সেটা আর মাথায় আসছিল না। হরদেব শ্মশান কালীর মন্দিরে যাওয়ার আগে পই পই করে বলে দিয়েছেন আগামীকালই যেন তিনি এসে অ্যাকাউন্ট খুলে চেকটা জমা দেন। বেলা এগারোটা নাগাদ হরদেব ব্যাঙ্কে থাকবেন। সেই সময় তিনি অমরনাথের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকার চেক নিয়ে নেবেন। তাঁর কমিশন। একথাও বলেছেন, 'পুরো সম্পত্তি আদায় করে আপনাকে দেব মশাই। ওই জাঁহাবাজ মেয়েছেলেটাকে রাস্তায় বসাবো।'

হরদেবকে আর পছন্দ হচ্ছে না। তিনি না থাকলেও এই টাকাটা প্রতুলবাবু তাঁদের দিতেন বলে অমরনাথের ধারণা। মাঝখান থেকে শকুনের মত উড়ে এসে জুড়ে বসেছে হরদেব। লোকটাকে কিভাবে কাটানো যায় তাও ঠাওর করতে পারছেন না। পুরো সম্পত্তি যদি দশ-বিশ লাখের হয়, হরদেব যদি পুরোটাই এনে দিতে পারেন— । বড় নিঃশ্বাস ফেললেন অমরনাথ। তিনি কি লোভী হয়ে যাচ্ছেন!

বাস থেকে নেমে এপাশ ওপাশে তাকাতেই গাড়িটাকে দেখতে পেলেন অমরনাথ। তাঁর কোয়ার্টার্সের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িতে চেপে তাঁর কাছে আসার কোন পরিচিত মানুষ নেই। সিঁড়ি পেরিয়ে মাঠে নামলেন তিনি। বারান্দায় উঠেই তিনি শুনতে পেলেন, 'অনেক আগেই আমার আসা উচিত ছিল কিন্তু বয়স হচ্ছে তো! শরীরে একটা না একটা রোগ লেগেই থাকে। তা অমরনাথবাবুকে বলো আমি এসেছিলাম। দীপাবলীর ব্যাপারে কোন চিন্তা তোমাদের করতে হবে না। এত ভাল রেজাল্ট করেছে যে মেয়ে— ।'

এই সময় অঞ্জলি বলল, 'ওই তো উনি এসে গিয়েছেন।'

অমরনাথ তখন দরজায়। বসার ঘরে রমলা সেনকে ঘিরে অঞ্জলি আর দীপা বসে আছে। মনোরমা সেখানে নেই। ছেলে দুটোর স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়নি।

রমলা সেন দুই হাত জোড় করে বললেন, 'নমস্কার মশাই। মেয়ের গর্বে নিশ্চয়ই খুব গর্বিত। আরে, কি চেহারা হয়েছে আপনার ? এত তাড়াতাড়ি চুলটুল পেকে গেল কেন ? কি ভাই অঞ্জলি, যত্নআত্তি করছ না কেন ?'

'কি করব !' অঞ্জলি হাসার চেষ্টা করল, 'দিনরাত শুধু ভবিষ্যতের চিন্তা করে। আর ওই দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর থেকেই শরীর ভাঙ্গছে।'

অমরনাথ চেয়ারে বসলেন, 'তোমার কলেজে ভর্তি হবার ফর্ম এনেছি।'

রমলা সেন মাথা নাড়লেন, 'ওমা, আমরা তো এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছি দীপাবলী শিলিগুড়ি কলেজে পড়বে। আমার কাছে থাকবে। কলেজে বাড়িতে আমিই থাকব, কোন চিন্তা নেই আপনাদের।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন অমরনাথ। হয়তো আজ সকালে এই প্রস্তাব শুনলে তিনি খুব খুশি হতেন। কিন্তু দীপা কারো বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ছে জানার পর প্রতুলবাবু কি— ! তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এত বড় ব্যাপারে তো এক কথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। আমি ভেবে দেখি।'

রমলা সেনের মুখ গম্ভীর হল। অঞ্জলি বলল, 'এতে ভেবে দ্যাখার কি আছে। উনি দীপাকে মেয়ের মত ভালবাসেন। এতদিন ধরে চিঠিতে উৎসাহ দিয়েছেন। ওঁর কাছে থাকলে মেয়ে আরও ঠিক থাকবে।'

রমলা বললেন, 'না, না। আমার কাছে না থাকলে দীপাবলী যে ঠিক থাকবে না এটা বললে ওকে অসম্মান করা হবে।'

অমরনাথ বললেন, 'আমি যখন বলছি ভাবতে হবে তখন নিশ্চয়ই তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। আপনারা গল্প করুন। আমার স্নান-খাওয়া কিছু হয়নি।' অমবনাথ মাথা নেড়ে চেয়ার ছেড়ে ভেতরে চলে এলেন। তাঁর সামনে এখন মনোরমা। তিনি ভেতরেব ঘরের খাটের ওপর বসেছিলেন। ছেলেকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছেন, 'বউমাব কোনদিন আক্কেল হবে না।' চাপা গলায় বললেন মনোরমা, 'তুই যে এক কথায় রাজী হয়ে যাসনি এটা ভগবানের আশীর্বাদ। ওর কাছে থাকলে তো দীপা ম্লেচ্ছপনা শিখবে।'

অমরনাথ জবাব না দিয়ে আলমারির কাছে চলে গেলেন। যথারীতি পাল্লা খোলা। শুধু লকারে তালা বন্ধ করে চাবিটা পাশেই রাখা আছে। অমরনাথ লকাব খুলে চেক এবং ব্যাঙ্কের ফর্ম রেখে দিলেন। তার পরেই কি ভেবে ব্যাঙ্কের ফর্ম বের করে নিয়ে কলেজেব ফর্মের সঙ্গে রাখলেন। এই সময় অঞ্জলি ঘরে এল। তাকে দেখে মনোবমা ভেতরে চলে গেলেন। অঞ্জলি সেদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

অমরনাথ জবাব দিলেন না। অঞ্জলি বলল, 'তুমি ওভাবে চলে এলে কেন ?'

অমরনাথ বললেন, 'খুব খিদে পেয়েছে। স্নানও করতে হবে।'

'তাহলে লকার খুলে কি করছ।'

'জরুরী কিছু রাখছি।' অমরনাথ জামা খুলতে খুলতে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে। প্রাইভেট। তুমি রান্নাঘরে খাবার দিয়েই চলে এস না।'

'উনি বাইরের ঘরে বসে কথা বলছেন।'

'আশ্চর্য। প্রথম যেদিন এসেছিলেন সেদিন মুখ গোমড়া কবে ছিলে।' অমবনাথ বাথরুমের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'খাবার দাও।'

বাইরের ঘরে বসে রমলা সেন বললেন, 'আমি তোমাকে কোন সাজেশন দেব না। সায়েন্স নেবে কিনা তুমিই ঠিক করবে। তবে যাই নাও মনে রেখো ভবিষ্যতে ওই পড়াটা যেন কাজে লাগে।'

'আমি ইংরেজি নিয়ে পড়তে চাই।'

'সেটা তো ইন্টার মিডিয়েটে সম্ভব না। গ্র্যাজুয়েশনের সময় তুমি অনার্স নিতে পার। চট

কবে ভেবে ফেলো না কি করবে। সময় আছে।'

'আমি কলেজে পড়াতে চাই বড় হলে।'

'পড়াবার মত যোগ্য হলে বল। বড় তো হয়েই গিয়েছ। কিন্তু কেন পড়াতে চাও? এখন পর্যন্ত এই প্রফেসনেই মেয়েরা নিরাপদ বলে? ছেলেরা যেসব চাকরি করছে তা করতে চাইবে না কেন? আমাদের সময়ে সুযোগ ছিল না তেমন, স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েরা শুধু মাস্টারি করার জন্যে পড়াশুনা করবে এই ব্যাপারটা আমি মানতে পারি না। অনেক দেরি হয়ে গেল। তোমার বাবা এখন নিশ্চয়ই স্নানখাওয়া করবেন। অঞ্জলিকে ডাকো, তাকে বলে যাই।' রমলা সেন ঘড়ি দেখলেন।

'তাহলে আপনাকে জানাবো কি করে?'

'কি ব্যাপারে?'

'শিলিগুড়িতে গেলে—।'

'ও হো। সোজা চলে যাবে। ওতে আবার জানানোর কি আছে। হয় বাড়ি নয় কলেজে থাকব। বইগুলো তুলে রেখে দাও। রবীন্দ্রনাথের সব কবিতা ওতে আছে। পড়ে মনে রাখবে। সমস্ত জীবন।' পাশেই ছোট ছোট কবিতার বই-এর স্তূপের ওপর হাত রাখলেন রমলা সেন। মাথা নেড়ে ভেতরে এল দীপা। অমরনাথ তখনও বাথরুমে। রান্নাঘরে এসে সে বলল, 'উনি চলে যাচ্ছেন। তোমাকে ডাকছেন।'

অঞ্জলি ভাতের হাঁড়িতে হাত দিয়েছিল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'বুধুয়াকে দেখেছিস?' দীপা মাথা নাড়ল, না। রান্নাঘরের দরজা টেনে বন্ধ করে দ্রুত চলে এল অঞ্জলি। যতটা শোভনভাবে বিদায় দেওয়া সম্ভব ততটাই শোভনতা বজায় রাখল সে। অস্টিন গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ামাত্র দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বাবার কি হয়েছে মা? কেমন গম্ভীরভাবে কথা বলছিল।'

অঞ্জলি ঠোঁট ওল্টালো। তারপর মনে পড়ে যাওয়ায় রান্নাঘরে ছুটল।

রাত তখন একটা। অঞ্জলি গালে হাত দিয়ে বসেছিল। খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে এগারোটা নাগাদ অমরনাথ কথা শুরু করেছিল। প্রায়-বিকেলে রান্নাঘরে কথা বলার সুযোগ হয়নি। অমরনাথ খেতে বসামাত্র মনোরমা এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

অঞ্জলি শেষ পর্যন্ত বলল, 'টাকাটা তুমি নিলে?'

'টাকা নয় চেক। না ভাঙালে কোন মূল্য নেই।' অমরনাথ বললেন।

'পঞ্চাশ হাজার?' সে আড়চোখে চেকটাকে দেখল। লকার থেকে বের করে নিয়ে এসেছেন অমরনাথ অঞ্জলিকে দেখাতে। অঞ্জলি বলল, 'আমার মাথা ঘুরছে গো। পঞ্চাশ হাজার টাকা এক সঙ্গে দিয়ে দিল?'

'বলছি তো টাকা নয়, চেক। না ভাঙালে কিস্যু দেয়নি। এখনও যদি ইচ্ছে করে ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিতে পারে টাকা দেওয়া বন্ধ করতে।'

'ও মা! তা করবে কেন?'

'মানুষের খেয়াল বলে কথা। তবে মনে হল লোকটা একদম পাল্টে গেছে।'

'বউ-এর খোঁজ নেয় না?'

'জিজ্ঞাসা করিনি। হরদেববাবু বললেন পাগলের শেষ স্টেজে পৌঁছে গেছে। যে-কোন দিন মরে যাবে। টাকা দিয়েই বোধ হয় দায়িত্ব খালাস করেছেন।'

'আর সেই ঝিটা? তাকে দেখলে?'

'না। সে বাইরে আসেনি। তবে প্রতুলবাবু সত্যি খুব অসুস্থ। কথাবার্তাও আগের মত বলতে পারছিলেন না। তুমি চিন্তা করতে পারছ ওঁর বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী তোমার মেয়ে।'

'বিশ লক্ষ ?'

'হরদেববাবু তাই বললেন। আরও বেশীও হতে পারে।'

'ও মাগো !'

'কিন্তু শোন, দীপা যদি জলপাইগুড়ির কলেজে না ভর্তি হয় তাহলে ওই পঞ্চাশ হাজারেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রতুলবাবু যেই বুঝবেন ওঁর পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে আমরা দীপার জন্যে খরচ করছি না, নিজেরাই ভোগ করছি সঙ্গে সঙ্গে হাত মুঠো করে ফেলবেন। আর একটা পয়সাও দেবেন না।'

'কিন্তু ওঁর টাকা আমরা নেব কেন ?'

'কেন নেব না। যে অন্যায় তিনি করেছেন, আমাদের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ছুঁড়ে ফেলেছেন তার দাম তাঁকে দিতে হবে না ?'

'টাকা দিয়ে সেই দাম শোধ করা যায় ?'

'যায় না। কিন্তু কিছু একটা তো দিতে হবে। এই টাকা দীপার ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করবে। ও অন্তত না খেয়ে মরবে না।'

'তা সেটা তো পঞ্চাশ হাজারেও হয়ে যায়।'

'এই না হলে স্ত্রীবুদ্ধি ! হাজাব হোক দীপা তো ও-বাড়ির বউ। ওর সম্পত্তি ঝি-এ. ছেলেরা ভোগ করুক এটা তুমি চাও ?'

'ও। কিন্তু মেয়েকে তো জানি। যেই জানবে তুমি প্রতুলবাবুর টাকায় ওকে পড়াচ্ছ সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে বসবে। হয়তো পড়াশুনাই ছেড়ে দেবে।'

'হুম্। ওই রমলা সেনই ওর বারোটা বাজিযেছে। তা সে-ব্যবস্থাও হয়েছে। টাকা যাবে এস সি রায়ের নামে। এস সি রায় গো ! যাঁর অনেক চা-বাগান আছে, খুব দানধ্যান করেন। জেলার মেধাবী ছেলেমেয়েকে পড়ার খরচ দেন। প্রতুলবাবু ওঁর সঙ্গে কথা বলে নেবেন। টাকা দীপার কাছে যাবে ওঁব নামে কিন্তু পাঠাবে ব্যাঙ্ক।'

'তাহলে ওকে শিলিগুড়িতে পাঠাচ্ছ না ?'

'না। শোন আমরা দীপাকে ভালবাসি। ওর ভাল চাইছি। কিন্তু আজ আমি তেমন কিছু করতে পারি না যাতে আমার দুই ছেলের ক্ষতি হয়। তা ছাড়া, এ তো পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনা, নেবই না বা কেন ? যাক, এসব কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। ও পড়াশুনা শেষ করুক। তদ্দিন অবশ্য মূল টাকায় আমরাও হাত দেব না।' অমরনাথ বিছানা থেকে নেমে চেকটা আবার লকারে তুলে রাখলেন।

সকালে দীপাকে ডাকলেন অমরনাথ, 'শোন, রমলা দেবী ভাল মানুষ। তোমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু তাঁর কাছে তোমাকে রাখলে তিনি টাকা পয়সা নেবেন না। সেটা ভেবেছ ?'

দীপা বলল, 'আমি টিউশ্যনি করব।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'না। পড়াশুনার সময় তোমাকে রোজগার করতে হবে না। জলপাইগুড়িতে একটা ফান্ড আছে। মেধাবী ছেলেমেয়ের পড়াশুনার খরচ সেই ফাণ্ড থেকেই দেওয়া হয়। তুমি এই ফর্মে সব কিছু লিখে সই করে দাও। আর সেই সঙ্গে এই ব্যাঙ্কের ফর্মেও। ওরা ব্যাঙ্ক থেকেই টাকাটা দেবে। এটা কারও দান নয়, নিজের যোগ্যতা দিয়ে যা উপার্জন করছ সেটা সব সময় গর্বের, কথাটা মনে রেখ। নাও, সই কর।'

॥ ১৭ ॥

জলপাইগুড়ি শহরে কেউ কখনও রাস্তা হারায় না। হোস্টেল থেকে কলেজ মাত্র পনের মিনিটের পথ। তবু দীপাকে হোস্টেলে পৌঁছে দেবার দিন অমরনাথ বারংবার সাবধান করে দিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। সেদিন দীপার একটুও ভয় ভয় করেনি। অমরনাথ যখন বলেছিলেন, 'কখনও তো তুই একা থাকিসনি আমাদের ছেড়ে, চিন্তা হচ্ছে সেই কারণে।'

'না। আমি তোমাদের ছেড়ে এর আগে থেকেছি।' মুখ নিচু করে বলেছিল দীপা।

কথা বলতে পারেননি আর অমরনাথ। যেন সপাটে চাবুক পড়েছিল মুখে। ওই অবস্থা কাটাতে দীপা বলেছিল, 'তোমাকে আমার জন্যে বেশী চিন্তা করতে হবে না। আমি ঠিক থাকব।'

চলে যাওয়ার আগে অমরনাথ তবু বলতে পেরেছিলেন, 'বাইরে বেশী ঘোরাফেরা করার দরকার নেই। কখনও কোন প্রয়োজন হলে আমাকে জানাস। আমরা ছাড়া কেউ দেখা করতে এলে দেখা করিস না। তুই তোর ঘরে যা, তারপর আমি যাচ্ছি।'

নিজেব ঘরে ফিরে এসে দৃশ্যটি দেখেছিল দীপা। খাটের ওপর উপুড় হয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছে মেয়েটা। গায়ের রঙ কালো, রোগা, শাড়িটি অবশ্য নিতান্ত কম দামী নয়। কি করা উচিত বুঝতে না পেরে তক্তাপোশের ওপর বসেছিল সে চুপচাপ। তখনও বিছানা খোলা হয়নি। ট্রাঙ্ক রয়েছে যেমন আনা হয়েছিল তেমনই। একটা তক্তাপোশ আর তার সঙ্গে টেবিল এই হল সম্বল। দেওয়ালে অবশ্য দুদিকে দুটো দড়ি ঝোলানো রয়েছে। মেয়েটিকে কাঁদতে দিয়ে সে নিজের বিছানা করে নিল। বিকেল নামব নামব করছিল। ও পাশের বাস্তায় রিক্‌শা সাইকেলের ঘন্টি অনর্গল বেজে যাচ্ছে। এই হোস্টেলটা তিনতলা। হোস্টেলের বড়দি সব নিযমকানুন শুনিয়েছেন। মহিলাকে দেখেই বোঝা যায় নিয়মের ব্যাপাবে কড়াকড়ি কবতে তাঁর খুব ভাল লাগে। নিয়মগুলো মানতে তার কোন আপত্তি নেই কাবণ কোন অসুবিধা তো হবে না।

দরজায় শব্দ হয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে দীপা দেখেছিল এক প্রৌঢ়া মহিলা দু-হাতে দুটো লুচির থালা নিয়ে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল। যে মেয়েটি কাঁদছিল তার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'প্রতি বছর এক কাণ্ড। দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল। পাস করে পড়তে আসা কেন বাপু যদি এত কান্না পায়।' দুজনের টেবিলে থালা নামিয়ে দীপাকে বলল সে, 'জল শুকালে খেয়ে নিতে বলো। তারপর ওই দরজার পাশে বারান্দায় থালা বের করে দেবে মনে করে। কুঁজো এনেছো ? এ মা, দুজনেই কুঁজো আনোনি ! দেখি, একটা আধুলি দেখি।'

'আধুলিতে কি হবে ?' দীপা অবাক।

'তেষ্টা পেলে নিচে গিয়ে জল খাবে ? রাতদুপুরে ? একটা কুঁজো এনে দিচ্ছি। আমার নাম মেনকা। দরকার হলে ডাকবে। দেখি দাও, বাইরে খাবাব রেখে এসেছি আরও পাঁচটা ঘরে ঘুরতে হবে। দাঁড়াবার সময় নেই। একটা কুঁজোয় দুজনের চলে যাবে। সিকিটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নিও।' মেনকা হাত বাড়িয়েই ছিল।

বাড়ি থেকে বের হবার সময় অঞ্জলি তিরিশটি টাকা দিয়েছিল। বইপত্র কেনার টাকা নিয়ে অমরনাথ সামনের সপ্তাহে আসবেন। খাতাপত্র এবং টুকিটাকি হাত খরচ যেন সে ওই

টাকা থেকেই করে নেয়। কিন্তু পুরো টাকা যেন সে খরচ না করে যদ্দিন না ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আসে। দীপা সেই সঞ্চয় থেকে একটি টাকা দিয়েছিল মেনকার হাতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই একটি জলভর্তি কুঁজো আর আধুলি ফেরত দিয়ে গিয়েছিল সে।

লুচি গোটা চারেক আর আলুর তরকারি। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল লুচি মিইয়ে রয়েছে। দীপা মেয়েটির দিকে তাকাল। এ ঘরে মেনকা ঢুকে কথা বলার পর থেকে তার কান্নার আওয়াজ কমেছিল। এখন শুধু বড় বড় নিঃশ্বাসের সঙ্গে পিঠ কাঁপছে। শেষপর্যন্ত দীপা না ডেকে পারল না, 'শোন, এই যে!' মেয়েটি মুখ তুলল না। তক্তাপোশ ছেড়ে দীপা উঠে এল কাছে, 'তোমার খাবার দিয়েছে।' হঠাৎ মেয়েটি ককিয়ে উঠল, 'আমি খাব না, কিছু খাব না।'

দীপা কথা না বাড়িয়ে নিজের টেবিলের কাছে চলে এল। একটা কাঁসার গ্লাস দিয়েছে অঞ্জলি। সেটা রয়েছে ট্রাঙ্কে। চাবি দিয়ে তালা খুলে গ্লাসে জল ভরে লুচিতে হাত দিল সে। শক্ত হয়ে গেছে এর মধ্যে। ছিঁড়তে অসুবিধে হচ্ছিল। এমন স্বাদের তরকারি কখনও খায়নি সে। মনোরমা বারংবার বলে দিয়েছেন আজ সকালে যতটুকু এড়ানো সম্ভব ততটুকু এড়িয়ে সে যেন নিরামিষ খায়। হোস্টেলে যে তার জন্যে কেউ আলাদা করে নিরামিষ রেঁধে দেবে না এটা বুঝতে পারার পর কদিন থম ধরেছিলেন তিনি। নিজের মনেই বিড়বিড় করেছেন কাল রাত্রে, 'পেঁয়াজ তো এড়ানো যাবে না, মাছ মাংস ডিম চোখে দেখা যায়, সেগুলো না খেলেই হল। হিন্দুর মেয়ে মরে গেলে ভগবানের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।'

কোন ভগবান? কি নাম তাঁর? গতকাল এ সব প্রশ্ন করেনি সে। করতে ইচ্ছে হয়নি শেষরাত বলে। যে দিন তেজেন্দ্রর সঙ্গে বাঘ না দেখে ফিরে এসেছিল সেদিন মনোরমার সঙ্গে খাওয়া নিয়ে একপ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল তার। বিধবাদের মাছ মাংস ডিম কেন খেতে নিষেধ বলে মনে করেন মনোরমা। যে মানুষটা মারা গেছে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ওসব যারা ত্যাগ করেছে তাদের তো সতী হওয়া উচিত। বেঁচে থাকাই অন্যায়। কোন স্বামী যখন স্ত্রীর মৃত্যুর পরে নিরামিষ খায় না তখন নির্বোধ মেয়েরাই নিজেদের বঞ্চিত করবে! মাছ মাংস ডিম খেলে শরীর যদি উত্তেজিত হয় তাহলে যেকোন কুমারী মেয়েরও তো তাই হয়। তাকে তো কেউ নিষেধ করে বলে না নিরামিষ খেতে। যে লোকটাকে শুধু করুণা ছাড়া কিছু করা যায় না সে মারা যাওয়ার পর কোন পাপ হবে না যদি আমিষ খাওয়া হয়। কিন্তু সে এই বাড়িতে নিরামিষ খাবে কারণ মনোরমা তাতে খুশী হবেন। যদিও এটা একটা অন্ধ সংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া তবু সে মনোরমাকে দুঃখ দেবে না। এসব কয়েকমাস আগের কথা। তারপর এ ব্যাপারে একদম চুপচাপ ছিলেন মনোরমা। কিন্তু গতরাতে নিজের মনে বিড়বিড় করতে ছাড়েননি যদি কথাগুলো তার কান দিয়ে মনে ঢুকে যায়। হেসে ফেলল দীপা। যতই বিশ্রী স্বাদ হোক তবু তো স্বাদবদল। কষ্ট করেই প্লেটটা শেষ করল সে।

জল খেয়ে নিজের তক্তাপোশে ফিরে দীপা দেখল মেয়েটা উঠে বসেছে। ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে রয়েছে। দীপা বলল, 'তোমার খাবার পড়ে আছে।'

মেয়েটা চোখ খুলল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জলের ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। দীপা জিজ্ঞাসা না করে পারল না, 'কি হয়েছে তোমার?'

মেয়েটি মুখ ফেরাল, 'আমার এখানে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'কেন?'

'আমি কখনও একা একা থাকিনি।' মেয়েটি ঠোঁট কামড়াল।

'সে তো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।'

'কিন্তু আমার বাবা জোর করে আমাকে পড়তে পাঠিয়েছে।'
'তোমার পড়ার ইচ্ছে ছিল না?'
'না। কেন যে আমি সেকেণ্ড ডিভিশন পেয়েছিলাম!'
'কোথায় বাড়ি তোমার?'
'আলিপুরদুয়ার।'
'তোমার বাবা নিশ্চয়ই ভাল চান।'
'মোটেই না। আমার চেহারা খারাপ, গ্র্যাজুয়েট না হই আই এ পাস না হলে আমার বিয়ে হবে না। বাবা একটা ছেলে ঠিক করে রেখেছে। পনের হাজার টাকা নগদ, বিশভরি সোনা, একটা সাইকেল, আলমারি খাট আর একশজন বরযাত্রী ছাড়া আমাকে অন্তত আই এ পাস হতে হবে। বাবা তাই জোর করে এখানে পড়তে পাঠিয়েছে। আগে জানলে আমি স্কুল ফাইনালে ঠিক ফেল করতাম।' মেয়েটির মুখ-চোখে এখন রাগ মিশছে। কান্নার ছায়া নেই।
'তোমার বাবা কি করেন?'
'ব্যবসা। বাবা মুখে যতই বলুক আমাকে আই এ পাস করাতে চায় কিন্তু আমি জানি কেন আমাকে এত দূরে হোস্টেলে রাখা হল। কুচবিহার তো কাছে ছিল। সেখানকার কলেজে আমাকে ভর্তি করল না কেন?'
'কেন?' দীপার এখন মজা লাগছিল ওর সঙ্গে কথা বলতে।
'সেটা তোমাকে বলতে পারব না।' মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে নিল।
'লুচিগুলো খেয়ে নাও।'
অত্যন্ত অনিচ্ছায় প্লেটের দিকে হাত বাড়াল মেয়েটি। লুচি ছিঁড়তে গিয়ে বলল, 'এম্মা, তো একদম চামড়া। কি করে খাব? তুমি খেয়ে নিয়েছ?'
'খিদে পেলে খেতে হবেই।'
'তোমার বাড়ি কোথায়?'
'চা-বাগানে।'
মেয়েটি অর্ধেকটা কোনমতে খেল। তারপর প্লেটটা দরজার বাইরে বের করে দিয়ে এল। অর্থাৎ একটু আগের কথাবার্তা ওর কানে গিয়েছে। দীপা আশা করছিল নিজে থেকেই চার আনা পয়সা দিয়ে দেবে মেয়েটা। কিন্তু জল খাওয়ার পর মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কি? আমার নাম মায়া মিত্র।'
'দীপাবলী ব্যানার্জী।'
'ওমা, তুমি ব্রাহ্মণ? আচ্ছা, মেয়েদের কি বামুন বলে? ব্যাটাছেলেরাই তো বামুন হয়।'
'জানি না।'
'ও। আচ্ছা, আমি শুয়ে পড়ি। আমার খুব মন কেমন করছে।' বলে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মায়া। মাঝেমাঝেই তার ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে আসছিল।
যে কথাটা মায়া প্রথম আলাপে বলতে চায়নি সেটা দিন তিনেকের মধ্যে হোস্টেলের সবাই জেনে গিয়েছিল। আলিপুরদুয়ার স্কুলের টিচার মায়াকে বাড়িতে এসে পড়াতেন। মায়া তার লভে পড়েছে। সেই টিচার ভদ্রলোক জাতে মাহিষ্য। এই কারণে মায়ার বাবা সেই লভ মেনে নিতে পারেননি। একদম জলপাইগুড়ির কলেজে মেয়েকে ভর্তি করেছেন যাতে টিচারের সঙ্গে দেখাশোনা না হয়। যেদিন প্রথম ব্যাপারটা ধরা পড়ে সেদিন নাকি তিনি গৃহশিক্ষককে জুতোপেটা করেছিলেন। নেহাত হ্যামিলটনগঞ্জের পাত্র নিদেনপক্ষে

আই এ পাস মেয়ে চায় তাই মায়াকে কলেজে পড়ানো। ভদ্রলোকের ধারণা মাতুল বংশের রূপ পেয়েছে মায়া। শ্বশুরবাড়ির টাকায় তিনি ব্যবসা শুরু করেছিলেন বলে যে কৃতজ্ঞতাবোধ অবশিষ্ট আছে তাই দিয়ে মেয়েকে পড়াচ্ছেন তিনি। মেয়ে তো বটেই গৃহশিক্ষককেও সাবধান করে দিয়ে এসেছেন সে যেন জলপাইগুড়ি শহরে ওই দু বছরে পা না দেয়। তিনদিনেই খবরটা চাউর হয়ে গেল। করল মায়া নিজেই। মেয়েটা খুব বোকা। নইলে কেউ বলে বেড়ায় যে তার বাবাও স্কুল ফাইনাল পাস করেনি। দ্বিতীয় দিন দুপুরে মায়া কলেজ থেকে ফিরে প্রশ্ন করেছিল, 'দীপাবলী, তুমি কখনও লভে পড়েছ?'

চমকে তাকিয়েছিল দীপা। তারপর হেসে বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'ওম্মা! তাই। কে গো? কোথায় থাকে?'

'কার কথা বলছ?'

'তুমি যার লভে পড়েছ!'

দীপা হেসে ফেলল, 'আমি প্রথম লভে পড়ি আমার মায়ের। তারপব বাবার। তারপর ঠাকুমার। তারপর চা-বাগানের, গাছপালার, আঙরাভাসা নদীর।'

'দুর! এ সব কে জিজ্ঞাসা করেছে। তুমি কোন ছেলের লভে পড়নি?'

দীপা মাথা নেড়ে না বলল। মায়া নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আজ কলেজে গিয়ে আমি কোন ছেলের দিকে তাকাইনি। একজন লাভার থাকতে অন্য কারো দিকে তাকাতে নেই। তুমি তো দেখতে ভাল, দেখবে এখানে তোমার লভে অনেকে পড়বে।'

মায়ার এই বোকামিতে সে অনেকের রসিকতার পাত্রী হয়ে উঠল। হোস্টেলে যারা সেকেণ্ড অথবা থার্ড ইয়ারের ছাত্রী তাদের ক'জন ওকে দেখতে পেলেই মজা কবাব চেষ্টা করত। এই তো গতকালই তাদের ঘরে ভিড় জমেছিল। দারোয়ান এসে দীপাব হাতে খামটা দিয়ে গিয়েছিল। নীলরঙেব খাম। ওপরে মায়ার নাম লেখা।

সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী মেটেলির শীলা মুখার্জির মুখে কোন কথা আটকায না। সে দীপার হাত থেকে খামটা ছিনিয়ে নিয়ে নাকেব নিচে ধবল, 'উঃ, কি সুন্দব গন্ধ রে মায়া।'

মায়া খুব রেগে গেল, 'আঃ, আমার চিঠি নিয়ে তোমরা ইয়ার্কি করছ কেন? দাও, দাও বলছি।' সে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সবাই মিলে তাকে ধবে তক্তাপোশে বসাল। শীলা বলল, 'চিঠি দেব, আগে বল গন্ধটা কিসেব?'

'কান্তা সেন্টের।'

'কি করে জানলি?'

'না জানলে বলছি কি করে! দাও চিঠি।'

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরে জমা হওয়া অন্য মেয়েরা চিৎকার করতে লাগল তারা চিঠির বিষয়বস্তু শুনবে। সবাই মিলে মায়াকে নানাভাবে বোঝাতে লাগল। দীপা চুপচাপ ব্যাপাবটা দেখছিল। হঠাৎ ওর মনে হল মেয়েরা প্রেমে পড়লে কি বোকা হয়ে যায়? নাকি বোকা মেয়েরাই প্রেমে পড়ে? বিশু খোকন বা ওদের বন্ধুবান্ধবদেব মুখ মনে পড়ল। সে তো কখনও কারও প্রেমে পড়েনি। দীপা শুনল মায়া রাজী হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শর্ত কবিয়ে নিচ্ছে, এই প্রথম আর শেষবার। আর কখনও যেন শীলারা তার চিঠি পড়তে না চায়। সবাই এককথায় রাজী হয়ে গেল। শীলা চিঠিটা মায়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর চিঠি তুই পড়, আমরা তোর মুখ থেকে শুনব।'

দীপা দেখল খামটা হাতে নিয়ে মায়ার মুখ লজ্জায় ভরে উঠল। সযত্নে খামের মুখ খুলল সে। একটা কালো রোগা মেয়ের মুখে এত জ্যোতি জ্বলতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা

যেত না। সন্তর্পণে ভেতর থেকে ভাঁজ করা কাগজটাকে বের করে আনল মায়া। সেটাকে টানটান করতে কি যেন খসে পড়ল কোলের ওপর। শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কিরে ?'

চট করে বস্তুটি তুলে ব্লাউজের ভেতর চালান করে দিয়ে মায়া বলল, 'কিস্যু না।'

'এম্মা, তুই আমাদের বলবি না ? কি রে ওটা !'

চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট কামড়াল মায়া, 'গোলাপফুলের পাপড়ি।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাসির তুবড়ি যেন ছিটকে উঠল ঘরে। এবং দরজায় এসে দাঁড়াল মেনকা, 'বড়দি চিৎকার করতে নিষেধ করছেন। আর তোমাদেরও বলি, একটা হাবাগোবা মেয়েকে নিয়ে মজা করছ। ওকে থাকতে দাও ওর মতন।'

শীলা বলল, 'হাবাগোবা ! মেনকাদি, তোমার কোন লাভার ছিল ?'

মেনকা আর দাঁড়াল না। শীলা বলল, 'নাও, আরম্ভ কর।'

মেনকাকে দেখার পর থেকেই মায়ার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। সে বলল, 'না, বাবা, বড়দি যদি জানতে পারে তাহলে বাবাকে লিখে দেবে। আর বাবা যদি একবার খবর পায় তাহলে ওকে মেরে ফেলবে।'

শীলা আশ্বস্ত করল, 'কেউ জানবে না। পড় তো চিঠিটা। আমরা আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।'

মায়া চিঠিটা পড়ল, 'আমার প্রাণাধিকাসু, তোমার অদর্শনে আমি অসহায় হয়ে পড়ে আছি। তুমি অশোকবনে বন্দিনী সীতা। কিন্তু রামের একজন দূত ছিল, তার নাম হনুমান। আমার তো কেউ নেই। একমাত্র ডাকবিভাগ ছাড়া। অতএব অসীম সাহসে তাহারই শরণাপন্ন হলাম। জানি না এই চিঠি তোমার হাতে পৌঁছাবে কি না। যদি পৌঁছায় তাহলে বুঝব ঈশ্বরের হৃদয়ে প্রাণ আছে। প্রথমে বলে রাখি, আমার চোখে ঘুম নাই, আহারে প্রবৃত্তি নেই, প্রাণ আছে বলেই রাখা। নইলে এই পোড়া জীবন কে বইত ! যতদিন তুমি পৃথিবীতে কুমারী অবস্থায় থাকবে ততদিন এই প্রাণ শরীরে থাকবে।

'মায়াবতী। তোমার বাবা একটি চীজ। তিনি আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারেন না। তোমাকে তিনমাস পড়িয়েও আমি মাইনে পাইনি তাঁর কাছ থেকে। অজুহাতটা তিনি কাজে লাগিয়েছেন। যে লোকটির সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয়েছে সে তোমাকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে যে গৃহশিক্ষক আছেন তাঁকে ছাড়িয়ে দেবে। সেইজন্যে অন্তত আই এ পাস চাইছে যাতে নাইন টেনের ছেলেমেয়েকে পড়াতে পার। বুঝতেই পারছ, তোমাকে নয় একজন বিনি পয়সার গৃহশিক্ষক চাইছে ওরা।

'মায়াবতী। আমার শিরায় শিরায় শুধু তুমি। তোমাকে ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না। তোমার বাবা, কিছু মনে করো না, খুব বদমায়েস। তার সঙ্গে লড়তে হলে সোজা পথে হবে না। আমাকেও বাঁকা পথ নিতে হবে। এখন তুমি বল রাজী আছ কিনা ? তোমাকে ঠিক করতে হবে কাকে চাও ? আমাকে না তোমার বাবাকে ? যদি আমাকে চাও তাহলে আমার পরিকল্পনামত কাজ করতে হবে। মনস্থির করে আমাকে জানাও। তুমি স্কুলের ঠিকানায় আমাকে চিঠি দেবে না। জগদীশ স্টোরসের ঠিকানায় দেবে। প্রাণাধিকা, তোমার চিঠির আশায় আমি বিরহী যক্ষের মত পথ চেয়ে আছি। আসমুদ্র হিমাচল ভালবাসা বুকে নিয়ে তোমারই জগন্নাথ।'

মায়া যখন চিঠিটা পড়া শুরু করেছিল তখন তার গলা কাঁপছিল। শেষে অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছিল তার পড়ার ধরন। সেইভাবেই সে শেষ করল। যারা চিঠির বয়ান শুনছিল তারা আচমকা চুপ হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত শীলা বলল, 'বাবাঃ, কি ভালবাসা।

লায়লামজনুকেও হার মানিয়ে দেয়। তোকে আমাদের হিংসে হচ্ছে মায়া।'

'তোমার হলে হতে পারে, অন্য সবাইকে জড়াচ্ছ কেন ?' মায়া চিঠি ভাঁজ করল।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই চেঁচিয়ে উঠল, তাদেরও হিংসে হচ্ছে। শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে তোর সঙ্গে এত জমলরে ?'

'প্রথমে আমার ভাইকে পড়াতে এসেছিল। তারপর আমাকে। দ্বিতীয় হপ্তায় বই-এর ভাঁজে আমাকে চিঠি দিল, তারপর থেকেই।' আবার বেগুনি হল মায়া।

'কি লিখেছিল সেই চিঠিতে ?'

'রিক্ত আমি নিঃস্ব আমি কিছু আমার নাই, চাও যদি ভালবাসা দেব ঢেলে তাই।'

হাততালি বাজল। সবাই যতই ইয়ার্কি করুক, দীপার মনে হচ্ছিল এই কালো মেয়েটাকে কেউ সত্যি ঈর্ষা করছে। হঠাৎই মায়া যেন সবার থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে।

মাঝরাতে হাতের ঠেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেল দীপার। মায়া তার ওপর ঝুঁকে আছে, 'শোন, তুমি একটু উঠবে ? আমার একা জেগে থাকতে ভাল লাগছে না।'

'জেগে আছ কেন ? ঘুমিয়ে পড়।'

'ঘুম আসছে না।' মায়া দ্রুত মাথা নাড়ল।

'কেন ?'

'চিঠিটা লিখতে পারছি না। ওকে তো জবাব দিতে হবে। কিছুতেই ঠিকমত কথা সাজাতে পারছি না। কি বলে সম্বোধন করব তাই মাথায় আসছে না।'

'তুমি এর আগে ওঁকে কখনও চিঠি লেখনি ?'

'না। ও তো এই আমাকে দ্বিতীয়বার লিখল।'

'শীলাদির কাছে যাও।'

'না বাবা। ওরা আমাকে নিয়ে শুধু ঠাট্টা করে। একমাত্র তুমি কিছু বলোনি।'

মায়া এমন মিনতি করতে লাগল যে উঠে বসতে হল দীপাকে। তার সামনে জগন্নাথবাবুর চিঠি। সেই চিঠির কাগজে কাস্তা সেন্টের মৃদু গন্ধ। মায়া তাকে প্রায় বাধ্য করছে চিঠির উত্তর লিখে দিতে। মায়ার মূল বক্তব্য জগন্নাথ যে পরিকল্পনাই নিক তাতেই মায়ার সায় আছে। জগন্নাথকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে। দীপা বলেছিল, 'এই কথাগুলোই তুমি লিখে দাও না।' মায়া মাথা নেড়েছিল, 'খুব রেগে যাবে ও। আমাকে বলেছে যে চিঠি আমি লিখব তা যেন খুব বড় হয়। নইলে ও রেগে যাবে।'

অতএব দীপা মধ্যরাতে কাগজপত্র নিয়ে বসেছিল। জীবনে যে প্রেমে পড়েনি সে কি করে প্রেমপত্র লিখবে। তিন তিনটে মকসো করে ছিঁড়ে ফেলল দীপা। এবং তখনই দেখতে পেল বালিশে মাথা রেখে মায়া ঘুমিয়ে পড়েছে অথচ ওই কালো মেয়েটার মুখে কি নরম প্রসন্নতার আলো জড়ানো। দীপা উঠল। তারপর রমলা সেনের দেওয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইগুলো নিয়ে এল। একটার পর একটা লাইন, কত তার অর্থ, কিন্তু কোনটাই বোকা বোকা নয়। জগন্নাথের চিঠির উত্তর কি রবীন্দ্রনাথের লাইন সাজিয়ে দেবে ? অনেক ভেবেচিন্তে সে নিজের মত করে একটা চিঠি লিখল।

'প্রিয় জগন্নাথ, তোমার চিঠি এল এক ঝলক হাওয়ার মত আমার এই বদ্ধ জীবনে। গভীর জলে যে ডুবে থাকতে বাধ্য হচ্ছিল তাকে এক নিমেষে ওই চিঠি তুলে নিয়ে এল আলোর রাজ্যে। আমি কবিতা লিখতে পারি না। মিল মিলিয়ে দুরূহ ছন্দে লিখতে যে ক্ষমতা লাগে তা আমার নেই। আমি এক সাধারণ মেয়ে। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন নিতান্তই অবহেলায়। ঘাসের বুকে শিশিরের যে সৌন্দর্য তাও তো আমার নেই। শুধু

বঞ্চিত আর অবহেলিতদের দলে ভিড় বাড়াতেই আমার জন্ম হয়েছিল। এই অভাগীর জীবনে তুমি নিয়ে এসেছিলে অমৃত। তুমি আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব।

'এখন অনেক রাত। সমস্ত পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার এই পোড়া চোখে শুধু জল। কবে সূর্য উঠবে? তোমার চিঠির আশায় আমি দিন গুনব। ইতি তোমার—।'

এই পর্যন্ত লিখে থমকে গেল দীপা। কি লেখা যায়? প্রাণাধিকা? দূর! সেবিকা বা প্রণতা খুব ঘাটপৌরে হয়ে যাবে। অথচ চিঠিটা শেষ করা যাচ্ছে না, একটা জম্পেশ শব্দ না পেলে। সে উঠে বসল। এবং তখনই শরীরে জমে থাকা আলস্য মাথা তুলল। সারাটা রাত কেটে গেছে। পাশের বিছানায় মায়া এখন অঘোরে ঘুমাচ্ছে। জানলার বাইরের আকাশের রঙ ফিকে হয়ে আসছে। দীপা শেষ করল চিঠিটা, ইতি তোমার একেশ্বরী মায়াবতী। লেখামাত্র সে হেসে ফেলল। এই চিঠির ভাষায় প্রভাবতী দেবী সরস্বতীও গল্প লিখতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকারা এই ভাষায় ভাবতে পারত। তাহলে সে কেন চিঠিটা এইভাবে লিখতে গেল? রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে যেখানে একা টেনে নিয়ে গিয়েছেন সেখান থেকেই তো তাদের লেখালেখি করা উচিত। যদি বঙ্কিমে ফিরে যেতে হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের কি দরকার ছিল? চিঠিটা ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়ল না সে। দ্বিতীয় কাগজটার ওপর উপুড় হল—'প্রিয় জগন্নাথ, তোমার চিঠি পেয়েছি। নীল রং এবং সুগন্ধ আরও অনেককেই আকর্ষণ করেছিল। নতুন বাসস্থানে ঠিকঠাক গুছিয়ে ওঠার সময় তোমার চিঠিতে খুব উৎসাহিত হলাম। তোমার সঙ্গে জীবন যোগ করেছি, অতএব আমাকে প্রশ্ন কেন? যা করার তুমি করবে আমি কখনও হাত সরাবো না। ভাল থাকবে। তোমারই মায়াবতী।'

মায়া প্রথম চিঠিটাই পোস্ট করেছিল কলেজে যাওয়ার পথে। দ্বিতীয় চিঠিটা সম্পর্কে সে বলেছিল, 'এরকম চিঠি তুমি কি করে লিখলে? যে ছেলে পাবে সেই পালাবে। কি সুন্দর লাইন প্রথম চিঠিটায়। ও পড়ে খুব ভাববে, কি করে আমি এত সুন্দর চিঠি লিখলাম।'

'তাহলে তুমি খুব অন্যায় করেছ মায়া। যাকে এত ভালবাস তাকে তো এক ধরনের ঠকানো হচ্ছে। তাই না?'

'ওমা, ঠকানো হবে কেন? আমার মনের কথা তুমি লিখে দিচ্ছ। তুমি কি বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা লিখছ ওকে। সত্যি যা তা সবসময় লেখা যায়।'

দীপা হকচকিয়ে গেল। সে যখন চিঠি লিখছিল তখন মায়া ঘুমিয়ে ছিল। অন্তর্যামী না হলে কারো মনের কথা জানা যায়? অথচ এ কারণে তার মোটেই গর্ব হচ্ছিল না। দীপা বলল, 'এর পরেরবার যখন উত্তর লিখবে—।'

'আমি লিখব নাকি? তোমাকে লিখে দিতে হবে। তুমি অপেক্ষা কর, এই চিঠির উত্তরে ও কি লেখে। সেই জবাব পড়ার পর তোমাকে আরও গভীর ভাষায় ওকে ডুবিয়ে দিতে হবে। পুরুষ মানুষ বলে কথা, বিশ্বাস নেই তো!'

আজ কলেজ চত্বরে প্রচণ্ড মারপিট হল। ছাত্র ফেডারেশন ধর্মঘট ডেকেছিল। বিধান রায়ের পুলিশ কলকাতায় গুলি চালিয়ে কয়েকজনকে খুন করেছে। তারই প্রতিবাদে কলেজ গেটে বিক্ষোভ দেখানো হচ্ছিল। এইসময় কংগ্রেসের ছেলেরা জোর করে ঢুকতে যায়।

কলেজের উল্টোদিকে বাগচী বাড়ির দোতলায় দাঁড়িয়ে ওরা দৃশ্যটা দেখছিল। আজ ধর্মঘট। অথচ হোস্টেলের ঘরে ঘরে সার্কুলার দেওয়া হয়েছিল যারা ধর্মঘট করে ঘরে বসে

থাকবে তাদের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। একমাত্র গায়ত্রী ছাড়া সবাই কলেজে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পড়েছে। গায়ত্রী মনে করে ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতি করা উচিত। এম·এ· পাস করতে গেলে অন্তত একুশ বাইশ বছর হয়ে যায়। ওই বয়স পর্যন্ত একটা মানুষ রাজনীতির ধারে কাছে থাকবে না অথচ তার পরেই রাজনীতির পাকে জড়াতে হবে এ কেমন কথা! যেহেতু ছাত্ররাই দেশ গঠন করে তাই তাদের রাজনীতি করা উচিত। গায়ত্রী অনেককেই বোঝাতে চেষ্টা করেছিল আজ ক্লাস হতেই পারে না। সেক্ষেত্রে হোস্টেল ছেড়ে বেরিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু এরকম একটা ছুটি পেলে কেউ ছাড়ে না। সিনেমা হলগুলোর ম্যাটিনি শো প্রায় ভর্তি হয়ে গেল। কেউ কেউ দল বেঁধে অকারণে শহর ঘুরতে লাগল। দীপারা চলে এসেছিল কলেজের সামনে। সেখানে তখন আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্রনেতারা মাথার ওপরে হাত ছুঁড়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলছে। এইসময় মায়ার নজরে পড়েছিল মিতা হাত নেড়ে ডাকছে। কলেজের উল্টোদিকের বাগচী বাড়ির মেয়ে মিতা। একদিনই ওর সঙ্গে গিয়েছিল। দীপারা তিন চারজন সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছিল মিতাদের বাড়িতে। মিতার মা অনুযোগ করেছিলেন, 'আজ তো গোলমালের দিন, তোমরা বেরুলে কেন?'

'হোস্টেলে থাকলে তাড়িয়ে দেবে।' দীপা হেসে বলেছিল।

'তার মানে?'

দীপা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে তিনি বলেছিলেন, 'এ ভারি অন্যায় কথা।'

দোতলা থেকে বিক্ষোভ দেখতে দেখতে মায়া বলেছিল, 'ঠিক যাত্রা দেখছি এরকম মনে হচ্ছে না তোদের?

মিতা বলল, 'আমার দেখতে দেখতে চোখ পচে গেছে। ওই যে ওই ছেলেটাকে দেখছিস, পাজামা পাঞ্জাবি পরা, ও না এককালে খুব নামকরা গুণ্ডা ছিল। এখন একদম পাল্টে গিয়েছে।'

মায়া বলল, 'এই দীপাবলী, ওই ছেলেটা কে?'

মিতা জানতে চাইল, 'কোন ছেলেটা?'

মায়া আঙুল তুলতে গিয়ে সামলে নিল, 'ওই যে বাঁ দিকে। লাল জামা পরে এদিকে তাকিয়ে আছে। ইনকিলাব বলছে না।'

মিতা ঠোঁট ওল্টালো, 'ও পল্লব। দীপাবলীকে খুব দ্যাখে বুঝি? আমাকেও দেখত। আমি পাত্তা দিইনি। সমবয়সী ছেলের সঙ্গে বাবা প্রেম করা।

মায়া জিজ্ঞাসা করল, 'তুই এর আগে প্রেম করেছিস?'

'এর আগে মানে?' মিতা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল তার মা কাছাকাছি আছে কিনা।

'পল্লব, মানে ওই ছেলেটার আগে?'

'দুর। ওকে কে পাত্তা দেবে। দু বছর থেকে তো দেখছি, একটু ভাল দেখতে মেয়ে এলেই ও ড্যাবড্যাব করে তাকায়। তবে আজ পর্যন্ত আমি নটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করেছি। দুবার ধরা পড়েছি।' মিতা হাসল।

'নটা?' মায়া যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে বাঁ হাতে দীপাকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'নবার প্রেমে পড়া যায় নাকি?'

'কেন যায় না?' মিতা যেন অপমানিত বোধ করছে।

'বাঃ, প্রেম হল মন দেওয়া নেওয়া। একবার কাউকে মন দিয়ে দিলে নিজের কিছু থাকে নাকি?' মায়ার বিস্ময় বাড়ছিল।

'ঠিক আছে। কাউকে না হয় আমি মন দিলাম। সে কিছুদিন পরে আমাকে আমার মন ফেরত দিয়ে গেল। কিংবা আমি দেখলাম সে এমন অযত্ন করছে যে তার কাছে আর মন রাখা যায় না। ফেবত নেবার পর আমার মনটাকে যদি সাফসুফ করে আবার কাউকে দিই তাহলে তোর আপত্তি কি?' মিতা জানতে চাইল।

'ওমা, সেটা তো বিধবা বিধবা ব্যাপার।' মায়ার মুখ থেকে কথাগুলো বের হওয়ামাত্র দীপা প্রচণ্ড নাড়া খেল। ততক্ষণে মিতা এবং অন্য বন্ধুরা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আর তখনই কলেজের সামনে মারপিট শুরু হয়ে গেল। চিৎকার চেঁচামেচিতে স্লোগান বন্ধ হল। এর মধ্যে কোথা থেকে পুলিশ এসে লাঠি চালাতে লাগল। সেদিকে একটু নিস্পৃহ চোখে তাকিয়ে মিতা বলল, 'হয়ে গেল। আর দশ মিনিট। তাবপরেই নাটক শেষ। ওরকম হম্বি তম্বি হয় যেন কত কি না হবে, কিন্তু একটাবও হাত পর্যন্ত ভাঙে না।'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখান থেকেই সব দ্যাখো, না?'

'ক্লাস এইট থেকে দেখতাম। আজকাল দেখি না।'

'কেন?'

'বললাম না স্কুল কলেজের ছাত্রদের গায়ে মায়ের আঁচলেব গন্ধ লেগে থাকে। দুমিনিট পরে আর কথা বলাব বিষয় খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি যা ভাবি তা ওরা ভাবতে পাবে না। ঠিক করেছিলাম এবার প্রেম কবলে অন্তত দশ বছরেব বড লোকের সঙ্গে প্রেম করব।'

মায়া বলল, 'ওম্মা, সে তো অনেক বড হবে বে!'

মিতা মাথা নাড়ল, 'কিন্তু কপাল খারাপ। বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে আমার। এ জীবনে সম্ভবত আব প্রেম কবা হবে না।' মিতা কথা শেষ করামাত্র মায়া চিৎকার করে উঠল, 'সে কি রে! কবে তোব বিয়ে? বর কোথাকার? প্রেম করে বিয়ে?'

'আঃ! আস্তে কথা বল। বব কলকাতায় থাকে। বড অফিসার। আমার চেয়ে আট বছরেব বড়। দেখিইনি তো প্রেম করব কি! যার সঙ্গে প্রেম কববি তাকে খবরদার বিয়ে কববি না। বিয়ে মানে প্রেমের মৃত্যু। প্রেম হল রোমান্টিক ব্যাপার, বিয়ে একটা প্র্যাকটিকাল প্রয়োজন। বুঝলি?'

এইসময় দীপা চিৎকার কবে উঠল, 'এইরে, পল্লবকে মারছে!'

ওবা সবাই হুমড়ি খেয়ে দেখল দুটো পুলিশ পল্লবকে লাঠিপেঠা করছে। সে মাটিতে পড়ে যেতে ওরা অনাদিকে ছুটল। এখন বিক্ষোভকাবীরা কেউ নেই ধাবে কাছে। শান্তি ফিরিয়ে এনে পুলিশেব ভ্যান পাহারায় কয়েকজনকে রেখে চলে গেল থানায়। দীপারা দেখল পল্লব উপুড় হয়ে পড়ে আছে কলেজেব গেটের সামনে। সে বলল, 'মরে গেছে নাকি? চল, দেখবি গিয়ে?'

'আমরা গিয়ে কি কবব? ব্যাটাছেলেদের ব্যাপার।'

মায়ার কথার প্রতিবাদ করতে গিয়েই দীপা থমকে দাঁড়াল। কোথা থেকে চারটে ছেলে ছুটে এসে পল্লবকে তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল! এখন সব চুপচাপ। আর আড্ডা জমছে না। ওরা হোস্টেলে ফিরে যাওয়ার জন্যে নিচে নামল। আট দশটি ছেলে বাগচী বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে স্লোগান দেওয়া শুরু করল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ। অসহায় ছাত্রের ওপর পুলিশের লাঠি চালানোর প্রতিবাদে আগামীকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ধর্মঘট।'

আটদশ মিছিল করে হাঁটতে শুরু করল। হঠাৎ ওদের দলের একজন এগিয়ে এল সামনে, 'আপনারা তো আমাদের কলেজের ছাত্রী?'

দীপা মাথা নাড়ল। ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'পুলিশ যে লাঠি চালিয়েছে তা দেখেছেন !' দীপা নীরবে হ্যাঁ বলল। ছেলেটি বলল, 'তাহলে আমাদের দলের সঙ্গে হাঁটুন। আসুন।'

দীপা বন্ধুদের দিকে তাকাল। মায়া বলল, 'আমি যাব না।' অন্যান্যরাও সেই মত জানাল। ছেলেটি মাথা নেড়ে ছুটে গেল ধ্বনি দিতে দিতে যাওয়া তার সতীর্থদের ধরতে। দীপার ইচ্ছে করছিল পল্লবের কথা জিজ্ঞাসা করতে। লাঠি তার ওপরেই পড়েছে কিন্তু তাকে তো আন্দোলনকারী বলে মনে হয়নি।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল দীপার। মায়া কাঁদছে। সে প্রশ্ন করার আগে মায়া বলল, 'মিতা ঠিকই বলেছে রে।'

'কি বলেছে ?'

'প্রেম করলে বিয়ে করতে নেই। আমি একটু আগে স্বপ্ন দেখলাম বেশী তেল খরচ করেছি বলে ও আমাকে খুব বকছে। আমার প্রেম আমার বুকে থাক, বিয়ে করে তাকে পায়ে ঠেলব না। তুই তাই লিখে দে লক্ষ্মীটি !' মায়া মিনতি করল।

দীপা হেসে ফেলল, 'দাঁড়া, আগে ওর উত্তরটা আসুক।'

॥ ১৮ ॥

পুলিশের লাঠিচার্জ নিয়ে জলপাইগুড়ি শহরে বামপন্থী আন্দোলন তীব্র হবে আশংকা করেই কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল। চা-বাগানে থাকতে আন্দোলনের গল্প দীপা পড়ত খবরের কাগজে। জ্ঞান হবার পর থেকে সে সেখানে কোন মিছিল দ্যাখেনি। আন্দোলন মানে শেষপর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে লড়াই, একদল লাঠি নিয়ে তেড়ে যাবে আর একদল দূর থেকে পাথর ছুঁড়বে, এমন দৃশ্য চা-বাগানে কল্পনাই করা যায় না। অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কলেজ বন্ধ হওয়ায় কাছাকাছি যারা থাকে তারা হোস্টেল ছেড়ে বাড়ি চলে যাচ্ছে। গতকাল জলপাইগুড়িতে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। শহরে বাস ঢোকে শিলিগুড়ির রাস্তায় কদমতলা পর্যন্ত। যানবাহন বলতে ভরসা রিক্সা। সকালের দিকে সেটাও চালু ছিল। দোকানপাট আধভেজানো।

আজ সকালে মায়াকে নিয়ে ওর বাবা চলে গেল। কদিন আগে যে মেয়ে বাড়ি ছেড়ে হোস্টেলে আসার জন্যে কান্নাকাটি করছিল আজ সে কিছুতেই যেতে চাইছিল না। দীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'সেকি ! তুমি তো বাড়িতে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছিলে ? হঠাৎ কি হল ?'

মায়া মাথা নেড়েছিল, 'দূর ! বাড়িতে গেলেই সব কিছু বাবা-মায়ের হুকুম মত করতে হবে। এখানে আমি খুব ভাল আছি। তাছাড়া--'

'তাছাড়া কি ?' দীপার মজা লাগছিল।

'যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তা হলে কি মুশকিলে যে পড়ব।'

'জগন্নাথবাবুর সঙ্গে দেখা হলে তোমার ভাল লাগবে না ?'

'না। যাকে ভালবাসি অথচ বিয়ে করলে ভালবাসা মরে যাবে তার সঙ্গে দেখা করলে শুধু কষ্টই হবে।'

'তুমি আগে থেকেই কি করে ভাবছ অমন হবে।' দীপা বোঝাতে চেয়েছিল। তবু মায়া ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল। দীপার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। যে মেয়ে একটা লোকের জন্যে অমন পাগলামি করে নিজের বাবার বিরুদ্ধে কথা বলেছিল সে হঠাৎ একটা

কথা কানে নিয়ে নিল এমন যে পাগলামি সেরে গেল ! লালাবাবুর গল্পের মত ব্যাপার তাহলে জীবনেও ঘটে ! জগন্নাথবাবুর জন্যে ওর মন খারাপ হয়ে গেল। চিঠিটা তার নিজের নয়, কোন পুরুষকে ওরকম চিঠি নিজের নামে লেখার কথা সে ভাবতেও পারে না, কিন্তু এটা তো সত্যিই সে মায়ার হয়ে চিঠিটা সারারাত ধরে লিখেছিল। সেই লেখাটা মিথ্যে হয়ে গেল এই ক'দিনেই ? প্রেমপত্রের গুরুত্ব শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে। তৃতীয় ব্যক্তি তার মর্ম বুঝবে না, এমনটা যেন কোথায় পড়েছিল। হয়তো তাই।

অনেকদিন রমলা সেনের কোন খবর নেই। সেই যে রেজাল্ট বের হবার পর শিলিগুড়িতে পড়ার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন তারপর মাত্র একটি চিঠি দিয়েছিলেন। খুব সংক্ষিপ্ত এবং পড়াশুনার উপদেশই ছিল তাতে। আজ হঠাৎ মনে হল, শিলিগুড়িতে গেলে কেমন হয়। সকালে জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেন যায় শিলিগুড়িতে। যাতায়াতে প্রায় দু ঘণ্টা পড়বে। ব্যাপারটা ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনা জন্ম নিল। অমরনাথ জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন। আচমকা গেলে রমলা সেনও কি মনে করবেন জানা নেই। দীপা ভেবে পাচ্ছিল না গেলে কতটা খারাপ হবে। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন জলপাইগুড়িতে আসে দুপুরের একটু পরে। দিনে দিনে যাওয়া আসায় কোন বিপদ নেই। কলেজ খোলা থাকলে কাউকে কিছু বলতে হত না, এখন বেরুবার সময় বলে যেতে হবে বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছে। এইটুকু মিথ্যে। বেশ উত্তেজনার মধ্যে দিনটা কাটল। জীবনে কখনও ট্রেনে চাপেনি সে। শিলিগুড়ি সম্পর্কে নানান গল্প কানে এসেছে। সেখানে নাকি অবাঙালির সংখ্যা বেশি। বাধ্য না হলে মেয়েরা একা যাওয়া আসা করে না। কলেজ থেকে ফেরার সময় একটু ঘুরপথে অনেকদিন সে জলপাইগুড়ির রেলস্টেশন দেখে এসেছে। চলন্ত ট্রেনের আকর্ষণ তখন থেকেই মনে লেগেছিল। পরদিন সকালে দীপা বেরিয়ে পড়ল স্নানটান সেরে।

কদমতলা হয়ে তিন নম্বর গুমটির পাশ দিয়ে স্টেশনে পৌঁছাতে মিনিট বারো লাগল তার। এই পথটুকু আসতেই নাকের ডগায় ঘাম জমে গেছে তার। পা ভারী হয়ে উঠেছে। ট্রেন লাইনটা চোখে পড়ার পর থেকেই মনে হচ্ছে না গেলেই ভাল হত। কিন্তু স্টেশনে এসে ফিরে গেলে পরে আরও খারাপ লাগবে। হোস্টেলের ঘড়ি দেখে ‍ বেরিয়েছিল, শিলিগুড়ির ট্রেন আসতে দেরি থাকার কথা নয়। খুব গম্ভীর মুখে সে টিকিট কাটার জন্যে লাইনে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক মাথা ঘুরিয়ে দেখে বললেন, 'মেয়েছেলেদের লাইন দিতে হয় না। আগে যাও, পেয়ে যাবে।'

মেয়েছেলে শব্দটা কানে আসামাত্র মুখ ফিরিয়ে নিল দীপা। না, আগে গিয়ে সুযোগ নেবার কোন দরকার নেই। সে যাচ্ছে না দেখে বৃদ্ধ আবার বললেন, 'কি হল ? যাও না। কটা টিকিট কাটবে ?'

দীপা বলল, 'আমি আপনার পরেই কাটব।'

বৃদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর সামনের লোকটিকে বললেন, 'আজকাল কারো ভাল করতে নেই। ছেলেদের দোষ কি দেব মেয়েদের যেভাবে পাখা উড়ছে।'

সামনের লোকটি ঘাড় ঘুরিয়ে দীপাকে দেখল। যেন সত্যি তার দুপাশে পাখা লাগানো আছে। দীপা ঠোঁট টিপে রইল। এইসময় এক বিশাল পরিবার এল বুকিং কাউন্টারের সামনে। টাক মাথা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে অন্তত গোটা এগার বাচ্চা বালক কিশোরী সমেত মধ্য বয়সের স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী। ভদ্রমহিলার মাথার ঘোমটা শুধু কপাল ঢেকেছে। টাক মাথা ভদ্রলোক লাইনের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, 'এই মরেছে। মেয়েছেলে লাইনে

দাঁড়িয়ে টিকিট কাটছে যে। ভাবলাম ওয়াইফকে দিয়ে আগেভাগে টিকিট কাটাবো—।'

বৃদ্ধ হাত নাড়লেন, 'কে নিষেধ করেছে। লেডিস এখনও ফার্স্ট। তবে যে মেয়েছেলে লাইনে দাঁড়াতে চায় সে দাঁড়াতে পারে।' কথাগুলো শোনামাত্র টাকমাথা লোকটা পকেট থেকে টাকা বের করে চিৎকার করতে লাগাল, 'অ দেবী, তোর মাকে পাঠিয়ে দে, তাড়াতাড়ি।' ভদ্রমহিলার শরীরের ভার এত বেশি যে তিনি আসতে সময় নিলেন। দীপা মুখ ফিরিয়ে নিল। লোকগুলো অযথা এমন চিৎকার চেঁচামেচি করে কেন? যেন সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিচ্ছে যে ওরা কোথাও যাচ্ছে। কোথায় যাবে?' প্রশ্নটা শুনে মুখ তুলে জানলার দিকে তাকিয়ে দীপা চটপট জবাব দিল, 'শিলিগুড়ি।'

হলদিবাড়ি থেকে ট্রেনটা জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে হাঁপাতে লাগল। দীপা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল কামরাগুলোর দিকে। প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি করে যাত্রীরা উঠছে। যারা নামতে চাইছে তারা জায়গা পাওয়ার জন্যে চিৎকার করছে। কিন্তু সেসব পালা চুকে গেলে ট্রেনটাকে বেশ খালি বলেই মনে হল। দীপা পায়ে পায়ে এগোল। একেবারে সামনে যে কামরার দরজা পড়ল তাতেই উঠে পড়ল সে।

জানলাগুলো সব দখল হয়ে গেছে এর মধ্যে। চট করে বসার জায়গা দেখতে পেল না দীপা। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সে কামরার ভেতরটা দেখছিল। আর তখনই ট্রেনটা দুলে উঠল। বাইরের দিকে তাকাতেই দীপার বুকের ভেতরটা টলে উঠল। ঠোঁট কামড়ালো সে। যা হবার হবে। এখন আর কোন মানে হয় না এসব নিয়ে ভাবার। সে কোন অন্যায় করছে না, এটাই আসল কথা। জলপাইগুড়ি শহরটা হু হু করে পেছনে সরে যাচ্ছে। হঠাৎ কেউ যেন তার সামনে এসে দাঁড়াতেই দীপার চমক ভাঙল। এক ভদ্রলোক তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ধুতি শার্ট পরা, ব্যাক ব্রাশ চুল, গোঁফ আছে এবং তার তলায় হাসিও, 'আপনি বসবেন?'

দীপা বুঝতে পারল না ঠিক কি বলা উচিত। ভদ্রলোক আর একটু বেশি হাসলেন, 'সঙ্কোচের কিছু নেই। জায়গা আছে, চলে আসুন।' ভদ্রলোক কথা শেষ করেই এমন ভঙিতে নিজের বেঞ্চির দিকে চলে গেলেন যেন ধরেই নিয়েছেন দীপা তাঁর সঙ্গে আসবে। আড়ষ্টতা প্রবল হচ্ছিল কিন্তু জোর করে সেটাকে সরিয়ে ফেলল সে। শিলিগুড়িতে পৌঁছাতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগবে। বসার জায়গা থাকলে খামোখা দাঁড়িয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় না। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দেখল ভদ্রলোক ছাড়া দুজন রাজবংশী মহিলা বসে আছেন বেঞ্চিতে। তাঁদের ভাবভঙ্গিতে নিজেদের গুটিয়ে নেবার চেষ্টা আছে। ভদ্রলোক ঈষৎ ডান দিকে সরে গিয়ে বললেন, 'মহিলাদের পাশেই বসুন। ওরা স্বস্তি পাবে, আপনিও।'

দীপা বসল। ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ রইলেন। উল্টো পিঠে চারজন বাঙালি ভদ্রলোক একবার দীপাকে দেখছেন আর একবার এই ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছেন। দীপা দেখল চারজোড়া চোখেই একধরনের মজা পাওয়ার উৎসাহ। হঠাৎ খুব চাপা গলায় পাশের ভদ্রলোক বললেন, 'ওদিকে নজর দেবেন না। বাঙালি থিয়েটার দেখতে ভালবাসে। আপনি এমন ভান করুন যেন আমার সঙ্গে আগেই আলাপ আছে।'

দীপা অবাক হয়ে তাকাল। তারপরে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়ে চলে এল দরজার পাশে সেই দেওয়ালের কাছে যেখানে সে কামরায় উঠেই দাঁড়িয়েছিল। তার চলে আসার সময় পাশের লোকটা একবারও মুখ ফিরিয়ে তাকায়নি। কিন্তু উল্টোদিকের চারজোড়া চোখ ঘুরেছিল। দীপার সমস্ত অনুভূতি বলছিল ওই লোকটি ভাল নয়। কিন্তু সামনের চারজনও

কি ভাল ? লোকটা যদি আবার উঠে আসে ? শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। কিন্তু লোকটা আর এদিকে এল না। ট্রেন থামল পরের স্টেশনে। দীপা দ্রুত নেমে পড়ল কামরা থেকে। পর পর তিনটে কামরা ছেড়ে আবার উঠে পড়ল সে। জানলার পাশে একটি একক আসন পেয়ে সে চটপট বসে পড়ল। ট্রেন চলতেই চোখের সামনে সবুজ মাঠ চাষের ক্ষেত এবং নীল আকাশ ভেসে উঠল। দীপার এত ভাল লাগছিল যে একটু আগের ঘটনা তার মন থেকে হারিয়ে গেল।

শিলিগুড়ি স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই সে প্ল্যাটফর্মে নামল। একটা স্টেশন এত বড হয় তার ধারণাই ছিল না। এত হকার এত মানুষ। ও পাশেও একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের অনুসরণ করে বাইরে আসতেই রিক্সা দেখতে পেল সে।

রিক্সা চেপে শিলিগুড়ির রাস্তায় চুপচাপ যাচ্ছিল দীপা। একটা নদী পড়ল। খুব চওড়া নয়, তিস্তার মত নয়। এই নদীটার নাম কি ? রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে সামলে নিল সে। নিশ্চয়ই লোকটা বুঝতে পারবে সে এই শহরে নতুন এসেছে। শিলিগুড়ির রিক্সাওয়ালারা কেমন তা কে জানে। রাস্তায় প্রচুর সাইকেল, অনেক রিক্সা। কান ঝালাপালা হবার যোগাড তাদের ঘণ্টার শব্দে। সেসব ছাডিয়ে শেষপর্যন্ত বাঁ দিকের একটা রাস্তায় নামল রিক্সাটা। ছোট ছোট বাড়ি, কাঠের বাডিও নজরে পড়ছে, একসময় রিক্সাওয়ালা বলল, 'এসে গেছি দিদি।'

দীপা ভাড়া চুকিয়ে দিযে কয়েক পা হাঁটল। রমলা সেনের ঠিকানাটা তার মুখস্থ। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা না করে বাড়িতে পৌঁছানো যাবে না। এখন বেশ রোদ। সকাল শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাস্তায় লোকজন কম। একটি ছেলে সাইকেল চালিয়ে আসছিল। দীপা দাঁড়িয়ে পড়তেই ছেলেটি এত বিস্মিত হল যে একটু হলেই অ্যাকসিডেন্ট করত।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, প্রফেসর রমলা সেনের বাড়িটা কোথায় বলুন তো ?'

ছেলেটির মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। দীপা অবাক হয়ে গেল। তারপরেই মনে হল হয়তো ছেলেটা বোবা। চা-বাগানে একটি মদেশিয়া ছেলে বোবা ছিল। তাকে দেখে বোঝাই যেত না সে কথা বলতে পারে না। দীপা কি করবে বুঝতে পারছিল না। এইসময় ছেলেটি কথা বলল। বলল না বলে, বলতে চাইল বলা ভাল।

'ইয়ে, মানে, রমলা সেন—।'

দীপা দেখল ছেলেটি ঢোঁক গিলল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওঁর বাড়ি চেনেন ? আমাকে একটু দেখিয়ে দেবেন ?'

প্রথম প্রশ্নের সময়েই ঘাড় নেড়েছে ছেলেটি। এবার সাইকেলটা ঘুরিয়ে নিল। দীপা দেখল ওব মুখে বেশ ঘাম জমে গেছে। ছেলেটা তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যে নার্ভাস হয়ে পড়েছে বুঝতে পেরে হঠাৎ তার মজা করার ইচ্ছে হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি নিশ্চয়ই এই পাড়ায় থাকেন ?'

ছেলেটা দুবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। দীপা হাসল, 'আপনি জবাব দিচ্ছিলেন না বলে আমি কিন্তু ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম আপনি বোবা।'

ছেলেটা প্রতিবাদ করে উঠল, 'না না। আসলে, আপনার মত—।' ছেলেটি কথা শেষ করল না।

হাঁটতে হাঁটতে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার মত মানে ?'

'সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার অভ্যেস নেই তো, তাই।' ছেলেটি সরল গলায়

বলতে পারল।

দীপা আড়চোখে তাকাল, 'আপনার কোন বোন নেই?'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'না। আমরা তিন ভাই। আমি কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। মানে মেয়েরাও আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় না।'

'কেন?'

'কথা বললে লোকে আজেবাজে কথা বলবে।'

'তাহলে এই যে আমার সঙ্গে কথা বলছেন!'

'হুম। আপনি না বললে বলতাম না। আপনি কি শিলিগুডিতে থাকেন?'

'না। জলপাইগুড়ি।।'

'সেকি! জলপাইগুড়ি থেকে একা এসেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সাহস তো খুব। ওই যে, ওই বাড়ি।' ছেলেটি হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিন। কাঠের গেটের ওপাশে একটা গ্যারেজ, বাগান এবং একতালা বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। দেখতে বেশ সুন্দর। দীপা বলল, 'আপনি আমার খুব উপকার করলেন। আসুন না?'

'কোথায়?' ছেলেটি চোখ বড় করল।

'ওঁর বাড়িতে।'

'না না। উনি খুব কড়া মহিলা। আপনি কি ওঁর আত্মীয়?'

'না, না।'

'ওঁর এখানে থাকবেন?'

'না। আজই চলে যাব।'

ছেলেটি মাথা নেড়ে সাইকেলে উঠে বেরিয়ে গেল আচমকা। যাওয়ার সময় কোন কথা বলল না। গেট খুলে ভেতবে ঢুকতেই দরজায় রমলা সেনের নাম চোখে পড়ল। তাহলে ঠিক জায়গায় এসেছে ও। এবং এতক্ষণ ধরে যে উদ্বেগ চাপা ছিল তা ঝট করে চলে গেল। দীপা মুখ ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছেলেটিকে আর দেখতে পেল না। এই ছেলেটাব সঙ্গে ট্রেনের লোকগুলোর কোন মিল নেই। কিন্তু ও কেন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে পারছিল না তাই তার মাথায় ঢুকছিল না।

দরজা খুললেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ' কাকে চাই?'

'রমলা সেন আছেন?'

'না। নেই। কি নাম তোমার?'

'দীপাবলী ব্যানার্জী।'

ভদ্রলোকের কপালে ভাঁজ পড়ল, 'জলপাইগুড়ির কলেজে পড়?'

দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। ভদ্রলোক দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন, 'ভেতরে এস, রমা আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে। এস।'

দীপা ভেতরে পা দিয়ে মুগ্ধ হল। এত সুন্দর সাজানো বসার ঘর সে এর আগে কখনই দ্যাখেনি। ঠিক উল্টো দিকে রবীন্দ্রনাথের বিরাট ছবি, যেন সোজাসুজি লক্ষ্য করছেন।

ভদ্রলোক আবার বসতে বললে দীপা একটু আড়ষ্ট হয়েই বসল। ভেতরে আর কেউ আছে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুখ তুলতেই শুধু রবীন্দ্রনাথ। একটি বিশাল মানুষ যেন সমস্ত পৃথিবী আড়াল করে রয়েছেন। ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি একা এসেছ?'

দীপা মাথা নাড়ল। তিনি হাসলেন, 'বাঃ, সাহস তো খুব। কি খাবে বল?'

'কিছু না। উনি অনেকক্ষণ গিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। সকালে কলেজের কি একটা ব্যাপারে মিটিং ছিল।'

ভদ্রলোক বসে আছেন খানিকটা দূরে। লম্বা, গায়ের রঙ ময়লা, পরনে ফতুয়া আর পাজামা। জুলপি সাদা কিন্তু মুখচোখে বুড়োটে ভাব নেই। ইনি রমলা সেনকে রমা বললেন। রমলা নামটার মধ্যে আটপৌরে ব্যাপার নেই, রমায় আছে। ইনি কে ? সে চোখ তুলে দেখল ভদ্রলোক তাকে লক্ষ করছেন, 'তুমি কোন বইপত্তর পড়বে ?'

দীপা বলল, 'না, থাক।'

'তুমি চুপচাপ বসে থাকলে আমার খারাপ লাগবে। আমি স্নান সারতে যাব।' ভদ্রলোক একটা পত্রিকা এগিয়ে দিলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেলেন। বাইরের ঘর এবং ভেতরের ঘরের মাঝখানে একটা ভারী পর্দা ঝুলছে। পর্দাব নিচে সম্ভবত ছোট ছোট ঘন্টা লাগানো আছে। উনি চলে যাওয়ার সময় মৃদু মিষ্টি শব্দ বাজল। দীপা পত্রিকাটি দেখল। দেশ। চা-বাগানে কারও বাড়িতে এই পত্রিকা সে দ্যাখেনি। হোস্টেলে রাখা হয়। এই সংখ্যাটা গতকাল পড়ে এসেছে সে। তবু পাতা ওলটাতে লাগল। কত বই। কত লেখক। বিজ্ঞাপনগুলো পড়লেই অনেক বই-এর নাম জানা যায়।

এইসময় রমলা সেন এলেন। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ শুনে দীপা একবার ভেতরের দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। দরজা খুলতেই বমলা সেন হতভম্ব, 'আরে! কি আশ্চর্য ? তুমি ?'

. দীপা হাসল, 'আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করল।'

রমলা সেন দুহাত বাড়িয়ে দীপাকে জড়িয়ে ধরলেন। একটা নরম শবীর এবং তা থেকে উঠে আসা মিষ্টি গন্ধে মন ভরে গেল দীপার। মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে রমলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কখন এসেছ ? হোয়াট এ সারপ্রাইজ !'

'এই তো একটু আগে।' দীপা হঠাৎ লজ্জা পেল।

তাকে নিযে ঘরে ঢুকে চারপাশে চোখ বুলিয়ে রমলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'সঙ্গে কে এসেছে। নিশ্চয়ই বলবে না একা একা চলে এসেছি।'

'ঠিক তাই!' দীপা গর্বিত ভঙ্গিতে জানাল।

'ও মা! তুমি এত বড় হয়ে গিয়েছ ? ' রমলা চোখ কপালে তুললেন।

দীপার মনে হল বয়স হওয়া সত্ত্বেও রমলাকে অনেক সুন্দরী দেখাচ্ছে আজ। ওঁর শাড়ি পবার ধরন, জামার স্টাইল, চুল আঁচড়ানোর কায়দা মিলে ওঁকে চেনা জানা মহিলাদের থেকে একদম আলাদা করে রেখেছে। বমলা ওকে হাত ধরে চেয়ারে বসালেন, 'তোমাকে দরজা খুলে দিল কে ? সুধাময় ?'

'নাম জানি না। একজন বয়স্ক ভদ্রলোক !'

সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে ভেঙে পড়লেন রমলা, 'সুধাময় যদি বয়স্ক হয তাহলে আমিও তো বুড়ি হয়ে গেলাম। কিন্তু দ্যাখো, আমার একটাও চুল পাকেনি।'

'আপনি কেন বুড়ি হতে যাবেন ?'

'বাঃ। আমি আর সুধাময় তো একসঙ্গে কলকাতায় পড়তাম।'

'উনি আপনার কে হন ?'

'বন্ধু।'

দীপা অবাক হয়ে তাকাল। ঠিক বুঝতে পারছিল না সে। সুধাময়বাবুকে দেখে মোটেই মনে হচ্ছিল না এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। এই মুহূর্তে তিনি বাথরুমে স্নান করছেন।

ছেলে এবং মেয়েতে বন্ধুত্ব হয় বিয়ের আগে। হয় তারা বিয়ে করে নয় সেখানেই বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায়। এত বয়স পর্যন্ত কোন বন্ধুত্ব থাকে নাকি ? রমলা সেন তখন দরজা বন্ধ করছেন।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কোথায় থাকেন ?'

'কে ? ও সুধাময়ের কথা জিজ্ঞাসা করছ ? ও থাকে বর্ধমানে। ওখানকার কলেজে পড়ায়। ছুটি পেলেই এখানে চলে আসে।' রমলা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'আজ কিন্তু বাড়িতে শুধু মাংস ভাত। তোমার খেতে অসুবিধে হবে না তো ?'

দীপা মাথা নাড়ল, না।

রমলা সেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ঠাকুমা অনুমতি দিয়েছেন ?'

দীপা হেসে ফেলল, এখনো না। কিন্তু আমি হোস্টেলে খাওয়া শুরু করেছি।'

'বাড়িতে জানে ?'

'এখনও না। কারণ হোস্টেলে আসার পর এখনও আমি চা-বাগানে যাইনি। শুধু মাছটা খাই না। কেমন আঁশটে গন্ধ লাগে।'

'গুড। আপরুচি খানা। যা তোমার খেতে ভাল লাগে তাই খাবে। এস, ভেতরে।' রমলা সেন পর্দা সরিয়ে ভেতরে পা বাড়ালেন। দীপা তাঁকে অনুসরণ করল। একটাই শোওয়ার ঘর। দ্বিতীয় ঘরে খাওয়ার টেবিল এবং একটা ছোট ডিভান। সেখানে পৌঁছে রমলা গলা তুলে বললেন, 'সুধাময়, হয়ে গিয়েছে ?'

'এক মিনিট।' ও পাশের একটা দরজার আড়াল থেকে শব্দ দুটো ভেসে এল।

শোওয়ার ঘরে ঢুকে আটপৌরে হচ্ছিলেন রমলা। দীপা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল দুটো সিঙ্গল খাটের মাঝখানে একটা ছোট টেবিল। এ পাশে ড্রেসিং টেবিল। ওপাশের দেওয়াল জুড়ে তরুণ রবীন্দ্রনাথের ছবি। যে রবীন্দ্রনাথের দাড়ি ওঠেনি, মাথার চুলে কাঁধ তেমন ঢাকেনি। এত সুন্দর পবিত্র মুখ কোন মানুষের হয় তা ছবিটির দিকে না তাকিয়ে বোঝা যাবে না। দীপা ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে দেখে রমলা বললেন, 'আমার প্রথম ও শেষ প্রেমিক। কেমন দেখছ ?'

'খুব সুন্দর। আপনি ওঁকে দেখেছেন ?'

'না।' এখন ভাবি কি বোকা ছিলাম তখন। তোমার মত সাহসী হলে ঠিক চলে যেতাম জোঁড়াসাকায়। ওঁকে কবে দেখলাম জানো ? যখন উনি দেহ রাখলেন। সেদিন হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে আমরাও শ্মশানে গিয়েছিলাম। পরে মনে হয়েছিল ওটাও ভুল করেছিলাম। কবির সঙ্গে কখনও শ্মশানে যেতে নেই। যিনি বেঁচে থাকবেন আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়া পর্যন্ত তাঁর শরীর লীন হওয়া দেখতে যাব কেন ?'

রমলা সেনের কথা শেষ হওয়া মাত্র সুধাময় বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন, 'গুরু-শিষ্যার মিলন হল ?'

রমলা বললেন, 'গুরু বলছ কেন ? সেই যোগ্যতা আমার আছে ? যাও দীপা, বাথরুম থেকে হাতমুখ ধুয়ে নাও।' সুধাময়ের জন্যেই দীপা দরজা ছেড়ে বাথরুমে চলে এল। একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম। কিছুদিন আগে কারও একটা লেখায় দীপা পড়েছিল যে কোন মেয়ের রুচি বোঝা যায় তার পায়ের গোড়ালি দেখে আর কোন বাড়ির চরিত্র বোঝা যায় তার বাথরুমে ঢুকলে। চৌবাচ্চা নেই ফলে তার নিচে জমা ময়লাও নেই। দু দুটো কল আছে। আর আছে মাথার ওপর ঝাঁঝরি। মনোরমা বলেন, 'মেয়েদের কখনও উদোম হয়ে স্নান করতে নেই। বাথরুমেও নয়। গায়ে একটা কিছু আব্রু না থাকলে নিজের কাছেই লজ্জা

করবে।' কিন্তু ওই শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে সেটা করতে কারো ভাল লাগবে ? ব্যাকে সাবান এবং কতরকমের শিশি। দীপার মনে হল চাকরি পেলে সে এইরকম একটা ফ্ল্যাটে একা থাকবে সাজিয়ে গুছিয়ে। হাত মুখ ধুয়ে একটা পরিষ্কার তোয়ালেতে মুখ মুছল সে। চা-বাগানে এখনও সবাই গামছা ব্যবহার করে। একটা তোয়ালে আছে যা অঞ্জলি কোন বিশেষ অতিথির জন্যে তুলে রাখে। এতে এতদিন তাদের কোন অসুবিধে হয়নি। আজ মনে হল তোয়ালের আরাম গামছায় পাওয়া যায় না। মুখ মোছার পর দরজা খুলতে গিয়ে তার শোওয়ার ঘরটার কথা মনে এল। সুধাময় কোথায় শোন ? এ বাড়িতে তো আর কোন শোওযার ঘর নেই। খাওয়ার ঘরে যে ডিভান রয়েছে সেখানে ? নাকি পাশাপাশি দুটো খাটের একটাতে ? শুধুই যদি বন্ধু হয় তাহলে ওরা এক ঘরে শুতে পারে ? দীপার শরীর একটু একটু করে ভারি হয়ে উঠল। রমলা সেন সম্পর্কে মা যা বলে তাই কি ঠিক ? তারপরেই খেয়াল হল উনি রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখিয়ে বলেছেন আমার প্রথম ও শেষ প্রেমিক। তার মানে সুধাময় ওঁর প্রেমিক নয়। রবীন্দ্রনাথ তো মারা গিয়েছেন উনিশ শো একচল্লিশ সালে। একটু স্বস্তি হল দীপার। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

খাওয়ার টেবিলে বসে একটু নার্ভাস হল দীপা। চিনেমাটির পাত্রে ভাত চাপা দেওয়া, মাংসও সেইবকম। আর একটা পাত্রে অদ্ভুত একটা তরকারি রয়েছে। সুধাময় চামচে করে ভাত এবং সেই তরকারি তুলে নিচ্ছিলেন। রমলা সেন বললেন, 'ইস, একটা চিঠি লিখে যদি আসতে তাহলে ভাল কিছু রাঁধতে পারতাম। ডাল পর্যন্ত করিনি।'

সুধাময় পাত্র দুটো দীপার দিকে এগিয়ে বললেন, 'আর একদিন খাইয়ে দিও।'

খেতে বসে নিজের হাতে খাবার তুলে নেবার অভ্যেস নেই দীপার। মনোরমা দেখলে এতক্ষণে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। রমলা সেন এঁটো মানেন না বোঝাই যাচ্ছে। ভাত নিতে গিয়ে যতটা সম্ভব কম নিল সে। মনে হচ্ছিল ওবা যেন না ভাবে সে বেশী খায়। তবকারিটা তুলে সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কিসের তরকারি ?'

'পোস্ত ঝিঙে চিংড়ি দিয়ে। তোমরা পোস্ত খাও না ?'

'বাড়িতে হয় না।' সত্যি কথাটা বলে ফেলল দীপা ?

'সে কি !' সুধাময় হবাক হলে, 'এইরকম ডিলিসিয়াস তরকারি তোমরা খাওনা ?'

রমলা বললেন, 'পোস্তটা দক্ষিণ বাংলায় চালু বেশী। উত্তরবাংলায় এখনও চল হয়নি। শিলিগুড়িতে মাত্র তিনটে দোকানে এখন পোস্ত পাওয়া যায়।'

'অদ্ভুত তো।' সুধাময় খেতে খেতে মন্তব্য করলেন।

'অদ্ভুত কেন হবে ! অঞ্চলভিত্তিক খাবার খাওয়ার অভ্যেস তো হবেই। পূর্ববাংলায় শুঁটকির চল খুব দক্ষিণ বাংলায় লোকে বমি করবে। উত্তর বাংলায় ঢেঁকির শাক নামে এক ধরনের শাক আছে। তুমি কখনও নাম শুনেছ ?'

'না।' সুধাময় মাথা নাড়লেন।

'একদিন খাওযাবো। দারুণ। যাক, দীপা, তোমার খবর বল। কলেজ কেমন লাগছে ?'

'ভাল।' দীপার পোস্ত খারাপ লাগছিল না।

'জলপাইগুড়ির কলেজ তো কোএডুকেশন ?' সুধাময় মুখ তুললেন।

'হ্যাঁ। ছেলেদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ?' রমলা জিজ্ঞাসা করলেন।

'না।' দীপা মাথা নাড়ল।

'সে কি ! কেন ?'

'খুব কম মেয়েই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে। আমরা কমন রুমে বসে থাকি। স্যার

যাওয়ার সময় ডেকে নিয়ে যান। ক্লাসেও আমরা আলাদা বসি।'

'কখনও মনে হয়নি তোমার, কেন এইভাবে আলাদা রাখা হবে ? তোমরা এক ক্লাসে একই মাইনে দিয়ে পড়াশুনা করছ। বয়সও একই।'

'আসলে কিছু কিছু ছেলে এত উদ্ধত যে সব মেয়ে তাদের সহ্য করতে পারে না।'

'এটা কোন যুক্তি হল না। পোস্ত কেমন লাগল ?'

দীপা ঘাড় নাড়ল, 'ভাল।'

রমলা সেন বললেন, 'তুমি যদি শিলিগুড়িতে থেকে কলেজে ভর্তি হতে তাহলে একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকত। কিন্তু তোমার বাবা রাজি হলেন না। আমি ওঁর মানসিকতা বুঝি। এখন তোমার হোস্টেল কলেজ মিলিয়ে কেমন খরচ পড়ছে ?'

'আমি ঠিক জানি না। বাবাই প্রথমবার দিয়ে গিয়েছেন।'

'ঠিক নয়। নিজের ব্যাপারটা সবসময় নিজে খেয়াল রাখবে। তা নাহলে দায়িত্ববোধ আসবে না। ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। নইলে তোমার বাবার এত পরিশ্রমের অর্থের অপচয় হবে, এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে।'

'প্রথম মাসে বাবা টাকা দিয়েছেন কিন্তু এরপর থেকে জলপাইগুড়ির এস সি রায় আমার সমস্ত খরচ দেবেন। উনি ভাল ছেলেমেয়েকে দিয়ে থাকেন।'

'কি খরচ দেবেন ? হয়তো কলেজের মাইনেটা দিয়ে দেবেন, তার বেশী কেউ করে না।'

'শুনেছি উনি মাসে দেড় শো টাকা করে দেবেন।'

'ইম্পশিব্‌ল। এখন একটি আপার ডিভিসন ক্লার্ক কিংবা স্কুল মাস্টার কাজে ঢুকে অত টাকা পায় না। না, না, এসব কথায় কান দেবে না। তোমাকে দাঁড়াতেই হবে। কলেজে রাজনীতি হবেই, আমার উপদেশ তুমি সেখানে নাক গলিও না। কলেজ পলিটিক্স হল শরতের বৃষ্টির মত। হেমন্ত শীত বসন্ত গ্রীষ্মে তার কোন মূল্য নেই।'

দুপুরের ট্রেন ধরিয়ে দেবার জন্যে রমলা সেন দীপাকে নিয়ে দেড়টা নাগাদ রিক্সায় উঠলেন। সুধাময় গেট পর্যন্ত এলেন। রমলা বললেন, 'আজ এসেছ ঠিক আছে, কিন্তু খুব জরুরী দরকার না থাকলে হুটহাট চলে এসো না। এখনও এদেশে একা মেয়েকে রাস্তায় দেখতে মানুষ অভ্যস্ত নয়।'

দীপা জবাব দিল না। কিছুক্ষণ বাদে রমলা নিজেই বললেন, 'সুধাময়কে দেখে তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ ! এদেশের ভাবনায় তাই হওয়া স্বাভাবিক। আমরা খুব ভাল বন্ধু। নানান কারণে একসময় আমাদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমার মত ও নিজেও বিয়ে থা করেনি। ওর আমার কাছে আসা নিয়ে শিলিগুড়িতে একসময় হৈচৈ হতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার জীবনযাপন দেখে আর সেটা দানা বাঁধেনি।

রিক্সায় বসে দীপা কথাগুলো শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পেছনে তাকাতেই চমকে উঠল। সেই ছেলেটা। যে তাকে রমলা সেনের বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছিল সে রিক্সায় বেশ কিছুটা পেছনে সাইকেল চালিয়ে আসছে। দীপার খুব মজা লাগল। সে বুঝতে পারল ছেলেটি এতক্ষণ তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কেন ?

দীপা রমলা সেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'রিক্সাটাকে দাঁড়াতে বলবেন ?'

'কেন ? ও নদীটাকে দেখবে। মহানন্দা। এখন অবশ্য কিছুই নেই দেখার। কিন্তু তোমার ট্রেনের তো বেশী দেরি নেই। ভুল হয়ে গেল, এদিকে না এসে টাউন স্টেশনের দিকে গেলেই হত।' রমলা ঘড়ি দেখলেন কবজি ঘুরিয়ে।

'না না। পেছনে একটা ছেলে সাইকেল চালিয়ে আসছে। ও আপনার বাড়িটা আমাকে

দেখিয়ে দিয়েছিল। ওকে একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

রমলা সেন মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে তো অনেক আগের কথা। এখন পেছন পেছন আসছে কেন?'

'তা আমি জানি না।' দীপা সহজ গলায় জানাল।

'ভেরি ব্যাড। এইসব ছেলেকে সবসময় এড়িয়ে চলবে।'

'ও কিন্তু খুব নার্ভাস। আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঘামছিল। বাড়িতে বোনটোন নেই। কোন মেয়ে নাকি ওর সঙ্গে কথা বলে না।' দীপা জানাল।

'এইট্টি পার্সেন্টি বাঙালি ছেলের ওই বয়সে একই অবস্থা। সহজভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে পারে না বলেই মেয়েরা এড়িয়ে যায়। এদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই।'

স্টেশনে রিক্সা থেকে নামবার পর দীপা ছেলেটিকে দেখতে পেল না। হয়তো তখন রমলা সেন মুখ ফিরিয়ে ওকে দেখায় সে আর সাহস পায়নি এগিয়ে আসার। কেন জানে না, দীপার মনে মায়া জন্মাল ছেলেটির জন্যে।

রমলা সেন জোর করে টিকিট কেটে দিলেন। দাঁড়িয়ে থাকলেন যতক্ষণ ট্রেন না ছাড়ে। শেষ মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো সব পড়েছ?'

জানলার পাশে বসে দীপা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'মনের মধ্যে গেঁথে নাও, একেবারে হৃদয়ে। সারাজীবন অক্সিজেন দেবে।'

দীপা হাসল। রমলা বললেন, 'ট্রেন দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়। খুব ইচ্ছে হচ্ছে তোমার সঙ্গে চলে যেতে।'

'আসুন না। খুব মজা হবে।'

'না বাবা। বাড়িতে সুধাময় একলা থাকবে। তোমার ওকে কেমন লাগল?'

'ভাল। আচ্ছা, একটা কথা বলব?'

'বল।' রমলা সেন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনের জানলায় বসা দীপার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

'আপনাদের বিয়ে হচ্ছে না কেন?' সাহস করে জিজ্ঞাসা করে ফেলল দীপা।

চোখ বন্ধ করলেন এক পলকের জন্যে রমলা সেন, 'আমাদের যেমন অনেক ব্যাপারে বেশ মিল তেমন বহু ব্যাপারে আকাশ পাতাল ফারাক। এই অবস্থায় কিছুদিন ভাল থাকা যায় কিন্তু চিরকাল থাকতে গেলে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে।'

কথা শেষ হওয়ামাত্র ট্রেন ছাড়ল। রমলা সেন ধীরে ধীরে পেছনে পড়ে গেলেন। দীপা কথাগুলোর অর্থ তলিয়ে ভাবতে যেতেই চমকে উঠল। প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে সেই ছেলেটা একা দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতেই কেমন লজ্জিত হল। দীপা জানলা থেকেই হাত নেড়ে উঠল। ছেলেটা হাত তোলার সুযোগ পেল না। তার আগেই ট্রেন গতি বাড়িয়েছে। কিন্তু দীপার মনে হল ছেলেটা হাত তুলতেও সঙ্কোচ বোধ করছিল। ছুটন্ত ট্রেনের কামরায় বসে আবার ছেলেটার জন্যে ওর মায়া থেকে কষ্টবোধ হল। কি করুণ লাগছিল ওর মুখটা। রমলা সেন বলেছেন এদের এড়িয়ে যেতে। রমলা সেন। এক অদ্ভুত জীবন দেখে এল সে আজ। ভাল না মন্দ তা পরের কথা।

হোস্টেলের দরজায় যখন ফিরল সে তখনও রোদ মরেনি। আর তখনই সে দরজার পাশে অমরনাথকে দেখতে পেল। দুটো হাত বুকে ভাঁজ করে রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

॥ ১৯ ॥

দীপা সত্যি কথা বলল, 'রমলা সেনের কাছে।'

অমরনাথ এবার যেন একটু স্বস্তি পেলেন, 'সেই সকাল থেকে তোর জন্যে বসে আছি। কোথায় যাচ্ছিস হোস্টেলে বলে যাবি তো। বন্ধুর বাড়ি বললে কিছু বোঝা যায়! ওঁর কোন আত্মীয় আছে নাকি জলপাইগুড়িতে!'

'না, আত্মীয় নেই।'

'ও, সেই গেস্ট হাউসে, যেখানে থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলি! না না, এভাবে হুটহাট গেস্ট হাউসে চলে যাওয়া ঠিক নয়। তোর ঠাকুমা শুনলে ঘুমাতেই পারবে না।'

'তুমি ভেতরে এসে বসবে?'

দীপা দেখল যাতায়াতের পথে অনেকেই তাদের লক্ষ্য করছে। উল্টোদিকে কয়েকটা ছোকরা দিনরাত আড্ডা মারে তাদেরও নজর এখন এদিকে।

'ভেতরেই তো বসেছিলাম এতক্ষণ।' বলতে বলতে অমরনাথ দীপাকে অনুসরণ করলেন। বড়দির ঘরের পাশে একটা গেস্টরুম আছে। কোন গার্জেন এলে সেখানেই বসে। আজ যেহেতু হোস্টেলে ছাত্রী কম তাই সব ফাঁকা। অমরনাথের হাতে একটা বড় থলি ছিল। সেটা থেকে বই বের করে সামনে রাখলেন তিনি, 'এগুলো কিনে আনলাম এবার। লিস্টের বাকি বইগুলো সামনের মাসে দেখব।'

'বাড়ির সবাই কেমন আছে?'

'ভাল। তা তোর কলেজে শুনলাম গোলমাল হয়েছে, সবাই বাড়ি চলে গিয়েছে, তুইও চল। এখানে পড়ে থাকবি কেন?' অমরনাথ সস্নেহে বললেন।

'না। বাড়িতে গেলে পড়াশুনা হবে না। আমি ভালই আছি।'

অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন। এই কদিনেই যেন অনেক পাল্টে গিয়েছে। বিয়ের পর যা হয়নি হোস্টেলে এসে তাই হয়েছে। দীপা আর ছোট নেই। অমরনাথ ঘড়ি দেখলেন, 'হরদেববাবুর আসার কথা এখানে, দেরি করলে লাস্ট বাস পাব না।'

'হরদেববাবু কে?'

অমরনাথ কি বলবেন বুঝতে না পেরে জবাব দিলেন, 'আমার পরিচিত।'

'তুমি কিছু খাবে? এখানে চা ওমলেট পাওয়া যায়!'

'ওমলেট? না থাক। আমি দুপুরে বেরিয়ে খেয়ে এসেছি রুবি বোর্ডিং থেকে। হ্যাঁরে, তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।'

'কলেজে ছেলেরা পড়ে, তারা কোনরকম বিরক্ত করছে না তো?'

'না।'

'তোর মামা কলকাতা থেকে চিঠি দিয়েছে। লিখেছে আই এ পাস করলে যদি চাস তাহলে কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে পারিস। ওর ওখান থেকেই কলেজ করতে পারবি। অবশ্য রেজাল্ট ভাল হলেই—।' অমরনাথ থেমে গেলেন। তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখান থেকে হোস্টেলের সদরদরজা দেখা যায়। কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করেছিলেন হরদেব উঁকি মারছেন। ঠিক শেয়ালের মত দেখাচ্ছে লোকটার মুখ। আজ দুপুরে রুবি বোর্ডিং-এ ভাত খেয়ে হরদেবের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি। গতকাল ডাকে চিঠি পেয়েছিলেন যেন জলপাইগুড়িতে এলে দেখা করেন। হরদেব তখন বাড়িতে ছিলেন না।

কাছারিতে গিয়েছিলেন। লোকটা উকিল নয় অথচ রোজ নাকি কাছারিতে যায়। অমরনাথ বলে এসেছিলেন তিনি মেয়ের হোস্টেলে থাকবেন। হরদেবকে দেখামাত্র তাঁর মনে হল দীপার সামনে ওকে না আনাই ভাল। তিনি উঠলেন, 'উনি এসে গিয়েছেন, আমি তাহলে চলি।'

কিন্তু অমরনাথ সেই সুযোগ পেলেন না। হরদেব ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছেন। হদিশ জেনে এগিয়ে এসেছেন গেস্ট রুমের দিকে, 'আরে আপনি যাওয়ার দু মিনিট আগে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ছি ছি ছি। এই প্রথম গেলেন অথচ আপ্যায়ন করতে পারলাম না।'

অমরনাথ এগিয়ে গেলেন, 'তাতে কি হয়েছে, আর একদিন হবে।'

হরদেব ততক্ষণে দীপার দেখা পেয়ে গিয়েছেন, 'বউমা ?'

'হ্যাঁ, আমার মেয়ে।' অমরনাথ সাত তাড়াতাড়ি সামাল দিতে চাইলেন।

'তুমি কি খানিক আগে স্টেশন থেকে এলে ?'

'না, না, ও কেন স্টেশনে যাবে ?' অমরনাথ প্রতিবাদ করলেন।

'তাহলে আমি ভুল দেখেছি। তা কেমন পড়াশুনা হচ্ছে ?'

এবারও উত্তরটা অমরনাথ দিলেন, 'আর পড়াশুনা ! রাজনীতি করে কলেজটাকেই বন্ধ করে দিল নেতারা। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়ার একটা কারণ ছিল। স্বাধীনতা পেয়ে নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ি শুরু হয়ে গেল। বলুন।'

'ওসব বাইবের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই মা।' হরদেব উপদেশ দিলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের তপস্যা হল পড়াশুনা করা। টাকা পয়সাব চিন্তা নেই যখন তখন মন দিয়ে ওইটেই কর। ভালই হল আলাপ হয়ে। মাঝে মাঝে খোঁজ নিয়ে যাব।'

দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। লোকটা তাকে বউমা বলল কেন ? বউমা বলে শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাদের কারো সঙ্গে তো অমরনাথের সম্পর্ক থাকার কথা নয়। লোকটা তাকে স্টেশনে দেখেছে। সে অমরনাথের কাছে নিজে থেকে মিথ্যে বলেনি। কিন্তু আগ বাড়িয়ে পুরো সত্যিটাও জানায়নি। রাস্তায় একটি অল্পবয়সী মেয়েকে দেখে যে বৃদ্ধ মনে রাখে তার মানসিকতা কি রকম ! আর টাকা পয়সার কথাটাই বা বলল কেন ? সেটা তো একদম অমরনাথের ব্যাপার। দীপা বুঝতে পারছিল অমরনাথ লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে চান। কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না তিনি। যাওয়ার আগে জানিয়ে গেলেন যে সামনের রবিবার বাজার করেই চলে আসবেন। আর ইতিমধ্যে যদি কলেজ দীর্ঘ দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চিঠিতে যেন সেটা জানায়। কলেজ বন্ধ থাকাকালীন দীপা যেন হোস্টেলের বাইরে না বের হয়। এটা ভাল দেখায় না এবং তিনি নিজেও পছন্দ করছেন না।

বাইরে বেরিয়ে একটু স্বস্তি পেলেন অমরনাথ, 'আপনি দীপাকে বউমা বলে ডাকবেন না। তাহলে ও আপনাকে সন্দেহ করবে।'

'মানে ?' অমরনাথের দিকে অবাক হয়ে তাকালেন হরদেব।

হাঁটা শুরু করে অমরনাথ বললেন, 'প্রতুলবাবুর ব্যাপারটা ও মন থেকে মুছে ফেলেছে।'

'কি আশ্চর্য ! মুছে ফেললেই হল ? এখন তো ওর ঘন ঘন যাওয়া দরকার ওখানে।'

'কেন ?'

'আপনাকে আর কি করে বোঝাবো ! হাজার হোক আপনার মেয়ে ওই বাড়ির বউ। একমাত্র উত্তরাধিকারী। সে যদি বাড়িতে যায় তাহলে প্রতুলের মন নরম হবেই। সেই

মেয়েছেলেটা যতই জ্বলুক তাড়িয়ে দিতে তো পারবে না। ঘন ঘন গেলে পুরো সম্পত্তি হাতে এসে যাবে।'

'কিন্তু এ কথাটা আমি ওকে বলব কি করে ?'

'বলতে হবে। বোঝান। নিজে না পারেন পরিবারকে দিয়ে বলান। অমরনাথবাবু লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হতে গেলে একটু মাথা নোয়াতে হয়। আর হ্যাঁ, আমার টাকাটা আমি পেয়ে গেছি।' হরদেব হাসলেন।

'পেয়ে গেছেন মানে ?'

'বাঃ, ব্যাঙ্ককে তো তখনই জানিয়ে দিয়েছিলেন আমার অ্যাকাউন্টে ওই পার্সেন্ট টাকা ট্রান্সফার করে দেওয়া যেন হয়। ওরা করে দিয়েছে।'

অমরনাথ কিছু বললেন না। ব্যাপারটা ভাবতেই তাঁর ভাল লাগছিল না। কদিন থেকেই মনে হচ্ছে নেপোয় দই মারছে। দীপার ন্যায্য পাওনায় ভাগ বসাচ্ছে হরদেব। কিন্তু মুখের ওপরে কিছু বলতে সাহসও হচ্ছে না। খানিকটা হাঁটার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেখা করতে বলেছিলেন কেন ? তেমন কিছু ঘটেছে কি ?'

'হ্যাঁ। প্রতুলের শরীর আরও খারাপ হয়েছে। এখনও দূরে দূরে থাকলে পুরো সম্পত্তিটা বেহাত হয়ে যাবে। আপনার লাস্ট বাস কখন ?' হরদেব জিজ্ঞাসা করলেন।

'বেশী দেরি নেই। ঘাট পার হতে হবে। তিস্তার চরটাও কম নয়। বার্নিশে পৌঁছাতে সময় লাগবে। কি ব্যাপার ?'

ওঁরা কথা বলতে বলতে থানার মোড়ে এসে পড়েছেন ততক্ষণে। হরদেব বললেন, 'আমি বলি কি যাওয়ার আগে আপনি প্রতুলের সঙ্গে দেখা করে যান। অসুস্থ মানুষ, গেলে খুশী হবে। প্রতুল যত খুশী হবে তত আমাদের মঙ্গল।'

এই 'আমাদের' শব্দটা মোটেই পছন্দ হল না অমরনাথের। তিনি ঘড়ি দেখলেন। বড়জোর মিনিট পনের সময় ব্যয় করা যেতে পারে। লোকটা খুব খারাপ মতলব দিচ্ছে না। প্রথমবার না হয় ওকে টাকা দেওয়া হয়েছে, সম্পত্তি পেয়ে গেলে তো নগদ হাতে আসছে না তেমন। তখন দেওয়ার কথা চিন্তা করা যাবে। কিন্তু হাতে না আসা পর্যন্ত লোকটাকে চটানো ঠিক হবে না।

করলা নদীর পাড় ধরে তিনি ঝুলনা পুলের দিকে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে সমান তালে পা চালাতে হরদেবের অসুবিধে হচ্ছিল। কোন মতে তাল রেখে তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রতুল এখন শোওয়ার ঘরে, বাইরে আসে না। সেই হারামজাদীটা দরজা পাহারা দিচ্ছে। আমাকে ঢুকতে দেয়নি। আপনি কোন কথা শুনবেন না। বুঝেছেন ?'

অমরনাথ ঘাড় নাড়লেন। সেই মেয়েছেলেটাকে দেখার আগ্রহ তাঁর অনেকদিনের।

গেট পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন হরদেব। বাগানটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আর এগোবো না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমি অপেক্ষা করছি, আপনি ঘুরে আসুন।'

মনে মনে তাই চাইছিলেন অমরনাথ। কথা না বাড়িয়ে তিনি বাগানের রাস্তায় পা রাখলেন। বেলা পড়ে আসছে। গাছেরা ছায়া বাড়িয়ে দিচ্ছে। বেশী সময় নষ্ট করলে আজ আর চা-বাগানে ফেরা যাবে না। ঘন ঘন ছুটি নেওয়া, সাহেব পছন্দ করছে না। কাল-সকালে তাঁকে কাজে যেতেই হবে। চারপাশে নজর বুলিয়ে হাঁটছিলেন তিনি। শহরের বুকে অনেকখানি জমি নিয়ে বাড়ি। বিক্রি করলে মন্দ দাম আসবে না। কিন্তু এর মধ্যেই বাগানের চেহারা বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে। যত্ন নিচ্ছে না কেউ। অসুস্থতা শুধু মালিকের

একার নয়।

অফিসঘরের দরজা বন্ধ। তার মানে ব্যবসা গুটিয়ে গিয়েছে। অমরনাথ বাইরের ঘরের বন্ধ দরজায় শব্দ করলেন। তিনবারের বার ভেতর থেকে সাড়া মিলল। একটি নারীকণ্ঠ জানতে চাইছে কে এল ? অমরনাথ গলা তুললেন, 'দরজাটা খুলুন।'

দরজা খুলল। মধ্যবয়সী এক মহিলা আঁচলে শরীর ঢেকে সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'কি চাই ?' জিজ্ঞাসা করেই বিরাট জিভ বের করে দাঁতে কাটলেন তিনি, 'ওমা, আপনি ? আসুন ভেতরে আসুন।'

অমরনাথ পলকেই বুঝে নিলেন। এরকম এক মহিলা প্রতুলবাবুকে কি করে কব্জা করল তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। গায়ের রঙ এবং মুখচোখের গড়ন দেখলে কারও পুলক জাগবে না। সম্বল বলতে শুধু স্বাস্থ্য। এত শক্ত বাঁধুনি অঞ্জলিরও কোনদিন ছিল না। অমরনাথ কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রতুলবাবু শুনলাম অসুস্থ। কেমন আছেন ?'

'একই রকম। আপনি ভেতরে আসুন না !'

অমরনাথ ভেতরে ঢুকলেন। বাড়িটার কোথাও কোন শব্দ নেই। এই মহিলার নাম আনা। এরকম নাম কোন মানুষের কি করে হয় ? নিশ্চয়ই কোন গল্প আছে পেছনে। আনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মেয়ে ভাল আছে ?'

'আছে।' অমরনাথ উশখুশ করলেন। তারপর নিচু স্বরে বললেন, 'ওর ব্যাপারে আপনি যা করেছেন তার জন্যে— ।'

'কিছুই করিনি আমি। আর যদি কিছু করে থাকি নিজের জন্যেই করেছি। তা উনি অসুস্থ এ খবর কোথায় পেলেন ? আনা জিজ্ঞাসা করল।

'কিছুদিন আগেও তো আমি এসেছিলাম।'

'তা জানি। কিন্তু তখন তো উনি হাঁটাচলা করতেন। আপনাকে নিশ্চয়ই হরদেব ঘোষাল খবরটা দিয়েছে। শয়তানের জাহাজ।'

অমরনাথ অবাক হলেন। এরা পরস্পরকে হারামজাদী এবং শয়তানের জাহাজ বলছে যখন, তখন মতান্তরের পেছনে নিশ্চয়ই কারণ আছে। তিনি ঘড়ি দেখলেন, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমার তাড়া আছে, বাস ধরতে হবে, একবার ওঁকে দেখে যেতে পারি কি ?'

'কি কাণ্ড ! এভাবে বলছেন কেন ? আসুন। আপনার বেয়াই-এর সঙ্গে আপনি দেখা করবেন তাতে আমি আপত্তি করব কেন ?' আনা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। এত সহজে সাক্ষাতের অনুমতি পাওয়া যাবে তা হরদেবের কথা শুনে মনে হয়নি অমরনাথের।

একটা বিশাল পালঙ্কে শুয়ে আছেন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। চট করে চিনে নেওয়া এখন মুশকিল। ভদ্রলোকের গায়ের চামড়ার ওপর যেন কেউ কালো রঙ মাখিয়ে দিয়েছে। শরীরের বাহার এখন শেষ। চোখ বসে গিয়েছে। আনা ঘরে ঢুকে বলল, 'চেয়ে দ্যাখ, কে এসেছে। তোমার বেয়াই, যাঁর মেয়ের সর্বনাশ করেছিলে।'

অমরনাথ হোঁচট খেলো। আনা যখন কথা শুরু করেছিল তখন মনে হয়েছিল বাইরের কেউ অসুস্থ স্বামীর কাছে এলে স্ত্রী এভাবেই পরিচয় করিয়ে দেয়। আনা এখন তাহলে সেই ভূমিকা নিয়ে নিয়েছে। কিন্তু শেষ চারটে শব্দ কানে যাওয়ামাত্র ধারণাটা পালটে গেল।

প্রতুলবাবু কোনমতে মুখ ফেরালেন, দেখে বোঝা গেল অমরনাথকে চিনতে তাঁর কোন অসুবিধে হচ্ছে না। অমরনাথ বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে আপনার ? এখন কেমন বোধ করছেন ?'

প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করছি। পুরোটাই করতে চাই যাতে পরজন্মে কোন দায় না থেকে যায়। বউমা কেমন আছে ?' গলার স্বর খুবই দুর্বল কিন্তু কথা বলার ধরনে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর বোধশক্তি চমৎকার রয়েছে। অমরনাথ বললেন, 'ভাল। কিন্তু ডাক্তার কি বলছে ? রোগটা ধরতে পেরেছে কি ?'

প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন, 'পেরেছে।'

এরপর তিনজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। অমরনাথ আনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর আগে তো দেখে গেলাম হাঁটাচলা করছেন লাঠি নিয়ে। এখন কি— ?'

আনা বলল,'ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যাই। ছাই ফেলতে তো ভাঙা কুলো আছিই। জলপাইগুড়ির সব বড় ডাক্তার দেখানো হয়ে গিয়েছে। বললাম, কলকাতায় চল তা ইনি এখান থেকে নড়বেন না।'

'অসুখটা কি ?'

'প্রথমে তো সন্ন্যাস রোগ হতে হতে হয়নি। একদিকের কিছুটা পড়ে গিয়েছিল। সেটা সামলে তুলেছিলাম আমি। এখন শুনছি পেটে গলায় ঘা হয়েছে। পাতলা ঝাল নুন ছাড়া খাবার দিতে হচ্ছে।'

'আর কেউ আসেন না ? ওঁর দাদা।'

'দু দিন এসেছিলেন। দুই ভাই-এর মধ্যে ঝগড়া দেখে আমি আসতে নিষেধ করেছি। অসুস্থ মানুষকে দেখতে আসছে না সম্পত্তি হাতাতে ? অমন আসার কোন দরকার নেই। ওঁর বন্ধু হরদেব শয়তানটা আসতো আর কানের কাছে গুজুর গুজুর করতো। দিন রাত বদ মতলব দিত ওকে।' আনা গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল।

এইসময় অমরনাথের কানে প্রতুলবাবুর চিনচিনে গলা এল, 'হরদেবের সঙ্গে আপনার দেখা হয় ? হরদেবের সঙ্গে ?'

অমরনাথ ঢোঁক গিললেন ! হরদেব সম্পর্কে আনার মনোভাব তিনি জেনেছেন। এমন লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় জানলে এ বাড়িতে ঢোকা বন্ধ না হয়ে যায়। তিনি দুদিক বাঁচিয়ে বললেন, 'সেই যে যেদিন এসেছিলাম সেদিন দেখেছিলাম।'

'তাকে এড়িয়ে চলবেন। দু মুখো সাপ।' প্রতুলবাবু চোখ বন্ধ করলেন।

'অ্যাদ্দিনে চৈতন্য হল। অনেক বলে কয়ে ব্যবসা থেকে ভাগিয়েছিলাম।' আনা বিজয়িনীর গলায় কথাগুলো বলল। অমরনাথের কৌতূহল হল, 'তিনি তো একসময় খুব বন্ধু ছিলেন প্রতুলবাবুর, মানে এমন শুনেছিলাম।'

'ঠিকই।' আনা বলল, 'এ বাড়িতে আসতেন শুধু ধান্দা নিয়ে। আমার শরীরে দু-দুবার হাত দেবার চেষ্টা করেছেন। ওঁর বিয়ে করা বউ-এর সঙ্গে ফস্টি নস্টি করতেন। তারপর যেই ইনি অসুখে পড়লেন অমনি আমার কানে মন্ত্র দিতে এলেন যদি আমি ওঁর সঙ্গে হাত মেলাই তাহলে একেবারে রাজধানী করে দেবেন। বুড়ো শেয়াল।'

অমরনাথ মনে মনে শঙ্কিত হলেন। হরদেবের চরিত্রের এই দিকটা তিনি জানতেন না। এই লোক স্বার্থের জন্যে অনেক দূর যেতে পারে। ওঁকে দীপার হোস্টেলে দেখা করতে বলে তিনি অন্যায় করেছেন। আনা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। যাওয়ার আগে বলে গেল, 'আমি না আসা পর্যন্ত উঠে যাবেন না। হাজার কুটুম মানুষ।'

অমরনাথ ঘড়ি দেখলেন। সন্ধের সময়েও নৌকো ওপারে যায়। তখন আর সরাসরি চা-বাগানে যাওয়ার বাস পাওয়া যাবে না। ধূপগুড়িতে গিয়ে বদল করতে হবে।কিন্তু প্রতুলবাবুকে একা পাওয়ার সুযোগ তো আর পাবেন কিনা কে জানে ! তিনি বললেন,

'আপনার ব্যবসাপাতির কি খবর ?'

হাতটা অসহায়ভাবে নাড়লেন প্রতুলবাবু, 'সব শেষ। এখন দিন গুনছি। এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় ?'

'এ কথা কেন বলছেন ? চিকিৎসা নিশ্চয়ই আছে।'

'ছাই আছে। দিনরাত ওষুধ গিলছি। কি হচ্ছে ?' প্রতুলবাবু নিঃশ্বাস ফেললেন, 'কিন্তু মরতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। সত্যি বলছি। চারদিকে এত কিছু ছড়ানো, আমার এত টাকা আর আমি অসময়ে মরে যাব ?'

'মৃত্যুর কথা চিন্তা করবেন না।'

'করছি কি সাধে। ওই যে মেয়েছেলেটা আমার সেবা করছে, আজকাল তো ওর শরীরটাকেও এক মিনিট ছুঁতে পারি না। সমস্ত শরীরে ব্যথা আমার। কত কি ভোগ করার ছিল মশাই, আর হল না।' প্রতুলবাবুর চোখের কোলে উপচে জল গড়িয়ে এল। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অমরনাথ। এই অবস্থাতে যে মানুষ বলে দিন গুনছি তার এখনও ভোগের তৃষ্ণা মিটল না ? প্রায়শ্চিত্ত আর কবে হবে ?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির কোন বিলিব্যবস্থা করেছেন ? একটা কিছু করে রাখা তো উচিত।'

'হুঁ করব। এখনই তো মরছি না।' প্রতুলবাবু চোখ বন্ধ করেই বললেন।

অমরনাথ হোঁচট খেলেন। লোকটা বলে কি ! তিনি কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। প্রতুলবাবু এখন অত্যন্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছেন। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়াতে অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি মনে করতে পারছি না আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছি কিনা, যখন আমার মেয়ে জলপাইগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসেছিল তখন কি আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন ?'

প্রতুলবাবুর মাথা ঈষৎ নড়ল। অমরনাথ বুঝলেন, উনি হ্যাঁ বললেন। তাই জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার কি কিছু বলার ছিল ?'

প্রতুলবাবু বললেন, 'ছিল। তবে এখন আর নেই।'

অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। এরপর আর ফেরার উপায় থাকবে কিনা সন্দেহ। তিনি বললেন, 'যদি কোন প্রয়োজন হয় খবর পাঠাবেন, আমি তৎক্ষণাৎ চলে আসব।'

প্রতুলবাবু এবার চোখ খুললো, 'আমি একবার বউমাকে দেখতে চাই।'

অমরনাথ দুর্বল বোধ করলেন। প্রতুলবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে। তিনি বললেন, 'এ তো খুবই ভাল কথা। তবে, আমার মেয়ে বড় জেদী।'

প্রতুলবাবু হাসলেন, 'এককালে মাংস কেনার আগে খাসিটাকে দেখতাম। যার ঘাড় শক্ত, জেদী, ঢুঁস মারছে আর গায়ের রঙ কালো সেটাকেই কাটতে বলতাম। জেদীদের পোষ মানাতে আনন্দ পেতাম তখন। আজ ক্ষমতা নেই, বিছানায় পড়ে আছি। কিন্তু আপনার মেয়েকে তো ভাল করে মনেও নেই। এই ক'বছর সে নিশ্চয়ই অনেক বড় হয়েছে। আমার এই বিষয়সম্পত্তির সে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। আর একজন তো পাগল হয়ে হাসপাতালে। ওর সঙ্গে তাই আমি কথা বলতে চাই। যদি সে সারাজীবন বৈধব্য পালন করে তাহলে— ।' ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন প্রতুলবাবু। অমরনাথ পাথরের মত দাঁড়িয়েছিলেন। পেছনে শব্দ হল। আনা ছোট একটা ট্রেতে চা আর মিষ্টি রেখে সামনে এসে দাঁড়াল, 'নিন, এগুলো খেয়ে নিন।'

অমরনাথের যেন সম্বিত ফিরল, 'না না। আমার খুব দেরি হয়ে গেছে।'

'আরও একটু হোক।' আনা হাসল, 'আচ্ছা, আপনি বরং বাইরের ঘরে বসে খাবেন আসুন। রুগীর সামনে— ।' আনা ট্রে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

অমরনাথের আর দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। তিনি প্রতুলবাবুকে বললেন, 'আচ্ছা, আজ তাহলে চলি। নমস্কার।' প্রতুলবাবু মাথা নাড়লেন।

বাইরের ঘরে পৌঁছে অমরনাথ দেখলেন টেবিলে চা মিষ্টি রেখে আনা দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, 'এসবের কি দরকার ছিল। বাড়িতে যখন অসুস্থ মানুষ— ।'

'বাঃ। কুটুম শুকনো মুখে ফিরে যাবে ?' আনা হাসল।

'আমি তাহলে চা খাচ্ছি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চা খেয়ে নিতে চাইলেন তিনি। কিন্তু আনা শুনল না, 'ওমা, বসে খান। এতে এ বাড়ির অকল্যাণ হবে।'

অগত্যা বসলেন অমরনাথ। আনা খানিকটা তফাতে দাঁড়িয়ে। আনা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার মেয়ে তো জলপাইগুড়িতে থেকেই পড়ছে !'

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন অমরনাথ।

আনা বলল, 'আপনাকে কয়েকটা কথা বলব।'

অমরনাথ তাকালেন।

আনা হাসল, 'ওঁর অবস্থা তো বুঝতে পারছেন। এখন শুধু দিন গোনা। এত বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা কিছুই করছেন না। এদিকে শকুনগুলো ওৎ পেতে রয়েছে। মরলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি একা মেয়েছেলে তাদের সঙ্গে লড়ব কি করে বুঝতে পারছি না। আপনি যদি আমার পাশে দাঁড়ান তাহলে ভাল হয়।'

'কি করতে হবে আমাকে ?' অমরনাথ সতর্ক হলেন।

'দেখুন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে এ বাড়িতে এসেছিলাম। আমাব যৌবন দিয়ে শুধু নয়, সেবা দিয়েও ওকে শান্তি দিচ্ছি। স্ত্রী ছিল কিন্তু তার তো কোন ক্ষমতা ছিল না। আমার জীবনটা এ বাড়ির জন্যে খরচ করেছি। এই যে এখনও আমি এখানে পড়ে আছি তা শুধু মায়ার জন্যে। আমার শরীর কি বুড়ি হয়ে গিয়েছে, বলুন ?'

অমরনাথ মাথা নেড়ে না বললেন।

'তাহলে নিজেকে আমি বঞ্চিত করব কেন ? আমি ওঁর সম্পত্তির ভাগ চাই। তবে একা নিতে চাইলে উনি দেবেন না। কিছুদিন হল খুব বউমা বউমা করছেন। আমি বাধা দিচ্ছি না। আপনি কোন ভাল উকিলকে দিয়ে একটা উইল কবান। সম্পত্তির ভাগ দুটো হবে। একটা আমার আর অন্যটা আপনার মেয়ের। উইলটা তাড়াতাড়ি করিয়ে ওঁকে দিযে সই করিয়ে নিতে হবে। ততদিন আমি ওঁকে আগলে রাখব। বুঝেছেন ?'

'যদি প্রতুলবাবু সই না করেন ?'

'বললাম তো, আমি একা চাইলে সই করবেন না। কিন্তু আপনার মেয়ে এলে মনে হয় না বলতে পারবে না।'

'কিন্তু উনি শর্ত দিয়েছেন যে দীপাকে বিধবা থাকতে হবে।'

'থাকবে। হিন্দু বিধবাকে ঘরের বউ করে ক'জন নেয়। আর সে তো আমার মত অশিক্ষিত নয় যে শুধু দাসীবৃত্তি করবে। সে পড়াশুনা করছে, মাথা উঁচু করে থাকবে। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামীর ঝিগিরি করার চেয়ে এত সম্পত্তির দখল নিয়ে মর্জিমত চলতে পারবে। কেন, আপনার কি মেয়ের আবার বিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে ?'

'না, না। এখন তো সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে না।'

'দেখুন বেয়াই মশাই, মেয়ে তো আপনার নিজের নয়। আর বয়স এমন কিছু হয়নি

আপনার। এই সম্পত্তির আধভাগ পেলে আপনার জীবন বদলে যাবে। মেয়ে তো নামেই, ভোগ করবেন তো আপনিই। শুধু আমার সঙ্গে যুক্তি করে চলুন, কোন অসুবিধে হবে না।' আনা মিষ্টি করে হাসল।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অমরনাথ উঠলেন, 'তাহলে আমি চলি।'

আনা অমরনাথকে সঙ্গে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল, 'তাহলে উইল কবে আনছেন?'

'দেখি।' বিড়বিড় করলেন অমরনাথ।

'কি আশ্চর্য! আপনি এখনও দেখি বলছেন?'

'না, মানে উকিলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হবে তো! ওঁব বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ আমি জানিও না। সেসব তো পরিষ্কার করে উইলে লিখতে হবে!'

'তার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না। প্রথমবার যখন অসুখ থেকে উঠলেন তখন উনি একটা কাগজে সব লিখে উকিলবাবুকে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন। তারপর আবার অসুখে পড়তে সেটা আর দেওয়া হয়নি। সেই কাগজটা আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। ওটা আমি আপনাকে দিতে পারি।' আনা গম্ভীব গলায় বলল।

'কাগজটা একবার দেখতে হয়।'

'আপনাকে আমি কিন্তু বিশ্বাস করছি।'

'ঠিক আছে।'

আনা সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। হাঁটুর ওপর সিরসির করতে লাগল অমবনাথের। তিনি কি একটা ষড়যন্ত্রে সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছেন! তা কেন হবে! প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই সজ্ঞানে পড়ে সই কববেন। জালিয়াতিব কোন ব্যাপার নেই। এই বিশাল সম্পত্তির অর্ধেকটা তাঁর হস্তগত হতে যাচ্ছে। মনে হঠাৎ পুলক জাগল তাঁব। এখন আর আগুপিছু কোন ভাবনা মাথায় আসছে না। আনার সঙ্গে হাত মেলাতে কোন আপত্তি নেই। হরদেব ঘোষালের চাইতে আনা শতগুণে ভাল। শকুনের মত দেখতে বুড়োর থেকে স্বাস্থ্যবতী যৌবন যাবো যাবো মহিলা তো চিবকালই শ্রেয়। এখন ওই কাগজে যদি বিশদ লেখা থাকে তবেই বাঁচোয়া।

উইলের কথা মনে আসতেই উকিলের চিন্তা এল। জলপাইগুড়ির কোন উকিলকে তিনি চেনেন না। আসলে এতদিন কোর্ট কাছারি করতে হযনি যাঁকে তিনি কি করে উকিল চিনবেন! কোর্ট কাছারির কথা মনে পড়তেই হবদেবের মুখ যেন দেখতে পেলেন তিনি। অসম্ভব। হরদেবকে এসব কথা বলা যাবে না।

এইসময় আনা ফিরে এল তিন চাবটে ফুলস্কেপ কাগজ হাতে নিয়ে। এক পলক চোখ বুলিয়েই অমরনাথ বুঝতে পারলেন এটা একটা উইলের খসড়া। চটপট ভাঁজ করে সেটাকে পকেটে পুরে রাখলেন তিনি। তারপর বললেন, 'আমি সাতদিনের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করছি। কোন চিন্তা নেই।'

আনা বলল, 'ভাল। তবে এভাবে পিছু টান নিয়ে আসবেন না। উইলের কাজ, হয়তো রাতে থেকে যেতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে এই বাড়িতেই থাকবেন। অনেক ঘর পড়ে রয়েছে। কুটুম বলে লজ্জা করবেন না।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'না, না। সে পরে ঠিক করা যাবে।'

পা বাড়াতে গিয়ে অমরনাথ দেখলেন একটা লোক সাইকেলে চেপে বাগানের মধ্যে দিয়ে আসছে। একেবারে তাঁর সামনে পৌঁছে সাইকেল থেকে নেমে লোকটা বলল, 'টেলিগ্রাম'।

অমরনাথ মুখ ফিরিয়ে আনার দিকে তাকালেন। আনা বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে।

সে ইশারায় অমরনাথকে টেলিগ্রাম নিতে বলল। লোকটার এগিয়ে দেওয়া খাতায় সই করে অমরনাথ টেলিগ্রামের খাতাটা আনার দিকে এগিয়ে ধরতে আনা বলল, 'ওমা, আমি লেখাপড়া জানি নাকি ! একটু আধটু বাংলা পড়তে পারি। ওটা কি বাংলায় লেখা ?'

অমরনাথ খামের মুখটা খুলে কাগজটা বের করলেন। খবরটা পড়ে তিনি কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। আনা পেছন থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি লেখা আছে ওতে ?'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'উনি নেই।'

'কে নেই ?' দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে এল আনা।

'প্রতুলবাবুর স্ত্রী।'

আনা থামকে দাঁড়াল। পলকেই তার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

অমরনাথ বললেন, 'হাসপাতাল থেকে টেলিগ্রাম করেছে। মৃতদেহ ওরা আজ বিকেল পর্যন্ত রেখে দেবে বলে লিখেছে।'

'আজ বিকেল ? বিকেল তো শেষ হয়ে গিয়েছে।'

'হুঁ।'

'দিন।' হাত বাড়াল আনা। অমবনাথ টেলিগ্রামটা দিলেন। তারপর বললেন, 'এখন রওনা হলেও তো মৃতদেহ দেখা যাবে না। টেলিগ্রাম দেরি করে এসেছে। কি হয়েছিল তা অবশ্য লেখা নেই।'

'যাবে জানতাম। তবে এত তাড়াতাড়ি— ।'

'পাগল মানুষের অবশ্য বেঁচে থাকার চেয়ে যাওয়াই মঙ্গল।'

'হ্যাঁ। বেঁচে গেল।'

'কিন্তু এখন তো ওঁর কাজকর্ম করতেই হবে। অশৌচ বলে কথা।'

'কিসের অশৌচ ?'

'বাঃ। বাড়ির বউ মরে গেলে অশৌচ হবে না ?'

'আপনার মেয়েকেও তাহলে সেসব মানতে হয়। মানবে ?'

অমরনাথ আকাশের দিকে তাকালেন। মনে মনে বললেন না মানাব তো কাবণ কিছু নেই। জন্ম ও বিবাহসূত্রে যে আত্মীযতা তা কি কখনও অস্বীকার করা যায় ? তাঁর মনে হল ব্যানার্জীবাড়ির ব্যাপারে দীপার যে তীব্র আপত্তি রযেছে তা নরম করার জন্যে এই খবরটাকে ব্যবহার করা যায়। যদিও মেয়ের ওপব তিনি এ ব্যাপাবে আস্থা বাখতে পাবছেন না কিন্তু সম্পত্তি পাওযার ব্যাপাবে অশৌচ পালন কবাটা অত্যন্ত জরুরী। তিনি জবাব দিলেন, 'মানতেই হবে।'

'কিন্তু আমি বলছি মানাব কোন দরকাব নেই ?' আনা বলল।

'মানবে না ?' হতভম্ব অমরনাথ।

'না। কারণ উনি মারা যাননি।'

'কি আশ্চর্য ! টেলিগ্রাম— ।'

'টেলিগ্রাম এসেছে। কিন্তু তাতে অন্য কথা লেখা আছে। ওঁর শরীর খাবাপ হয়েছে। হাসপাতাল থেকে তাই জানিয়েছে। মারা যাওয়ার খবর আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না। যদি তাই হল তাহলে অশৌচ কিসের ?'

'এসব তুমি কি বলছ ?' আর আপনি নয়। কাজের মেয়েছেলেকে তুমি বলা উচিত, অমরনাথের অবচেতন মন জানিয়ে দিল।

'ঠিকই বলছি। খবরটা কর্তা পেলে আর উইলে সই করা পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন

ভেবেছেন ? সারা জীবন যাদের ওপর অত্যাচার করেছেন এখন তাদেব জন্যে ওঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। দিনরাত অনুতাপ করছেন। এইসময খবরটা শুনলে হয়তো হার্ট ফেল করে ফেলবেন। আপনি তা চান ?' আনাকে খুব হিংস্র দেখাচ্ছিল।

'না, না। তা নয় !'

'আমি ওকে মেবে ফেলতে দেব না। আপনি আপনাব মেযের ভাল না চাইতে পারেন আমি আমার স্বার্থ দেখব।'

'খববটা তো একদিন দিতে হবে।'

'উইল হযে যাওয়াব পব। শুনুন, আমি একদিন আপনার মেয়েকে বাঁচিযেছিলাম। যদি সত্যি সেটা মনে বাখেন তাহলে যা বলছি তাই শুনুন। এই মৃত্যুসংবাদ আমবা দু'জন ছাডা কেউ জানবে না। কথা দিন।'

'বেশ।' অমরনাথ সম্মোহিতের মত উচ্চাবণ করলেন।

'তাহলে সাতদিনের মধ্যে উইল আব উকিল নিযে আসুন।' আনা দ্রুত পায়ে ভেতবে চলে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। মন খুব খাবাপ হয়ে গিয়েছিল অমবনাথের। সম্বন্ধ কবতে আসার দিন দেখা মহিলাকে মনে পডছিল। হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে আসার সময় ভাবছিলেন অদ্ভুত মানুষের জীবন। বেঁচে থেকে যে স্বীকৃতি পায়নি মরে গিযেও তা হারাল।

'এই যে মশাই। আমি তো ভাবলাম ওখানেই বাত কাটাবেন।' গলা কানে আসতেই অমবনাথ হরদেবকে দেখতে পেলেন। গেটেব বাইরে দাঁডিযে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘিনঘিনে ভাব এল। তিনি বললেন, 'চলি। অনেক দেবি হযে গিযেছে।'

'কথা হল ?'

'তেমন নয়।'

'টেলিগ্রামটা কিসেব বলুন তো ? আপনি তো সই করে নিয়েছেন দেখলাম।'

'ওঁব স্ত্রী খুব অসুস্থ।' কথাটা বলেই অমবনাথের মনে হল তিনি পাঁকের মধ্যে নেমে পডলেন।

হবদেব বলল, 'ওই মেযেছেলেটা কি বলল ? ঘোডা ডিঙিযে ঘাস খেতে চাইছে। আমাকে তো চেনে না বাছাধন।'

অমবনাথ হাত জোড কবলেন, 'এবাব আমাকে যেতে দিন শেষ নৌকো হয়তো ছেড়ে যাবে।' উত্তরের অপেক্ষায না থেকে তিনি প্রায দৌডাতে লাগলেন।

॥ ২০ ॥

এখনও জলপাইগুডিব রাস্তায কোন হোস্টেলেব মেযে একা ঘুবে বেড়ায় না। দীপা এমন কাণ্ড কবেছে কযেকবার। সুপাবিনটেনডেন্ট ঘরে ডেকে বেশ কডা কথা শুনিয়েছেন। পরিষ্কার বলেছেন, 'দেখো, তোমাদের দায়িত্ব আমাব ওপর দেওয়া হয়েছে। কিছু ঘটলে কৈফিয়ত আমাকেই দিতে হবে। তোমাদের বয়সের মেয়েকে একা রাস্তায় দেখলে এমনিতেই মানুষের কৌতূহল হয তার ওপব হোস্টেলেব মেযে জানলে তো কথাই নেই।'

'হোস্টেলের মেয়ে কি আলাদা ?' দীপার পছন্দ হচ্ছিল না কথাগুলো।

'হ্যাঁ। আলাদা। সাধারণ মানুষের ধারণা যেসব মেয়ে হোস্টেলে থাকে তারা খুব স্বাধীন। বাবা মাযের চোখেব ওপর থাকতে হয় না বলে যা ইচ্ছে তাই করে। একটু চেষ্টা করলেই এদের কব্জা করা যায়। ঘরের মেয়েদের থেকে তোমাদের আলাদা চোখে দেখে।

যখনই কলেজে যাবে দলবেঁধে যাবে।'

ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যে নয়। হোস্টেলের উল্টোদিকে সকাল থেকে সন্ধে কিছু ছেলে সাইকেল নিয়ে বসে থাকে। কলেজে যাওয়ার সময় সাইকেলে চেপে একটা না একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে যায়। ওরা দাঁড়ায় না তাই প্রতিবাদ করার সুযোগ পাওয়া যায় না। মেয়েদের কমনরুমে প্রথম দিকে দুটো ভাগ স্পষ্ট দেখা যেত। যারা বাড়িতে থেকে কলেজে পড়ে তারা যেন একটু দূরত্ব রাখত। আলাপ হলে কেউ কেউ বলে ফেলেছে, 'তোমরা খুব স্বাধীন, না ? আচ্ছা, বাড়ির জন্যে মন কেমন করে না ? হোস্টেলে মেয়েরা সিগারেট খায়, তাই না ? ইস্, আমি যদি হোস্টেলে থাকতে পারতাম !'

কলেজে পৌঁছে মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে যেতে হয়। দীপা লক্ষ্য করেছে সেখানে কেউ পড়াশুনার কথা বলে না। হয় শাড়ি নয় কোন ছেলেকে নিয়ে আলোচনা অথবা দু'জন বিবাহিতা ছাত্রীকে ঘিরে তার ব্যক্তিগত জীবনের গল্প শুনেই সময় কাটে মেয়েদের। প্রতিটি পিরিয়ডের আগে স্যার এসে দাঁড়ান দরজার বাইরে। তাঁর ক্লাসের যারা ছাত্রী তারা তাঁকে অনুসরণ করে ক্লাসে যায়। ক্লাসরুমে ছেলেদের স্পর্শ বাঁচিয়ে মেয়েদের আলাদা বসার বেঞ্চি আছে। সেটা সাজানো থাকে অধ্যাপকের মুখোমুখি। কিন্তু প্রতিটি ক্লাসেই বেঞ্চিতে বসার পরে কেউ না কেউ চিরকুট পায়। তাতে যেমন কবিতার লাইন থাকে তেমনি অশ্লীল শব্দাবলীও বাদ যায় না। ক্লাসের পর কমনরুমে পৌঁছে তাই নিয়ে জোর হাসাহাসি চলে মেয়েদের মধ্যে। কেউ কেউ আবার নিজের নাম না দিয়ে জবাব লেখে। চাপান উতোর পালার কি পরিণাম হবে তা দীপা জানে না।

আজ বেঞ্চিতে বসতেই দীপা দেখল ডেস্কের ফাঁকে একটা কাগজ ভাঁজ করা রয়েছে। অধ্যাপক তখন রোল কল করছেন। দীপা কাগজটা টেনে বের করল। তাতে লেখা রয়েছে, 'হাসি কেন নেই মুখে, বাজে দাগা এই বুকে।' তারপর একটা গোমরা মুখের স্কেচ পাশে তার নাম লেখা। নিজের নম্বরের সময় সাড়া দিয়েছিল দীপা। অধ্যাপক রেজিস্টার সরিয়ে পড়ানো শুরু করতে যাচ্ছেন এই সময় সে উঠে দাঁড়াল। এখন পর্যন্ত ক্লাসরুমে কোন মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অধ্যাপককে প্রশ্ন করেনি। ফলে সমস্ত ক্লাস অবাক হয়ে তাকিয়েছে তার দিকে। দীপার একটু অস্বস্তি হল। অধ্যাপক বই রেখে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি কিছু বলতে চাও ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। আমরা যখন ক্লাসে এসে বেঞ্চিতে বসি তখন এইরকম কাগজের টুকরো দেখতে পাই। প্রায় প্রতি পিরিয়ডের আগে আপত্তিকর কথা লিখে এখানে রাখা হয়।'

অধ্যাপক যেন নার্ভাস বোধ করলেন, 'কি লেখা আছে ওতে, দেখি।'

দীপা ডেস্ক ছেড়ে বেরিয়ে এসে ভদ্রলোকের হাতে কাগজটা তুলে দিল। তিনি সেটি খুলে পড়লেন, পড়ে হাসলেন। দীপা আড়চোখে দেখল সমস্ত ক্লাস চুপ করে রয়েছে। ছেলেরা টানটান। অধ্যাপক বললেন, 'রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে শুধু সবুজ ঘাস পাবে এমন কথা নেই, পাথরের টুকরো কাচের কুচিও পড়ে। সেগুলোকে অবহেলায় এড়িয়ে যেতে হয়। এই চিরকুটকে কোন মূল্য দিও না।'

দীপা বলল, 'আপনি কি মনে করেন না যে এসব লেখা খুব নিচু মনের পরিচয় ?'

'নিশ্চয়ই। কুরুচিই প্রকাশ পায়। তবে এইরকম উৎপাত তো অনেক বছর ধরেই চলে আসছে। কোন মেয়েকে প্রতিবাদ করতে শুনিনি। তুমি করেছ, ভাল লাগছে। কি নাম তোমার ?'

'দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় ।'

দীপা ফিরে এসেছিল নিজের জায়গায় । তখনই ছেলেদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছিল । অনেকেই নড়েচড়ে বসেছিল । অধ্যাপক পড়ানো আরম্ভ করেছিলেন । দীপা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল বারংবার । কাগজের ছবিটার কথা ভাবলেই রাগ হয়ে যাচ্ছিল তার । ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকের পেছন পেছন তারা যখন বের হচ্ছে তখন হঠাৎ একটি ছেলে বলে উঠল, 'কাল কেউটে ।' সঙ্গে সঙ্গে চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল পেছনে ।

দীপা ঘুরে দাঁড়াল, 'শুনুন, আমরা সবাই এক বয়সী, একই ক্লাসে পড়ি । যদি কারো কথা বলার ইচ্ছে হয়ে থাকে সে সোজাসুজি কথা বললে ভাল হয় না ? সেটাই কি উচিত না ? আমরা মেয়ে কিন্তু অন্য গ্রহের জীব তো নই । আপনাদের বাড়িতে যেসব মহিলা আছেন তাঁদের সঙ্গে কি আপনারা কথা বলেন না ?'

ছেলেগুলো হকচকিয়ে গেল । এ ওর মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল । দীপা আর দাঁড়াল না । তার সঙ্গিনীরা অনেক আগেই কমনরুমে চলে গিয়েছে । দীপা সেখানে পৌঁছনোমাত্র মেয়েরা এসে ঘিরে ধরল তাকে ।

এখন মেয়েরা দুভাবে বিভক্ত । কারো মতে দীপা ঠিক করেছে । প্রতিদিন ওই সব কথার সঙ্গে অশ্লীল শব্দ পড়তে ঘেন্না করে । ছেলেদের একটু বুঝিয়ে দেওযা দরকার ছিল । তবে ছেলেরা যদি কথা বলতে চায় হোস্টেলের মেয়ে হিসেবে দীপা কথা বলতে পারে কিন্তু তাদের পক্ষে সবার সামনে কথা বলা সম্ভব না । বাড়িতে জানলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে । বিপক্ষের মতে, অত ডাঁট দেখানো উচিত হয়নি । ছেলেদেব লেখা কাগজ তাদের পড়তে খারাপ লাগে না । শুধুই তো পড়া, কেউ গায়ে পড়ে কথা বলতে এলে দাদা কাকাকে বলে ধোলাই-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় । কিন্তু এই খেলার সুখ থেকে বঞ্চিত করার কোন অধিকার দীপার নেই । দ্বিতীয় দল অবশ্য প্রকাশ্যে চেঁচিয়ে মতামত ব্যক্ত করল না । কিন্তু চাপা অসন্তোষ বুঝতে অসুবিধে হয়নি ।

ছুটিব পবে দীপা আরও দু'জন মেয়ের সঙ্গে ফিরছিল । এই মেয়েদুটি খুবই শান্ত । হোস্টেলে এসে আবও গুটিযে গিযেছে । পড়াশুনা আর কলেজেব বাইরে অন্য কিছুতে মন নেই । কলেজ গেটের সামনে পৌঁছতেই হঠাৎ একটি ছেলে এগিয়ে এল 'নমস্কার । আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি ?'

দীপা থমকে দাঁড়াল । ওর সঙ্গিনীবাও । ছেলেটি বলল, 'আমাব নাম নিশীথ । আপনার সঙ্গেই পড়ি । আজ আপনি যেভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাতে আমরা খুব লজ্জিত হয়েছি । ওভাবে কাগজ রেখে আব আপনাদেব বিরক্ত করা হবে না, কথা দিচ্ছি ।'

'এই কথাগুলো ক্লাসেই বলতে পারতেন ।'

'পারতাম । কিন্তু ব্যাপাবটা বুঝতে যে সময় লাগল ।'

'খুব ভাল ব্যাপার । ওগুলো পড়লে শবীব মন ভাল থাকে না ।'

'আসলে কেউ কেউ বসিকতা করতে চেয়েছিল ।'

দীপা এর পর কি বলতে পারে । সে দেখল সঙ্গিনীরা উশখুশ করছে । অতএব আর কথা বাড়াল না, 'এবার চলি ।'

নিশীথও বোকার মত হাসল । দৃশ্যটা সমস্ত কলেজ দেখছে দূর থেকে । মুখে মুখে ঘটনাটা ছড়িয়ে পড়েছে । কলেজ শুদ্ধ ছেলের দল অপেক্ষা করছিল দীপাকে দেখবে বলে । নিশীথ এই সুযোগে হিরো হয়ে গেল । হাঁটতে হাঁটতে দীপা সেটা বুঝতে পারল । একেবারে শেষ মুহূর্তে তার কানে এল, কেউ একজন চিৎকার করছে, 'মাস্টারনি ।'

হোস্টেলে ফেরার পর মেয়েরা তাদের ঘরে এল। এখনও মায়া ফেরেনি। ঘরটা তাই তার একার অধিকারে। দীপকে গোল করে ঘিরে সবাই জানতে চাইল কাগজটায় কি লেখা ছিল, কলেজ গেটে সেই ছেলেটা তাকে ঠিক কি বলেছিল! কারণ যে দুটি মেয়ে দীপার সঙ্গে ছিল তারা বলছে যে কিছুই শোনেনি। হোস্টেলে ফেরার সময় একটা ছেলে আগবাড়িয়ে কথা বলতে শুরু করায় তারা নাকি নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল। দীপা সরল গলায় ঘটনাটা বলামাত্র সবাই হই চই করতে লাগল। যেন বিরাট জয় হয়েছে মেয়েদের।

কিন্তু পরদিনই কলেজে গিয়ে দেখা গেল দীপাব নামকরণ করা হয়েছে। এখন সবাই মাস্টারনি বলতে দীপাকেই বোঝে। কানের কাছে ওই শব্দটা ঘন ঘন উচ্চারিত হতে লাগল। প্রথমে খুব ক্ষেপে গিয়েছিল দীপা। এমন কি মিতা পর্যন্ত কমনরুমে বসে বলল, 'জানিস, মাস্টারনি ছাড়া তোর আর একটা নাম হয়েছে, পিসিমা।' দীপাব মনে হয়েছিল এবার প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে অভিযোগ কবা উচিত। কিন্তু মিতা তাকে নিষেধ করল, 'দুর! তুই যত রাগ করবি ওরা তত আনন্দ পাবে।'

মিতার এই কথাটা খুব পছন্দ হল দীপার। কলেজে ঢোকামাত্র তার কানে মাস্টারনি এবং পিসিমা শব্দদুটো বর্শার মত বিঁধতে লাগল। ঠোঁট কামড়াতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল সে। প্রথম পিরিয়ডে ক্লাসে ঢুকে প্রত্যেকটা মেয়ে আবিষ্কার করল ডেস্কেব ফাঁকে কিছু গোঁজা নেই। ক্লাস শেষ হলে অধ্যাপকেব পেছন পেছন যখন মেয়েবা বেবিয়ে যাচ্ছে দীপা ঘুরে দাঁড়াল। ছেলেরা সবাই বেঞ্চি ছেড়ে বেরুবাব জন্যে তৈবী হচ্ছিল, দীপাকে ঘুবে দাঁড়াতে দেখে নিস্তব্ধ হল। ততক্ষণে অধ্যাপকেব সঙ্গে সমস্ত ছাত্রী চলে গিয়েছে কমনরুমের দিকে। দীপা নিশীথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। আমাব অনুরোধ রেখেছেন বলে খুশি হয়েছি।'

নিশীথ কিছু বলাব আগেই লম্বামত একটা ছেলে বলল, 'আমবা ভদ্রলোক, পছন্দ না করলে বিরক্ত করব কেন?'

দীপা বলল, 'বারে, বিরক্ত হতে কেউ পছন্দ কবে নাকি!'

ছেলেটি মাথা নাড়ল, 'করে করে। মেয়েবা যা চীজ।'

দীপার মুখ মুহূর্তেই পাল্টে গেল, 'মানে?'

ছেলেটি ততক্ষণে বুঝতে পেবেছে, চট কবে নিজেব কানদুটো দু হাতে ধবে জিব বেব করে বলল, 'সরি। আর কক্ষনো হবে না দিদিমণি।' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস হাসিতে ফেটে পড়ল। দীপার একবার মনে হল ঘর ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু প্রায় জেদ কবেই সে থেকে গেল, 'আপনার বয়স কত?'

'সতের।' ছেলেটি বলল।

'আমি পনের পার হয়েছি। আমি কি কবে তোমাব দিদিমণি হব?'

'তোমার? তুমি, আপনি আমাকে তুমি বললেন?' ছেলেটা হতভম্ব।

'নিশ্চয়ই। এক ক্লাসে পড়ি, তোমার বয়স সতের, তুমি মেয়ে হলে কি আপনি বলতাম? তুমি কি কোন ছেলেকে আপনি বল?'

'বলি না। তাহলে আমিও তোমাকে তুমি বলব।'

'সহপাঠী যখন তখন নিশ্চয়ই বলতে পার।'

প্রতি পিরিয়ডের শেষে মিনিট দশেকের জন্যে কমনরুমে যেতে হত মেয়েদের। কিন্তু দীপা থেকে গেল ক্লাসেই। সাত-আটটি ছেলে তাকে ঘিরে বেঞ্চিতে বসে কথা বলতে লাগল। লম্বা ছেলেটির নাম হরিপদ। খুব মজার মজার কথা বলে। সে বেশি বলছিল,

'শোন, মাইরি আমার যা আনন্দ হচ্ছে, উঃ, আজ রাত্রে ঘুমতে পারব না।'

'ওমা কেন?' দীপা ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল।

'সারারাত স্বপ্ন দেখব আমি মরুভূমির মাঝখানে ওয়েসিস পেয়ে গেছি।'

'ওয়েসিস?'

'তাই নয় তো কি? আমাদের বাড়িতে সব দেবতার পা। বাবার নাম বিষ্ণুপদ, কাকার নাম শিবপদ, আমি হরিপদ, ভাই গোবিন্দপদ, কোন মেয়ে নেই চারপাশে। আপনি, মানে, তুমি হলে প্রথম মেয়ে যার সঙ্গে এইভাবে কথা বলছি।'

'তোমার মা নেই?'

'না। ভাই-এর জন্মাবার পর মা বিষ্ণুর কাছে চলে গিয়েছে।'

'বিষ্ণুপদ মানে কিন্তু বিষ্ণুর পা নয়।'

হরিপদ হকচকিয়ে গেল। নিশীথ বলল, 'পদ মানে তো পা।'

'হ্যাঁ, কিন্তু বিষ্ণুপদ মানে আকাশ।' দীপা জানাল।

বিস্ময়সূচক শব্দ মুখগুলো থেকে বেরিয়ে এল। হরিপদ বলল, 'আমার বাবা আকাশে? অসম্ভব। বাবার সঙ্গে আমাদের কোন মিল নেই। বাবার গায়ের রঙ অন্ধকারের চেয়ে কালো।'

আবার হাসির ফোয়ারা উঠল। নিশীথ জিজ্ঞাসা করল, 'বিষ্ণুপদ মানে যদি আকাশ বিষ্ণুপদী তাহলে সাগর, না মাটি?'

দীপা বলল, 'গঙ্গা।'

হরিপদ বলল, 'তুমি তো অনেক জানো। কোন স্কুলে পড়েছ।'

'আমি চা-বাগানের স্কুলে পড়তাম। কিন্তু আমার একজন মাস্টারমশাই ছিলেন। যিনি আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন।

কলেজের একটি মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেশে, তুমি তুমি করে কথা বলে, শহরে খবরটা চাউর হতে বেশি সময় লাগল না। এখন আর দীপাকে কেউ দূর থেকে আওয়াজ দেয় না। কমনরুমের চেয়ে ক্লাসরুমেই সে বেশি আড্ডা দেয়। আর এই ঘটনার পরে দীপা মেয়েদের কাছে একঘরে হয়ে পড়ল। বেশিরভাগ মেয়েই তাকে এড়িয়ে যায়। একজন তো বলেই ফেলল, 'ভাই আমরা কলেজে পড়তে এসেছি, তোমার মত ছেলেদের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে তো আসিনি। ছি ছি ছি।' এমন কি মিত্রা আর আগের মত গল্প করে না সবার সামনে। মন ভাল ছিল না দীপার। ছেলেদের নিয়ে যারা চব্বিশ ঘণ্টা আলোচনা করে তারা কেন এমন ব্যবহার করবে কেউ ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে!

প্রথম প্রথম একটু চক্ষুলজ্জা ছিল, এখন হরিপদ বা নিশীথের সঙ্গে কলেজ থেকে হোস্টেলে আসতে একটুও খারাপ লাগে না। নিশীথ ভাল ছেলে কিন্তু হরিপদকে ওর বেশি পছন্দ হয়। ও যখন কথা বলে তখন কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে এমন ভাবনা যেন মাথায় কাজ করে না। মেয়েরা তাকে এখন আড়ালে মক্ষীরানী বলে ডাকতে শুরু করেছে। ছেলেরা আর আওয়াজ দেয় না। তবে এখন পর্যন্ত ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গেই আড্ডা মারে দীপা। ব্যাপারটা উঁচু ক্লাসের ছেলেদেরও চমকিত করে। কলেজে মেয়েদের সংখ্যা কম। সিনিয়ার মেয়েদের একজন তাকে ডেকে বলেছিল, 'তোমার তো খুব সাহস। এইভাবে কেউ কখনও ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারেনি, তা জানো? দুর্নামের ভয় পাওনা?'

'দুর্নাম হবে কেন? আমার সঙ্গে যারা পড়ে তারা কি নোংরা?'

'নোংরা হতে যাবে কেন, তারা মেয়ে নয়, ছেলে।'

'তাতে দোষ কিসের ? কেউ তো কারো ভাই দাদা অথবা ছেলে। ওরা যখন বাড়িতে থাকে তখন বাড়ির মেয়েরা ওদের সঙ্গে কথা বলে না ?'

'বাড়ির মেয়ে আর আমরা এক হলাম ?'

'একই। আলাদা ভাবলেই কমপ্লেক্স তৈরি হয়।'

'কমপ্লেক্স ? একটা ইংরেজি শব্দ বলে দিলেই হল। বাড়ির মেয়ের সঙ্গে কেউ প্রেম করে না কিন্তু আড্ডা মারলে একটা বাজে ছেলে প্রেম করতে চাইতে পারে, জানো ?'

'কেউ যদি একা একা প্রেম করে তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ প্রেম করতে এলে আমি তাতে মত দিয়ে দেব ? কি বোকা বোকা কথা !'

সিনিয়ার মেয়েটি অবাক হয়ে বলেছিল, 'তুমি তাকে কি বলবে ?'

'বলব, সহপাঠীর মত যদি মিশতে পারো মেশো না হলে কথা বলো না।'

মেয়েটি আর কথা বলেনি। মফস্বল শহরের ইতিহাসে এমন ব্যাপার বড় একটা ঘটেনি। কলেজের সিনিয়ার ছেলেরা আগ বাড়িয়ে আলাপ করতে চাইল। কিন্তু দীপা ঠিক করে নিয়েছিল সে কি করবে। ছেলেগুলো ওর শীতল কথাবার্তায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে গেল। দিন দশেকের মধ্যেই সে প্রচারিত হয়ে গেল কলেজ এবং সংলগ্ন মহলে। শেষপর্যন্ত সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে ডাক পড়ল তার। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমার সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলছে। আমাদের দেশে এখনও ফ্রি মিক্সিং চালু হয়নি, কেউ মেনেও নিতে পারে না। এটা বুঝতে পারো না কেন ?'

দীপা শান্ত গলায় বলল, 'ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলাকে কি ফ্রি মিক্সিং বলে ? আমি ঠিক মানে জানি না !'

ভদ্রমহিলা আরও গম্ভীর হলেন, 'ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারার কি দরকার ? মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে সুখ হয় না তোমার ?'

দীপা হেসে ফেলল, 'সত্যি কথা বলব ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

'মেয়েদের সঙ্গে পাঁচ মিনিটের বেশী কথা বলা যায় না। কারণ ওরা পৃথিবীর কিছুই জানতে চায় না। শাড়ি গয়না আর বিয়ে ছাড়া কোন চিন্তা করতে পারে না। ছেলেদের নিয়ে রসিকতা করেই আরাম পায়।'

'আর ছেলেরা এসব করে না বুঝি ?'

'করে হয়তো তবে শাড়ি গয়না নিয়ে কথা বলে না। আমি থাকলে কোন মেয়েকে নিয়ে রসিকতা করে না। নিশীথ গল্প লেখে। জলপাইগুড়ির কাগজে ওর লেখা বেরিয়েছে। ওর সঙ্গে কথা বললে সাহিত্যের অনেক খবর পাই। রথীন সারা পৃথিবীর খেলাধুলোর হিসেব জানে। আর যারা রাজনীতি করে তারা তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করে তা আমাদের কোন মেয়ে বুঝতেই পারবে না।'

'আচ্ছা। তা এতে তোমার কি মোক্ষলাভ হচ্ছে ?'

'আমার মাস্টারমশাই বলতেন ভাল সঙ্গ পেলে মনের উন্নতি হয়। ওদের সঙ্গে মেশার আগে আমি অনেক কিছু জানতাম না।'

'তোমাকে বলা হয়েছিল হোস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে দল বেঁধে কলেজে যেতে। তুমি আমার কথার অবাধ্য হয়েছ। এ ব্যাপারে কোন বক্তব্য আছে ?'

'হ্যাঁ। যাওয়ার সময় কাউকে সঙ্গী পেলেও আসার সময় কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা

করে না। তা ছাড়া দিনের বেলায় একটা সভ্য শহরে একা হেঁটে যাওয়াটা কি অপরাধ ?'

'এই প্রশ্নের জবাব তোমাকে আমি দেব না। আমার হোস্টেলে থাকতে হলে তোমাকে কিছু নিয়মকানুন মানতে হবে। তোমার আচরণের জন্যে অন্য অভিভাবকরা যদি তাঁদের মেয়েদের এখানে না রাখতে চান তাহলে তোমাকেই হোস্টেলে থাকতে দিতে পারি না আমি।'

তর্ক করার ঝোঁক কোনমতে সামলে নিল দীপা। চুপচাপ ঘরে ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল। সে কোন অন্যায় করছে না অথচ এরা সবাই মিলে তাকে শাসাচ্ছে। কেন যে সহজ কথাটা কেউ বুঝতে চাইছে না সেটাই বিস্ময়ের। কিন্তু সত্যি যদি ওরা তাকে এই হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেয় ? জলপাইগুড়ি শহরে তার আর কোন থাকার জায়গা নেই। অমরনাথের মুখ মনে পড়ল। খবরটা শোনামাত্র তিনি প্রচণ্ড খেপে যাবেন। ভাল ছাত্রী বলে যে মানুষটা তার খরচ দিচ্ছেন তিনিও সেটা বন্ধ করলে অমরনাথ দীপাকে চা-বাগানে ফেরত নিয়ে যাবেনই। আর এই ফিরে যাওয়া মানে চিরকালের জন্যে পড়াশুনা শেষ হয়ে যাওয়া। ভাবতেই শিউরে উঠল দীপা। সত্যসাধন মাস্টারের সামনে সে দাঁড়াবে কি করে ? সত্যসাধন মাস্টার তাকে বলেছিলেন পড়াশুনা করে যেতে, সে কথাও দিয়েছিল। আর পড়াশুনা না করে বাড়িতে বসে থাকলে তো আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত তার ভবিষ্যৎ কোন বিশেষ খাতে বইবে না। স্বীকার করুক বা না করুক, বিধবা শব্দটার ছাপ সে চাইলেও লোকে মুছতে দেবে না।

রমলা সেনের মুখ মনে পড়ল। এরকম অবস্থায় রমলা সেনকে দরকার তার। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন কি করা উচিত। কিন্তু ভদ্রমহিলা তাকে নিষেধ করেছেন একা শিলিগুড়িতে যেতে। বলেছেন, প্রয়োজন পড়লে চিঠি দিতে। রমলা সেনকে চিঠিতেই সব জানাবে সে। কিন্তু তখনই মনের গভীরে জমে থাকা অস্বস্তিটাকে সে টের পেল। ওই মানুষটি, যিনি রমলা সেনের বন্ধু, স্বামী কিংবা আত্মীয় নয়, অথচ মাঝেমাঝেই একসঙ্গে থাকেন, এইটে সে মেনে নিতে পারছে না। অথচ ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তার খুব পছন্দ হয়েছিল ওঁকে। ওঁদের দু'জনের সম্পর্ক খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু যত সময় যাচ্ছে বুকের গভীর থেকে উঠে আসা একটা বোধ যা তার রক্তে মিশে আছে, ওই স্বাভাবিক ব্যাপারটাকে আর মেনে নিতে পারছে না। এবং এই কারণেই রমলা সেন আর তার মধ্যে একটা স্বচ্ছ আড়াল তৈরি হচ্ছে। ক্রমশ বিপরীত চিন্তা মনে এল। তাকে না জানিয়ে শিলিগুড়িতে যেতে নিষেধ করেছেন রমলা সেন যাওয়াটা নিরাপদ নয় বলেই কি ? সে গেলে ওঁদের অসুবিধে হবে ভেবে নয়তো ? খারাপ লাগল, খুব খারাপ, এরকম ভাবলে নিজে ছোট হয়ে যেতে হয়, তবু ভাবনাটা থেকে সে মুক্তি পাচ্ছে না কিছুতেই। আর যতক্ষণ সেটা পরিষ্কার না হচ্ছে ততক্ষণ রমলা সেনের কাছে সাহায্য চাইতে যাবে কেন ? তা ছাড়া এমনি পরিচিত মানুষ কেন তার সমস্ত খরচ বহন করবেন ? রমলা সেনের কাছে গেলে নিশ্চয়ই অমরনাথ তাকে টাকা পাঠাবেন না। না, এই মুহূর্তে সে এমন কাজ করতে পারে না যাতে অমরনাথ এবং অঞ্জলিকে অপমান করা হয়। এই দুটি মানুষ না থাকলে সে এই অবধি পৌঁছতে পারত না। জন্ম দিয়েই যে মহিলা চলে গিয়েছিলেন পৃথিবী ছেড়ে তিনি তার মা নন। এই শরীরটাকে যিনি যত্নে বড় করেছেন অনেক ভালবাসা দিয়ে, ঘটনা যাই হোক, তাকে ছাড়া আর কাউকে মা বলে ভাবতে পারবে না সে। আর যে মানুষটা স্ত্রী মারা যাওয়ামাত্র তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছিল সে কি করে বাবা হবে ? দীপা বিছানা থেকে নেমে এল। তার শরীর ভারী এবং বুকের মধ্যে চাপ

বাড়ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট-এর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সে একটু ইতস্তত করল। তারপর পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল। টেবিলে বই রেখে তার ওপর ঝুঁকে ছিলেন ভদ্রমহিলা। দীপা ডাকল, 'বড়দি!'

ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন, 'ও, তুমি? কি ব্যাপার?'

দীপা ঢোক গিলল, 'আমি নিয়মকানুন মেনে চলব।'

'খুব ভাল। তাহলে আমার আর কিছু বলাব থাকবে না।'

'কিন্তু।'

'এর মধ্যে আবার কিন্তু কেন আসছে?'

'যেসব ছেলের সঙ্গে আমার এর মধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছে তাদের আমি কি বলব? ওরা কথা বলতে চাইলে—।' দীপা শেষ করতে পারল না।

'তাদের মধ্যে এমন কেউ আছে নাকি তুমি যাকে এড়াতে পারবে না।'

'হ্যাঁ। হরিপদ।'

'হরিপদ? হু ইজ হি? ছি ছি ছি, এই জন্যেই মেয়েদের এত বদনাম হয়।'

'না বড়দি। ও আমাকে দিদি বলে ডাকে। খুব সরল।'

'ও, তাহলে ওকে বলবে পাবলিক প্লেসে কথা বললে তোমার বদনাম হবে। ও যদি নিজেকে তোমার ভাই হিসেবে ভাবে তাহলে বদনামটা চাইবে না। ঠিক আছে? যাক, তোমার মতিগতি পাল্টালো বলে খুশি হলাম।' হাত বাড়িয়ে তিনি একটা খাম টেনে নিলেন, 'তোমার ব্যাপারটা অমরনাথবাবুকে জানিয়ে এই চিঠিটা লিখেছিলাম। তুমি কথা দিলে এটা পোস্ট করব না। কথা দিচ্ছ?'

দীপা অনেক কষ্টে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ।' সুপারিনটেনডেন্ট-এর আঙুল চিঠিটাকে ছিঁড়তে লাগল কুচি কুচি করে।

বিকেলের ডাকে চিঠিটা এসেছিল, দীপা পেল রাত্রে। খামটা খুলে সে হতভম্ব। মায়া লিখেছে। মেয়েটার হাতের লেখা সত্যি খাবাপ। তার ওপর বানানও ভুল। সম্বোধন দেখে হেসে ফেলল দীপা। 'আমার প্রাণ পাপিয়া দীপা। আমি কেন যাচ্ছি না তাতে নিশ্চযই খুব অবাক হয়েছ। আমার পড়াশুনা করতে ভাল লাগত না, সেই দায় থেকে মুক্ত হলাম। আমি আর পড়াশুনা করব না। কারণ আগামী সপ্তাহে আমাব বিয়ে। ছেলে থাকে মালদায়। তাদের বাড়িতেও পড়াশুনার কোন চল নেই। আর আমাকে বই নিয়ে বসতে হবে না। আমি জানি তোমার পক্ষে আমার বিয়েতে আসা সম্ভব নয়। তাই আর নিমন্ত্রণ করলাম না। বিয়ের খবর এখানকার সবাই জানে। শুনেছি সে নাকি প্রথমে খুব রাগ পরে কান্নাকাটি করেছে। করুক আমি আর ভয় পাই না। কারণ তার কাছে যেসব চিঠি আছে তা তোমার লেখা। আমাকে ধরতে পারবে না। আমি একজনকে দিয়ে তাকে ঘটনাটা জানিয়েও দিয়েছি। হয়তো সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। এখন তোমার যা ইচ্ছে। যে ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হতে যাচ্ছে সে ব্যবসাদার। টাকার কোন অভাব নেই। আমার বাবা পঞ্চাশ ভরি সোনা আর পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিচ্ছেন। তাছাড়া আর যা দিচ্ছেন তা বলতে গেলে চিঠি বড় হয়ে যাবে। জানি না আর কখনও তোমার দেখা পাব কিনা। কিন্তু কথা দিচ্ছি কোনদিন ভুলব না। সবশেষে, তোমার পায়ে পড়ি, এই চিঠি পড়ামাত্র কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেল। ইতি ভাগ্যবতী, মায়া।'

দীপা আবার খামটাকে দেখল। পেছন দিকে লেখা আছে, 'সাড়ে চুয়াত্তর।' প্রচণ্ড রাগ

হয়ে গেল দীপার। অনুরোধ না থাকলেও এই চিঠি সে জমিয়ে রাখত না। একেবারে শেষ টুকরোটা ছিঁড়েও শান্তি পেল না সে। অশিক্ষিত একটা মেয়ে কতখানি স্বার্থপর হতে পারে মায়া তার বড উদাহরণ। প্রথম রাত্রে যে মেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তার জন্যে তার কপালে এই নাচছিল ? মিতার কথা শোনামাত্র সে ঠিক করে নিল যার সঙ্গে প্রেম করা যায় তাকে বিয়ে করতে নেই ? অসম্ভব। ওর একটা বাহানা দরকার ছিল। টাকাপয়সা গযনাগাঁটিব আড়ালে বাঙালী মেয়ে যে সুখ পায় তা ছেড়ে অনিশ্চিত জীবনেব ঝুঁকি নিতে বোধ হয় ও কখনই চায়নি। হ্যাঁ, সে নিজেও মায়াকে কোনদিন ভুলবে না। একটি প্রতারককে যদ্দিন মনে রাখা যায়, রাখবে।

তারপরেই ভাবনাটা মাথায় এল। মায়ার প্রেমিক কেন তার কাছে আসবে ? তার ভূমিকা তো সামান্য। ও অনুরোধ করত বলেই চিঠিগুলো সে লিখে দিয়েছে। কথা ছিল দীপা বয়ানটা লিখে দিলে মাযা তা নকল করে পাঠাবে। মাযা যে সেটা কখনই করেনি তা খেয়াল রাখেনি সে। লোকটা এসে কি বলতে পারে ? আপনি কেন ওর হয়ে চিঠি লিখলেন ? এতটা সাহস পাবে সে ? দীপা স্থির কবল, এ নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই, লোকটা আগে আসুক।

পরদিন কলেজে গেল সে দল বেঁধেই। সঙ্গের মেযেবা দীপার সঙ্গে তেমন কথা বলছিল না। দীপারও ইচ্ছে করছিল না। খানিকটা যাওযার পব সে নিশীথকে দেখতে পেল। থানার সামনে দাঁডিয়ে আছে। গতকাল সে এখানেই ছিল। দীপার সঙ্গে গল্প করতে কবতে কলেজে গিয়েছে। আজ দীপা বাধ্য হল মুখ ঘুবিয়ে নিতে। নিশীথ এগিয়ে এল, 'কি ব্যাপাব, দেখতে পাচ্ছ না নাকি ?'

এবাব অন্য মেযেবা হনহনিয়ে হাঁটা শুরু করল। দীপা ওদের ডাকল, 'এই, তোমরা এক মিনিট দাঁড়াবে ?' খুব অনিচ্ছা নিয়ে ওরা দাঁডাল কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। নিশীথ কাছে আসতেই দীপা বলল, 'কিছু মনে ক'ব না। আমার হোস্টেলে থাকা এবং পড়াশুনা কবা অসম্ভব হয়ে যাবে যদি তোমাদেব সঙ্গে কথা বলি। বাধ্য হয়ে আমাকে এই হুকুম মানতে হচ্ছে। তোমবা ক্লাসের বাইবে আমাব সঙ্গে কথা বল না যদি আমার ভাল চাও।' কথা শেষ কবে সে আব দাঁড়াল না। সঙ্গিনীদের কাছে গিয়ে বলল, 'চল।' এবার মেয়েরা হেসে উঠল। একজন বলল, 'উঃ, আমাব যা ভয় করছিল। তোমার খুব সাহস।'

বিকেলে কলেজ থেকে ফিবে সে শুনল একটি লোক নাকি দুবার তাকে খুজতে এসেছিল। বড়দিব সঙ্গে দেখাও কবেছে। জলপাইগুড়ি শহরে কোন পরিচিত মানুষ নেই যে তার সঙ্গে হোস্টেলে এসে দেখা করতে পারে। আধঘণ্টা পবে বড়দির ঘরে তাব ডাক পড়ল। দীপা তখন বই নিয়ে বসেছিল। যেমন ছিল তেমন এলোমেলো অবস্থায় চলে এল। পর্দা সরিয়ে ভেতবে পা দিতেই সে বড়দির সামনে দু'জন মানুষকে দেখতে পেল। একজন বৃদ্ধ, বাড়িব কর্মবাচীর মত দেখতে, অন্যজন বছর চল্লিশের মহিলা, শাড়ির ওপর একটা পাতলা চাদব জড়ানো।

বড়দি বললেন, 'এঁরা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তোমার আত্মীয়।'

দীপা শেষ শব্দটা শুনে অবাক হয়ে তাকাল। এবং তখন তার মনে হল মহিলার মুখটাকে সে যেন কোথায় দেখেছে। চট করে কিছুতেই মনে আসছে না। মহিলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'কেমন আছ, ভাল ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। কিন্তু—।'

'তুমি আমাকে একদম ভুলে গিয়েছ। তোমার বাবার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কি, মনে পড়ছে না আমাকে ? আমি আনা।'

ধক্ করে বুকে লাগল শব্দটা। আনা। হুড়মুড় করে বিস্মৃতির দেওয়ালটা খসে পড়ল। আনা। হ্যাঁ, এই মহিলাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে রিকশায় তুলে দিয়েছিল, এর দেওয়া টাকাতেই ভাড়া মিটিয়ে সে চা-বাগানে পৌঁছাতে পেরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল, এখানে কি করতে এসেছে এই মহিলা ?

আনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি, এবাব চিনতে পারছ ?'

বড়দি তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টিতে। দীপা ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ। ভাল আছেন ?'

'আছি।' হাসার চেষ্টা করল আনা।

বড়দি বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি এদের নিয়ে গিয়ে গেস্টরুমে বসে কথা বল।'

দীপা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তাকে অনুসরণ করল দু'জন। মাথায় কিছুই ঢুকছিল না দীপার। তার সঙ্গে কি কথা বলতে এসেছে এরা। ওই সম্পর্কটা তো একদম মুছে ফেলেছে মন থেকে। একটা অমঙ্গলের আশংকা করতে লাগল সে।

গেস্টরুম খালি। আনা সেখানে ঢুকে লোকটিকে বলল, 'তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও গগনদা।' বৃদ্ধ মাথা নেড়ে চলে গেল বাইরে। আনা একটা চেয়ারে বসে বলল, 'বসো। দাঁড়িয়ে কথা বলা যায় ?'

দীপা বসল। তাকে ভাল করে দেখল আনা। তারপর বলল, 'তুমি বেশ সুন্দর হয়েছ দেখতে। ষড়যন্ত্র করে তোমার কপাল পোড়াল ওরা। আমি তোমার মাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম কিন্তু তিনি বোধ হয় বুঝতে পাবেননি। ওই সময় আমি আব কি বেশী বলতে পারতাম। ভাবলে খুব খারাপ লাগে আমার।'

দীপা ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কেন এসেছেন ?'

আনা গলার স্বর শুনে চোখ ছোট করল। তাবপব জানতে চাইল, 'এব মধ্যে তোমার বাবা কি এখানে এসেছিলেন ?'

'বাবা ? না তো ! কেন ?'

'ওঁর আসার কথা ছিল। বলেছিলেন সাতদিনেব মধ্যে আসবেন। কিন্তু আসেননি। ওঁকে আমার খুব দরকার। তোমাদের চা-বাগানের বাড়িতে একা মেয়েছেলে গেলে খারাপ দেখাবে। তাই তোমার কাছে খোঁজ নিতে এলাম।'

'বাবাকে আপনার কি দরকার ?'

'তুমি কিছু জানো না ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'ও। তাহলে তোমার না জানাই ভাল।'

'আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দেখো, যা কিছু বলার তা তোমার বাবাই বলবেন।' আনা উঠে দাঁড়াল, 'আচ্ছা, তোমার কাছে হরদেব ঘোষাল আসে ?'

'কে ?'

'হরদেব। শকুনের মত দেখতে। তোমার বাবার সঙ্গে খুব ভাব।'

দীপার মনে পড়ল লোকটাকে। সে ঘাড় নাড়ল, 'না তো।'

'যাক। লোকটা কখনও এলে তুমি দেখা করো না। শয়তান।'

'এ কথা বলছেন কেন ?'

'তোমার শ্বশুরের বন্ধু ছিল এককালে। মেয়ে মানুষের ওপর লোভ ছিল কিন্তু সাহস ছিল না। অবশ্য টাকা পয়সার জন্যে নরকেও যেতে পারে লোকটা।'

'যার বন্ধু ছিলেন তিনি কি আলাদা?'

'একই। তবে সে এখন খাবি খাচ্ছে। সেটা জানো নিশ্চয়ই।'

'না।'

'তুমি জানো না যে প্রতুলবাবু মৃত্যুশয্যায়? অনেকদিন পড়ে আছেন?'

'না। ওদের সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। কিছু জানতেও চাই না আমি। এসব কথা আমাকে কখনও বলতে আসবেন না।'

'বারে মেয়ে। বোকার মত কথা বলছ কেন? ব্যানার্জী বাড়ির মালিক হতে যাচ্ছ তুমি, এখন নাক ফুলিযে অভিমান দেখালে কাজ হবে?'

'সম্পত্তি? আমি না খেয়ে মরে যাব তবু ওদের কিছু নেব না।'

'কথাটা লিখে দিতে পারবে?'

'নিশ্চযই। আপনি যদি চান এখনই লিখে দিতে পারি। অন্য কেউ হলে আমি কথা বলতাম না। কিন্তু সেদিন আপনি—। যাক, বড়দিকে কি আমার কথা কিছু বলেছেন আপনি?'

'না। বলেছি আত্মীয। যাক, যেটা বলেছ সেটা লিখে রাখবে গগনদা এসে নিয়ে যাবে। তাহলে আর তোমার বাবাকে কোন খবর দিতে হবে না। বলার দরকারও নেই আমি এসেছিলাম। চলি।' আনা বেরিয়ে গেল। কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় অমরনাথ চলে এলেন হোস্টেলে।

॥ ২১ ॥

দূর থেকে অমরনাথকে দেখে দীপার মনে হয়েছিল কিছু একটা হয়েছে। দুশ্চিন্তার ছাপ মানুষটির মুখে বেশ স্পষ্ট। গেস্টরুমের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ যা এর আগে সে কখনও দেখেনি।

দীপা দাঁড়াতেই অমরনাথ মেয়েকে দেখলেন। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং বিরক্ত থাকায় দৃষ্টিটা বেশীক্ষণ স্থির রাখলেন না। মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে এসেছি। এই ঘরে বসা যাবে?'

দীপা মাথা নাড়ল। গেস্টরুমে একমাত্র পিতামাতা এলেই অনুমতি না নিয়ে বসা যায়। সে আগে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এসো।'

অমরনাথ চেযারে বসলে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'মা ঠাকুমা কেমন আছে?'

'তাদের খবরে তোমার কোন প্রয়োজন আছে?'

'মানে?' চমকে তাকাল দীপা। বাবাকে এমন গলায় কথা বলতে সে কখনও শোনেনি। অমরনাথ তখন ব্যাগটি কোলের ওপর রেখে পকেট হাতড়াচ্ছেন। তিন চারটি কাগজপত্রের মধ্যে একটি বিশেষ কাগজ বের করে বললেন, 'এটা পড়ে দেখ।'

সামান্য তফাতে দীপা দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ থেকেই ধন্দ লাগছিল খুব। অমরনাথের এগিয়ে ধরা কাগজটা যে একটা চিঠি তা বুঝতে সময় লাগল। ভাঁজ খুলতেই পাকা হাতের লেখায় সম্বোধন চোখে পড়ল, 'মাননীয় অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সমীপেষু, এই চিঠি প্রায় বাধ্য হইয়াই আপনাকে লিখিতেছি। আপনার কন্যা দীপাবলী জলপাইগুড়ির হোস্টেলে

থাকিয়া কলেজে ভর্তি হইয়াছে। আপনি অনেক দূর স্থানে বাস করেন বলিয়া শহরের কোন সংবাদ নিয়মিত রাখিতে পারেন না বলিয়া বিশ্বাস করি।

'আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে দীপাবলীর ব্যবহার ও আচরণ সনাতন বঙ্গরমণীর বিপরীত। তাহাকে উচ্ছৃঙ্খল আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। জলপাইগুড়ি শহর বিলাত আমেরিকা নহে। এখানে ছাত্রীরা অধ্যয়নের বাইরে অন্য জীবনযাপন করে না। কিন্তু দীপাবলী ছাত্রীদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ছাত্রদের সঙ্গে দিনরাত মশগুল থাকে। কলেজে তো বটেই, শহরের রাস্তাতেও তাহাদের ঢলাঢলির দৃশ্য নিয়মিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই বেলেল্লাপনা শহরের যুবকদের কোন পথে নিয়া যাইতেছে তাহা নিশ্চয়ই অনুধাবন করিতে পারিতেছেন। আশঙ্কা হইতেছে এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সুকুমারমতি অন্যান্য ছাত্রীরা যদি একই আচরণ করে তাহলে সমস্ত শহরের জীবনযাত্রা ও ঐতিহ্য গোল্লায় যাইবে।

'আমার একমাত্র পুত্র ওই কলেজে দীপাবলীর সহপাঠী। আপনার কন্যার ওই আচরণ দেখিয়া সে নষ্ট হইতে বসিয়াছে। এই অবস্থায় হয় আপনি কন্যাকে সংযত করুন নয় তাহাকে চা-বাগানে ফিরাইয়া নিয়া যান। ইতি, আপনার এক শুভাকাঙ্ক্ষী।' চিঠিটা পড়া হয়ে গেলে দীপা মুখ তুলল। তার মুখে নিশ্চয়ই কোন কৌতুকের চিহ্ন স্পষ্ট ছিল তাই অমরনাথ সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'তুমি কি চিঠিটা পড়লে? তোমার মুখ দেখে আমি বুঝতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, পড়লাম।' দীপা কাগজটা ভাঁজ করে অমরনাথের হাতে ফিরিয়ে দিল।

'এটা পড়ার পরেও তুমি হাসছ?'

'বাবা, যারা চিঠি লেখে অথচ নাম সই করতে পারে না তাদের কোন রকম গুরুত্ব দেওয়াটা বোকামি। বেনামী চিঠির লেখকরা মেরুদণ্ডহীন।'

'তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনতে আসিনি। মনে কোরো না কলেজে পড়ছ বলে তোমার চারটে হাত গজিয়েছে। এ চিঠিতে যা লেখা রয়েছে তা সত্যি?'

'আমি কি বলব?'

'কি বলব মানে? আমি জানতে চাইছি সত্যি কি না?'

দীপা খুব নীচু গলায় বলল, 'তোমার কি ধারণা?'

'আমার ধারণার কথা হচ্ছে না। আমি থাকি চা-বাগানে। তুমি এখানে কি করছ তা তোমার জানার কথা। তোমার মুখেই সেটা শুনতে এসেছি।'

'তুমি কি জানতে চাইছ?'

'কতবার এককথা বলব?'

'তার আগে তুমি বল বেলেল্লাপনা মানে কি?'

'নির্লজ্জ আচরণ।'

'আমি সেটা কোনদিন করিনি।'

'তাহলে এই লোকটার কি দায় পড়েছিল পয়সা খরচ করে আমাকে লিখতে?'

'কোন লোকটা?'

'ও, বেনামী চিঠি বলে কোন গুরুত্ব থাকবে না। ঘটনা মিথ্যে হয়ে যাবে?'

'না। নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছিল। যে লিখেছে সে সেটাকে বিকৃত করেছে?'

'কি ঘটেছিল?'

'আমার ক্লাসের কিছু ছেলে মেয়েদের বিরক্ত করত। অনেক বছর ধরে চলে আসছিল ব্যাপারটা। মেয়েরা সেটা মুখ বুজে মেনে নিত। আমি মানিনি। কিন্তু ওদের সঙ্গে ঝগড়া না

করে আলাপ করেছিলাম। আসলে এখানকার ছেলেদের সঙ্গে কোন মেয়ে প্রকাশ্যে কথা বলে না বলেই ছেলেরা ওরকম আচরণ করে। আমার মনে হয়েছিল, আমরা একসঙ্গে পড়ি, একই বয়েস, তখন সামান্য কথা বলতে দোষ কি! আর সেটা করতেই ওদের ব্যবহার পাল্টে গেল। এখন যার সঙ্গে ক্লাসের ভেতরে কথা বলি তার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে যাওয়া যায়? কলেজে যাওয়া আসার সময় কারো কারো সঙ্গে কথা বলেছি। আমার মনে হয়েছে ওরা যে কোন মেয়ের চেয়ে নতুন বিষয়ে কথা বলতে পারে। কিন্তু হোস্টেলের বড়দি বললেন আমার এই আচরণ নাকি অনেক মেয়ের বাবা মেনে নিতে পারছেন না। ওদের সঙ্গে কথা বললে আমাকে হোস্টেল ছাড়তে হবে। হোস্টেল ছাড়লে আমি পড়াশুনার সুযোগ পাব না। বাধ্য হয়েই আমি ছেলেদের এ সব বলেছি। ওরা আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার বয়সের ছেলেরা অনেক বেশী বুঝতে পারে।' কথাগুলো বলতে বলতে দীপার গলার স্বর ভারি হয়ে এল, চোখ ভিজে উঠল।

'তোমাকে কি এখানে প্রগতি করতে পাঠানো হয়েছিল?'

'মানে?'

'তুমি এসেছিলে পড়াশুনা করতে। তার বাইরে অন্য কোন ব্যাপারে মন দেওয়ার কোন কথা ছিল না। আজ নিশ্চয়ই সারা শহরে এ ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছে। যে দেশে থাকবে সেই দেশের মানুষরা যে আচরণ করে তাই তোমাকে করতে হবে। চা-বাগানে বিশু বাপী খোকনের সঙ্গে মিশতে, আমরা ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, তাও বড় হবার পর তোমার ঠাকুমা মা সেটা অপছন্দ করেছেন। আগুন আর কাঠ পাশাপাশি যদি কোন আড়াল না রেখে থাকে তাহলে অগ্নিকাণ্ড হবেই। নিষেধ এই কারণে। ছি ছি ছি, এ তুমি কি করলে?'

'আমি কিন্তু কিছুই করিনি।'

'তোমাকে আজকাল আমি বুঝতে পারি না। হয় তুমি বোকা নয় মিথ্যেবাদী।'

'আমি তোমাকে কি মিথ্যে বলেছি?'

অমরনাথ জবাব দিলেন না। কয়েক মুহূর্ত মাটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। তারপর অন্যরকম গলায় বললেন, 'এ চিঠি পাওয়ার পর থেকে আমার চোখে ঘুম নেই। তোমার মা বা ঠাকুমাকেও চিঠিটার কথা বলতে পারিনি কারণ আমি চাই না ওরা এই আঘাত পাক। এখন একমাত্র উপায় তোমাকে চা-বাগানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া।'

'না!' চিৎকার করে উঠল দীপা।

'পয়সা খরচ করে কেউ দুর্নাম কিনতে চায় না।'

'আমি এমন কিছু করিনি যাতে তোমার দুর্নাম হয়।'

অমরনাথ হাতে ধরে থাকা চিঠিটা নাড়ালেন, 'এটা পড়েও বলছ?'

দীপা দিশাহারা হয়ে গেল। সত্যি, অমরনাথকে খুব কাহিল দেখাচ্ছে এখন। যদি জলপাইগুড়ি থেকে চলে যেতে হয় তাহলে ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যাবে না কখনও। সে কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'বাবা, তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না?'

অমরনাথের চোয়াল শক্ত হল। তিনি কোন জবাব দিলেন না।

'বাবা, আমি তো বড়দিকে কথাই দিয়েছি এই কলেজে পড়ার সময় কোন ছেলের সঙ্গে আর কথা বলব না। তুমি আমাকে আর একবার সুযোগ দাও।'

অমরনাথ এবার মুখ খুললেন, 'ব্যাপারটা শুধু আমার ওপর নির্ভর করছে না। যে ভদ্রলোক দয়া করে তোমার পড়ার খরচ দিচ্ছেন খবরটা নিশ্চয়ই তাঁর কানেও উঠেছে।

তিনি যদি সেটা বন্ধ করে দেন তাহলে--।'

'তিনি তো তোমাকে কিছু বলেননি এখনও।'

'তা বলেননি—।'

'যদি কিছু বলেন তাহলে আমি তাঁর কাছে যাব। সব বুঝিয়ে বলব।'

চকিতে সোজা হয়ে বসলেন অমরনাথ, 'না না। ওখানে তুমি যাবে না। মিস্টার রায় সেটা কখনই পছন্দ করবেন না।'

অমরনাথের এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার মত মানসিক অবস্থা দীপার ছিল না। তার দু গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। অমরনাথ চোখ তুলে মেয়েকে দেখলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'কান্নার কোন দরকার নেই।'

চকিতেই বাবার সেই কথাগুলো মনে পড়ল। বাবা বলতেন, রক্তের চেয়ে চোখের জল অনেক বেশী মূল্যবান। কিন্তু আজ সেই কথাগুলো বললেন না।

দীপা আঁচলে মুখ মুছল। তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যদি চাও তাহলে একবার বড়দির সঙ্গে কথা বলতে পার।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'আমার কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না বাবা?'

'ঠিক আছে। তুমি যা বলছ তা যেন সত্যি হয়, সেইটে দেখো। ব্যাঙ্ক থেকে তোমার নামে টাকা এসেছে?' অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন।

'হ্যাঁ। অত টাকা আমার দরকার নেই।'

'যা দরকার তা রেখে বাকিটা তোমার মাকে দিয়ে দাও।'

দীপা ইতস্তত করল একটু। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবে?'

'না। মানে, ওই টাকা তো মিস্টার রায়ের অফিস থেকে আমার পড়ার জন্যে আসছে। ওঁকে বললে হয় না কম টাকা পাঠাতে?'

'উনি মনে করেন অতটাই তোমার দরকার। তোমার প্রয়োজন না থাকলে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পার। এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে উনি নিশ্চযই খুব বিরক্ত হবেন। বড়লোকের খেয়াল বলে কথা।'

'তাহলে দাঁড়াও, আমি এনে দিচ্ছি।' দীপা দ্রুত বেরিয়ে গেল। এখন তাকে অনেক সহজ দেখাচ্ছে। অমরনাথ চিঠিটাকে পকেটে রাখলেন। হাতের লেখা দেখে বোঝার উপায় নেই কে লিখেছে। তবে খামের ওপর জলপাইগুড়ি পোস্ট অফিসের ছাপ ছিল। সেইটেই স্বাভাবিক। কিন্তু ওটা পাওয়ার পর থেকেই মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল তাঁর। এখন মেয়ের পরিবর্তন দেখে একটু ভাল লাগছে। দীপা ফিরে এল প্রায় দৌড়েই। তার হাতে বেশ কয়েকটা দশ টাকার নোট। অমরনাথ মেয়েকে বসতে বলে কাগজ কলম বের করলেন। দীপার যা যা প্রয়োজন তা আর একবার হিসেব করা হল। দেখা গেল একশ টাকা হলেই পুরো খরচ মিটে যায়। দীপা বাকি টাকাগুলো অমরনাথের হাতে দিতে তিনি সেটা পকেটে রেখে দিলেন। এবং এই সময় দীপার আনার কথা মনে পড়ল। সে বলল, 'জানো, এর মধ্যে একদিন আমি খুব চমকে গিয়েছিলাম?'

অমরনাথ মুখে কিছু না বলে গম্ভীর মুখে অপেক্ষা করলেন। আসলে সেই মুহূর্তে তিনি এক লজ্জাবোধে আক্রান্ত ছিলেন। মেয়েকে টাকা দেওয়ার বদলে মেয়ের টাকা তিনি নিচ্ছেন, এইটে বড় খোঁচা দিচ্ছিল। চেক নেওয়া, ব্যাঙ্কে জমা দেওয়ার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি ছিল না।

দীপা বলল, 'হঠাৎ আনা নামের সেই কাজের মহিলা এই হোস্টেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।'

'আনা ?' অমরনাথ চমকে উঠলেন।

'যে আমাকে ওই বাড়ি থেকে পালাতে সাহায্য করেছিল। কি বিরাট চেহারা হয়েছে, মোটাসোটা, কাজের লোক বলে আব চেনাই যায় না।'

'আনা এখানে এসেছিল ?' বিড়বিড় করলেন অমরনাথ।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি এখানে আছি তা ও জানল কি করে ?'

'জেনেছে নিশ্চয়ই।'

'ও এসেছিল তোমার খবর নিতে। তোমার সঙ্গে ওর কি দরকার ?'

অমরনাথ নার্ভাস বোধ করলেন। আনাব ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তার এখানে আসার কি দরকার ছিল ! দীপা দেখল অমরনাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা করল। অমরনাথ সজাগ হলেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। ব্যানার্জী মশাই-এর শরীর খারাপ হল কি না কে জানে ! আর তুমি যে এখানে আছ তা হরদেব দেখে গিয়েছেন। খবরটা তিনিই দিতে পারেন। তোমার এখানে না এসে আমাকে চিঠি দিতে পারত !'

'কেন ?' দীপাব মুখে বক্ত জমল, 'তোমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক ? কে অসুস্থ কি না তা তোমাকে জানাতে হবে কেন ? ও বাড়ির সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তা তুমি জান না ? আমি ভাবতেই পারি না এসব। নেহাত ওই কাজের মেয়েটা আমার উপকার করেছিল সেদিন তাই আমি খারাপ ব্যবহার করতে পারিনি।'

'দ্যাখ মা, সবসময় স্মৃতি আঁকড়ে বসে থাকতে নেই।'

'তুমি কি বলতে চাইছ ?'

'অতীতে ওঁরা অন্যায় করেছিলেন, আমরাও যোগাযোগ রাখিনি। সম্পর্ক যা ছিল তা শুধু বলার জন্যেই। তোকে পবীক্ষা দিতে হয়েছে কলেজে ভর্তি হতে হয়েছে ওদের উপাধি নিয়ে। কিন্তু দিন আর নদীর জল সবসময় সমান বহে যায় না। খবর তো আমারও কানে আসে। ব্যানার্জী মশাই পক্ষঘাতে পঙ্গু এখন, ওঁর স্ত্রী উন্মাদাশ্রমে। সংসার ছাড়খার হয়ে গিয়েছে। এখন বিষ তো দূরেব কথা, ছোবলও নেই।' অমরনাথ কথাগুলো বলতে বলতে মেয়ের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু মেয়ের মুখে কোন পরিবর্তন দেখতে পেলেন না।

দীপা বলল, 'যেমন কর্ম কবেছে তেমন ফল পাচ্ছে। কিন্তু তাতে আমাদের কি ? তুমি ওদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না বলে দিলাম। আর আমার কাছে যদি কেউ আসে তাহলে আমি মুখের ওপর কথাটা বলে দেব।'

'দীপা, তুই কি এখনও ব্যাপারটা ভুলতে পারছিস না ?'

'তুমি কি বলছ বাবা ? আমি কোনদিন ভুলতে পারব ! তোমরা আমাকে জোর করে বিয়ে দিয়েছিলে, আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে চেয়েছিলে—।'

'কি বলছিস তুই ? আমি জেনেশুনে তোর ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে চেয়েছিলাম ? এমন কথা তুই উচ্চারণ করতে পারলি ?' অমরনাথের গলার স্বর পাল্টে গেল।

দীপা মাথা নাড়ল, 'আমার কি ক্ষতি হয়েছে তুমি জানো না ? বন্ধুবান্ধবদের পর্যন্ত ব্যাপারটা বলতে পারি না। সবাই জানে আমি কুমারী। ব্যাপারটা ভাবলেই বমি পায় আমার। আর তুমি এখন ওদের হয়ে নরম নরম কথা বলতে এসেছ। তোমার ওপর আমার রাগ হওয়া অন্যায় ? তুমি বল ?'

অমরনাথ হাসার চেষ্টা করলেন, 'দ্যাখ দীপা, রাগ করে দূরে থেকে নিজের কোন লাভ হয় না। আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। তোর ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তার দাম দিয়ে যেতে হবে প্রতুল ব্যানার্জীকে। আমি সেই চেষ্টাই করছি।'

দীপা অবাক হয়ে তাকাল, 'দাম ? ওই অন্যায়ের কি দাম হতে পারে ?'

'দেখি !' অমরনাথ মাথা নিচু করলেন, 'অনেক চিন্তা করার আছে। ঠিক আছে, ভালভাবে থাকিস। আজ আমি চলি।'

অমরনাথ গেস্টরুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই দীপা পেছন থেকে ডেকে উঠল, 'বাবা !' অমরনাথ মুখ ফেরালেন না।

দীপা এগিয়ে এল, 'আমার কোন দাম দরকার নেই।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'শুনলাম।'

'তুমি কি এ কথাটা জানতে না ?'

'জানি। কিন্তু জীবন তো কোন হিসেব মেনে চলে না। আজ যে অত্যন্ত ঘৃণ্য শত্রু কাল যদি সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে তোর কাছে এক গ্লাস জল চায় তাহলে কি তুই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারবি। মানুষ হলে পারবি না। এটাই জীবনের নিয়ম। তোর কিছু চাই না, কিন্তু আমিও তো একইভাবে প্রতারিত হয়েছি, সে জ্বালা মেটাবার সুযোগ পেলে ছাড়ব কেন ?'

'তুমি কি ওদের বাড়িতে যাচ্ছ ?' দীপা সরাসরি প্রশ্ন করল।

অমরনাথ একটু ইতস্তত করলেন, 'হ্যাঁ। আনা কেন এসেছিল তা জানা দরকার। হয়তো— ! তাছাড়া তাকে নিষেধ করতে হবে, এখানে যেন আর না আসে।'

অমরনাথ আর দাঁড়ালেন না। হন হন করে হোস্টেলের গেট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর যাওয়ার ধরন দেখে দারোয়ান পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল। দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল অমরনাথ সত্যি কথাটা গোপন করছেন। আজ যে মেজাজ এবং চেহারা নিয়ে তিনি চিঠি পেয়ে ছুটে এসেছিলেন তার সঙ্গে চলে যাওয়ার সময় তাঁর চেহারায় কোন মিল নেই। প্রথম দিকে তিনি যেভাবে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন শেষ দিকে যেন পালিয়ে গেলে বাঁচেন, এমন মনে হচ্ছিল। জ্ঞান হবার পর সে অমরনাথকে ওই ভঙ্গী এবং ভাষায় কথা বলতে শোনেনি। আজ এক সম্পূর্ণ অচেনা অমরনাথ হোস্টেল থেকে পালিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, বাবার যাওয়ার ভঙ্গীটাকে পালানো বলাই ঠিক। বাবার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওদের যোগাযোগ আছে। এটুকু ভাবতেই শরীর জ্বলতে লাগল। যোগাযোগ আছে বলেই আনা এসেছিল। প্রতুল ব্যানার্জীর পক্ষাঘাত হয়েছে, তার স্ত্রী উন্মাদ—এতে তার কিছু এসে যায় না। কিন্তু বাবা কেন ওদের বাড়িতে যাওয়া আসা করছে ! দীপার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই চা-বাগানে ছুটে যেতে। অঞ্জলিকে সব কথা খুলে বললে বাবার পরিবর্তনের কারণটা জানা যাবে। কিন্তু তখনই মনে হল, মা যদি তার কাছে লুকিয়ে যান ? দীপা ভেবে পাচ্ছিল না কি করা উচিত !

থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর ধার দিয়ে ঝোলনা ব্রিজের কাছে পৌঁছে অমরনাথের চেতনা পরিষ্কার হল। এতক্ষণ তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে আসছিলেন। মেয়ের হোস্টেলে যাওয়ার জন্যে আনাকে কটুকথা বলবেন। পারলে প্রতুলবাবুকেও কথা শোনাতে ছাড়বেন না। যে সর্বনাশ তাঁরা এককালে করেছেন তার পুনরাবৃত্তি হতে দেবেন না তিনি।

কিন্তু ঝোলনা ব্রিজের ওপর উঠে মনে হল এরকম রাগের কোন মানে হয় না। সাত দিনের বদলে অনেক দিন হয়ে গেল। ব্যাপারটা নিয়ে তিনি অনেক ভেবেছেন। বীরপাড়া চা-বাগানের গুদামবাবুর ভায়রাভাই উকিল। ভদ্রলোক শালির বাড়িতে বেড়াতে

এসেছি ' '। তাঁর সঙ্গে দেখা করে অমরনাথ সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছেন। তিনিও বলেছে । প্রতুল বন্দোপাধ্যায় যদি উইল করে কাউকে দিয়ে না যান তাহলে সমস্ত সম্পত্তির সম্ভব উত্তরাধিকারিণী দীপা। কিন্তু আনা যেখানে আছে সেখানে উইল হবেই। তিনি না গেলে আনা অন্য কাউকে ধরতে পারে। গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ছে বলে কোন মূর্খ বলে না যে সে জুতো ব্যবহার করবে না। আনার দেওয়া প্রতুলবাবুর তৈরী উইলের খসড়া থেকে সম্পত্তির যে হিসেব পাওয়া গিয়েছিল তাই উকিল ভদ্রলোককে দিয়ে দিয়েছিলেন অমরনাথ। কথা ছিল তিনি সব কিছু লিখে স্ট্যাম্প পেপারে টাইপ করিয়ে রাখবেন। ভদ্রলোকের বাড়ি এই করলা নদীর ধারে জলপাইগুড়ি গার্লস স্কুলের পাশেই।

অমরনাথ পথ পরিবর্তন করে জিজ্ঞাসাবাদ করে উকিলবাবুর বাড়িতে পৌঁছালেন। ভদ্রলোক তখনও বাইরের ঘরে মক্কেলদের নিয়ে বসে। অমরনাথকে ঢুকতে দেখে মাথা নেড়ে বললেন, 'বসুন।' অমরনাথ কোণার দিকে একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলেন। মক্কেলদের সঙ্গে কথাবার্তা সারতে আধ ঘণ্টা সময় লাগল। অমরনাথ দেখলেন একজন মক্কেল যাওয়ার সময় কুড়িটি টাকা দিয়ে গেল। উকিলবাবু ডাকলেন, 'আসুন আপনি আপনার তো অনেকদিন আগেই আসার কথা। দেরি হচ্ছে দেখে গতকালই আমার ভায়রাভাইকে একটা চিঠি দিয়েছি। কি ব্যাপার মশাই?'

'নানারকম ঝামেলায় আটকে পড়েছিলাম।'

'শুনুন, এ যা সম্পত্তি তার তুলনায় কোন ঝামেলাই ইমপর্টেন্ট হতে পারে না। আচ্ছা, এই আনা মহিলাটিকে অংশ দিতেই হবে?'

অমরনাথ অসহায় ভাবে মাথা নাড়লেন।

'বুঝুন, বাড়ির ঝি সেবা করে মাথায় উঠছে। কাটানো যায় না?'

'কি ভাবে?'

'কাটাতে চান? তাহলে আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

অমরনাথ দ্বিধায় পড়লেন। আনাকে প্রতারিত করে পুরো সম্পত্তির দখল নিলে লাভ হয় নিশ্চয়ই কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। তা ছাড়া সইসাবুদ তো আনাই প্রতুলবাবুকে দিয়ে করাবে। ব্যাপারটা জানতে পারলে সে অনর্থ করে ছাড়বে। না, ক..., অভিশাপ থাকলে সম্পত্তি থেকে সুখ পাবেন না তিনি। অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'দরকার নেই, যেমন বলেছি তেমন করুন।'

উকিলবাবু হাসলেন, 'আপনার যেমন ইচ্ছে। কাগজপত্র সব তৈরী করেই রেখেছি।' তিনি উঠে আলমারির দরজা খুলে একটা ফাইল টেনে আনলেন, 'যত তাড়াতাড়ি পারেন পেন্সিলে টিক দেওয়া জায়গাগুলোয় সই করিয়ে আনুন। বাকি কাজটা আমি করে দেব।'

অমরনাথ স্ট্যাম্প পেপারগুলো নিয়ে মন দিয়ে পড়তে লাগলেন। হ্যাঁ, সব ঠিকঠাক আছে। উকিলবাবু টেবিলের উল্টোদিকে বসেছিলেন। পড়া শেষ হলে আচমকা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি হরদেব ঘোষালকে চেনেন? আপনার বেয়াই মশাই-এর বন্ধু!'

চমকে উঠলেন অমরনাথ। পরক্ষণেই মনে পড়ল কোর্ট কাছারিতে ঘোরাঘুরি করা হরদেবের নেশা। একই শহরের লোক সেই সূত্রে পরিচিত হতেই পারে। তিনি মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ।

'ভদ্রলোকের কাছে প্রতুলবাবুর কাহিনী শুনলাম। ওই আনা মেয়েটা তো মুঠোয় করে রেখেছে তাকে। খুব সুন্দরী নাকি?'

'না। তেমন নয়।'

'তাহলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য ভাল।' হ্যা হ্যা শব্দ করে হাসলেন উকিলবাবু, 'হরদেবের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কি রকম ?'

'আলাপ আছে।'

'উঁহু, মনে হল আরও বেশী কিছু। যাক, আর দেরি করবেন না।'

একটু ইতস্তত করে অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি হরদেবকে এই উইলের কথা কিছু বলেছেন ?'

'না মশাই। সেই বুদ্ধি না থাকলে ওকালতি করে খেতে পারতাম না। লোকটা একটা শেয়াল, খ্যাঁক শেয়াল বললেও কম বলা হয়। আমার মক্কেল আপনি, সে নয়।'

অমরনাথ খুশী হলেন, 'কত দিতে হবে ?'

'আমাকে ?' দুলে দুলে নিঃশব্দে হাসতে লাগলেন উকিলবাবু, 'রাজার সম্পত্তি পেতে চলেছেন। এখনই কিছু দেওয়ার দরকার নেই। তবে পাওয়ার আগে আঙুলগুলো আর মুঠো করবেন না, তাহলেই হবে। পারলে আজই সই করিয়ে আনুন।'

'তবু যদি একটা আন্দাজ দেন।'

'আরে মশাই, এখন আপনার পকেটে যা আছে তাতে আমার কোন আসক্তি নেই। আমি আমারটা ঠিক সময়মত আপনার কাছে চেয়ে নেব। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কোর্টে চলে আসবেন। উকিলরা যেখানে বসে সেখানে খোঁজ করলে পেয়ে যাবেন।'

ঝোলনা ব্রিজ পেরিয়ে হাকিমপাড়ায় ঢুকলেন অমরনাথ। এত শান্ত এলাকা যে মনেই হয় না শহরে এসেছি। চারপাশে নজর রেখে তিনি এগোচ্ছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল পথে হরদেবের সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। কিন্তু প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গেট পর্যন্ত আসতে কোন বিঘ্ন ঘটল না। বাগানেব ভেতরে পা দিতেই গন্ধটা নাকে এল। বাঁ দিকে একটা স্বাস্থ্যবান মাঝারি উচ্চতার গাছে পদ্মের মত সুন্দর ফুল ফুটেছে। একটু চিন্তা করে নামটা মনে করতে পারলেন তিনি, গ্র্যান্ডিফ্লোরা। গন্ধে বুক ভরে যায়। ফুল ফোটে তার সময়মত শুধু মানুষের সময়টায় কোন হিসেব থাকে না।

সদর দরজা যথারীতি বন্ধ। চট কবে মনে হয় কেউ বাস করে না। অমরনাথ দরজায় শব্দ করলেন কয়েকবার কিন্তু সাড়া মিলল না। প্রতুলবাবু নিশ্চয়ই মারা যাননি। এই ছোট্ট শহরে প্রতুলবাবুর মত মানুষ মারা গেলে মুখে মুখে খবর ছড়াতো। হঠাৎ অমরনাথেব মনে হল উইলটুইল করার আগেই যদি প্রতুলবাবু চলে যান তাহলে আনাকে এক পয়সাও দিতে হবে না। সমস্ত সম্পত্তি আইনমোতাবেক দীপাই পাবে। মরে গেল নাকি ? পরক্ষণেই মাথা নাড়লেন তিনি। কিছু বিশ্বাস নেই, কোত্থেকে একটা উইল বেবিয়ে পড়বে আব চোখে ধুতরো ফুল দেখতে হবে। যত যাই হোক, কোন মানুষেব মৃত্যু কামনা কবা ঠিক নয়।

'শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল !'

গলাটা শুনেই চমকে ফিরে তাকালেন অমরনাথ। বাগানের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে আনা। কে বলবে বাড়ির ঝি। শরীর স্বাস্থ্য যেন আরও ঝকমকে। স্নান কবেছে বলে আরও টাটকা দেখাচ্ছে। হাতে ফুলের সাজি। ফুল তুলতে বেরিয়েছিল পেছনের দরজা দিয়ে।

অমরনাথ আমতা আমতা করলেন, 'সব কিছু তৈরী করতে দেরি হয়ে গেল !'

'আমি হনুমান নাকি যে সূর্যকে বগলে আটকে রাখব ? এই সময়ে তিনি যদি স্বর্গে চলে যেতেন তাহলে ওই তৈরী করা কাগজ আমার কোন কাজে লাগত ?'

অমরনাথ হাসলেন, 'শেষ ভাল যার সব ভাল। এখন সব তৈরী।'

'আসুন এদিক দিয়ে। সদর খোলা নেই।' কথাগুলো বলে আনা বাগানের মধ্যে দিয়ে

হাঁটতে লাগল। ওকে অনুসরণ করে প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি অমরনাথ হঠাৎ শিহরিত হলেন। আজকাল অঞ্জলির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক দৈবাৎ হয়। তাঁর বাসনা অঞ্জলির নির্লিপ্তির কাছে চাপা পড়ে যায়। কোথায় যেন পড়েছিলেন, বাঙালি মেয়েদের মন পঁয়ত্রিশের এপাশে চলে এলেই শরীর নিবিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। অথচ আনার বয়স চল্লিশের এদিকে তো নয়ই। কিন্তু হাঁটার ধমকে সমস্ত শরীরে ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তার। নিজেকে সংযত করতে প্রাণপণে চেষ্টা করছিলেন অমরনাথ। দেশটা বিলেত আমেরিকা নয়। বাঙালি পুরুষ যদি বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা হয় তাহলে মনের মধ্যে এক সন্ন্যাসীকে ধরে রাখা অবশ্য কর্তব্য।

পেছনের বারান্দায় পৌঁছে একটা মোড়া এগিয়ে দিল আনা, 'বসুন।' অমরনাথ বসলেন। সাজিটা রেখে দিয়ে এসে আনা বলল, 'ওমা, আপনার কি শরীর খারাপ ? মুখচোখ অমন হয়ে গিয়েছে কেন ?'

অমরনাথ দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'না, না। কিছু হয়নি।'

আনার ঠোঁটে হাসি চলকে উঠল, 'না হলেই ভাল। কই দিন।'

অমরনাথ উকিলবাবুর তৈরী উইল এগিয়ে দিলেন। আনা সেটাকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'চা দেব, না সরবত ?'

অমরনাথ বললেন, 'কিছু না। আমি খেয়েই এসেছি।'

'এসেছেন তো চা-বাগান থেকে। এতক্ষণে সব হজম হয়ে গেছে।'

'না, না, আমার কিছু প্রয়োজন নেই। প্রতুলবাবু কেমন আছেন ?'

'শালগ্রামশিলা।'

'মানে ?'

'নড়াচড়া করতে পারে না যে তাকেই পুজো করতে হয়। আপনার সঙ্গে এর মধ্যে হরদেবের দেখা হয়েছিল ?'

'না তো।'

'আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না আপনার দেরি হচ্ছে কেন ? খোঁজ নিতে মেয়ের কলেজে গিয়েছিলাম। সে তো এখন দিব্যি হয়েছে।'

'হুঁ। তবে আজকালকার মেয়ে তো, এ বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না।'

'সেটা অ্যাদ্দিন চাইত না। এখন সম্পত্তি পাবে, না চাইলে চলে ?'

'ও যে এসব পাচ্ছে তা জানে না।'

'জানে না মানে ?'

'এ বাড়ির কোনকিছুর সঙ্গে ও যোগাযোগ নেই বলে জানে।'

'এই যে উনি অতগুলো টাকা দিলেন পড়ার খরচা চালাতে ?'

অমরনাথ মুখ তুলে তাকালেন। আনার মুখে বিস্ময়। এই মহিলার কাছে প্রতুলবাবু কোন কিছুই গোপন রাখতে শেষ পর্যন্ত পারেন না। তিনি নিচু স্বরে বললেন, 'সেটা ব্যাঙ্কে আছে। ব্যাঙ্কই পাঠাচ্ছে। দীপা জানে না।'

'কদ্দিন ধামাচাপা দিয়ে চালাবেন ?'

'দেখি।' অমরনাথ উঠলেন, 'প্রতুলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?'

'দাঁড়ান। উনি এখন উদোম হয়ে পড়ে আছেন। চাদর টেনে দিই তারপর যাবেন।' আনা ঘরে ঢুকে গেল। তাজ্জব হয়ে গেলেন অমরনাথ। অসুস্থ একটি মানুষ কেন বিবস্ত্র হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবে ? পেচ্ছাপ বাহ্যি করাচ্ছিল নাকি ? তা তো নয়, আনা তো

বাগানে ফুল তুলছিল ! ব্যাঙ্কের ব্যাপারটা না বলাই উচিত ছিল।

মিনিট খানেক বাদে প্রতুলবাবুর খাটের পাশে বসেছিলেন অমরনাথ।

'চিনতে পারছেন ?'

'না পারার কোন কারণ নেই।' প্রতুলবাবুর গলার স্বর মিনমিনে কিন্তু স্পষ্ট। শরীর শুকিয়ে প্রায় দড়ির মত হয়ে গিয়েছে। মুখ এবং বাইরে বেরিয়ে থাকা দুটো হাত দেখে সেটা বোঝা যায়। বাকি শরীর সাদা চাদরে ঢাকা। অমরনাথ অনুমান করলেন সেটি আনা এখনই ঢাকা দিয়েছে। আজ প্রতুলবাবু ঘাড় ঘোরাতে পারছেন না বলে মনে হল। তার মুখ ছাদের দিকে স্থির। চোখ ঘুরছে।

'মেয়ে কেমন আছে ?' সেই অবস্থায় প্রশ্ন করলেন প্রতুলবাবু।

'ভাল। কলেজে পড়ছে।'

'জলপাইগুড়িতেই তো আছে, দেখতে বড় সাধ হয়।' প্রতুলবাবুর মুখ থেকে কথাগুলো বেরুতেই আনা বলল, 'এখন আর সাধ হলে কি হবে।'

'কি নাম যেন রাখা হয়েছিল ? আশা, আশালতা। সেই নাম আর নেয়নি, না ?'

আনাই জবাব দিল, 'না।'

প্রতুলবাবু বললেন, 'আমি খুব শিগগির যাচ্ছি না। সে কি আসবে ?'

'দেখি।' অমরনাথ বলতে পারলেন।

এবার আনা ঝুঁকে তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল। প্রতুলবাবু চোখ ঘোরালেন, 'আমাকে আপনারা ক্ষমা করেছেন ?'

'অতীতের ওইসব ব্যাপার ভুলে যাওয়াই ভাল।'

প্রতুলবাবুর মুখে হাসি ফুটল, 'একটা কথা রাখবেন ?'

'বলুন।'

'আমি চলে গেলে আপনি আনুকে একটু দেখবেন।

অমরনাথ মুখ তুলতেই আনার ঠোঁটে হাসি খেলে গেল। প্রতুলবাবু হাত তুলতে চেষ্টা করছিলেন। সাদা চাদরটা সরে যাচ্ছিল। আনা প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক করে দিল সেটা। প্রতুলবাবু বললেন, 'আর ঢেকে কি হবে। এসেছি যেভাবে যাব সেইভাবে।' হাত নেতিয়ে পড়ল শরীরের পাশে।

আনা ইশারা করল বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে। অমরনাথ বললেন, 'চলি।' প্রতুলবাবু সাড়া দিলেন না। চোখের পাতাদুটো বন্ধ হল মাত্র।

বাইরের ঘরে পৌঁছে অমরনাথ ছটফট করতে লাগলেন। উইলটা সই করাবার কোন চেষ্টাই আনা করল না। লোকটাকে পেছন থেকে ধরে বসিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সই করতে পারবে। এখন সই হয়ে গেলে তিনি কোর্টে গিয়ে উকিলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। উইল আইনসঙ্গত করতে কত খরচ পড়বে তিনি জানেন না। আজ না হলে তাঁকে আর একদিন আসতে হবে। এইরকম খুচরো ছুটি পাওয়াও তো মুশকিল।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন তিনি। আনা বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।'

'না, না। যেতে হবে।' অমরনাথ ব্যস্ততা দেখালেন।

আনা হাসল, 'উনি চলে গেলে আমার দায়িত্ব নিতে বললেন আপনাকে, কই, আপনি তো কোন জবাব দিলেন না ?'

'কি বলব ?' মুখ ঘোরালেন অমরনাথ।

'হরদেব ঘোষাল হলে কিন্তু বিশ্বরূপ দেখানোর মত হাঁ করত।'

অমরনাথ অস্বস্তিতে পড়লেন। হরদেব নাকি একসময় আনার শরীরের দিকে নজর দিয়েছিল। তাঁকে আর হরদেবকে আনা একই চরিত্রের মনে করছে না কি ! আজ হাঁটার ভঙ্গী দেখে কয়েক সেকেণ্ড চঞ্চলতা এসেছিল, সেটা কয়েক সেকেণ্ডই। হঠাৎ আনা হাত ঘুরিয়ে বলল, 'না, বাবা, আমার দায়িত্ব কাউকে নিতে হবে না। অ্যাদ্দিন দেখলাম যখন তখন চিতায় ওঠার আগে ঠিকই টিঁকে থাকতে পারব।'

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'উইলটা সই কবিয়ে নিলে আজই কোর্টে যাওয়া যেত।'

আন হাসল, 'আমি তো ইংরেজি পড়তে জানি না। যাচাই করে নিই আপনি ঠিকঠাক লিখিয়েছেন কি না। আমার ভাগটা ঠিকমত লেখা আছে কি না। পুরুষমানুষকে আমি বিশ্বাস করি না।'

॥ ২২ ॥

'হিত্তি গেনু, হুত্তি গেনু, গেনু জলপাইগুড়ি/জলও নাই, গুড়িও নাই পাইতে সুড়সুড়ি/নিজের চোখুত দেখি আসিনু শহরটার ঢক্/নামের বাহার অফুলা শাক, মানষিলায় ঠক্।'

বিষণ্ণ চেহারার একটি মানুষ একতারা বাজিয়ে গান গাইছিল কিং সাহেবের খাটে বসে। সামনেব বালির চরে পক্ষীরাজ ট্যাক্সিগুলো জিরোচ্ছে। এ পাশে করলা আর তিস্তার মিলনমুখে কিছু দোকান, চা সিঙ্গাড়ার আর ঘাটবাবুদের। এখন ভরদুপুর। কলেজ থেকে জনা চারেক মেয়ে আচমকা ছুটি হওয়ায় তিস্তা দেখতে এসেছিল চুপিসারে। আর এসেই ওরা ওই গানটা শুনল।

জলপাইগুড়ি জেলার মানুষের বাংলা কলকাতার থেকে আলাদা। তা কোন জেলাব ভাষাই বা ঠিকঠাক মিলে যায় কলকাতার সঙ্গে ? এতদিন চালু ছিল কামরূপী আর বঙ্গালা-বরেন্দ্রী মিশ্রিত এক ধরনের বাবু বাংলা। কামরুপী বলেন রাজবংশী এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ। দেশ বিভাগের পর এই বারো বছরে ব্যাপারটা ওলট পালট হয়ে যাওয়ার মুখে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষেরা বিশেষ করে বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা আর মৈমনসিংহ থেকে আগত শরণার্থীরা জলপাইগুড়ি শহরের প্রান্তে পত্তন করলেন উদ্বাস্তু কলোনির। মাসকলাইবাড়ি বা পাণ্ডাপাড়ায়, সেই কলোনি সীমাবদ্ধ থাকল না, সস্তা চাষের জমি এবং বসতজমি পাওয়ায় তাঁরা ছড়িয়ে পড়লেন ডুয়ার্সের গ্রামে গ্রামে, অরণ্যে। এবার কামরুপী এবং বঙ্গালী-বারেন্দ্রীর সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের ওইসব জেলার ভাষা যা কিনা প্রত্যেকেরই প্রায় আলাদা চেহারা, মিলে মিশে একটা বাংলা ভাষা চালু করতে চাইছে যার ক্রিয়া পদে পূর্ব পাকিস্তানের অস্তিত্ব, শব্দভাণ্ডারে কামরূপী ভাষার প্রচুর অস্তিত্ব এবং পরিবেশনে কলকাতার বাবু বাংলার ছায়া স্পষ্ট। মাত্র বারো বছরেই এই কাণ্ড। জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলতেন, 'আমরা একটা চমৎকার ভাষা পেলাম কারণ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষরা বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছেন। যদি ওঁরা সবাই একই জেলা থেকে এখানে আসতেন তাহলে এ জেলার ভাষার অর্ধেকটাই হয়ে যেত রাজসাহী বা মৈমনসিংহের।

অথচ চা-বাগানে দীপারা যে বাংলা বলত তাতে পূর্ববাংলার ভাষা যেমন ছিল না তেমনি কামরূপী ভাষার প্রভাবও পড়েনি। যেহেতু মুষ্টিমেয় কয়েকটি পরিবারের বাস ছিল সেখানে এবং বহিরাগত মানুষও গল্প-উপন্যাসের চরিত্রের ভাষায় কথা বলতেন তাই দীপাদের

বিপাকে পড়তে হয়নি। বরং মদেশিয়া অনেক শব্দ কথার মধ্যে ঢুকছিল। ঠাকুমা প্রায়ই সতর্ক করতেন শব্দ-উচ্চারণে গোলমাল হলে। অমরনাথ তো 'বাঙাল' শব্দ শুনলেই রেগে যেতেন। অন্তত পরিবারের মানুষের মুখে। হোস্টেলে এসে দীপা নিজের অজান্তে নতুন বাংলা বলতে লাগল সঙ্গিনীদের সংস্পর্শে। এখনও তাদের কলেজে শরণার্থী ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয়নি, স্বাধীনতার আগে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একধরনের বিনীতভাব ছিল, নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতেন তাঁরা, বেপরোয়াভাবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ছিল না। যেসব তরুণ পূর্ববাংলায় স্কুল শেষ করে এখানকার কলেজে দেশ বিভাগের পর ভর্তি হয়েছিল তাদেরও সম্ভবত নতুন পরিবেশে ভাষার জন্যে একধরনের সঙ্কোচ হত। এখন দীপাদের ক্লাসে যে কটি মেয়ে রয়েছে তাদের কেউ শরণার্থী নয়। অর্থাৎ এখনও সেই প্রজন্মের কলেজে পড়া শুরু হয়নি।

মানুষটি রাজবংশী। তাঁর ভাষা কামরূপী। দুই একটি শব্দ কানে প্রথমে অবোধ্য ঠেকলেও কয়েকবার উচ্চারিত হবার পর সহজ হল। দীপার সঙ্গিনীদের ওর গান শোনার চেয়ে কিং সাহেবের ঘাট দেখার দিকেই কৌতূহল বেশী। কিন্তু দীপাকে লোকটা টানছিল। গান শেষ হলে কাঁঠালগাছের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা চোখ মেলে মেয়েদের দেখল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিল। মানুষটির বয়স হয়েছে কারণ দাড়িতে রুপোর ঝিলিক। দীপা তার এক নতুন বান্ধবী সরমাকে বলল, 'লোকটার সঙ্গে কথা বলব। আমার সঙ্গে যাবি ?'

সরমা সহজ মেয়ে। জলপাইগুড়ি শহরের সবরকম সংস্কার নিয়ে মানুষ। প্রিয় গায়কের দিকে তাকিয়ে সে ইতস্তত করল। দীপা বলল, 'নতুন স্যার বলছিলেন না যে দরবেশ বাউল ফকিরদের গানে সাধারণ মানুষের কথা ফুটে ওঠে। আমার ওঁর গান শুনে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে কেন উনি জলপাইগুড়ির মানুষদের ঠক বললেন।'

'কিছু যদি মনে করে ?' সরমা বলল।

'কি মনে করবে ? আমাদের চেয়ে অনেক বড়। প্রায় বাবার মত।'

'লোকটা কিন্তু ফকির না।'

'কি করে বুঝলি।'

'ফকিরদের একরকম পোশাক থাকে।'

'নতুন স্যার বলেছেন দেশজ গান থেকে অনেক প্রবাদ পাওয়া যায়। কয়েকটা পেয়ে গেলে কেমন হয় বলতো ? চল না!'

আনন্দচন্দ্র কলেজে সম্প্রতি যোগ দেওয়া এক অধ্যাপক বেশ আলোড়ন তুলেছেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। তিনি শুধু যত্ন করেই পড়ান না, সাহিত্যের নানান খবর গল্প করে বলেন। ছেলেরা সম্ভবত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর আর একজনকে বন্ধুর মত পেয়েছে। তাঁর নামে কাজ হল। সরমা এগোল। অন্য দুজন দূর থেকে দেখতে লাগল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'এই গানটা আপনি বানিয়েছেন ?'

মানুষটি মৃদু মাথা নাড়ল। তার দাড়ি বাতাসে উড়ছিল, 'সেই ক্ষমতা কি দীনদয়াল আমাকে দিয়েছেন ? আমি কুড়িয়ে কুড়িয়ে জমা করি বুকের মধ্যে। যখন ইচ্ছে হয় তখন গাই মা। এই গান কি তোমাদের ভাল লেগেছে ?'

'হ্যাঁ। আপনি জলপাইগুড়ির মানুষদের ঠক বললেন কেন ?'

'মানুষ যদি ঠকায় তাহলে তাকে ঠক বলতেই হয়।'

'আপনি গানের সময় ওই ভাষায় গাইলেন, কথা বলছেন শুদ্ধ বাংলায়।'

'তোমরা তো বাবুদের বাড়ির মেয়ে। তাই তোমাদের বুঝতে সুবিধে হবে বলে বলছি। আর আমার ঘর ছিল নদীয়া জেলায়। ভাসতে ভাসতে অনেককাল এখানে ঠেকে আছি।'

'আপনি এরকম গান অনেক জানেন ?'

'না মা। আমার পুঁজি অল্প। তবে এর প্রেমে পড়ে আছি। যা পাই তাই নিই। বাদ বিচার করি না। ত্রিস্‌সায় না জানে ঘাট কি অঘাট/ নিমদে না জানে ভাঙ্গা ঘাট/ পিরীত না বুঝে জাত কি অজাত।' সুর করে নিচু গলায় গাইল লোকটা।

দীপা চটপট হাতের খাতা খুলল, 'আর একবার বলবেন ?'

'কেন ?'

'লিখে রাখব।'

'না মা, আমি লিখে রেখেছি মনে আর তুমি লিখবে খাতায় ? সেটা কি মানানসই হল ? মনে রাখতে পারলে রাখো। 'যদি থাকে মনত্, হয়না ক্যানে দেশের কোনত্, পিরীতি যদি মাচায় থাকে, দূর হলেই কি ভুলে তাকে ?'

'আপনার মত স্মরণশক্তি নেই যে আমার।'

'কি করে বুঝলে ? লোকে সুখের কথা ভুলে যায়, দুঃখের কথা ভুলতে পারে না। তুমি বাচ্চা মেয়ে। বুঝবে না এখন। কখনও যদি দুঃখের মত দুঃখ পাও দেখবে চেষ্টা করলেও ভুলতে পারবে না।'

দীপার মুখ থমথমে হয়ে গেল। এ কথাটা কতখানি সত্যি তা সে জানে। সব কিছু ভোলা যায় কিন্তু সেই ফুলশয্যার রাত্রের নরকটাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না সে।

'কিন্তু আপনি এখনও স্পষ্ট বললেন না কেন শহরের লোক ঠক ?'

লোকটা হাসল। তানপুরায় শব্দ করে মুখে বলল, 'ফুটানির রামা/ উপর ধুতি তলে জামা।'

সরমা আর দীপা একসঙ্গে হেসে উঠল। দীপা সরমাকে বলল, 'এটা আমি কখনও ভুলব না। আপনি এরকম আর কয়েকটা বলুন না।'

'শহরের লোক বড় অহঙ্কারী। নিজের গুণ পাঁচমুখে বলে। এরা সব রাজার ঘরের বান্দী। কিন্তু, ছান্ ফ্যালাইতে দেখা যায় খোলা মাথায় চান্দি।' লোকটা এবার হাসল, 'আচ্ছা লিখে নাও তিনটে উপদেশ। আমার কথা না, এই জেলার মানুষের পূর্ব-পুরুষদের মুখ থেকে শুনে শুনে মনে রেখেছে। কিন্তু মনেই রেখেছে কাজে তো করা যায় না। করতে চাইলেও না। লেখ।' লোকটা চোখ বন্ধ করল। কিন্তু দীপা খাতা খুলল না। সরমা তাকে খোঁচা দিল। দিয়ে নিজের খাতা খুলল। লোকটি চোখ বন্ধ করে বলল, "সুদিনের বাপ ভাই, নিদান কালে কাহয় নাই।" "সুজনেরও ডুবে নাও হাতিরও পিছলে পাও।" "নয়া নয়া বথুয়া শাক নুন তেলে খায়, বুড়া হইলে বথুয়া শাক গড়াগড়ি যায়।" ব্যাস। হয়ে গেল। এবার আমি চলি।' কোন ভূমিকা না করেই লোকটা খেয়াঘাটের দিকে পা বাড়াল। ওরা দেখতে পেল খেয়াঘাটের সামনে পৌঁছানো মাত্র মাঝিরা লোকটিকে সাদরে নৌকোয় তুলে নিল। এক নৌকো মানুষ কিং সাহেবের ঘাট ছেড়ে রওনা হল বার্নিশ ঘাটের দিকে। হঠাৎ দীপার বুক টনটন করতে লাগল। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল চা-বাগানে যেতে। এই পথ দিয়ে এক অপরাহ্ণে সে একা অসুস্থ শরীরে চা-বাগানে গিয়েছিল। এখন তো সব চেনা। শনিবারে চলে গিয়ে সোমবার সকালে ফিরে আসা যায়। হাতখরচের পয়সা বাঁচিয়ে গাড়িভাড়া দেওয়া যায়। তবু অনেকদিন যাওয়া হয়নি। সেই পুজোর ছুটির আগে যাওয়ার কথাও নয়।

কোর্টের পাশ দিয়ে নেতাজী পুলের দিকে আসছিল ওরা। হঠাৎ কেউ একজন চিৎকার করতে লাগল, 'আশা মা, আশালতা মা। একটু দাঁড়াও।'

দীপা প্রথমে খেয়ালই করেনি। ওর বন্ধুদের কারো ওই নাম নয়। কিন্তু কোর্টের প্রাঙ্গণ থেকে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে আসা লোকটিকে দেখতে পেল সরমা। পেয়ে বলল, 'এই আমাদের থামতে বলছে।' ওরা দাঁড়াল। হরদেব ঘোষাল ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে। দীপা তাকে চিনতে পারল। পেয়েই শক্ত হয়ে গেল।

হরদেব ততক্ষণে সামনে এসে পড়েছেন, 'এই যে আশা মা, দূর থেকে একঝলক দেখেই চিনতে পেরেছি। এদিকে কোথায় এসেছিলে ? কোর্টে ?'

'আপনি ভুল করছেন। আমার নাম দীপাবলী।'

'তা তো জানি। কিন্তু আমাদের পক্ষে বউমা তোমার নাম রেখেছিলেন আশালতা। ভারি মিষ্টি নাম। তা তোমার বাবার খবর কি ?'

দীপা কি বলবে বুঝতে পারছিল না। বন্ধুরা, কলেজ এবং হোস্টেলের কেউ জানে না তার বিয়ে হয়েছিল। জানাবার সুযোগই হয়নি। সে বিধবা একথা বলার প্রয়োজনই বোধ করেনি। বন্ধুদের সে চেনে। সে বিবাহিতা এই খবর ওরা মেনে নিতে পারবে। কিন্তু যদি জানে বিধবা তাহলেই প্রতিক্রিয়া হবে। হিন্দু-বিধবা মেয়ে মাছ-মাংস খাচ্ছে, রঙিন শাড়ি পরছে, ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, এটা হজম করা ওদের পক্ষে মুশকিল হয়ে পড়বে। সে বুঝতে পারছিল হরদেবের সঙ্গে তর্ক করলে সেই তথ্যটা এরা জেনে ফেলবে। অতএব মুখ ফিরিয়ে দীপা বলল, 'ভাল আছেন।'

'তা তো থাকবেনই। আমি তোমাকে কোর্টের দিকে দেখে ভাবলাম তুমি বুঝি উইল রেজিস্ট্রি করতে এসেছ। আচ্ছা মা, তুমিই বল, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হয় ?'

'আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। কিসের উইল ?'

'তুমি জানো না কি করে একথা বিশ্বাস করি বল ?'

'দেখুন, আমাদের হোস্টেলের নিয়ম রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলা চলবে না। জানতে পারলে হোস্টেল থেকে বের করে দেবে। আপনি বরং আমাদেব হোস্টেলের গেস্টরুমে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন। কবে আসবেন বলুন ?' দীপা এ ছাড়া কিছুই বলতে পারল না।

'কবে আবার ? আজই আসতে পারি। ঠিক আছে, তুমি এগোও, আমি আসছি। ঠিক কথা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয়।' হরদেব হাসল।

দ্রুত পা চালাল দীপা। বন্ধুরা কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরদেবের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব তৈরী হবার পর সরমা জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে ?'

'আমার বাবার পরিচিত।'

'ওসব কি বলছিল ?'

'কিসব ?' দীপা নিজেই যেটা বোঝেনি সেটা সরমারা কতখানি বুঝছে জানতে চাইল।

'ওই উইল টুইল। লোকটা যেন কেমন !'

আর এক বন্ধু বলল, 'আমরা জানতামই না তোমার নাম আশালতা।'

'ধ্যাত। যত বাজে কথা।'

'ওমা, ওই লোকটা তোমাকে আশা আশালতা বলে ডাকছিল। নাম না হলে কেউ মিছিমিছি ডাকে। বলল না, আমাদের পক্ষে বউমা তোমার নাম রেখেছিল।'

চতুর্থ জন বলল, 'আমাদের পক্ষে মানে ? এসব তো বিয়ের ব্যাপারে বলে।'

সরমা বলল, 'আমার মায়ের নাম আগে ছিল গোলাপ বিয়ের পর ঠাকুমা রাখেন সুধা। বিয়ের পর হরদম নাম পাল্টে যেত। তোমার কি বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ?'

মুখ গম্ভীর করে হাঁটছিল দীপা। এই সময় সত্যি কথাটা বলে দেবে ওদের ? কাল সকালের মধ্যে খবরটা ছড়িয়ে যাবে চারপাশে। কিন্তু মিথ্যে কথা বললে সেটা যদি ফাঁস হয়ে যায় ? এতদিন কেউ জিজ্ঞাসা করেনি বলে সে আগ বাড়িয়ে কিছু বলেনি। সেটা ছিল একরকম। এখন গলা ফুলিয়ে মিথ্যে বললে তো ধরা পড়লে আরও লজ্জা। সে মাথা নেড়ে বলল, 'হয়েছিল।'

'তারপর ?'

'ছেলেটা অসুস্থ ছিল, মরে গিয়েছে।' এটা সত্যি তবু কোথাও তো রাখা ঢাকা থাকল। দীপার কথা শেষ হওয়ামাত্র সরমা বলল, 'বাঁচা গেছে।'

হরদেব কিন্তু এল না। দুদিন অপেক্ষা করে দীপা চা-বাগানে চিঠি দিল ঘটনার বর্ণনা দিয়ে। অমরনাথের কাছে জানতে চাইল ব্যাপারটা কি ? অমরনাথ এতদিন ঘটনার গতিপ্রকৃতি বিশদভাবে অঞ্জলিকে বলেননি। মনোরমার কিছু জানা নেই। মেয়ের চিঠি পেয়ে অমরনাথ বুঝলেন আর চেপে রাখা যাবে না। কিন্তু এখন বলতে গেলে ওরা জানতে চাইবে ঘটনাটা কেন বলেনি আগে। অবশ্য অঞ্জলি প্রতুলবাবুর দেওয়া টাকাটার কথা জানে। অর্ধেক বলা আছে যাকে তাকেই তিনি বাকি ঘটনাটা রেখে ঢেকে বললেন।

অঞ্জলি স্বামীর দিকে তাকালেন, 'এসব কথা তুমি আগে বলনি কেন ?'

'আমি অপেক্ষা করছিলাম। আসলে না আঁচালে তো বিশ্বাস নেই।'

'তার সঙ্গে আমাকে না বলার কি আছে ! আমি তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। সত্যি ব্যাপারটা খুলে বল।' অঞ্জলি সন্দিগ্ধ গলায় বলল।

'যা বললাম তাই সত্যি ! আসলে আমার মনে হচ্ছিল এই যে সম্পত্তির জন্যে যাওয়া আসা করছি, এসব শুনলে তুমি আমাকে খুব লোভী ভাববে। একথা ঠিক, মেয়ে বিধবা হবার পর আমরা সম্পর্ক রাখিনি কিছুদিন। ওরা যেভাবে লুকিয়ে বিয়ে দিয়ে মেয়ের সর্বনাশ করেছে তাতে মুখদর্শন করাও পাপ। তোমার মেয়েরও তাই ধারণা। কিন্তু সব পাপের তো একটা প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম আছে। প্রতুলবাবু যদি সম্পত্তি তা বউমাকে দিতে চান তাহলে চাইতে পারেন। নেওয়া না নেওয়া আমাদের ইচ্ছে। কিন্তু চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার কোন মানে হয় ? দীপা ওই সম্পত্তির ন্যায্য উত্তরাধিকারী। তাকে সম্পত্তি পাইয়ে দিয়ে আমি কি কোন অন্যায় করছি ?'

'তোমার মেয়ে যদি না নেয় ?'

'না নিলে কাউকে দান করে দেবে। তাহলে অন্তত বারোভূতে লুটেপুটে খাবে না ?'

'কত টাকার সম্পত্তি ?'

'লক্ষ লক্ষ টাকা।'

অঞ্জলি উত্তরটা শুনে চুপ মেরে গেল। অমরনাথ বললেন, 'আমার কি ! মেয়ে যদি ভোগ করতে চায় করবে না চাইলে ছেড়ে দেবে। আমি তো আর ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। কিন্তু এই হরদেব লোকটা এসব বলতে গেল কেন ? উইলের কথা তো আমি তাকে বলিনি।'

'লোকটা কেমন ?'

'খুব খারাপ। প্রতুলবাবুর সেই টাকা থেকে কমিশন নিয়েছে। আমার ওপর নজর

ছিল।'

'আনা! প্রতুলবাবুর সেই ঝি যে দীপাকে সাহায্য করেছিল?'

'হ্যাঁ। সেই তো এখন সমস্ত কিছু দেখাশোনা করছে। প্রতুলবাবুর পাশে সে একা আছে। আনা যা চাইবে তাই হবে।'

'আনা কি চায়?'

'সম্পত্তির ভাগ। আমাকে বলল একটা উইল করে নিয়ে যেতে। করলাম। তা পরীক্ষা না করিয়ে সই করাবেন না তিনি প্রতুলবাবুকে দিয়ে।'

'সরাসরি প্রতুলবাবুর' সঙ্গে কথা বলছ না কেন?'

'তিনি তোমার মেয়েকে দেখতে চান।'

'ঠিক আছে, এবার যখন তুমি জলপাইগুড়িতে যাবে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি দীপাকে বুঝিয়ে বলব। আর হ্যাঁ, ওই আনার কাছে তোমার একা যাওয়ার দরকার নেই।'

অমরনাথ স্ত্রীর দিকে তাকালেন, 'জঙ্গলের অন্ধকারে শহরের বিদুষী সুন্দরীকে সাইকেলের পেছনে বসিয়ে এনেছি চরিত্র মুঠোয় করে ধবে, তাতেও তোমার বিশ্বাস হল না?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'পুরুষমানুষের আবার চরিত্র! বাজে বকো না তো। খুঁটি বাঁধা বকনা। খুঁটি উঠে গেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

কিন্তু এ যাত্রায় অমরনাথ স্ত্রীকে নিয়ে এলেন না। হরদেবেব সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সেইসময় স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকলে বিপত্তি হবে। দীপার ছুটির সময় হয়ে এসেছে। বড়দি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে অঞ্জলি।

কিং সাহেবের ঘাটে নেমে কোর্টের দিকে পা না বাড়িয়ে অন্য বাস্তা ধরলেন তিনি। তিস্তার গায়ে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। ভয়ঙ্করীকে সরকার এবাবে বেঁধে ফেলবে। ওপাশে নদীর ওপর ব্রিজ হয়ে গেলে ডুয়ার্স এক দৌড়ে কাছে এসে যাবে। ট্রেন চলবে বাস চলবে আর ওই নৌকো আর পক্ষীরাজ ট্যাক্সিগুলো উধাও হয়ে যাবে। কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে আর বেশী দিন নেই। নির্জনে পথ চলে অমবনাথ চলে এলেন হাকিমপাড়ায়।

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ঢুকে সদরে না গিয়ে বাগানের পথ ধরে পেছনে এসে গলা খুললেন তিনি, 'কেউ আছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়িঙ্গে গোছের এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এল, 'অ। আপনি।'

এই লোকটিকে বাগানে কাজ করতে দেখেছিলেন অমরনাথ একসময়। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার। আর সব কোথায়?'

'আর সব মানে? বাবু তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন।'

অমরনাথ সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আনাকে দেখছি না!'

'তিনি ঘুমোচ্ছেন। রাত জেগেছেন তো!'

'রাত জেগেছে?' অমরনাথ চিন্তিত হলেন, 'কেন? খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল?'

'না। বাবুর বন্ধু হরদেববাবু এসেছিলেন। তিনি তো গেলেন তিনটের পর।'

ধক্ করে বুকে লাগল কথাটা। হরদেব তাহলে এই বাড়িতে আসার অনুমতি পেয়েছে! শুধু আসা নয় একেবারে রাত তিনটে পর্যন্ত এমন জাগা জাগতে হল যে এই সকাল ন'টাতেও তিনি ঘুমাচ্ছেন। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুর ঘুম ভাঙেনি?'

'তা ভাঙবে না কেন? পেচ্ছাপ পায়খানা করিয়ে চা খাইয়ে দিলাম আমি! আনা কিছু বললে না বলতে তো চিতায় ওঠার আগে পারবো না। আমাকে একবার বাজারে যেতে হবে

তাও রোগী ছেড়ে যেতে পারছি না।'

'কতক্ষণ লাগবে ?'

'আধঘণ্টা। যাব আর আসব।'

'ঠিক আছে, আমি তোমার বাবুর পাশে বসছি।'

লোকটা তাঁকে প্রতুলবাবুর ঘরে নিয়ে এল। প্রতুলবাবু আজ বালিশ উঁচু করে মাথা রেখেছেন। চাদরের পাশ দিয়ে পা বেরিয়ে গিয়েছিল। অমরনাথ সেটা ঢেকে দিতেই প্রতুলবাবুর নজর পড়ল, 'ও, আপনি। আশা কোথায় ? আশালতা ? তাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করে। যাওয়ার আগে মাথায় হাত বোলাবে না ?'

বেদম রাগ হয়ে গেল অমরনাথের। অত কাণ্ডের পরেও তিনি আশা করছেন দীপা এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে। ঘুণাক্ষরেও যদি জানতে পারে প্রতুলবাবু নগ্ন হয়ে একটা চাদর চাপা দিয়ে স্ব-ইচ্ছায় পড়ে থাকেন তাহলে মরে না গেলে এই ঘরে ঢুকবে না।

'ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে কিছুটা স্বাধীন তো হয়েই যায়।'

'স্বাধীন ? স্বাধীন আবার কি ? আমি টাকা না দিলে পড়তে পারত ?' সরু গলায় অহঙ্কারের ছাপ বড় স্পষ্ট। অমরনাথ হজম করার চেষ্টা করলেন। কথা ঘোরাবার জন্যে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তার রোজ আসছে ?'

'পয়সার স্বাদ পেয়েছে, না এসে পারে।' প্রতুলবাবু কথাগুলো বলামাত্র অমরনাথের মনে হল মানুষটা যেন আগের দিনের চেয়ে বেশী সুস্থ। এত চটপটে কথা আগের দিন বলেনি।

'আমি মরছি ভেবে সবকটা শকুন উড়ে এসে বসছিল। আনা তাদের তাড়িয়েছে। তার জন্যেই আমার চিন্তা। মেয়েছেলে তো।'

জেনে শুনেও না জানার ভান করলেন অমরনাথ। বৃদ্ধ মালী বেরিয়ে গেছে এর মধ্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আনা কোথায় ?'

'পাশের ঘরে। ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। মেয়েছেলে যত ঘুমোবে তত শরীর ভরাট হবে।'

'প্রতুলবাবু, আনা কি কিছু বলেছে আপনাকে ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'সম্পত্তি, মানে বিষয় আশয়—উইল টুইল।'

'না। তার কোন লোভ নেই। মুখ ফুটে কিছু চাইল না আজ পর্যন্ত। কথা বলতে বলতে হঠাৎ নেতিয়ে পড়লেন প্রতুলবাবু। যেটাকে আপাতচোখে সুস্থতা বলে মনে হচ্ছিল সেটি অন্তর্হিত হল। চোখ বন্ধ করে কাঁপতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বসে রইলেন অমরনাথ। আনা উইল সই করায়নি। সম্পত্তির জন্যে যে মেয়ের জিভ লোভে লকলক করছে তাকে প্রতুলবাবু সন্ন্যাসিনী সাজাবেন। এখন তাঁর চোখ বন্ধ। আচমকা অনর্গল কথা বলে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

প্রতুলবাবু বুঝতেই পারলেন না অমরনাথ উঠে দাঁড়িয়েছেন। লোকটি তাঁকেও শকুনের দলে ফেলেছে বোঝার পর থেকেই খুব খারাপ লাগছিল। মনে হল চুপচাপ এ বাড়ি থেকে চলে গিয়ে দীপাকে সব কথা খুলে বলে হালকা হবেন। প্রায় নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এপাশ ওপাশ তাকালেন তিনি। লোকটা অবশ্য তাঁকে বিশ্বাস করে বাজার করতে গিয়েছে। কি করা যায় ! পাশের ঘরের দরজা ভেজানো। আনাকে ঘুম থেকে তুলে ব্যাপারটা বলে যাবেন ? মন স্থির করে দরজা ঠেলতেই সেটা খুলে গেল। বড় ঘর। মাঝখানে চওড়া পালঙ্ক। পালঙ্কের ওপর রাজেন্দ্রাণীর মত শুয়ে আছে আনা। চোখ বন্ধ। একটা হাত কপালের ওপর আলগোছে রাখা। বুকের কাপড় সরে যাওয়ায় চোখ ঘুরিয়ে নিলেন

অমরনাথ। তিনি দরজা থেকে ডাকলেন, 'আনা, আনা।'

দুবার ডাকতেই হাত সরাল আনা। তার ঘুম ভেঙ্গেছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর ঠোঁটে হাসি খেলল অথচ বুকের আঁচলের কথা খেয়াল করল না।

এই মুহূর্তে সে মোটেই প্রৌঢ়া নয়, গৃহপরিচারিকার ভূমিকা অন্তর্হিত। অমরনাথ গলায় শব্দ করলেন, 'এসেছিলাম। একটু দরকার ছিল।'

ঝট করে উঠে বসে কাপড় সামলে নিল আনা, 'এখানেই বসুন, আমি আসছি।'

দরজা থেকে সরে দাঁড়াতেই আনা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। অমরনাথ ঘরে ঢুকলেন। একটা আঁশটে গন্ধ যেন ঘরে ঝুলছে। জানলাগুলো বন্ধ। তিনি এগিয়ে গিয়ে জানলা খুললেন। রোদ এবং হাওয়া ঢুকলে পালঙ্কের দিকে তাকালেন। এমন দামী পালঙ্কে তিনি কখনও শোননি। ঘরে আরও দুটো চেয়ার আছে। তার একটিতে সতর্ক ভঙ্গীতে বসলেন তিনি। এটি তাহলে আনার ঘর। প্রতুলবাবুর ঘরের পাশেই সে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু গতরাত্রে হরদেব কি এই ঘরে ছিল? হরদেবের যে বয়স, শরীর যে পরিমাণ শুকিয়েছে তাতে রাত তিনটে পর্যন্ত জেগে আনার সঙ্গে—। ছি ছি ছি। লোকটাকে দেখেই অবশ্য নোংরা মনে হয় কিন্তু সে দিনরাত আনাকে যা-ইচ্ছে-তাই গালমন্দ করত। আবার আনাও ওর প্রসঙ্গ উঠলে গাল না দিয়ে ছাড়ত না। অমরনাথের মনে হল দুই শয়তানের মিলন হয়েছে। এবং তার ফলে তাঁর মত ভালমানুষের পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরী হবে। এই অবস্থায় মাথা গরম করা বুদ্ধিমানেব কাজ হবে না।

আনা ঘরে ঢুকল পোশাক পরিবর্তন করে। তার মুখ চোখ পবিষ্কার। সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'কখন এসেছেন? বেলা যে এত হল টেরই পাইনি।'

'শরীর খারাপ বুঝি?'

'না। কাল রাত তিনটে পর্যন্ত জাগতে হয়েছিল।'

'প্রতুলবাবু দেখলাম আগের থেকে ভাল।'

'তা ভাল।'

'উইলটার কোন খবর' আছে?'

'হ্যাঁ। ওটা যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনই লিখিয়েছেন।'

'তাহলে প্রতুলবাবুকে দিয়ে—।'

'করিয়েছি।'

অমরনাথ চমকে উঠলেন। প্রতুলবাবু উইলে সই করেছেন? কই, তিনি তো একথা একবারও বলেননি। আনা হাসল, 'দুদিন আগে থেকে নানান কাগজপত্রে এমনি এমনি সই করাতাম। উনি এত বিরক্ত হতেন যে শেষে দেখতেনও না কি সই করছেন।'

অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন, 'তাহলে—!'

'কাল সব ফাঁস হয়ে গিয়েছে।'

'মানে?'

'আপনি যে উকিলকে দিয়ে ওটা লিখিয়েছেন সে কোর্টে গল্প করেছে। মুখে মুখে খবর পৌঁছেছে হরদেব ঘোষালের কানে। তারপরেই সে ছুটে এসেছিল আমার কাছে। তাকে চেপে রাখব এমন সাধ্য নেই আমার।'

'তারপর?'

হরদেব অবশ্য ভাল কথা বলেছে। আপনার মেয়ে তো ঘেন্নায় এর নাম মুখেও আনে না। স্বীকারই করে না বিয়ে হয়েছিল। সম্পত্তি সে ছুঁয়েও দেখবে না। তাহলে তার নামে

বড় অংশ লিখিয়ে লাভ কি ? সইসাবুদ যখন আমিই করছি তখন পুরোটাই আমার নামে লিখিয়ে নেওয়া ভাল। হরদেব যদ্দিন বেঁচে থাকবে দেখাশোনা করবে, আমি মাসোহারা দেব। লোকটা অবশ্য শেয়াল, তবে শেয়ালের বুদ্ধিকে কাজে লাগালে সিংহের হাত থেকে বাঁচা যায়। তাছাড়া ওর নজর ছিল আমার ওপর অনেক দিনের। পায়নি বলেই শত্রুতা করছিল। এরকম লোককে বশ মানাতে পারলে কোন চিন্তা থাকে না। কথা শেষ করে আনা এগিয়ে গেল আলমারির দিকে। সেটি খুলে অমরনাথের দেওয়া উইলটি বের করে বলল, 'এটা রেখে কোন লাভ নেই।'

অমরনাথ দেখলেন আনা ওটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে। তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। নারীর এ কি রূপ। টুকরোগুলো একটা কাগজে মুড়ে আনা বলল, 'ব্যস। হয়ে গেল। আর কোন চিহ্ন রইল না।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হরদেবকে শকুন বলা হয়েছিল!'

'সত্যি কথা। দেখুন, আমি মেয়েছেলে। পাশের ঘরের লোকটার পা নাড়ার ক্ষমতা নেই তবু তিনি বেঁচে আছেন বলেই মাথার ওপর একটা পুরুষ আছে। পুরুষ ছাড়া মেয়েছেলে মানে আঢাকা খাবার ছাদে রাখা। উনি আপনাকে আমার দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন। আপনি বা কাড়েননি। পঁচিশ ভাগ দিয়েই হাত মুছে নিতে চান। কোন পঁচিশ ভাগ। এই বাড়ির এক সিকি জমি ? তা দিয়ে কি করব আমি ?'

'তা কেন ? আমি কি আপনাকে ঠকাতাম ?'

'শুধু কথায় চিড়ে ভেজে মুখুজ্জে মশাই ?'

'শুনেছি আপনার আত্মীয়স্বজন আছে দেশে— ।'

'অতীত, অতীত। আমি তো অতীত হইনি। এখনও ভগবান শরীরটা রেখেছেন। শরীরে সাধ আহ্লাদ আছে। যৌবনের শুরুতে ওই পাশের ঘরের উনি যে জ্বালা তৈরী করে দিয়েছিলেন তা যে কবে মিটবে কে জানে!' আনা হাসল, 'তা বলে আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আপনি কুটুম মানুষ, যখন খুশী তখন আসবেন। এতদিন ছাদ ছিল মাথার ওপর এখন ছাতি বেছে নিলাম। সুবিধে হল এই, ছাতির বাঁট আমার হাতেই ধরা থাকবে।'

'তাহলে সব সম্পত্তি নিজের নামে করে নেওয়া হল ?'

'উপায় কি!' আনা হাসল।

অমরনাথ উঠে দাঁড়ালেন। কেমন যেন অসহায় লাগছে নিজেকে। হঠাৎ তিনি প্রশ্নটা করলেন, 'তা এর জন্যে এত জল ঘোলা হল কেন ? আমাকে না ডেকে প্রথম দিকেই তো নিজের নামে করে নেওয়া যেত।'

'বললাম যে, মেয়েমানুষের মন। আপনার মেয়েকে পুরো ঠেকাতে ইচ্ছে ছিল না। জানলে তিনিও সই করতেন না। এখনও আশালতা করে যাচ্ছেন। কিন্তু যেই বুঝতে পারলাম আপনার মেয়ে নখ দিয়েও এ বাড়ির বিষয় ছোঁবে না তখন আর মনে হল না ঠকাচ্ছি। পাঁচভূতের পেটে না গিয়ে আমিই ভোগ করি।' আনা ঘুরে দাঁড়াল, 'কি খাবেন বলুন, চা না সরবৎ ?'

'কিছু না।' যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালেন অমরনাথ।

'আর একটা কথা।' আনা মৃদুস্বরে বলল। অমরনাথ থেমে গেলেন।

'হরদেব আর আপনার মধ্যে পছন্দ করতে গেলে আমার মন প্রথম জনকে কখনই মেনে নিতে পারে না। তাই অপেক্ষা করছিলাম। তাই রাজী করেছিলাম ভাগ করে নিতে। এখন

বুঝে গেছি গাছের পাখির থেকে হাতের পাখি ঢের ভাল।'

অমরনাথ হন হন করে বেরিয়ে এলেন। নিজেকে খুব ক্ষুদ্র লাগছিল তাঁর। এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ অসহায়। কোন নারী, সে দাসী অথবা মহারাণীই হোক তাঁকে কামনা করে হতাশ হয়ে এমন কাণ্ড করবে তা কখনও চিন্তায় ছিল না। যা হোক, খুব বড় ফাঁড়া কেটে গেল মনে করতে গিয়ে আর এক ধরনের হতাশ বোধ তাঁকে আচ্ছন্ন করছিল। এত বড় সম্পত্তি একেবারে হাতছাড়া হয়ে গেল ?

গেটের কাছে পৌঁছেই শক্ত হলেন অমরনাথ। চুপসানো মুখে হাসতে হাসতে হরদেব ঘোষাল আসছে। দুটো হাত মাথার ওপরে ঠেকিয়ে হরদেব বলল, 'নমস্কার অমরনাথবাবু, ধন্য আপনি। অমন আদর্শবতী কন্যার পিতা সবাই হতে পারে না।'

'মানে ?' অমরনাথ ফিস ফিস করলেন।

'এক কথায় বলে দিল প্রতুলের সম্পত্তি সে ছুঁয়েও দেখবে না।'

'আপনার সঙ্গে কবে কথা হল ?'

'গতকাল। মাঝখানে একবার হোস্টেলে যেতে বলেছিল। আমি যাইনি। কি দরকার ! আপনিও নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আনু যখন বলল আমাকে তার প্রয়োজন তখন দেখা করতে গেলাম। সব বললাম।'

'বললেন ?'

'হ্যাঁ। আমি মিথ্যাচার করতে পারব না। তবে ওই ব্যাঙ্কের টাকার কথা বলিনি। তা সে বলল প্রতুল যদি লিখেও দেয় তবু ও নেবে না। আমার কাজ হয়ে গেল। কাল রাত্রে দুজনে বসে সব ঠিক করে নিয়েছি। আজ প্রতুল সই করছে, আমি সাক্ষী হব। তারপরেই সমস্ত সম্পত্তি আনুর নামে কোর্টে আইনসম্মত করিয়ে নেব। এটা ঠিক, আনু যা করেছে সব তো তারই পাওনা।' হরদেব হাসলেন।

'আনু ?'

'আনা। প্রতুল তো আদর করে আনু ডাকত। বুনো বেড়াল।'

আর তখনই দূরে বাড়ির ভেতর থেকে উচ্চস্বরে কান্না ভেসে এল। হরদেব চমকে উঠল, 'আনুর গলা ! কি হল ? প্রতুল টেঁসে গেল ? সর্বনাশ। উইল তো এখনও সই করানো হয়নি।' পড়ি কি মরি করে হরদেব ছুটল বাড়ির দিকে। অমরনাথ আর যেতে পারলেন না। বুক থেকে না উঠলে এমন কান্না মানুষ কাঁদতে পারে না।

॥ ২৩ ॥

খুব দ্রুত থানার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন অমরনাথ।

চোখের সামনে এখনও প্রতুলবাবু। কিংবা বলা যেতে পারে একটি মৃত নগ্ন শরীর, বিছানায় শুয়ে শুয়ে যার সর্বাঙ্গে ক্ষত দগ দগ করছে, জীয়নকালে যিনি ছিলেন দুর্দান্ত ব্যবসাদার প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, এখন অসহায় অবস্থায় খাটের ওপর পড়ে আছেন। মাথার পাশে বসে আনা যে কাঁদছিল, তাতে বানানো ব্যাপার কিছু ছিল না। আনার কান্না এত স্বাভাবিক যে অমরনাথও ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হরদেব ঘোষাল ঘরে ঢুকে একপলক দৃশ্যটি দেখলেন। তারপরে ছুটে গেলেন খাটের পাশে, কবজি টেনে পালস দেখার চেষ্টা করলেন, চোখের পাতা ধরে টানাটানির পর উদোমশরীর থেকে খসে পড়া চাদরটিকে সস্থানে ফিরিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'যাই, ডাক্তার ডেকে আনি।'

কান্না থামিয়ে আনা ফ্যালফ্যাল করে তাকাল, 'ডাক্তার ?'

'নিশ্চয়ই। প্রাণ আছে কি নেই বোঝার যোগ্যতা একমাত্র ডাক্তারের আছে। থাকলে তিনি চিকিৎসা করবেন, গেলে একটা সার্টিফিকেট দেবেন। ততক্ষণ গলা সাধা বন্ধ বাখো। এভাবে ফট্ করে মরে গেলে তোমার কোন লাভ হবে না।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হরদেব অমরনাথকে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে যেন দুশ্চিন্তা খেলে গেল, 'অমরনাথবাবু, মনে হচ্ছে খুব দুর্বলভাবে নাড়ি চলছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকের মোড়ের মাথায় সন্তোষ ডাক্তার থাকেন। তাঁকে ডেকে আনবেন একবার ?'

অমরনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

প্রায় ঝড়ের মত দৌড়ে গেলেন অমরনাথ। সন্তোষ ডাক্তার সব শুনে বললেন, 'প্রাণ যদি থেকেও থাকে তাহলে কিছু করার নেই। আপনি এগোন, আমি যাচ্ছি।'

ব্যানার্জিবাড়িতে ফেরার পথে হঠাৎ মনে হল হরদেব তাঁকে ইচ্ছে করে ওই সময় সরিয়ে দিল না তো ! আত্মীয়স্বজনরা আসার আগে কিছু হাতিয়ে নিতে পারে। মৃতদেহ খুব বেশী দেখেননি অমরনাথ এ জীবনে, কিন্তু প্রতুলবাবুর শরীরের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হয়েছিল তাঁর প্রাণ নেই। বাড়ির সেই বুড়ো চাকব অথবা নিজে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কেন তাঁকে পাঠালেন হরদেব ?

সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে বাগানের পথে পা রাখলেন অমরনাথ। বুড়ো চাকরটা চুপচাপ বসেছিল। একবার চোখ তুলে মুখ নামিয়ে নিল। খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল লোকটাকে। অমরনাথ প্রায় নিঃশব্দে পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। প্রতুলবাবুর ঘরের দিকে পৌঁছানো মাত্র হরদেবের গলা কানে এল, 'তাড়াতাড়ি কর। প্রত্যেক পাতায় ছাপ দাও। যেসব জায়গায় পেন্সিলের টিক আছে তার ওপরে। উইলে সই না করলে কি আছে, টিপসই দিয়েছে তো ! যে মানবে না সে করুক কেস।'

অমরনাথ দরজায় দাঁড়ালেন। ভূত দেখার মত চমকে উঠল আনা। এবং হরদেব কিছু বলার আগেই সে দুই হাতে উইলটাকে মুচড়ে ফেলল।

হরদেব খুব দুঃখিত ভাবে বললেন, প্রতুল যা করতে চেয়েছিল তা সুস্থ অবস্থায় করে যেতে পারেনি। বিছানায় পড়ে রইল কত বছর। আমায় বলেছিল যদি টুপ করে সে মরে যায় তাহলে অন্তত এই উইলে ওর টিপছাপ তুলে রাখি। দুর্জনের তো অভাব নেই। ওর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করছি এখন। হেঁ হেঁ করে একটু হেসে আরও যোগ করলেন, 'কিন্তু কার জন্যে করব ? স্ত্রীবুদ্ধির নমুনা দেখলেন ? আপনাকে দেখে ও এমন ঘাবড়ে গেল যেন চুরি করছে। উইলটার কি অবস্থা করল দেখুন ! আরে অমরনাথবাবু যখন পৌঁছে গিয়েছেন তখন সাক্ষীহিসেবে ওঁর সই নিতে হবে না ? দাও উইলটা।' হরদেব হাত বাড়ালেন।

সত্যি চোরের মত দাঁড়িয়ে ছিল আনা। এবার হরদেব হাত বাড়ানো মাত্র সে সচল হল। কোন কথা না বলে মুচড়ে ফেলা উইলটাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হরদেব চিৎকার করলেন, 'আরে ? কি হল ? সব ছাপ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। আনা ? ও আনু !'

আর এইসময় ডাক্তারবাবুর গলা পাওয়া গেল সদর দরজায়। তাঁকে দরজা খুলে দিয়ে আর দাঁড়ালেন না অমরনাথ। আর সেই সময় পেছন থেকে আনা তাঁকে ডাকল, 'শুনুন।'

থমকে দাঁড়িয়ে মুখ ফেরালেন অমরনাথ। আনার হাতে তখনও গোল করে পাকানো উইল ধরা, 'একটা অনুরোধ রাখবেন ?'

অমরনাথ জবাব দিলেন না। আনা বলল, 'আমাকে যত খারাপ ভাবেন তাতে আমার কিছু এসে যায় না। ওঁর শেষ ইচ্ছে ছিল আশালতাকে দেখা। হল না। আপনি ওকে

একবার নিয়ে আসবেন ?'

'কি দরকার ?' অমরনাথ শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

'বললাম তো ওঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে।'

'যেভাবে হরদেব শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করছিলেন !'

'বাড়িতে মড়া পড়ে আছে। এই অবস্থায় তর্ক করবেন ?'

অমরনাথ আর দাঁড়াননি। হনহনিয়ে বেরিয়ে এসে করলা নদী পেরিয়ে থানার রাস্তা ধরেছিলেন। লোভ মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে তার সবচেয়ে নগ্ন উদাহরণ দেখে উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন বারংবার। কোন দিকে নজর ছিল না তাঁর। হঠাৎ কানে গেল 'বাবা' শব্দটি। দ্বিতীয়বারে মনে হল গলাটি তাঁর চেনা। মুখ ফিরিয়ে তিন চারটি মেয়েকে দেখলেন। তিনটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে, একটি এগিয়ে আসছে। এবাব দীপা স্পষ্ট হল। অমরনাথ যেন হুঁস ফিরে এলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার ? তিনবার ডাকলাম, শুনতেই পাচ্ছ না !'

'তুই এখানে ?' অমরনাথ স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করছিলেন।

'বাঃ আমরা কলেজে যাচ্ছি। তুমি কখন এসেছ জলপাইগুড়িতে ?'

'আজ সকালে।' অমরনাথ সত্যি কথাই বললেন।

'তাহলে আমার কাছে যাওনি কেন ?' দীপা জিজ্ঞাসা করল। অমরনাথ ঘুরে দাঁড়ানো মেয়েদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'দীপু, তুমি তোমার বন্ধুদের বলো কলেজে চলে যেতে। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কোথায় ?' দীপা অবাক হচ্ছিল।

'বলছি। আগে ওদের ছেড়ে দাও। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

দীপা মেয়েদের কাছে গিয়ে কিছু বলল। তাবা অমরনাথকে দেখতে দেখতে পোস্ট অফিসের দিকে হাঁটতে লাগল। ফিবে এসে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বাবা ?'

অমরনাথ এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এই সময় কলেজে না গিয়ে অন্য কোথায় যাওয়ার জন্যে কি হোস্টেল থেকে অনুমতি নিতে হয় ?'

'না।' দীপা মাথা নাড়ল।

'সে কি ! তাহলে তো তোমরা যেখানে ইচ্ছে যেতে পাব !'

'আমরা কলেজে পড়ছি বাবা। স্কুলে নয়। খারাপ জায়গায় যাবই বা কেন ?' দীপা হেসে ফেলেই গম্ভীর হবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু তোমার কি হয়েছে বল তো ? কিছু লুকিয়ে যাচ্ছ !'

এই সময় একটা খালি রিক্‌শা সামনে দেখে অমরনাথ সেটাকে দাঁড় করালেন, 'ওঠো।' দীপা আদেশ মান্য করল। অমরনাথ পাশে বসে রিক্‌শাওয়ালাকে হাত তুলে ইশারা করলেন রাস্তা দেখিয়ে। এবং তখনই তাঁর মনে হল মেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। একজন ভদ্রমহিলার পাশেই বসে আছেন এমন অনুভূতি হচ্ছিল।

থানার পাশ দিয়ে রিক্‌শা ঝুলনা পুলের গায়ে এসে থামল। অমরনাথ বুঝলেন তিনি ভুল রাস্তায় রিক্‌শাওয়ালাকে আসতে বলেছেন। করলা নদীর ওপর ঝুলনা পুলে রিক্‌শা উঠবেই না। সেই সুভাষ বোসের স্ট্যাচু অথবা দীনবাজার ঘুরে আসতে হবে। তাতে সময় লাগত বেশী। এইটুকু রাস্তা পেরিয়ে ঝুলনা পুলে আসতে রিক্‌শার কোন প্রয়োজন ছিল না। পয়সা দিয়ে মেয়েকে বললেন, 'চল।'

ঝুলনা পুলে উঠে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি বাবা ?'

'ব্যানার্জী বাড়িতে।'

'না।'

'দীপা, জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ একভাবে মাপতে যেও না।'

'আমি ওই বাড়িতে যাব না।'

'আমি তোমাকে কখনও যেতে বলিনি। কিন্তু আজ বলছি।'

'কেন ? ওদের সঙ্গে তো আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'ইচ্ছে না করলেও কোন কোন কাজ করতেই হয়। সম্পর্ক তুমি স্বীকার না করলেও আমাদের মানতে হয়। তোমাকে এখন ব্যানার্জী লিখতে হচ্ছে। আর সম্পর্ক যে-মানুষগুলোকে কেন্দ্র করে ও বাড়িতে তৈরী হয়েছিল তারা কেউ আর আজ বেঁচে নেই। প্রতুলবাবু আজ সকালে পরলোকগমন করেছেন।'

সেই ভয়ঙ্কর রাগী মানুষটির মুখ মনে পড়ল দীপার। মুখের সব কিছু আর তেমন স্পষ্ট নয় কিন্তু আদলটি মুছছে না এখনও। মেয়েকে চিন্তিত দেখে অমরনাথ বললেন, 'আমরা আর কদিন ! সবাইকেই যেতে হবে। প্রতুলবাবুও গেলেন। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যে-কোন জীবিত মানুষের কর্তব্য। চল।'

'না।' শক্ত হয়ে দাঁড়াল দীপা। নিচে করলার কালো জল স্থির। দুই এক জন লোক যারা ঝুলনা পুল দিয়ে যাতায়াত করছে তারা কৌতূহলী হয়ে এদের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছিল। অমরনাথ বলে ফেললেন, 'বেয়াদপি করো না দীপা।'

দীপা জবাব দিল না। নদীর দিকে তাকাল। এবং তখনই তার দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। অমরনাথ সেটা দেখতে পেলেন না। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি তোমাকে আদেশ করছি তাই তুমি যাবে।'

চোখ মোছার চেষ্টা করল না দীপা। অমরনাথকে সে অনুসরণ করল। বাতাস বইছে। তার ছোঁয়ায় চোখের জল গালে শুকিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর জুড়ে কাঁপুনি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে অমরনাথ তাকে দিয়ে যে কাজ করাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাসনা ক্রমশ তাকে শক্ত করল। দীপা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই শেষ। যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছুর সঙ্গে সমঝোতা করবে না। অমরনাথ কিংবা অঞ্জলি যদি অন্যায় ভাবে কিছু তার ওপর চাপিয়ে দবার চেষ্টা করেন তাহলে সেটা ঝেড়ে ফেলতে দ্বিধা করবে না। এই শেষ, শেষবার।

এর মধ্যে বেশ কিছু লোকজন এসে গিয়েছে। পাড়াপ্রতিবেশীরা আছেনই, আত্মীয়স্বজনরাও আসতে শুরু করেছেন। মেয়েকে নিয়ে অমরনাথ ঘরের এককোণে দাঁড়িয়েছিলেন। আনা ইতিমধ্যে প্রতুলবাবুকে পাঞ্জাবি পরিয়ে বুক অবধি চাদরে ঢেকে রেখেছে। হরদেব ঘোষাল অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে সব তদারকি করছিল। আনা বসে আছে প্রতুলবাবুর পায়ের কাছে। যাঁরা এসেছেন তাঁরা নিচু গলায় কথা বলছিলেন। জেলার কংগ্রেস-কর্তারা মালা ফুল নিয়ে পৌঁছে গেলেন। দেখতে দেখতে প্রতুলবাবু এতকালের একাকিত্ব কাটিয়ে তাঁর কর্মময় জীবনের প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে চললেন। জলপাইগুড়ি শহরের একজন প্রথিতযশা মানুষ চলে গিয়েছেন এবং তাঁকে বিদায় জানাবার ব্যাপারটা যাতে সম্মানের সঙ্গে হয় তার আয়োজন চলছিল। এই সময় হরদেব প্রতুলবাবুর দাদাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। বয়স বেড়েছে। হাতে লাঠি। অমরনাথ দেখলেন ভদ্রলোক খুব একটা বদলাননি। এই মানুষটি যদি হরিদাসবাবুর বাড়িতে তাঁকে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে দীপার বিয়ের প্রস্তাব না দিতেন তাহলে মেয়েটাকে বিধবা হতে হত না। অমরনাথ অনেক কষ্টে

নিজেকে সংবরণ করলেন।

প্রতুলবাবুর দাদা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমে মৃতদেহের দিকে তাকালেন, তারপর তাঁর চোখ ঘরের মানুষগুলোর ওপর ঘুরতে লাগল। অমরনাথ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়েছিলেন। প্রতুলবাবুর দাদা কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, 'হরদেববাবু, প্রতুল আমার নিজের ভাই নয় কিন্তু রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। সে মারা না গেলে আমি এই বাড়িতে পা দিতাম না। আজ এসেছি ওই রক্তের সম্পর্কের জন্যে। আসতে বাধ্য হয়েছি।'

হরদেব নিচু স্বরে বললেন, 'অত্যন্ত সত্যি কথা।'

'খাটের ওপর কে বসে আছেন ?'

'আনা।'

'আনা' ! মানে প্রতুলের—।' ওঁকে কথা শেষ করতে দিলেন না হরদেব, 'হ্যাঁ।'

'ওকে নেমে আসতে বলুন। ব্যাপারটা অসম্মানজনক।'

হরদেব মিনমিন করে বললেন, 'উনিই এতদিন সব সেবাযত্ন একা করে এসেছেন।'

'ভালকথা। কিন্তু সেবিকা সেবিকাই। সে কখনও আত্মীয়ের মর্যাদা পেতে পারে না।'

হরদেব ছুটে গেলেন আনার কাছে। কথাগুলো সে-ও শুনেছিল। কিন্তু তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। হরদেব আনার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ঝামেলা না করে নেমে আসাই ভাল। পাঁচজন চেয়ে দেখছে।'

আনা তবু নড়ল না। তার মুখ নিচু। অধৈর্য হরদেব ডাকলেন, 'আনা !'

আনা উত্তর দিল না। প্রতুলবাবুর দাদা গলা তুললেন, 'আশ্চর্য ! এ তো দেখছি কান কাটা মেয়েছেলে ! অমরনাথবাবু, আপনি একটু শুনবেন ?"

অমরনাথ চমকে উঠলেন। হঠাৎ যে তাঁর নাম উচ্চারণ করবেন ভদ্রলোক তিনি ভাবতে পারেননি। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাকে কিছু বলছেন ?'

'হ্যাঁ।' প্রতুলবাবুর দাদা দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন, 'যতদূর মনে হচ্ছে আপনি এখানে কন্যাকে নিয়ে এসেছেন। তাই তো ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অমরনাথ ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না।

প্রতুলবাবুর দাদা যেন খুব স্বস্তি পেলেন। অমরনাথরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে এগিয় এসে বললেন, 'এসো মা, দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না, তুমি এই বাড়ির বউ। প্রতুলের স্ত্রী পুত্র নেই, তুমিই তার পরিবারের একমাত্র জীবিত মানুষ। ওর এই সময়ে তুমি তোমার কর্তব্য পালন কর।'

অমরনাথ কিছু বলার আগেই দীপা পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কিভাবে ?'

প্রতুলবাবুর দাদা বললেন, 'অত দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না। মৃতের পাশে তার নিকট আত্মীয়বা থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক।'

দীপা ঠোঁট কামড়াল। ঘরের সমস্ত মানুষ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অমরনাথ মেয়ের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, 'আসলে এ বাড়িতে ওর আসা-যাওয়া নেই তাই সংকোচ—।'

প্রতুলবাবুর দাদা কথাটা থামিয়ে দিলেন, 'সংকোচের কোন কারণ নেই। আসা-যাওয়া বন্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। এখন সেই প্রসঙ্গ তোলার কোন যুক্তি নেই। হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ না করা পর্যন্ত বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয় না। আর ওর না হয় আসা-যাওয়া ছিল না কিন্তু আপনি তো নিয়মিত এসেছেন।'

'আমি !' অমরনাথ হতভম্ব।

'সব খবর কানে এসেছে আমার। এতদিন বলাব দরকার মনে করিনি। তাছাড়া এখানে এসে আপনি অন্যায় কিছু করেননি। এসো মা।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। উনিই ওখানে বসার যোগ্য মানুষ।'

'মানে?' প্রতুলবাবুর দাদা চমকে উঠলেন, 'এর পরিচয় তুমি জানো?'

'হ্যাঁ। উনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন।'

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার কি খুব দরকার আছে? ওই মহিলা যখন জীবন দিয়ে সেবা করে গেছেন বছরের পর বছর তখন আপনারা কেউ বাধা দেননি। সাহায্য কবতেও আসেননি। আজ কেন গায়ে পড়ে নিজের মতামত চাপিয়ে দিচ্ছেন।'

প্রতুলবাবুব দাদা অবাক হয়ে তাকালেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘব থেকে বেরিয়ে গেলেন। অমরনাথ দেখলেন হরদেব খুব খুশি হয়েছে। শোকসংবাদ পেয়ে যারা এসেছে তাবা গুঞ্জন শুরু করল। আনা ওই একই অবস্থায় বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বাড়ছিল অমরনাথের। ওই মহিলা প্রতুলবাবুব মৃত্যুব পরে হরদেবেব নির্দেশ যখন মান্য কবছিল তখন অন্য চেহাবা ছিল। কোনটে সত্যি আব অভিনয় বোঝা অসম্ভব।

এই সময একটি যুবক এসে অমরনাথেব সামনে দাঁড়াল, 'আপনাদেব বাবা ডাকছেন।'

চেহারা দেখে অমরনাথ অনুমান কবলেন ছেলেটি প্রতুলবাবুর দাদাব ছেলে। তিনি দীপাকে বললেন, 'আয় মা।'

এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে দীপা যেন বেঁচে গেল। যে মানুষটি খাটেব ওপব শুযে আছে তাব সঙ্গে বিয়েব সময় দেখা প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন মিল নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদিকে তাকালে তাব নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

অমবনাথেব সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে দীপা দেখল শ্মশানযাত্রীবা প্রস্তুত। ভিড় আরও বাড়ছে। শুধু হাকিমপাড়া নয়, জলপাইগুড়িব অনেক মানুষ এসেছেন এখানে। বাগানের মধ্যে একা দাঁড়িয়েছিলেন প্রতুলবাবুর দাদা। সামনে যেতেই তিনি বললেন, 'অমরনাথবাবু, আমি আমার বেয়াই-এর বাড়িতে গিয়ে আগ বাড়িয়ে আপনাকে বিয়ের সম্বন্ধটা দিয়েছিলাম। এই কারণে আমি পরে অনুতপ্ত হয়েছি। এখন বললে কেউ বিশ্বাস করবে না প্রতুলেব অসুস্থতার পুরো ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। তারপব অনেক বছর কেটে গেছে। আপনার মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার আচরণ নিয়ে যখন নানান কথা আমার কানে এসেছে তখন ভেবেছিলাম মেয়েটা সেই আঘাত ভুলতে পেরেছে। কিন্তু তাই বলে আজ সবার সামনে আপনার মেয়ে আমাকে অপমান করাব সাহস পায় কোত্থেকে? সেদিনের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত কবতে চেয়েছিলাম আজ। এই বাড়িব, প্রতুলের সম্পত্তির অধিকার তাকে দিতে চেয়েছি সর্বসমক্ষে কিন্তু তাব বদলে— ! ছি ছি ছি।'

অমরনাথ বললেন, 'আপনি ভুল বুঝছেন। ও আপনাকে ভাল কবে চেনেই না। খামোকা অপমান করতে যাবে কেন?'

'অপমান নয়? আপনি এ কি বলছেন? ওই নষ্ট মেয়েটাকে সমর্থন করল, আমাকে বলল গায়ে পড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি, এসব শুনতে পাননি?'

দীপা শুনছিল এতক্ষণ। এবার অমরনাথকে বলল, 'বাবা, আমরা কি যাব?'

'যাবে মানে?' প্রতুলবাবুর দাদা আঁতকে উঠলেন, 'এখন শ্মশানযাত্রা শুরু হয়নি আর তুমি যেতে চাইছ? না, বাড়ির বউকে শ্মশানে যেতে বলছি না। কিন্তু এখানে এসেছ ঘোমটা না দিয়ে তার ওপর এখন বেরিয়ে গেলে আমাদের সম্মান থাকবে?'

দীপা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট বলল, 'দেখুন, আমি এখানে নিজের ইচ্ছায় আসিনি। বাবা জোর করেছিলেন বলেই আসতে হল।'

'তুমি কি নির্বোধ ?'

'মানে ?'

'এসব কথা বলার অর্থ কি জানো ?'

'যা সত্যি তাই আমি বলছি।'

'অমরনাথবাবু, আপনার মেয়েকে বুঝিয়ে বলুন এসব কথা উচ্চারণ করার অর্থ এই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি থেকে সরে দাঁড়ানো।'

দীপা হাসল, 'এখানেও আপনি ভুল করেছেন।'

'ভুল ?'

'যে সর্বনাশ একদিন আপনারা আমার করেছিলেন আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন। খুব ভাল। কিন্তু এ বাড়ির একটা টুকরোকেও নিজের করে ভাবার কোন প্রবৃত্তি আমার নেই। বাবা, বল।'

'দাঁড়াও। ছোট মুখে অনেক বড় কথা বললে।'

'বড় কথা কিনা জানি না, এটা আমার বিশ্বাসের কথা।'

'যারা দিনের আলোয় উপদেশ দেয় আর রাতের অন্ধকারে চুরি করে এই বয়সে তুমি তাদের দলে পৌঁছে যেতে পেরেছ দেখে অবাক হচ্ছি!'

'কি বলছেন আপনি ?'

'তুমি কি ভাবছ আমি জানি না যে তোমার বাবা ওই মেয়েছেলেটার সঙ্গে এক হয়ে তোমাকে সম্পত্তির ভাগ দেবার চেষ্টা করছে ?'

'সে কি!'

'অথচ সেটা তুমি নিজেই একা অধিকার করতে পারতে। আমি ব্যাপারটার কোন অর্থ বুঝতে পারিনি এতকাল। আজ যখন ওই মেয়েছেলেটাকে তুমি সমর্থন করলে তখন অর্থটা হৃদয়ঙ্গম হল।'

'আপনি আমার বাবার নামে মিথ্যে বদনাম দিচ্ছেন।'

অমরনাথ কিন্তু কিন্তু করে বললেন, 'প্রতুলবাবু চেয়েছিলেন বলে—।'

মিথ্যে বদনাম! কি অমরনাথবাবু ব্যাপারটা কি মিথ্যে ?'

'তুমি আমাকে এসব কথা কখনও বলনি বাবা ?' দীপার গলার স্বর কেঁপে উঠল। তার প্রশ্ন শুনে অমরনাথ মাথা নিচু করলেন।

প্রতুলবাবুর দাদা বললেন, 'যাচ্চলে! ঠিক আছে, বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারটা না হয় তোমার বাবা তোমাকে বলেননি। কিন্তু চা-বাগান থেকে জলপাইগুড়ি শহরে এসে হোস্টেলে বাস করে এই যে পড়াশুনা করছ—।'

এই সময় শ্মশানযাত্রীরা হরিধ্বনি দিতে দিতে প্রতুলবাবুর দেহ খাটে চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। একটি মাত্র কণ্ঠের কান্না শোনা যাচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে প্রতুলবাবুর দাদা বললেন, 'থাক। আর কিছু বলার নেই।'

দীপা বাধা দিল, 'দাঁড়ান। আমার পড়াশুনার ব্যাপারে কি বলছিলেন ?'

যেতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, 'এতক্ষণ তুমি অনেক বড় কথা বললে মা। তোমার অপমানিত হবার কারণ যথেষ্ট আছে। তবে দুরকম আচরণ করা ঠিক নয়। তুমি এ বাড়ির সম্পত্তি, এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক যদি অস্বীকার কর তাহলে প্রতুলের দেওয়া টাকায়

পড়াশুনা করা ঘোরতর অন্যায়।'

প্রতুলবাবুর দাদা আর দাঁড়ালেন না। শব মিছিলের সঙ্গী হতে ছেলেকে নিয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন। তখন চারধার হরিধ্বনিতে উচ্চকিত। মিছিল একটু একটু করে বেরিয়ে গেল বড় রাস্তায়। বলহরি-হরিবোল শব্দদুটো আর দীপার কাছে পৌঁছাচ্ছিল না। সে পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। প্রতুলবাবুর দাদা কথাগুলো বলার পর থেকেই তার সমস্ত অনুভূতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল।

অমবনাথ অত্যন্ত অসহায় বোধ করছিলেন। মেয়ের কাছে লুকিয়ে রাখা খবরগুলো প্রতুলবাবুর দাদা যে এভাবে বলে যাবেন তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। ঠিক করেছিলেন, মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হবার পর এক সময় নিজেই খুলে বলবেন। এমন হবে জানলে তিনি নিশ্চয়ই জোর করে দীপাকে নিয়ে আসতেন না। এখন মাথা তুলতেও তাঁর সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু প্রতুলবাবু, হরদেব ঘোষাল আর তিনি ছাড়া একমাত্র আনা আর অঞ্জলি ব্যাপাবটা জানে। আনা জানে কিনা সে-ব্যাপারেও তিনি নিঃসন্দেহ নন। ব্যাপারটা গোপন রাখতে তিনি প্রতুলবাবুকে সেইসময় অনুরোধ করেছিলেন। তাহলে এই ভদ্রলোক খবরটা পেলেন কি করে? তিনি যে মাঝে মধ্যে এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করেছেন তাও ভদ্রলোকের অজানা নয়। অমরনাথের মনে হল আর কিছু করার নেই। তিনি মেয়ের মুখের দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছিলেন না।

এই সময় সেই বুড়ো কর্মচাবিটি এগিয়ে এসে দীপার সামনে দাঁড়াল। খুব বিনীত গলায় বলল, 'আপনাকে ডাকছে।'

দীপা তাকাল। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না। লোকটি আবার বলল, 'আনাদি আপনাকে একবার আসতে বলল।'

এবার দীপা সচল হল। অমবনাথ দেখলেন তাঁকে কোন কথা না বলে দীপা ধীরে ধীরে লোকটির সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু প্রতিবেশী মহিলা তখনও দাঁড়িয়েছিলেন বাড়ির সামনে। তাঁরা সকৌতূহলে তাকিয়ে আছেন দীপার দিকে। অমরনাথ এগোতে পারলেন না। দীপা ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতবে ঢুকে গেলে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন বাগানে।

শূন্য বাড়ি। প্রতুলবাবুর শরীর বের করে নিয়ে যাওয়ায়র সঙ্গে সঙ্গে যারা জড় হয়েছিল তারাও বেরিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপাকে ইশারা করল, 'ভিতরে।' দীপা ঘরে ঢুকল। লোকটি চলে গেল।

আনা বসেছিল তক্তাপষেব ওপর। তার হাতের মুঠোয় আঁচল এবং সেটি মুখে চাপা। পিঠ ফুলে ফুলে উঠছে। দীপা কিছুটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখল। তারপর কথা বলল, 'কিছু বলবেন?'

আনা মুখ তুলল। তার কান্না সোচ্চার হওয়ামাত্র সে সামলাবার চেষ্টা করল। তারপর জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কি হবে?'

দীপার বোধগম্য হল না, সে প্রশ্ন করল, 'কি ব্যাপারে?'

'তোমরা কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে?' কান্না গলার দখল ছাড়ছিল না।

'আমি তো তাডাবার কেউ নই।'

'তুমিই সব। বল, তুমি কি আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলবে?'

'আবার বলছি আমি কেউ নই। কিন্তু আপনার চলে যাওয়ার কথা হচ্ছে কেন?'

'আজ সবার সামনে আমাকে জানিয়ে দেওয়া হল আমি ওর দাসী।'

'আপনি কি নিজেকে তার চেয়ে বেশী ভাবেন?'

'হ্যাঁ। শুধু দাসী হলে এতগুলো বছর আমি মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইতাম না। খুব খারাপ, বদ লোক ছিল, তবু—।' কান্নাটা বন্ধ করতে আনা মুখে আঁচল চাপা দিল।

'আমি যাই ?'

'না।' আনা হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে করুণ স্বরে বলল, 'তুমি যেও না, তুমি না থাকলে ওরা আমাকে এ বাড়ি থেকে দূর করে দেবে।'

'কেউ আপনাকে সেটা করতে পারবে না। আচ্ছা, ওঁর স্ত্রী কোথায় ?'

'সে কি! তুমি জানো না ?'

'না।'

'তিনি নেই। পাগলাগারদেই মারা গিয়েছেন।'

'পাগলা গারদ!'

'হ্যাঁ। শোন আশালতা—।'

'আপনি আমাকে ওই নামে ডাকবেন না।'

'ও। তুমি একটু বসো। তোমাকে আমি সব কথা বলব।'

'আমার কোন কথা শোনার একটুও ইচ্ছা নেই।'

'না। শুনতে হবে। একদিন আমি তোমার উপকার করেছিলাম, সেই অধিকারে তোমাকে বলছি, একটু বসো।' কথা বলতে বলতে আনা দরজার কাছে পৌঁছে সেটাকে ভেজিয়ে দিল। আনাকে হঠাৎ উন্মাদিনীর মত দেখাচ্ছিল। তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে, চুল আলুথালু। দীপা হতাশভঙ্গীতে খাটে এসে বসল। আনাব মুখ দেখে মনে হল এতে সে একটু সন্তুষ্ট হয়েছে।

হঠাৎই দীপার সামনে মেঝেতে বসে পড়ল আনা। দীপা প্রতিবাদ কবতে গিয়েও থেমে গেল। আনা বলল, 'উনি তো মানুষ ভালছিলেন না। সারা জীবন টাকা আব মেয়েমানুয নিয়ে ফুর্তি করেছেন। ঘরের বউ-এর ক্ষমতা ছিল না তাঁকে সুখী কবে। কোন কোন পুরুষমানুষের চাহিদা বাক্ষসের মত, একমাত্র রাক্ষুসী না হলে সেটা মেটাতে পারে না। সেই কাজটা করেছিলাম আমি। তাঁকে ঘরে ফিরিয়েছিলাম। গিন্নিই আমাকে লেলিয়ে দিয়েছিল। ছেলের অসুখের পর তার মাথা সব সময় ঠিক কাজ করত না। যাক এসব কথা। গিন্নি চলে গেছেন পাগলাগারদে থাকার সময়। খবরটা তোমার বাবা জানতেন। কর্তাকে জানানো হয়নি। কর্তা যখন প্রথম বিছানায় পড়লেন তখন থেকেই তাঁর বিবেক দংশন আরম্ভ হল। তোমার প্রতি যে অন্যায় করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইলেন।'

আমা নিঃশ্বাস নিতে একটু চুপ করতেই দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'উনি কি আমার পডাশুনার জন্যে টাকা দিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ। জোর করেই। তোমার বাবা নিতে চাইছিলেন না। ওই হরদেব শকুনটা জোর করে নেওয়ালেন। নিশ্চয়ই সে ভাগ নিতে ছাড়েনি। তবে, শুনেছি, টাকাটা ব্যাঙ্কে আছে, তা থেকে সুদ যায় তোমার কাছে।'

'কত টাকা ?'

'ঠিক জানি না। কর্তা আমাকেও বিশ্বাস করে পুরোটা বলেননি।'

'তারপর ?'

'উনি চাইতেন তুমি এ বাড়িতে এসো থাকো। ওঁর শরীর আরও খারাপ হতে লাগল। এই সম্পত্তি তোমাকে দিতে চেয়েছিলেন। আমি বলতাম, আমার কি হবে ? তিনি বলতেন, তোকেও কিছু দেব। শেষ দিকে যখন বুঝে গেলেন তুমি আসবে না তখন আর সম্পত্তির

ব্যাপারে কিছু বলতেন না। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে একটা উইল তৈরী করলাম। আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম ওঁকে দিয়ে সই করাতে। কিন্তু তখন ওঁর হাত উঠত না। এই সময় হরদেব শেয়াল আমাকে কুমতলব দিল। আমি একা মেয়েমানুষ। শরীর এখনও শুকিয়ে যায়নি। পুরুষমানুষের কুনজর চিতায় না ওঠা পর্যন্ত মরে না। ভাবলাম, এতদিন বাঘের হাতে ছিলাম এখন না হয় শেয়ালের হাতে থাকি। প্রশ্রয় পেয়ে হরদেব মাথায় উঠল। সে তোমাকে ঠকাতে বলল। নতুন উইল হল। সব সম্পত্তি বিষয়-আশয় আমার নামে। তদারকি করবে হরদেব। দিনরাত বলত সই করাতে। যিনি করবেন তাঁর তখন আঙ্গুল সরে না। বলল, টিপসই করাতে। করব করব করে যখন হুঁস হল তখন তিনি নেই। ওই মরা মানুষটার আঙ্গুলে কালি মাখিয়ে ছাপ লাগাতে চেয়েছিল শেয়ালটা। আর তখন ভগবান আমাকে সম্বিত ফিরিয়ে দিলেন। সব ছিঁড়ে ফেলেছি। কিন্তু কে জানত ওঁর আত্মীয় এসে পাঁচজনের সামনে আমাকে খাট থেকে টেনে নামাতে চাইবে! তুমি বলছ সম্পত্তি চাই না, আমাকে কুকুর বেড়ালের মত তাড়াবে আর পাঁচভূতে সব দখল করবে। করুক। কিন্তু তুমি বল, আমার অপরাধ কোথায়?'

দীপা কোন জবাব দিল না। সে অবাক হয়ে আনার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। যা শুনছে তা কি সত্যি? হরদেব ঘোষাল তাকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে যে কথাগুলো বলেছিলেন তা মনে পড়ল। চা-বাগানে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন ব্যাপারটা। কিন্তু অমরনাথ এখনও সেই প্রসঙ্গ তোলেননি। আনা যা বলছে তাতে কি মিথ্যে আছে? দুটো যোগ করলে তো— ! এমন কি প্রতুলবাবুর দাদাও একই কথা বলে গেলেন। কেঁপে উঠল দীপা। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। অমরনাথ তাকে মিথ্যে কথা বলেছেন? জলপাইগুড়ির বিখ্যাত চা-বাগানের মালিক রায়পরিবার থেকে তাকে তার মেধার জন্যে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে না?

আনা দীপার হাত ধরল, 'শোন, তুমি আমাকে রক্ষা কর।'

'কি ভাবে?' দুর্বল গলায় বলল দীপা।

'ওদের বল আমি এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না।'

'আপনার কেউ নেই?'

'আছে। একটা ছেলে। আমাদের দেশে। হাওড়ায়। সেখানে আমার যাওয়ার মুখ নেই। কর্তার টাকায় সে বড় হচ্ছে।'

'ওর বাবা নেই?'

'না। সে কর্তাবাবুর ছেলে। এখন হরদেব শেয়াল ছাড়া একথা কেউ জানে না। আমি বলতেও চাই না। এই পরিচয় দেবার তো উপায় নেই। আইন মানবে না।' আনা আরও ঘনিষ্ঠ হল, 'তুমি হোস্টেলে থেকো না। এই বাড়িতে চলে এস। তোমার মধ্যে একধরনের তেজ আছে। কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না।'

'আপনি আমাকে বাঁচাতে এ বাড়ি থেকে একদিন চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন। আজ কেন—।' দীপা মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'সত্যি কথা বলব? তোমাকে বাঁচাবার চেয়েও সেদিন আমার মনে হয়েছিল তুমি চলে গেলে কর্তাবাবুকে আমি নিজের মত করে পাব।' কেঁদে উঠল আনা।

সেই মহিলার দিকে কয়েক সেকেন্ড অপলক তাকিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এল দীপা। দরজার বাইরে সেই বৃদ্ধ চাকরটি অসহায় চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দীপা কোন দিকে লক্ষ্য না করে হাঁটছিল। মৃত্যুশোক নয়, একটি নির্মম সত্যের শোষণ তার

জীবনকে নীরক্ত করে দিয়েছে কয়েক মিনিটে।

অমরনাথ মেয়েকে দেখে চমকে উঠলেন। দ্রুত পা চালিয়ে কাছে এসে তিনি উদ্বেগে প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে দীপু ?'

দীপা অমরনাথের দিকে তাকাল। সেই দৃষ্টির সামনে তিনি কেঁপে উঠলেন। দীপা নিচু গলায় বলল, 'তুমি কেন এত লোভী হলে ! ছিঃ !'

॥ ২৪ ॥

মনোরমা একটা মোড়ায় বসেছিলেন। অঞ্জলি ভেতরের দরজায় দাঁড়িয়ে। সমস্যায় পড়লেই তার হাত আঁচল তুলে ঠোঁটে চাপা দেয়। অমরনাথ তাঁর চেয়ারে। সত্যসাধন মাস্টার এসে পড়বেন এখনই।

সত্যসাধন মাস্টারকে খবর দিয়ে এসেছিলেন বুধুয়া। মনোরমা তাকে পাঠিয়েছিলেন। বিকেলের একটু আগে অমরনাথ জলপাইগুড়ি থেকে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। মেয়ের সঙ্গে তার যাবতীয় সম্পত্তি। পরনে কলেজে যাওয়ার শাড়ি। আর বাড়িতে ফিরেই সে মনোরমার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছিল। অনেক ডাকাডাকিতেও খোলেনি।

অঞ্জলি এবং মনোরমা অমরনাথকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বাইরের ঘরে বসে অমরনাথ ধীরে ধীরে সব কথা খুলে বলেছিলেন। এব অনেকটাই অঞ্জলিব জানা কিন্তু মনোরমা প্রথম শুনলো। তাঁব খেয়াল হল না যে ছেলে এতদিন কথাগুলো তাঁকে জানায়নি। বরং মনে হল দীপা খুব বোকামি করছে। তিনি বলেছিলেন, 'সমস্ত সম্পত্তি এমনি এমনি রেখে লোকটা চলে গেল ভাবতে কেমন লাগছে। সব দীপা পাবে ?'

অমরনাথ হাত নাড়লেন 'আমাকে আব জিজ্ঞাসা করো না। আমি খুব ছোট হয়ে গেছি।'

'কেন ? ছোট হবি কেন ? তুই তো আর হাত পেতে কিছু নিতে যাসনি। আইন যা বলে তাই হবে। তুই দীপার গার্জেন। ওব ভালর জন্যে করেছিস।' মনোরমা গজগজ কবতে লাগলেন, 'ওইটুকুনি পুঁচকে মেয়ে মুখেব ওপর বলল লাগবে না আর তুই চুপ করে বইলি ? কেমন বুদ্ধি তোর ?'

অমরনাথ লক্ষ্য করেছিলেন মনোবমা বাবা না বলে গার্জেন বললেন। খট্ করে লেগেছিল শব্দটা। কিন্তু তিনি উপেক্ষা করলেন, 'প্রতুলবাবুকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়াব পর আনা ওকে ভেতরে ডেকে পাঠিয়েছিল। কি বলেছিল জানি না।'

'তুই যেতে দিলি কেন ওকে ওই নষ্ট মেয়েছেলেটার কাছে ? বাড়িব ঝি হয়ে বাবুব সম্পত্তির দিকে হাত বাড়াচ্ছে। সাহস কি !' মনোরমা মুখ ঘুবিয়ে নিলেন।

অঞ্জলি এই প্রথম কথা বলল, 'আপনি তাকে দ্যাখেননি মা। আমি দেখেছি। কে বলবে বাড়ির ঝি। পোশাক, ঠমক দেখে যে-কোন পুরুষেব মাথা ঘুরে যাবে। উনি যে ওখানে যেতেন তাতেই আমার আপত্তি ছিল।'

'আঃ বাজে বকো না তুমি।' মনোরমা ধমক দিলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, 'তারপর কি হল ?'

আনার ব্যাপার নিয়ে অঞ্জলির দেওয়া খোঁচাটা ভুলতে চাইলেন অমরনাথ। হ্যাঁ, আনাব শরীরে একটা আকর্ষণ-শক্তি আছে। অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে তিনি নিজেকে খুব সংযত রেখেছেন। মায়ের প্রশ্নের জবাব দিলেন তিনি, 'অনেকক্ষণ বাদে ও ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কেমন অসুস্থ দেখাচ্ছিল ওকে। আমি ছুটে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতে

মেয়ে বলল, তুমি কেন এত লোভী হলে, ছিঃ আমি মাটিতে মিশে গেলাম মা। যাকে এইটুকুনি থেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি তার মুখ থেকে আমাকে ওই কথা শুনতে হল ? আমি কার জন্যে লোভ করেছি ? নিজের জন্যে ?' দু হাতে মুখ ঢাকলেন অমরনাথ। প্রতুলবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে দীপা তাঁর দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তা কিছুতেই মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারছেন না তিনি।

বাড়ির সামনে তখন কেউ নেই। প্রশ্নটা শুনে কিছুই জবাব দিতে পারেননি অমরনাথ। হয়তো জবাব আশাও করেনি দীপা। কারণ খানিক দাঁড়িয়ে সে ধীরে ধীরে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল। অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন না তাঁর কি করা উচিত। অসহায়ের মত তিনি মেয়েকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলেন। আনা দীপাকে ভেতরে ডাকিয়ে নিয়ে গিয়ে ঠিক কি কথা বলেছে তার কোন আন্দাজ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে সব তথ্য এতদিন মেয়ের কাছে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন তা প্রকাশ পেয়ে যাওয়াতে একধরনের সংকোচবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যা নাড়া খেয়ে গেল দীপার একটি বাক্যে। ক্রমশ তিনি উষ্ণ হতে আরম্ভ করলেন। তাঁর মনে এমন ভাবনা ছিল যে অল্প বয়সের স্পর্দ্ধায় দীপা তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটিকে অস্বীকার করছে। এই বয়সে অনেকেই ন্যায়নীতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে থাকে। কিন্তু বয়স বাড়লে, বাস্তববুদ্ধি প্রখর হলে অমরনাথ যখন ঘটনাটা প্রকাশ করবেন তখন প্রতুলবাবুর সম্পত্তি গ্রহণ করতে হয়তো আপত্তি থাকবে না। অভাবের আঁচ যার গায়ে লাগেনি সে অনেক ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের, অভাবীর পক্ষে সংসারে থেকে ত্যাগের কথা বলা খুব নির্মম ব্যাপার।

অমরনাথ দ্রুত পা চালিয়ে মেয়ের সঙ্গ নিলেন। কিন্তু প্রশ্ন করতে গিয়েও সামলে নিলেন তিনি। কি প্রশ্ন করবেন ? কি বলল আনা ? কেন দীপা তাঁর মুখের ওপর অমন ভয়ানক কথাটা বলল ? মেয়ের মুখের দিকে আড়চোখে তাকিয়েই তিনি বুঝে গেলেন প্রশ্নগুলো করা নিরর্থক। একদম পাথরের মত মুখ হয়ে গেছে মেয়ের। চুপচাপ তারা হেঁটে এসেছিলেন করলা নদী পর্যন্ত। তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না এখন দীপা কোথায় যাবে। কলেজে যাওয়ার মানসিকতা নিশ্চয়ই থাকতে পারে না। তাঁর মনে হল ওকে চা-বাগানে নিয়ে যাওয়া উচিত। এই মানসিক টালমাটালের সময় অঞ্জলির উপস্থিতি ওকে সাহায্য করবে। কিন্তু কলেজ খোলা থাকলে হোস্টেল থেকে ছুটি পাওয়া যায় কিনা তা তাঁর ধারণায় ছিল না। ঝুলন ব্রিজের ওপর উঠে তিনি প্রথম কথা বললেন, 'এখন হোস্টেলে গেলে বড়দিকে পাওয়া যাবে ?'

দীপা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, 'কেন ?'

'না, মানে, আমি ভাবছি, তুই যদি কদিন বাড়ি থেকে ঘুরে আসতিস ভাল হত।'

'আমি চা বাগানেই যাচ্ছি।' দীপা আবার হাঁটা শুরু করল।

বাকি পথটা কোন কথা হয়নি। হোস্টেলে পৌঁছে গেস্ট রুমে বসেছিলেন অমরনাথ। যেন একটা বিরাট ঝড় আজ বয়ে গেল। আর যাই হোক মেয়ের মুখে নিজের সম্পর্কে অমন কথা শোনার পর থেকেই ক্রমশ শূন্যতাবোধ ঘিরে ধরছে তাঁকে। অমরনাথ দেখলেন বড়দি বের হচ্ছেন তাঁর কাজে। তিনি চটজলদি সামনে গিয়ে নমস্কার করলেন, 'নমস্কার। আমার মেয়ে দীপাকে একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই যদি আপনার আপত্তি না থাকে।'

'এখন তো কলেজ খোলা। কোন জরুরী কারণ আছে ?'

'হ্যাঁ। আমাদের এক—।' নিজেকে সামলে নিলেন অমরনাথ। আত্মীয় শব্দটা ব্যবহার করলে যদি আবার দীপার কাছে বিপাকে পড়তে হয়। তিনি বললেন, 'একজন খুব কাছের

মানুষ মারা গিয়েছেন— ।'

'ও হো। তাহলে তো নিশ্চয়ই যাবে। ও আছে হোস্টেলে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেকি। কলেজে যায়নি ?'

'যাচ্ছিল। পথে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।'

'ও। ঠিক আছে। নিয়ে যান। তবে এখন তো রোজ ক্লাস হচ্ছে। বেশী দিন অ্যাবসেন্ট থাকলে ও পিছিয়ে যেতে পারে।' বড়দি চলে গেলেন।

জিনিসপত্র নিয়ে দীপা যখন নেমে এল নিচে তখন অমরনাথ অবাক হয়েছিলেন। টিনের ট্রাঙ্কটাতে না হয় জামাকাপড় বইপত্তর নিচ্ছে, কিন্তু বিছানা নিয়ে যাওয়ার তো কোন কারণ নেই। তিনি একটু বিরক্তগলায় কারণটা জানতে চেয়েছিলেন।

দীপা অমরনাথের মুখের দিকে না তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল 'এগুলো বাড়ি থেকেই এনেছিলাম। এখানে রেখে যাওয়ার তো কোন মানে হয় না।'

'মানে হয় না। ফিরে এসে শোবে কোথায় ?'

'আমি তো ফিরে আসব না।'

'ফিরে আসব না মানে ?' প্রায় আকাশ থেকে পড়েছিলেন অমরনাথ।

'আমি আর পড়ব না।' এবার তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিল দীপা।

'পড়বে না ? সে কি ?' কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি।

'হ্যাঁ। চল।'

'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি বলছ !'

'তুমি এতদিন আমাকে সত্যি কথা বলনি। তুমি বলেছিলে মিস্টার রায় আমার রেজাল্ট দেখে ওঁর ফান্ড থেকে পড়াশুনার খরচ দিচ্ছেন। এত টাকা ভাল অবস্থার মেয়েরাই পায় না বলে আমার কেমন লেগেছিল কিন্তু তোমার কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখন যখন জানতে পেরেছি তুমি ওদের কাছ থেকে হাত পেতে টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে আমাকে পড়াচ্ছ তখন আর সেই টাকায় পড়ার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

ফাঁপরে পড়লেন অমরনাথ। এবং সেটা ঢাকতে প্রায় চিৎকার করেই উঠলেন, 'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। কে টাকা দিচ্ছে, কোত্থেকে টাকা আসছে, এসব তোমার ভাবার কোন দরকার নেই। তোমার কাজ পড়াশুনা করা, সেইটেই কর।'

দীপা তাকিয়ে দেখল হোস্টেলের কাজের লোকেরা অমরনাথের কথা বলার ধরনে আকৃষ্ট হয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করেছে। সে বলল, 'এসব কথা এখানে দাঁড়িয়ে না বললেই ভাল হয়। তুমি কি যাবে ?'

ওই প্রশ্নের পর আর কথা বাড়ায়নি অমরনাথ। দুটো রিকশা ডেকে তার একটায় মালপত্তর সমেত মেয়েকে তুলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়টিতে উঠে বসে রাগ অভিমান আর অসহায়তার মিশেল নিয়ে দিশেহারা হয়ে চলেছিলেন তিস্তার ঘাটের দিকে।

অঞ্জলি ইতিমধ্যে আলো জ্বেলে দিয়েছে। ছেলেরা বড় হয়ে গেছে। তাদের কৌতূহল এখন স্বাভাবিক। দিদি বাক্স-প্যাটরা নিয়ে কলেজ থেকে ফিরে এসেছে কেন সেটা জানতে চেয়েছে মায়ের কাছে। দিদি ঠাকুমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছে। তার কাছে পৌঁছানোর উপায় নেই। তাছাড়া তার গাম্ভীর্যের কারণে সব কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। ভেতরের বারান্দায় হ্যারিকেন জ্বালাতে জ্বালাতে অঞ্জলি বলেছিল, 'সব ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন ? তোমরা তোমাদের মত থাক।'

বড়টা জিজ্ঞাসা করল, 'দিদির শ্বশুর মরে গেছে ?'
'হ্যাঁ। কেউ মারা গিয়েছে শুনলে এভাবে প্রশ্ন করতে নেই।'
'দিদি কি আর পড়বে না ?'
'জানি না।'
'না পড়লে দিদি কি করবে ? দিদির কি আবার বিয়ে হবে ?'
সঙ্গে সঙ্গে ছোটটা বলল, 'এম্মা। দিদি তো বিধবা। বিধবার বিয়ে হয় ?'
বড় জবাব দিল, 'হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করেছেন।'
ছোট জানতে চাইল, 'তাহলে ঠাকুমার বিয়ে হয়নি কেন ?'
অঞ্জলি এবার কড়া ধমক দিল। এ ব্যাপারে আর কোন কথা ওদের মুখ থেকে শুনতে চায় না জানিয়ে বাইরের ঘরে চলে এল আলো নিয়ে। আবছা অন্ধকারে মা আর ছেলে বসেছিলেন। আলো টেবিলে রেখে অঞ্জলি বলল, 'মাস্টারমশাই এখনও এলেন না কেন ?'
অমরনাথ ভাঙা গলায় বললেন, 'ওকে কেন খবর দিতে গেলে।'
মনোরমা বললেন, 'পারলে একমাত্র উনিই পারবেন। পড়াশুনার ব্যাপারে মাস্টারের কথাই দেখেছি ও বেদবাক্য বলে মনে করে।'
অমরনাথ তাঁর আপত্তি জানালেন, 'ঘরের কেচ্ছা বাইরের লোকে জানবে।'
'কেচ্ছা আবার কি ! এ তো ঘরে ঘরেই হয়। তাছাড়া মাস্টার সেরকম মানুষ নয় হাজার হোক মেয়েটাকে খুব স্নেহ করে।' মনোরমা দৃঢ় গলায় বললেন।
এই সময় বাইরের বারান্দায় পায়ের শব্দ হল : এবং সেই সঙ্গে সত্যসাধন মাস্টারের গলা ভেসে এল, 'অমরনাথবাবু আছেন না কি ?'
অঞ্জলি চটপট এগিয়ে গিয়ে ভেজানো দরজা খুলে বলল, 'আসুন।'
'কি ব্যাপার ? হঠাৎ জরুরী তলব। দীপার কিছু হইছে না কি ?' বলতে বলতে সত্যসাধনবাবু ঘরে ঢুকলেন। অমরনাথ ওঠার একটু চেষ্টা করে আবার গা এলিয়ে দিলেন মনোরমা বললেন, 'বসুন মাস্টারমশাই। আপনার সঙ্গে কথা আছে।'
সত্যসাধনবাবু বসলেন। তাঁর লংক্লথের পাঞ্জাবি থেকে ঘামের গন্ধ পেল অঞ্জলি দরজা বন্ধ করে পাশ দিয়ে আসার সময় : সত্যসাধনবাবু অমরনাথের দিকে তাকালেন, 'দীপামায়ের কিছু হইছে না কি ? সে আছে কেমন ?'
অমরনাথ জবাব দিলেন না। মনোরমা বললেন, 'দীপা এখানে চলে এসেছে।'
'তার কলেজ বন্ধ ?' সত্যসাধন মাস্টার ব্যাপারটা বুঝতে পরছিলেন না।
মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'না। আপনাকে সব কথা খুলে বলি : ব্যাপারটা আমাদের পরিবারের গোপন বিষয়। কিন্তু আপনাকে আমি বিশ্বাস করছি কারণ আপনি দীপাকে ভালবাসেন। আপনি জানেন ওর বিয়ে এবং বিধবা হবার ঘটনা। সেসব মন থেকে সরিয়ে ফেলেছিল। আপনি তখন ওকে সাহায্য করেছিলেন। জলপাইগুড়ির কলেজে যখন পড়তে যাওয়ার কথা হল তখন ওর শ্বশুরমশাই নিজে অমরকে ডেকে অনুনয় করলেন যেন দীপার পড়ার খরচ তাঁকে দিতে দেওয়া হয়। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করতে চান : তা সরাসরি না দিয়ে টাকাটা তিনি ব্যাঙ্কে অমর আর দীপার নামে রেখেছিলেন। ব্যাঙ্ক থেকে প্রতি মাসে হোস্টেলে পাঠিয়ে দিত। অমর একথা দীপাকে বলেনি। মেয়ের যা জেদ তাতে বললেও শুনত না। এই চলছিল। ওর শ্বশুর খুবই অসুস্থ ছিলেন। আজ সকালে মারা গিয়েছেন তা তাঁর উত্তরাধিকারী বলতে দীপা। অমর দীপাকে নিয়ে গিয়েছিল সেই বাড়িতে : সেখানে গিয়ে মেয়ের মাথা বিগড়ে গিয়েছে। অমরকে অপমান করেছে। আর সব জিনিসপত্র নিয়ে

হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছে পড়াশুনা করবে না বলে।'
সত্যসাধন মাস্টার চুপচাপ শুনছিলেন। এবার নিচু গলায় জানতে চাইলেন, 'কেন ?'
এবার অমরনাথ আচমকা গলা তুলে বললেন, 'তাব মান গিয়েছে। প্রতুলবাবুর টাকায় তিনি পড়বেন না। আমাকে লোভী বললেন। লোভ ? আরে কাব জন্যে আমি করছি ? নিজের জন্যে না ছেলে দুটোর জন্যে ? তোরই তো ভাল চাই।'
অঞ্জলি চাপা গলায় ধমকে উঠ, 'আঃ। কি হচ্ছে কি ? এসব কি বলছ চিৎকার করে ? মেয়েটা শুনতে পেলে ভাল হবে ?'
'পাক। এ বাড়িতে ওর ভয়ে আমাকে চুপ করে থাকতে হবে ? হোস্টেলে থেকে মেয়ে বিদ্যেধরী হবে, আমার পয়সায় পড়লে বাকিদের বঞ্চিত করা হবে এ চিন্তা তার মাথায় কখনও এসেছে ? এত জেদ কিসের, অ্যাঁ ?' ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছিল অমরনাথকে।
মনোরমা শান্ত গলায় বললেন, 'অমর, তুই যদি এমন করবি তাহলে আর কথা বলে লাভ কি ! মাস্টারমশাইকে কষ্ট দিয়ে ডেকে আনলাম।'
অমরনাথ হাত নাড়লেন অসহায়ভাবে কিন্তু মুখে কোন কোন কথা বললেন না।
সত্যসাধন মাস্টার চুপচাপ শুনছিলেন এতক্ষণ। এবার বললেন, 'আমি একটা কথা সাপোর্ট করি না। অমরনাথবাবু তার গুরুজন। উনারে সে যদি অপমান কইরা থাকে তাহলে এতদিনের সব শিক্ষা বৃথা। পিতা ও মাতা দেবতার মত।'
'হয়তো হত। যদি আমি নিজের বাবা হতাম। আমি কাক, কোকিলের ডিমকে নিজেব ডিম ভেবে এতকাল তা দিয়েছি।' অমরনাথ আক্ষেপ করলেন।
হঠাৎ অঞ্জলি চাপা গলায় ধিক্কার দিয়ে উঠল, 'ছিঃ।'
শব্দটা এমন জোরালো ছিল যে ঘরের সবাই একই সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকাল। অঞ্জলি বলল, 'তুমি ওই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে ?'
অমরনাথ স্ত্রীর চোখে চোখ রাখতেই কুঁকড়ে গেলেন। দু হাতে কপাল চেপে ধরলেন তিনি। সত্যসাধন মাস্টার উঠে এলেন তাঁর পাশে, 'ঠিক আছে, আপনার মনের অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা রাখা সত্যই মুশকিল। কিন্তু সে অনেক ছোট। আমাদের তো একটু উদার হতেই হয়। আপনি নিজেকে সংযত করেন অমরনাথবাবু।'
অমরনাথ কোন জবাব দিলেন না। কিন্তু তাঁকে খুবই অনুতপ্ত দেখাচ্ছিল।
সত্যসাধন মাস্টার ঘুরে দাঁড়ালেন, 'সে কোথায় ?'
মনোরমা গালে হাত দিয়ে বসেছিলেন, 'আমার ঘরে বসে আছে দরজা বন্ধ করে।'
সত্যসাধন মাস্টার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার লগে তো কথা কওয়া দরকার।'
মনোরমা অঞ্জলির দিকে মুখ ফেরালেন, 'যাও, বলো মাস্টারমশাই দেখা করতে এসেছেন।' অঞ্জলি পা বাড়াচ্ছিল, মনোরমা আবার ডাকলেন, 'বউমা। আজ তোমরা মাথা গরম করছ। কিন্তু যেদিন ওই একদিনের বাচ্চাকে নিয়ে এসে তুমি আমার অনুমতি চেয়েছিলে সেদিন আমি কি বলেছিলাম মনে আছে ?'
অঞ্জলি জবাব দিল না।
মনোরমা অপেক্ষা করলেন না, 'আমি আপত্তি করিনি শুধু বলেছিলাম আমৃত্যু মাথায় এই চিন্তা এনো না যে সে তোমাদের রক্তে জন্মায়নি। আজও বলি, চিন্তাটা মাথায় এলে তোমরা যেমন কষ্ট পাবে সেও তা থেকে বাদ যাবে না। এতদিনের পরিশ্রম তো মিথ্যে ছিল না তাহলে আজ কেন ওসব কথা তুলছ তোমরা।'
অঞ্জলি একবার শাশুড়ি আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল। তার মনে হল এই

কথাগুলো মনোরমা অমরনাথকে শোনানোর জন্যই বলছেন। মনটা খানিক হাল্কা হল তার। সে কোন কথা না বলে ভেতরে চলে এল।

মনোরমার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি ডাকল, 'দীপা।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে জবাব এল, 'আমাকে এখন বিরক্ত করো না।'

বলার ভঙ্গী এবং কথাগুলো শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হল অঞ্জলি। সে উষ্ণ গলায় বলল, 'তোমাকে বিরক্ত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। সত্যসাধন মাস্টার এসেছেন, তিনি তোমাকে ডাকছেন বলেই আমাকে আসতে হল। কি বলব দয়া করে বলে দাও।'

এতেই কাজ হল। ধীরে ধীরে দরজা খুলল। কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত উষ্ণতা উধাও হয়ে গেল অঞ্জলির। দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদলে কোন মানুষের মুখ এমন ফুলে যায়। কিন্তু নিজেকে সংযত করল সে। কোন কথা না বলে মেয়ের আগে আগে বাইরের ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে ইঙ্গিতে মনোরমাকে জানাল দীপা আসছে।

সত্যসাধন মাস্টার দেখলেন অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে দীপা এসে দরজায় অঞ্জলির পাশে দাঁড়াল। তিনি ডাকলেন, 'এখানে আসো। এই খাটের উপরে বসো।'

দীপা চোখ তুলে মাস্টারমশাইকে দেখল। তারপর হঠাৎই সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ঘরের এ প্রান্তে খাটের কাছে এসে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সে ভুলেও একবারও অমরনাথের দিকে তাকাল না। সত্যসাধন তাঁর ছাত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। এবার বললেন, 'তোমাকে একটা প্রশ্ন করি। কোন বস্তু গ্রহণ করার সময় লজ্জা, মান সম্মান, দারিদ্র্য, অর্থকে প্রতিবন্ধক হিসাবে কল্পনা করে নির্বোধরা ?'

দীপা জবাব দিল না। তার ঠোঁট মৃদু নড়ল মাত্র।

সত্যসাধন মাস্টার মাথা নাড়লেন, 'জবাব দাও। তোমারে এতকাল যা শিক্ষা দিলাম তার কতটা গ্রহণ করছ দেখি।'

'ভালবাসা।' দীপা জবাব দিল নীচু গলায়।

সম্ভবত এই উত্তরটা আশা করেননি সত্যসাধন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। তারপর হেসে বললেন, 'ঠিক। কারেক্ট। আর ?'

দীপা মাথা নাড়ল। সে জানে না।

'শিক্ষা।' সত্যসাধন নিজেই উত্তরটা দিলেন, 'শিক্ষিত হইতে চাইলে কোন লজ্জা মান সম্মান অভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া বোকামি।'

'আত্মসম্মান ?'

'হ্যাঁ। আত্মসম্মানও। কারণ এটি এমন এক বস্তু যে চিরকাল একই চেহারায় থাকে না। তোমার আত্মা আজ যে-সকল জিনিসের দ্বারা অপমানিত বোধ করতেছে তা আগামীকাল সেইভাবে নাও ভাবতে পারে। বয়স অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষা মানুষকে উদার করে। উদারতা অনেক সময় মান অপমান বোধকে চালিত করে। আজ যে ব্যাপারে তোমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতেছে কাল সেটা গুরুত্বহীন হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষা কখনই বৃথা যায় না। বিদ্যার জন্য মানুষ, প্রকৃত মানুষ চিরকাল নত মস্তকে থাকে। বিদ্যা বিনয় দান করে। আবার বিনীত না হইলে বিদ্যার্জন সম্ভব নয়। আশা করি আমার কথা তোমার বোধগম্য হইতেছে ?'

'আমি ওদের বাড়ির টাকায় পড়াশুনা করব না।'

'কারণ ?'

'ওদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক স্বীকার করি না।'

'তাঁরা তো কেউ জীবিত নাই।'

'কিন্তু আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল।'

'স্নেহ অতি বিষমবস্তু। অমরনাথবাবু তোমার মানসিকতা বুঝিয়াই তোমারে তখন কিছু জানান নাই। হ্যাঁ, সেই কাজটা ঠিক হয় নাই।'

'কিন্তু কেউ করুণা করে আমাকে টাকা দিয়েছে পড়াশুনা করতে—।'

'করুণা ? এটা কি বললা ? তুমি জানতা কোন এক বড়লোক তাঁর ট্রাস্টি হইতে তোমার পড়াশুনার খরচ দিতেছে। সেইটারে করুণা ভাব নাই কেন ?'

'ভেবেছিলাম এটা অনেকেই পেয়ে থাকে ?'

'খোঁজ নিছিলা তোমাদের কলেজের আর কেউ ওই টাকা পায় কিনা ?'

না।'

'কেন ? এ ব্যাপারে আগ্রহ হয় নাই কেন ?'

'টাকা পয়সার ব্যাপারে আমার কখনও আগ্রহ হয়নি।'

'চমৎকার। আজ নতুন কইর‍্যা আগ্রহের কি দরকার ! শোন মা, টাকার গায়ে কারো নাম লেখা থাকে না।পাপীর টাকা যদি পুণ্যের জন্যে ব্যয় হয় তাইলে সেটায় আর পাপের গন্ধ থাকে না।'

দীপা জবাব দিল না। কিন্তু তার ভঙ্গী দেখে বোঝা যাচ্ছিল এসব কথায় সিদ্ধান্ত বদল করতে রাজী নয়। সত্যসাধন মাস্টারও ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, ধরো তোমার কথাই ঠিক। তাইলে এখন তুমি কি করবা ?'

মাথা নাড়ল দীপা, 'জানি না।'

'চমৎকার। এতদিন এত বছর যত পরিশ্রম করছ সব জলাঞ্জলি দিয়া যদি ঘরে বইস্যা থাক তাইলে তো তুমি আমার মুখ সত্যি উজ্জ্বল করবা।'

দীপা কথাগুলো শুনে করুণ চোখে তাকাল। একটু ভেবে বলল, 'আমি না হয় প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব।'

'না হয় ! যেন কোন কিছু করার নাই বইল্যাই পরীক্ষা দেবা ? ছি ছি। এই চা-বাগানে কার কাছে তুমি পড়বা ? প্রাইভেটে পরীক্ষা দেওয়া যদি সোজা হইত তাইলে কেউ কলেজে ভর্তি হইত না।'

এবং এই প্রথম কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল দীপা। সত্যসাধন মাস্টার এবার অপেক্ষা করলেন। যতক্ষণ দীপা শান্ত না হয় ততক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। নিশ্বাস খানিক স্বাভাবিক হয়ে এলে দীপা বলল, 'ওদের টাকায় পড়াশুনা করার কথা ভাবলে মনে হয় গায়ে নোংরা লাগল। বিয়ের দু দিনের কথা তখন কিছুতেই ভুলতে পারি না। তাছাড়া বাবা কেন আমার কাছে সব লুকিয়ে রাখল। একদিন না একদিন আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। লুকিয়ে রেখে কি লাভ হল !'

সত্যসাধন মাস্টার বললেন, 'আমি তো প্রথমেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করছি। অমরনাথবাবু কাজটা ঠিক করেন নাই। কিন্তু তুমিও খুব অন্যায় করতেছ দীপা।'

'অন্যায় ?' দীপা চোখ তুলল।

'নিশ্চয়। বিদ্যার গায়ে কাদা লাগে না। কেউ যদি কোনদিন কোন খারাপ কাজ করে তাইলে নিজেকে রেক্টিফাই করা চলবে না, এ কি ধরনের কথা ? তুমি তো অনেক সময় ভুল কইর‍্যা পরে আমার কাছে ক্ষমা চাইছ, আমি যদি ক্ষমা না করতাম ? আমি যদি আর তোমারে পড়াইতে না আসতাম ? তোমার শ্বশুর প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টায় ছিলেন। সেইটা

তো মিথ্যা নয়। সেই চেষ্টারে তুমি কেন অসম্মান করবা। যাও, ঘরে যাও, এখনই তোমার মতামত দিতে হইব না। আমার কথাগুলান ভাবো। কাল সকালে আসবা আমাব কাছে। যাও।'

দীপা মাস্টারমশাই-এর দিকে একবার তাকিয়ে ধীবে ধীরে ঘব ছেড়ে ভেতরে চলে গেল। মনোরমা অঞ্জলিকে ইশারা করতেই সে মেয়ের সঙ্গ নিল। সত্যসাধন মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন, 'এখন চলি অমরনাথবাবু, চলি মা।'

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বুঝলেন?'

'কাল সকাল পর্যন্ত ওরে কিছু না বলাই ভাল। কিন্তু একটা কথা অমরনাথবাবু, ইউ শুড বি প্রাউড অফ ইয়োর ডটার। দীপার মত ছাত্রী পাইছি বইল্যায় আমিও আজ গর্বিত। নমস্কার।' ব্যাগ থেকে টর্চ বেব করে বাইরের দরজা খুলে বাবান্দায় পা বাখলেন সত্যসাধন মাস্টার।

মাঠেব ভিতব দিয়ে আসাম রোডে পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি অন্যমনস্ক ছিলেন। ওইটুকুনি একটি মেয়ে এতখানি আত্মসম্মানবোধ কি করে অর্জন কবল? এতক্ষণ যত উপদেশই তিনি দিয়ে থাকুন সেগুলো যে খুব জোবালো নয় তা তাঁর চেয়ে আব কে বেশী জানে। এখন মনে হচ্ছে দীপাবও সেটা বুঝতে অসুবিধে হযনি। কিন্তু তিনি কি কবতে পাবতেন? সঙ্গত কারণেই জেদ দেখিয়ে সবে দাঁড়ালে মেয়েটাব সারা জীবন মুখ থুবড়ে থাকবে। নিজেব পায়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবাব চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে এমন ছাত্রছাত্রী তিনি কখনই পাননি। দীপা ব্যতিক্রম। সেই দাঁড়াবাব মুহূর্তে যদি অভিমান বা আত্মসম্মানবোধ এসে আঘাত করে তাহলে তিনি সমর্থন কবতে পাবেন না। ভাল কাজের জন্যে কখনও কখনও মন্দেব সঙ্গে সমঝোতা কবতে হয়। তিনি দীপাকে তাই করাব উপদেশ দিয়েছেন।

আসাম রোড নির্জন। দুপাশে বড বড দেওদার গাছে ঝিঁঝি ডাকছে। বেশ কিছুটা দূবে চা-বাগানের বাবুদেব কোযার্টার্সে জ্বলা হ্যাবিকেনেব টিমটিমে আলো অন্ধকারকে আবও ঘন কবে তুলেছে। টর্চেব আলো মিইয়ে এসেছে। এ মাসে স্কুলে মাইনে হযনি। এমনিতে হাতে যা পান তাতে দুবেলা ভাত-ডালেব বেশী কিছু জোটে না। ব্যাটাবি কেনার টাকা এখনই যোগাড় করাব কথা চিন্তা কবতে পারেন না তিনি। তাই পথ চলতে মাঝে মাঝে সুইচ টিপে টর্চ নিবিয়ে বাখছিলেন। একবাব জ্বেলে যতটা হাঁটা যায়।

আঙবাভাসাব পুলেব কাছে এসে তিনি মানুষটাকে দেখতে পেলেন। টর্চেব আলো পায়েব কাছে ফেলে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কে?'

'আমাকে তো চেনার কোন কাবণ নেই।' গলাব স্বরে বোঝা গেল বক্তাব বযস হযেছে কিন্তু ব্যক্তিত্ব অটুট। কাছাকাছি হতেই সত্যসাধন আবিষ্কাব করলেন মানুষটিব পবনে গেরুয়া লুঙ্গি এবং ফতুয়া, কাঁধে ব্যাগ আর মুখে সাদা দাড়ি। তাঁকে এটা দেখাব জন্যে টর্চ জ্বালাতে হয়েছিল।

'আপনাকে এব আগে তো দেখি নাই।'

'হ্যাঁ। আমি এইমাত্র পৌঁছেচি। চা-বাগানটা কি ওই দিকে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কার কাছে যাইবেন? মানে, এই অন্ধকাবে তো ঠাওর কবা মুশকিল। আপনি আগে আসেন নাই, আপনাব তো অসুবিধা আরও বেশী।'

'অমরনাথ মুখোপাধ্যায়। সে তো এই চা-বাগানেই চাকরি করে?'

হ্যাঁ। আমি তাঁর কোয়ার্টার্সে ছিলাম এতক্ষণ। ঠিক আছে, চলেন, আমি আপনারে নিয়া যাই।' সত্যসাধন মানুষটিকে নিয়ে হাঁটা শুরু করলেন। বেশ কৌতূহল হচ্ছিল তাঁব।

হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি সন্ন্যাসী বইল্যা মনে হয় !'

'হ্যাঁ । যোশীমঠের কাছে আমার আশ্রম । নিজের প্রয়োজনেই অনেক খোঁজাখুঁজি করে এখানে এসেছি । আপনি ওদের ভাল করে চেনেন ?'

'ঘনিষ্ঠভাবে চিনি । অমরনাথবাবুর কন্যার গৃহশিক্ষক ছিলাম আমি ।'

'ছিলেন মানে ?'

'ছাত্রী বড় হইয়া কলেজে ভর্তি হইছে ।'

'ও । আর কে কে আছে ওদের বাড়িতে ?'

'অমরনাথবাবুর স্ত্রী, দুই পুত্র মা ।'

সন্ন্যাসী নিঃশ্বাস ফেললেন, 'অমরনাথের জননী জীবিত ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ । তাঁকে তো তেমন বয়স্কা মনে হয় না । কিছু যদি মনে না করেন, আপনাব লগে ওঁদের কি সম্পর্ক ?'

'এখন কোন সম্পর্ক নেই । বুঝতেই পারছেন, আমি কিছুই জানি না ।'

আসাম রোড ছাড়িয়ে মাঠের ভেতর দিয়ে ততক্ষণে তাঁবা অমরনাথের কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছে গিয়েছেন । সত্যসাধন মাস্টাব দরজার কড়া নাড়তেই ভেতব থেকে অঞ্জলিব গলা পাওয়া গেল, 'কে ?'

সত্যসাধন বললেন, 'আমি মাস্টারমশয় । একটু দরজাটা খোলেন ।'

অঞ্জলি হ্যারিকেন হাতে দরজা খুলতেই সত্যসাধন মাস্টার বললেন, 'ইনি আপনাদেব লগে দেখা কইরতে আইছেন । আমি কেয়ার্টার্স চিনইয়া দিলাম ।'

অঞ্জলি হ্যারিকেন ওপরে তুলতেই গেরুয়াবসনধারী সন্ন্যাসীকে দেখতে পেল । সে খুব আশ্চর্য হয়ে বলল, 'বলুন ।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমার পরিচয় জানতে পারি ?'

সত্যসাধন জবাব দিলেন, 'উনি অমরনাথবাবুর পরিবার ।'

'ও । সে কোথায় ?'

অঞ্জলি বলল, 'উনি খুব ক্লান্ত । শুয়ে আছেন ।'

'অ । অমরনাথের জননীকে ডেকে দেওয়া যেতে পারে ?'

'আপনি ভেতরে এসে বসুন ।'

সন্ন্যাসী একটু ইতস্তত করে বাইরের ঘরে ঢুকে নিজেই মোড়া টেনে নিলেন । অঞ্জলি দশাসই মানুষটির দিকে সভয়ে তাকান । খুব সাধারণ চেহারার মানুষ নন ইনি এমন ধারণা জন্মাল । সত্যসাধন মাস্টার বললেন, 'আমি তাইলে চলি । নমস্কাব ।'

বাইরের দরজাটা বন্ধ না করে অঞ্জলি ভেতরে এল । শোওয়ার ঘরে অমরনাথ তখন খাটে লম্বা হয়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে পড়ে আছেন । অঞ্জলি তাঁব কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'শুনছ, একজন সন্ন্যাসী এসে প্রথমে তোমার, তারপর মায়েব খোঁজ করছেন । বাইরের ঘরে বসে আছেন ।'

হাত সরালেন চোখ থেকে অমরনাথ, 'সন্ন্যাসী ? ধুত । চলে যেতে বল ।'

'কি করে বলব ?'

'কি করে বলবে মানে ? রাত দুপুরে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার মেজাজ এখন আমার নেই । বলে দাও ধর্মটর্মে আমার কোন আস্থা নেই ।' মুখ ব্যাজার করলেন অমরনাথ, 'শুধু পয়সা বাগাবার ধান্দা ।'

'উনি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ।'

'বেশ তো। মাকে গিয়ে বলো।'

'মেয়েটার এই অবস্থা আর বাড়িতে সন্ন্যাসী এল, কোন যোগাযোগ আছে কিনা কে জানে?' বিড় বিড় করতে করতে অঞ্জলি মনোরমার ঘরের দিকে পা বাড়াল। দরজা ঠেলে দেখল দীপা খাটের ওপর চুপচাপ বসে আছে। মনোরমা তাঁর ঠাকুরের সামনে বাবু হয়ে বসে জপ করছেন। অঞ্জলি মৃদু গলায় ডাকল, 'মা।'

মনোরমা প্রথমবারে সাড়া দিলেন না। দ্বিতীয়বারে নিঃশব্দে তাকালেন।

অঞ্জলি বলল, 'একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। মনোরমার মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল। জপের সময় তিনি কথা বলতে চান না। আজ বিকেল থেকে বাড়িতে যে ঝড় বইছে তাতে ঠাকুরের সামনে নিশ্চিন্তে বসার সুযোগ পাননি। তিনি মুখ ঘুরিয়ে আবার জপে মন দিলেন।

অঞ্জলি বুঝল শাশুড়ি উঠবেন না এখন। সে বলল, 'ওকে বসিয়ে রাখছি।'

মনোরমা ঈষৎ ঘুরে দীপাকে ইঙ্গিত করলেন। ইঙ্গিতটা দীপা বুঝল। সে খানিকটা অনিচ্ছা নিয়ে খাট থেকে নেমে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ব্যাপারটা অঞ্জলিকে আহত করল। দীপাকে না পাঠিয়ে মনোরমা তাকেই ইসারাটা করতে পারতেন। দীপা ততক্ষণে ভেতরের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে। কৌতূহল নিয়ে অঞ্জলি অভিমান সত্ত্বেও মেয়েকে অনুসরণ করল।

বাইরের ঘরে পৌঁছে দীপা দেখল সন্ন্যাসী তার দিকে তাকিয়ে আছেন। লোকটির চাহনি অত্যন্ত সতেজ। দীপা বলল, 'ঠাকুমা এখন ব্যস্ত। কি বলবেন আমাকেই বলতে পারেন।'

সন্ন্যাসী হাসলেন, 'সব পাত্রে কি সব জিনিস রাখা যায়? তোমার ঠাকুমা কখন ব্যস্ততামুক্ত হবেন?'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি কি ঠাকুমাকে চেনেন?'

'এ প্রশ্নও অবান্তর। চিনতে পারা খুব কঠিন কর্ম। তোমার নাম?'

'দীপাবলী?'

'তুমি, তোমার বিবাহ হয়েছিল?'

'একথা সবাই জানে।'

'কিন্তু তুমি খুব তেজী মেয়ে। ভাল, খুব ভাল। দ্যাখো, আমি তোমাদের এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করতে আসিনি। আমি এসেছি আমার প্রয়োজনে। তোমার বাবা কি একবার এখানে আসতে পারবেন না?'

এই সময় পেছনে চটির আওয়াজ হল। দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অমরনাথ দরজায় এসে বলছেন, 'কি ব্যাপার বলুন! রাত দুপুরে কারো কাছে আসা ঠিক নয়।'

সন্ন্যাসী হাসলেন, 'তোমার নাম অমরনাথ?' তিনি একবার তাকিয়েই মুখ সরিয়ে নিলেন, 'বসো। তোমাদের সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

॥ ২৫ ॥

অমরনাথ হতভম্ব। সন্ন্যাসীর বয়স অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর দীর্ঘদেহের গৌরবর্ণ ত্বক যেরকম কুঁচকে গিয়েছে তাতে আশির কাছাকাছি হওয়াই সঙ্গত। মাথার জটা প্রায় সাদা, দাড়িতে লাল ছাপ লেগেছে সাদার গায়ে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত বছর বয়সে এই চাকরিতে যোগ দিয়েছ তুমি?'

অমরনাথ জবাব না দিয়ে পারলেন না, 'অল্প বয়সেই। এখন বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে। রাত অনেক হয়েছে।'

'তোমার জানতে নিশ্চয়ই কৌতূহল হচ্ছে আমি কি বলতে এসেছি?'

'স্বাভাবিক।'

'আমি যা বলব তার আগে আমার কয়েকটা তথ্য জানা দরকার। তুমি কি তোমার মাতুলালয়ে বড় হয়েছ?' সন্ন্যাসী অমরনাথের মুখের দিকে তাকালেন।

'হ্যাঁ। সেখানে থেকেই আমি স্কুলে পড়েছি।'

'তোমার পিতা— ?'

'তিনি আমার জন্মের আগেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।'

'কী রকম দুর্ঘটনা ?'

'নৌকোডুবি।'

'তোমার পিত্রালয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই ?'

'না। কিন্তু আপনি এইসব তথ্য জানতে চাইছেন কেন ?'

'প্রয়োজন আছে।' সন্ন্যাসী হাসলেন, 'এটি কে ?'

'আমার মেয়ে।' অমরনাথ বুঝতে পারছিলেন যে তিনি সন্ন্যাসীর ব্যক্তিত্বের কাছে পরাস্ত হচ্ছেন। মানুষটির দৃষ্টিতে এমন সম্মোহনী শক্তি রয়েছে যে তিনি ওঁর আদেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছেন। অমরনাথ ঘাড় ঘুরিয়ে অঞ্জলি এবং দীপাকে দেখলেন।

'তোমার সংসারে এখন ক'জন মানুষ ?'

'ছয় জন। আমার দুটি পুত্রসন্তান, এরা, আর আমার মা।'

'তোমরা কি সুখে দিনযাপন করছ ?'

অমরনাথ উত্তর দিলেন না। আজ দুপুরের পর থেকে ঈশ্বর তাঁর জীবন থেকে সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছেন। দিনযাপন করতে হয় বলেই করা।

সন্ন্যাসী বললেন, 'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'গৃহী মানুষের জীবন কি সুখে বাঁধা থাকে ?'

'থাকে না। তবু গৃহী পার্থিব সুখের চেষ্টা করে। তুমি করেছ নিশ্চয়ই !'

'করেছিলাম।'

'পাওনি ? ব্যর্থ হয়েছ ?'

হঠাৎ দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চান ?'

সন্ন্যাসী হাসলেন, 'উত্তরটা তোমার ঠাকুমা থাকলে দিতে ভাল লাগত।'

'তিনি এখন পুজো করছেন ?'

'পুজো ? তিনি কি দীক্ষা নিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।' দীপা উত্তরটা দেওয়ামাত্র অঞ্জলি ফিসফিস করে বলল, 'দ্যাখ, ঠাকুমার বোধ হয় পুজো হয়ে গিয়েছে। হলে ওঁকে এখানে ডেকে আন।'

দীপা একটু জেদ দেখিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, আগে শুনি ওঁর কথা।'

সন্ন্যাসী দীপার দিকে তাকালেন, 'তুমি ছাত্রী ?'

'হ্যাঁ। আমি কলেজে পড়ি।'

'হুঁ। অনেক পড়াশুনা হবে তোমার।'

অঞ্জলি এতক্ষণ উশখুশ করছিল। এবার সুযোগ পেয়ে বলে ফেলল, 'দেখুন তো, ইনি আবার জেদ ধরেছেন জলপাইগুড়ির কলেজে পড়তে যাবেন না।'

'জেদ ? না পড়ার জন্যে জেদ ! কেন ? নিজের স্বভাবেব উল্টো আচরণ করছ কেন ?'

'আমার কি স্বভাব তা আপনি জানেন ?' দীপা জিজ্ঞাসা কবল।

'তোমাদের বংশে কি কোন মেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে ?'

প্রশ্নটা উত্তর দিলেন অমরনাথ, 'না। ও প্রথম। অবশ্য— !'

'অবশ্য কি ?'

'দীপা আমাদের মেয়ের চেয়ে আপন। জন্মমাত্র ওকে আমরা সন্তানের মত লালন করেছি। আমার শ্যালিকা ওকে জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছিল। সেই দিন থেকে যদিও রক্তেব কোন সম্পর্ক নেই কিছু আমরা মনে করি হৃদয়ের সম্পর্ক রক্তেব চেয়ে মূল্যবান।'

সন্ন্যাসী দীপার মুখের দিকে আবার তাকালেন, 'পড়াশুনা তোমাকে করতে হবেই মা। তা থেকে তোমার নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু একটা কথা, অন্তত তিরিশ বছর না হলে বিবাহ করো না। বাঙালি মেয়েদের পক্ষে বয়সটা যদিও খুব বেশী তবু তিরিশ পর্যন্ত অপেক্ষা কবা উচিত।'

অঞ্জলি কৌতূহল দমন করতে পারল না, 'কেন ?'

'শুনতে খারাপ লাগবে কিন্তু এ মেয়ের কপালে বৈধব্য লেখা আছে যদি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। এ ছাড়া মেয়েটি নিজেব ভাগ্য নিজে গড়ে নেবে।' অঞ্জলি জিজ্ঞাসা কবল, 'আপনি হাত দেখতে পারেন ?'

সন্ন্যাসী সশব্দে হেসে উঠলেন, 'না মা। ওসব বিদ্যে আমাব জানা নেই। তবে গুরুব আশীর্বাদে কখনও কখনও কাবো মুখেব দিকে তাকালে কেউ যেন কানে কানে আমাকে তাব সম্পর্কে কিছু বলে যায।'

দীপা হেসে ফেলল, 'এই বাড়িতে আমার আগে বুঝি আপনি এখানকার কারো সঙ্গে আমাদেব বিষয়ে আলোচনা করেছেন ?'

সন্ন্যাসী অবাক হলেন, 'মানে ?'

দীপা বললে, 'আপনি যেসব কথা বলছেন তা এখানকার সবাই জানেন।'

সন্ন্যাসীর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, 'কাবো সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা কবার সৌভাগ্য আমাব হয়নি। তাছাড়া তোমার ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সবাই জানবে কি করে ?'

'আপনি যা ভবিষ্যতে হবে বলছেন তা অতীতে ঘটে গিয়েছে।'

সন্ন্যাসী অবাক হয়ে গেলেন। অমরনাথ চুপচাপ শুনছিলেন। দীপাকে তাঁর বেশ বাচাল বলে মনে হচ্ছিল। অনথর্ক কথা বাড়াচ্ছে সে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বলছিলেন আমার সঙ্গে আপনার কিছু কথা আছে। সেটা যদি শেষ কবেন তাহলে ভাল হয। বাত বাড়ছে। আমি খুব ক্লান্ত।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'এ-সময়ে এসেছি বলে আমি দুঃখিত। বেশ, আমাব কথা শেষ করি।'

এই সময় অঞ্জলি মুখ ঘুরিয়ে দেখল মনোবমা আসছেন। সে বলল, 'মা এসে গিয়েছেন। আসুন মা !' সন্ন্যাসী মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেলেন। তাঁর চোখ এখন অঞ্জলির পাশে, দরজার দিকে। মনোরমা ধীরে ধীরে সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

মনোরমা সন্ন্যাসীকে দেখলেন। এত রাত্রে একজন সন্ন্যাসী কখনও কাবো বাড়িতে আসে বলে তিনি শোনেননি। অমরনাথ বললেন, 'ইনি আমার মা।'

'হ্যাঁ। ওঁর চেহারার সামান্যই পরিবর্তন হয়েছে।' সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে বলতেই মনোবমা চমকে উঠলেন। তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। দুচোখে অন্ধকার দেখলেন তিনি। তাঁর সমস্ত চেতনা লোপ পেয়ে গেল। শেষবাব চেষ্টা করলেন দরজা আঁকড়ে ধরতে। সন্ন্যাসী

বলে উঠলেন, 'ওঁকে ধরো।' তাঁর গলার স্বর এত উচ্চগ্রামে ছিল যে অঞ্জলি চমকে গিয়ে শাশুড়িকে পড়ে যেতে দেখে দুহাতে জড়িয়ে ধরল। অমরনাথ ছুটে এলেন। তিনিও মনোরমাকে আর এক পাশে ধরলেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'ওঁকে ওখানে শুইয়ে দাও।'

মনোরমাকে খাটের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। ঘরের কেউ মনোরমার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারছিল না। অঞ্জলি দ্রুত পাখা নিয়ে এসে বাতাস করা শুরু করল। অমরনাথ মনোরমার ওপর ঈষৎ ঝুঁকে ডাকতে লাগলেন, 'মা, মা তোমাব কি হয়েছে ?'

অঞ্জলি বলল, 'তুমি ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'মুখে একটু জল দাও। ডাক্তারের প্রয়োজন হবে না।'

দীপা এতক্ষণ চুপচাপ সব লক্ষ্য করছিল। সন্ন্যাসীর উপদেশ শেষ হওয়ামাত্র সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে দেখামাত্র ঠাকুমার এমন হল কেন ?'

সন্ন্যাসী গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ থেকে প্রমাণিত হল মনের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক রয়েছে। আমার ভাবতে ভাল লাগছে তোমার ঠাকুমার মনের কোন পরিবর্তন হযনি।'

এই সময় মনোরমা চোখ মেললেন। অঞ্জলি ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, কি হয়েছে আপনার ? শরীর খারাপ লাগছে ?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। তাঁর নিঃশ্বাস দ্রুত পড়ছিল। অঞ্জলি আবার হাওযা কবতে চাইলে তিনি নিষেধ করলেন, 'থাক।' তারপর চোখ বন্ধ করলেন। ঘরেব কেউ কোন কথা বলছিল না। মিনিটখানেক চুপচাপ শুয়ে থাকার পর মনোরমা উঠে বসলো অঞ্জলির আপত্তি সত্ত্বেও। তাঁর চোখ এবার সন্ন্যাসীর দিকে। সন্ন্যাসীও চোখ ফেরাচ্ছিলেন না। মনোবমা বেশ রুগ্ন গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কে ?'

'আমাকে দেখে যা মনে হয় আমি তাই।'

'তাহলে এখানে এসেছেন কেন ?'

'তুমি অসুস্থ। কথা বললে আরও উত্তেজিত হয়ে পড়বে।'

'সেটা আমি বুঝব। কেন এসেছেন ?'

'সন্ন্যাসীরও সংসারের প্রতি কিছু দায় থাকে। সেই দায় মোটানোর প্রয়োজন হয পঞ্চাশ বছর সাধনার পর। তবে আমার আসার জন্যে কারো কোন ক্ষতি হোক আমি চাই না।'

মনোরমা বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ সন্ন্যাসীকে দেখলেন। তারপর অঞ্জলিব দিকে তাকিযে বললেন, 'তোমরা সবাই এই ঘর থেকে যাও তো ! আমি একা ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি ডাকলে এ ঘরে এসো।'

অঞ্জলি অমরনাথের দিকে তাকালে তিনি ইশারা করলেন আদেশ মান্য করতে। যদিও তাঁর এই রহস্যময় ব্যাপারে কৌতূহল বেড়ে যাচ্ছিল। অঞ্জলি দীপাকে ডাকলেন ঘর থেকে চলে আসবার জন্যে। ওরা সবাই চলে গেলে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'না, আমার ভুল হতে পারে না। আপনার প্রকৃত পরিচয় জানতে চাই। বলুন ?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'প্রথমে বলে রাখি তুমি খেয়াল রাখবে যে হিন্দুঘরের বিধবা হিসেবে তোমার যা করণীয় তা থেকে সরে আসার কোন কারণ ঘটেনি। কোন গৃহী যখন সন্ন্যাসীব জীবন যাপন করেন তখন সংসারী মানুষের কাছে তিনি মৃত হয়ে যান। মনোরমা, তোমার অনুমান অভ্রান্ত। নৌকোডুবিতে আমার শারীরিক মৃত্যু ঘটেনি, আমাকে তুমি ঠিকই দেখছ। নদীতে ডুবে যাওয়ার পর কোথায় ভেসে উঠেছিলাম, কোন সাধুর প্রভাবে পড়ে আমি হিমালয়ে গেলাম সেসব কথা এখন অবান্তর। নৌকোডুবিতে আমার সাংসারিক অস্তিত্বের

মৃত্যু ঘটেছে। এবং সেই কারণেই তোমার এই বৈধব্যজীবন ধর্মমতে সঙ্গত।'

মনোরমা থরথর করে কেঁপে উঠলেন। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর কান্নার শব্দ সম্ভবত ভেতরের ঘরেও যাচ্ছিল। এবং আচমকা তিনি হাত সরিয়ে ভেজা চোখে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাস করি না। আমার বাবা সব জায়গায় খবর নিয়েছিলেন। আমি যাঁকে বিয়ে করেছিলাম তিনি অনেকদিন আগে ঈশ্বরের পায়ে চলে গিয়েছেন।'

'বেশ তো! আমি তোমাকে কিছুই বিশ্বাস করতে বলিনি। তোমাকে নিজে থেকে কোন কাহিনী শোনাইনি। আমার গলার স্বর শোনামাত্র তুমি চৈতন্য হারালে— !'

এই সময় ভেতর থেকে অমরনাথের গলা পাওয়া গেল, 'মা, কি হয়েছে, কাঁদছ কেন?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। সন্ন্যাসী বললেন, 'তোমার ছেলেকে এখানে আসতে বলো।'

মনোরমা দ্রুত মাথা নাড়লেন, 'না। আপনি বুজরুক। আপনাকে আমি চিনি না।'

সন্ন্যাসী মাথা নাড়লেন, 'না আমি বুজরুক নই। চিনতে চাইছ না সেটা তোমার ইচ্ছে। পঞ্চাশ বছর পর সন্ন্যাসীকে এক দিনের জন্যে তার গৃহে ফিরে আসতে হয়— ।'

'এসব কথা আমি শুনতে চাই না।' মনোরমা উঠে দাঁড়ালেন। তারপব গম্ভীর ভঙ্গীতে ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরেব ঘরে পা দিতেই অমরনাথের মুখোমুখি হলেন। অমরনাথ অত্যন্ত বিস্মিত। আজ পর্যন্ত তিনি মায়ের এই চেহারা দেখেননি। ইতস্তত না করেই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি হয়েছে তোমার? কাঁদছিলে কেন খারাপ কিছু বলেছে না কি?'

মনোরমা নিঃশব্দে মাথা নেড়ে না বললেন।

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, দেখছি।' অমরনাথ মনোরমার পাশ কাটিয়ে বাইরের ঘবে এসে হাত জোড করলেন, 'কিছু মনে করবেন না। আপনাব আচরণ আমাদের কাছে রহস্যময় ঠেকছে। আপনি বৃদ্ধ এবং সন্ন্যাসী। কিন্তু এর বেশী আমাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। তাছাড়া রাতও অনেক হয়েছে, এবার আপনি চলে গেলে খুশি হব।'

সন্ন্যাসী বললেন, 'আমি এখানে থাকার জন্যে আসিনি। পথেঘাটে রাত কাটানোব অভিজ্ঞতা আমার আছে। সেই যোশীমঠ থেকে অনেক ঘুরে তোমাদের ঠিকানা বের করে শেষ পর্যন্ত যে কারণে পৌঁছাতে পেরেছি তা সম্পূর্ণ হলেই আমি চলে যাব।'

'কারণটা তাড়াতাড়ি বলুন।'

'তুমি ঈশ্বরেব নামে যে কোন খাদ্যবস্তু আমাকে দান কবো।'

'মানে?' অমরনাথ আবার হতভম্ব।

'তুমি মনোরমার পুত্র। অতএব এই দানের অধিকারী তুমিই।'

'কেন আমি আপনাকে দান করতে যাব? আপনি যদি অভুক্ত থাকেন তাহলে আমার স্ত্রীকে বলছি আপনাকে কিছু খাবার দিতে। অঞ্জলি— ।' স্ত্রীকে গলা তুলে ডাকলেন অমরনাথ। অঞ্জলি কাছাকাছি ছিল। ডাক শুনে চটপট চলে এল। তাকে দেখে অমরনাথ বললেন, 'কিছু খাবার এনে ওঁকে দাও। নাটকটা শেষ হোক।'

'নাটক!' সন্ন্যাসী হাসলেন, 'ঠিকই বলেছ, জীবন থেকে নাটক তৈরী হয় কিন্তু অনেক সময় জীবন নাটককে ছাপিয়ে যায়। মা, তোমার বাড়িতে কোন ফল আছে?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'না।' সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, 'অন্ন? ভাত?'

'শুধু ভাত?'

'হ্যাঁ।'

'সকালের রাঁধা কিছুটা রয়েছে।'

'তাই হবে। একটা পাত্রে তার সামান্য কিছু নিয়ে এস।'

হঠাৎ অমরনাথ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, 'দাঁড়াও। আপনি কি কবতে চাইছেন ?'

'আমার চাওয়াটা খুবই সামান্য অমরনাথ। সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ত্যাগ করে গেলে কোন কোন গোষ্ঠীর সন্ন্যাসী যদি পঞ্চাশ বছর জীবিত থাকেন তাহলে তাঁকে এক দিনের জন্যে তাঁর সংসারে ফিরে এসে পুত্র কন্যা অথবা স্ত্রীর হাতের দান গ্রহণ করতে হয়। নইলে তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ হয় না। বলতে পার নিজের স্বার্থেই আমি তোমাদেব কাছে এসেছি।' সন্ন্যাসী খুব ধীর গলায় কথাগুলো বলে গেলেন।

অমরনাথের দুই চোখ বিস্ফারিত। তাঁর কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। এই সময় অঞ্জলি চিৎকার করে উঠল, 'এ আপনি কি বলছেন ?'

'আমি সত্যি কথাই বলছি মা।'

'না !' তীব্র স্বরে শব্দটি উচ্চারণ করে মনোরমা দরজায় ছুটে এলেন, 'ওঁর কথা বিশ্বাস করো না বউমা, মিথ্যে মিথ্যে, সব বুজরুকি !'

সন্ন্যাসী চোখ বন্ধ করলেন। সাদা দাড়ি গোঁফ সত্ত্বেও তাঁকে পাথরের মত দেখাচ্ছিল। অমরনাথ এবার চেতনায় এলেন, 'আপনি যা বলছেন তা দায়িত্ব নিয়ে বলছেন ?'

'দেখো, তোমাদের কাছে আমার অন্য কিছু চাওয়ার নেই। না টাকা পয়সা, না বিষয় সম্পত্তি। মিথ্যাচার করে আমি কি পেতে পারি ? এখনই এই রাত্রে আমি চলে যাব। হয়তো এই জীবনে তোমাদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। আমার গোষ্ঠীর নিয়ম পালন করতেই তোমাদের বিরক্ত করতে এসেছি। তোমরা অসংযত হয়ো না।'

হঠাৎ অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন অমরনাথ। তিনি বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন ! এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁর পিতা ? যে মানুষটিকে জন্মইস্তক মৃত বলে জানেন তিনি তাঁর সামনে বসে দান চাইছেন ? পিতৃস্নেহের প্রতি তাঁর লোভ ছিল ছেলেবেলা জুড়ে। বন্ধুদের প্রত্যেকের বাবা ছিল, শুধু তাঁর নয়। সেই মানুষটিকে আজ সামনে পেয়ে— । না, মনোরমা স্বীকার করেননি এখনও। বাবার চেহারার যে বর্ণনা তিনি শুনেছেন তার সঙ্গে সন্ন্যাসীর বয়স সত্ত্বেও কিছু মিল রয়েছে। তিনি চোখে দেখেননি। কিন্তু চিনতে যদি কেউ পারেন তিনি হলেন মনোরমা। অমরনাথ মায়ের দিকে ঘুরে কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'মা, তুমি বল, ইনি আমার বাবা ?'

মনোরমা মুখে আঁচল চাপা দিলেন।

অমরনাথ বললেন, 'মা, তুমি চুপ করে থেকো না। যদি ইনি মিথ্যা কথা বলেন তাহলে যাতে এই চা-বাগান থেকে সশরীরে না বেরুতে পারেন তার ব্যবস্থা আমি করব।'

মনোরমা অস্ফুটে বললেন, 'না।'

অমরনাথ উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি স্পষ্ট বল মা, এটা সত্যি ?'

মনোরমা সেই অবস্থায় মাথা নাড়লেন, 'আমি জানি না।' তার মুখ থেকে আবার কান্না ছিটকে উঠল। এবং এতক্ষণ চুপচাপ দেখে গিয়ে দীপা ঘরের মাঝখানে এগিয়ে এল, 'তোমরা একটু চুপ কর। শুনুন, আপনি যে পরিচয় দিচ্ছেন তার সপক্ষে কোন প্রমাণ আছে ?'

সন্ন্যাসী মাথা নাড়লেন, 'না নেই। ধরো মা, তোমাকে এখান থেকে তুলে যোশীমঠে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে কেউ কখনও তোমাকে দেখেনি। হঠাৎ যদি কেউ তোমাকে সেখানে বলে যে তুমি কে প্রমাণ দাও তাহলে দিতে পারবে ? তোমার ঠিকানা নাম যতই

বল তাতে তো তুমি এই তুমি প্রমাণিত হবে না যতক্ষণ না সেটার সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে কেউ এখানে আসে। তাই না ? পরিচিত মানুষ-সমাজ থেকে আমরা চলে গেলে পরিচয় প্রমাণ করা বড় শক্ত হয়ে পড়ে।'

দীপা সন্ন্যাসীর কথা মন দিয়ে শুনে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আপনার পরিচয় জানতে যোশীমঠে যেতে হবে আমাদের ? ব্যাপারটা কি আদৌ বাস্তব ?'

'ঠিকই বাস্তব নয়। তাহলে আর একটা উপায় থেকে যাচ্ছে। সেটা হল যিনি চিনতে পারবেন অর্থাৎ একমাত্র পূর্বপরিচিত ব্যক্তিই শনাক্ত করতে পারেন।'

'এখানে আপনার পূর্বপরিচিত কেউ নেই। বাবাও পঞ্চাশ বছর আগে জন্মাননি। ঠাকুমাও যে কথা বললেন, তা আপনি শুনেছেন।'

'শুনেছি।'

'এত রাত্রে আপনি কোথায় যাবেন ?'

'পথে বের হবার আগে পথ নিয়ে কি কোন সন্ন্যাসী চিন্তা করে মা ?'

'যিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন—।'

'সন্ন্যাসীদেব স্বার্থপর হতে হয?'

'এক অর্থে তুমি সত্যি বলছ।'

'নিজেব স্বার্থ ছাড়া যাবা চিন্তা কবতে পারে না তারা কি ধরনের মানুষ ?'

'বিচাব করতে হবে কোন স্বার্থ ? ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে পার্থিব সম্পর্ক থেকে যিনি গুটিয়ে নেন নিজেকে তাঁব সঙ্গে ধনলোভী স্বার্থান্বেষী তুলনা কবা কি ঠিক ?'

'ঈশ্বব চিন্তায় মগ্ন থেকে যিনি নিজেব পারিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন হন তিনি কি একাই ঈশ্বরকে পেতে চান না ? তার স্ত্রীপুত্র যদি ভেসে যায তবু তিনি নিজেব পুণ্যেব জন্যে সন্ন্যাসী হয়ে দিন কাটান না ? অর্থাৎ ঈশ্বরকে পেতে তিনি একাই চান নিজেব স্বার্থসিদ্ধি করতে। তফাতটা কোথায় আমি বুঝতে পারছি না।'

এই সময় অমবনাথ ধমকে উঠলেন, 'দীপা ! এত কথা বলাব কোন দবকার নেই।'

আর মনোরমা বললেন, 'না অমব। দীপা ঠিকই বলছে।'

খুব অবাক হযে গেল দীপা। যে ঠাকুমা দিনবাত ঠাকুব পুজো ‘াব বস্তাপচা সংস্কার আঁকড়ে থাকেন তাঁর মুখ থেকে এমন কথা সে শুনবে ভাবতে পারেনি। সে ঘুবে দাঁড়িযে বলল, 'ঠাকুমা, ভাল করে চেয়ে দেখো তো, ইনি তোমার স্বামী ছিলেন ?'

মনোরমা জবাব দিলেন না। দীপা একবার বাবাব দিকে তাকাল। তাবপর বলল, 'বাবা, ঠাকুমাব কাছে ঠাকুর্দার অনেক গল্প শুনেছি। ওঁব বাঁ দিকের বুকে একটা বড় আঁচিল ছিল। ছোটবেলায় সেটা কাটতে গিয়ে ঘা করে ফেলেছিলেন। এই নিয়ে ঠাকুমা তাঁকে খুব ক্ষ্যাপাতেন। তুমি দেখবে সেই দাগটা ওঁর শবীরে রয়েছে কিনা ?'

মনোরমা বললেন, 'আঃ। তোমরা থামবে ? আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না কেন ?'

অমরনাথ এক পাও এগোলেন না। সন্ন্যাসী হাসলেন। তারপর তাঁর আলখাল্লার বাঁধন খুলে উর্ধ্বাঙ্গের কিছুটা উন্মুক্ত করে বললেন, 'সম্ভবত এই দাগটির কথাই উনি তোমাকে বলেছিলেন।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ামাত্র মনোরমা ছিটকে বেবিয়ে গেলেন ঘবের বাইরে। অমরনাথ কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন চেয়ারে। অঞ্জলি দ্রুত শাশুড়িকে অনুসরণ করল।

দীপা বলল, 'আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'ঠিক হল না। এই চিহ্ন যে কোন মানুষের শরীরে থাকতে পারত। কাকতালীয় ভাবে

সে যদি তোমাদের কাছে মিথ্যে বলতে এসে সেটা দেখাতো তাহলে এত তাড়াতাড়ি তাকে স্বীকার করা কি ঠিক ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। আর কোন প্রমাণের দরকার নেই।'

'কেন ?' সন্ন্যাসীর চোখে কৌতুক।

'ঠাকুমার আচরণ প্রমাণ করছিল তিনি আপনাকে চিনতে পেরেছেন ?'

'তুমি তো অসাধারণ বুদ্ধিমতী।'

'তাতে কিছু লাভ হচ্ছে না। কিন্তু এটা কি আপনি ঠিক করলেন ! একটি মানুষ এতকাল ধরে জেনে এসেছেন যে তিনি বিধবা। তাঁর সমস্ত সত্তায় সেই ধারণা বসে গিয়েছে। এতদিন বাদে তিনি এই আঘাত কি করে সহ্য করবেন ?'

'আমি তো তাঁর কাছে মৃত।'

'কিন্তু সেটা এখন তো সত্যি নয়।'

'কেন নয় ! আমার সাংসারিক সত্তা তো সেই কবে মরে গিয়েছে।'

'এটা আপনি যেভাবে ভাবতে পারেন ঠাকুমা তা পারবেন কেন ? তিনি আপনার শ্রাদ্ধ পর্যন্ত করেছেন। আমি বুঝতে পারছি না কি হবে ?'

'ঠিকই বলছ তুমি ? মৃত মানুষ ফিরে এলে মানুষের সুখের বদলে দুঃখ বাড়ে। আমি নিজের কথাই ভাবতে গিয়ে এ দিকটা চিন্তা করিনি।'

'কিন্তু নৌকোডুবির পরে আপনি কি করে সন্ন্যাসী হলেন ? ঠাকুমার কথা আপনার মনে পড়েনি ? তাঁকে বঞ্চিত করে যাচ্ছেন একথা মনে হয়নি ?'

'না। কারণ যে সাধু আমাকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে তাঁর কাছে থাকার পরে জানতে পেরেছিলাম তিনি হিমালয়ে ফিরে যাচ্ছেন। আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে জেনেছিলাম তোমার ঠাকুমা ইতিমধ্যে শ্রাদ্ধ করে বৈধব্যজীবন যাপন করতে আরম্ভ করেছেন। কেমন ধিক্কার এল মনে। আমি পৃথিবীতে বেঁচে আছি অথচ আমার প্রিয়জনেরা মৃত ভেবে নিয়ে তাঁদের মত জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেই মানসিকতায় আমি সাধুর কাছে ফিরে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন হিমালয়ে। ওঁকে যদি কেউ বঞ্চিত করে থাকেন তাহলে তিনি ঈশ্বর। আমি নই।' সন্ন্যাসী কথা শেষ করতেই ঘড়িতে শব্দ বাজল। রাত গভীর হচ্ছে। সন্ন্যাসী অমরনাথের দিকে তাকালেন।

অমরনাথ বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে এতক্ষণ কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার চোখাচোখি হতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন, 'বাবা !'

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। অমরনাথ এগিয়ে এলেন দুই হাত জোর করে, 'বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।'

'তুমি স্বাভাবিক আচরণ করেছ অমরনাথ। এখন কি তোমার কাছে দান পেতে পারি ?'

'বাবা, আপনি যেতে পারবেন না।'

'মানে?'

'আপনাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে।' অমরনাথের গলার স্বর কাঁপছিল।

'অসম্ভব। সন্ন্যাসী কখনও গৃহবাসী হতে পারে না।'

'আপনাকে আমরা পেতে পারি না বাবা ?'

'না।' সন্ন্যাসী বললেন, 'আমার প্রার্থনা এবার পূর্ণ কর অমরনাথ।'

'বাবা। এ জীবনে আপনার দর্শন এভাবে পাব কখনও ভাবিনি। আমার অনেক সমস্যা।

পিতা হয়ে আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে যান দয়া করে। আজ রাতটা অন্তত থাকুন।'

'না। রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু এখানে কোন হোটেল দূরের কথা ধর্মশালা পর্যন্ত নেই।'

'সেই চিন্তা তোমার নয়।' সন্ন্যাসী হাসলেন, 'তোমার নিজস্ব জীবনযাত্রা বলে দেবে সমস্যায় পড়লে তোমার কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিত। সংসারী জীবন এবং তার সমস্যা সম্পর্কে কোন আগ্রহ আমার আর অবশিষ্ট নেই।'

অমরনাথ ঠোঁট কামড়ালেন। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী দীপার দিকে তাকালেন, 'তোমাব নামটি কি যেন?'

'দীপাবলী।'

'বাঃ। আলোকিত কর। নিজেকে প্রকাশ কর।'

'কি ভাবে?'

'নিজের চারপাশের অন্ধকার দূব করে। আমি অনুমান করছি তোমার বিবাহ হয়েছিল। তোমার স্বামী বিগত। কিন্তু এখন এই বয়সে—, বিভ্রম হচ্ছে।'

'আমাব বাবা বোধ হয় এই ব্যাপারে আপনার উপদেশ চাইছিলেন। ওঁরা কেন যে বালিকা অবস্থায় আমার বিয়ে দিলেন তা এখনও আমি বুঝতে পারিনি। বিয়ের দুদিন বাদেই সেই ছেলেটি অসুস্থতায় মারা গেল। তার বাবাব হাত থেকে আমি কোনমতে রক্ষা পেয়ে চলে এসেছিলাম। তাব দীর্ঘদিন বাদে যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন জানতাম না যে সেই ভদ্রলোক প্রায়শ্চিত্ত করাব জন্যে আমার বাবাব সঙ্গে ষড়যন্ত্র কবে ব্যাঙ্কে আমার নামে টাকা রেখেছিলেন যাতে আমি পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারি। খবরটা ওঁর মৃত্যুর পবে আমি জেনেছি। জানাব পর ওঁর নোংবা টাকায আব পড়াশুনা করতে আমি রাজী নই। জলপাইগুড়ি শহবের কলেজ থেকে আজ আমি চলে এসেছি।'

সন্ন্যাসী হাসলেন, 'যা ভাল মনে কবেছ তাই হয়েছে।'

দীপা বলল, 'কিন্তু আমাকে সবাই বোঝাতে চাইছেন আমি ভুল করছি।'

'তাদের নিশ্চয়ই বোঝাবাব অধিকার আছে।' সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়ালেন, 'অমবনাথ কি করবে? বলতে না বলতে অমরনাথ এবং অঞ্জলি ফিরে এলেন। অমরনাথের হাতে একটি থালায় রাতের খাবাব। তিনি বললেন, 'আপনি হাত মুখ ধুয়ে তাবপব নিশ্চয়ই এসব গ্রহণ কববেন?'

সন্ন্যাসী বললেন, 'তার প্রয়োজন হবে না। এত কেন এনেছ? আমি সামান্য অন্ন চেয়েছি তোমার কাছে। তুমি ওই থালা থেকে একমুঠো আমাব হাতে তুলে দাও।'

'আপনি আমার এখানে রাতেব খাবার খাবেন না?'

'না।' সন্ন্যাসী দুটো হাত অঞ্জলির মত এগিয়ে ধরেও সবিয়ে নিলেন। তিনি দীপাব দিকে তাকালেন, 'শোন মা। তুমি পথিক, পথ তোমার। সেই পথ রাজা তৈরী করেছেন না কোন অসৎ ধনীর টাকায তৈরী হয়েছে তা তো তোমাব জানার কথা নয়। পথিকের কাজ পথ ধবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। শরীরের জন্যে জীবন নয়, জীবনের জন্যে শরীর। লক্ষ্যে পৌঁছে পথিক পায়ের ধুলো ধুয়ে ফেলে জলে। সেটাই তো উচিত। পথ পড়ে থাকে পথে।' সন্ন্যাসী আবার অমরনাথের দিকে ফিরলেন, 'দাও।'

তাঁর বাড়ানো দুই হাতের চেটোয় এক মুঠো অন্ন তুলে দিলেন অমরনাথ। সন্ন্যাসী মনে মনে কিছু বললেন। তাঁর দুটো ঠোঁট কাঁপছিল। সযত্নে ওই অন্ন তিনি নিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। নেমে দাঁড়ালেন অন্ধকার আকাশের নিচে। তারপর মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে

সেই অন্ন ছড়িয়ে দিতে লাগলেন মাটি, জল, আলো, বাতাস এবং আকাশের উদ্দেশে। হ্যারিকেনের আলোর যে সামান্য অংশ বাইরে আসতে পেরেছিল তাতে তাঁকে খুব রহস্যময় মনে হচ্ছিল। উৎসর্গ শেষ হলে তিনি যখন স্থির হলেন তখন অমরনাথ এবং অঞ্জলি তাঁর পায়ের সামনে নতজানু হলেন। সন্ন্যাসী হাত তুলে আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আসাম রোডের দিকে এগিয়ে চললেন। আর তখন অমরনাথ ডুকরে কেঁদে উঠলেন। অঞ্জলি তাঁকে বলল, 'তুমি ওঁকে চলে যেতে দিচ্ছ? তোমার বাবা না? যাও, আটকাও। মায়ের কথা ভাবতে পারছ? উনি চলে গেলে ওঁর কি হবে?'

অমরনাথ বললেন জড়ানো গলায়, 'থাকলে কি ভাল হবে অঞ্জলি?'

অঞ্জলি সেটা বুঝতে চাইল না, স্বামীকে পঞ্চাশ বছর পরে ফিরে পেতে স্ত্রীর ভাল লাগবে না? কি যাতা বলছ? তাছাড়া এত রাত্রে এই জঙ্গুলে জায়গায় উনি কোথায় থাকবেন?

দীপা চুপচাপ শুনছিল। তার চোখের সামনে একটি মানুষ বংশধরের কাছ থেকে অন্নের ডেলা গ্রহণ করে পঞ্চভূতে ছড়িয়ে দিয়ে নির্বিকারভাবে চলে গেলেন। এই সংসার এই অন্ধকার কোন কিছুই তাঁর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারল না। সে বলল, 'মা, বাবা ঠিকই বলেছেন। ওঁকে ডেকে কোন লাভ হবে না।'

দীপা ভেতরে চলে এল। বসার ঘর শোওয়ার ঘর পেরিয়ে উঠোনের বারান্দায় পৌঁছে মনোরমার ঘরের দিকে তাকাল। দরজা ভেজানো। আলো জ্বলছে। সে নিঃশব্দে দরজা খুলল। মনোরমা বসে জপ করছেন, রোজ যেমন করেন। ঠাকুমার পুজো এর আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে বলে সে জানত। দীপা খাটের ওপর বসল।

তার চোখের সামনে এক বৃদ্ধার টানটান শরীর, যে শরীরে কম্পন নেই। একমাত্র একবার কেঁদে ওঠা ছাড়া ঠাকুমা সমানে অস্বীকার করে গিয়েছেন ঠাকুর্দার অস্তিত্ব। যাওয়ার সময় ঠাকুর্দা ভুলেও ওঁকে ডাকেননি। উনি জানেন না এখনও, ঠাকুর্দা চলে গিয়েছেন। সত্যি কি ঠাকুমা মনে করছেন উনি ঠাকুর্দা নন! কিন্তু কি স্বার্থ নিয়ে মানুষটা এখানে আসবেন? মনোরমা যেভাবে বসে আছেন তাতে মনেই হচ্ছে না কোন কিছু তাঁকে আলোড়িত করেছে। পুজোর সময় তাঁকে ডাকা নিষেধ। দীপা অপেক্ষা করতে লাগল।

এ বাড়ির কোথাও কারো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অন্তত আধঘন্টা কেটে যাওয়ার পর প্রণাম সেরে মনোরমা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নজর পড়ল দীপার ওপর। দীপা তাঁর চোখের দিকে তাকাল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বিশ্বাস করো উনি ঠাকুর্দা নন।'

'নিশ্চয়ই।' মনোরমা জবাব দিলেন।

'কিন্তু উনি তো প্রমাণ দিলেন।'

'কিসের প্রমাণ? বুকের দাগ আর অতীতের গল্প? তাতে কি হয়েছে? এই যে আমি পঞ্চাশ বছর ধরে বৈধব্যজীবন পালন করছি সেটা মিথ্যে হয়ে যাবে এক নিমেষে? আমার বাবা পঞ্চাশ বছর আগে অনেক খবর নিয়ে জেনেছিলেন তিনি মারা গিয়েছেন। আজ ভূতের মত বেঁচে ফিরে এলেই হল? উঃ, আর কত বুজরুকি দেখব!'

'তাহলে তুমি কাঁদলে কেন? কেন চলে এলে?'

'আমি সহ্য করতে পারছিলাম না।'

'কিন্তু ধরো ঠাকুর্দা তখন মারা যান নি, আজ সত্যি উনি ফিরে এসেছেন!'

'কে বলল মারা যায়নি! যখন মানুষের মন থেকে টান চলে যায় তখন সে বেঁচে থাকে না কি! নে ওঠ, খেয়ে নে।

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দীপা। তার মনে হল ঠাকুমা ঠিকই বলছেন। ঠাকুর্দা যদি

ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্যে পঞ্চাশ বছর ধরে স্বার্থপরতা দেখান, যদি আজ সংসারে এক মুহূর্তের জন্যে এই ফিরে আসাটা স্বার্থের কারণে হয়ে থাকে তাহলে ঠাকুমা ঠিকই করেছেন তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে। সে বলল, 'দাঁড়াও!'

দীপা মনোরমাকে প্রণাম করল। মনোরমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। দীপা ফিসফিস করে বলল, 'তুমি শক্ত হও ঠাকুমা, তুমি একজন সন্ন্যাসীর চেয়েও অনেক বড়।' একটু শান্ত হয়ে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই কলেজে ফিরে যাবি তো?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'যাব।' মনে মনে সে উচ্চারণ করল, পথ তুমি কার? পথিকের!

॥ ২৬ ॥

তিনদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে জলপাইগুড়িতে। আকাশ জুড়ে মেঘ। রাস্তায় একটাও রিকশা নেই। মেয়েরা কেউ আজ হোস্টেল থেকে বেরিয়ে কলেজে যাওয়ার নাম করছে না। দীপার কিছু ভাল লাগছিল না। জানালায় বসে সে শূন্য চোখে রাস্তা, একতলা বাড়িগুলো ভিজতে দেখছিল। আর এক মাস বাদে ফাইন্যাল পরীক্ষা। সব কটা পেপারের নোটস নেওয়া শেষ। শুধু পড়া আর লেখার বাইরে অন্য কিছুতে সে মন দেবার আগ্রহ পায় না আজকাল। তার বিরুদ্ধে এতদিনের যে অভিযোগ তা এখন একদম মিইয়ে গিয়েছে। দীপা আর ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে না, রাস্তায় দাঁড়িয়ে গল্প করে না, অদ্ভুত গাম্ভীর্য ওকে সব সময় ঘিরে থাকে। ওর এই পরিবর্তন ছেলেরা বুঝতে পারে না, মেয়েরা জল্পনা করে। নতুন রুমমেট পর্যন্ত কথা বলার বেশী চেষ্টা করে না। প্রয়োজনের বাইরে কথা বলতে যে চায় না তার সঙ্গে আড্ডা মারতে কে চায়।

টিপুস টিপুস বৃষ্টি পড়তে পড়তে একসময় থমকালো। মেঘ নেমে এসেছে নিচে রাস্তায় কয়েকটা মানুষ। দিনদুপুরেই সন্ধ্যে হামা দিচ্ছে। এই সময় দারোয়ান এসে খবর দিল, 'দীপা দিদি, আপনার গেস্ট।'

দীপা মুখ ফেরালো। এই কয়মাসে কোন গেস্ট তার কাছে আসেনি। এমন কি অমরনাথও নিতান্ত বাধ্য না হলে আসেন না। প্রতুলবাবুর মৃত্যুর দিন সাতেক বাদে, সে যখন আবার হোস্টেলে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল তখন একদিন হরদেব ঘোষাল এসেছিলেন। কলেজ থেকে ফিরে দীপা শুয়েছিল খাটে। খবর পেয়ে নিচে নেমে এসেছিল খোলা চুলে আঁচল গলায় জড়িয়ে। হরদেব বসেছিলেন গেস্টরুমে। তাকে দেখামাত্র বলেছিলেন, 'এসো মা, তোমাদের বাগানের বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তুমি হোস্টেলে ফিরে এসেছ। দরকারটা খুবই জরুরী। শোক তো কম না। আর কার জন্যে শোক এও দেখতে হবে। শহরের কোন মানুষ নেই যিনি ওঁকে চিনতেন না। তাঁর কাজ বলে কথা।'

দীপা স্থির চোখে তাকাল। কোন কথা বলল না। হরদেব সেটা লক্ষ্য করে জিভে ঠোঁট চাটলেন, 'না, মানে, তুমি তো ও-বাড়ির বউ। অস্বীকার যতই কর আইন মানবে না যতক্ষণ ডিভোর্স না হচ্ছে। আমি অবশ্য জানি না স্বামী মারা যাওয়ার পর স্বামীর সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করতে আদালতে গিয়ে ডিভোর্স চাইতে হয় কি না। পাঁচজনেও কথা শোনাতে ছাড়বে না।'

দীপা এবারও জবাব দিল না। হরদেব অস্বস্তিতে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত তিনি বলেই ফেললেন, 'শোন মা, তুমি ও-বাড়ির বউ। তোমার শ্বশুরের কাজের সময় তোমার গিয়ে

দাঁড়ানো উচিত।'

'উচিত ? আজ যাঁর কাজের ব্যাপারে আমাকে বলতে এসেছেন তিনি কিন্তু তাঁর ছেলের কাজের সময় আমাদের কাউকে বলার প্রয়োজন মনে করেননি।'

'ও। আসলে তখন তো প্রথম প্রথম, রক্তও গরম ছিল। আজ আমাকে আনা পই পই করে বলে দিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'আমার রক্ত এখন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে আপনাকে কে বলল ?'

'মানে ?' হরদেব থতমত।

'শুনুন। ওই মানুষটিকে আমি কোনদিন শ্রদ্ধা করতে পারব না। তাই তাঁর শ্রাদ্ধের সময় আমি অশ্রদ্ধা নিয়ে উপস্থিত থাকতে চাই না। তাছাড়া এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ আমার কাছে আসুক তা আমি একদম চাই না।' দীপা ফেরার জন্যে পা বাড়াল।

হরদেব উঠে দাঁড়ালেন, 'শোন।'

দীপা দাঁড়াল। মুখ ফেরাল, চোখে জিজ্ঞাসা এবং কিছুটা বিরক্তি।

'প্রতুলের সম্পত্তির দাবি কি তুমি করছ না ?'

'না।'

'কিন্তু সেটা কাগজে কলমে হলে ভাল হয় না ?'

'না।' দীপা মাথা নাড়ল, 'আমি যদি লিখে দিই ওই সম্পত্তি আমি চাই না তাব মানে দাঁড়াবে ওই সম্পত্তির মালিকানা আমার ছিল। আমি সেটুকু ভাবতেও চাই না। আমি লিখে দেব না কিন্তু কোনদিন দাবি করতেও আসবো না।'

'তাহলে কেউ তো বিক্রী করতে পারবে না। মানে যেই মালিকানা নিক আইনসম্মত করতে তোমার লেখা কাগজ তো দরকার হবে।'

'আমি অপরাগ।'

'কিন্তু ধরো, পরে যদি তোমার মতের পরিবর্তন হয় ?'

'হবার কোন সম্ভবনাই নেই।'

হরদেব হাসলেন, 'উত্তম। তোমার অহঙ্কার দেখে বেশ ভাল লাগছে। কিন্তু প্রতুল জীবিত থাকতে তোমার বাবা যে টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, যাব সুদের টাকায় তোমার এই পড়াশুনা চলছে সে ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিয়েছ জানতে ইচ্ছে করছে।'

'টাকাটা বাবা নিয়েছিলেন, আমি নিইনি। আমি জানলাম বাবা আমার পডার খবচ দিচ্ছেন। তা তিনি চুরি করে না ডাকাতি করে দিচ্ছেন তা আমার জানার দরকার আছে বলে মনে করি না। এই ঋণ আমি শোধ করবো এমন অহঙ্কার আমার নেই। তবে যে টাকা আমার পড়ার জন্যে উনি দিচ্ছেন তা ভবিষ্যতে ফিরিয়ে দেব এমন আস্থা নিজের ওপর আছে।'

'ব্যানার্জী বাড়ির বউ হয়ে তুমি চাকরি করবে ?' আঁতকে উঠলো হরদেব।

'প্রথম কথা আমি আর কারো বাড়ির বউ নই। আর শিক্ষা যদি চাকরির উপযুক্ত হয় তাহলে সেই চাকরি করতে কোন লজ্জা নেই। বাড়ির বউরা চাকরি করলে দোষ হবে কেন ?'

'পাঁচটা বাইরের লোকের সঙ্গে কাজ করতে হবে না ? তাদের দৃষ্টিতে কু থাকতে পারে !'

'চমৎকার। বাড়ির ছেলে যদি সারাজীবন লাম্পট্য করে তাতে কোন দোষ নেই, বাড়ির মান যায় না, না ? তার চোখে যদি নিজের বউমা পর্যন্ত একটা ভোগের সামগ্রী হয় তাতে কোন দোষ হয় না, না ? আপনাদের এই প্রাগৈতিহাসিক কথাবার্তা শুনলে আমার বমি

পায়। আপনি আসুন।' সে আর দাঁড়ায়নি। বড় বড় পা ফেলে ওপরে উঠে এসেছিল।

হরদেব তারপরে আর আসেননি। কোন গেস্ট এর পরে দেখা করতে আসেনি তার সঙ্গে। আজ এই ভিজে মেঘের দুপুরে কে আসতে পারে! অমরনাথ নিশ্চয়ই এই আবহাওয়ায় এতদূর ঠেঙ্গিয়ে আসবেন না। দীপা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বড়দির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার। বড়দি বললেন, 'দুটি ছেলে এসেছে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কি ব্যাপার?'

দীপা বুঝতে পারছিল না। বড়দি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, যদি প্রয়োজন মনে কর তবেই কথা বলতে পার।'

মাথা নেড়ে নিচে এল দীপা। গেস্টরুমে ঢুকে সে তাজ্জব হয়ে গেল।

ওরা বসেছিল। দেখামাত্র প্রায় লাফিয়ে উঠল। দুজনের মুখেই হাসি।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোরা!'

বিশু বলল, 'তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

খোকন হাসল, 'লেডিস হোস্টেলে কখনও আসিনি তো, কেমন লজ্জা লজ্জা করছিল'

দীপা ওর বলার ধরনে হেসে ফেলল, 'কেন?'

'বাঃ, এত মেয়ে একসঙ্গে কখনও দেখেছি নাকি?' খোকন জবাব দিল।

বিশু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে প্রশ্ন করল, 'এসে অবধি কটা মেয়ে দেখেছিস?'

খোকন মাথা নাড়ল, 'তা সত্যি। মেয়েরা সব কোথায় রে। কাউকে চোখে পড়ছে না। শুধু বিশাল এক ভদ্রমহিলা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দীপাবলির সঙ্গে জরুরী দরকার আছে? আমি কোনমতে হ্যাঁ বলতেই চলে গেলেন।'

দীপা বলল, 'বড়দি। বস তোরা।'

ওরা মুখোমুখি বসলে বিশু পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল, 'এখানে ধরানো যাবে? একটাও অ্যাসট্রে দেখতে পাচ্ছি না।'

'না ধরানোই ভাল।'

'সেকি রে? এটা কলেজ না স্কুল হোস্টেল?'

'মেয়েদের তো কখনই এদেশে অ্যাডাল্ট ভাবা হয় না। এলি কেন'

খোকন জবাব দিল, 'তোকে দেখতে।'

'ভ্যাট! নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। সেকি রে, তুই দাড়িগোঁফ কামিয়েছিস?'

খোকন আবার লাজুক লাজুক হাসি হাসল, 'আমরা চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'মিলিটারিতে।'

দীপা অবাক হয়ে গেল, 'কি বাজে কথা বলছিস?'

এবার বিশু বলল, 'না রে কথাটা সত্যি। আমাদের পড়াশুনা হবে না। বাবার পয়সা নষ্ট করে কোন লাভ নেই। পরের ভাইবোনদের জন্যে ওটা খরচ হোক। এমনিতে কোথাও চাকরি পাবো না। স্কুল ফাইন্যাল পাশ বলে হয়তো অনেক কষ্টে শ্যামলদার মত একটা চাকরি জুটতে পারে চা-বাগানে কিন্তু তার জন্যে হাঁ করে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। বাড়িতে দিনরাত খোঁচাচ্ছে একটা কিছু যেন করি। তাই দুজনে ঠিক করেছিলাম মিলিটারিতে জয়েন করব। তিনচার দিন এসে পরীক্ষাটরীক্ষা দিয়ে পাশ করে অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার পেয়ে গেছি। আজ সন্ধেবেলার নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে রওনা হব। ভাবলাম, তোকে জানানো দরকার, কবে দেখা হবে কে জানে, তাই চলে এলাম।'

খোকন প্রশ্ন করল, 'আমরা না বলে চলে গেলে তুই দুঃখ পেতিস না ?'

'দূর ! আমি বিশ্বাসই করি না তোদের । মিলিটারিতে যাবি, বললেই হল ?' কথা বলতে বলতে দীপার নজরে পড়ল দরজার গোড়ায় দুটো পুরোনো স্যুটকেস রয়েছে । বিশু সেটা লক্ষ করে বলল, 'এবার বিশ্বাস হয়েছে । ওর মধ্যে সমস্ত কাগজপত্র আছে, সন্দেহ না গেলে দেখাতে পারি ।'

দীপা গালে হাত দিল । ওরা এখনও সেই অর্থে বড় হয়নি । বিশু যদিও কিছুটা ব্যক্তিত্ব পেয়েছে খোকন মোটেই নয় । ওর মুখে এখনও সারল্য লেগে আছে । মিলিটারিতে জয়েন করার বয়স হয়েছে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে । পড়াশুনায় ভাল ছিল না, দু-এক বছরের বড় হতে পারে । কিন্তু তাই বলে কোন কিছু না ভেবে একেবারে মিলিটারিতে ! দীপার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল । আংরাভাসা নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া, হাটে ঘুরে বেড়ানোর ছবিগুলো চট করে মনের সামনে চলে এল । সে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা মা আপত্তি করেনি ?'

বিশু বলল, 'দিন রাত যারা বকর বকর করত ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে খবরটা পেয়ে যদি একটু মন খারাপ অথবা কান্নাকাটি করে তাহলে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কি হবে । যাক, যে জন্যে এসেছি । আমাদের ট্রেন সন্ধ্যেবেলায় । তুই কি আজ কলেজে যাবি ?'

'মাথাখারাপ ? কলেজে আজ রেইনি ডে ।'

'এটা আবার বৃষ্টি নাকি ! চা-বাগানে এর চেয়ে বেশী বৃষ্টি দেখিসনি ? তুই হোস্টেল থেকে আমাদের সঙ্গে বাইরে বেরুতে পারবি ?'

'কোথায় যাব ?'

'এখানে ওখানে । আমরা তিনজন একসঙ্গে দুপুরে কোন হোটেলে খাব ।' বিশু বলল ।

'দারুণ ।' খোকন হাসল, 'তোর সঙ্গে কোনদিন হোটেলে গিয়ে বসিনি । সেটা আজ হয়ে যাবে । তুই আমাদের ফেযারওয়েল দিবি । দীপু, চল ।'

হঠাৎ দীপা তীব্র আকর্ষণ বোধ করল । এই দুটি ছেলের সঙ্গে সে জ্ঞান হবার পর থেকে এক সঙ্গে বড় হয়েছে । অনেক ঝগড়াঝাঁটি, মান অভিমান, আনন্দের শরিক হয়েছে । একটু বড় হবার পর এদের সঙ্গে মেশার কারণে বাড়ির লোকের কাছে বকুনি খেতে হয়েছে । এরাই তার বিয়ের রাত্রে শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার সময় শব্দ করে কেঁদে উঠেছিল । এখন এই যৌবনের প্রথম প্রহরেও এরা তার বন্ধু । আর এই বন্ধুত্বে কোন স্বার্থ নেই । প্রেম-ভালোবাসা যা দুটি নারীপুরুষের মধ্যে এই বয়সে গড়ে ওঠে তা কখনও মাথায় আসেনি । জলপাইগুড়ির রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে সাদামাটা কথা বলার দায়ে তাকে অনেক অভিযোগের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে । এখন কলেজে কোন ছেলের দৃষ্টি দেখলেই অস্বস্তি হয় । ছেলেরা এই বয়সে সহজ চোখে তাকাতে পারে না ।। অথচ দুজন একই রকম রয়ে গেছে । ওরা মিলিটারিতে চলে গেলে সে দুজন ভাল বন্ধুকে হারাবে । অথচ এতদিন সে এদের কোন খোঁজ খবর করেনি । চিঠি দেওয়ার কথা মনে আসেনি । অথচ চলে যাওয়ার মুহূর্তে ওরা তো মনে করে এসেছে । দীপা মাথা নাড়ল, 'চল, তাহলে । আমি বড়দিকে বলে আসি । তোদের কাছে টাকা পয়সা আছে ?'

'একশো টাকা করে আছে ।' খোকন জানাল ।

'থাক । আমি দেখছি কি আনতে পারি । আজ আমি তোদের খাওয়াবো ।' দীপা উঠে পড়ল ।

বড়দির মুখোমুখি হয়ে দীপা খুব সহজ গলায় বললো, 'আমি একটু বেরুবো ।'

ভদ্রমহিলা শরৎচন্দ্র পড়ছিলেন। চোখ তুলে জানতে চাইলেন, 'কোথায় ?'

'ওই যাদের দেখলেন ওদের সঙ্গে। চা-বাগানে আমাদের বাড়ির গায়ে থাকে। ওরা আজ মিলিটারিতে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার আগে কিছু কেনাকাটা করতে চায়।'

'মিলিটারিতে ! ওইটুকু ছেলে ! নিশ্চয়ই বদ। পড়াশুনায় ইতি দিয়েছে। কোন গতি নেই তাই। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝ কর। কিছুদিন তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ের মত ছিলে। যাও, কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে ভাই, বন্ধু বলার দরকার নেই।' বড়দি বই-এর পাতায় চোখ রেখে হঠাৎ মুখ তুলে দীপাকে ডাকলেন, 'শোন।'

দীপা দাঁড়াল।

বড়দি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু বললে, কি ধরনের বন্ধু ?'

দীপা বড় চোখে তাকাল। তারপর বলল, 'আমরা কখনও ভাবিনি কে ছেলে কে মেয়ে।'

বড়দি হতবাক। কথা না বলে ঘাড় নাড়তে পারলেন শুধু। দীপা বেরিয়ে এল।

বুদ্ধি করে রুমমেটের কাছ থেকে ছাতা চেয়ে এনেছিল দীপা। রাস্তায় বেরিয়ে বলল, 'যাচ্চলে, আবার বৃষ্টি আসছে। তোদের সঙ্গে ছাতা নেই, ভিজে যাবি।'

বিশু বলল, 'ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে বৃষ্টি নামবে না।'

'কি করে বুঝলি ?'

'মেয়েদের চরিত্র আমি জানি।'

'বাপস।' দীপা শব্দ করে হাসল। এবং তখনই তার মনে পড়ল অনেক মাস পরে সে এভাবে হাসতে পারল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মিলিটারিতে গিয়ে তোরা কোথায় থাকবি ?'

'জানি না। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে দেখা করতে বলেছে।'

'তোরা দুজন একসঙ্গে থাকবি ?'

'কি জানি ! হয়তো না। কিছুদিন একসঙ্গে থাকতে পারি। ওই যখন ট্রেনিং হবে। তারপর আমি হয়তো আসামে আর ও পাঞ্জাবে।'

দীপা নিশ্বাস ফেলল, 'তোদের সঙ্গে আমার আর দেখা হবে ?'

খোকন বলল, 'বাঃ, কেন হবে না। বছরে ছুটি পাবো তো। বাবা যদ্দিন চা-বাগানে চাকরি করবে তদ্দিন দেখা হবেই। আর তুই যদি অনেক পড়াশুনা করে মাস্টারনি হয়ে যাস আর তখন যদি আমাদের মত অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে কথা না বলিস।'

খোকন কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই দীপা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'এক থাপ্পড় খাবি।' বলেই চারপাশে তাকাল। ওরা এখন রূপশ্রী সিনেমার সামনের রাস্তায়। ভাগ্যিস এখন পথে তেমন মানুষ নেই নইলে এই নিয়ে আবার গল্প চালু হত।

বিশু বলল, 'তুই জলপাইগুড়ির রাস্তাঘাট চিনে গিয়েছিস, না রে ?'

'কিছুটা। কয়েকদিন থাকলেই জানা যায়।'

বৃষ্টি পড়া শুরু হল আচমকা। ওরা দৌড়ে থানার সামনে রুবি বোর্ডিং-এর বারান্দায় উঠে পড়ল। দীপা এল ধীরে সুস্থে। এসে জিজ্ঞাসা করল, 'ভিজেছিস তো ?'

ওরা অল্প ভিজেছিল। বিশু রুমালে চুল মুছে চিরুনি চালাল। এবার বৃষ্টি জোর পেয়েছে। দীপা বলল, 'মেঘেরা তাহলে মেঘেদের মত চলে।'

খোকন এপাশ ওপাশে তাকিয়ে বলল, 'বৃষ্টি এখনই থামবে বলে মনে হয় না। খেয়ে নিলে হয়। তোর খিদে পায়নি বিশু ?'

'এখানে ভাত পাওয়া যায় ?' বিশু জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরটা দীপারও জানা নেই। সে ভেতরে পা বাড়াল। বেশ কয়েকটা টেবিল চেয়ার. অনেকটা রেস্টুরেন্টের মত, একটা কাউন্টারও রয়েছে। কিন্তু কোথাও কোন মানুষ নেই। একটা অদ্ভুত গন্ধ ভাসছে বাতাসে। অনেকটা রসুনের মত মনে হল দীপার। সে এপাশ ওপাশে তাকাচ্ছে এমন সময় একটি প্রৌঢ় লোক সামনে এসে দাঁড়াল, 'কিছু বলবেন দিদি ?'

'আপনাদের এখানে ভাত পাওয়া যায় ?'

'অবশ্যই। বোর্ডাররা তো এখানে এসে খান। কজন আছেন ?'

'তিনজন।'

'কি খাবেন বলুন ? ভাত, ডাল, এঁচোড়ের তরকারি, বেগুন ভাজা, ভেণ্ডি, রুই, কাতলা. চিতল মাছ এমন কি কই মাছ পর্যন্ত পাবেন এখানে।'

'ভাত ডাল ভাজা তরকারি আর চিতল মাছের কত দাম ?'

'রিপিট না হলে আড়াই টাকা।'

'তাই দিন। তিন জায়গায়।' দীপা দশ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল হোস্টেল থেকে।

খুব তৃপ্তি করে খেল ওরা দুজন। চিতল মাছের পেটি প্লেট ছাপিয়ে গিয়েছে। খোকন বলল, 'এরকম মাছ জীবনে বাড়িতে খাইনি রে।'

দীপার খুব ভাল লাগছিল। ওরা ভাত এবং ভাজা আবার নিলে ওর মনে ভয় ঢুকল।। যদি দশ টাকার বেশী খরচ হয়ে যায় তাহলে মুশকিলে পড়তে হবে।কিন্তু বিল এল মাত্র সাড়ে আট টাকার।

বিশু বলল, 'দীপা, আজকের এই দুপুরের খাবার আমি চিরকাল মনে রাখব।'

দীপা বলল, 'বাড়িয়ে বলিস না। তোরা যখন প্রথম মাইনে পাবি তখন আমার নাম করে খেয়ে নিস। তাহলেই আমার ভাল লাগবে।'

হঠাৎ বিশু ঝুঁকে পড়ল, 'দীপা, তোকে একটা কথা বলব ?'

'বল।' দীপার মনে হল বিশু খুব একটা স্বাভাবিক নয়।

'আমরা তোর বন্ধু। আমাদের কথা শুনবি ?'

'বল না !'

'তুই আবার বিয়ে থা করে সংসারী হবি। বুঝলি। তুই তো নিজেকে কখনও বিধবা বলে মনে করিসনি তাই চাকরি পেলে কাউকে বিয়ে করে ফেলিস।'

'না পেলে করব না বলছিস ?'

'টাকা না থাকলে কেউ পাত্তা দেয় না, বুঝলি।' খোকন বলল, 'আমরা যখন চাকরি করে টাকা জমাবো তখন সবাই আমাদের পাত্তা দেবে।'

বৃষ্টি আবার বন্ধ হল। দীপা দাম মিটিয়ে দিচ্ছিল। বিশুর প্রবল আপত্তি, সে কিছুতেই রাজি নয়। হোস্টেলে তারা নিছক ঠাট্টা করেছিল। কিন্তু দীপা ওকে আমলই দিচ্ছিল না। এখন কাউন্টারে ক্যাসিয়ার এসেছেন। দীপার হাত থেকে টাকা নিয়ে ভদ্রলোক বললেন 'তোমাকে খুব চেনা মনে হচ্ছে ! কোন পাড়ায় থাকো ?'

দীপা গম্ভীর হয়ে গেল, 'কদমতলায়।'

'হ্যাঁ। এদিক দিয়েই তো তোমাকে রোজ কলেজে যেতে দেখি। কলেজে পড় তো ? বাবার নাম কি, বাড়ির ঠিকানাটা বল তো !'

'কেন আপনার কি দরকার ?'

'বলছি। এরা তোমার আত্মীয় !'

'হ্যাঁ।'

'জলপাইগুড়ির কোন মেয়ে আমাদের হোটেলে এসে খাওয়া-দাওয়া করে না। কোন চায়ের দোকানে একটা মেয়েকেও দেখবে না ছেলেদের সঙ্গে বসে চা খেতে। সবাই ভাবে বদনাম হয়ে যাবে, লোকে ছি ছি করবে। তুমি যেভাবে ওদের সঙ্গে এসে এখানে খাওয়া-দাওয়া করলে তাতে আমার ভাল লাগল। তোমার বাবার সঙ্গে একটু কথা বলব।'

'বদনাম করতে পারবেন বলে ?' ফেরত-পয়সা নিয়ে দীপা ঘুরে দাঁড়াল, ওরা রাস্তায় পা দিতেই খোকন বলল, 'যাঃ মৌরি নিলাম না।' বলে সে দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। রাস্তা ভিজে, মেঘেরা আরও ঘন, এমন সময় হাওয়া বইল। দীপা দেখল শোঁ শোঁ করে মেঘেদের নাকাল করছে ওপরের বাতাস। মুখ নামিয়ে বলল, 'বাঙালিরা চল্লিশ পেরিয়ে গেলেই কেমন খেঁকুড়ে হয়ে যায়। কারো ভালো দেখতে পারে না।'

বিশু জিজ্ঞাসা করল, 'হঠাৎ ?'

'ওই দেখলি না, আমার ঠিকুজি চাইছিল !'

'এই দাঁড়া।' পেছন থেকে চিৎকার করল খোকন। সে হোটেল থেকে বেরিয়ে দৌড়ে আসছিল। বাবু পাড়ার মুখে এসে ধরে ফেলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিল, 'ওঃ, দারুণ ব্যাপার, দীপার একটা হিল্লে হয়ে গেল।'

'মানে ?' দীপার কপালে সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ জমল।

'হোটেলের ওই লোকটা তোর ঠিকানা জানতে চাইছিল কেন জানিস ? ওর এক ভাইপো নাকি দিল্লীতে চাকরি করে। স্মার্ট, সংস্কারবিহীন অথচ ভদ্র বাঙালি মেয়ে না পেলে বিয়ে করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। তোকে দেখে কাকার খুব পছন্দ হয়েছে। আমাকে তোর কথা জিজ্ঞাসা করছিল।'

'তুই কি বললি ?'

'তুই বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবি না।'

বিশু শব্দ করে হেসে উঠল। খোকন বলল, 'আর কিছু মাথায় এল না যে।'

দীপা বলল, 'তোর মাথাটা বড্ড ছোট। কোথায় যাবি বল ?'

এই সময় একটা রিকসাওয়ালা নেতাজী পুলের দিক থেকে দ্রুতগতিতে আসতে আসতে থানার সামনে দাঁড়ানো একজনকে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'ঘাট বন্ধ হে[illegible]য়া।'

দীপা বিশুকে জিজ্ঞাসা করল, 'ঘাট বন্ধ হয়ে গেছে মানে ? তোরা আজ আসিসনি ?'

খোকন জবাব দিল, 'হ্যাঁ। কিন্তু খুব ভয় করছিল। তিস্তা কত চওড়া হয়ে গিয়েছে, কি কালো কালো ঢেউ। দু-দুবার উল্টে যেতে যেতে বেঁচে গেছে নৌকো।'

দীপা পা চালালো। রাস্তায় এখন কিছু লোক। বৃষ্টি নেই বলেই যে যার কাজ সারতে বেরিয়েছে। মিনিট আটেকের মধ্যে তিস্তার পাড়ে পৌঁছে ওর চক্ষুস্থির। তিস্তা এখন সমুদ্রের মত হয়ে গিয়েছে। শুধু জল আর জল। খেয়া পারাপার তো বন্ধ হয়েই গেছে, কাছারির ঘাট থেকে দোকানদাররা জিনিসপত্র সরাতে আরম্ভ করেছে। পুলিসের লোক চোঙা নিয়ে ঘোষণা করছে যে কোন মুহূর্তে বন্যা আসতে পারে। সবাই যেন সতর্ক থাকে। একটা নদীর চেহারা এমন হিংস্র হতে পারে না দেখলে কল্পনা করতে পারত না দীপা। সে বলল, 'ভাগ্যিস তোরা সকাল সকাল পার হয়ে এসেছিলি।'

বিশু ততক্ষণ একটা বুড়োমতো লোকের সঙ্গে কথা বলতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে বলল, 'তাড়াতাড়ি পা চালা।'

খোকন জানতে চাইল, 'কেন ?'

'জল বাড়লে ট্রেন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। মণ্ডলঘাটের ওদিকে অলরেডি লাইনের ওপর

জল উঠে গেছে। খুব মুশকিলে পড়ে যাব তাহলে।'

'কিন্তু এখন তো কোন ট্রেন নেই।'

'আমরা বাসে যাব। বাসে শিলিগুড়ি, ওখান থেকে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস ধরব।' ঘাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো রিক্‌শা ধরতেই বৃষ্টি নামল ইলশেগুঁড়ি। সামনের রিক্‌শায় দীপা বসেছিল একা। হোস্টেল থেকে স্যুটকেস নিয়ে ওরা কদমতলার মোড় থেকে বাসে উঠবে। প্রায় সমবয়সী ওই দুটো ছেলের যে স্বাধীনতা এদেশে আছে তার সেটা নেই। রাস্তা খারাপ হবে এই আশঙ্কায় ওরা স্বচ্ছন্দে পথ বদল করে ফেলতে পারল আগাম। হয়তো তাতে নিশ্চিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। মেয়েদের সেই স্বাধীনতা না থাকায় জেনেশুনে নিশ্চিত আত্মহত্যার দিকে এগোতে হয়। একা রিক্‌শায় ত্রিপলঘেরা সিটে বসে হঠাৎ খুব বিষণ্ণ বোধ করছিল দীপা। ওরা চলে যাবে। মিলিটারিতে গিয়ে ওরা কি এমন সহজ থাকবে। বরেন বসুর লেখা 'রঙরুট' পড়েছে সে।

হোস্টেল থেকে স্যুটকেস নিয়ে কদমতলার মোড়ে বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখা গেল খবর এখানেও পৌঁছেছে। সন্ধেবেলার লোকাল ট্রেন ধরে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাবা নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে উঠে কলকাতায় যাবে বলে ঠিক করেছিল তাদের কিছু কিছু চলে এসেছে এখনই বাস স্ট্যান্ডে। বৃষ্টি পড়ছিল। বিশু আর খোকন এর মধ্যে ভিজে একসা। ছাতি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। দুদুটো বাস একসঙ্গে শিলিগুড়িতে যাচ্ছে। সুযোগ পেয়ে ট্যাক্সিওয়ালারা দর হাঁকছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে কান পাতা যাচ্ছে না। প্রায় মারপিট করেই ড্রাইভারের কেবিনে ওরা দুটো জায়গা করে নিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বের করল। ওরা কি বলল দীপা শুনতে পাচ্ছিল না। কাদা বাঁচিয়ে ও একটু এগিয়ে গেল।

খোকন চিৎকার করল, 'কখনও ভুলে যাবি না তো ?'

দীপা মাথা নাড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশু ধমকে উঠল, 'অ্যাই, খবরদার, এখন তুই কাঁদবি না।'

হাসতে গিয়ে দীপা আবিষ্কার করল ঝড়ের মত সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে কান্না উঠে আসছে গলায়। সে ঠোঁট কামড়ালো। সে ওদের দিকে তাকাতে পারছিল না। এবং তখনই বাসটা চলতে শুরু করল। ওরা কিছু চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু দীপা মুখ তুলে তাকাল না। বাস যখন শিল্পসমিতি পাড়ার দিকে বাঁক নিয়েছে তখনও মুখ ঘোরালো না। কোনমতে নিজেকে সামলে ছাতি মাথায় সে হোস্টেলে ফিরতে লাগল। আর তখনই চেঁচামেচি শুরু হল। রাস্তার সামান্য লোকজনও দৌড়ে পালাচ্ছে। দুপাশের বাড়িগুলোয় ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। দীপা প্রথমে কারণটা বুঝতে পারছিল না। এই সময় একজন চিৎকার করে উঠল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি যান, বন্যা আসছে।'

শহরের মাঝখানে বন্যা। হঠাৎ নজরে পড়ল দুপাশের ড্রেন দুটো ঘোলা জলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। এই জল তিস্তার। দীপা দৌড়াতে লাগল। পাহাড়ি পাড়ার মোড় থেকে ওদের হোস্টেলে আসতেই একদম ভিজে গেল সে। হোস্টেলের গেটের কাছে ড্রেন উপচে জল জেগেছে। পার হতে গিয়ে পায়ে নোংরা লাগল। দারোয়ান গেট বন্ধ করতে আসছিল। ওকে দেখে থমকে গিয়ে বলল, 'জলদি আইয়ে দিদি।'

বাথরুম থেকে শুকনো কাপড় পরে চুল মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে দেখল জানলায় বেশ ভিড়। নীতা বলল, 'তোমার সাহস খুব, এই ওয়েদারে বেরিয়েছিলে ?'

দীপা জবাব না দিয়ে চুল আঁচড়ালো। যাদের ঘর রাস্তার দিকে নয় তারা এখানে ভিড় করেছে। এখন বিকেল অথচ মনে হচ্ছে সন্ধে হয়ে গেছে। সে আলো জ্বালল। তারপর

জানলার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তার যেটুকু নজরে এল তাতেই তার চক্ষুস্থির। জলের স্রোত বইছে এখন। সে যদি পাঁচ মিনিট দেরি করত তাহলে ওই স্রোতের মধ্যে পড়তে হত তাকে। খুব কপালজোর তাই বিশুরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে। কিন্তু পথে যদি তিস্তার জল চলে আসে ? না, তিস্তা থেকে বাসটা দূরে সরে সরে যাবে। আর তখনই নীতা বলে উঠল, 'উঃ, কি দৃশ্য ! যেন ভেনিসে আছি আমরা।'

সন্ধে সাড়ে ছটায় জলপাইগুড়ি শহর নিষ্প্রদীপ হল। পাওয়ার হাউসের ভেতর জল ঢুকে গিয়েছে। শহরের কোথাও আর বিদ্যুৎ নেই। খানিক আগে বৃষ্টির তেজ বেড়েছে। মুষলধারে শুরু হয়ে গিয়েছে এখন। জানলা বন্ধ করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। মাঝে মাঝে বাজ পড়ছে আশে পাশে। বড়দি এসে ঘরে ঘরে বলে গিয়েছেন নটার মধ্যে শুয়ে পড়তে। একতলার মেয়েদের দোতলায় তুলে দেওয়া হয়েছে। দীপাদের ঘরেও দুজন এসেছে। তারা মাটিতে বিছানা করে শোবে। রাত্রের খাবার ইতিমধ্যেই খাওয়া হয়ে গিয়েছে সবার। বড়দি বললেন, তিস্তার জল নাকি করলা দিয়ে ঢুকে শহরে আসছে। হাকিমপাড়া ইতিমধ্যে জলের তলায় কারণ তার দুদিকে দুটো নদী।

রাত বাড়ছে। সেই সঙ্গে চিৎকার। সমস্ত জলপাইগুড়ির মানুষ আর্তনাদ করছে যেন ! যাদের বাড়ি একতলা তারা দোতলায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে জল ভেঙে। কেউ কেউ এই হোস্টেলের গেটে এসেছিল আশ্রয়ের জন্যে। কিন্তু গেট তালা বন্ধ থাকায় তারা ঢুকতে পারেনি। উৎসাহীরা খবর আনল জল ঢুকে গিয়েছে নিচের গেস্টরুমে, একতলার ঘরগুলোতে। জল্পনা হচ্ছিল জল যদি আরো বাড়ে, যদি দোতলায় উঠে আসে তাহলে এই বৃষ্টিতেও ছাদে যেতে হবে। মানুষ যে প্রকৃতির কাছে কত অসহায় তাই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল।

দীপা চুপচাপ বসেছিল চেয়ারে। খোকনরা কি ঠিক সময়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যেতে পেরেছে। মাঝ রাস্তায় যদি ওদের বাস আটকে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গায় যদি জল বাড়তে থাকে, দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল সে। নীতারা গল্প করছিল, 'কি হল ? অ্যাই দীপা, কী হয়েছে ?'

দীপা কান্না থামাল। মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু না।'

নীতা এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'অদ্ভুত।'

জল নামল পরদিন বিকেলে। কিন্তু শহরময় রেখে গেল পুরু পলিমাটি, মরা গরুবাছুর ছাগল, কিছু মৃত মানুষ আর অর্ধমৃত মানুষের ভিড়। পরদিন বিকেল থেকেই হোস্টেলে খাবারের টান। রাত্রে শুধু খিচুড়ি। বড়দি বলে দিলেন যে যার বাড়িতে চলে যাক। কিন্তু যাওয়ার পথটাই বন্ধ। শহর থেকে জল নামলেও ফেরিঘাট বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে। ডুয়ার্সের দিকে ব্রিজ ভেঙেছে কয়েকটা। হোস্টেলের বেশীর ভাগ মেয়েই এসেছে চা-বাগানগুলো থেকে। তাদের ফিরে যাওয়ার সহজ পথ বন্ধ। যেতে হলে আট মাইল হেঁটে শিলিগুড়ির রাস্তায় যে সাঁকোটা ভেঙেছে সেখান থেকে বাস ধরতে হয় শিলিগুড়ির। তার পর সেবক হয়ে ডুয়ার্সে। মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল। জলপাইগুড়ি শহরের জন্যে প্রথম ত্রাণসামগ্রী এল শিলিগুড়ি থেকে। সেটা চাহিদার তুলনায় খুবই অল্প। রাজনৈতিক দলগুলো উদ্ধার কাজে নেমে পড়েছে। দীপারা ঠিক করল হোস্টেলেই থাকবে। দুবেলা শুধু খিচুড়ি খাবে তবু এখান থেকে যাবে না। বড়দির সঙ্গে মেয়েদের হয়ে কথা বলতে গিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল তার। ভদ্রমহিলার যুক্তি ছিল শহরে যখন কোন বাজার নেই তখন চাল

ডালই বা আসবে কোত্থেকে ?

দীপা বলল, 'আপনি যদি থাকতে পারেন তাহলে আমরাও পারব। শহরের অন্য মানুষ তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

কিন্তু থাকব বলা সহজ থাকার সমস্যাটার সমাধান সহজে হচ্ছে না। যে সব দোকানে জিনিসপত্রের স্টক ছিল, যারা বাঁচাতে পেরেছিল তারা দাম বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। শহরের মানুষ তাই কিনছে। এই সময় হোস্টেলের একটি মেয়ে, যার নাম গোপা, খুবই সাধারণ চেহারার শান্ত মেয়ে জানাল তার দাদার শ্বশুর থাকেন জেলা স্কুলের পেছনে। ভদ্রলোকের চাল ডালের ব্যবসা আছে। গোপাকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ দীপারা বেরিয়ে পড়ল। করলার জল নামেনি। দীনবাজার হয়ে কাদা মাড়িয়ে ওরা কোনমতে সেনপাড়া দিয়ে সেই ভদ্রলোকেব দোতলা বাড়িতে যখন পৌঁছাতে পারল তখন কাউকেই ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে না। জল পলি লেগে শাড়ির রঙ পাল্টে গিয়েছে।

ভদ্রলোক মেয়ের ননদকে এতগুলো মেয়ের সঙ্গে দেখে আঁতকে উঠলেন। প্রথমে কুশল সংবাদ দিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি। তোমরা বরং এক কাজ করো। দুবেলা এখান থেকেই খিচুড়ি যাবে তোমাদের হোস্টেলে। যদ্দিন সব নর্মাল না হয় তদ্দিন এই ব্যবস্থাটা চলুক। যা ন্যায্য দাম তা দিয়ে দিও।'

'খিচুড়ির আবার কোন দাম ঠিক করা যায় ?' দীপা জিজ্ঞাসা করল।

'দ্যাখো মা, লোকে সন্দেহ করছে আমার কাছে চাল ডাল লুকোনো আছে। আমি বলছি নেই। হাওয়া না বুঝে মুখ থেকে সত্যি কথা বলতে রাজি নই। এখন যদি তোমাদেব জন্যে চাল ডাল বের করি তাহলে এ বাড়ি লুট হয়ে যেতে পারে। আমার ক্ষতি হোক তা নিশ্চয়ই তোমরা চাও না।'

'সেটা তো খিচুড়ি গেলেও বুঝতে পারবে।'

'পারবে না। বলব রিলিফ পাঠাচ্ছি এতে আমার সুনাম বাড়বে। কতজন ?'

দীপা সংখ্যাটা বলল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ রাত্রে তোমাদের হোস্টেলেব ঠাকুব যেন রান্নার জিনিসপত্র নিয়ে এখানে আসে। রাত নটাব পরে। এই কদিন সে আমাব কাছেই থাকবে। রিলিফ নিয়ে দুবেলা আমার জিপ তোমাদেব হোস্টেলে যাবে। টাকা পয়সার ব্যাপার নিয়ে আমি তোমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্টের সঙ্গে পরে কথা বলব।'

তবু একটা সুরাহা হল। হঠাৎ প্রতুলবাবুর কথা মনে এল দীপার। এই লোকটা রিলিফ দেবার নাম করে সুনাম কিনবে আবার রোজগারও হবে। রান্নাকরা খাবারেব দাম নিশ্চযই বেশী। ঠিক প্রতুলবাবুর চরিত্র। ওরা হাঁটতে হাঁটতে হাকিমপাড়া দিয়ে আসছিল। বাস্তায় একহাঁটু পলিমাটি। ডুবে যাওয়া পা তোলাই মুশকিল। আশেপাশের এক তলা বাড়িগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। কান্নাকাটি থামেনি এখনও। হঠাৎ বাড়িটাকে চিনতে পাবল সে। কয়েক হাজার বুনো মোষ যেন বাগানটাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। পলির স্তূপ জমেছে। বাড়িটার একাংশ ধসে গিয়েছে। কিছু মানুষের ভিড় সেখানে। দীপাকে দাঁড়াতে দেখে নীতা জিজ্ঞাসা করল, 'এই বাড়ির লোকদের চেন তুমি ?'

দীপা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। দুজন মানুষ পলি মাড়িয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, 'দুদিন ধরে পচেছে। জল বাড়লে বেরুতে পারেনি। মেয়েছেলেটা ঢোল হয়ে গিয়েছে। হরদেবদাকেও চেনা যাচ্ছে না। পাপের বেতন মৃত্যু, বুঝলে।'

সঙ্গীরা এগিয়ে যাচ্ছিল। দীপা কোনমতে তাদের অনুসরণ করল।

অমরনাথের শরীর বয়সের তুলনায় বেশী বুড়িয়ে যাচ্ছিল। আজকাল একটুতেই মাথা ঘোরে, প্রেসার বেড়ে গিয়েছে খুব। চিন্তা করলেই মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। বাগানের ডাক্তার ছুটি নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, পনের দিন একদম বিশ্রামেথাকতে হবে, চিন্তা করলে চলবে না। দীপাকে নিয়ে যে সমস্যা তিনি তৈরী করেছিলেন তার ধাক্কা সামলানোই যখন মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তখনই মৃত পিতা ফিরে এলেন সন্ন্যাসের শেষ বাধা পার হতে। ব্যাপারটাকে মেনে নিতে তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। পরদিন সকালে সর্বত্র খোঁজ করেও তিনি সন্ন্যাসীর দর্শন পাননি। অথচ মনোরমার দিকে তাকিয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। মনোরমা যেন ঘটনাটা সম্পর্কে একদম নির্বিকার। তিনি মানতেই রাজি নন যে তাঁর স্বামী জীবিত, এবং এই বাড়িতে এসেছিলেন। বিধবার যা যা করণীয় তাই নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছেন তিনি।

এখন অনেকটা অজান্তেই দীপার কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন অমরনাথ। চিঠিপত্র আর লেখেন না। সেই ভার দিয়েছেন অঞ্জলিকে। সে-ই মেয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। জলপাইগুড়িতে বন্যার খবর পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছিলেন। খবরটা এসেছিল সন্ধেবেলা। সেদিন রেডিওতেও শুনেছিলেন। সন্ধে নামলে যাওয়ার উপায় নেই। সারারাত ছটফট করেছিলেন। সকালবেলায় বানারহাট মালবাজার সেবক হয়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছে শুনেছিলেন সেদিন যাওয়া যাবে না। পরের দিন মেয়ের কাছে এক হাঁটু কাদা মেখে পৌঁছে বলেছিলেন, 'তোমার মা বললেন এখানে অসুবিধে হলে আমার সঙ্গে চা-বাগানে চলে আসতে।'

দীপা মাথা নেড়ে বলেছিল তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। অমরনাথ সেদিনই আবার ঘুরপথে ফিরে গিয়েছিলেন চা-বাগানে। মাথা ঘোরা আরম্ভ হয়েছিল তখন থেকেই। দীপা এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে। অঞ্জলি একাই দুদিন ঘুরে এসেছে। বাগানের ডাক্তারের ওষুধে অমরনাথের শরীর ভাল হচ্ছে না। বাঁ দিকের বুকে প্রায়ই ব্যথা হচ্ছে। বাগানের ডাক্তার এবার পরামর্শ দিলেন কোন স্পেশালিস্টকে একবার দেখাতে।

জলপাইগুড়ি শহরে এইসময় বুকের বিশেষজ্ঞ তেমন কেউ নেই। শিলিগুড়িতে আছেন, কিন্তু অনেক আলোচনার পর স্থির হল শিলিগুড়িতে যাওয়ার চেয়ে কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করানো ঢের ভালো। থাকা খাওয়ার খরচ এক তাছাড়া আরও ভালো চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো যাবে। অঞ্জলি তার দাদা সুভাষচন্দ্রকে চিঠি লিখল। দীপার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলেই তারা দিন সাতেকের জন্যে অমরনাথকে নিয়ে কলকাতায় যেতে চায় তাঁর চিকিৎসার জন্যে। সুভাষচন্দ্র চটপট উত্তর দিলেন, 'সাত দিনের জন্যে কোন অসুবিধে নেই।'

এই লাইনটা অমরনাথ অপছন্দ করলেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে সাতদিনের বেশী থাকলে সুভাষচন্দ্র যে অসুবিধায় পড়বেন তা লাইনটিতে স্পষ্ট। কলকাতায় সাধারণ মানুষের বাসস্থানের সমস্যা প্রকট তা তিনি জানেন। যদিও সুভাষচন্দ্র যখন এখানে আসেন এবং বেশ কিছুদিন থেকে যান তখন তাঁর আচরণে সেটা বোঝা যায় না। অঞ্জলি তাঁকে লিখেছে যদি অল্প ভাড়ায় মাসখানেকের জন্যে একটা বাড়ি পাওয়া যায় তাহলে খুব ভাল হয়।

ছেলের জন্যে মনোরমাও উদ্বিগ্ন হয়েছেন। যদিও কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার

প্রস্তাবে তাঁর কিছুটা অস্বস্তি হয়েছে। বউমার দাদার বাড়িতে গিয়ে থাকার বাসনা বিন্দুমাত্র নেই। অবশ্য এখনও কেউ তাঁকে যেতে বলেনি। সমস্ত কিছুর উদ্যোগ অঞ্জলিই নিচ্ছে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে। ইতিমধ্যে বাড়িতে সবাই বুঝতে পেরেছে যে করেই হোক অমরনাথকে সুস্থ করা দরকার। এই পরিবারের প্রতিটি মানুষের ভবিষ্যৎ ওই একটি জীবনের ওপর নির্ভর করছে। মনোরমার উদ্বেগ তাই মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়াচ্ছে। অঞ্জলির কাছে সেটা এখন বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। শেষপর্যন্ত অঞ্জলি মনোরমাকে বলতে বাধ্য হল, 'মা, ওঁকে নিয়ে কলকাতায় কতদিন থাকতে হবে বুঝতে পারছি না। ওখানে তো আপনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করা যাবে না।'

মনোরমা চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'জলপাইগুড়িতে ভাল ডাক্তার নেই ?'

'থাকলে কেউ সাধ করে অতদূর যায়!?' অঞ্জলি তখনই কথা শেষ করেছিল। তার হঠাৎই মনোরমার জন্যে কষ্ট হল। অমরনাথ ওঁর একমাত্র পুত্র। অঞ্জলি নিজের দুই ছেলের একজনের এমন হলে ছেড়ে দিয়ে দূরে থাকতে পারত ? অসম্ভব। অঞ্জলির সন্ন্যাসীর কথাও মনে পড়ল। এ ব্যাপার নিয়ে আর কোন আলোচনা এই বাড়িতে না হলেও অঞ্জলির বিশ্বাস ভদ্রলোককে মনোরমা চিনতে পেরেও না চেনার ভান করেছেন। কেন করেছেন সেটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু করার সময় এবং তার পরে বুকের মধ্যে যে যন্ত্রণা নিয়ে উনি আছেন তার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু কোথায় ওঠা হবে কি রকম পরিবেশ হবে না জেনে ওঁকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ?

বিকেলের ডাকে দুটো চিঠি এল। দীপার পরীক্ষা সামনের সপ্তাহে। সে তৈরী। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছেন সুভাষচন্দ্র। কলকাতার মেডিকেল কলেজের একজন হার্ট স্পেশালিস্টের সঙ্গে এ্যাপয়ন্টমেন্ট করা হয়েছে। এখানে নামকরা ডাক্তারদের দেখা একমাস আগে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সুভাষচন্দ্রের এক পরিচিত ভদ্রলোক মির্জাপুর স্ট্রিটে থাকেন। তাঁর বাসায় দুটো ঘর পাওয়া যাবে। তবে তাঁকে অন্তত দুমাসের ভাড়া দিতে হবে। মাসিক দেড় শো টাকা। কলকাতায় পৌঁছাবার দিন জানালে সুভাষচন্দ্র স্টেশনে থাকতে পারবেন।

চিঠিটা পড়ে অমরনাথ স্বস্তি পেলেন। যদিও দেড় শো টাকা মাসিক ভাড়া তাঁর কাছে যথেষ্ট বেশী তবু এই টাকা কোনমতে ব্যবস্থা করা যাবে। যাতায়াতের ভাড়া অফিস থেকে পাওয়া যাবে। দু বছর অন্তর বেড়ানোর জন্যে একটা নির্দিষ্ট টাকা পাওয়া যায় অফিস থেকে। অনেকেই সেটা নিয়ে বাড়িতে বসে থাকে। চিকিৎসার খরচ চেষ্টা করলে কিছুটা অন্তত পাওয়া যাবে। বেশিরভাগ চা-বাগানগুলোর হেড অফিস কলকাতায়। এখন যিনি হেড অফিসের মেজকর্তা তিনি একসময় এই চা-বাগানে নিয়মিত ট্যুরে আসতেন। ভাল আলাপ আছে অমরনাথের সঙ্গে। মিস্টার মুখোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করেন তাঁকে। গিয়ে দাঁড়ালে তিনি নিশ্চয়ই না বলতে পারবেন না। নিজের শরীরের বদলে অমরনাথের এবার দীপার জন্যে চিন্তা শুরু হল। যা ঝড় গেল মেয়েটার ওপর দিয়ে তাতে পরীক্ষার ফল আর কত ভাল হতে পারে! জলপাইগুড়ি থেকে গ্র্যাজুয়েট হলে স্কুলে একটা চাকরি পেতে পারে মেয়েটা। কলকাতায় ডাক্তার স্থির হবার খবর পেয়েই মনে হতে লাগল শরীর অনেক ভাল হয়ে গিয়েছে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর অঞ্জলি মনোরমার ঘরের দরজায় শব্দ করল। দীপা না থাকলে রাত ন'টার মধ্যে দরজা বন্ধ করেন তিনি। চাপা গলায় প্রশ্ন এল, 'কে ?'

'আমি।' অঞ্জলি নিচু গলায় জানান দিল।

মনোরমা দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ?'

অঞ্জলি ভেতরে ঢুকল, 'দাদার চিঠি এসেছে আজ। আমাদের জন্যে দুটো ঘর ভাড়া করেছেন। আমার একার পক্ষে সবদিক সামলে চলা মুশকিল হবে—।'

'দীপা তো যাচ্ছে। সে বেশ বড় হয়ে গিয়েছে আজকাল।'

'কিন্তু আমার ইচ্ছে আপনি সঙ্গে চলুন। আমি ভরসা পাই তাহলে।'

'আমাকে কেন যেতে বলছো ? তোমাদের সমস্যা বাড়বে' মনোরমা মুখ ফেরালেন।

'দুটো ঘর আছে। আপনি আপনার ছেলের সঙ্গে একটা ঘরে থাকবেন। এতে কোন সমস্যা হবে না। বরং আমাকে যদি বেরুতে হয় আপনি ওঁর পাশে থাকতে পারবেন।

মনোরমা চুপ করে রইলেন। অঞ্জলি তাঁর দিকে তাকিয়েছিল। উত্তর না পেয়ে বলল, 'মা, আপনি চলুন। এখানে একা থাকলে চিন্তাই করে যাবেন, কষ্ট বাড়বে। ওখানে আমি চেষ্টা করব আপনার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দিতে।'

মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'আমার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে না।'

'মানে ?' অঞ্জলি অবাক।

'বিদেশে গিয়ে নিয়ম মানার কোন দরকার নেই।'

'কিন্তু আপনার ছেলের জন্যে মাছ মাংস রাঁধতে হতে পারে।'

'আগে নিরামিষ করে নিও পরে ওসব করো।'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল। তার খুব অবাক লাগছিল। মনোরমা এত পাল্টে গেলেন কি করে ? নাকি নিজের বাসনা পূর্ণ করতে শেষ পর্যন্ত এইটুকু মেনে নিলেন। এখন এখানে যে ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচানোর চেষ্টা করে চলেছেন, সেটাও স্বচ্ছন্দে বিস্মৃত হলেন। স্বচ্ছন্দে কি ? অঞ্জলি বুঝতে পারল না।

'কবে যাবে ?' মনোরমা প্রশ্ন করলেন।

'দীপার পরীক্ষার পরেই।'

'এ বাড়ির কি হবে ?'

'বুধুয়া আছে। ওই দেখাশোনা করবে। পাশের বাড়িকেও বলে যাব।'

'খোকা কি চাইছে আমি যাই ?'

'ওঁর সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়নি। কলকাতায় যেতে গেলে আপনার কি কি জিনিস কিনতে হবে তার একটা ফর্দ করে রাখবেন। আমি দীপার পরীক্ষার দিন জলপাইগুড়িতে যাব, তখন কিনে আনব।' অঞ্জলি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওর মন এখন ভাল।

পরীক্ষার শেষ দিনে হোস্টেলে ফিরে এসে দীপা দেখল অঞ্জলি তার জন্যে বসে আছে। পরীক্ষার আগেই তার আসার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সেইসময় অমরনাথ আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটু ভাল লাগলেই ছুটি বাঁচাতে কাজে বেরুতেন তিনি। দিন পাঁচ ছয় মোটামুটি চলত। তারপর আর পারতেন না। এ ব্যাপারে অঞ্জলির নিষেধ শোনার মানুষ তিনি নন। এই রকমটাই হয়েছিল কয়েকদিন আগে। ফলে অঞ্জলির আর জলপাইগুড়িতে আসা হয়নি। কিন্তু এই খবর মেয়েকে না জানিয়ে অন্য কথা লিখেছিল চিঠিতে। আজ মাকে দেখে খুশি হল দীপা। দ্রুত কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কেমন আছে মা ?'

অঞ্জলি বলল, 'ভাল না। বুকের ব্যথাটা কিছুতেই কমছে না। ওষুধ খেলে ভাল থাকছে না খেলে যেকে সেই। তোর পরীক্ষা কেমন হল ?'

'হল। আমরা কলকাতায় যাচ্ছি কবে ?'

অঞ্জলি যা যা ঘটেছে তা দীপাকে খুলে বলল। বলতে বলতে হঠাৎ তার ধারণা হল সেই একদিনের বাচ্চা মেয়ে আজ অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। ঠিক মেয়ে নয়,বন্ধুর মত এর সঙ্গে সব কথা খুলে বলা যায়। সংসারের যাবতীয় অর্থচিন্তা, অমরনাথের কিছু হয়ে গেলে যে বিপর্যয় আসবে সেসব ভাবনাও অকপটে বলতে পারল সে।

দীপা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, 'তুমি আগ বাড়িয়ে এতসব ভাবছ কেন ? ভাল চিকিৎসা হলে বাবা ঠিক হয়ে যাবে। আমার মনে হচ্ছে কলকাতায় গিয়ে মামার ওখানে না উঠে সোজা ওই ভাড়াবাড়িতে উঠলে ভাল হয়।'

'কেন ?'

'এতে মামার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল থাকবে।'

অঞ্জলির ব্যাপারটা পছন্দ হল না। একথা ঠিক সুভাষচন্দ্র নিজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। প্রতি নববর্ষে এবং বিজয়াতে অঞ্জলি চিঠি দিয়েছে এই বছরগুলো ধরে এবং সেই সব চিঠিতে বউদিকেও প্রণাম জানিয়েছে কিন্তু সেই মহিলার কাছ থেকে কোন চিঠি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। যেহেতু অঞ্জলির মা একসময় ওই মহিলাকে অপছন্দ করতেন তাই তিনি নিজেকে নির্লিপ্ত রেখেছেন। আর অমরনাথও গায়ে পড়ে ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে যাননি। অঞ্জলি দু-একবার বলেছিল কিন্তু অমরনাথ উৎসাহিত হননি। কথাটা অপছন্দ হলেও মেয়ের বুদ্ধিতে আস্থা বাড়ল তাঁর। সেইদিন বিকেলে যা কিছু কেনাকাটা করে মেয়েকে নিয়ে ফিরে এল সে চা-বাগানে।

বাড়িতে ঢুকে অমরনাথের সামনে দাঁড়াল দীপা। অমরনাথ ইজিচেয়ারে শুয়ে জানলা দিয়ে লিচুগাছের দিকে তাকিয়েছিলেন, পায়ের শব্দে মুখ ফেরালেন। মুখ সহজ করে জানতে চাইলেন, 'কেমন হল ?'

'পাশ করব।'

'একবার সত্যসাধন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে এস। কাল শ্যামল এসে বলল ওঁর শরীর খুব খারাপ। তোমার পড়াশুনার পেছনে ওঁর দান সবচেয়ে বেশী।'

দীপা মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কেমন আছ ?'

'আমি ভাল আছি। তোমার মা ঠাকুমা অনর্থক চিন্তা করছেন। তুমি তো এদের মত মানুষ হওনি, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে এসব চিন্তার কারণ কি।'

'তুমি কি ভেবেছ ?'

'শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে একটা বটগাছ আছে। গাছটা যখন প্রথম বড় হয়েছিল তখন তার মূল গুঁড়ির ওপর সমস্ত শরীরটা দাঁড়িয়েছিল। আস্তে আস্তে বিভিন্ন ডাল থেকে ঝুরি নামতে নামতে সেগুলো মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে নিজেরাই এক একটা গাছ হয়ে গেল। কিন্তু যতদিন সেটা হয়নি ততদিন মূল গাছটির গোড়ার ওপর তার জীবন নির্ভর করত। আমি জানি আমার বেঁচে থাকার প্রয়োজন অনেকটা এই কারণেই। তুমি এবং তোমার ভাইরা যতদিন পায়ের তলায় মাটি না পাবে ততদিন আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা শুধু এঁদের আকাঙ্ক্ষা নয়, আমারও। যাও বিশ্রাম কর।' দীপার মনে হল বিশ্রামটা অমরনাথের দরকার। একটানা কথা বলে তিনি কাহিল হয়ে পড়েছেন। মুখে ক্লান্তি জমেছে, নিঃশ্বাস দ্রুত হল। সে আর দাঁড়াল না।

দুই ভাই এখন পূর্ণ কিশোর। একসঙ্গে থেকেও এরা চিরকালই দীপার থেকে আলাদা স্বভাব নিয়ে রয়েছে। দুজনেই খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কলকাতার দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর লিস্ট করে রেখেছে। এই বয়সে বাবার অসুখ নিয়ে ভাবার মত মানসিকতা এদের তৈরী

হয়নি। অথচ ওই বয়সে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছেলেরা সম্ভবত অনেক সময় নেয় প্রাপ্তবয়স্ক হতে।

মনোরমার ঘরে ঢুকে সে বিছানায় ধপ করে বসেই আবার লাফিয়ে উঠল, 'এই যাঃ।'

মনোরমা নাড়ু বানাচ্ছিলেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল ?'

'বাইরের কাপড়ে বিছানায় বসে পড়েছিলাম।'

'ও।' মনোরমা মুখ ফেরালেন, 'এখন তো ভেতর বাইরে বিচার করলে চলবে না। বসেছ যখন তখন বসো। বিদ্যাধরীর বিদ্যা কতদূর হল ?'

'ইন্টারমিডিয়েটটা পাশ করে যাব মনে হচ্ছে।'

'গ্রাজুয়েট হতে হলে আর কতদিন পড়তে হবে ?'

'দু বছর।'

'ওরে বাবা। তা যাই বলিস তুই যে পরীক্ষা দিলি আমাদের বংশের কোন মেয়ে দূরের কথা ছেলেরাই ওই পরীক্ষা দেয়নি।' গর্বের হাসি হাসলেন মনোরমা।

দীপা এক পলক দেখল। তারপর ইচ্ছে করেই বলল, 'আমি তোমাদের বংশের কেউ নই।'

'তাতো বলবেই। নিজের ছানা ভেবে বড় করে এখন তো কোকিলের ডাক শুনব।'

শব্দ করে হেসে উঠল দীপা। এবং হাসতে হাসতে প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'ও ঠাকুমা, তুমি এটা কি বললে ?'

'কি হল, চেঁচাচ্ছিস কেন ? তোর বাবার অসুখ খেয়াল নেই ?' মনোরমা অপ্রস্তুত।

'আমি কোকিল হলে তোমরা, তুমি নিজেকে কাক বলছ।'

এইসময় অঞ্জলি এসে দাঁড়ায় দরজায় চিৎকার এবং হাসি শুনে। মনোরমা তাকেই সাক্ষী মানলেন, 'দ্যাখো বউমা, কলেজ থেকে ফিরে আমাকে জ্বালাতে এল।'

অঞ্জলি ভ্রূ কোঁচকালো, 'কি বলছিস তুই ?'

জবাবটা মনোরমাই দিলেন, 'পড়াশুনো করে ওর শিক্ষা হয়েছে যে উনি আমাদের বংশের নন।'

দীপা বড় চোখে তাকাল, 'কথাটা মিথ্যে, বল মা ?'

'এসব কথা উঠছে কেন ?' অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হল।

'কথার কথা। আমি তোমাদের বংশের নই কিন্তু আমার চেয়ে আপন তোমাদের কেউ নেই। আচ্ছা, আমরা কবে রওনা হচ্ছি ?' প্রশ্নটি মনোরমাকে। কারণ অঞ্জলি তাকে আগেই জানিয়েছিল বাগানের ম্যানেজার তাদের জন্যে টিকিট কাটতে শিলিগুড়িতে লোক পাঠিয়েছেন। খবরটা আজ দুপুরেই বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

মনোরমা মাথা নাড়লেন, 'আমি জানি না তো। কেউ কিছু বলেনি।'

দীপা অঞ্জলিকে বলল, 'আমি একটু মাস্টারমশাই-এর কাছ থেকে ঘুরে আসছি।'

'কাল সকালে যাস না। এখনই সন্ধে হয়ে যাবে।'

'যাব আর আসব।' দীপা উঠোনে নেমে এল। সে দেখল বুধুয়া তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বুধুয়ার এখন মধ্যবয়স। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

বুধুয়া মাথা নাড়ল, 'ভাল না। বউ ভেগে গিয়েছে।'

'মানে ?' দীপা অবাক।

'ছয় মাস আগে শাদী হয়েছিল। বানারহাটের মেয়ে। আমি চা-বাগানে কাজ করি না, বাবুবাড়িতে নোকর হয়ে আছি বলে থাকল না।' বুধুয়া বিমর্ষ মুখে বলল।

'তুমি তো বাবাকে বলে চা-বাগানে চাকরি নিতে পার ?'

'নাঃ। আমার ওইসব কাজ ভাল লাগে না ?'

দীপার কৌতূহল বাড়ছিল, 'বউ-এর জন্যে তোমার মন কেমন করে না ?'

বুধুয়া দ্রুত মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হ্যাঁ বলল।

'তাহলে তুমি চা-বাগানে কাজ নিয়ে নাও।'

বুধুয়া উদাস চোখে কাঁঠাল গাছের মাথায় তাকাল। সেখানে দুটো শালিক তর্ক জুড়েছে। দীপা আর দাঁড়াল না। খিড়কি দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এখন ঘন বিকেল। মাঠে ছেলেরা খেলছে। বাগানের মেয়েরা সেজেগুজে দলবেঁধে মাঠের একধারে পাক খাচ্ছে। এরা নিতান্তই ছোট। কিন্তু ভাবভঙ্গিতে ইতিমধ্যেই পাকামি এসে গিয়েছে। ওরা দূর থেকে দীপাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপা যেন ওদের লক্ষ করেনি এমন ভঙ্গীতে হেঁটে আসাম রোডে উঠে এল।

মসৃণ পিচের রাস্তার দুধারে ছায়া টেনে আনা দেওদার গাছের সারি। এই রাস্তায় হাঁটতে দীপার খুব ভাল লাগছে আজ। কয়েকটি মদেশিয়া কামিন ওর দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। এবং তখনই সে বিশুর বাবা আর মাকে আসতে দেখল। এই চা-বাগানে যে রক্ষণশীল মানসিকতা এখনও চলে আসছে তাতে কোন স্বামীস্ত্রী তা যে বয়সেরই হোক না কেন একসঙ্গে পথে হাঁটতে বড় একটা দেখা যায় না। মুখোমুখি হতেই দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কেমন আছেন জ্যেঠিমা ?'

বিশুর মা মাথা নাড়লেন, 'ভাল না। তুমি নিশ্চয়ই জানো বিশু মিলিটারিতে গিয়েছে।

'হ্যাঁ। ওরা যেদিন যায় সেদিনই বন্যা এসেছিল জলপাইগুড়িতে।'

'ও, তুমি জানো তাহলে। দুটো ছেলে একসঙ্গে গেল, খোকন ফিরে এল কিন্তু বিশু এল না।সে শুনেছি কাশ্মীর না কোথায় এখন আছে। দেড়মাস চিঠি পাইনি। তাই তোমার জ্যাঠামশাইকে নিয়ে তেলিপাড়ায় গিয়েছিলাম।'

'তেলিপাড়ায় কেন ?'

'ওখানে একজন কাপালিক এসেছেন। ত্রিকালজ্ঞ। মারণ-উচাটন সবরকম বিদ্যে জানেন তাঁর পায়ে পড়ে বললাম ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনতে। উনি কথা দিয়েছেন। এখন কি আছে বরাতে কে জানে!'

দীপা হাসি সামলালো বেশ চেষ্টা করে, 'কিন্তু ফিরিয়ে আনতে চাইছেন কেন ? ওর যদি ওই চাকরি ভাল লাগে তাহলে করতে দিন না।'

'তারপর কোথায় শত্রুর গুলি খেয়ে মরে থাকুক, আমরা জানতেও পারব না। একি কথা বলছ তুমি ?' ভদ্রমহিলার গলার স্বর পাল্টে গেল।

'মিলিটারিতে যদি কেউ চাকরি না নিয়ে যায় তাহলে আমাদের দেশকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে কারা ?'

'ওসব কথা ভাবার লোক আছে, আমি চাই বিশু ফিরে আসুক।' ওঁরা আর দাঁড়ালেন না। দীপা লক্ষ করল বিশুর বাবা তাকে কোন প্রশ্ন করলেন না।বিশু নিশ্চয়ই ফিরে আসবে না। কিন্তু খোকন ফিরে এসেছে কেন ? খোকনের চরিত্রের মধ্যে একটা মেয়েলি নরম ভাব ছিল। কিন্তু তাই বলে ভয় পেয়ে ফিরে আসবে এটা কখনও মনে হয়নি।

বাজারের রাস্তায় পৌঁছে দীপা দেখল প্রচুর অচেনা ছেলে এসে গিয়েছে এখানে। তারা শহরের ছেলেদের মত রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারছে। এরকম দৃশ্য আগে এখানে দেখা যেত না। একটি ছেলেকে বলতে শুনল, 'দারুণ জিনিস।'

দীপা এক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল। ছেলেগুলোর দিকে তাকাল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল। এদের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার কোন মানে হয় না বলে মনে হল দীপার সে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল।

সত্যসাধন মাস্টারের বাড়ি স্কুল পেরিয়ে কলোনির মধ্যে। এলাকাটা ছাড়ালেই খুঁটিমারি ফরেস্ট। কাঠের বাড়ি। ছোট উঠোন, টিনের বাউণ্ডারি দেওয়া। টিনের গেট খুলতেই একজন বয়স্কা মহিলা মাথায় ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালেন। রোদে শুকুতে দেওয়া কাঠের টুকরো ঝুড়িতে ভরছিলেন তিনি।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'মাস্টারমশাই আছেন?'

মহিলা মাথা নাড়লেন, 'তুমি দীপা, না?'

'হ্যাঁ।' দীপা এগিয়ে এসে প্রণাম করল। মহিলার দিকে তাকালেই বোঝা যায় অভাব তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি আশীর্বাদ করলেন, 'আয়ুষ্মতী হও মা। যাও ভিতরে যাও, তিনি শুইয়া আছেন।' দীপা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

'পরীক্ষা কেমন দিলা?' চিনচিনে গলায় একটা প্রশ্ন ভেসে এলো ঘরের কোনা থেকে। এখনও আলো জ্বালা হয়নি। জিনিসপত্রে ঠাসা ঘরটিতে চিমসে গন্ধ ভাসছে। দীপা সেখানে দাঁড়িয়েই জানতে চাইল, 'আপনি, আপনার কি হয়েছে?'

'পেটে বড় যন্ত্রণা হয়, আর কিছু না। এখানে আস, পরীক্ষা কেমন দিলা?'

দীপা এগিয়ে খাটের পাশে দাঁড়াল। খাট বলতে তক্তপোশ এবং তার ওপর প্রায় সতবঞ্চি হয়ে যাওয়া তোষক। সত্যসাধন মাস্টার চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। এই আধা-অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল তাঁর মুখ চোখ ভেঙে গিয়েছে। অত্যন্ত শীর্ণ হয়েছেন তিনি. চোখ কোটরে ঢুকে গিয়েছে। দীপা খাটের পাশে রাখা কাঠের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'পরীক্ষা ভালই দিয়েছি। কিন্তু এ কি চেহারা হয়েছে আপনার?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে চোখ বন্ধ করে সত্যসাধন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিক্সটি পার্সেন্ট নম্বর পাইবা তো? ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউ আর ফাইটিং এগেইনস্ট ডেস্টিনি। ইউ আর টু মেক ইওর ওন ফিউচার। ভুলবা না কখনও কথাটা।'

'আমি চেষ্টা করব।'

'না। বল, তোমারে জয়ী হইতে হইব।'

'কিন্তু আপনি ডাক্তার দেখাচ্ছেন?'

'কবিরাজী করাইতেছি। কলোনিতে একজন ভাল কবিরাজ আইছেন। রাজসাহীর মানুষ। মাঝে মাঝে একটু উপকার দেয়।' নিঃশ্বাস ফেললেন সত্যসাধন। তারপর যেন মনে পড়ল এমন ভঙ্গীতে বললেন, 'তোমার বাবার তো খুব অসুখ। কেমন আছেন?'

'ভাল না। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হবে।'

'তুমি যাইবা সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। শোন, যখনই টাইম পাইবা তখনই কয়েকটা জায়গায় যাইবা। ধর, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ওইসব জায়গায় কিছুক্ষণ থাকলেই মনের পরিবর্তন হয়। আমার ইচ্ছা ছিল তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হও।'

এইসময় একটা হ্যারিকেন নিয়ে সত্যসাধনের স্ত্রী প্রবেশ করলেন, 'অল্প কথা কইলে ভাল হয়। কবিরাজ মশাই রাগ করবেন।

'আরে রাখো তোমার কবিরাজ। এরে চেনো তুমি?'

মহিলা হাসলেন, 'তোমারে দেইখ্যা ওনার মুখে কথা ফুটতেছে।'

'শোন, সারাজীবন অনেক ছাত্র ছাত্রী দেখলাম। কিন্তু এ হল আমার বেস্ট স্টুডেন্ট। কিছু খাইতে দাও এরে।'

দীপা তড়িঘড়ি বলে উঠল, 'না না। আমার একটুও খিদে নেই। কিন্তু ডাক্তার মানে কবিরাজ কি বলছে ? অসুখটা কি ?'

'লিভারে পচন ধরছে। মদ্যপান করলে নাকি এই রোগ হয়। দুবেলা ভাত জোটে নাই ঠিকমত, মদ্যপান করার মত মনও হয় নাই কখনও অথচ দ্যাখো, আমার লিভারে সেই রোগ বাসা বাঁধল। এরেই বলে কপাল।'

'আপনি কপালকে মেনে নিচ্ছেন কেন ? লড়াই করছেন না কেন ?'

'ওরে মা, লড়াই করনের একটা বয়স থাকে। যখন রক্ত গরম তখন দুনিয়া পায়ের তলায়। জীবন থিকা আমার আর পাওনের কিছু নাই।'

'এসব কথা শুনতে চাই না। বাগানের ডাক্তারকে আপনি দেখিয়েছেন ?'

'না। তিনি আমারে দেখবেন কেন ?'

'আমি বলব। আপনাকে সেরে উঠতেই হবে।'

দীপা যখন উঠে দাঁড়াল তখন বাইরে ঘন অন্ধকার। একটু আগে বুধুয়া হাজির হয়েছে টর্চ নিয়ে। অঞ্জলি তাকে পাঠিয়েছে। দীপার কেবলই মনে হচ্ছিল মাস্টারমশাই আর বেশীদিন বাঁচবেন না। এই একটু কথা বলেই কেমন হাঁপিয়ে পড়েছেন। বোঝা যাচ্ছে তাঁর পেটে আবার যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। শায়িত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। সে মাস্টারমশাই-এর কপালে হাত রাখল, 'আপনাকে বাঁচতে হবে। আমার জন্যে আপনাকে বাঁচতে হবে।'

সত্যসাধন বললেন, 'পাগল। তোমার জীবনে আমার প্রয়োজন আর নাই। আমার যা ছিল আমি দিতে পারি তার সব নিয়া তুমি রান শুরু করছ। তোমারে পড়ানোর যোগ্যতা আর আমার নাই। শিশু যখন মায়ের কোলে থাকে তখনই তার স্তন্যদুগ্ধের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেই সে অন্য খাদ্য গ্রহণ করতে শেখে তখন মায়ের স্তন্যের দুগ্ধ শুকাইয়া যায়। এইটাই জীবনের নিয়ম। শোন মা, তোমারে একটা কথা বলি, কখনও পিছন দিকে তাকাইবা না। তোমার চেয়ে নিচে যার স্থান তার সঙ্গে হৃদয়ের কথা বলবা না। তুমি যতক্ষণ নিজে না মনে কর অন্যায় ততক্ষণ পাঁচজনে যাই বলুক তুমি কথা কানে তুলবা না। তোমার বিচারক তুমি।'

আগামীকাল আবার আসবে বলে দীপা বাইরে বেরিয়ে এল। বুধুয়া দাঁড়িয়ে ছিল গেটের সামনে। ওকে দেখামাত্র টর্চ জ্বালল। এই অন্ধকারে পথ হাঁটা সত্যি মুশকিল। দীপা অঞ্জলির কাণ্ডজ্ঞানে কৃতজ্ঞ হল। দূরে শেয়াল ডাকছে। বুধুয়া টর্চ হাতে আলো ফেলতে ফেলতে পেছনে আসছে। সত্যসাধন মাস্টারের জন্যে দীপার খুব কষ্ট হচ্ছিল। বাজার পেরিয়ে বাগানে এসে সে বুধুয়াকে নিয়ে ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্সে চলে এল। লুঙ্গি পরে হ্যারিকেনের আলোয় খবরের কাগজ পড়ছিলেন ডাক্তারবাবু বাইরের ঘরে বসে। দীপাকে দেখে অবাক হলেন, 'কি ব্যাপার তুমি ? পরীক্ষা কেমন হল ?'

'ভাল। আপনাকে একবার যেতে হবে।'

'কেন ? বাবার কি শরীর আবার খারাপ হয়েছে ?'

'না। বাবার না। মাস্টারমশাই, সত্যসাধনবাবুর।'

'হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে উনি অসুস্থ। কিন্তু উনি তো চা-বাগানের স্টাফ নন।

'কিন্তু কোন মানুষ, অসুস্থ হলে এসব বিচার কি সবসময় করা উচিত ?'

'বেশ, তুমি চাইছ যখন তখন আমি যাচ্ছি। কিন্তু ওঁর বাড়ি আমি চিনি না।'

'আমি আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।'

'দরকার হবে না। তোমাদের কাজের লোক চেনে ? ও সঙ্গে গেলেই হবে।'

'খোকন বাড়িতে আছে ?'

'না হে। সে আজ আলিপুরদুয়ারে চলে গেল। মাসীর বাড়িতে। আর তো কিস্যু হবে না জীবনে। যে ছেলে মিলিটারিতে গিয়ে পরিশ্রম সহ্য না করে পালিয়ে আসে তার জন্যে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয় না। হঠাৎ লাস্ট বাসে আলিপুরদুয়ার চলে গেল। তুমি বাড়িতে যাও, আমি মাস্টারকে দেখে আসছি।'

বুধুয়াকে নির্দেশ দিয়ে অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে কোয়ার্টার্সে ফিরতে ফিরতে দীপার মনে হল খোকন কি তার সঙ্গে দেখা হওয়া এড়াতেই মাসীর বাড়িতে চলে গেল ? নইলে হুট করে লাস্ট বাস কেউ ধরে না। অন্তত একটু আত্মসম্মানবোধ এখনও ওর মধ্যে কাজ করছে মনে হতে ভাল লাগল দীপার।

রাত আটটার মধ্যেই রাতের খাবার, ওষুধ-খেয়ে শুয়ে পড়েন অমরনাথ। দীপা পরিষ্কার হয়ে তাঁর ঘরে গেল। মশারি এখনও ফেলা হয়নি। অমরনাথ চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন। মেয়ে পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখ মেললেন। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ ?'

অমরনাথ হাসলেন।কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাসিটা কাঁপতে লাগল। তাঁর ঠোঁট মুচড়ে উঠল। চোখ বন্ধ হল। চোখের দুই কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। দীপা ধীরে ধীরে ওঁর মাথার পাশে উঠে বসল। আঙুলের ডগায় জলের ধারা মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'কেঁদো না। কাঁদলে তোমার শরীর আরও খারাপ হবে।'

অমরনাথ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন। দীপা ওঁর মাথায় গালে হাত বুলিয়ে দিতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে অমরনাথ নিজের ডান হাত দীপার কোলের ওপর রাখলেন। অঞ্জলি কাজ সেরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দৃশ্যটি সে দেখল, দেখে খুশি হল। ওরা কেউ কোন কথা বলছে না। অন্যদিন ঘুমের ওষুধ না খেলে অমরনাথের কিছুতেই ঘুম আসে না। আজ পনের মিনিটের মধ্যে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। অঞ্জলির মনে পড়ল ঠিক এইভাবেই অনেক অনেক বছর আগে মেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে অমরনাথ নিজেই ঘুমিয়ে পড়তেন আর মেয়ে চুপিচুপি উঠে আসত।

রান্নাঘরে গিয়ে দীপা জানতে পারল তাদের টিকিট হয়েছে পরশু। ম্যানেজার বলে পাঠিয়েছেন এখান থেকে বাগানের গাড়িতে সবাইকে পৌঁছে দেওয়া হবে শিলিগুড়িতে। বেলা একটায় বেরিয়ে পড়তে হবে। মনোরমা আর অঞ্জলির ব্যস্ততা বেড়ে গিয়েছে। পরশু যেন আগামীকাল। বুধুয়া ফিরে এল। সে বলল ডাক্তারবাবু থেকে গিয়েছেন মাস্টারমশাই-এর বাড়িতে। ওঁর নাকি ব্যথা খুব বেড়েছে। দীপা অঞ্জলিকে সব বলল। কাল সকালে চা খেয়েই দীপা মাস্টারমশাই-এর কাছে যাবে।

অঞ্জলি দরজায় শব্দ করতে মনোরমার ঘুম ভাঙল। তখন রাত শেষ হয়েছে কিন্তু দিন আরম্ভ হয়নি। মনোরমা দরজা খুলতেই অঞ্জলি বলল, 'ডাক্তারবাবু এইমাত্র বাড়ি ফিরলেন।'

কেন মনোরমা বুঝতে পারলেন না।

'আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখি উনি ফিরছেন।' কথাগুলি বলার সময় অঞ্জলি দেখল দীপা বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। সে

পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন করল, 'উনি কি বললেন ?'

আজ ভোর সাড়ে তিনটের সময় মাস্টারমশাই চলে গিয়েছেন।'

হঠাৎ একটা কান্না ছিটকে বেরুলো দীপার গলা থেকে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে আঁচল চেপে ধরলেন মনোরমা, 'মুখপুড়ি করছিস কি ? বাড়িতে একটা রুগী রয়েছে না ? খবরটা পেলে তার কি অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে ?'

কান্না চেপে ছটফট করতে লাগল দীপা। তারপর ছুটে চলে গেল বাথরুমে। মুখে জল দিয়েই সে ছুটল উঠোন পেরিয়ে খিড়কির দরজার দিকে। প্রায় পাগলের মত সে দৌড়াতে লাগল খালি পায়ে আসাম রোড ধরে। এখন রাস্তায় একটিও লোক নেই। প্রতিদিনের মত পাখিরা ডাকছে গাছের ডালে ডালে। ভোর হচ্ছে। স্কুলবাড়ির সামনের মাঠেব কাছে পৌঁছে থমকে গেল দীপা। তারপর হাঁটুমুড়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। যে কান্নাটা এতক্ষণ বুকের পাঁজরায় পাঁক খাচ্ছিল তা ভোরের শূন্য প্রান্তরে উগরে দিতে পেরে স্বস্তি হল। একসময় সম্মোহিতের মত সে মাস্টারমশাই-এর বাড়ির সামনে পৌঁছাল সেখানে, কিছু ছাত্র, পাড়ার লোকজন ইতিমধ্যে ভিড় জমেছে। স্কুলের অন্যান্য মাস্টারমশাই, কিছু ছাত্র, পাড়ার লোকজন। ওরা দীপাকে দেখল। দীপা উঠোনের একপাশে আঁচল দাঁতে চেপে দাঁড়িয়ে রইল। মাস্টরমশাই-এর মৃতদেহ নিয়ে স্কুলে যাওয়া হবে কিনা এইসব কথা হচ্ছিল। শুধু ভেতর থেকে মাস্টারমশাই-এর স্ত্রীর ভাঙা গলায় কান্না ভেসে আসছিল। পবিবেশেব সঙ্গে একটু অভ্যস্ত হয়ে গেলে দীপা ধীরে ধীরে কাঠেব সিঁড়ি বেয়ে ঘবের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে চার পাঁচ জন মানুষ চুপচাপ বসে আছে। একজন মহিলা মাস্টারমশাই-এর স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে আছেন। আর মাস্টারমশাই নিশ্চিন্তে শুয়ে আছেন। জীবনের সমস্ত সমস্যার বাইরে। মুখে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। হঠাৎ দীপার কানেব কাছে কেউ বলে উঠল, 'ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইউ আর ফাইটিং এগেইন্সট ডেস্টিনি। কখনও পিছন দিকে তাকাইবা না।' দীপা বিড়বিড় করল, 'কক্ষনো না।'

বেলা বারোটা নাগাদ সবাই তৈরী। ডাক্তারবাবু, তেজেনবাবু, শ্যামল এসেছে বিদায় দিতে। জিনিসপত্র তোলা হয়ে গিয়েছে গাড়িতে। অমরনাথ ধীরে ধীবে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর পাশে মনোরমা অঞ্জলি আর দীপা। দুই ছেলে সামনে। বুধুয়া দাঁড়িয়েছিল করুণ মুখে।

গাড়ি চলতে শুরু করল। কোয়াটার্সের সামনের মাঠ পেরিয়ে আসাম রোড ধবতেই দীপার মনে সত্যসাধন মাস্টারের মুখ ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট চাপল দাঁতে, মুখে মেঘ জমল। অমরনাথ সেটা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মন খারাপ করছে ? তোব তো মন খারাপ করার কথা না জলপাইগুড়িতে থেকে এ জায়গা ছেড়ে যাওয়া অভ্যেস হয়ে যায়নি ?' দীপা জবাব দিল না। সত্যসাধনমাস্টারের মৃত্যুর কথা অমরনাথকে জানানো হয়নি। সহজ হতে চেষ্টা করল দীপা। হঠাৎ তার মনে হতে লাগল তাব জীবন এবাব অন্য বাঁক নিতে যাচ্ছে।

॥ ২৮ ॥

অমরনাথকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে নেওয়া হল। সুভাষচন্দ্র যে বড় ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছিলেন তিনিই হাসপাতালের ওই বিভাগের কর্তা। রোগীকে দেখে নির্দেশ দিয়েছিলেন অবিলম্বে ভর্তি করে নিতে।

ব্যাপারটা যদি জলপাইগুড়ি অথবা শিলিগুড়ি হাসপাতালে হত তাহলে অঞ্জলি এত ভরসা পেত না। পশ্চিমবাংলার সেরা হাসপাতালে সেবা চিকিৎসা পাচ্ছে তার স্বামী এবং সেটা ভাইয়ের জন্যেই সম্ভব হয়েছে, এই নিয়ে সে বেশ সুখে ছিল।

হ্যাঁ, এটা ঠিক সুভাষচন্দ্রর কাছে যা আশা করা গিয়েছিল তার সবই সে পূর্ণ করেছে। মীর্জাপুর স্ট্রিটে দু ঘরের একটা বাসা ভাড়া করে রান্না থেকে শোওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা রেখে দিয়েছিল। এমন কি প্রথম দুদিনের বাজারও। এটা কে করে ? শুধু ট্রেন থেকে নামার পরে সুভাষচন্দ্র যখন রিকশায় চাপিয়ে মীর্জাপুর স্ট্রিটে নিয়ে এল তখনই একটু তিক্ততা তৈরি হল। বোঝা গেল নিজের বাসায় না নিয়ে গিয়ে সুভাষচন্দ্র তাদের ভাড়া করা বাসায় নিয়ে এসেছে। মনোরমা বলেই ফেললেন, 'এ খুব ভাল হয়েছে। এত লোক গিয়ে তোমার বাড়িতে ওঠাও তো ঠিক না। বউমার ওপব চাপ পড়ত।'

অমরনাথ কিন্তু অসুস্থ অবস্থায় কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলতে ছাড়েনি, 'আর গেলেও তো সাতদিনের মধ্যে বিদায় হতে হত।'

এই ব্যাপাবটা অঞ্জলির খুব গায়ে লেগেছিল। হাজার হোক সুভাষচন্দ্র তার দাদা। যতই দূরত্ব থাকুক, একতরফা কাজে কর্মে শুধু সুভাষচন্দ্রই চা-বাগানের বাড়িতে গিয়েছেন। কবে অমরনাথ সুভাষচন্দ্রের স্ত্রীকে চিঠি দিয়ে উত্তর পাননি আর তারপব থেকেই যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছেন, এতে সুভাষচন্দ্রের কোন দায় ছিল না। তবে আর যাই হোক, আজকের রাতটা অন্তত সুভাষচন্দ্র তাঁদেব নিজেব বাড়িতে তুলতে পারতেন। তাহলে এই ঘুবিয়ে বলা কথার খোঁটা সহ্য কবতে হত না।

জিনিসপত্র রেখে সুভাষচন্দ্র যখন অঞ্জলি আব দীপাকে নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে আলাপ করাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন চাপা গলায় অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বউদি বাড়িতে নেই ?'

সুভাষচন্দ্র মাথা নেড়েছিলেন, 'আছে। ওর এক দাদা এসেছে আজ সকালে।'

অঞ্জলি তৎক্ষণাৎ বুঝে গিয়েছিল ব্যাপাবটা। সংসারে বাস করতে গেলে স্ত্রীব ওপব ভার চাপিয়ে দেওয়ার মানুষ সুভাষচন্দ্র নন। এক রাত থাকতে দিলে হয়তো ওঁকে অনেক রাত অশান্তিতে ভুগতে হবে। সুভাষচন্দ্র যোগ করেছিলেন, 'কাল পবশু তোমাব বউদি এসে দেখা করে যাবে। এমনিতে ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না।'

দীপা বলেছিল, 'এত ব্যস্ত হবার কি আছে, মামীমাকে সুবিধে হলে আসতে বলো।'

শাশুড়ী স্বামী এবং মেয়ে এই যে উদারতা দেখাচ্ছে তা মোটেই ভাল লাগেনি অঞ্জলির। সবাই যেন সুভাষচন্দ্রের অক্ষমতাকে মেনে নিয়ে একটা আববণ দিতে চাইছে। যদি এত নিকট আত্মীয়বা চা-বাগানে যেত তাহলে মবে গেলেও অমরনাথ বাড়িতে না তুলে কোন বাড়ি ভাড়া করে সেখানে নিয়ে যেতেন না। এটা বোধ হয় কলকাতাতেই সম্ভব। সুভাষচন্দ্রের অসহায়তা যেন অঞ্জলিকেই ছোট করে রাখছিল শাশুড়ি স্বামী পুত্রকন্যার কাছে। সেই সুভাষচন্দ্র যখন প্রতিদিন দেখাশোনা করে, অমরনাথকে বড ডাক্তাবের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে দেখিযে হাসপাতালে ভর্তি কবিযে দিলেন তখন এক ধবনেব স্বস্তি এল। মানুষের কৃতকর্ম তার পরবর্তী কাজের দ্বারাই চেহারা পাল্টে নেয়। এই যা স্বস্তি।

দু'ঘরের এই বাসাটি দোতালায়, রাস্তা দেখা যায়। কিন্তু বাথরুম পায়খানা আব এক ভাড়াটের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয। এ জীবনে এমন অভিজ্ঞতা ওদেব কারোবই হয়নি। সব চেয়ে অসুবিধে মনোরমার। তার স্নান ও কাচাকুচিতে সময় লাগে। তার ওপব কাপড মেলে দিতে ছাদে যেতে হয়। সেখানে বাড়িওয়ালা আব ভাড়াটেদেব কাপড শুকোয়।

ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলা অত্যন্ত মুশকিল। প্রথম রাত্রে সুভাষচন্দ্র তাদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িওয়ালার সঙ্গে। তিনি থাকেন তিনতলায়।

সেইসময় রেডিওতে খবর শুনছিলেন ভদ্রলোক গড়গড়া হাতে। বছর সত্তর বয়স। সুভাষচন্দ্র পরিচয় করিয়ে দিতেই চিৎকার করে ডাকলেন, 'হ্যাঁ গা শুনছ।'

ভেতর থেকে জবাব এল, 'অমন ষাঁড়ের মত চেঁচিও না তো, যাচ্ছি।'

পুরনো আমলের রঙ-ওঠা সোফায় ভদ্রলোক তাদের বসিয়ে ছিলেন। এই সময় মাথায় ঘোমটা টানতে টানতে মোটাসোটা বৃদ্ধা ঘরে ঢুকলেন। বাড়িওয়ালা গড়গড়ায় টান দিয়ে হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন, 'তোমার নতুন ভাড়াটে। কথা কয়ে নাও।'

'কথা কইবার আর কি আছে। টাকা নিয়ে ভাড়াটে বসাচ্ছ যখন, তখন তো এরা থাকবেই। তা ঘরদোর পছন্দ হয়েছে?' শেষ প্রশ্নটি অঞ্জলিকে।

'হ্যাঁ।' অঞ্জলি মাথা নাড়ল।

'একটা কথা জানা হয়নি। তুমি বলছি ভাই। তুমি তো ওঁর বোন। উনি এ-পারের বলে শুনেছি। তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায় ছিল?'

'কেন?' অঞ্জলি অবাক হল।

'দ্যাখো বাপু, স্বাধীনতা না কি ছাই হবার পর তো কলকাতার রাস্তায় আর হাঁটা যায় না। গিজ গিজ করছে বাঙাল। আমাদের বাড়ির সামনের ফুটপাতগুলোতেও ছিটকাপড় নিয়ে বসে গেছে। এঁটো কাঁটা মানে না, বিছানায় বসে ভাত খায়, ওরা বোয়াল মাছ পর্যন্ত খায়, জানো? কী নোংরা কী নোংরা। আর ইনি, শিব হয়ে বসে আছেন।। তোমাদের পাশের ঘরের ভাড়াটেরা যে বাঙাল তা খোঁজ নিয়েও দ্যাখেননি। তোমার দাদার মত একজন এসে কথা বলেছিল। হাইকোর্টের উকিল, ব্যাস, উনি গলে গিয়েছিলেন।'

এবার বাড়িওয়ালা বললেন, 'ওদের উত্তরটা না জেনেই তুমি কথা বলে যাচ্ছ।'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'আমরা এপারেরই মানুষ। ওঁর কেউ কখনও পাকিস্তানে ছিল না।'

'সেটা বুঝেছি বলেই তো মনের কথা বললাম। তবে জলপাইগুড়ির লোক তো শুনেছি আধাবাঙাল। তোমরা একটু পরিষ্কার হয়ে থেকো বাপু। সঙ্গে কে এসেছে? তোমার শাশুড়ি? তিনি তো বিধবা, নিয়মটিয়ম মানে তো?'

দীপা জবাব দিল, 'একটু বেশিমাত্রায় মানেন।'

'তবু রক্ষে। যাক, স্বামীর অসুখটা কি? খারাপ রোগ নয় তো।'

অঞ্জলি বলল, 'বুকে ব্যথা হয়। মাথা ঘোরে।'

'অ এটি মেয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'এই বাঙালরা আসার পর থেকে মেয়ে ধেড়ে হয়ে গেলেও ঘরে রাখা রেওয়াজ হয়ে গেছে। পড়াশুনা করেছে কতদূর?'

'এবার আই এ পরীক্ষা দিয়েছে।'

'ওমা তাই।' বাড়িওয়ালি বড় বড় চোখে দীপাকে দেখলেন, 'শোন মেয়ে তোমাকে একটা কথা বলি, হুট হাট একা রাস্তায় বেরুবে না। ভদ্রমেয়েদের সঙ্গে ব্যাটাছেলে থাকে। খুব খারাপ জায়গা কলকাতা। রাস্তায় একা হাঁটা মোটেই নিরাপদ নয়। মনে রেখো।'

বাড়িওয়ালা বললেন, 'গিন্নী, কথা বলার অনেক সময় পাবে। এরা এই মাত্র অতক্ষণ জার্নি করে ট্রেন থেকে নেমেছে, একটু বিশ্রাম নিতে দাও।'

বাড়িওয়ালি তাদের তিনতলার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'ছাদে কাপড়

শুকোতে যেতে পারে, সকালে দশটা থেকে এগারটা আর বিকেলে চারটে থেকে পাঁচটা। জল কলে এলে ধরে রাখবে। সবসময় তো জল আসে না। গঙ্গাজলের কল অবশ্য সারাদিন ভরা থাকে। আর হ্যাঁ, উনুন জ্বালাবে নাকি?'

'না, স্টোভ।' সুভাষচন্দ্র উত্তরটা দিলেন।

'তালে ভাল। এক ভাড়াটের ধোঁয়ার জ্বালায় দু'বেলা অন্ধকার দেখি।'

মাটিতে বিছানা করে ফেলেছিলেন ছেলেরা মনোরমার নির্দেশে। ফিরে এসে ওরা দেখল পাশের ভাড়াটে-বউ রীতিমত গল্প জুড়ে দিয়েছে মনোরমার সঙ্গে। সুভাষচন্দ্র গিয়ে অমরনাথের পাশে বসলে অঞ্জলিদেব সঙ্গেও বউটির আলাপ হল। এই বাড়িটা খুব খারাপ। কলে সুতোর মত জল পড়ে। দশটা বাজলেই সদর দরজা বন্ধ করে দেয় বাড়িওয়ালার লোক। আর সারাক্ষণ পেছনে টিক টিক করে যায়। এই ধোঁয়া কেন ওপরে উঠছে, ওখানে নোংরা ফেলল কে, বউটি শেষ করল, 'আমরা কি মাছ খাই তাই নিয়া পর্যন্ত ওদেব চিন্তা জানেন দিদি!'

এই সময় একটি অল্প বয়সী মেয়ে দরজায় এল। এক মুহূর্তে দীপা দেখল মেয়েটি চোখ ঘুরিয়ে লক্ষ্য করে শরীর বেঁকিয়ে বলল, 'বউদি, দাদায় ডাকে।'

বউটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। যাওযার আগে যাচ্ছি বলে যাওয়ার সৌজন্য পর্যন্ত দেখাল না। মেয়েটি দীপাব দিকে একবার তাকিয়ে বউদিকে অনুসবণ করল। এই মেয়েটিব চেহাবা বেশ পাকা পাকা। রোগা কিন্তু শবীরে যেন চেষ্টাকৃত ঔদ্ধত্য রয়েছে। হাঁটা চলা তাকানো পর্যন্ত কোন চেনা মেয়ের মত নয়। দীপা কলকাতার মেয়েদের নানান গল্প হোস্টেলে থাকতে শুনেছে। এ বোধ হয় সেইরকম একজন। কপালেব দু'পাশের চুল ছেঁটেছে সামান্য। দীপা ঠিক কবল যেচে মেয়েটাব সঙ্গে আলাপ করবে না।

খানিক বাদেই একটি কাজেব মেয়ে এল বাটি হাতে। বাটিব মুখটা সে আঁচলে ঢেকে বেখেছিল। অঞ্জলিব হাতে দিযে বলল, 'মা পাঠিয়ে দিল। আপনাবা আজ প্রথম এয়েছেন, তাই মুখে মিষ্টি দিতে বলল।'

অঞ্জলি দেখল বাটিতে গোটা দশেক অমৃতি বয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা কে?'

কাজের মেয়েটি চোখ ঘুবিযে বলল, 'এ বাড়ির মালিকের গিন্নি।'

'ও হো।' অঞ্জলি তাড়াতাড়ি সুভাষচন্দ্রেব কিনে আনা প্লাস্টিকের ডিশে মিষ্টিগুলো ঢেলে রেখে বাটিটা ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন কিন্তু তাব আগেই কাজেব মেয়েটি চলে গেল। মনোবমা বললেন, 'বাড়িওয়ালি মানুষটি তো ভাল। আমবা কেউ নই অথচ মিষ্টি পাঠিয়ে দিল। এই শুনলাম কলকাতার মানুষের মনে মায়া দয়া নেই, কথাটা ঠিক নয়।'

অঞ্জলিও এই ব্যবহারে খুশি। সে বাটি হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এইটে ফেবত দেওয়া দরকার। এইসময় পাশেব ভাড়াটে বউটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। সে দাঁড়িযে আছে তার দরজায়, 'আপনাদেব বুঝি মিষ্টি দিযা গেল কালুব মা?'

অঞ্জলি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

বউটি বলল, 'আমরা যেদিন প্রথম আইছিলাম আমাদেরও দিছিল। আমি তো বুঝি নাই, খালি বাটি ফিরত দিয়া দিছিলাম। আর তারপর কি কথা, কি কথা। আমরা বাঙাল, ভদ্রতা জানি না, জংলী, এইসব।'

অঞ্জলি আর কথা না বাড়িয়ে পাশের ঘরে ঢুকল। সেখানে সুভাষচন্দ্র কথা শেষ কবে দাঁড়িয়েছেন যাওয়ার জন্যে। তাকে দেখে বললেন, 'তোমার দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। আজকের রাতটায় তোমাদের রাঁধতে নিষেধ কবেছিলাম। ওদের হাতে খাবার

পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার শাশুড়ির জন্যে নিরামিষ পাঠাবো ভাল দোকান থেকে। ওঁকে আজকের রাতটা কষ্ট করতে বলো।'

'ছেলেরা রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না তো ?'

'আরে বাবা ওদের এ বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাব।'

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। আমাদের চা-বাগানে কেউ কারো বাড়িতে কোন খাবার পাঠালে বাটিটাকে ফেরত দিয়ে দিতাম। পরে যখন কোন ভাল খাবার হত তখন আমিও পাঠাতাম। এখানকার নিয়ম কি ?'

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'যদি ঘটিবাড়ি থেকে আসে তাহলে খবরদার খালি বাটি ফেরত দিও না। তারা ভাববে তুমি সভ্যতা জানো না।'

'তাহলে ওদের হাতে দশ টাকার মিষ্টি কিনে পাঠাতে হবে।'

অমরনাথ শুয়েছিলেন চুপচাপ, জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে আবার ভদ্রতা করল ?'

'ওপর থেকে, বাড়িওয়ালার গিন্নী।'

'তাই বলে দশ টাকার মিষ্টি এখনই পাঠাতে হবে কেন ?'

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'দশ টাকা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে। আসলে এটা উত্তর কলকাতাব নিজস্ব ভদ্রতা। না করলে ওঁরা আপনাদের সম্পর্কে খাবাপ ভাববেন।'

ছেলেরা যখন রাতের খাবার নিয়ে এল তখন দীপা শুয়ে। অঞ্জলি তাকে বলল, 'যা বাটিটা দিয়ে আয়।'

দীপা চোখ বন্ধ করল, 'অসম্ভব। ওদের বলো, আমার দ্বারা সম্ভব না।'

'কেন ?' অঞ্জলি বিরক্ত হয়েছিল।

'চুক্তিবদ্ধ ভদ্রতায় আমি বিশ্বাস করি না, তাই।'

দুই কিশোর ভাই যত সহজে কলকাতার সঙ্গে মিশতে পারল মনোরমাব তা পাবা সম্ভব নয়। অঞ্জলিও এত গাড়ি এবং মানুষ দেখলেই ভয় হয়। দীপাব মনে অন্য একটা ধাবণা তৈরি হল। মাঝরাত্রে অথবা ভোরে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালে শহরটাকে দারুণ শান্ত, সুন্দর মনে হয়। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ আর মানুষে চার পাশ থিক থিক করে। অথচ এইসব মানুষের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ তার দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। কারো প্রয়োজন পড়ে না দাঁড়িয়ে দু'দণ্ড কথা বলার। পরস্পরের সম্পর্কে নির্লিপ্ত থেকে এরা একই রাস্তা ব্যবহার করে। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। সেটা অঞ্জলি অথবা মনোবমাব ক্ষেত্রে হয় না। অল্প বয়সী তরুণ অথবা চল্লিশ পার হওয়া প্রৌঢ়েবা তাকে দেখে দৃষ্টি পাল্টায়। মানুষের চোখের মধ্যে লালা গড়ানো জিভ আছে তা কলকাতায় না এলে জানা যেত না। আর তখনই তার আঙরাভাসা নদীব গায়ে খুঁটিমারির জঙ্গলের কথা মনে পড়ে যায়। সেই গভীর জঙ্গলের পায়ে চলা পথে হাঁটলে কান ঝালাপালা হয়ে যায় ঝিঁঝির ডাকে, পাখির চিৎকারে। কিন্তু গাছগুলো ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে থাকে অত্যন্ত নির্লিপ্ত হয়ে। পাশ দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছে তা গ্রাহ্যই করে না যেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই বাড়িয়ে থাকা কোন কাঁটাগাছের ডালে শরীর জ্বলতে থাকে। আর সেই ডালগুলো যে গাছে হয় তাকে গাছ না বলে ঝোপ বলাই সঙ্গত। এইসব লোভী চোখ দেখলে ওই কাঁটাডালের কথা মনে পড়ে যায়।

অমরনাথকে দেখতে যাওয়ার জন্য দু'বেলা এই বাড়ি থেকে মিছিল বের হয়। সুভাষচন্দ্র তাদের অন্য একটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। বড় রাস্তা এড়িয়ে গলি দিয়ে হেঁটে মেডিকেল কলেজের সামনে পড়া যায়। এতে ঝামেলা কম। অমরনাথের বিছানার পাশে একটি মাত্র

টুল, তাতে মনোরমা বসেন। হাসপাতালে আসা-যাওয়ার জন্য দুবেলা মনোরমাকে জামাকাপড় ধুতে হয়। কিন্তু তিনি টুলে বসে থাকেন গম্ভীর মুখে। আশেপাশের রোগীদের দিকে ভুলেও তাকান না। ছেলেরা কিছুক্ষণ বাবার কাছে দাঁড়িয়ে করিডোরে চলে যায়। অঞ্জলি রোজই এক প্রশ্ন করে। অমরনাথের রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, এই হাসপাতালের খাবার মুখে দেওয়া যাচ্ছে না, আজ পায়খানার সময় আয়াকে তিনবার ডাকতে হয়েছে, বড় ডাক্তার কাল রাত্রে দেখতে আসেননি। অমরনাথ এইসব উত্তর দিয়ে যান। শুনতে শুনতে দীপার মনে হয় অসুস্থ হলে মানুষ অনেকটা যান্ত্রিক হয়ে যায়। খুব সামান্য ব্যাপারও তার কাছে তখন অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে। অমরনাথের শরীরের তেমন উন্নতি হচ্ছে না। বিকেলে সুভাষচন্দ্র দেখতে আসেন রোজ। তিনি অবশ্য খুব আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন। বড় ডাক্তার সমস্ত পরীক্ষা করিয়েছেন, রিপোর্ট পেলেই ব্যবস্থা নেবেন। এই ব্যাপারে চিন্তা করার কিছু নেই।

তৃতীয় দিন বিকেলে সুভাষচন্দ্র স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। দীপা এই প্রথম তার মামীকে দেখল। হাসপাতালে দেখা করতে আসার সুবিধে এই যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম না করলেও চলে যায়। ভদ্রমহিলাকে দীপার অঞ্জলির থেকেও আধুনিক বলে মনে হল। সাজপোশাক এবং কথা বলার ধরন অনেক আলাদা। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাপ হবার পর তিনি দীপাকে বললেন, 'তোমার কথা খুব শুনেছি। পড়াশুনায় খুব ভাল তুমি। তোমার মামা যখন পাত্র খুঁজছিলেন আবার তখন আমি ওঁকে নিষেধ করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিত।'

দীপা বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

ভদ্রমহিলা অনর্গল কথা বলে গেলেন। তাঁর নিজস্ব সমস্যা, কলকাতার সমস্যা, কিছুই বাদ গেল না। জায়গাটা যে হাসপাতালের ভেতর তা তাঁর খেয়ালেই থাকল না। দীপা দেখল আশেপাশের রোগীরা বেশ বিরক্ত হয়েই এদিকে তাকিয়ে আছে। সে বলল, 'মা, আমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াই।'

অঞ্জলি কিছু বলার আগে ভদ্রমহিলা বললেন, 'তাই ভাল। আমার হাসপাতালে এলেই শরীর গুলিয়ে ওঠে গন্ধে। চল, আমিও সঙ্গে যাই।'

অগত্যা দীপাকে মামীর সঙ্গে বেরুতে হল। খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে মামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আই এ পাস করে কি করবে?'

'পড়ব।'

'কোথায়? জলপাইগুড়িতে?'

'দেখি।'

'তুমি কি বিধবাদের নিয়মকানুন মানো?'

'না।'

'বাড়িতে কিছু বলেনি?'

'প্রথম দিকে বলেছিল তারপর বলা ছেড়ে দিয়েছে।'

কথা শুনে মামী উদাস চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, 'তোমার মামার ইচ্ছে ছিল যে তোমরা আমার ওখানে ওঠ। আরে আমরাই ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারি না, তোমরা গেলে তো বিপদে পড়তে। দুটো ঘর তার ওপর পাশের বাড়িতে একটি বখাটে ছেলে, তোমাদের নিয়ে যাই কি করে বলতো? যাক, এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? কদিনের ব্যাপার, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

কিন্তু দেখতে দেখতে কাটল না। অমরনাথ তিন মাস বিছানায় পড়ে রইলেন। ডাক্তার অনেক ঝুঁকি নিয়ে তাঁর অপারেশন করলেন। অঞ্জলির টাকা শেষ হয়ে আসছিল। তার চেয়ে বড় সমস্যা ছেলেদের স্কুল কামাই হচ্ছে। এইভাবে চললে বছর নষ্ট হবে। অনেক চিন্তার পর নিতান্ত অনিচ্ছায় অঞ্জলি ভেবেছিল যে ছেলেদের নিয়ে ফিরে যাবে। কলকাতার বাসায় মনোরমা থাকবেন দীপাকে নিয়ে। চা-বাগানে ফিরে গিয়ে অঞ্জলি টাকার ব্যবস্থা করবে। কি ভাবে সেটা হবে তা জানা নেই। কিন্তু সেই পরিচিত পরিবেশে সেটা যদিও সম্ভব কিন্তু এই কলকাতায় চাইলে কেউ একটা টাকাও দেবে না।

অমরনাথ যখন অপারেশনের পর চৈতন্যহীন তখন দীপার পরীক্ষার ফল বের হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির সামনে থেকে পরীক্ষার ফল ছাপা বই কিনে এনেছিলেন সুভাষচন্দ্র। এনে দীপার নম্বরটা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এই নম্বর মনের মধ্যে গাঁথাই ছিল। দীপা লক্ষ্য করল ঘরের সবাই উদ্বিগ্ন মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। দীপার একটুও ভয় করছিল না। সে জানে ফেল করার মত পরীক্ষা সে দেয়নি। নম্বরটা বলতেই সুভাষচন্দ্র তড়িঘড়ি পাতা ওল্টাতে লাগলেন। শেষে তাঁর দৃষ্টি পড়ল নম্বরটার ওপরে এবং তিনি হেসে উঠলেন, সজোরে, 'আরে ব্বাস, তুই ফার্স্ট ডিভিসন পেয়েছিস দীপা।'

সঙ্গে সঙ্গে মনোরমা এবং অঞ্জলির মুখে প্রশান্তি নেমে এল। অঞ্জলি বলল, 'ইস, তোর বাবার অপারেশনটা যদি কালকে হত তাহলে আজই ওঁকে খববটা দেওয়া যেত।'

মনোরমা বললেন, 'আঃ, খবর দেওয়ার সময় যেন পাবে না এমন ভাবে বললে!'

অঞ্জলি তাড়াতাড়ি মাথা নাড়ল, 'না-না, আমি তা বলতে চাইনি।'

সুভাষচন্দ্র তখন দীপার সামনে দাঁড়িয়ে, 'শোন, তোর আর জলপাইগুড়িতে থেকে পড়া চলবে না। তুই কলকাতার কলেজে ভর্তি হবি। হয় বেথুন নয় ব্রেবোর্ন।'

অঞ্জলি বলল, 'তুমি পাগল হলে? কলকাতায় পড়তে কত খরচ!'

'খরচ? ও তো জলপাইগুড়ির হোস্টেলে থেকে পড়ত। সেখানে খরচ হত না।'

অঞ্জলি চুপ করে গেল। এবং তখনই তার মনে পড়ল ব্যাঙ্কে অমরনাথ আর দীপার নামে প্রতুলবাবুর দেওয়া টাকাটা এখনও আছে। দীপার পরীক্ষা শেষ হওয়ামাত্র অমরনাথ নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন যেন সুদের টাকা আর হোস্টেলে না পাঠানো হয়। সেই টাকাটা পেলে এখনকার অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান হতে পারে। কিন্তু অঞ্জলি ভাবার সময় পেল না। সুভাষচন্দ্র তখন গড়গড় করে দীপার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন।

হঠাৎ দীপা প্রশ্ন করল, 'তুমি বেথুন ব্রেবোর্নের কথা বলছ কেন?'

'ওই দুটো হচ্ছে শুধু মেয়েদের কলেজ। বেথুন বেটার।'

'কিন্তু কলেজ হিসেবে প্রেসিডেন্সি সবচেয়ে ভাল।'

'তা ঠিক। কিন্তু ছেলেদের সঙ্গে পড়তে পাঠিয়ে মা-বাবা চা-বাগানে আরামে থাকতে পারবে তো? আর প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের জন্যে হোস্টেল আছে কিনা জানি না।'

'তাহলে বি এ পাস করার পর কি করব? মেয়েদের জন্যে কি আলাদা এম এ পড়ার ব্যবস্থা আছে? জলপাইগুড়িতেও আমি ছেলেদের সঙ্গে পড়তাম। মামা আমি প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হব।' দীপা জোর গলায় বলল।

শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি না বলে পারল না, 'তুই কী রে! উনি ওদিকে বিছানায় পড়ে আছেন আর তুই নিজের জন্যে চিন্তা করছিস?'

দীপা তথমত হয়ে গেল। সে অবাক হয়ে অঞ্জলির দিকে তাকাল। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'এটা কি রকম কথা হল। রেজাল্ট বেরিয়েছে। এখনই সব ছেলেমেয়ে কলেজে ভর্তি হবার

চেষ্টা করবে। ও যদি চুপচাপ বসে থাকে তাহলে পরে সুযোগই পাবে না। কিন্তু তোকে মার্কস আনতে হবে তো জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে।'

অঞ্জলি বলল, 'হ্যাঁ, পরে আমার মনে হয়েছে ওকেও আমাব সঙ্গে একবার জলপাইগুড়িতে যেতে হবে। বিশেষ কাজে ওর যাওয়া দরকাব।'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি কাজ ?'

'সেটা ওখানে গেলেই জানতে পারবে।'

রেজাল্ট বেরুনোর পর দীপার মনে হল অঞ্জলি যেন আচমকা পাল্টে গিয়েছে। সুভাষচন্দ্র চলে যাওয়ার পর নিজের মনেই গজগজ করল, 'আর পড়াশুনা করে যে কি হাতি ঘোড়া হবে কে জানে ! ওই তো সত্যসাধনমাস্টার, কত পড়াশুনা লোকটার, শেষ সময়ে প্রায় বিনি চিকিৎসায় মরতে হল। মামা বলল আর ভাগ্নী হাত তুলে নাচলেন।'

মনোরমার কানে গেল কথাটা, 'কি যা তা বলছ বউমা। মেয়েকে পড়ানোর জন্যে তুমিই তো একসময় উঠেপড়ে লেগেছিল। জানলায় দাঁড়িয়ে রোজ দেখি কত বড় বড় মেয়ে এম এ পড়তে যাচ্ছে। এমনি এমনি যাচ্ছে তারা ?'

অঞ্জলি বলল, 'আপনি এসব বুঝবেন না। আপনার ছেলেব কিছু হলে আমি কোথায় ভেসে যাব তা জানেন ? ওই বলদ দুটোর কি হবে ? এতবাব বললাম যে মামাকে নিয়ে হেড অফিসে গিয়ে ধর্না দে, তা না একবার গিয়েই উৎসাহ ফুরিয়ে গেল। টাকা কি মিনমিন করে চাইলে কেউ দেয় ? আপনার ছেলের পেছনে কত খরচ হচ্ছে জানেন ? সেই টাকা জোগাবে কে ?'

'তা এর সঙ্গে দীপার পড়ার কি সম্পর্ক ?'

'সম্পর্ক আছে।' অঞ্জলি কথা বাড়াতে আর চাইল না।

দীপার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি কলেজেব সামনে সে দু-দিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কলেজে তাকে ভর্তি হতে বলেছিলেন সত্যসাধনমাস্টার। আজ অঞ্জলিব কথাবার্তার ধরনে তার সব স্বপ্ন চুরমার হতে চলেছে। বুকের ভেতব অভিমান একটু একটু করে বিদ্রোহের চেহারা নিচ্ছিল।

'তোমায় দ্যাখে।' পেছন থেকে গলাটা কানে আসতেই দীপা ঘুরে দাঁড়াল। পাশের ভাড়াটেদের মেয়েটা। আজ শাড়ি পরেছে। দীপাব সামনে জানলা, তার ওপাশে রাস্তা। সেদিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল রাস্তাব উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে দুটো ছেলে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মেয়েটি বলল, 'আমারে দু'দিন কইছিল তোমার সঙ্গে কথা কওয়াব ইচ্ছা খুব।'

'তুমি ওদের চেনো ? কি করে ওরা ?'

'আগে চিনতাম না। আলাপ করছে তাই নাম জানি। বাপেব পয়সা আছে, সেই পয়সা দিয়ে সিনেমা দ্যাখে, আমারেও দেখাইছে। তুমি দেখবা ?'

চটপট মাথা নাড়ল দীপা। 'না। আমার ঘেন্না করে।'

মেয়েটি ঠোঁট ওল্টালো। তারপর রাগত ভঙ্গীতে চলে গেল। একটু বাদেই দীপা লক্ষ্য করল মেয়েটি রাস্তায় উদাসীন ভাবে হাঁটছে। আর সেই ছেলে দুটো কয়েকবার তার দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে অনুসরণ করল।

এই কয় মাসে মেয়েটির সঙ্গে তার সামান্যই কথাবার্তা হয়েছে। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়ে শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ওর দাদার নাকি একটা কাটা কাপড়ের দোকান আছে। বউদি সিনেমা দেখতে ভালবাসে। আর মেয়েটা যখন ইচ্ছে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে

যেতে পারে দাদা বাইরে থাকলে।

মনোরমাকে একা কলকাতায় রেখে যাওয়া অশোভন। অথচ তিনি ছেলেকে সুস্থ না করে কলকাতা ছাড়বেন না বলে জিদ ধরেছেন। দশ দিনের চাল ডাল আলুর ব্যবস্থা হয়ে গেলেই নাকি তিনি দিব্যি থাকতে পারবেন। এই দশ দিনের মধ্যে দীপা যদি ফিরে আসে তাহলে তো কোন চিন্তা নেই। সুভাষচন্দ্রের চিনিয়ে দেওয়া গলি দিয়ে দু-বেলা হাসপাতালে যাবেন আর এই ঘরে শুয়ে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র আশ্বাস দিলেন তিনি রোজ না হলে একদিন অন্তর এসে দেখে যাবেন। তা ছাড়া হাসপাতালে গিয়ে অমরনাথের দেখাশোনা করা, ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা—এসব তো তাঁকে করতে হবেই।

ফিরে যাওয়ার আগের দিন বিকেলে অমরনাথের কিছুটা চেতনা ফিরেছে দেখা গেল। তিনি মানুষ চিনতে পারছেন। অক্সিজেনের নল খুলে দেওয়া হয়েছে। অঞ্জলি কাঁদো কাঁদো গলায় তাঁকে জানাল দীপা পাস করেছে এবং সেই কারণে জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া দরকার। অমরনাথের পাণ্ডুর মুখে যেন আলো ফুটল। তিনি ইশারায় দীপাকে কাছে ডাকলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, 'তুই এবার কলকাতার কলেজে পড়বি।' কথাটা কানে যাওয়া মাত্র অঞ্জলির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

চা-বাগানে পৌঁছে সুখবরটা পাওয়া গেল। হেড অফিস থেকে অমরনাথের সম্পর্কে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল ম্যানেজারের কাছে। তিনি সেটা যথাসময়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছু টাকা মঞ্জুর হয়ে এসেছে। অত্যন্ত অল্প হলেও টাকা টাকাই। বাগানের সমস্ত বাবু এসে খোঁজ নিতে লাগলেন অমরনাথ কেমন আছেন। তাঁর মাইনে এবং হেড অফিসের দেওয়া অনুদান অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে অঞ্জলির হাতে দিয়ে গেলেন। অঞ্জলি একটু স্বস্তি পেল। সেদিনই কিছু টাকা সুভাষচন্দ্রের নামে মনি-অর্ডার করে পাঠিয়ে দিল সে।

পরদিন সকালে দীপা যখন জলপাইগুড়িতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন দেখল অঞ্জলিও প্রস্তুত। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'জলপাইগুড়িতে।'

'ওমা, তুমি গিয়ে কি করবে?'

'টাকা তুলতে হবে।'

'কোত্থেকে?'

'ব্যাঙ্ক থেকে। তোমার আর তোমার বাবার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখা হয়েছিল, যার সুদে তুমি এই দু বছর পড়লে সেটা প্রতুলবাবুর দেওয়া বলে একসময় রাগ করে পড়া ছেড়ে দিয়ে এসেছিলে। বলেছিলে ওই টাকা ছুঁয়ে দেখারও প্রবৃত্তি তোমার নেই? মনে পড়ছে? আজ সেখান থেকে টাকা তুলে তোমার বাবার চিকিৎসা করাতে হবে। তোমার নিশ্চয়ই এতে কোন আপত্তি নেই?'

'কেন আপত্তি করব? কত টাকা তুলবে?'

'দশ হাজার।'

'বাব্বা! অত টাকা নিয়ে ফিরে আসবে কি করে?'

'যেভাবে সবাই আসে।'

জলপাইগুড়ি শহরে ওরা যখন পৌঁছালো তখন ঠিক এগারটা। দীপার ইচ্ছে হচ্ছিল তখনই কলেজে গিয়ে মার্কসিট দেখতে। পঁয়ষট্টি শতাংশের ওপর নম্বর না পাওয়া গেলে অনার্স পড়তে দেবে না প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু অঞ্জলি আগে ব্যাঙ্কে যেতে চাইল।

চেক-বই ও পাস-বই অমরনাথের ড্রয়ার থেকে নিয়ে এসেছিল অঞ্জলি।

ব্যাঙ্কের কাউন্টারে পৌঁছে সে জানতে চাইল দশ হাজার টাকা তুলতে হলে কি করতে হবে। ভদ্রলোক জানালেন, সেভিংস অ্যাকাউন্ট থেকে অত টাকা তুলতে গেলে আগে নোটিস দেওয়ার নিয়ম। অবশ্য ম্যানেজার ইচ্ছে করলে অনুমতি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে অঞ্জলিদের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

দীপাকে নিয়ে অঞ্জলি ম্যানেজারের ঘরে এল। ভদ্রলোক বসতে বলে বক্তব্য শুনলেন। তিনি বললেন, 'আপনার স্বামীর অসুস্থতার জন্যে টাকাটা প্রয়োজন বলে একটা দরখাস্ত করুন। আমি ততক্ষণ আপনাদের খাতাটা আনিয়ে দেখছি।' তিনি চেক-বুক এবং পাস-বই চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দীপা ব্যানার্জি কে?'

দীপা বলল, 'আমি।'

'অমরনাথ মুখোপাধ্যায়?'

'আমার বাবা।'

'ও, আপনাদের তো জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। দাঁড়ান দাঁড়ান মনে পড়েছে। আপনাকে হোস্টেলের ঠিকানায় ইন্টারেস্ট পাঠানো হত প্রত্যেক মাসে, তাই না?'

দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

ভদ্রলোক নিজের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট তিনেক বাদে একটা বড় লেজার-বুক নিয়ে ফিরে এসে বললেন, 'আপনারা কি কিছুই জানেন না?'

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'কি বিষয়ে?'

ম্যানেজার লেজার বই-এর বিশেষ পাতাটি মেলে ধরলেন। সেখানে আর একটি কাগজ পিন দিয়ে আটকানো আছে। ম্যানেজার বললেন, 'প্রথম কথা, আইদার অর নয়, টাকা তুলতে গেলে দু'জনেরই সই লাগবে। তবে একজন মারা গেলে অন্যজনের সইতে টাকা তোলা যাবে ডেথ সার্টিফিকেট দেখিয়ে। দ্বিতীয়ত, আজ থেকে দু বছর আগে অমরনাথবাবু এবং দীপা দেবী একসঙ্গে সই করে ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন সুদের টাকা থেকে একটা অঙ্ক প্রতি মাসে হোস্টেলের ঠিকানায় দীপা দেবীর নামে পাঠিয়ে দিতে। আজ থেকে সাড়ে তিন মাস আগে অমরনাথবাবু সেই চিঠির সূত্র উল্লেখ করে আমার নির্দেশ দিয়েছেন জলপাইগুড়ির কলেজ হোস্টেলের ঠিকানায় আর টাকা পাঠাতে হবে না। এবার থেকে টাকা পাঠাতে হবে কলকাতার কলেজ হোস্টেলের ঠিকানায় এবং সেই ঠিকানাটা ব্যাঙ্ককে তিনি অথবা দীপা দেবী পরে জানিয়ে দেবেন। এখন এই চিঠির বক্তব্যে যদি দীপা দেবীর আপত্তি থাকে এবং যেহেতু তিনিও টাকাটার একজন অংশীদার তাহলে আমাদের জানালে আমরা অমরনাথবাবুর নির্দেশ অগ্রাহ্য করব। আপত্তি না থাকলে কলকাতার হোস্টেলের ঠিকানায় দীপা দেবীর নামে পাঠানো আরম্ভ হবে। তবে কোন অবস্থায় দু'জনের সই চেকে না থাকলে এখনই টাকা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

অঞ্জলির মুখ কথাগুলো শুনতে শুনতে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। দীপা ভাবতে পারছিল না অমরনাথ তাকে কিছু না জানিয়ে ব্যাঙ্ককে এই নির্দেশ দিয়েছেন। ম্যানেজার বললেন, 'আপনার কলকাতায় হোস্টেলের ঠিকানাটা জানিয়ে আমাদের একটা চিঠি পাঠালে ভাল হয় দীপা দেবী।'

ওরা চুপচাপ বাইরে বেরিয়ে এল। এসেই অঞ্জলি চাপা গলায় বলল, 'ওঃ কত বড় বড় কথা বলেছিলি, টাকার ওপর তোর তো কম লোভ না!'

'আমি কিছুই জানি না মা। আমি ব্যাঙ্ককে লিখতে পারি কলকাতায় টাকা পাঠাতে হবে

না। এতে তুমি খুশি হবে ?'

'তাতে লাভটা কি হবে ? তোমার বাবার সই চাই টাকা তুলতে। উঃ, আমি আর ভাবতে পারছি না।' অঞ্জলি হন হন করে হাঁটতে লাগল। অবাক দীপা দৌড়ে এল পাশে, 'তুমি কোথায় চললে ?'

'বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।' অঞ্জলি আর দাঁড়াল না। স্তম্ভিত দীপা কি করবে বুঝতে পারছিল না। একটা সাইকেল রিকশার হর্নের শব্দে তার চেতনা ফিরল। তাকে কলেজে যেতেই হবে। মার্কসিট নেওয়া সবচেয়ে জরুরি। সে একা হাঁটতে লাগল। এই অঞ্জলিকে সে কোনদিন দেখেনি। মানুষের কতগুলো মুখ থাকে ? কতগুলো ?

॥ ২৯ ॥

ফুল হাতা শার্ট, ধুতির কোঁচা বাঁ হাতের মুঠোয় তুলে নাকের প্রান্তে চাপা, ডান হাতে বড় ছাতার বাঁট উঁচিয়ে ধরে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি হাঁটছিলেন। তাঁর ছাতার নিচে গোলগাল ফর্সা লাজুক মুখের মেয়েটি পা ফেলছিল শামুকের মত। মাঝে মাঝে কোঁচার খুট সরিয়ে প্রৌঢ় কথা বলছিলেন, 'কোনদিকে তাকাবে না। মাস্টার যখন ডাকবে তখন তার পেছন পেছন অন্য মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকে মাঝখানে বসবে। আবার ক্লাস শেষ হলে মাস্টারের পেছন পেছন মেয়েদের ঘরে এসে বসবে। কলেজ ছুটি হলেই আমি গেটে এসে দাঁড়াব। দেখো বেশিক্ষণ যেন আমাকে দাঁড়াতে না হয়।'

মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হল না।

হেদুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রৌঢ় বাঁদিকে তাকালেন। সেখানে বসন্ত কেবিন নামে একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। কিছু এঁচোড়ে পাকা ছেলের সারাদিনের আড্ডা মারার জায়গা ওটা। তারপরেই কসমস নামে আর একটি রেস্টুরেন্ট। এ দুটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক মন্তব্য বাতাসে উড়ে আসে। প্রৌঢ় আবার কোঁচার খুট সরালেন, 'কোন বদ ছেলে যদি আগবাড়িয়ে কথা বলতে আসে তাহলে তাকে বলে দেবে যে তোমার বাবা ওসব পছন্দ করেন না। মিত্তির বংশের কোন মেয়ে অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে না। বুঝলে ?'

মেয়েটি এবারও ঘাড় নাড়ল। ইতিমধ্যে তারা কলেজের গেটের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল। কলেজটি খুবই প্রাচীন। বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র ওই কলেজেই একদা পড়াশুনা করেছিলেন। এখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল একজন সাহেব। কলেজের গেটের ভিতরে কার্তিক সেজে আসা ছেলেরা ভিড় করে বসে আছে সিঁড়ি দখল করে। প্রৌঢ় মেয়েটিকে নিয়ে গেলেন লেডিস কমনরুমের দরজা পর্যন্ত। ছাতাটা সামান্য সরিয়ে নিতেই মেয়েটি সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের হাসি, কথাবার্তা। প্রৌঢ় ঘুরে দাঁড়াতেই সিঁড়িতে বসা কোন ছেলে মন্তব্য করল সজোরে, 'হিপোর গার্ড জিরাফ।'

প্রৌঢ় রাগত চোখে সেদিকে তাকাতে সবাই মুখ নিরীহ করল। তিনি গেটের বাইরে আসবার জন্যে পা বাড়াতেই পেছনে যেন হাসির তুবড়ি ফাটল। যেন খুব মজার কথা শুনল সবাই। গেটের বাইরে এসেই প্রৌঢ় বাঁ দিকে তাকালেন। সেখানে কিছু অভিভাবক মেয়েদের পৌঁছে দেবার পর কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলেন। ইতিমধ্যে আলাপ হয়ে গিয়েছে তাঁদের সঙ্গে।

পাঞ্জাবি ধুতি পরা বসুবাবু ডাকলেন, 'আসুন মিত্তিরবাবু।'

প্রৌঢ় মিত্তির কাছে পৌঁছে চাপা গলায় বললেন, 'অসম্ভব, এই কলেজে মেয়েকে পড়ানো যাবে না। আবহাওয়া খুব বদ হয়ে গিয়েছে।'

বসুবাবু মাথা নাড়লেন, 'এই কথাই হচ্ছিল। মেয়ের মায়ের মন্ত্রণা শুনে বি-এ ক্লাসে ভর্তি করেছিলাম। এখন ঠিক করেছি বিয়ে দিয়ে নিস্তার নেব।'

ঘোষবাবু কথা বলেন স-স করে। বললেন, 'আবহাওয়া এমন ছিল না। আজ ট্র্যাম রাস্তাটা পার হবার পর থেকেই ব্যাটারা আওয়াজ দিয়ে কান ঝালাপালা করে ফেলল। দুধের মেয়েকে কোলে নিয়ে যান দাদু, ও খুকী দুধু খাবি ? এসব কি কথা, অ্যাঁ ?'

বসুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কটিসের ছেলে সব ?'

'নয়তো কি ?'

'তাহলে এক কাজ করলে হয়। চলুন সবাই মিলে প্রিন্সিপ্যালের কাছে নালিশ করি। কটিশের একটা ইজ্জত আছে। এখানে যদি মেয়েদের সম্মান না থাকে তাহলে আমরা তাদের পড়তে পাঠাবো না।'

চ্যাটার্জিবাবু মুখ খুললেন, 'গতকাল বাড়িতে তুলকালাম কাণ্ড। মেয়ে তার মাকে বলেছে বাবাকে নিষেধ করো আমার সঙ্গে কলেজে যেতে। সবাই ঠাট্টা করে, বলে আমি এখনও দুধের মেয়ে, খুব লজ্জা করে।'

মিত্তিরবাবু চোখ কপালে তুললেন, 'বলেন কি ? আইবুড়ো মেয়ে একা কলেজে আসতে চাইছে ? উঃ, দেশ স্বাধীন হবার ফলটা দেখছেন ?'

বসুবাবু চোখ তুলে বললেন, 'ওই যে, এনাদের জন্যে, দেখছেন ?'

প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা একসঙ্গে তাকালেন। একটি মেয়ে দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলে কলেজের গেট দিয়ে ঢুকে গেল। মিত্তিরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই রিফ্যুজি।'

'তা নয়তো কি।' চ্যাটার্জি মুখ বেঁকালেন, 'এই বাঙালগুলো এসে দেশটাকে উচ্ছন্নে নিয়ে গেল। পাকিস্তানিরা পেঁদিয়েছে আর হুড়মুড় করে চলে এল এদেশে। জহরলাল আর বিধান রায় যে কেন এদের ঢুকতে দিল।'

বসুবাবু বললেন, 'বিধান রায়কে দুষছেন কেন মশাই, হাজার হোক উনি বাঙালি।'

'বাঙালি!' মিত্তিরবাবু গর্জে উঠলেন, 'বাঙালির কোন ঐতিহ্য এদের মধ্যে আছে ? বাপ বসে গেছে ফুটপাতে কাটাকাপড় বিক্রি করতে, যাদবপুর গড়িয়ায় যান, দেখবেন জমি দখল করে কলোনি বানাচ্ছে সব। তাদের ঘরের মেয়েরা স্কুল পার হতেই মেমসাহেব হয়ে গেছেন সব। ড্যাংডেঙিয়ে কলেজে ঢুকছেন বর খুঁজতে। আর এরাই আমাদের মেয়েগুলোর মাথা খাবে মশাই। চলুন, যাবেন তো প্রিন্সিপ্যালের কাছে ?'

অতএব যাওয়া হল। সাতজন অভিভাবক মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর তাঁর ঘরে ডাক পেলেন। এই কলেজের প্রিন্সিপ্যালের খ্যাতি আছে প্রশাসক হিসেবে। কখনও কোন অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করেন না। রাশভারি ভদ্রলোকটি অভিভাবকদের আসন গ্রহণ করতে বলে আগমনের কারণ জানতে চাইলেন। অভিভাবকদের মধ্যে বসুবাবু আবাল্য ইংরেজি খবরের কাগজ পড়ছেন। অন্যদের পৈতৃক অবস্থা ভাল থাকায় বেশিদূর পড়াশুনার সুযোগ হয়নি। তাছাড়া বাঙালির সঙ্গে ইংরেজি বলতে বাঙালি যে সুবিধে পায় ইংরেজের সঙ্গে তা পাওয়া যায় না। অতএব দলের হয়ে বসুবাবু কথা শুরু করলেন, 'স্যার, আমাদের মেয়েরা আপনার কলেজের ছাত্রী। স্কটিশ কলেজের একটা সুমহান ঐতিহ্য আছে। আমরা সবাই উত্তর কলকাতার অত্যন্ত ঐতিহ্যশালী পরিবারের মানুষ। ইচ্ছে করলে আমরা বেথুন

কলেজে মেয়েদের ভর্তি করতে পারতাম। কিন্তু সেখানকার পড়াশুনার আবহাওয়া ঠিক না থাকায় আমরা আপনাদের এই কলেজে ভর্তি করেছিলাম।' বসুবাবু খুব ভেবেচিন্তে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছিলেন এবং সেটা করতে পেরে আনন্দবোধ হচ্ছিল তাঁর।

প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনাদের সমস্যাটা কি?'

বসুবাবু চটপট জবাব দিলেন, 'ছেলেরা।'

'ছেলেরা মানে?'

'আপনার কলেজের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করছে।'

'সেকি? কোন্ ছেলেরা?' তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন প্রিন্সিপ্যাল।

'নাম জানি না স্যার। কিন্তু কলেজ শুরু হবার সময় আপনি যদি মেইন গেটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন।'

'নাম বললে আমার সুবিধে হত। আচ্ছা কি ধরনের অশ্লীল আচরণ করে?'

'খারাপ খারাপ মন্তব্য দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়। একা পেলে কথা বলতে চায়।'

'কি কথা বলে?'

'তা জানি না স্যার। মানে আমাদেব মেয়েরা ওদের কথা বলতে সুযোগ দেয়নি।'

প্রিন্সিপ্যাল অবাক হলেন, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এটা কো-এডুকেশনাল কলেজ। ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক। আমি নিজে ওদেব কথা বলতে দেখেছি কিন্তু সেই মেয়ে তো কোন কমপ্লেন করেনি।'

মিত্তিরবাবু আর পারছিলেন না, এবার বলে ফেললেন, 'ওরা বাঙাল স্যার।'

'বাঙাল?'

'রিফ্যুজি ফ্রম ইস্টবেঙ্গল। নো কালচার নো ব্যাকগ্রাউন্ড।'

প্রিন্সিপ্যাল মাথা নাড়লেন, 'আপানাদের এইসব কথা খুবই অযৌক্তিক। যখন মেয়েকে এই কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন তখন জানতেন যে এখানে ছেলেরা পড়ে। ছেলেদেব সঙ্গে কথা বললে যদি আপনাদের আপত্তি হয় তাহলে আপনারা মেয়েদের এই কলেজ থেকে নিয়ে যেতে পাবেন। আর যদি সত্যি কোন ছেলে আপনাদের মেয়েদেব সঙ্গে খাবাপ ব্যবহার করে তাহলে প্রমাণ দিন, আমি ব্যবস্থা নেব। আর হ্যাঁ, আমি কাল কলেজ গেটে থেকে দেখব কে কি কবছে। এবার আসতে পাবেন আপনাবা?' যে শ্লিপে নিজেদেব নাম লিখে দিয়েছিলেন অভিভাবকরা সেটি তুলে নিয়ে বেল বাজালেন প্রিন্সিপ্যাল

এর একঘণ্টা পরে প্রতিটি ক্লাসে নোটিশ গেল। এই এই নামেব অভিভাবক অভিযোগ করছেন যে এই কলেজের ছাত্ররা তাঁদের মেয়েদের বিরক্ত করে। যদি এমন ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন।

ছাত্রদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল। যে সব ছেলে নিতান্তই নিরীহ তারা গা করল না। কিন্তু ব্যাপারটা ছাত্র-ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে গেল। তারা সিদ্ধান্ত নিল দোষী ছেলেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। এখন পর্যন্ত ছাত্র-ইউনিয়নে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব বড় চোখে পড়ে না। মায়া চ্যাটার্জি নামেব একটি মেয়ে, যে পড়াশুনায় যথেষ্ট ভাল এবং উত্তর কলকাতার মানুষ হয়েও ব্যতিক্রম, ছেলেদের সঙ্গে নানা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়, তার ওপর দায়িত্ব পড়ল ওই অভিভাবকদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার। মায়া সম্পর্কে বেশিরভাগ মেয়ে এক ধরনের ঈর্ষা লালন করে। চোখেমুখে কথা বলে যে মেয়ে, বামপন্থী মানসিকতায় যে উজ্জীবিত, ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে অত্যন্ত সাবলীল কথা বলতে যার অসুবিধে হয় না তার সম্পর্কে উত্তর কলকাতার একান্নবর্তী প্রাচীন ঘরানায় মানুষ হওয়া

মেয়েরা কিছুতেই সহজ হতে পারে না। তারা যখন কমনরুমে বসে শাড়ি রান্না এবং ছেলেদের চাহনি নিয়ে পরস্পরের মত বিনিময় করে তখন মায়া ছেলেদের সঙ্গে মিছিল করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে, ইউনিয়ন অফিসে বসে তুই তোকারি করে। মায়াকে নাকি রাত আটটাতেও ট্রামে দেখা গেছে। সন্ধের পর কলকাতার বাসে ট্রামে মহিলাদের একা দেখতে পাওয়া এখনও বিরল ঘটনা। দিনের বেলায় মা-মাসীমার সঙ্গে দর্জিপাড়া থেকে ঝামাপুকুর ট্রামে যাওয়া চলতে পারে কিন্তু আলো নিবলেই একজন ব্যাটাছেলে সঙ্গে না থাকলে কেউ পথে নামবে না। এরকম পরিস্থিতিতে মায়া নাকি রাত্রে একাই যাওয়া আসা করে। এমনকি কলকাতার সবচাইতে খারাপ জায়গা ধর্মতলাতেও মায়া একা যায়। মায়ার সঙ্গে মেয়েদের কিছু অংশের ভাব আছে। এরা পাকিস্তান থেকে আসা মেয়ে। অবশ্য মায়ার মত সাহসী নয় এরা কিন্তু মায়া ওদের পছন্দ করে।

পাকিস্তান থেকে আসা মেয়েদের কথা শুনলে ভীষণ মজা পায় সবাই। তাদের ব্যঙ্গ করতে চেষ্টা করে সময় পেলেই। অনেকে পাকিস্তানের মেয়েদের বাঙালি বলতে রাজি নয়। যারা লিখিত বাংলা ভাষায় কথা বলে না তারা বাঙালি নয়, এইরকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে। এখনও সংখ্যায় পাকিস্তানের মেয়ে খুব কম। দলে যারা ভারি তাদের শাসন চলে কমনরুমে। কিন্তু যেসব পাকিস্তানী মেয়ে এই কলেজে ইতিমধ্যে দুটি বছর পড়ে ফেলেছে তারা অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। আজ তারাই সেই মেয়েদের পেছনে লেগেছিল যাদের অভিভাবকরা প্রিন্সিপ্যালের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন। মেয়েগুলো মুখ-চোখ লাল করে বসেছিল। ওদের মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব মেয়ে কত সুবিধে ভোগ করে থাকে শুধু তারাই যেন এক বন্দীদশায় দিন কাটাচ্ছে। এইসময় মায়া এল কমনরুমে। এসে টেবিল বাজিয়ে চিৎকার করে বলল, 'বন্ধুগণ তোমরা একটু মন দিয়ে শোন। কয়েকজন অভিভাবক প্রিন্সিপ্যালের কাছে অভিযোগ করেছেন যে, এই কলেজের ছাত্ররা তাঁদের মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেছে। এ ব্যাপারে ছাত্র-ইউনিয়ন ব্যবস্থা নিতে চায়। আমি সেই সব মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই যাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।'

কিন্তু দেখা গেল কেউ জানে না কার অভিভাবক এই কাণ্ডটি করেছেন। তবে কেউ মনে করতে পারল না কোন ছেলে তাদের অপমান করেছে কিনা। মায়া হাসল, 'তোমরা ছেলেদের সঙ্গে যত দূরত্ব রাখবে তত তাদের খারাপ বলে মনে হবে। এ ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যারা কলকাতায় জন্মেছ এবং বড় হয়েছ তাদের নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে।'

এই আটটি মেয়ে সেদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই কিছু ঘটনা ঘটেছিল। দেখা গেল বসুবাবু আর চ্যাটার্জিবাবু তাঁদের মেয়েদের ছাতির আড়াল দিয়ে কলেজে নিয়ে আসছেন। তিনটি মেয়ে একা একাই কলেজে ঢুকছে। আর বাকি তিনজন কলেজে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের অভিভাবকরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে হয়তো অন্য কলেজে মেয়েদের ভর্তি করিয়েছেন। মাসখানেকের মধ্যে জানা গেল ওই তিনজনের একজনের বিয়ে।

প্রেসিডেন্সি কিংবা ব্রেবোর্ন নয়, দীপা ভর্তি হয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজে। সুভাষচন্দ্রই ব্যবস্থা করেছিলেন। মিশনারি স্কুল, পড়াশুনার আবহাওয়া রয়েছে, বিখ্যাত মানুষেরা পড়েছেন এককালে। তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের এক পরিচিত ভদ্রলোকের সূত্রে অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে তিনি দীপাকে রাজি করিয়েছেন স্কটিশে পড়তে। সুবিধে এই যে স্কটিশের নিজস্ব মেয়েদের হোস্টেল রয়েছে যা হাঁটাপথে কলেজ

থেকে মিনিট পাঁচেকের। আর সুভাষচন্দ্রের বাসা এই তল্লাটেই, বিপদে আপদে চটপট যোগাযোগ হবে।

কলেজে ভর্তি হবার পর এইসব নাটক দেখে কলকাতা সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা তৈরি হচ্ছিল দীপার। জলপাইগুড়ির মত মফস্বল শহরে মেয়েরা অভিভাবকের যতটুকু আস্থা বা বিশ্বাস পেয়ে থাকে কলকাতায় তা পায় না দেখে সে অবাক হল। জলপাইগুড়ির রাস্তায় খুব খারাপ দেখাত যদি কোন মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলত তাহলে তার বদনাম হত।ছেলেটি হত ঈর্ষার বস্তু, কিন্তু তার গায়ে বদনামের গন্ধ বড় একটা লাগত না। কিন্তু কখনই কোন অভিভাবক বি· এ ক্লাসের ছাত্রীকে ছাতা মাথায় করে কলেজে পৌঁছতে যেত না। ব্যাপারটা স্কুলের শেষ ক্লাসেই শেষ হয়ে যায়। অথচ কলকাতায় এখনও সেটা হচ্ছে আর তাই নিয়ে কলেজে তোলপাড়ও হয়। কলকাতার ছেলেমেয়েরা খুব আধুনিক, নিত্যনতুন স্টাইলের জন্ম এই শহরে, শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান ইত্যাদি গল্প তারা ছেলেবেলা থেকে শুনেছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এর অনেকটা সত্যি হলেও পাশাপাশি একটা অন্ধকূপ মানসিকতা কলকাতা বহন করে চলেছে। কয়েক বছর আগের মনোরমার মানসিকতার সঙ্গে যার কোন তফাত নেই। এইরকম অবস্থায় মায়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। কোনরকম আড়ষ্টতা ছাড়াই একটি মেয়ে ঘুরে বেড়ায়, স্পষ্ট কথা বলে এবং তার জন্যে কোন অনুশোচনা করে না, রমলা সেনের পরে এমন কাউকে তো সে দ্যাখেনি।

হোস্টেলের নাম ডানডাস। বাঙালি মেয়েরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু বেশ কিছু শিলং এবং গ্যাংটকের মেয়েও স্কটিশে পড়তে এসেছে। অবশ্য তারা বেশিরভাগ সময় থাকে দল বেঁধে, কথা বলতে চায় ইংরেজিতে। বাঙালি মেয়েরা এদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না ইংরেজি বলতে হবে বলে। বাঙালি মেয়েরা এসেছে বিভিন্ন জেলা অথবা অন্য প্রদেশ থেকে। তাদের প্রত্যেকের অবস্থা যে ভাল তা জিনিসপত্র এবং সাজগোজ দেখলেই বোঝা যায়। এই হোস্টেলের কেউ গামছা ব্যবহার করে না। কিন্তু শৈশব থেকে তোয়ালে ব্যবহার করার অভ্যেস দীপার হয়নি। দ্বিতীয় দিনেই স্নানের ঘরে যাওয়ার সময় নীনা নামের একটি মেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল, 'এম্মা, তুমি গামছা ব্যবহার কর ?'

'হ্যাঁ, কেন ?'

'ইস। চটচটে লাগে না ? মুখ ঘষে যায় না ? ওটা তো একটুও সফট্ নয়।'

'আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'আমি বাবা মরে গেলেও গামছায় মুখ মুছতে পারব না।'

দীপার তোষক খুবই পাতলা, সেই জলপাইগুড়ির কলেজে যাওয়ার সময় অঞ্জলি একটা পুরনো তোষক দিয়েছেন ব্যবহার করতে, সেটাকেই কলকাতায় নিয়ে এসেছে। তার ওপর যে সুজনি দু'দিন অন্তর পাল্টায় সে-দুটোও সাধারণ। এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামানোর চিন্তাও হয়নি। যারা ঘামায় তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটা দূরত্ব তৈরি হল তার। হোস্টেলের প্রথমদিন তার সঙ্গে যে মেয়েটিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার বাবা কি করেন ?'

'চা-বাগানে চাকরি করেন।'

'চা-বাগান ? মানে টি-এস্টেট ? তোমার বাবা টি-এস্টেটের মালিক ? দারুণ ব্যাপার। আমি একবার দার্জিলিঙ-এ যাওয়ার সময় টি-এস্টেট দেখেছি।'

'না, মালিক নন, আমার বাবা একটা চা-বাগানে চাকরি করেন। আমরা বড়লোক নই,

তুমি যা ভাবছ ।'

'তাহলে তুমি কলকাতায় পড়তে এলে কি করে ?'

'এলাম ।' দীপা হেসেছিল, 'আসা হয়ে গেল ।'

'কলকাতায় এর আগে এসেছ ?'

'না । পরীক্ষাব পর বাবার অসুখের সময় প্রথম এলাম ।'

'কি অসুখ ?'

'হার্টের গোলমাল ।'

মেয়েটি খুব গম্ভীর হয়ে গেল । এবং তারপরেই সে ঘর পাল্টালো । মুখে বলল 'আমি রাস্তার দিকে ঘরে যাচ্ছি । এখানে একদম আলো ঢোকে না ।'

দীপা কিছু বলেনি । কথাটা নেহাতই মিথ্যে তা মেয়েটিও জানে । সে ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে এই মেয়েটি এক অত্যন্ত বড়লোকের মেয়ে এবং তার বাবা শিক্ষা দিয়েছেন অসমশ্রেণীব কোন মেয়েব সঙ্গে না মিশতে ।

প্রথমদিনেই আব একটি ঘটনা ঘটেছিল । দীপার ডাক পড়েছিল সুপারের ঘবে । তিনি সুভাষচন্দ্রের ভর্তি কবা ফর্মটি এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বি· এ· ক্লাসে পডতে এসেছ, মন দিয়ে ফর্ম ফিল-আপ কবতে পাবো না ?'

ফর্ম তুলে নজব বুলিয়ে ভুল ধবতে পারেনি দীপা । মাথা নেড়ে বলেছিল, 'আমি কোন ভুল পাচ্ছি না । ঠিকই তো বয়েছে ।'

'তোমাব নাম কি ?'

'দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায় ।'

'তাহলে তোমাব বাবাব উপাধি মুখোপাধ্যায হয় কি করে ?'

দীপা ঠোঁট কামড়ালো । এই প্রশ্নটি তাকে জলপাইগুড়ির কলেজ হোস্টেলে কখনও শুনতে হয়নি । হয়তো ভর্তিব সময অমরনাথ বড়দির সঙ্গে কথা বলেছিলেন । কিন্তু যতই সে ভুলে যাক, সত্য সত্য হয়েই বেবিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায় । গম্ভীর মুখে দীপা বলল, 'এখানে কোন ভুল নেই ।'

'মানে ?' সুপার অবাক, তুমি, তুমি ম্যারেড ?'

'আমাকে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ।'

'তাহলে লেখনি কেন তুমি ম্যাবেড ?'

'বিয়ের একদিন পরে সেই ছেলেটি মারা যায় ।'

'আই সি । আই অ্যাম সরি । আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি', কিন্তু সত্যি কথাটা লিখতে পারতে, তুমি উইডো ।'

'আমি নিজেকে সেটা মনে করি না ।'

'বুঝতে পারছি না তোমার কথা ।'

'আপনাকে বললাম, আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল । আমার তখন বারো বছর বয়স । বোঝার আগেই সব ঘটনা ঘটে গেল । যেহেতু বাবা স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেটে বন্দ্যোপাধ্যায় রেখেছিলেম তাই এখনও আমাকে ওটা লিখতে হচ্ছে । কিন্তু আমি এখনও কুমারী, মনের দিক থেকেও তাই ।'

ফর্ম ড্রয়ারে রেখে সুপার বললেন, 'লেটস ফরগেট দিস । তোমার রুমমেট দু ঘণ্টার মধ্যে কেন রুম চেঞ্জ করতে চাইল ।'

'আমি জানি না, এটা ওর সমস্যা ।'

'হুঁ। ঠিক আছে যাও।' কথাটা শোনামাত্র দীপা পা বাড়াচ্ছিল, পেছন থেকে আবার ডাক এল, 'শোন, রুমমেট হিসেবে একটি বিদেশী মেয়েকে পেলে তোমার কি খুব অসুবিধে হবে ? আমি সাধারণত ওদের এক ঘরে রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু এই মেয়েটি একা হয়ে গিয়েছে।'

'আমার কোন অসুবিধে হবে না যদি কেউ অসুবিধে তৈরি না করে।'

সন্ধের মুখে চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়েছিল দীপা। পাশের তক্তপোশ খালি। এখনও হোস্টেলের কোন মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়নি। জলপাইগুড়ির হোস্টেলের থেকে এখানকার আবহাওয়া একটু আলাদা। মেয়েদের মধ্যে একটা স্বাধীন স্বাধীন ভাব দেখা যাচ্ছে। কথাবার্তা বলছে উঁচু গলায়। স্বভাবতই এরা পুরোনো মেয়ে। আর একটা তফাত পোশাকের। জলপাইগুড়িতে কুড়ি একুশ বছরের কোন মেয়ে স্কার্ট পরত না।

হঠাৎ দীপার মন ভারি হয়ে উঠল। কবেকার সেই ব্যাপারটা এখনও তার পিছু ছাড়ছে না। চোখ বন্ধ করল দীপা। এই হোস্টেলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার পার্থক্য, সে বিধবা। যতই অস্বীকার করুক, নিজের মনে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিক, সমস্ত অতীত তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলছে, তুমি বিধবা। আর পাঁচটা মেয়ে এখন যে হাল্কা মনে ঘুরে বেড়াবে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান রঙিন স্বপ্ন দেখবে—তার ক্ষেত্রে সেসব ভাবাই যেন অনুচিত। আর যদি সে ভাবতেও চায়, দীপা কেঁপে উঠল। একসময় সুভাষচন্দ্র তার জন্যে সম্বন্ধ খুঁজেছিলেন। বেশীর ভাগ পাত্র বয়স্ক, স্ত্রী মরে গেছে সন্তান রেখে। একটা স্বাভাবিক ছেলে যার সঙ্গে এই হোস্টেলের যে কোন মেয়েকে যুক্ত করা যায় দীপা যেন আশা করতে পারে না। আর আশা করলেও ছেলেটি যখন জানবে তার বিয়ে হয়েছিল তখন অবশ্যই প্রতিক্রিয়া হবে। সে যে কুমারী, স্বামীর সঙ্গ তাকে কোনভাবেই নষ্ট করেনি একথা বোঝাবে কে ? বন্ধ চোখের পাতায় চলকে উঠল সে অসুস্থ তরুণের মুখ। কি যন্ত্রণা নিয়ে পিতৃ-আদেশ পালন করতে মরীয়া হয়ে উঠেছিল ফুলশয্যার রাত্রে। দীপার ধাক্কায় ছিটকে পড়েই আহত টিকটিকির মত নেতিয়ে গিয়েছিল। যার শরীরে কয়েকটা হাড় চামড়ায় আটকানো রয়েছে শেষ অবস্থায় তাকে অনুরোধ করেছিল প্রতুলবাবুকে মিথ্যে কথা বলতে। কেন ? নিজের অক্ষমতার লজ্জা ঢাকার জন্য ? হঠাৎ দীপার আর একটা কথা মনে এল। অতুল কি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল ? প্রতুলবাবুর স্বভাব জানা থাকায় সে কিছুদিন ওই কথা বলে তাকে নিশ্চিন্ত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিল ?

কিন্তু আজ নতুন করে এই চিন্তাটা মাথায় এল কেন ? সে কি নিজেই নিজের অতীতটাকে ভুলতে পারছে না ! যে জীবন সেই ফুলশয্যার রাত্রেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাকে অনেক বাঁক পেরিয়ে আজ কলকাতায় এনেও কেন অস্বস্তি হচ্ছে ! এক ঝটকায় সে উঠে বসল। তার বয়সের একটি মেয়ে যদি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তাহলে সেই স্বপ্নে কেন একটি সহজ ছেলের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করার কথা আসবে ! বিয়ে ছাড়া কি মেয়েদের কোন কিছুতেই পূর্ণতা নেই ? একটি মানুষের অনেক কাজ থাকে, সেই কাজে আনন্দ আসে সার্থক হলে, সেই সার্থকতার জন্যে কি বেঁচে থাকা যায় না। আর তখনই তার রমলা সেনের কথা মনে পড়ল। পঞ্চাশের দশকেও শিলিগুড়ির মত শহরে বিবাহিতা না হয়েও একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বাস করতে কতখানি সাহসের দরকার হয়। এটা সাহস না ব্যাভিচার এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। দীপার সেই মুহূর্তে মোটেই পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা। তার দেখা শোনা জগতের নিয়মের এটা ব্যতিক্রম। দীপার প্রশ্নের উত্তরে রমলা সেন জবাব

দিয়েছিলেন, 'আমাদের যেমন অনেক ব্যাপারে মিল তেমন বহু ব্যাপারে আকাশ পাতাল ফারাক। এই অবস্থায় কিছুদিন ভাল থাকা যায় কিন্তু চিরকাল থাকতে গেলে অশান্তির আগুনে জ্বলতে হবে।' তাই যদি হয় তাহলে কিছুকালের জন্যেও এক সঙ্গে থাকা কেন ? শুধু বন্ধুত্ব কি একসঙ্গে থাকার অধিকাব দেয় ? তৎক্ষণাৎ একটা বিপরীত চিন্তা মাথায় এল। দুটি পুরুষ অথবা দুটি মেয়ে যদি বন্ধুত্বের সুবাদে একসঙ্গে থাকতে পারে এবং তাতে ন্যায়নীতি গোল্লায় না যায় তাহলে একই বন্ধুত্ব নিয়ে দুটি নারীপরুষ যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে অপরাধটা কোথায় ? শিলিগুড়িতে রমলা সেনের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় মনে যে বিরূপ ভাবনা এসেছিল এতদিন নিজের অজান্তে সে তাকেই লালন করে চলেছিল। আজ মনে হচ্ছে বিপরীত দিকও আছে। সত্যি, আজ যে ধারণাটাকে সঠিক বলে মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনদিন তাই বেঠিক হয়ে যেতে পারে। হয়তো এরই নাম আধুনিকতা, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা।

দীপার মনে হল বাইরের পৃথিবীর কৌতূহল থেকে অমরনাথ তাকে বক্ষা করতে পারতেন। বিয়ে এবং বিধবা হবার পর তিনি যদি মুখার্জি পাল্টে ব্যানার্জি না করতেন তাহলে আজ সুপাবেব ঘরে তাক ডাক পড়ত না। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবনা এল। যা হবার হয়েছে, সত্যিটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে অসুবিধে কোথায় ? সে কি বলল তাই নিয়ে মন খারাপ করাব মত মন না রাখলেই হয়। সুপারের কাছ থেকে যদি হোস্টেলের মেয়েরা ঘটনাটা জেনেও যায় তাতেই বা তার কি এসে যাবে। যার মনে হবে তার সঙ্গে মেশা যায়, সে মিশতে পারে।

একটু হালকা হল মন। অমবনাথের নামটা আসতেই অঞ্জলির কথা ভাবল দীপা। এতদিনের সম্পর্ক, তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে যে মহিলার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী আজ তার সঙ্গেই দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল। জলপাইগুড়ি ´কলেজ থেকে মার্কশীট নিয়ে একা চা-বাগানে ফিরে গিয়ে সে অনেক কান্নাকাটি করেছিল অঞ্জলির মন পেতে। প্রতুলবাবুব দেওয়া ব্যাঙ্কে জমা রাখা টাকার জন্যে তার কোন লোভ নেই। অমরনাথ তাকে জানিয়ে ব্যাঙ্ককে ওই নির্দেশ দেননি। এইসব কথা অনেকবার বলেও বিশ্বাস করাতে পারেনি সে অঞ্জলিকে। তার বদ্ধ ধারণা মেয়ে বাপকে দিয়ে এই কাজটা করিয়েছে বিদ্যেধরী হবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত দীপা বলেছিল, 'আমি চেক বইতে সই করে দিচ্ছি কিন্তু তাতে বাবারও সই লাগবে। তুমি কলকাতা থেকে বাবার সই নিয়ে এসে টাকা তুলে নাও।'

অঞ্জলি মুখ বিকৃত করে বলেছিল, 'আমি বিধবা হয়ে লোকের বাড়িতে দাসীগিরি করে দুই ছেলেকে মানুষ কবব তাও ভাল, কিন্তু ওই টাকা পায়ের নখ দিয়েও স্পর্শ করব না। ষড়যন্ত্র। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিস তোরা ! কি পেয়েছি আমি এই সংসার থেকে ?'

দীপা বলে ফেলেছিল, 'এটা ঠিক বলছ না। এতদিন তো তোমাকে খুব কষ্টে দিন কাটাতে দেখিনি। তখন যে ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিলে আজ হঠাৎ সেটাকে খারাপ বলার কোন মানে হয় না।'

'ও তা তো বলবি। তোর মা যখন মারা গেল, বাপ যখন দায় নামাল তখন কাকের ডিম ভেবে নিয়ে এসেছিলাম আজ তো কোকিল হয়ে আমাকে উপদেশ দিবি ! তোর কি ! পাশ করেছিস, চাকরি জুটিয়ে নিয়ে ফুর্তি করবি আর আমার ছেলেদুটো লোফার হবে, ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে উনি চলে গেলে। ওই মানুষটা তোর জন্যে এত করল আর তাকে বাঁচাবার জন্যে তুই কিছু করেছিস ? পরের সন্তান চিরদিনই পর তাকে আপন করতে যাওয়া বোকামি।'

সেই রাত্রে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল দীপা। অঞ্জলির মত শান্ত ভালবাসাময় মানুষ আচমকা আমূল পাল্টে গেল। কোন কথাতেই তার মন ভিজল না। স্পষ্ট বলে দিল, 'মার্কশীট পেয়ে গেছ, তোমার মামা তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেবে বলেছে আর কি চাই। দয়া করে কালই কলকাতায় চলে যাও। আমাকে আমার মত থাকতে দাও।'

কিভাবে দীপা কলকাতায় এসেছিল তা অন্য কথা। কিন্তু যে সত্যটা সে আবিষ্কার করল, তা তার কাছে সারাজীবনের শিক্ষা হয়ে গেল। স্বামী স্ত্রী সন্তান অথবা বন্ধুর মধ্যে যতক্ষণ অল্পস্বল্প সংঘাত হচ্ছে ততক্ষণ তারা একটা মানিয়ে নেবার আবহাওয়া তৈরী করে বাস করতে পারে। কিন্তু যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বার্থে আঘাত লাগে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বলে ধারণা তৈরী হয় তখন তার মানিয়ে চলার মুখোশটাকে একটানে ছিঁড়ে ফেলতে সে একটুও দ্বিধা করে না। নিজের শরীর এবং মনের বাইরে আর একটি মানুষের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে কিছু সম্পর্কের ভিত্তিতে। স্ত্রী যখন বাথরুমে একা থাকেন তখন তিনি তাঁর মত। স্বামীর অনেক আচরণ শুধু স্বামী বলেই মেনে নিচ্ছেন এমন ভাবনা সেখানে বসে লালন করতে করতেও বিরক্ত হতে পারেন। সেই বিরক্তিটা ওই মুহূর্তে কারও নজরে পড়ার কথা নয়। বাইরে বেরিয়ে এসে সামান্য মান অভিমানের মাধ্যমে একটা সেতু হয়তো তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু আমাব শরীব আমার মন একান্ত আমারই এই বোধ তো আমৃত্যু দূব হবার নয়। যে মানুষটির শরীরে জন্ম হয় যার কাছে জীবনধারণের কৃতজ্ঞতা আকাশ ছোঁয়া, বয়স হলে শরীরের অন্য কোষগুলো জাগ্রত হলে তাকে সরিয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আসক্তি তৈরী হয় তাও ওই নিজের মন আর শরীরের সুখের কারণে। সেই সুখ বিপন্ন হতে চললে প্রতিটি মানুষের মুখে ড্রাকুলার মত দুটি ধারালো দাঁত মাথা চাড়া দেয়।

অমরনাথ আপাতত সুস্থ। দিন সাতেক আগে সুভাষচন্দ্র তাঁকে এবং মনোরমাকে নিয়ে চা বাগানের বাড়িতে রেখে এসেছেন। জলপাইগুড়ি থেকে আসার পরে সে মনোবমাব কাছে সমস্ত ঘটনা বলে কেঁদে ফেলেছিল। মনোরমা চুপ করে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ বাদে বলেছিলেন, 'তুই কোন অন্যায় করিসনি।'

যাওয়ার দুদিন আগে দীপা অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিল সে কলকাতায় পড়বে কি না। চিকিৎসার জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, যে ঋণ করতে হয়েছে তা ওই ব্যাঙ্কের টাকায় শোধ দিতে সে আগ্রহী। অমরনাথ বলেছিলেন, 'তাহলে এত কষ্ট করে তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন ? চা-বাগানেই আমি স্বস্তিতে মরতে পারতাম।'

'মানে ?' অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপা।

'আমি যা করেছি তা অনেক ভেবেচিন্তে করেছি। তুমি কলকাতার কলেজে ভর্তি হবে আর এ ব্যাপারে আমি কোন আলোচনা করতে চাই না। তুমি আমার হাতে ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দিয়ে চিঠিটা লিখে দাও।'

চুপচাপ শুয়ে থাকল দীপা। সুভাষচন্দ্র ফিরে এসে জানিয়েছিলেন অমরনাথ খুব ভাল নেই। এখনও চাকরিতে যোগ দেননি। কিছুদিনের মধ্যে যোগ দিতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বারংবার বলে দিয়েছেন দীপা যেন মন দিয়ে পড়াশুনা করে। অন্য কোন ব্যাপারে তার চিন্তা করার দরকার নেই। অমরনাথের মানসিকতা বুঝতে পারছে দীপা। কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে ভদ্রলোক কোন বাধা মানবেন না।

হঠাৎ ঘরের দরজায় শব্দ হল। হোস্টেলের বুড়ো বেয়ারা রেডিও আর স্যুটকেস নামিয়ে রেখে চলে গেল। এবং তারপরেই বাইরে একটি মেয়ের গলা শোনা গেল, 'দিস ইজ মাই রুম ?'

'জী মেমসাব।'

চোখ মেলে তাকাল দীপা।ঘরের দজরায় যে দাঁড়িয়েছে এসে তার উচ্চতা অন্তত পাঁচ ফুট আট। সুন্দর ফিগার। পরণে প্যান্ট'সার্ট, কাঁধে ব্যাগ। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। মাথার চুল কুঁকড়ে এঁটে বসেছে। নাক চ্যাপ্টা কিন্তু দাঁতে সহজ হাসি। মেয়েটি এগিয়ে এল, 'হেলো। আই অ্যাম গ্লোরিয়া। ইউ লিভ হিয়ার ?'

উঠে বসে দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। গ্লোরিয়া হাত বাড়াল, 'দেন আই অ্যাম ইওর রুমমেট। আই অ্যাম ফ্রম জাম্বিয়া।'

নরম হাতে হাত মেলাল দীপা। তারপর বলল, 'আই অ্যাম দীপাবলী।'

'দী-পা-বলী ! হাউ সুইট। হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট ?'

॥ ৩০ ॥

এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা এতকালের চেনাজানা মানুষ এবং তাদের আচরণে যে অভ্যাস তৈবি হয়েছিল তাব সঙ্গে কোন সাযুজ্য নেই গ্লোরিয়ার আচরণে। এতকাল দীপার মনে হত বাঙালি মেয়ে হিসেবে এত অল্প বয়সে সে এমন অনেক কাজ করেছে যা সাধারণ নিয়মের মধ্যে পড়ে না। স্বাধীনতার দশ বারো বছর পরেও মেয়েরা শুধু মেনে নিয়ে বেঁচে থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। 'অনেক' ব্যাপাবে জিভে কেন শব্দটি উঠে এলেও তারা সেটাকে গিলে ফেলতে পারলে বেঁচে যায়। মাঝে মাঝে এই ধারণাও তীব্র হয়েছে যে মেয়েদের বড় শত্রু হল মেয়েবাই। নলিনী কিংবা আনা জানত কি জন্যে তাকে ওই বয়সে বউ করে আনছেন প্রতুলবাবু। তারা এও জানত অতুলচন্দ্রের স্বাস্থ্য কি বকম সুস্থ। তবু তাবা প্রতিবাদ করেননি। নিজেব স্বার্থে আনা তাব উপকার করেছে, মেয়ে হিসেবে আর একটি মেয়েকে সম্মান জানাতে নয। মনোবমা তার ওপর বৈধবোর নিয়মাবলী চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। সে প্রতিবাদ করেছিল পবে কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সে বিধবার মত জীবন যাপন করুক তা অন্তত অমরনাথ মুখ ফুটে কখনও বলেননি। অঞ্জলিও মনোরমাকে বোঝাতে এগিয়ে যাননি। সে নিজে একটু একটু করে যখন ওইসব নিয়মের পাঁচিল ভেঙে স্বাভাবিক হয়েছিল তখন চা-বাগানের বিভিন্ন কোয়ার্টার্সেব বয়স্করা ঘুরিযে ফিবিযে কথা বলতেন এই নিয়ে। রমলা সেন ব্যতিক্রম। তিনি ঔদ্ধত্য এবং স্বাধীনতা একসঙ্গে ব্যবহার করছেন। এখন মনে হয় তাঁব অনেক কাজের পেছনে কোন যুক্তি নেই। যেভাবে মাঝবাত্রে জঙ্গলের বাস্তায় তিনি অমরনাথেব সাইকেলে চেপে অচেনা বাড়িতে এসে বাত কাটিয়েছিলেন সেটা কোন অবস্থাতেই সমর্থনযোগ্য নয়। একটা বাত গাড়ির মধ্যে কাটালে তাঁর যে ক্ষতি হত সেই একই ক্ষতি অচেনা লোকের সাইকেলে উঠলেও হতে পারত। কলকাতায় এসে বাসাবাড়িতে ওঠার পব যে মেয়েটির সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল সে কিছুটা স্বাধীনতার সুযোগ চুরি করে নিয়েছিল। সিনেমা এবং লুকিয়ে-চুবিয়ে ছেলেদের সঙ্গে মেশার মধ্যে সেই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করে তৃপ্তি পায় সে। কিন্তু তার বাইরে এই কলকাতার মেয়েরা এখনও পর্দাপ্রথায় বিশ্বাস করে। রিকশায় উঠেই মধ্যবয়সী মহিলারাও পর্দা ফেলে দেন সামনে। মির্জাপুর স্ট্রিটে উল্টোদিকের বাড়িতে এক মহিলা সারা দুপুর খড়খড়ি ফাঁক করে রাস্তা দেখতেন, জানলা খুলে দেবার সাহস তার ছিল না মাঝে মাঝে মনে হয় সাহস নয়, সংস্কারে জড়ানো মন প্রতিটি পায়ে আটকে যায়। এই যে অভিভাবকরা ছাতা মাথায় করে কলেজে ছাত্রী পৌঁছে দিচ্ছেন, ছেলে

হলে দিতেন না। হয় তাঁরা মেয়েটিকে সাবালিকা ভাবেন না অথবা সাবালিকা ভাবেন বলেই ভয় করেন। যেন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ তাঁর মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে একা পেলেই এবং সেই ননীর পুতুল তাদের হাতে নিজেকে তুলে দেবে। অথবা এমনও হতে পারে এঁরা নিজেদের মেয়েকেই সন্দেহ করেন যেন ফাঁক পেলেই মেয়েটি কোন গর্হিত কর্ম করতে ছটফট করবে।

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এখনও তার চোখে পড়েনি। বাসে ট্রামে তার বয়সী মেয়ে একা ঘোরে না। সে শুনেছে ঘটিদের বাড়িতে নাকি এ ব্যাপারে আরও কড়াকড়ি। সেখানে দাদার বন্ধুদের দিকেও চোখ তুলে তাকানো নিষেধ। মা মাসি না থাকলে সিনেমায় যাওয়ার কথা কেউ ভাবতে পরে না। এখন অবশ্য বারোতে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় না কিন্তু এদেশের নব্বুইভাগ মেয়ে কুড়িতে পড়তে না পড়তেই কোনরকমে শ্বশুরবাড়িতে চলে যায়।

প্রথম রাতে গ্লোরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে বেশ অসুবিধেয় পড়েছিল দীপা। ইংরেজি বলার একদম অভ্যেস নেই, তার লিখতে আটকায় না। তার ওপর গ্লোরিয়ার কথা বলার ধরন একদম অন্যরকম, একটু জড়ানো আর উচ্চারণও আলাদা। কর্তার পর ক্রিয়া এবং তার কাল নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না সে। মাঝে মাঝে কর্তা ব্যবহার না করে দু-তিনটি শব্দে মনেব কথা বোঝায়। বিছানাপত্র সাজিয়ে জুতো খুলে বিছানায় বাবু হয়ে বসতেই ওর কাছে আর দুটি মেয়ে এসেছিল। তিনজনই লিভিংস্টোন নামে একটা শহরে থাকত। নিজেদের মধ্যে চিৎকার চেঁচামেচি হাসাহাসি করল ঘণ্টাখানেক। গ্লোরিয়া তার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। যে মেয়েটির নাম লুসাকা সে বলল, 'ইওর নেম বিউতিফুল।' গ্লোরিয়া তাকে দীপাবলী শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দিয়েছিল। দীপা জানতে চাইল লুসাকা শব্দটির মানে কি? মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর হাত নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি জানি না। আসলে জাম্বিয়াতে একটা শহর আছে যার নাম লুসাকা। আমার মা সেই শহরের মেয়ে। তাই আমার নাম রেখেছিল লুসাকা।'

এই সময় গ্লোরিয়া একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করল। করে প্রথমে দীপার দিকে সেটা এগিয়ে ধরল। দীপা মাথা নাড়ল, 'আমি সিগারেট খাই না।'

'গুড গার্ল। আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান মেয়েরাই সিগারেট খায় না।' গ্লোরিয়া বন্ধুদের মধ্যে সিগারেট বিতরণ করে নিজেরটা ধরাল, 'কেন বলতো?'

'কোন বিশেষ কারণ নেই। ব্যাপারটা চালু হয়নি তাই।'

এইসময় লুসাকা বলল, 'কিন্তু আমি দিল্লী স্টেশনে একটা মেয়ে ভিখিরিকে সিগারেট খেতে দেখেছি। হ্যান্ডমেড সিগারেট।'

গ্লোরিয়া অবাক হল, 'তাই? তুমি শিয়োর যে মেয়েটা ভারতীয়?'

'নিশ্চয়ই। দিল্লীর স্টেশনে কি বিদেশী মেয়ে ভিখিরি ভিক্ষা করবে?'

দীপা বলল, 'এটা হতে পারে। এদেশের একদম নীচুতলার বিত্তহীন মেয়েদের মধ্যে সিগারেট বিড়ি খাওয়ার রেওয়াজ আছে।'

তৃতীয় মেয়েটি যার নাম খুব খটমটে, হেসে বলল, 'দিল্লীতে একটা একজিবিশনে আমি তিনশ বছর আগের এক রেসপেক্টবল ইন্ডিয়ান লেডির ছবি দেখেছি যিনি স্মোক করছিলেন পাইপের সাহায্যে। লম্বা পাকানো পাইপ।'

গ্লোরিয়া দীপাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তোমার ব্যাখ্যায় গোলমাল থাকছে। বাড়িতে ছেলেরা যদি চোখের সামনে সিগারেট খায়, প্যাকেট টেবিলে ফেলে রাখে, কলেজে ছেলেরা

যদি একসঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে সিগারেট ধরায় মেয়েরা কি হাত গুটিয়ে থাকবে ? ফিফটি পার্সেন্টের হয়তো সিগারেটের টেস্ট খারাপ লাগে বলে খায় না কিন্তু বাকিরা ? সিগারেট খেলে মেজাজ ভাল হয় না ?'

দীপা তখন বোঝাতে বসল। এদেশে বড়দের সামনে ছোটরা সিগারেট ধরায় না কারণ তারা মনে করে নেশার জিনিস বড়দের সামনে খাওয়া অভদ্রতা।

'নেশার জিনিস ?' কথার মাঝখানে বাধা দিল গ্লোরিয়া। 'সিগারেট খেলে কি নেশা হয় ? মাথা ঘোরে ? পা টলে ? কথা জড়িয়ে যায় ?'

'যায় না। কিন্তু এদেশের ছেলেরা কোন যুক্তি ছাড়াই বড়দের সামনে খায় না। আর মেয়েরা তো ভাবতেই পারে না খাবার কথা। যেসব মেয়ে খায় তাদের হয় নিচু শ্রেণীর বলে উপেক্ষা করা হয় না বদচরিত্রের বলে এড়িয়ে যায়।'

লুসাকা চেঁচিয়ে উঠল, 'গুড গড ! তাহলে কি আমাদের সিগারেট খেতে দেখে তুমি খুব খারাপ ভাবছ ?'

দীপা ওর কথা বলার ধরনে হেসে ফেলল, 'আমার কিছুই মনে হচ্ছে না। তবে এই হোস্টেলের কি নিয়ম আমি জানি না রাস্তায় যদি সিগারেট খাও তাহলে লোকে ফিরে ফিরে তাকাবে। অবশ্য বিদেশী বলে তোমরা কিছুটা ছাড় পেতে পার।'

গ্লোরিয়া বলল, 'এটা খুব ফালতু ব্যাপাব। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি খুব বাস্তব মেয়ে। তুমি কেন সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা কর না। আমাদের দেশে এখনও পড়াশুনার চল বেশী হয়নি। বেশীরভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে। কিন্তু তারাও অযৌক্তিক কিছু আঁকড়ে বসে থাকে না।'

দীপা বলল, 'তোমাদেব দেশ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না। শুধু শুনেছি আফ্রিকার মানুষবা মানুষের মাংস খেত।'

তিনটে মেয়ে একসঙ্গে চিৎকাব কবে উঠল। খটমটে নামের মেয়েটি একটু রেগে গিয়ে বলল, 'তোমার কি আমাদেব দেখে ক্যানিবাল বলে মনে হচ্ছে ?'

দীপা লজ্জা পেল, 'আমি বলেছি এমন ঘটনা শুনেছি।'

গ্লোরিয়া বলল, 'খুব মিথ্যে শোননি। একসময় জঙ্গলে এই ধবনেব কিছু আদিবাসী ছিল। এখন সেটা ভাবাই যায় না। তাছাড়া আফ্রিকা একটা বিশাল মহাদেশ। মরোক্কো আলজেরিয়া থেকে সাউথ আফ্রিকাব কেপ প্রভিন্স পর্যন্ত গাদা গাদা দেশ। আচার ব্যবহারে জীবনযাত্রায় প্রচুব পার্থক্য। তাই আফ্রিকার মানুষকে তুমি একই চেহারায় ফেলতে পার না।'

রাত্রে দীপা ওদের সঙ্গে খেতে নামল। সে লক্ষ্য করল অন্য বাঙালি মেয়েরা তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে। তিনটে জাম্বিয়ান মেয়ের সঙ্গে তার কি করে ভাব হল এমন প্রশ্ন সবার মনে। একজন মন্তব্য করল, 'উরিব্বাস, কি কালো, অন্ধকারে খালি গায়ে হেঁটে গেলে বোঝাই যাবে না কেউ যাচ্ছে।'

আর একজন মন্তব্য করল, 'কালো মেমসাহেবের সঙ্গে একজন ভিড়ে গেছে।' বাব্বাঃ, আমি মরে গেলেও ওদের সঙ্গে একঘরে থাকতে পারব না।'

খাওয়ার টেবিলে বসে লুসাকা ঝুঁকে পড়ে দীপাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওরা কি আমাদের সম্পর্কে কিছু বলছে ?'

দীপা অস্বস্তিতে পড়ল। দূরের মেয়েগুলোর দিকে তাকাল সে। তারপর গলা তুলে জিজ্ঞাসা কবল, 'শোন, এরা জিজ্ঞাসা করছে তোমরা কি এদের নিয়ে কিছু আলোচনা

করছ ? কি জবাব দেব বলে দাও ।'

দুটো মেয়ে একই সঙ্গে মাথা নামিয়ে খেতে লাগল । দীপা মাথা নাড়ল, 'না । ওরা কোন জবাব দিল না ।'

ভাত ডাল তরকারি আর মাছ খেতে তিনজনের খুব অসুবিধে হচ্ছিল । হাতে করে খেতে পারবে না বলে চামচ চেয়ে নিল তিনজনেই । কিন্তু খাওয়ার শেষে অর্ধেক খাবারই পড়ে রইল । গ্লোরিয়া বলল, 'প্রথমবার তো, দিন তিনেকের মধ্যেই এই খাবার অভ্যেস করে ফেলব ।'

লুসাকা বলল, 'আমার গলা পেট জ্বলছে । প্রচুর মশলা । আমাদের সুপারের সঙ্গে কথা বলা উচিত । ওরা তো আমাদের সেদ্ধ খাবার দিতে পারে ।'

খটমটে নামের মেয়েটি বলল, 'না না এখনই নয় । গ্লোরিয়া ঠিকই বলেছে, আগে চেষ্টা করা যাক এই খাবার অভ্যেসে আসে কি না । না পারলে দেখা যাবে । যখন রোমে এসেছ তখন রোমানদের মত বিহেভ কর ।'

দীপা হেসে ফেলল । লুসাকা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি হাসছ কেন ?'

দীপা জবাব দিল, 'তাহলে তোমাদের শাড়ি পরতে হয় আর প্রকাশ্যে সিগারেট খাওয়াও চলবে না ।'

গ্লোরিয়া হেসে বলল, 'আমি যেদিন শাড়ি পরব সেদিন সিগারেট খাব না, প্রমিস । শুধু তোমাকে কপি করে যাব সেইদিন ।'

শুভরাত্রি জানিয়ে মেয়েরা চলে গেল নিজেদের ঘরে । নিজের টেবিলে বসে দীপা ভাবল বাবাকে প্রথম দিনের ঘটনা জানিয়ে চিঠি লিখবে । হঠাৎ তার চোখে পড়ল গ্লোরিয়ার ওপরে । একটানে ওপরের জামা খুলে বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে ফ্যানের রেগুলেটার বাড়িয়ে দিল গ্লোরিয়া । হকচকিয়ে গেল দীপা আজ পর্যন্ত কোন মেয়েকে নগ্ন শরীরে শুধু ব্রা পরা অবস্থায় দেখেনি সে । ওই অবস্থায় কিছু গোছগাছ করছে গ্লোরিয়া । দীপা চোখ বন্ধ করল । গ্লোরিয়া বলছিল, 'আমরা ভাবতাম ক্যালকাটাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে । একগাদা গরম জামাকাপড় মিছিমিছি বয়ে আনলাম ।'

দীপা চোখ বন্ধ করল । এটা কি স্বাভাবিক আচরণ ? সে কি ওইভাবে দাঁড়াতে পারত ? নিজের কাছে উত্তরটা স্পষ্ট কিন্তু তবু তো গ্লোরিয়াকে খারাপ মনে হচ্ছে না । কোনরকম আড়ষ্টতা নেই, সঙ্কোচ নেই । আচ্ছা, নিজের মনে যদি কোন পাপবোধ না থাকলে তাহলে সেই কাজটা কি অন্যায় নয় ?

প্রায় সেমিজের মত অথচ কাঁধে সরু স্ট্র্যাপের একটা জামা যার প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছে, শরীরে জড়িয়ে শুয়ে পড়ল গ্লোরিয়া । বিছানায় মাথা রেখে বলল, 'তুমি মর্নিং ওয়াক করো ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না ।'

'কিন্তু করা উচিত । শরীর ভাল থাকে, মন আরও ভাল হয়ে যায় । তাছাড়া খুব ভোরে পৃথিবীর বেশীরভাগ মানুষের মন প্যাঁচালো হয় না । যেসব জায়গায় প্রচুর বদনাম আছে যেখানে দিনের বেলায় কোন মেয়ে নিশ্চিন্তে হাঁটতে পারে না সেখানে সকাল হবার সময়টায় যদি হাঁটো তাহলে ঝামেলা হবে না । কারণ বদমায়েসী করার জন্য মানুষের মন তখনও তৈরি হয় না । আমার ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে । তোমাকে ডাকব ?'

'ডেকো ।' দীপা বড় আলো নিবিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালল ।

গ্লোরিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কি লিখছ তুমি ?'

'চিঠি।'

'বয়ফ্রেন্ডকে ?'

দীপা হাসল, 'আমার বাবাকে।'

'বাবা ?' শব্দটি মৃদু স্বরে উচ্চারণ করল গ্লোরিয়া, 'তোমার বাবাকে খুব ভালবাসো তুমি ?' প্রশ্ন কানে যেতে দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল। টেবিল ল্যাম্পের আলো ঘরের ওদিকে যাচ্ছে না। প্রায়ান্ধকারে মিশে আছে গ্লোরিয়া বিছানায়। চট করে জবাব দিতে পারল না দীপা। সে কি অমরনাথকে ভালবাসে ? ভালবাসা কাকে বলে ? সে যেদিন স্কুল ফাইন্যাল পাস করেছিল সেদিন চা-বাগানের স্কুলের মাঠে অমরনাথ অনেক ছেলেমেয়ে মাস্টার মশাইদের সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠেছিলেন। কেন ! যে অমরনাথ প্রায় ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে বালিকা অবস্থায় তার বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কেন কাঁদবেন ? তার রুচি এবং মনের গড়ন বুঝেও প্রতুলবাবুর হাত থেকে তার জন্যেই টাকা নিতে যে লোকটা দ্বিধা করেনি, ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর যার সঙ্গে সে কথা বন্ধ করে দিয়েছিল, নিজের অসুস্থ অবস্থাতেও সেই একই লোক কেন ব্যাঙ্ককে নির্দেশ দেবে কলকাতার হোস্টেলের ঠিকানায় টাকা পাঠাতে ? অমরনাথের জন্যে মন কেমন করে উঠল। একেই কি ভালবাসা বলে ? না। অবশ্যই নয়। চোখের সামনে কোন মানুষ দুর্ঘটনায় মারা গেলে মনে ব্যথা জমে, সেখানে ভালবাসা কোথায় ? সত্যি, ভালবাসা কারে কয় ! দীপা মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না। আমি এও জানি না ভালবাসা কাকে বলে ?'

গ্লোরিয়া মাথা তুলল, 'অদ্ভুত ! তুমি বলতে চাইছ এই বয়স পর্যন্ত কোন ছেলেকে তুমি ভালবাসনি ? তোমার কোন বয়ফ্রেন্ড নেই ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না।'

'অসম্ভব ! তোমার মত সুন্দর দেখতে মেয়ে সম্পর্কে ছেলেরা উদাসীন থাকতে পারেই না। দীপাবলী, তুমি আমাব কাছে সত্যি বলছ না।'

'গ্লোরিয়া, আমাদের দেশে বিয়ের আগে কোন ছেলেমেয়ের বন্ধুত্ব এখনও প্রকাশ্যে স্বীকৃতি পায় না। কোন অভিভাবক এটা করতে অনুমতি দেন না। আমি বললাম বন্ধুত্ব, আর তার বেশী এগিয়ে যেতে চাইলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।'

গ্লোরিয়া উঠে বসল, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। ভালবাসতে হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে ? কী রকম সংখ্যায় এমন ঘটনা ঘটে ?'

'দশ হাজারে একজন মেয়ে সাহসী হলেও হতে পারে।'

'কিন্তু কেন ?'

'আমাদের এখানে মেয়েরা বিয়ে করে না, তাদের বিয়ে দেওয়া হয়।'

'তাব মানে তোমরা মন থেকে শরীরে পৌঁছাও না, একটা অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে প্রথমেই শরীরের সম্পর্ক তৈরি করে মনে পৌঁছাতে চাও। তা সম্ভব ?'

'এও আমি জানি না। সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও হয়তো হুকুম মেনে চলাটাই এদেশের বিবাহিতা মেয়েরা দাম্পত্য জীবনযাপন করা বলে মনে করে।'

গ্লোরিয়া ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল। দীপা আবার ঘুরে বসল। কলম খুলে সে লেখা শুরু করল, 'শ্রীচরণেষু বাবা, তোমার শরীর এখনও ভাল হয়নি বলে মামা বললেন। তুমি নিশ্চয়ই যত্নে আছ কিন্তু চিন্তাভাবনা করলে শুধু যত্নে শরীর সারবে না। আমার মনে হয় তুমি আমার জন্যেও চিন্তা করো। আমি বলি কি, আমি এখন অনেক বড় হয়েছি, আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই।'

'আমি স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছি তা তুমি জানো। আমার হোস্টেলের নাম ঠিকানা পেছনে দিলাম। মামাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আজ এখানে আমার প্রথম রাত। আমার রুমমেট হিসেবে আছে আফ্রিকা মহাদেশের জাম্বিয়া বলে একটি দেশের মেয়ে। আমরা যাকে নিগ্রো বলি এ তাই। কিন্তু এত পরিষ্কার কথা এবং আচরণ যে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ওর গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে, কথা বলে ইংরেজিতে। আমরা যেভাবে ইংরেজি বলতে এদেশে শুনেছি তা থেকে একটু আলাদা। একদম অজানা দেশে কোন মানুষের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, তুমি জানো। কিন্তু অন্য মেয়েরা একে এড়িয়ে চললেও আমার শুধু কৌতূহল হচ্ছে। ক্লাস শুরু হবে আগামী কাল। তুমি ভেবো না, আমি মন দিয়ে পড়াশুনা করব। মাকে আমার প্রণাম ভাইদের স্নেহ আর তোমাকে আমার— ।' দীপা কলম তুলল। ভক্তিপূর্ণ প্রণাম শব্দদুটি অভ্যেসে এসে যাচ্ছিল। সে গ্লোরিয়ার দিকে তাকাল। গ্লোরিয়া এখন চুপচাপ। হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ও জিজ্ঞাসা করেছিল বাবাকে ভালবাসে কি না। ভক্তিপূর্ণ প্রণামে কি ভালবাসা থাকে? দীপা ঠোঁট কামড়াল।

গত বছর থেকে আফ্রিকার কিছু দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আদান প্রদান প্রকল্পমত ছেলেমেয়েরা এখানে পড়তে আসছে। সংখ্যায় তারা খুব অল্প এবং তাদের মেলামেশার চৌহদ্দিটা খুবই সীমিত। গ্লোরিয়া তাদের ব্যতিক্রম। দীপা লক্ষ্য করছিল ওর মধ্যে কেমন একটা একরোখা ভঙ্গী আছে? কেন নয়? এই প্রশ্নটা শুধু মুখে বলে ক্ষান্ত হয় না, শরীরের ভঙ্গীতেও ফুটে ওঠে। প্রথম দিন ভোর চারটের সময় ঘুম ভাঙিয়েছিল সে দীপার। একমাত্র পরীক্ষার আগে ছাড়া ওই সময়ে চোখ মেলাব অভ্যেস নেই। কিন্তু মেনে নিয়েছিল সে। শাড়ি পাল্টে চুল আঁচড়ে বেরুবার জন্যে তৈরী হতেই দেখতে পেল গ্লোরিয়া কেডস শর্টস আর জামা পরে তৈরী। সে আঁতকে উঠেছিল, 'এম্মা!' গ্লোরিয়া অবাক হয়ে একান্ত বাঙালি শব্দটি শুনে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ওটার মানে কি?'

'তুমি কি ওই হাফ প্যান্ট পরে বাইরে বেরুবে?'

'হাফ প্যান্ট? এটা তো শর্টস। জগিং কিংবা দৌড়বার সময় সারা পৃথিবীব মেয়েরা পবে থাকে। তোমার নেই?'

'নাঃ। কিন্তু সবাই তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'

'থাকুক। মাই লেগস আর নট ব্যাড।'

সত্যি এত ভাল পা দীপা কখনও দেখেনি। অবশ্য এদেশে বাঙালি মেয়েদের পা বারো বছরের পর দেখা সম্ভবও নয়। সে নিজের পা বাথরুমেব বাইরে কোনদিন দেখেছে কি? আর বাথরুমের ভেতরেও পা দেখার কথা কখনও খেয়ালে থাকে? কিন্তু গ্লোরিয়ার পায়ের গড়ন এত চমৎকার, একটুও মেদ দেই, দীর্ঘ পা দুটি যেখানে যেমন হওয়া উচিত, মা কালীর পা থেকেও সুন্দর। দীপা ভেবেছিল বলে, তুমি ঠিক করেছিলে রোমে থাকতে হলে রোমানদের মত আচরণ করা উচিত। অতএব ওই বস্তুটি খুলে পায়ের পাতা ঢাকা প্যান্ট পরে বের হও।কিন্তু সে কিছু বলেনি। এখন এই সময়ে রাস্তায় নিশ্চয়ই মানুষ নেই। গ্লোরিয়া যদি এতে স্বস্তি পায় পাক না।

মুশকিল হয়েছিল হোস্টেলের মেইন গেট নিয়ে। সেটি তালা মারা। সাধারণত আলো ফুটলে দারোয়ান চাবি বের করে। গ্লোরিয়া তালা দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'গেটকিপার কোথায়? তাকে ডাকতে হবে।'

দীপা একটা ঝামেলার গন্ধ পেল। সাড়ে চারটের সময় বেচারার ঘুম ভাঙালে সুপারের

কাছে অভিযোগ পৌঁছাতে পারে। সে ডাকাডাকি করতে নিষেধ করল। গ্লোরিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? আমরা কি গেট টপকে বাইরে যাব ? মর্নিং ওয়াক করার রাইট আমাদের থাকবে না কেন ?'

দারোয়ানের দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে ঘুম ভাঙিয়েছিল লোকটার। এমন অদ্ভুত পোশাকের মহিলার দর্শন পেয়ে লোকটা হতভম্ব। গ্লোরিয়া যা বলছে তা তার মাথায় ঢুকছে না। দীপা একটু পিছিয়ে ছিল। এবার এগিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বলল ব্যাপারটা।

লোকটা বলল, 'রাত নটার পর সুপারের পারমিশান ছাড়া দরজা খোলা নিষেধ ?'

দীপা বলল, 'ঠিক। কিন্তু এখন আর রাত কোথায় ? দিন তো ফুটল বলে৭ আর এই মেমসাহেবের সকালবেলায় না হাঁটলে শরীর খারাপ হয়।'

কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে লোকটা দরজার তালা খুলেছিল। দীপা লক্ষ্য করেছিল তারা বাইরে বেবিয়ে আসামাত্র সে আবার তালা দিয়ে ভেতরে চলে গেল। এখনও অন্ধকার ফিকে হয়ে মাখামাখি কলকাতার শরীরে। গ্লোরিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছিল না দীপা। একেই সে অনেক লম্বা তাবপর ক্ষিপ্র পায়ে চটপট এগিয়ে যাচ্ছিল হাঁটার ভঙ্গিতেই। হেদুয়ার মুখে পৌঁছেই সে চিৎকার করে উঠল, 'আঃ দারুণ ! ওর ভেতরে দৌড়ানো যাবে।'

দীপা দেখল ওই সময়েও কিছু বৃদ্ধ প্রাতর্ভ্রমণ করতে এসে হতভম্ব ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়েছেন গ্লোরিয়াকে দেখে। গ্লোরিয়া তখন কোমরে হাত রেখে একই জায়গায় সোজা হয়ে লাফাচ্ছে। কুড়িবার লাফিয়ে গ্লোরিয়া থামল, 'চল দৌড়াই।'

দীপা হাত নাড়ল, 'না বাবা এই শাড়ি পরে দৌড়তে পারব না।'

'তুমি কালকে শর্টস পরবে। আমার কাছে একটা নতুন আছে।'

দীপা মনে মনে বলল, 'পাগল।'

ওরা হেদুয়ার ভেতর ঢুকে পড়ল। পেছন পেছন বৃদ্ধরাও আসছেন। তাঁদের সংখ্যা এখন বেড়েছে।

গ্লোরিয়া বলল, 'তুমি জোরে হাঁটো, আমি দৌড়াই।' বলেই সে দৌড়তে লাগল। এখন অন্ধকার যাব যাব করছে। গ্লোরিয়ার শরীরটা একটা কালো চিতার মত ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে হেদুয়ায় বেড়াতে আসা কিছু মানুষ থমকে ওর ছোটা দেখতে আরম্ভ করল।

একা হাঁটতে আরম্ভ করতেই দীপার বেশ ভাল লাগল। অল্প হাওয়া বইছে। আকাশটা পরিষ্কার হচ্ছে। অনেক অনেক আগে চা-বাগানের এমন ভোরে সে বিছানা ছেড়ে উঠে শিউলি ফুল কুড়োতে ছুটে যেত। তখন কি আকাশ আরও উজ্জ্বল, আরও নীল থাকত ! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও কি ঔজ্জ্বল্য হারায়। হঠাৎ পেছন থেকে গ্লোরিয়ার গলা ভেসে এল, 'হ্যারি আপ গার্ল, এক রাউণ্ড কমপ্লিট।' পাশ কাটিয়ে সে ছুটে গেল আবার। একটু একটু করে শরীরে ঝরঝরে ভাব এল দীপার। মন ভাল।

দু'বার পাক খেয়ে দীপার পাশে এসে দাঁড়াল গ্লোরিয়া। এর মধ্যে বেশ ঘেমে গেছে সে। হেদুয়ায় সাঁতার কাটতে ক্লাব মেম্বাররা চলে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে গ্লোরিয়া বলল, 'কস্ট্যুম আনলে একটু সাঁতার কাটা যেত।'

দীপা বলল, 'রক্ষে কর। তোমার এই পোশাক দেখার জন্যেই পেছনে দর্শক জমে গিয়েছে।' গ্লোরিয়া পেছনে ফিরে লোকগুলোকে দেখল। তারপর হাসল, 'এদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এদের দাঁত নেই নখ নেই শুধু চোখ আছে। আমাকে কেউ যদি চোখ দিয়ে রেপ করে খুশি হয় আমি শুধু তাকে করুণা করতে পারি, তার বেশী কিছু না।

পুরুষ মানুষ যে কত খারাপ হতে পারে তা আমার চেয়ে বেশী কেউ জানে না দীপাবলী।'

কলেজে মায়ার সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেল দীপার। এত অকপট কথাবার্তা, খামোকা লজ্জা না টেনে আনা, ছেলেদের সঙ্গে প্রকাশ্যে তুই তোকারি করে নিজের মতামত জানিয়ে দেওয়া—ও যেন পঞ্চাশ দশকের বাঙালি মেয়ে নয়। মায়া বলছিল, 'আমাদের দেশের মেয়েরা এককালে স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে। মাতঙ্গিনী হাজরা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দার, এমন কত মহিলা। কিন্তু এখন চারপাশে তাকালে কেউ কি সেকথা বিশ্বাস করবে?'

দীপা জবাব দিয়েছিল, 'যেসব ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আড্ডা মারে, মেয়েদের সিটি দেয়, যেসব লোক ব্যাগ হাতে করে অফিসে কেরানিগিরি করতে যায় অথবা যে বাঙালিরা টাকা রোজগারের ধাক্কায় ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের দেখে কেউ কি বলবে একজন সুভাষচন্দ্র এদের মধ্যে থেকেই উঠে এসেছিলেন?'

'ওয়েল সেইড।' মায়া ওর হাত চেপে ধরেছিল, 'আমি একচোখা হয়ে গিয়েছিলাম। আচ্ছা দীপা, তোমার এদেশের রাজনীতি সম্পর্কে কি ধারণা।'

'কোন ধারণা নেই।'

'তুমি কম্যুনিজম নিয়ে পড়াশুনা করেছ কখনও?'

'না। সেই সুযোগ পাইনি'

'পড়তে চাও?'

'আপত্তি নেই।'

'আমি তোমাকে পড়তে দেব। আমি বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের মানুষের স্বাধীনতা উনিশ শো সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট হয়নি। একমাত্র কম্যুনিজমের আদর্শ এদেশে প্রতিষ্ঠা হলেই মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে।'

'কম্যুনিস্টরা দেশকে স্বাধীন করবে?'

'মানুষকে। তুমি আমাদের ইউনিয়ন অফিসে এসো না।'

'না মায়া, আমি রাজনীতিতে জড়াতে চাই না।'

'কিন্তু রাজনীতি ছাড়া কোন আধুনিক মানুষ বাঁচতে পারে না। ধব, তুমি কোন সৃষ্টি করতে চলেছ এবং তার জন্যে তোমার একটা অনুকূল পরিবেশ পাওয়া দরকার। স্বার্থান্বেষী কোন দল ক্ষমতায় থেকে সেই পরিবেশ তৈরী হতে দিচ্ছে না। তোমার সক্রিয় সমর্থনে কম্যুনিজম সেই পরিবেশ এনে দিতে পারে। অর্থাৎ মানুষ তার অধিকার অর্জন করতে পারে কম্যুনিজমের মাধ্যমেই।'

'এ নিয়ে তর্ক করা যায়। আমি কম্যুনিজমবিরোধী নই। তবে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেছিল মহাত্মা গান্ধীকে। কারণ কম্যুনিজমে বিশ্বাসীরা এদেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে তেমন অংশ নেয়নি। কংগ্রেস খারাপ ভাবলে মানুষ তখন তার ডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত না। মানুষ ভেবেছিল তাদের মুক্তি আসবে কংগ্রেসের মাধ্যমেই। রাজনীতি বড় গোলমেলে জিনিস, আমার এনিয়ে ভাবতে ভাল লাগে না। বরং মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই আমার অনেক কিছু নিয়ে ভাবার আছে।'

'যেমন?' মায়া উৎসুক হল।

'আমরা এমন কিছু সংস্কার বা ধারণা নিয়ে যুগ যুগ ধরে জীবনযাপন করছি যার পেছনে কোন যুক্তি নেই। আমি মফস্বলের মেয়ে সেখানকার পরিবেশে অনেক কিছু করা এখনও সম্ভব নয়। কিন্তু কলকাতার মত বড় শহরে সেটা কেন মানা হবে? এখানে তো কেউ

কাউকে চেনে না, তাহলে লোকলজ্জা বাধা হয়ে দাঁড়াবে কেন ?'

'তুমি কি ব্যাপারে কথা বলছ দীপাবলী ?'

'মেয়েদের জীবনযাত্রা নিয়ে। কয়েকজন অভিভাবক প্রিন্সিপ্যালের কাছে অভিযোগ করলেন তাঁদের মেয়েদের বিরক্ত করা হয়েছে। প্রিন্সিপ্যাল সেই মেয়েদের ডেকে জানতে চাইলেন না কেন ? তোমরা আবার সেইসব মেয়ের খোঁজ করতে এলে ইউনিয়ন থেকে। আর সব কিছুর ফল হল কয়েকজনের বিয়ে হয়ে গেল।'

'বিয়ে যেমন হল তেমনি কয়েকজন অভিভাবক ছাড়াই কলেজে আসার স্বাধীনতা পেল ! পেল না ? ইউনিয়ন থেকে আমরা কি করতে পারতাম ?'

'কিছু না। অবহেলা করতে পারতে। কলেজে ছেলেমেয়েরা যে বেলেল্লাপনা করতে আসে না, একটা ছেলের সঙ্গে দুটো কথা বললে যে চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় না এই বোধ অভিভাবকদের মনে সঞ্চারিত হবার আগে মেয়েদের মনে সেটা ঢোকানো উচিত। জানো, আমার রুমমেট গ্লোরিয়া জাম্বিয়ার মেয়ে— ।'

'গ্লোরিয়াকে আমি চিনি। কলেজ স্পোর্টসে নাম দিয়েছে।'

'আমাদের জীবনের এইসব গল্প আর সমস্যা শুনে ও হতভম্ব হয়ে যায়। ব্যাপারটা যেন ওর মাথায় ঢুকতেই চায় না। কেউ এসে যদি আমাদের বলে সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে তাহলে তাকে যা মনে হবে ওরও যেন এইসব কথা শুনে তাই মনে হচ্ছে। অথচ জাম্বিয়া মোটেই উন্নত দেশ নয়। বিলেত ফ্রান্স নয়। ওদের দেশেও গরীব মানুষের সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু মোটা দাগের কতগুলো ব্যাপার ওরা ঝেড়ে ফেলেছে অনেক দিন।'

মায়া চুপচাপ দীপার কথা শুনছিল। এবাব সে ঘড়ি দেখল, 'তুমি এখন কি করছ।'

'হোস্টেলে ফিরে যাব। কিছু তো করার নেই।'

'তাহলে আমাব সঙ্গে চল। আটটাব মধ্যে ফিরে আসবে।'

'রাজনীতিব মধ্যে আমাকে টানবে না।'

'আবে না না। আমি তোমাকে বুঝে গিযেছি।'

দীপা হেসে ফেলল। সে নিজেকেই এখনও বুঝতে পারল না আর মায়া তাকে এত অল্প দেখে বুঝে গেল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না।

হেদুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো ফুট থেকে ডাক ভেসে এল, 'এই মায়া।'

দীপা দেখল দু'জন দাঁড়িয়ে আছে। একজনের পরনে পাজামা পাঞ্জাবি, গালে দাড়ি, কাঁধে কাপড়েব ব্যাগ। মায়া ওকে ইশারা করে রাস্তা পাব হল।

'কি ব্যাপাব ? তুমি এখানে ?'

দাড়িওয়ালা ছেলেটি বলল, 'সুজয়েব কাছে এসেছিলাম। চা খাবে ?'

'না। এর নাম দীপাবলী, আমাদের কলেজে এসেছে জলপাইগুড়ি থেকে, ওকে নিয়ে একবার বাড়িতে যাব। দীপা, আলাপ করিয়ে দিচ্ছি, শমিত, মণি কলেজে পড়ে। দারুণ নাটক করে। আমাদেব একটা গ্রুপ আছে, মানে গ্রুপটা নতুন ফর্ম করেছি, সুজয়ের লেখা নাটক শমিত পরিচালনা করছে।'

সুজয় ছেলেটি ছিমছাম, বলল, 'একটু ভুল হল, আমি একটি বিদেশী নাটকের ভাবানুবাদ করেছিলাম, শমিত মেঝে ঘষে তার চেহারা পাল্টে দিয়েছে।'

শমিত একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দীপার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একদিন আসুন না, আমাদের গ্রুপে। বুড়ো হাবড়া কেউ নেই, ভাল লাগবে।'

দীপা হাসল শুধু। এরই মধ্যে পথচারিরা ঘুরে ঘুরে তাদের দেখে যাচ্ছে। মায়া ওদের

কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ছেলেদের সঙ্গে নাটক কর নাকি ?'

'হ্যাঁ। নাটক আমার সেকেন্ড লাভ। ফার্স্ট লাভ অবশ্যই রাজনীতি।'

'বাড়িতে কিছু বলে না ?'

'কে বলবে ? মা আর আমি, মা আমার বন্ধু।'

'আত্মীয়স্বজন ?'

'আই ডোন্ট কেয়ার।'

'তুমি কি'নাটক করে টাকা পাও ?'

'দূর। আমরা যে থিয়েটার করছি তাতে ঘর থেকে পয়সা ঢালতে হয়। একি আর বোর্ডের নাটক ! কিন্তু আমরা ভাল নাটক করতে চাই। শিল্পের জন্যে জীবন। এদেশের মানুষের রুচি নষ্ট হয়ে গিয়েছে একগাদা বাজে নাটক দেখে দেখে। আমরা এমন নাটক করতে চাই যাতে সততা থাকবে, যা দেখার পর মানুষ ভাববে। এই যে শমিতকে দেখলে, ওর প্রাণশক্তি খুব বেশী। ওর কাছে থাকলে একটা আলাদা উৎসাহ আপনা আপনি তৈরী হয়ে যায়।'

'তার মানে তোমরা রাজনৈতিক নাটক কর ?'

'না হে। মানুষের নাটক। মানুষের কথা।'

একটা পুরনো বাড়িতে ওরা ঢুকল। বাড়িটির শরীর থেকে প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। বোঝাই যায় অনেকগুলো পরিবার এখানে বাস করছে। মায়া হেসে বলল, 'দেড়শ বছরের বাড়ি, এরও বোধ হয় আমাকে সহ্য হচ্ছে না, গা থেকে চুনবালি খসিয়ে ফেলছে।'

॥ ৩১ ॥

বাড়িটা শুধু পুরনো নয়, গঠনেও আজকের দিনের সঙ্গে কোন মিল নেই। সিঁড়িগুলো সরু এবং হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নেওয়া। কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ বেরিয়ে আসছে দাঁত দেখানো ইঁটের শরীর থেকে। দীপার মনে হল এই বাড়ি যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। কথাটা বলতে মায়া মাথা নাড়ল, 'না, এদেশের সংস্কারের মত এ বাড়ি সহজে ভেঙে পড়বে না।'

চার শরিকের বাড়ি, মায়াদের ভাগে পড়েছে তিনখানা ঘর। সেদিকে পা বাড়ানো মাত্র একটা সুন্দর মোলায়েম গন্ধ নাকে এল। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে জুতো একপাশে খুলে রেখে মায়া বলল, 'ছোট মামা তামাক খাচ্ছে। ওইটে আর বেহালা বাজানো তার শখ। জুতোটাকে ওখানে রাখার নির্দেশ মায়ের। আমারও মন্দ লাগে না।'

এই সময় এক প্রৌঢ়া মহিলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। লম্বা, গৌরবর্ণা দেহ, পরনে সাদা শাড়ি, ঘোমটা মাথার মাঝ বরাবর, কানের ওপরকার চুলে সামান্য পাক ধরেছে, চোখে চশমা। মায়া বলল, 'এর নাম দীপাবলী, জলপাইগুড়ির চা-বাগানে থাকত, ডানডাস হোস্টেলে থেকে পড়ছে।' তারপর দীপার দিকে ঘুরে বলল, 'ইনি হাই হাইনেস লেট নবীনচন্দ্রের স্ত্রী, আমার জননী।'

ভদ্রমহিলা অল্প হাসলেন, 'এসো। ভেতরের ঘরে এসো।'

মায়া বলল, 'খুব খিদে পেয়ে গেছে। রাধা কোথায় ?'

'রান্নাঘরে। যা গিয়ে বল।' মায়া চলে যেতে তিনি দীপাকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে

বসালেন। একটা পালঙ্ক, দেওয়ালে অজস্র মানুষের ছবি এবং সেগুলো প্রায় বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কিছু আদ্যিকালের আসবাব, মায়ার মা মুখোমুখি দুটো চেয়ারে দীপাকে নিয়ে বসলেন, 'কোন চা-বাগান ?'

দীপা নাম বলে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ওদিকে গিয়েছেন ?'

মাথা নাড়লেন, ভদ্রমহিলা, 'অনেক কাল আগে। আমার দাদু ছিলেন স্টেশন মাস্টার। মালবাজার নামে একটা জায়গা আছে তোমাদের ওদিকে, সেখানে পোস্টেড ছিলেন। মায়ের সঙ্গে সাত বছর বয়সে তাঁর কাছে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। এত সবুজ আর এত নীল আকাশ, আজও ভুলতে পারি না ?

'আপনারা তো এই কলকাতারই মানুষ ?'

'হ্যাঁ, আমার দু'কূলই কলকাতার। একেবারে সুতানটী, কলকাতার।'

'মায়াকে দেখে কিন্তু সেটা মনে হয় না।'

'বুঝলাম না।'

'না, মানে, যদি কিছু মনে না করেন তা'হলে বলতে পারি।'

'তুমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পার।'

'মায়া যেরকম সাহসী মেয়ে, যেভাবে ও ইউনিয়নের কাজ করে, নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত, কোন মিথ্যে সংস্কারকে আঁকড়ে নেই, এমন মেয়ে উত্তর কলকাতার পুরনো পরিবারে বড় একটা দেখা যায় না। জানেন, এখনও আমাদের কলেজে মেয়েদের অভিভাবকেরা ছাতার আড়ালে করে নিয়ে যায়।'

'এই ব্যাপার কি মফস্বলের কলেজে হয় না ?'

'স্কুল থেকে পাস করার পর প্রথম দু-একদিন হয়তো যেত পরে, জলপাইগুড়ির মেয়েরা একাই যেত। ক্লাসের একটি মেয়ে বলছিল দক্ষিণ কলকাতার কলেজগুলোতে মেয়েরা একাই যাতাযাত করে।'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'এখানকার অভিভাবকরা বোধ হয় একটু বেশি সতর্ক। আর মায়া কিন্তু নতুন কোন কাজ করছে না। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর বাড়ির মেয়েরা গান গাইতেন, নাটক অভিনয় করতেন ছেলেদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ তো নিজেই নাটক পরিচালনা করেছেন। আমি জানি স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় গান্ধীজীর ডাকে অনেক মেয়ে সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। কম্যুনিস্ট পার্টিকে যখন নিষিদ্ধ করা হল তখন অনেক মেয়ে সেই দলে কাজ করত।'

দীপা অবাক হয়ে বলল, 'আপনি তো অনেক খবর রাখেন !'

'কি আশ্চর্য। চোখ কান খোলা রাখলেই তো এসব জানা যায়। তোমাকে তোমার বাবা জলপাইগুড়ি থেকে টাকা পয়সা খরচ করে কলকাতায় লেখাপড়া করতে পাঠিয়েছেন। তুমি রাসসুন্দরী দেবীর নাম শুনেছ ?'

'না। রবীন্দ্রনাথের কেউ হন ?'

'না গো সেইটেই অবাক কাণ্ড। তাঁর সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির তিন কুলেও কোন সম্পর্ক ছিল না। ঘরের দরজা বন্ধ করে লেখাপড়া শিখেছিলেন। তারপর বাঙালি মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম লিখলেন আত্মজীবনী। তাই দেখে এদেশের পুরুষরা বলেছিল, ঘোর কলিকাল চলছে। এখন মেয়েছেলেরা পুরুষদের কাজ করবে। এখন মিনসেরা জড়ভরত হয়ে থাকবে মনে হচ্ছে। কত কষ্ট করে সবাই পড়াশুনা করত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী রাত্রে ঘরের দরজা বন্ধ করে পড়তেন। তখন তো লেখাপড়া শেখা, জামা জুতো পরা,

বাইরে বের হওয়া, গান গাওয়া, পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা অপরাধ হিসেবে গণ্য হত। মেয়েদের কাজ ছিল "রাঁধার পর খাওয়া আর খাওয়ার পর রাঁধা।" এরপর কলকাতার কিছু সম্ভ্রান্ত মানুষ বাড়ির মেয়েদের জন্যে আনলেন ইংরেজ গৃহশিক্ষিকা, হিন্দু ফিমেল স্কুল তৈরি হল আঠারোশ উনপঞ্চাশ সালে। তখন কত আপত্তি মেয়েরা স্কুলে গেলে কামাতুর পুরুষরা তাদের বলাৎকার করবে। হয়তো সেই ধারণা এখনও অনেক অভিভাবক লালন করেন। তবে তোমরা যে সুযোগ পাচ্ছ তা ওই সময়ের মেয়েরা পায়নি। এখনও যদি তোমার মনে হয় উত্তর কলকাতার মেয়েরা অন্ধকার থেকে খুব একটা সরে আসেনি তাহলে তখন কেমন ছিল বুঝতেই পারছ।'

দীপা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মায়ার মা চুপ করতেই সে বলল, 'আমার খুব ভাল লাগছে একথা শুনতে। আর একটু বলুন না।'

মায়ার মা বললেন, 'আমি তো মায়াকে বলি তোরা পুরুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা বলিস অথচ কাজটা করে দেখিয়ে দিয়েছেন দ্বারকানাথের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী। খবর পেলেন দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগানবাড়িতে নাকি মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। খুব ধার্মিক মহিলা ছিলেন। নিজে যাচাই করতে গেলেন কয়েকজন জন সঙ্গিনীকে নিয়ে। সেই প্রথম ঘরের বউ অত সাহস দেখাল। সাহেব মেমদের সঙ্গে মত্ত দ্বারকানাথকে দেখেও ভেঙে পড়লেন না। বোঝাতে চেষ্টা করেও যখন পারলেন না তখন নিজের কর্তব্য করে গিয়েছেন আমৃত্যু কিন্তু আর কখনও স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় শোননি। অবশ্য দ্বারকানাথও এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, ওই সময় বেশীরভাগ মেয়ে হয় আত্মহত্যা করত, নয় মেরুদণ্ডহীন হয়ে বেঁচে থাকত। দিগম্বরী প্রথম প্রতিবাদ করলেন আত্মমর্যাদা নিয়ে।' হাসলেন ভদ্রমহিলা।

এই সময় মায়া ফিরে এল দুটো প্লেট নিয়ে। এসে বলল, 'চটপট হাত চালাও, আমাদের এখনই বেরুতে হবে।'

প্লেট নিয়ে দীপা বলল, 'তোমার মায়ের মুখে পুরনো দিনের গল্প শুনছিলাম।'

'ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে?'

'নিশ্চয়ই। জানেন মাসীমা, জলপাইগুড়িতে কলেজ হোস্টেলে আমার রুমমেট ছিল মায়া নামে একটি মেয়ে। তোমার নামে নাম।'

মায়া বলল, 'আমার ডুপ্লিকেট?'

'উল্টো। সে তার প্রাইভেট টিউটারকে ভালবাসত। হোস্টেলে এসে কি কান্নাকাটি। তারপর যেই তার বাবা ভাল সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দেবে বলে স্থির করল অমনি সেটা মেনে নিয়ে খুশি মনে বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে বসল।'

মায়া বলল, 'এটাই এদেশের নব্বুইভাগ মেয়ের ধরন।'

মায়ার মা বললেন, 'তোমাদের খারাপ লাগতে পারে কিন্তু এধরনের কাজের একটা ভাল দিক আছে। আমাদের দেশে কোন মেয়ে যদি প্রেমে পড়ে তাহলে তার আবেগটাই মুখ্য ভূমিকা নেয়। ছেলেটির সঙ্গে ভাল করে কথা বলার সুযোগ যে পায় না তার জীবন এবং মানসিকতা সম্পর্কে জানবে কি করে? যদি বাড়ির বিরুদ্ধে গিয়ে ছেলেটিকে বিয়ে করে তাহলে হয়তো কিছুদিনের মধ্যে নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। তখন তার ফেরার কোন উপায় নেই। জোর করে বাপ মা যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছে সেখানে আর যাই হোক সারা জীবনের জন্যে একটা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকছে।'

মায়া ফুঁসে উঠল, 'মা, তুমি এটা কি বললে? অর্থনৈতিক নিরাপত্তা আত্মসম্মান বিকিয়ে

দিয়ে পেতে হবে ?'

মায়ার মা হাসলেন, 'তুই কি জানিস না এদেশের বেশীর ভাগ মেয়ের মনে আত্মসম্মান বোধই নেই। আমি বঞ্চিত, আমাকে অবহেলা করছে, এমন একটা জ্বালা নিয়ে বসে থাকে সবাই। অর্জনের জন্যে নিজেকে যোগ্য করে তোলে না। আমি সেইসব মেয়েদের কথা ভেবে ওটা বললাম। দিগম্বরী দেবীর মত মনের তেজ আজকে কটা বাঙালি মেয়ের আছে ?'

দীপা না বলে পারল না, 'কিন্তু মাসিমা দিগম্বরী দেবী সেটা করতে সক্ষম হয়েছিলেন কারণ দ্বারকানাথ মেনে নিয়েছিলেন। ধরুন, দ্বারকানাথ ওটা মানতে চাইলেন না, জোরজবরদস্তি করলেন, দিগম্বরী দেবী তখন কি করতেন ?'

মায়া বলল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন।'

'বাঃ, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া খুব সোজা ব্যাপার। সেই সময়ে বাড়ির বউ যদি রাস্তায় নামে তাহলে কেউ তাকে থাকতে দেবে ?'

'তাহলে তুমি বলছ পুরুষদের সাহায্য ছাড়া মেয়েরা আত্মসম্মান বজায় রাখতে পারবে না ?' মায়া ফুঁসে উঠল।

মায়ার মা বললেন, 'ইতিহাস কিন্তু তাই বলে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে যিনি প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতার হাওয়া আনলেন তাঁর নাম জ্ঞানদানন্দিনী, সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী। মাত্র সাত বছর বয়সে পায়ে গুজরি-পঞ্চম আর একগলা ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরবাড়িরে এসেছিলেন তিনি। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ বিলেতে পড়তে গিয়ে চক্ষুষ্মান হলেন। তাঁর মনে হল, তাঁরা বিয়ে করেননি, তাঁদের বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছেন তখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। সেজ দেওর হেমেন্দ্রনাথের সামনে ঘোমটা টেনে বউরা পড়তে বসত। জ্ঞানদানন্দিনী এমনি করেই পড়ে ফেললেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। সত্যেন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফিরে চাকরি পেলেন মহারাষ্ট্রে। নিয়ে যেতে চাইলেন স্ত্রীকে। চারদিকে ছি ছি শুরু হয়ে গেল। বাঙালি দূরদেশে চাকরি করতে গেলে বউকে মায়ের কাছে রেখে যায়। কিন্তু বিদ্রোহ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ, জোর করে বাবার অনুমতি আদায় করলেন। কিন্তু কি পরে জ্ঞানদানন্দিনী বাড়ির বাইরে যাবেন ? বাঙালি বউয়ের ইজ্জত নষ্ট হবে পরপুরুষের নজর পড়লে। শাড়ির ওপর চাদর জড়িয়ে যাওয়াটাও চলবে না। ঘর থেকে বেরিয়ে পালকিতে ওঠা নয়, সত্যেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন দেউড়ি পেরিয়ে গাড়িতে উঠতে। দেবেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাব খারাপ লাগল, এতে কর্মচারিরা ঘরের বউকে দেখে ফেলবে। তাই পালকি গিয়ে তুলে দিয়ে এল বোম্বের জাহাজে, জ্ঞানদানন্দিনীকে ফরাসী দোকানে অর্ডার দিয়ে বানানো "ওরিয়েন্টাল ড্রেস" পরিয়ে। সেই কিম্ভূত পোশাক পরে অস্বস্তিতে ভুগতে ভুগতে জ্ঞানদানন্দিনী স্থির করলেন বাঙালি মেয়েদের জন্যে রুচিশীল সাজ বের করা দরকার।'

মায়া বলল, 'মা তুমি কিন্তু প্রথম থেকে সরে যাচ্ছ !'

'যাচ্ছি না, আসছি। দু'বছর স্বামীর সঙ্গে একা বোম্বাইতে থেকে জ্ঞানদানন্দিনী অনেক জানলেন। যেদিন ফিরে এলেন কলকাতায় সেদিন হুলুস্থুল পড়ে গেল। ঘরের বউকে মেমসাহেবের মত গাড়ি থেকে নামতে দেখে হাহাকার উঠল। তিনি ঠাকুরবাড়ির ভেতরেই একঘরে হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন বালক, কিন্তু ঠাকুরবাড়ির অন্য মেয়েরাও ওঁর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করতেন না। বাইরের বঙ্গসমাজের অবস্থা তো আরও করুণ। জ্ঞানদানন্দিনী দুঃসাহস দেখালেন। লাটসাহেবের নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি স্বামীর সঙ্গে চললেন সেখানে।

সবার চোখ বড় হল। ঘরের বউকে সাহেব মেমদের সঙ্গে ভোজসভায় দেখে পাথুরেঘাটায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর লজ্জায় মরে গেলেন যেন। কিন্তু এই প্রথম বাইরের হাওয়া এসে লাগল বাঙালির অন্তঃপুরে। জ্ঞানদানন্দিনী আর এক ধাপ এগোলেন। তিনি বিলেতে পাড়ি দিলেন পুরুষসঙ্গী ছাড়া। অবশ্যই স্বামীর ইচ্ছায়। সে সময় বাঙালিরা বিলেতে যেত না কালাপানি পার হবার ভয়ে। যারা যেত তারা ফিরত না, ফিরলেও বাঙালিয়ানা ছেড়ে সাহেবিপনা দেখাত।। স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে পরিচিত হতে কয়েকটি ইংরেজি বাক্যের পুঁজি নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী বিলেত গিয়েছিলেন। ভাবতে পারো তোমরা ? এই যে আজ তোমরা যে ভাবে শাড়ি পরো তার প্রথম ধাপ চালু করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী। সেই সঙ্গে সায়া-সেমিজ-জ্যাকেট-ব্লাউজ। লোকে বলত ঠাকুরবাড়ির সাজ। পরে ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবী মেয়েদের শাড়ি পড়ার আধুনিক ঢঙটি প্রবর্তন করেন। এই যে জন্মদিন পালন করা, এদেশে সেটা জ্ঞানদানন্দিনী প্রথম শুরু করেন। যৌথ পরিবারের অসুবিধা বুঝতে পেরে জ্ঞানদানন্দিনী স্বামীপুত্র কন্যাকে নিয়ে আলাদা বাড়িতে উঠে যান। সেটাও তো এদেশে প্রথম। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেননি। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সবার উপকারে লেগেছেন এরপর ঠাকুরবাড়িতে অভিনীত হল "রাজা ও রাণী"। বিক্রম রবীন্দ্রনাথ আর সুমিত্রা জ্ঞানদানন্দিনী। ভাবতে পারো, সেই সাত বছর বয়সে বিয়ে হওয়া মেয়েটি শেষপর্যন্ত কোথায় পৌঁছেছিলেন। আর এ সবই সম্ভব হয়েছিল তাঁব পাশে সত্যেন্দ্রনাথের মত স্বামী ছিলেন বলে। ওই পুরুষটি যদি এই নারীর হৃদয়ে জ্ঞানেব আলো না জ্বালিয়ে দিতেন তাহলে তিনি বাঙালি মেয়েদের বন্ধ দরজায় আঘাত করতে পারতেন কি না সন্দেহ আছে।'

মায়া বলল, 'তুমি সত্তর আশি বছর আগের কথা বলছ। কিন্তু এখন তো সময় পাল্টে গিয়েছে। এখন আমরা নিজেরাই নিজেদের— ।'

তাকে থামিয়ে দিলেন প্রৌঢ়া, 'শোন, প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু মেয়ে গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে। লেখাপড়া যারা করতে পারে না তাদের কথা ছেড়ে দে। তা এই গ্র্যাজুয়েট মেয়েগুলোর ক'জন চাকরি করে ? স্কুল কিংবা কলেজে সুযোগ না পেলে বাড়িতে বসে থাকে, বিয়ে-থা করে লেখাপড়া ভুলে যায়।'

মায়া কথাটা মানল। মানল বলেই চুপ করে রইল। খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুটো প্লেট তুলে সে চলে গেল ভেতরে। দীপা বলল, 'মাসীমা, আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। যদি আপনার কাছে মাঝে মাঝে আসি তাহলে আপত্তি করবেন ?'

'ওমা, আপত্তি করব কেন ? নিশ্চয়ই আসবে। কলকাতায় তোমার কেউ নেই ?'

'মামা মামী আছেন।'

'তাঁদের বাড়িতে কি জায়গা কম ?'

'হ্যাঁ। তাছাড়া, মামীমাকে আমি এই প্রথম দেখলাম।'

'পড়াশুনা শেষ করে তুমি কি করতে চাও ?'

'চাকরি।'

'তোমার বাবা আপত্তি করবেন না ?'

'না। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।'

'তুমি মায়ার মত কলেজে রাজনীতি কর ?'

'না। আমার পছন্দ হয় না।'

'কেন ?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তাছাড়া আমার ভালও লাগে না।'

'মায়া নাটক করে। তুমি কি সেখানে যাচ্ছ ?'

'এখনও যাইনি।'

'তুমি ঠিক কি করতে চাও ?'

'আমি নিজেকে বুঝতে চাই। কারো ওপর নির্ভর করতে চাই না।'

'একসময় তো করতেই হবে।'

'কেন ?'

'বাঃ, তোমাকে তো সংসার করতেই হবে।'

'কেন ?'

'এটা একটা সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়ম।'

দীপা কথা বলল না। ওর খুব ইচ্ছে হচ্ছিল এই ভদ্রমহিলাকে নিজের জীবনের সব কথা খুলে বলে। সে নিজেকে সামলে নিল প্রথম আলাপে অত অকপট হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এই মহিলাকে তার ভাল লাগছে । ইনি অঞ্জলির বিপরীত আবার রমলা সেনের সঙ্গেও কোন মিল নেই। অনেকটা গাছের মতন। মাটির গভীরে শিকড় ছড়িয়ে যেমন রস টেনে নেয় শরীরে তেমনি আকাশেব দিকে ডালপালা উঁচিয়ে বাতাসের স্বাদ নেয় প্রতিটি রন্ধ্রে।

দীপা বলল, 'মাসিমা, মায়া যে এসব করছে এটা আপনি চেয়েছিলেন ?'

ভদ্রমহিলা হাসলেন, 'আমি ওকে বলেছি যেটা স্বাভাবিকভাবে আসবে সেটাই করবে। এই নিয়ে তো এ বাড়িতে কম জল ঘোলা হল না। ইউনিয়ন করে, রাত ন'টায় ট্রামে চেপে বাড়ি ফেরে। এককালে ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা যা করত তাও ভুলে যেতে চায় সবাই। মায়ার বাবা যা রেখে গিয়েছেন তা ভাঙিয়ে চলে যাচ্ছে কোনমতে। আমি যা পারিনি মেয়ে যদি তা করে আপত্তি করব কেন ?'

'আচ্ছা, ব্রাহ্মসমাজের মেয়েরা খুব গালাগাল খেত, না ?'

'খুব। সেই গল্পটা শোননি ? নীরদ চৌধুরীর নাম শুনেছ ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'উনি খুব পণ্ডিত মানুষ। লেখালেখি করেন। তা ওঁর বাবা-মাকে নিয়ে ট্রামে উঠেছিলেন। ভদ্রমহিলার পায়ে মোজা জুতো ছিল। ট্রামের কয়েকজন যাত্রী নিজেদের মধ্যে ঠারে ঠুরে কথা বলছিলেন ওইদিকে তাকিয়ে। নীরদবাবুর বাবার কানে এল একজন বলছেন, 'এ বেবুশ্যে না হয়ে যায় না।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিবাদ করলেন, 'না মশাই, ইনি আমাব স্ত্রী।' তাই শুনে যাত্রীটি বলল, 'ও, আপনারা তাহলে ব্রাহ্ম।'

দীপা হেসে ফেলল, 'কি অবস্থা।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'এখন, এতদিন বাদে কোন মেয়ে যদি রাত দশটায় ধর্মতলা থেকে একা ট্রামে ওঠে তাহলে যাত্রীরা তাকে প্রথমটাই ভাববে।'

পাশের ঘর থেকে তামাকের গন্ধ আর তেমন তীব্র হয়ে আসছিল না। মায়ার মামাকে এর মধ্যে একবারও দেখতে পায়নি দীপা। তিনি ওই ঘরেই রয়ে গেছেন। মায়া এসে তাড়া লাগাতে সে উঠে পড়ল, 'এলাম মাসিমা।'

'মাঝে মাঝে এস।'

মাথা নেড়ে সরু সিঁড়ি দিয়ে মায়ার সঙ্গে নামতে লাগল দীপা। সেই স্যাঁতসেঁতে গন্ধ, অন্ধকার অন্ধকার সিঁড়ি। একটা চত্বরে পা দিতে গিয়ে মায়া ইশারা করে তাকে থামাল,

'দাঁড়াও।'

'কি হল ?' দীপা অবাক হয়ে সামনে তাকাল। সম্ভবত এটি আর এক শরিকের অংশ। তাদের ঘর থেকে শব্দ ভেসে আসছে। ওপাশের দরজায় শব্দ হল। এক প্রবীণা মহিলা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় দ্রুত হেঁটে গেলেন সামনে দিয়ে। দীপা হকচকিয়ে গেল। মায়া ঠোঁটে আঙুল চেপে চুপ করে থাকতে বলল। কয়েক সেকেন্ড বাদে ওপাশেই কোন দরজা শব্দ করে বন্ধ হতেই সে বলল, 'চল, এবার যাওয়া যেতে পারে।'

সিঁড়িগুলোয় যেন বাতাস নেই। বাড়ির বাইরে পা দিতে স্বস্তি পাওয়া গেল। এই সময় ডানদিকের রকে বসা কয়েকটি বৃদ্ধের মধ্যে থেকে একজন প্রশ্ন করল, 'কোথায় চললে হে ? রিহার্সালে নাকি ?'

'হ্যাঁ।' মায়া ঘুরে দাঁড়াল।

'এবারে কি প্লে ধরেছ ?'

'পিরানদোল্লাব ভারতীয় রূপ।'

'ভাল ভাল। বিদেশের ভাল জিনিস নিতে কোন আপত্তি নেই। বিদ্যাসাগব মশাই সেক্সপীয়ার সাহেব থেকে লিখলেন ভ্রান্তিবিলাস। লেখেননি ? এটি কে ?'

'আমার সঙ্গে পড়ে।'

'প্লে করে ?'

'না। প্রণাম।' মায়া দাঁড়াল না। খানিকটা এগিয়ে বলল, 'বুড়ো ভাম।'

'কে ?' দীপা জানতে চাইল।

'আমার দুঃসম্পর্কের এক জ্যেঠা। তিন তিনটে বউ। রোজ একই প্রশ্ন করে। আমাকে দেখলেই যেন ঠোঁট চুলবুল করতে থাকে। অন্যেরা মজা পায়।'

'বল না কেন কিছু ?'

'বললেই তো শত্রু হয়ে যাবে। এমন ভাব দেখায় যেন নাটকের কি সমঝদার। অথচ শাজাহান সিরাজদৌল্লার বাইরে কোন নাটক দেখেননি।'

এখন সন্ধে নেমে গিয়েছে। দীপা একটু শঙ্কিত হল। মায়া যদি সঙ্গে না যায় তাহলে সে হোস্টেলের পথ চিনবে তো ? মায়া জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি হোস্টেলে ফিরবে না আমাব সঙ্গে গ্রুপে যাবে।'

'গ্রুপে ?'

'আমাদের নাটকের দলে।'

'আজ থাক।' দীপা মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগল আমাদের বাড়ি ?'

'তোমার মা অপূর্ব। আচ্ছা, ওই ভদ্রমহিলা অমনভাবে গেলেন কেন ? বাইরের লোক তো না জেনে এসে পড়তে পারত।'

'উনি তখন দৌড়াতেন। চেঁচাতেন। সে চেঁচানি তো কখনও শোননি !'

'কিন্তু কেন ?'

'শুচিবায়ুগ্রস্ত। চারবেলা স্নান করবেন। বাথরুমে পরিষ্কার কাপড় নিয়ে যাবেন না। শুধু নিজে নয় ওর মেয়েদেরও তাই করতে হবে। তারা অবশ্য একটা গামছা জড়ায়। মায়ের কাছে শুনেছি জ্যাঠামশাই যখন বেঁচে ছিলেন তখন মাঝরাত্রে বিছানা থেকে নেমে আধঘণ্টা ধরে স্নান করতেন।'

ট্রাম স্টপে এসে মায়া দাঁড়াল, 'তুমি এখান থেকে হোস্টেলে যেতে পারবে ?' ডানডাস

হোস্টেলের সামনে দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গিয়েছে। সোজা হেঁটে গেলে না পৌঁছানোর কোন কারণ নেই। সে বলল, 'কাল কলেজে দেখা হবে।'

'হ্যাঁ। কাল তাড়াতাড়ি যেও, কলেজ থেকে ফান্ড কালেকশনে বের হব।'

'কেন ?'

'ওঃ, তুমি কোন খবরই রাখো না। আসামে মারাত্মক বন্যা হয়েছে। ইউনিয়ন থেকে বন্যার্তদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

দীপা মাথা নেড়ে হাঁটতে লাগল। ফুটপাতের ধার ঘেঁষে দ্রুত পায়ে হাঁটছিল সে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। মাঝে মাঝে গাড়ি বাস অথবা ট্রাম হুস হাস বেরিয়ে যাচ্ছে। দীপা তাকিয়ে দেখল রাস্তায় একটিও মেয়ে নেই। কিন্তু কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। ওর মায়ার মায়েব কথা মনে এল। যে বাড়িতে ভদ্রমহিলা বাস করেন সেই বাড়ির অন্য শরিকের স্ত্রীমেয়েবা ওইভাবে বাথরুম থেকে বের হয় ? তিনি কেন ওঁদের বোঝাতে পারেননি ?

হোস্টেলটা যে এত তাড়াতাড়ি এসে যাবে দীপা ভাবতে পারেনি। চেনা গেট দেখে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। গেট পেরিয়ে দোতলার সিঁড়িতে পা দিয়ে স্বস্তি এল। গ্লোরিয়া ঘরে নেই। আলো জ্বেলে ওর বিছানাব দিকে তাকাতেই মন বিরূপ হল। মেয়েটা অন্তর্বাস ছেড়ে রেখে গিয়েছে বিছানায়। ওকে কি কেউ শেখায়নি। এগুলো আড়ালে রাখা উচিত। গ্লোরিয়ার গায়ে দেবার চাদরটা ওগুলোর ওপব চাপা দিয়ে দিল দীপা।

হাত মুখ ধুয়ে আলো নিবিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। হঠাৎ চোখের সামনে দিগম্বরী দেবী চলে এলেন। একশ পঁচিশ বছর আগেব সেই মহিলা দেখতে কিরকম ছিলেন ? দীপা কল্পনা করল, খুবই সাধারণ স্বভাবের ছোটখাটো মানুষ। অবশ্যই সুন্দরী, নইলে দ্বাবকানাথ তাঁকে বিয়ে করতেন না। কিন্তু সেই মহিলা এত তেজ পেলেন কোথায় ? ডল্‌স হাউসের নোরা প্রতিবাদ কবতে বেরিয়ে এসেছিল ঘর ছেড়ে কারণ তার বেরুবার উপায় ছিল কিন্তু দিগম্বরী দেবী ঘরে থেকেই সারাজীবন প্রতিবাদ করে গেলেন স্বামীকে স্পর্শ না কবে। এটা কি একটা বিরাট বিপ্লব নয় ? চোখেব সামনে চলে এলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। এই মহিলাব ছবি মনে মনে আঁকতে লাগল দীপা। চোখদুটো নিশ্চয়ই ছিল খুব স্বপ্ন ভরা। মাথার চুল নিশ্চযই টান টান করে আঁচড়াতো, সিঁথি মাঝখানে সরল ভাবে উঠে গিয়েছে।

দরজায় টোকা পড়তেই চোখ মেলল দীপা। গ্লোরিয়া ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'আলো জ্বালতে পারি ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' উঠে বসল দীপা।

আলো জ্বেলে গ্লোরিয়া বিছানায় বসল। ওর পরনে লাল স্কার্ট আর কালো জামা। কোন কালো মেয়ে এমন অদ্ভুত বঙ পরে ? কিন্তু গ্লোরিয়া একটুও অস্বচ্ছন্দ নয়। হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দেখছ আমার দিকে তাকিয়ে ?'

'তোমার পোশাক। কোথায় গিয়েছিলে ?'

'নিউ মার্কেটে। তুমি বিকেলে হোস্টেলে ফিরে আসনি না ?'

'হ্যাঁ, এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। আমার দেশের দুটো ছেলে এখানকার ওয়াই এম সি এ-তে থাকে। ওরা একজন বেঙ্গলি গার্লের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। তোমার কথা বলেছিলাম ওদের, ওরা এসেছিল।'

দীপা বলল, 'আমি হয়তো ইন্টারেস্টেড নাও হতে পারি।'

'তাহলে অবশ্য আলাদা কথা।' গ্লোরিয়া জামার বোতাম খুলতে লাগল। এই দৃশ্যটি মোটেই পছন্দ হয় না দীপার। সে মেয়ে হলেও মানুষ। গ্লোরিয়ার ভঙ্গী দেখে মনে হয় সে এই ঘরে একা আছে। কিন্তু কিছু বলল না দীপা। তার মনে পড়ল মা ভাইদের সামনে কাপড় ছাড়ত না কিন্তু সে থাকলে কোন সঙ্কোচ হত না। ঠাকুমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার দেখেছে সে। গ্লোরিয়া না হয় আর এক ধাপ এগিয়েছে। মায়ার জেঠিমা কি আরও আধুনিক ? বিবস্ত্র হওয়া যদি আধুনিকতা হয় !

বেলা বারোটায় ছুটি হয়ে গেল কারণ ছাত্রছাত্রীরা আসামের বন্যার্তদের সাহায্যার্থে চাঁদা তুলতে বের হবে। তিনটে ট্রাক ভাড়া করে নিয়ে এসেছে ইউনিয়নের ছেলেরা। মাইকে ছাত্রছাত্রীদের কাছে বারংবার আবেদন জানাচ্ছে এই অভিযানে শামিল হতে। বেশীরভাগ মেয়েই এখন কমনরুমে বসে আছে। যারা ব্যাপারটা জানত তাদের অনেকেই আজ কলেজে আসেনি। ব্যস্ত মায়া কমনরুমে এসে দীপাকে ধরল, 'তুমি যাচ্ছ তো ?'

'অরাজনৈতিক ব্যাপারে যখন তখন আমি আছি।'

'বিধান রায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে তুমি নেই ?'

'তার মানে আমি বিধান রায়ের দলেও নই।'

'ঠিক আছে, যারা যেতে চায়, মানে যাদের মানবিকতাবোধ আছে তাদের নিয়েই এখনই চলে এস। ছেলেরা জড় হয়ে গিয়েছে।' কথাগুলো মায়া বলল বেশ গলা তুলে যাতে কমররুমের সবাই শুনতে পায়। বলে চলে গেল সে। দীপা মেয়েদের দিকে তাকাল। তারা গল্প করছে এমন ভঙ্গীতে যেন কোন কথাই কানে যায়নি। শুধু মানসী নামের একটি মেয়ে এগিয়ে এল, 'চল, আমিও যাব।' মানসী ফোর্থ ইয়ারে পড়ে, হোস্টেলে থাকে। ওর বাড়ি আসামের হাইলাকান্দি শহরে। আসলে সিলেটের লোক ছিলেন ওর বাবা। এদেশীয় মেয়েদের আড়ষ্টতা ওর মধ্যে নেই। মানসী বলল, 'আর কেউ যাবে বলে মনে হচ্ছে না।' সিঁড়ির মুখে গোটা তিনেক মেয়ে বেশ সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দেখলে মনে হয় না পড়তে এসেছে। দীপা লক্ষ্য করল ট্রাকের সামনে দাঁড়ানো কয়েকটা ছেলের সঙ্গে ইশারায় কথাবার্তা চলছে। এরা ইন্টার মিডিয়েট ক্লাসের ছাত্রী। তিনটে ছেলে শেষ পর্যন্ত সাহস করে ওদের সামনে দাঁড়াল। কি কথা হল দূর থেকে শোনা গেল না। কিন্তু অনেকখানি ন্যাকামো করে তিনটি মেয়ে সিঁড়ি ভেঙে এগিয়ে গেল ট্রাকের দিকে। এই সময় গ্লোরিয়া চিৎকার করে ডাকল, 'হ্যালো, দীপাবলী।'

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলেরা এদিকে তাকাল। অর্থাৎ সমস্ত কলেজ জেনে গেল তার নাম দীপাবলী। ভাগ্যিস মেয়েটা আজ সাদা জামা সবুজ স্কার্ট পরেছে। গ্লোরিয়ার সঙ্গে তার বান্ধবীরাও ছিল। গ্লোরিয়া বলল, 'ওরা আমাদের ডাকছে না কেন ?'

মানসী বলল, 'সব ছেলে মেয়েকেই তো ডাকছে।'

'তাহলে আমরাও যেতে পারি ?'

দীপা বলল, 'স্বচ্ছেন্দে।'

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। সিলকরা কৌটোর মাঝখানে এক ইঞ্চি ফুটো। মায়া তাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে একটা করে। ট্রাকে চেপে শহর পরিভ্রমণ শুরু হল। মাঝে মাঝে ট্রাক থামলে রাস্তায় নেমে পথচারিদের আসামের বন্যার কথা বলে কৌটো তুলে ধরছে ওরা। কেউ সেখানে পয়সা কিংবা টাকা ফেললে খুব আনন্দ হচ্ছে। দোতলা তিনতলা থেকে পুরনো জামাকাপড় ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ কেউ ট্রাকের ওপরে। মাইকে বারংবার আবেদন জানানো হচ্ছে সাহায্য করার জন্যে। দীপা লক্ষ্য করল গ্লোরিয়ারা সোৎসাহে লেগে পড়েছে

অর্থ সন্ধানে। যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে, 'হেল্প হেল্প, আওয়ার ব্রাদার্স সিস্টার্স আর ইন ডিসট্রেস। প্লিজ হেল্প দেম।' কলকাতার রাস্তায় তিনজন আফ্রিকার কালো মেয়ে কৌটো হাতে আসামের বন্যার্তদের জন্যে চাঁদা তুলছে, এ দৃশ্যে পুলকিত হচ্ছে সবাই। এমন কি তাঁরা যেকটি বাঙালি মেয়ে এই অভিযানে নেমেছে তারাও দ্রষ্টব্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসময় একটি সুদর্শন ছেলে দীপার সামনে এসে দাঁড়াল, 'কিছু মনে করবেন না, এখানে গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াবে। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন তাহলে বাড়িগুলোর ভেতরে গিয়ে মেয়েদের কাছে সাহায্য চাইতে পারি।'

আপত্তি করার কিছু দেখল না দীপা। মানসী এখন অন্য ফুটপাথে। তাকে ডাকার অবকাশ নেই। দীপা ছেলেটার সঙ্গে পা বাড়াল। সামনের বাড়ির দরজা খোলাই ছিল। কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি হোস্টেলে থাকেন।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আপনি তো দীপাবলী, আমি অসীম।অসীম চক্রবর্তী। মায়ার কাছে আপনার কথা শুনেছি। আমি এবার ইকনমিক্স নিয়ে দিচ্ছি। আপনাকে দেখে আমার খুব সহজ মনে হয়।'

॥ ৩২ ॥

একটা দুপুর এবং বিকেলের অনেকটা সময় ধবে ওবা উত্তর কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াল। এই একদিনেই উত্তর কলকাতার রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা হয়ে গেল দীপার। একটা লরিব অর্ধেকটা জনসাধারণের দানে ভরে উঠেছে। সম্ভবত তাঁদের কাছেও কোনদিন ছেলেমেয়েবা দল বেঁধে এসে এভাবে কোন দুর্গতদের জন্যে সাহায্য চায়নি।

দীপাব একটুও ক্লান্তি লাগছিল না।বিবেকানন্দ রোড ধরে ওরা এখন চিৎপুরের দিকে বাঁক নিয়েছে। মায়া বলল, 'আর একটু এগোলেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি।'

দীপা উত্তেজিত হল, 'ওখানে গিয়ে সাহায্য চাওয়া যায় না?'

অসীম বলল, 'ট্রামরাস্তা থেকে অনেক ভেতবে। বিকেলও হয়ে গিয়েছে।'

দীপা বলল, 'ওখানে কিন্তু সাহায্য পাওয়া যেতই।'

মানসী জানতে চাইল, 'এত জোর দিয়ে বলছ কি কবে?'

'বাঃ, ওই বাড়ি থেকেই এক সময় বাংলাদেশের মানুষ নবজাগরণের শিক্ষা পেয়েছে। ওখানে ববীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। ভাবতে পারো?'

অসীম হাসল, 'সে তো অনেক আগের কথা। তারপর সময় বয়ে গিয়েছে। সময় আমার সময়। যে-মাথায় শৈশব থেকে যৌবনে কাজল কালো চুল, সেই একই মাথায় বার্ধক্যে কাশফুল ছড়িয়ে থাকে, না ঝরে গেলে?'

'আপনি না জেনে মন্তব্য করছেন!' দীপা প্রতিবাদ করল।

'আমি জীবনের সত্যি বলছি। দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ,. রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ এবং খুব অল্প হলেও রথীন্দ্রনাথ—কিন্তু তার পরে আর কোন মানুষ ওই বাড়িতে জন্মায়নি যাঁকে নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে। জন্মানোটা যেমন বিস্ময়ের হতে পারে না জন্মটা কিন্তু অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।'

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যাওয়া হল না দীপার। কিন্তু এর মধ্যে দুটো কাণ্ড সে দেখতে পেল। প্রায় জনা পঞ্চাশেক ছেলেমেয়ে কলেজ থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল সাহায্য

সন্ধানে। এখন তিরিশজনও আছে কিনা সন্দেহ। সেই দুটি মেয়ে এবং তাদের দুই ছেলে বন্ধু কখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। দীপা ভেবে পাচ্ছিল না ওরা কোথায় যেতে পারে! কোন রেস্টুরেন্টে বসে গল্প করবে? অসম্ভব। কেউ যদি সেখানে দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। পার্কে বসে কথা বলার সুযোগই নেই। অথচ কলেজ থেকে বেরুবার সময় এবং রাস্তায় বেরিয়ে ওদের চোখে মুখে যে মতলব খেলে যেতে সে দেখেছে তা জলপাইগুড়িতে একমাত্র মিতার মুখেই সে দেখেছিল। ছেলেদের সঙ্গ মানেই একটা গোপন পাপ—যা করার জন্যে কিছু মেয়ে চাপা উৎসাহ বোধ করে। যেমন মীর্জাপুর স্ট্রিটের সেই ভাড়াটেদের মেয়েটি। সে সাহসী ছিল কারণ তার অভিভাবকরা জীবনধারণের সরঞ্জাম যোগাতে এমন ব্যস্ত থাকেন যে তার ওপর নজর দেওয়ার সময় পান না। ব্যাপারটা সে মায়াকে বলল। মায়া হাসল, 'তুমি লক্ষ্য করেছ?'

'হ্যাঁ। ওরা তো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমাদের মত গল্প করতে পারত।'

'তাতে ওদের মন ভরত না।' মায়া আর কথা বাড়াল না।

গ্লোরিয়া লুসাকা খুব উৎসাহিত। ওদের সঙ্গে অসীমের আলাপ করিয়ে দিল দীপা। অসীম বলল, 'ভাবতে খুব ভাল লাগছে, কোথায় জাম্বিয়া আর কোথায় আসাম, তবু আপনারা আসামের মানুষদের সাহায্য করতে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় বের হয়েছেন।'

গ্লোরিয়া প্রতিবাদ করল, 'এ কি কথা বলছেন? এখন আমরা এক কলেজের ছাত্রছাত্রী। মানুষের বিপদে মানুষ হিসেবে যেটুকু করা উচিত তাই করছি।'

ওরা কলেজে ফিরে এসেছিল। লুসাকা বলল, 'চল আমরা সবাই মিলে কফি খাই।'

অসীম বলল, 'কফি খেতে হলে কফি হাউসে যেতে হবে। কলেজ স্ট্রিটে।'

'এখনকার রেস্টুরেন্টে কফি পাওয়া যায় না?' গ্লোরিয়া জানতে চাইল।

'না। পেলেও ভাল না। চা খেলে বসন্ত কেবিনে যাওয়া যেতে পারে।'

দীপার বেশিদূরে যাওয়ার বাসনা ছিল না। ওরা বসন্ত কেবিনের দিকে এগোল। কিন্তু মানসী ওদের সঙ্গে গেল না। ওর শরীর নাকি ভাল লাগছে না তাই হোস্টেলে ফিরে গেল। দীপার মনে হল মানসী সঠিক বলল না। একসঙ্গে সাহায্য চাইতে রাস্তায় নামা যায় কিন্তু রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খাওয়ায় বোধ হয় ওর মন সায় দিল না।

বসন্ত কেবিনে ঢোকামাত্র যাঁরা বসেছিলেন অবাক হয়ে তাকালেন। কালো বিদেশিনী মেয়ে দূরের কথা বাঙালি মেয়েরা বড় একটা রেস্টুরেন্টে খেতে আসে না। দীপার একটা আলাদা উত্তেজনা ছিল। সে এই প্রথম রেস্টুরেন্টে ঢুকছে। কোণার দিকের একটা খালি টেবিলে ওরা পাঁচজনে বসল। অসীম চাপা গলায় বাংলায় বলল, 'এদের আমারই খাওয়ানো উচিত। প্রথম দিন তো!'

দীপা বলল, 'আপনি একা খাওয়াবেন কেন? আমিও দেব।'

'ছেলে হিসেবে সেটা আমার ভাল লাগবে না।' হেসে ফেলল অসীম।

গ্লোরিয়া বাংলা কথা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলছ তোমরা?'

দীপা বলল, 'অসীম দাবি করছেন তিনি একজন ছেলে।'

গ্লোরিয়া অবাক হল, 'সেটা দাবি করার কি আছে? দেখলেই তো বোঝা যাচ্ছে?'

অসীম এবার এমন শব্দ করে হেসে উঠল যে বসন্ত কেবিনের ম্যানেজার পর্যন্ত হাঁ করে তাকাল। টোস্ট আর চা বলা হল। মায়া আসেনি। তার অনেক কাজ। সংগৃহীত জিনিসপত্র সঠিক জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। দীপার মনে হয় এই মেয়ে সময় এবং সমাজ ছাড়া। ও যে কাজ করে যাচ্ছে তা কাউকে তোয়াক্কা না করেই করছে।

এবং কেউ তো ওর সামনে এসে বলছে না তোমার করা চলবে না। এটা কলকাতা বলেই সম্ভব হয়েছে। জলপাইগুড়ি হলে হুলুস্থুল পড়ে যেত। কলেজের ওপর চাপ আসতো এমন ছাত্রীকে ছাড়িয়ে দেবার। তাই যদি হয়, কলকাতার মানুষ যদি এত উদার তাহলে অন্য মেয়েরা কেন এখনও এত আড়াল আবডাল খোঁজে?

হঠাৎ অসীম বাংলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার প্রিয় কবি কে?'

দীপা দেখল গ্লোরিয়ারা নিজেদের ভাষায় গল্প করছে। অসীম কিংবা দীপা একা থাকলে ওরা নিশ্চয় ইংরেজিতে কথা বলত। সে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাংলাতেই বলল, 'এর চেয়ে কঠিন প্রশ্ন আপনার পায়ের তলায় কি?'

'উত্তরটা কি হবে?'

'আপনি নিশ্চয়ই জুতো বলবেন না।'

'না, মাটি।'

'ঠিকই। যে কোন বাঙালির প্রিয় কবি হওয়া উচিত রবীন্দ্রনাথ।'

'কেন?' অসীমের মুখে কৌতুক।

'আপনার সঙ্গে বোধ হয় আর কথা না বলাই আমার উচিত।'

'সুন্দর। আপনি জীবনানন্দ দাশ পড়েছেন।'

'পড়েছি।'

'তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে আপনার পছন্দ? জীবনানন্দ কি অনেক আধুনিক নন?'

'দেখুন, জীবনানন্দ আমার চেতনার কাছে আবেদন করেন। তাঁকে বুঝতে গেলে বুদ্ধি এবং আগ্রহ দুই রাখতে হয়। আর সবচেয়ে বড় কথা, জীবনানন্দ আমাকে বড় একা করে দেন। একা এবং নিঃসঙ্গ। তিনি বড় কবি। তাঁকে পড়লে নিজের সম্পর্কে একধরনের বিভ্রম জাগে। শব্দের খেলায় তিনি এক লৌকিক এবং অলৌকিক জগতের মাঝখানে আর একটি জগৎ সৃষ্টি করে ফেলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার বোধে আমার অস্তিত্বে প্রাণদান করেন। আমার মনের গা ঘেঁষে বন্ধুর মত এসে বসেন।'

কথাগুলো বলতে বলতে দীপা এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল লক্ষ্য করেনি যে গ্লোরিয়া চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে থেমে যেতে গ্লোরিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এত উত্তেজিত কেন?'

'লুসাকা হাসল, 'রাগ তো অনুরাগের দ্বিতীয় স্তর।'

দীপা হতভম্ব, 'মানে?'

লুসাকা বলল, 'প্রথমে আলাপ হবার সময় একধরনের মুগ্ধতা কাজ করে। তারপর কোন ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হলে রাগারাগি হয়। সেই স্টেজটায় যাদের সম্পর্ক না কেটে যায় তাহলে অনেকদিন তারা একসঙ্গে এগোতে পারে।'

অসীম তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আমাদের কিন্তু সেসব কিছুই হচ্ছে না। দুই বড় কবি নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল।'

'বিতর্ক যে-কোন বিষয় নিয়েই হতে পারে।' লুসাকা মাথা নাড়ল।

দীপা একটু উষ্ণ হল, 'লুসাকা, আমাদের আজই আলাপ হয়েছে।'

এবার গ্লোরিয়া চোখ বড় করল, 'সত্যি? আমি তো ভাবছিলাম অসীম তোমার বয়ফ্রেন্ড। ওয়েল, অসীম, দীপাবলীকে তোমার কেমন লাগে?'

অসীম গম্ভীর হল, 'খুব জটিল প্রশ্ন। কয়েক ঘণ্টার আলাপে কি বলা যায়?'

অসীম এমন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল যে গ্লোরিয়ারা শব্দ করে হেসে উঠল। বেশ রাগ

হয়ে গেল দীপার। সে ঘাড় বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অভিনয় করেন নাকি ?'

জবাব দিতে গিয়ে আচমকা থেমে গেল অসীম। তার চোখে মুখে বিস্ময়। দৃষ্টিটা এত অস্বস্তিকর যে চোখে চোখ রাখতে পারল না দীপা। লুসাকা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ?'

অসীম ইংরেজিতেই বলল, 'আমাদের এখানে একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আছেন যিনি অনেকের বুকের শব্দ বাড়িয়ে দেন। আমার তাঁর কথা মনে পড়ল।'

দীপা এবার ফোঁস করে উঠল, 'মানে ?'

অসীম ইংরেজিতেই বলল, 'আপনি যখন ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তাকালেন তখন যেন অবিকল সুচিত্রা সেনকে দেখতে পেলাম।'

'অদ্ভুত !' সমস্ত শরীর ঝিনঝিন করতে লাগল দীপার।

এরপর আড্ডা জমল না। অসীম রাজি হচ্ছিল না তবু জোর করে অর্ধেক দাম দিয়ে দিল দীপা। বসন্ত কেবিন থেকে ওদের হোস্টেল খুব বেশিদূর নয়। অসীমের সঙ্গে হাঁটতে একদম ইচ্ছে করছিল না দীপার। কিন্তু সে বুঝতে পারছিল অসীম ক্রমাগত তাকে দেখে যাচ্ছে। হোস্টেলের গেট পর্যন্ত এল সে। গ্লোরিয়ারা যখন বিদায় জানিয়ে ঢুকে যাচ্ছে তখন অসীম কেমন অদ্ভুত গলায় ডাকল, 'দীপাবলী, শুনুন !'

উপেক্ষা করতে চেয়েও পারল না দীপা। কোন জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অসীম বেশ দুঃখিত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি রাগ করেছেন। আমি কিন্তু স্রেফ রসিকতা করতে চেয়েছিলাম। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।'

দীপা এড়াতে চাইল, 'ঠিক আছে।'

অসীম তাড়াতাড়ি বলল, 'আর একটা কথা— ।'

'বলুন !'

'আমি, আমি আপনার বন্ধুত্ব চাইছি।'

এবার না হেসে পারল না দীপা।

'আপনি হাসছেন যে ?'

'বন্ধুত্ব কি দেওয়া যায় ? বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আপনার সঙ্গে আমার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকলে সেটা গড়বে কি করে। এলাম।' সে আধা ভেজানো গেটের ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল। নিজের ঘরে পৌঁছে দেখল গ্লোরিয়া তখনও সেখানে পৌঁছায়নি। হয়তো লুসাকাদের ঘরে আড্ডা মারছে। দীপার মনে হল স্নান কবতে পারলে ভাল লাগবে। সারাদিনের পরিশ্রম তো ছিলই, অসীম তার মেজাজ খারাপ কবে দিল। খামোকা কিছু তরল রসিকতা— । আচ্ছা সেকি একটু বেশি মাত্রায় বয়স্কা হয়ে যাচ্ছে ! বয়সের তুলনায় নিজেকে কি বেশি গম্ভীর করে ফেলছে। এবং তখনই তাব মনে পড়ল। সেই কোন বালিকা বয়সে এক আলো ফুটতে শুরু হওয়া ভোরে চা-বাগানের বাড়ির সামনে শিশিরভেজা শিউলি ফুল তোলার সময় মালবাবুর বাড়িতে আসা এক শহুরে ছেলে তাকে বলেছিল, তোমাকে ঠিক সুচিত্রা সেনের মত দেখতে। সেই মুহূর্তে ছেলেটিকে তার খারাপ লেগেছিল। সেই খারাপ লাগাটা নিশ্চয়ই মনের আনাচে কানাচে এতকাল লেগেছিল, আজ অসীম বলামাত্র সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকের এই অস্বস্তিটা সেই ছেলেটির কারণে। বোধ শুরু হবার আগেই তার মনে বিরূপতা জন্মেছিল। যদি কেউ কখনও তাকে কিছু না বলত, কথাটা যদি অসীমের মুখে আজ প্রথম শুনতো তাহলে খুব বেশি হলে সে বলত, আপনার চোখে ন্যাবা হয়েছে অথবা হেসে উড়িয়ে দিত। এত কাণ্ড করে ফেলত না। স্নান করে তাজা হয়ে দীপার মনে হল সে একটু বাড়াবাড়ি করেছে। কিন্তু অসীম তা সত্ত্বেও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব

করতে চাইল। সে কোন ছেলেমেয়েকে এমন প্রকাশ্যে বন্ধুত্ব আকাঙ্ক্ষা করতে শোনেনি! ছেলেমেয়ের মধ্যে আন্তরিক সম্পর্ক মানেই একটি পরিণতি এমন ধারণাই তৈরি আছে। শেষের কবিতার লাবণ্য এবং অমিত রায় যতই বন্ধুত্বের কথা বলুক সেটা কখনই ছেলেয় ছেলেয় অথবা মেয়েতে মেয়েতে বন্ধুত্ব নয়। হে বন্ধু বিদায়, শব্দ তিনটির মধ্যে আর একধরনের আর্তি না-পূরণ হওয়ার কান্না আছে।

স্কটিশচার্চ কলেজে পডাশুনার একটা চমৎকার আবহাওয়া আছে কয়েকজন অধ্যাপক তো রীতিমত বিখ্যাত। যেমন কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সুদর্শন মিষ্টভাষী প্রৌঢ়কে খুব ভাল লাগে দীপার। এখন তো পড়াশুনা রীতিমত মাঝপর্যায়ে। হোস্টেল আর কলেজ ছাড়া কোন কিছুতেই মন দিতে সে নারাজ। নিজেকে দাঁড় করাতে হবে। অনেক ওপরে উঠতে হবে। এ ধরনের প্রতিজ্ঞা প্রতিনিয়ত করে চলেছে দীপা। বি·এ· পরীক্ষা দেবাব পর এম·এ· না পড়ার সিদ্ধান্ত সে নিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসলে আরও বেশি কাজ হবে। এম·এ· পাস করে কোন স্কুল অথবা কলেজে চাকরির জন্যে ঘুবে বেড়ানোব কোন মানে হয় না। মায়া অবশ্য ইংরেজি নিয়ে এম·এ· পড়বে। এত কাণ্ড করেও মেয়েটা ভাল ছাত্রী হিসেবে ঘোষাল স্যার কিংবা সুশীল মুখোপাধ্যায়ের খুব প্রিয়। মায়ার আকাঙ্ক্ষা ইংরেজিতে অধ্যাপনার সঙ্গে নাটক করে যাওয়া। ওদের দলে বেশ কয়েকবাব যাওয়ার জন্যে বলেছিল মায়া। দীপাই আগ্রহ দেখায়নি। গ্লোরিয়ারা সব করছে শুধু পডাশুনা ছাড়া। মেয়েটা বই নিয়ে বসতেই চায় না। ওদের ছেলে বন্ধুর সংখ্যা এত যে পড়াব সময় পায় না। অনেক রাত্রে ফেবার জন্যে এর মধ্যে দু-দুবার সুপারের কাছে ওয়ার্নিং খেয়েছে।

আপাতত যে সমস্যাটা বড হচ্ছে তা হল পুজোর ছুটি আসছে। এই সময় একমাত্র বিদেশিনী ছাডা হোস্টেলে কোন ছাত্রী থাকে না, থাকার কথাও নয়। দারোয়ান ছাড়া ঠাকুর চাকররাও ছুটিতে যায় পালা করে। কিন্তু দীপা এবাব কি করবে? কলকাতায় পড়তে আসার পর থেকে অঞ্জলি তাকে কোন চিঠি লেখেনি। মাঝে একবার মনোরমা আশীর্বাদ জানিয়ে একটা পোস্টকার্ড লেখেন। অমরনাথের শেষ চিঠি এসেছিল মাসখানেক আগে। হাতের লেখা বেশ কাঁপা কাঁপা। চাকরিতে জয়েন করে তিনি আবার ছুটি নিয়েছেন। এভাবে চললে আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে উইদাউট পে হতে হবে। সেখানে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা প্রবল হয়ে উঠেছে। তবে এসব ব্যাপার নিয়ে দীপা যেন কোন চিন্তা না করে। ওঁরা কেউ জানতে চাননি কবে দীপার পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে এবং সে কবে আসছে!

দীপা জানে সুর কেটে গিয়েছে। মূলত অঞ্জলির ব্যবহারেই এটা ঘটেছে। এতদিনের সম্পর্ক হঠাৎ কি করে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়? মানুষের কোন সম্পর্কই কি শিকড় ধরে উঠে আসা নয়? নাকি শিকড়গুলোও সময় বুঝে আলগা হয়ে যায়? কিন্তু এসব সত্ত্বেও যেটা সত্যি পেছন ফিরে তাকালেই দীপার বুকের ভেতর টনটনানি শুরু হয়ে যায়। কত সুন্দর স্মৃতি, অঞ্জলি মনোরমার কত স্নেহের ছবি, আদুরে ভঙ্গী, রেজাল্ট বেরুবার পর অমরনাথের তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠা—এসব যখন বুকের ভেতরে ছটফট করে তখন আজকের অভিমান ধুয়ে মুছে একসা হয়ে যায়। দীপা ঠিক করল, শেষবার যদি হয় হোক তবু সে এবার চা-বাগানে যাবে।একাই।

সুভাষচন্দ্র অবশ্য প্রতি মাসে একবার আসেন খোঁজখবর নিতে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে

তিনি কখনও দীপাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন না। তাঁর কথাবার্তাও মোটামুটি একই ধরনের থাকে। পড়াশুনায় যেন ফাঁকি না দেওয়া হয়, এম·এ· পাস করে স্কুলের শিক্ষিকা না হলে সারাজীবন কষ্টে থাকতে হবে। সে যে সুযোগ পাচ্ছে তা বাংলাদেশের খুব কম ছেলেমেয়েই পায়। পরে অমরনাথের প্রসঙ্গে চলে যান তিনি। এত বছর চাকরি করেও তিনি নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেননি। ছেলেদের অথবা স্ত্রীর কথা ভাবেননি। তার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে তাঁকে। সুভাষচন্দ্রের ধারণা চিরকালের জন্যে অমবনাথ অকর্মণ্য হয়ে গেলেন। এত দূর থেকে তাঁর পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানিয়ে গেলেন।'

সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিল দীপা। আগামী আড়াই বছরের মধ্যে, বড় জোর তিন বছর সে সময় নেবে একটা চাকরির জন্যে উপযুক্ত হতে। এই তিন বছরে বড় জোর ছয় হাজার টাকা তার নিজস্ব খরচ হবে। এবার পূজোর ছুটিতে গিয়ে ওই টাকাটা বাদ দিয়ে ব্যাঙ্কের বাকি টাকা সে অমরনাথের হাতে তুলে দিয়ে আসবে। ফার্স্ট ইয়ার থেকে শেষ পর্যন্ত যে টাকাটা তার জন্যে খরচ হবে তা সুদে-আসলে ফেরত দেবে অঞ্জলিকে চাকরিটা পেয়ে গেলে। জীবনের এই ঋণ সে কখনও বহন করবে না।

অসীমের সঙ্গে কলেজে তার প্রায়ই দেখা হচ্ছে। কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়েকে নিয়মিত কথা বলতে দেখলেই গল্প চালু হয়। কিন্তু যেহেতু অসীমকে এখন খারাপ লাগছে না তাই গল্পের ব্যাপারটাকে সে কেয়ার করছে না। অসীম তার সঙ্গে হোস্টেল পর্যন্ত প্রায়ই হেঁটে আসে। ছুটির দিন দশেক আগে হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে যাওয়ায় দীপা ঠিক কবল শিয়ালদা স্টেশনে যাবে টিকিট কাটতে। যাদবপুর থেকে রাধা নামের একটি মেয়ে শিয়ালদা স্টেশনে আসে ট্রেনে চেপে। ওর তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। শাড়ি জামা দেখলে বোঝা যায় অবস্থা তেমন ভাল নয়। দীপার সঙ্গে কয়েকবার কথা বলেছে। কথায় এখনও পূর্ববঙ্গেব টান আছে। দীপা রাধাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি বাড়িতে ফিরছ?'

রাধা মাথা নাড়ল, হাঁ। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বাসে যাবে?'

'বাসে অনেক পয়সা লাগে। আমি ইস্টিশন পর্যন্ত হেঁটে যাই, সেখান থিকা ট্রেনে।'

'ভালই হল। আমি তোমার সঙ্গে: শিয়ালদা পর্যন্ত যাব। আপত্তি আছে?'

রাধা যেন খুশি হল, 'কিন্তু আমি হেঁটে যাই!'

দীপা হাঁটতেই চাইল। কলেজের গেটের বাইরে অসীম দাঁড়িয়েছিল। ওদের উল্টো দিকে হাঁটতে দেখে জিজ্ঞাসা করল দূর থেকেই, 'ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

দীপা বলল, 'স্টেশনে।'

'মানে?'

'টিকিট কাটবো।'

'ও।' একটু হকচকিয়ে গেল যেন অসীম। দীপা কথা না বাড়িয়ে রাধার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। সে প্রশ্ন করল, 'তুমি যাদবপুরে থাক, এতদূরে পড়তে এলে কেন?'

'এই কলেজে নাকি বিবেকানন্দ পড়ছিলেন তাই বাবা এইখানেই ভর্তি করলেন।

'তোমার বাবা কি করেন?'

'কাটা কাপড়ের ব্যবসা। হাটে হাটে।'

'হাট? কলকাতায় আবার হাট বসে নাকি?'

রাধা হাসল, 'তুমি জানো না, কলকাতায় অনেকগুলো হাট বসে।'

'তোমরা কবে এসেছ পূর্ববঙ্গ থেকে?'

'আমরা বলি পাকিস্থান। যে সালে ইন্ডিয়া স্বাধীন হইল তার পরের সালে। নাইনটিন ফরটি এইট। বাবায় আসতে চায় নাই, কিন্তু আর একদিন থাকলে আমরা সব খতম হইয়া যাইতাম। আসার সময় যে কি কষ্ট তা তোমরা বুঝবা না।'

'এখানে কি বাড়ি ভাড়া করে আছ?'

'নাঃ। কলোনি। যে যার মত জমি দখল কইর‍্যা বইস্যা পড়ছে।'

'তুমি এখানকার স্কুলে পড়েছ?'

'হ। কলোনির স্কুল। এইরে, আমি একদম দ্যাশের ভাষা কইয়া ফেললাম।'

'তাতে কি? চা-বাগানে আমার একজন মাস্টারমশাই ছিলেন, তিনিও তাঁর দেশের ভাষায় কথা বলতে ভালবাসতেন। মাতৃভাষায় কথা বলতে তো আরাম লাগেই।'

'তুমি অন্যরকম।'

'আচ্ছা, এই যে তুমি যাদবপুর থেকে শিয়ালদায় ট্রেনে আসো, সেখান থেকে হেঁটে কলেজে, এত কষ্ট করো কেন?'

'করি কারণ পয়সা নাই। বাবায় তো কিছু দিতে পারে না। আমরা অনেকগুলান ভাই বুন। সক্কালে আর সন্ধ্যায় আমি দুটা মেয়েরে পড়াই। তা বিশ পঁচিশ টাকা হয়। জানো, কলেজের অন্য সবাইকে দেইখ্যা ভাবি ভগবান তাদের কত সুখে রাখছেন।'

দীপা অবাক হয়ে তাকাল। একই কলেজে গ্লোরিয়ারা পড়তে এসেছে আবার রাধার মত মেয়েও। কেউ সেন্টের দাম শাড়ির রঙ নিয়ে কথা বলে, কেউ খিদে চেপে থাকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই যে তুমি একা আসো, তোমার মা-বাবা বাড়ির লোকজন এতে কখনও আপত্তি করেনি?'

'প্রথম প্রথম কেউ কেউ করত এখন করে না। কলোনিতে এখন সবার উনুন ধরাবার চিন্তা, এসব নিয়ে ভাববার সময় কোথায়? আমি যদি বি·এ পাস করে একটা চাকরি পেয়ে যাই তাহলে আমাদের পরিবারটা বেঁচে যাবে। সবাই যখন এটা জানে তখন বাধা দেবে কেন?' রাধা হাসল।

ওরা শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকল। নিত্য আসা-যাওয়া করলেও রাধা মেইন স্টেশনের অনেক কিছুই চেনে না। জিজ্ঞাসাবাদ করে জলপাইগুড়ির টিকিট কাটল দীপা। তারপর বলল, 'চল, কিছু খাই।'

'না। থাক।' মাথা নাড়ল রাধা।

'কেন? কি খেয়ে বেরিয়েছ তুমি?'

রাধা ঠোঁট কামড়ালো। চোখে চোখ পড়তে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। দীপা তবু জিজ্ঞাসা করল, 'ভাত খেয়ে আসনি?'

'আজ আমাদের ভাত হয় নাই। হয়তো এখন হবে।'

'ও। তাহলে তো তোমার খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।'

'থাক। ভাইবুনের বোধ হয় খাওয়া হয় নাই, আমি খাই কি করে!' মাঝে মাঝেই রাধা সতর্ক হয়ে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে। দীপা আর কথা বাড়াল না। সে অন্তত দশটা টাকা রাধাকে দিতে পারত। কিন্তু সেটা দিতে কুণ্ঠা এল। এরকম একটা লড়াই করা মেয়েকে সাহায্য করতে চাইলে সে অপমানিত বোধ করতে পারে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি একা ফিরতে পারবা? কোন অসুবিধা নাই, একদম সুজা রাস্তা, মানিকতলা পর্যন্ত।'

দীপা মাথা নাড়ল। এক গাল হেসে রাধা তার ট্রেন ধরতে গেল। মাথার ভেতর এখন

চিন্তার টানাপোড়েন। রাধা কি বাংলাদেশের মেয়ে নয় ? এখন এই সময়েও যে দেশের পুরুষেরা মেয়েদের ঘরের বাইরে একা যেতে দিতে চায় না, যে দেশের মেয়েরা পুতুল খেলে সুখ পায় সেই দেশের মেয়ে রাধা ? ও নিশ্চয়ই একা নয়। বাধাদের মত মেয়েরা কি দিন দিন বেড়ে যাবে বাংলাদেশে ? সেই প্লাবন এলে এইসব ঘরকুনো ভীতু মেয়েব দল কি আগল ভেঙে বেরিয়ে আসবে ?

অন্যমনস্ক ছিল দীপা। প্লাটফর্মের বাইরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল সে। হঠাৎ লক্ষ্য কবল দু'জন লোক তার খুব কাছ ঘেঁষে বিড়বিড় করে কিছু বলে চলে গেল। ব্যাপারটা ভালমতন বোঝার আগেই আবার একজন ফিরে এল। আকাশের দিকে তাকিয়ে এবার স্পষ্ট গলায় কথা বলল হাঁটতে হাঁটতে, 'চল, পেছন পেছন এসো।' সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকুনি খেল সে। লোকটার স্পর্দ্ধা কি ? একটা মাঝবয়সী মানুষ তাকে কি ভেবেছে ? যারা ডাকলেই পেছন পেছন যায় তাদের সঙ্গে কি কোন মিল আছে তার ? দীপার ইচ্ছে করছিল লোকটাকে ডেকে কৈফিয়ত চায়। কিন্তু নিজেকে সামলালো সে। লোকটা এবার খানিক দূরে চলে গিয়ে উদ্বিগ্ন চোখে তাকে দেখছে। দীপা ডানদিকে এগিয়ে গেল। আপার সার্কুলার রোড ধরে হাঁটবে। আর তখনই পেছন থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'এই, দীপাবলী, এক মিনিট।'

অবাক দীপা মুখ ফিরিয়ে দেখল অসীম প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে বেরুচ্ছে স্টেশন থেকে। কাছে এসে হাসল, 'সারাটা স্টেশন খুঁজে কোথাও পাইনি। টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে ?'

দীপা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'মানে, শুনলাম স্টেশনে আসা হচ্ছে তাই চলে এলাম। সেই মেয়েটা কোথায় ?'

'ওর বাড়ি চলে গিয়েছে।'

'ও। হোস্টেলে তো ?'

ইদানীং অসীম কথা বলছে এভাবেই। তুমি বা আপনি এড়িয়ে যাচ্ছে। দীপা হাসল, 'হোস্টেলে তো ফিরতেই হবে।'

'হাতে সময় থাকলে কফি'হাউসে যাওয়া যেতে পাবে।'

'কফি হাউস ?'

'এই তো কলেজ স্ট্রীটে। হেঁটে গেলে দশ মিনিটও নয়।'

নামটা এর মধ্যে অনেকবার কানে এসেছে। কলকাতার সমস্ত বুদ্ধিজীবী শিল্পীদেব নাকি সেখানে জমজমাট আড্ডা বসে। আগ্রহটা পেয়ে বসল। সে বাজি হল।

হ্যারিসন রোড ধরে অসীমের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল দীপা, 'কফি হাউসে মেয়েবা যায় ? আমি একা হয়ে পড়ব না তো !'

'আমি তো আছি। মেয়েরাও যায়। তবে সংখ্যায় খুব বেশি নয়।' অসীম কথা ঘোবাল, 'কবে জলপাইগুড়িতে যাওয়া হচ্ছে ?'

'যেদিন ছুটি হবে।'

'কালীপুজোর পরে ফেরা।'

'হ্যাঁ।'

'ও।'

'কেন ?'

'নাঃ, এমনি।'

'আমি ফিরতে নাও পারি।'

'মানে ?'
'জন্মাবার পরে আমি যাঁকে বাবা বলে এসেছি তিনি খুব অসুস্থ।'
'বাবা বলে এসেছি মানে ?'
'কারণ তিনি আমার জন্মদাতা বাবা নন। মা মারা গিয়েছিলেন আমায় জন্ম দিয়েই। আমি মাসি মেসোমশায়ের কাছে মানুষ। তাঁদেরই মা-বাবা বলি।'
'ও।' অসীমের মুখ গম্ভীর হল, 'ওঁর কি হয়েছে ?'
'বুকের অসুখ, সেই সঙ্গে ব্লাড প্রেসার।'
'কিন্তু তোমাকে তো পড়াশুনা শেষ করতেই হবে !' বেশ জোরের সঙ্গে বলল অসীম।
'দেখি।' ইচ্ছে করেই নিজের গল্পের খানিকটা দীপা বলল। কিন্তু সেটা শুনে অসীম যে অসতর্ক হয়ে তুমিতে নেমে আসবে বুঝতে পারেনি।
'আশ্চর্য ! দেখি মানে ? দীপাবলী, তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মত নও। তুমি একদম তোমার মত আলাদা। পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব।'
'আমি আলাদা কেন ?'
'আলাদা বলেই। তুমি মায়ার মত বেপরোয়া নও। আবার অন্য মেয়েদের মত বোকা ভীরু মোটা দাগের কিছু তোমার চরিত্রে নেই। আর এই জন্যেই তোমার সঙ্গে কথা বলতে, তোমার সঙ্গ পেতে আমার ভাল লাগে।'
'কিন্তু জীবনানন্দ দাশকে আমি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি বলতে রাজি নই।'
'আমি তর্ক করব না। কিন্তু জীবনানন্দ সত্যিকারের কবি।'
'তা নিয়ে তো কোন দ্বিমত নেই।'
হ্যারিসন রোড থেকে সংস্কৃত কলেজের রাস্তায় ঢোকার সময় অসীম বলল, 'তুমি কিন্তু আমায় খুব ভাবনায় ফেলে দিলে ! সত্যি পড়া ছেড়ে যাবে ?'
'আমার জন্যে এত ভাবনা হচ্ছে কেন ?'
অসীম একটু হকচকিয়ে গেল। কিছু ব্যাখ্যা করার জন্যে ভাবতে গিয়েও সে হাল ছেড়ে দিল। দীপা ততক্ষণে একটা বাইরে দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব বই ডিসপ্লের জন্যে রাখা আছে তার একটির দাম জিজ্ঞাসা করল। অসীম পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, 'কি ব্যাপার ? আই এ এসের কোয়েশ্চন পেপার কিনছো ?'
'উল্টে পাল্টে দেখব বলে।' দাম দিয়ে দিল সে। হাতে আর বেশি পয়সা রইল না এখন। অসীম বলল, 'আপনাকে আমি মোটেই বুঝতে পারি না।'
হাঁটা শুরু করে দীপা বলল, 'বোঝার কি দরকার ?'
'আমার নিজের প্রয়োজনেই বুঝতে চাই।'
'মানে ?'
'দীপাবলী, আপনাকে আমি বন্ধু হিসেবে পেতে চাই।'
'ওমা, বন্ধু না হলে এতটা পথ একসঙ্গে হেঁটে আসতাম নাকি ?' ডানদিকের একটা বাড়ির সিঁড়ি ধরে দোতলায় উঠে এল দীপা অসীমের সঙ্গে। আর ওঠামাত্র যেন বাজারের শব্দ পেল। কানে তালা লাগার যোগাড়। বিশাল হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে হতভম্ব। এত টেবিল এত চেয়ার এবং সেগুলো জুড়ে বসে বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা একই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাদা আলাদা কথা বলে যাচ্ছে। তাকে দেখামাত্র কাছাকাছি টেবিলের ছেলেরা কথা থামিয়ে উৎসুক চোখে তাকাল। দীপা দেখল অসীমই অস্বস্তিতে পড়েছে। সে বলল, 'চল, ওপরে যাই। ওখানে খালি টেবিল পাওয়া যেতে পারে।'

অতএব তিনতলায়। ইউ প্যাটার্নে বসার ব্যবস্থা। বাঁ দিকের হাতায় খালি টেবিল পাওয়া যেতে সেখানেই বসল ওরা। এখান থেকে ডান দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে দোতলার ভিড়টাকে স্পষ্ট দেখা যায়। দীপা দেখল দোতলার অনেকেই মুখ উঁচু করে তাকে দেখার চেষ্টা করছে। এইসময় অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'কি কফি খাবে ? ঠাণ্ডা না গরম ?'

কফি খাওয়ার চল উত্তরবঙ্গে একদমই নেই। দীপার মনে হল ঠাণ্ডা কফির দাম নিশ্চয়ই বেশি হবে। ধরন দেখে মনে হচ্ছে অসীমই দাম দেবে। সে বলল, 'গরম।'

অনেক ডাকাডাকির পর বেয়ারাকে অর্ডারটা দিতে পারল অসীম। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'এত লোক একসঙ্গে কথা বলে, ওদের মাথা ধরে যায় না ?'

'অভ্যেসের ব্যাপার।' অসীম হাসল।

'অভ্যেস করতে হলে রোজ আসতে হয়। ওদের অন্য কাজকর্ম নেই ?'

'নিশ্চয়ই আছে। তবে আলোচনা করাও কারো কারো কাজ। তুমি আই এ এস দেবে ?'

'ইচ্ছে তো আছে।'

'তাহলে তো গ্র্যাজুয়েট হতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

উত্তরটা শোনামাত্র অসীমের মুখে হাসি ফুটল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথা থাক। তুমি যখন শেষপর্যন্ত তুমিতে নামলে আমিও তুমি বলছি। পড়াশুনা শেষ করে কি করবে ঠিক করেছ ?'

'এম·এ· করে পড়াব। আমাদের বাড়িতে সবাই ব্যবসাদার।'

'বাঃ।' দীপা হাসল, 'এ তো গোত্রছাড়া ব্যাপার।'

'আমরা তিনভাই। বাবা তিন বছর হল মারা গিয়েছেন। বড়বাজারে বড় ব্যবসা আছে। দাদারা দ্যাখে। ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা জমাচ্ছে। আমার ওসব ভাল লাগে না। আমি জীবনটাকে অন্যরকম ভাবে দেখতে চাই। রুচি, শিক্ষা, সৌজন্য দিয়ে গড়া একটা জীবন।' অসীম হাসল, 'বাড়িতে আমার পজিশন তাই ভাল নয়। ব্যবসায় আমার আইনত অংশ আছে বলে কেউ কিছু বলতে পারে না।'

কলেজ স্ট্রিট থেকে হেঁটে এল দীপা। হাঁটতে কোন অসুবিধে হল না। অসীম কিন্তু সারাটা পথ প্রায় চুপচাপই ছিল। কথা না বলায় অসীমকে বেশ ভাল লাগছিল দীপার। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অসীমকে ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছিল। একটা তিরতিরে অনুভূতি মনের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। চেষ্টা করেও তা থেকে পরিত্রাণের পথ নেই। আর এই সময় অসীম একদম চুপচাপ পাশে হেঁটে এসেছে বলেই তা আরও দ্রুতগামী হয়েছে। কলেজের গেটে পৌঁছে অসীম জানতে চাইল 'কাল দেখা হবে ?'

'হবে।' ছোট্ট শব্দটা উচ্চারণ করে দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেল দীপা। কান গরম, শরীরে অদ্ভুত উষ্ণতা। ঘরের ভেজানো দরজা খুলে শুয়ে পড়তে গিয়ে থমকালো সে। নিজের খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে গ্লোরিয়া চাপা কাঁদছে। দীপা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে ?'

মুখ তুলল গ্লোরিয়া, 'আই অ্যাম ফিনিশড্। ও আমাকে বিট্রে করেছে।'

'কে ?' দীপা হতভম্ব।

'আমার বয়ফ্রেন্ড। হি ইজ এ চিট। অল দ্য বয়েস আর চিট।' কঁকিয়ে উঠল মেয়েটা, 'তবু কেন যে ওদের প্রেমে আমাদের পড়তে হয়! ঈশ্বর ?'

কলেজ এবং হোস্টেলের বাইরে দীপা প্রতি রবিবার বিকেলে মায়ার বাড়িতে যায়। এই সময় মায়া প্রায়ই বাড়িতে থাকে না। কিন্তু মায়ার মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক এখন এত কাছের হয়ে গিয়েছে যে সময় কাটাতে অসুবিধে হয় না। কলকাতা শহর, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মানুষের গল্প ভদ্রমহিলা অনর্গল বলে যান। ওঁর সঞ্চয়ে প্রচুর পুরনো বই রয়েছে। দীপাকে সেগুলো তিনি মাঝেমাঝেই পড়তে দেন। স্কটিশচার্চ কলেজের লাইব্রেরিতে নিয়মিত বই আনতে যায়। কিছুদিন একটা ঘোরের মধ্যে কেটেছিল দীপার। কিন্তু হঠাৎই একদিন মনে হল সে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত পরিধির বাইরে বড্ড বেশি মন দিচ্ছে। আর এই সময় সে বিবেকানন্দের লেখা এবং তাঁর জীবনী পড়ে ফেলল। একটা মানুষ অত অল্প দিনের মধ্যে এত কাণ্ড করে ফেললেন ? কখনই মনে হল না ওঁর জীবনটা বড় কম সময়ের। কথাটা এক রবিবারে মায়ার মাকে বলল দীপা। সেদিন মায়া ছিল। মায়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল শমিত। লম্বা, খুবই লম্বা, দোহারা চেহারা। মাথা ভর্তি চুল, চোখ বড় আর গলার স্বর ভরাট। মণি কলেজ থেকে বি·এ· পাস করেছে সদ্য। ফস করে বলে বসল, 'তাজ্জব ! আপনি বিবেকানন্দ পড়েছেন ?'

'তাজ্জব কেন ?' এই ভাবে কথা বলার মধ্যে একটা তাচ্ছিল্য পেল দীপা।

উত্তর না দিয়ে শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'মায়া, তুমি পড়েছ ?'

মায়া মাথা নাড়ল, 'না বাবা ! ধর্মটর্ম আমার পোষায় না।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল শমিত, 'মাসিমা, আপনার মেয়ে তো মায়া ? না, না, হতেই পারে না, হসপিটালে ওলটপালট হয়ে গিয়েছে।'

মায়া খুব রেগে গেল, 'এতে হাসির কি হল ? দ্যাখো শমিত, তুমি নাটক ভাল বোঝ মানে এই নয় সব বিষয়ে পণ্ডিত হয়ে গিয়েছ !'

চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়ল, 'উহুঁ ! আমি শিশির ভাদুড়ি নই যে নাটক বুঝে গিয়েছি। বোঝার চেষ্টা করছি এইমাত্র। কিন্তু কথা হল যেটা তুমি জানো না বিবেকানন্দের সঙ্গে ধর্মকে যারা জড়ায় তাদের ভাবনা খুবই দুর্বল।'

মায়ার মা চুপচাপ কথাগুলো শুনছিলেন, এবার বললেন, 'শমিত ঠিকই বলেছে।'

'বাঃ, রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য, রামকৃষ্ণমঠের প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দের সঙ্গে ধর্মের কোন সংশ্রব নেই ?' মায়া প্রতিবাদ করে উঠল।

মায়ার মা বললেন, 'শোন। বিবেকানন্দ একজন তেজস্বী মানুষ। তাঁর ভাবনায় কোন সংকীর্ণতা ছিল না। তিনি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন বটে কিন্তু নিজস্ব ভাবনার রূপ দিয়েছেন।'

শমিত বলল, 'মাসিমা, আমি একটু বলি। পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া আসা ছিল, শুনেছি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে দেবেন ঠাকুরকে গান শুনিয়েছেন। এরকম একটা মানুষকে রামকৃষ্ণ বেছে নিলেন কেন ? সবাই যখন তাঁর কাছে ছুটে যাচ্ছে শিষ্য হবার জন্যে, কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত, তখন রামকৃষ্ণ ডাকছেন বিবেকানন্দকে। তার মানে এই ভদ্রলোক স্রোতের বাইরে ছিলেন। মানুষ রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দের পছন্দ হল। তিনি শিষ্যত্ব নিলেন। বোধ হয় কোথাও একটা নাড়া বাঁধার প্রয়োজন পড়ে মানুষের। তা বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে থেকে যেতে পারতেন। থাকেননি। সমস্ত ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে বলেছেন নিজেকে জাগাতে হবে। আত্মাকে আবিষ্কার করতে হবে। মাটির দেবতা নয় মানুষকে সেবা করতে হবে।

মেয়েলিপনা একদম পছন্দ করতেন না। আমার ধন্দ লাগে, উনি যখন মারা গেলেন তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স একচল্লিশ। অথচ ওঁদের মধ্যে কোন সেতু ছিল না। অথচ দুজনের মন ছিল সংস্কারমুক্ত, দুজনেই কয়েক শতাব্দী বেশি আধুনিক ভাবনা নিয়ে জন্মেছিলেন। চারপাশের আবহাওয়াতে ওই দুইজন ছিলেন বেমানান। এক টানে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেছেন। কিন্তু কেউ কারো ছায়া মাড়াননি। এই সময়ে বিবেকানন্দকে পড়লে মনে হয় আজ যারা কম্যুনিজমের বুলি আওড়ায় তিনি তাদের থেকে অনেক খাঁটি কম্যুনিষ্ট। মানুষ নিয়ে যে লোকটি কাজ করে গেলেন তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কোন অসুবিধে ছিল না। বুঝলে খুকি ?'

দীপা চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'বিবেকানন্দ কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেননি।'

শমিত বলল, 'কিন্তু তিনি স্বাধীনতার সমর্থনে কথা বলেছেন। আগে স্বাধীনতার জন্যে যোগ্য হতে হবে তারপর বাইরে স্বাধীনতা আদায় করতে হবে। এবং সেটা কোন বাইরের শক্তির হাত ধরে নয়। এক জাপানি ভদ্রলোক বোম বাঁধা শেখাতে এসেছিলেন বলে খুব খেপে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা বিবেকানন্দকে ভাল চোখে দেখত না। উনি মারা যাওযার আগে এদেশে সশস্ত্র বিপ্লবের সূত্রপাত হয়নি।'

মায়ার মা বললেন, 'তুমি এই বিবেকানন্দকে নিয়ে নাটক লিখছ না কেন ?'

'মাথায় আছে মাসিমা। খুব ইচ্ছে করে। এই দীপা, তুমি নাটক করবে ?'

দীপা হাসল, 'না। আমি পারব না।'

'পারবে না মানে ? চলে এস, পরীক্ষা হয়ে যাক।'

'তা নয়। আমার অন্য উদ্দেশ্য আছে। সেইটেই করতে চাই মন দিয়ে।'

'কি উদ্দেশ্য ?'

'একান্ত ব্যক্তিগত।'

শমিত চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, 'গুড। যেদিন উদ্দেশ্য সফল হবে সেদিন জানিও, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। মাসিমা, এ মেয়ে কিন্তু গোত্রছাড়া!' এবার শমিত ছাড়া সবাই হেসে উঠল।

দীপা বলল, 'কথাটা কি ঠিক হল ? আমি তো গোত্রের মধ্যেই রয়েছি। ওটা মায়া সম্পর্কে বলা উচিত। একসঙ্গে কতগুলো কাজ করছে। কাউকে বোকার মত ভয় পাচ্ছে না। ও যা করতে পারছে বাংলাদেশের ক'টি মেয়ে তা পারে ?'

কথাগুলো বললেও বুকের মধ্যে শমিতের শব্দটা বিঁধে গিয়েছিল, গোত্রছাড়া। সে কি সত্যি গোত্রছাড়া ? মনে যতই দ্বিধা না থাক, হিন্দুঘরের বিধবা, মাছ মাংস খায়, রঙিন শাড়ি পরে, গতরাত্রে গ্লোরিয়ার বারংবার অনুরোধে সিগারেটে দুটো টান দিয়ে অনেকক্ষণ কেসেছে নিজের বিছানায় বসে, তার বয়সী কোন বাঙালি মেয়ের এমন অবস্থা ? গোত্রছাড়া নয় তো কি ?

রাধার সঙ্গে কথা বলতে খুব স্বস্তি পায় দীপা। মেয়েটার কোন ভান নেই, সাজানো অহঙ্কার নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় ও এই কলেজে সব দিক দিয়ে বেমানান। এক শাড়ি দুদিন পরে আসে এবং দুটোর বেশী শাড়ি এখন পর্যন্ত দেখতে পায়নি। সেন্ট পাউডার শাড়ি সিনেমা অথবা ছেলেদের নিয়ে গল্প করে না। সন্ধ্যা নামের বাগবাজারের একটা মেয়ে তো তাকে বলেই বসল, 'ওই রিফ্যুজি মেয়েটার সঙ্গে কি এত কথা বল ?'

'জীবনের কথা।' হেসে উত্তর দিয়েছিল দীপা।

'তার মানে ?' হাঁ হয়ে গিয়েছিল সন্ধ্যা।

'ধর, তোমার মা-বাবা-দাদা আজ বিকেলে বললেন, কাল থেকে তুমি এ বাড়ির একটা ঘরে শুধু থাকতে পারবে। কিন্তু নিজের খাওয়া, জামাকাপড়, কলেজ পড়ার খরচ তোমাকেই রোজগার করতে হবে, কোন সাহায্য পাবে না বাড়ির কাছ থেকে, তুমি কি করবে ?'

'যাঃ, কেউ বলে নাকি ?'

'যদি বলে। তোমার তো আঠারো বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। মানুষ হিসেবে তুমি যথেষ্ট সাবালক। আমাদের বয়সে এখন অনেকেই দুই তিন ছেলেমেয়ের মা হয়ে যায়। অতএব তাঁরা যদি তোমাকে নিজের পথ দেখে নিতে বলেন তুমি কি করবে ?'

'দূর ! তোমার মাথা খারাপ !'

'আমি বলছি, যদি বলেন তাহলে—'

'মামার বাড়িতে চলে যাব।'

'মামা যদি জায়গা না দেন ?'

'ওরে বাবা ! তাহলে না খেয়ে মরতে হবে।' শিউরে উঠল সন্ধ্যা।

'কিন্তু যারা মরতে চায় না, যারা লড়াই করে, তাদের কাছেই জীবনের গল্প শোনা যায়।'

'ও তাই বল !' ঠোঁট ওল্টালো সন্ধ্যা, 'তুমি ওই রিফ্যুজি মেয়েটার সঙ্গে আমার তুলনা করছ ! আমি আর ও সমান হলাম।'

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গিয়েছিল দীপার। সে বলল, 'শোন, তুমি আর কখনও আমাকে ডেকে কথা বলবে না। তোমার সঙ্গে কথা বলার কোন প্রবৃত্তি নেই আমার।'

ছুটির পরে অসীমের সঙ্গে দেখা হল দীপার। গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল গম্ভীর মুখে। বলল, 'তুমি পরশু চলে যাচ্ছ ?'

হেসে ফেলল দীপা, 'কি ব্যাপার বলতো ? তুমি কি দিন গুনছ ?'

'না, মানে, আমার ভাল লাগছে না।'

'কেন ?' দীপা অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

'কি ছেলেমানুষী করছ ? কোন একটা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অথচ কেন [illegible] জানি না এমন বয়স থেকে আমরা অনেকদিন আগে চলে এসেছি।' বেশ শক্ত গলায় কথা বলল দীপা। অসীম অবাক হয়ে তাকাল, 'তোমার কি হয়েছে ?'

'আমার মন মেজাজ ভাল নেই।'

'কেন ?'

'দ্যাখো, ছেলেরা নয়, মেয়েরাই মেয়েদের এক নম্বর শত্রু। কোন মেয়ে আর একটা মেয়ের প্রশংসা প্রাণ খুলে করতে পারে না। যাদের অহঙ্কার করার কোন কারণ নেই তারাই আকাশে নাক তুলে থাকে। সময় বিশেষে ননীর পুতুল, ন্যাকামি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, আবার পরক্ষণেই ফণা বের করতে এদের জুড়ি নেই।'

'আজ কিছু হয়েছে ?' অসীম শক্ত গলায় জানতে চাইল।

'একটি মেয়ে যে সাজগোজ আর শরীর নিয়ে ব্যস্ত থাকে, বাপ দাদার স্নেহকে ন্যায্য অধিকার মনে করে নিশ্চিত সে সমালোচনা করছে একটা লড়িয়ে মেয়েকে যাকে সাহায্য করার কেউ নেই, পায়ের তলার মাটি খুঁজতে যে হিমসিম খাচ্ছে। নিজের যোগ্যতা নেই এক ফোঁটা সে করছে অন্যের সমালোচনা।'

'তুমি এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?'

'হব না ? এক শো বছরেও আমাদের বেশির ভাগ মেয়েদের কোন পরিবর্তন হল না ? শরৎচন্দ্রের সেই মুখরা নিন্দুক স্বভাবের নারী চরিত্র দিব্যি খোলস পাল্টে বেঁচে রয়েছে ? কে বলবে এদেশে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন ?'

'হঠাৎ এঁদের কথা ?'

'ক'দিন আগে মায়ার বাড়িতে বিবেকানন্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল। ওঁর বই পড়ছিলাম। আমেরিকায় গিয়ে বিবেকানন্দ সেই দেশের মেয়েদের মুক্ত জীবন দেখে অভিভূত হন। প্রকাশ্যেই বলেন, "শত সহস্রবার জন্মেও আমি আপনাদের কাছে আমার গভীর কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করতে পারব না।" এই সম্মান পাওয়ার কোন আকাঙ্ক্ষাই আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে নেই।'

পথ শেষ হয়ে আসছিল। হোস্টেলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অসীম বলল, 'এত তাড়াতাড়ি না ফিরে চল না কফিহাউসে গিয়ে বসি।'

'না বাবা। ওটা মাছের বাজার। আমার ভাল লাগেনি।'

'দীপা— ।'

'বল। আমি, আমি,—না থাক, কাল কলেজে দেখা হবে।' অসীম মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল। দীপা দাঁড়িয়ে রইল যতদূর অসীমকে দেখা যায় সে দেখল। অসীম কিন্তু একবারও পিছু ফিরে তাকাল না। নিজেকে সংযত করতে চাইল দীপা। উপলক্ষ যেন আসল বস্তুকে অতিক্রম করে না যায়। হঠাৎ সে এক বিপরীত ভাবনার আবর্তে পড়ল। কোনটে আসল আর কোনটে উপলক্ষ তা গোলমাল হয়ে যায়। আজ যা আসল বস্তু কাল তা উপলক্ষ হয়ে যেতে পারে। রামকৃষ্ণদেবের আশীর্বাদ এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নেওয়াকেই সেই সময়ের অনেক মানুষ মোক্ষপ্রাপ্তি বলে মনে করতেন। সেটাই তাঁদের কাছে আসল বস্তু ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের জীবন বলে দিচ্ছে বিবেকানন্দের সেটা ছিল একটা উপলক্ষ। যার মাধ্যমে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ মানুষই তাঁর কাছে ছিল আসল বস্তু। অসীম চলে গিয়েছে কিন্তু ওই মানুষটি আজ তাকে বড় টানতে লাগল। প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে যে মানুষটি মারা গিয়েছেন তিনি আধুনিকতা শব্দটির সঠিক প্রতিনিধি। আর রবীন্দ্রনাথ ? দীপা মাথা নাড়ল। সব গোলমাল হয়ে যায়। একজন বাঙালির হৃদয় যদি রবীন্দ্রনাথ হয় তবে তার মস্তিষ্ক বিবেকানন্দ হওয়া উচিত।

দীপা আশা করেছিল জলপাইগুড়িতে যাওয়ার আগে সুভাষচন্দ্র তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু এলেন না। দীপাকে কখনই তিনি বাড়িতে যাওয়ার কথা বলেননি। ফলে মন থেকে কোন তাগিদ বোধ করেনি সে।

গ্লোরিয়ারা ছুটিতে কলকাতায় থাকছে না। ওরা চলে গেল দিল্লিতে। সেখানে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে থাকা জাম্বিয়ার ছেলেমেয়ে এক সয়ে ছুটি কাটায়। ঘন ঘন দেশে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই একটা রাত মেয়েটা অঝোরে কেঁদেছিল কিন্তু তারপর একদম স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। ওর জীবনের অত বড় একটা ঘটনা এক রাতের কান্নায় শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সত্যি কি যায় ? দেশ কাল সমাজে ভেদে একজন মেয়ে আর কতটা আলাদা হতে পারে ? অবশ্য ওর আচরণ দেখে সেটা বোঝা যাচ্ছে না। যা বাস্তব তার বিরুদ্ধে নিজের জীবনকে টেনে রাখার মত বোকামি সে অন্তত করছে না।

হোস্টেলের দারোয়ান ট্যাক্সি ডেকে আনল। বিছানাপত্র রয়ে গেল, নিজের জামাকাপড় আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে সুপারের সঙ্গে দেখা করে এসে ট্যাক্সিতে উঠে বসতেই কেমন অস্বস্তি হল। এতটা পথ, প্রায় চব্বিশ ঘণ্টার, তাকে একা যেতে হবে। সে যখন

দ্বিতীয়বার কলকাতায় এসেছিল তখন একটা জেদ কাজ করছিল। এবার খুব একলা লাগছে। হোস্টেলের অন্য মেয়েদের গার্জেনরা এসে গতকাল থেকেই তাদের নিয়ে যেতে শুরু করেছেন। তাকে নিতে কেউ আসেনি শুনে সুপার খুব অবাক হয়েছিলেন।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই দীপা দেখতে পেল অসীম ফুটপাত থেকে নেমে এসে হাত তুলে তাকে থামতে বলছে। সে ড্রাইভারকে বলতেই ট্যাক্সি থামল। দরজা খুলে উঠে বসল অসীম, 'উঃ, আর একটু হলে মিস করতাম। চলিয়ে ভাই।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ ?' দীপা অবাক।

'তোমাকে সি-অফ করতে।' কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটা পাশে নামিয়ে রাখল অসীম। দীপা বলল, 'আমি কিন্তু একদম আশা করিনি।'

অসীম হাসল, কিছু বলল না।

দীপা ঠাট্টা করল, 'তুমি যে আমার সঙ্গে এক ট্যাক্সিতে যাচ্ছ, কেউ দেখতে পেলে ?'

অসীম হাত নাড়ল, 'যাঃ বাবা ! তুমিও সন্ধ্যাদের মত কথা বলছ !'

'সন্ধ্যার সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে নাকি ?'

'আমার নয়, দীপকের। দীপক ওর সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছিল। দীপককে চেন তো ? ফরসা লম্বা দেব আনন্দের মত হাঁটে। ফোর্থ ইয়ার সায়েন্স। দীপক বলে ওকে নাকি সন্ধ্যা দেখলেই চোখ ঘুরিয়ে হাসে। তাই সাহস পেয়ে রাস্তায় কথা বলেছিল। সন্ধ্যা আর একটা মেয়ে ছিল। একটা প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রায় দৌড়েই চলে গিয়েছিল।'

'তারপর ?' মজা পেল দীপা।

'পরদিন কলেজে দূর থেকে দেখা হতেই যেই সন্ধ্যা হাসল অমনি দীপক এগিয়ে গিয়ে কড়া গলায় বলল, 'হাসতে লজ্জা করে না ? রাস্তায় কথা বললে পালিয়ে যাও। তার উত্তরে সন্ধ্যা বলেছে, কি করব ! রাস্তায় কথা বললে যদি কেউ দেখে ফেলে ? আর আমাকে কলেজে আসতে দেবে না। কলেজের মধ্যে কথা বললে বাড়িব লোক জানবে না।'

'কি অবস্থা !' দীপা মাথা নাড়ল।

শিয়ালদা স্টেশনে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে বেশ ভিড় হয়। কিন্তু মেয়েদের একটা আনরিজার্ভড কামরায় বসতে পাওয়া যায়। সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল দীপা কিন্তু অসীম বাধা দিল, 'দূর ! মেয়েদের কম্পার্টমেন্টে অসহায় মেয়েরা ওঠে।'

'জেনারেল কম্পার্টমেন্টে জায়গা পাব না।'

'চল না দেখি।' কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে জায়গা পেয়ে গেল অসীম। এক বৃদ্ধকে চারজন তুলে দিতে এসে বেঞ্চি দখল করে বসেছিল। অসীম তাদের কথা দিল বৃদ্ধকে যত্ন করে সকরিকলি মনিহারি ঘাট পার করে দেবে। যেহেতু জানলার পাশে বসলে বৃদ্ধের হাওয়ায় ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে তাই ওরা ওদিকটাও পেয়ে গেল। দীপার পাশে অসীম বসার পর বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা কবলেন কাঁপা গলায়, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ বাবা ?'

'জলপাইগুড়ি।' অসীম জবাব দিল।

'কোন পাড়া ?'

এবার দীপার দিকে তাকাল অসীম। দীপা হেসে ফেলল, 'আমি চা-বাগানে থাকি। আপনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ। কালীঘাট দেখতে এসেছিলাম। হাকিমপাড়ায় ব্যানার্জীদের পাশেই আমার বাড়ি। ব্যানার্জীরা তো মরে হেজে গিয়েছে।' নিজের মনেই শেষ কথাগুলো বললেন বৃদ্ধ আর শক্ত হয়ে গেল দীপা। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রতুল ব্যানার্জীর কথা বলছেন। সবাই ওই বাড়িটাকেই

ব্যানার্জী বাড়ি বলত। ওঁর পক্ষে দীপাকে চিনতে পারা সম্ভব নয়। এইসময় অসীম চাপা গলায় বলল, 'আর একটু হলে ধরা পড়ে যাচ্ছিলাম। আমি তো কোন পাড়ার নাম জানি না।' এই সময় হুইসল বাজতেই প্লাটফর্মে ব্যস্ততা শুরু হল। দীপা বলল, 'যাও, নেমে যাও।'

'কোথায় ?' বড় চোখে তাকাল অসীম।

'আশ্চর্য। ট্রেন ছেড়ে দেবে না ?'

'পরে নামলেও তো চলবে।'

'দক্ষিণেশ্বরে। আবার বাস ধরে ফিরতে হবে।'

অসীম কিছু বলল না। কিন্তু সে দক্ষিণেশ্বরেও নামল না। এবার সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গেল দীপা। অসীম চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে পৌঁছে দেব বলে বেরিয়েছি।'

'তুমি কি পাগল।'

'যা ভাব।'

'টিকিট কেটেছ ?'

'সেই জন্যে তো হোস্টেলে তোমার কাছে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল।'

'বাড়িতে বলে বেরিয়েছ ?'

'অবশ্যই।'

হঠাৎ একটা ভাল লাগায় আক্রান্ত হল দীপা। এমনটা কেউ করতে পারে ধারণায় ছিল না তার। অসীম আগে থেকেই এতটা ভেবে রেখেছে ? কিন্তু জলপাইগুড়িতে পৌঁছেই ফিরে আসতে হবে যে ওকে। চা-বাগানের বাড়িতে নিয়ে গেলে যে কুরুক্ষেত্র বাধবে সেটা সে চায় না। একের পর এক স্টেশন চলে যাচ্ছে আর ভাল লাগাটা তীব্রতর হচ্ছে। চারপাশে একটাও চেনামুখ নেই, কাউকে জবাবদিহি করতে হচ্ছে না। নানা রকম গল্প করে চলেছে ওরা। সূর্যাস্তের মুহূর্তে ট্রেন গঙ্গার ধারে গিয়ে থামল। যাত্রীরা ছুটছে স্টিমারের জায়গা দখল করতে। কুলিদের চিৎকার শুরু হয়েছে। অসীম বৃদ্ধকে সযত্নে নামিয়ে ধীরে ধীরে চলল।

স্টিমারে উঠে বৃদ্ধ বললেন, 'তোমরা ভাই বোন দুটি খুব ভাল।'

অসীম মাথা নাড়ল, 'না, না, আমরা ভাইবোন নই।'

'মানে ?' বৃদ্ধ হাঁ হয়ে গেলেন। দীপার সিঁথির দিকে তাকালেন।

'আমরা বন্ধু। একসঙ্গে পড়ি।'

'বন্ধু অনাত্মীয় ?'

'কি হল ? এরপর আর আমার সাহায্য নেবেন না ?'

'না।' শব্দ ছিটকে এল বৃদ্ধের শরীর থেকে।

'ঠিক আছে। চল দীপা।' অসীম অম্লানবদনে হাঁটতে লাগল ভিড় সামলে। এই ব্যাপারটা আরও চমৎকৃত করল দীপাকে। এত স্পষ্ট কথা অসীম বলতে পারল ? এই কয়েকমাসে সে কি ওকে চিনতে পারেনি ?

সন্ধে নামছে নদীর ওপর। হাওয়া দিচ্ছে খুব। ভোঁ বাজিয়ে স্টিমার ছাড়ল। লোয়ার ডেকে গিজগিজ করতে মানুষ। যেহেতু ওদের টিকিট প্রথম শ্রেণীর নয় তাই আপার ডেকে না গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিল। গঙ্গার ঢেউ এ স্টিমারের আলো নকশা আঁকছে। দীপার খুব ভাল লাগছিল এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে। চুপচাপ।

নদী পেরিয়ে ঘাটে স্টিমার লাগতেই আবার বালির চরে দৌড়ঝাঁপ শুরু হল। অনেক

দূরে দাঁড়ানো ট্রেনে জায়গা দখল করা, একটা গোটা রাত না ঘুমিয়ে গল্প করে যাওয়া, দীপা যা কখনও করবে বলে স্বপ্নেও ভাবেনি। আর এইসব কথারা এতদিন কোথায় ছিল ? না, খুব স্বাভাবিক কথাবার্তা, রসিকতা, নানান বিষয়ের গল্প। আর কখনই হৃদয় সংক্রান্ত সংলাপ নয়। যেন দুজনেই জানত পৃথিবীর সব বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় শুধু ওইটুকু ছাড়া। রাত যখন গড়াতে থাকে, কামরায় যখন ঘুম জাঁকিয়ে বসেছে তখন চুপচাপ খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার দেখে যেতে যে কি ভাল লাগে তা জানা ছিল না দীপার।

সকাল হয়ে গেল শিলিগুড়িতে পৌঁছাতে। স্টেশনের বাইরে এসে দীপা অসীমের মুখের দিকে তাকাল। অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে কতদূর ?'

'অনেক। জলপাইগুড়ি শহর হয়ে গেলে দুবার বাস পাল্টাতে হবে। নৌকোও। আব সেবক দিয়ে গেলে এখান থেকে এক বাসেই যাওয়া যায়।'

'তাই তো গেলে হয়।'

রিক্শায় চেপে ওরা বাসস্ট্যান্ডে এল। আলিপুরদুয়ারের বাস ছাড়ছে। দীপা অসীমকে বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু কি ভাবে তোমাকে নিয়ে যাই।'

আমি তো তোমাদের বাড়িতে যাব বলে আসিনি।'

'জানি। কিন্তু শুধু আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি আবার ফিরে যাবে এটা ভাবতেই ভাল লাগছে না। এতটা পথ, একা একা!'

'তোমার বাস হর্ন দিচ্ছে।'

আচমকা দীপা প্রশ্ন করল, 'তুমি তো আমাকে ভাল কবে জানোই না। সত্যি কথা বলতো, তুমি কেন এলে ?'

'তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকব বলে।'

দীপা আর কিছু না বলে বাসে উঠল। ভিড হয়ে গেছে এরই মধ্যে কিন্তু জানলার পাশে জায়গা পেতে অসুবিধে হল না। কন্টাক্টর অনেক বকাঝকা করে দুটো দেহাতি লোককে সরিয়ে জায়গা করে দিল। এদেশে মেয়ে হিসেবে শুধু এইটুকু সুবিধে পাওয়া যায়। কদিন আগেও দীপার মনে হয়েছিল এটা এক ধরনেব করুণা। সে এমন করুণার দান গ্রহণ করবে না। কিন্তু এখন সেই ভাবনা কাজ করল না। সে দেখল অসীম একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই এগিয়ে এল অসীম। গলা তুলে বলল, 'এখানকার হাসপাতাল পাড়ায় আমার মেশোমশাই ডাক্তাব। ডক্টর রামানন্দ মুখার্জি। তুমি চিন্তা করো না, আমি ওঁর কাছে তিন চারদিন থেকে ফিরে যাব।'

এইসময় বাস ছাড়ল। অসীমকে আর দেখা গেল না। কিন্তু এবার উদ্বেগ অস্বস্তির ওপর স্বস্তির হাল্কা প্রলেপ লাগল। সে জানলায় মাথা রাখল। শিলিগুড়ি শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটছে সেবকের দিকে। আকাশে পুজো পুজো রঙ, রোদের চেহারা পাল্টাচ্ছে। হঠাৎ সে আড়ষ্ট হয়ে গেল। না, এ হতে পারেনা। সে জেনেশুনে কি করে একটা ভুল করতে চলেছে! অসীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় তৈরি হতে চলল কিন্তু কোন প্রস্তুতি ছাড়াই ? সে কি নিজেকে কখনও জিজ্ঞাসা করেছে যে অসীমকে প্রয়োজন আছে কিনা ? অসীমের জন্যে কোন টান তো কখনও তেমন করে অনুভব করেনি। নিজের চারপাশে একটা বাঁধ দিয়ে চমৎকার ছিল সে। কলকাতা থেকে এমনভাবে সঙ্গে এসে অসীম সেই বাঁধ ভেঙে দিচ্ছে। এটা কখনও ঠিক নয়। প্রথম কথা অসীমের জানা উচিত তার অতীতে কি কি ঘটে গিয়েছে। সেই জানার পরে ওর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেটাও অজানা। দ্বিতীয়ত অসীমের ব্যক্তিজীবন সে জানে না। সাময়িক ভাল লাগা থেকে সে আর একটা

ছেলেখেলায় জড়াতে চায় না।কিন্তু গত দিন এবং রাতের যে ভাললাগা, সেটা কি মিথ্যে! এখনও তার রেশ মন জুড়ে। তাহলে? দুই বিপরীত মেরু থেকে টান অনুভব করতে লাগল দীপা। গাড়ি কখন সেবক ব্রিজ, বাগরাকোট ছাড়িয়ে মালবাজারে পৌঁছে গিয়েছে খেয়ালই করেনি। হঠাৎ সে সোজা হয়ে বসল। না, তার পথ একটাই। যে করেই হোক মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। সত্যসাধন মাস্টার তাকে যা বলে গিয়েছিলেন তা কখনই মিথ্যে হতে দেবে না সে। ব্যক্তিগত আবেগ, ভাললাগা, হৃদয়ের আর্তি, এসব ভুলে যেতে হবে তাকে। তাকে পৌঁছাতে হবে সেই জায়গায় যেখানে গেলে লোকে বলবে কৃতী মানুষ।

সূর্য যখন মধ্যগগন অতিক্রমণ করেছে, চা-বাগানের ওপর পোড়া রোদ ধকধক করছে তখন নাকে পরিচিত গন্ধ এল। দীপা তৃপ্তি নিয়ে চেনা গাছ, চায়ের বাগান, দূরের ফ্যাক্টরি আর উলঙ্গ মদেশিয়া শিশুদের কৌতূহলী দৃষ্টি দেখে উঠে দাঁড়াল। কন্টাক্টর ঘণ্টি বাজিয়ে চিৎকার করল, 'বাগান?'

দীপা মাথা নেড়ে ব্যাগ হাতে ব্যালেন্স সামলে দরজার দিকে এগোতে লাগল। ঠিক মাঠের শেষে সিঁড়ির সামনে থেমে গেল বাস। নিচে নেমে দীপা দেখল কোয়ার্টার্সগুলোর বাইরের দরজাগুলো বন্ধ। সামনেব মাঠেও কেউ নেই। এই ভরদুপুরে কারো সেই প্রয়োজন পড়েনি। বাস চলে যাওয়ার পর শূন্য আসাম রোড আবার দেওদার শিরীষের ছায়ায় মাখামাখি হয়ে গেল। দীপার মনে হল অনেককাল বাদে নিজের মাটির কাছে ফিরে এল।সে ব্যাগ নিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে দেখতে পেল শ্যামলদা সাইকেল চেপে ফ্যাক্টরিতে ডিউটি করতে যাচ্ছে। মাথায় চুল অনেক পড়ে গিয়েছে, একটু মোটা দেখাচ্ছে। দূর শ্যামলদা যে তাকে চিনতে পারেনি তা কাছে আসার পর বোঝা গেল, 'আরে তুই! আমি ভাবলাম কোন ভদ্রমহিলা। কলেজ ছুটি হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ।' দীপা হাসার চেষ্টা করল।

'তুই কি একা এলি কলকাতা থেকে?' বিস্ময় যেন যাচ্ছিল না।

'হ্যাঁ।'

'ও! চলি রে!' শ্যামলদা সাইকেলের প্যাডেল ঘোরাল।

মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় উঠল দীপা। দরজা বন্ধ। তিন চারবার কড়া নাড়াব পব ভেতর থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল, 'কে? এই ভরদুপুরে যে কে আসে!' গলাটা অঞ্জলিব। খিল খোলার আওয়াজেই বোঝা গেল যে সে খুব বিরক্ত। দরজা খুলে সামনে দীপাকে দেখে তার চোখ ছোট হয়ে গেল, কপালে ভাঁজ পড়ল। তারপর কিছু না বলে আচমকা ঘুরে বড় বড় পা ফেলে ভেতরে চলে গেল।

দীপা হতভম্ব। আর যাই হোক এমনভাবে অঞ্জলি তাকে গ্রহণ করবে সে কল্পনাও করেনি। ব্যাগ নিয়ে ভেতরে ঢুকল দীপা। বাইরের ঘরে কেউ নেই। ভেতরের ঘরে ঢুকেই সে দেওয়ালের দিক-ঘেঁষা খাটে অমরনাথকে শুয়ে থাকতে দেখল। অঞ্জলি এখানে নেই। অমরনাথ একা। চোখ বন্ধ।

ব্যাগটাকে নামিয়ে রেখে সে খাটের পাশে চলে এল। মনে হল অমরনাথ ঘুমোচ্ছেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দীপা। এবং তারপরে পায়ের আওয়াজ কানে এল। মনোরমা উঠোনের দিকের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখাচোখি হতেই ইশারায় উঠে আসতে বললেন। বাবার দিকে আর একবার তাকিয়ে দীপা নিঃশব্দে ঠাকুমাকে অনুসরণ করল। মনেরমা নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন না তাকে। কারণটা দীপা জানে। বাইরের কাপড়, বাসি কাপড় ইত্যাদি ভাবনা এখন মনোরমার মনে কাজ করছে। বারান্দার একটা মোড়া দেখিয়ে

মনোরমা বললেন, 'বোস'।

দীপা বলল না, 'ঠিক আছে।'

'তুই একা এলি ?' মনোরমা জানতে চাইলেন।

'আবার কে আসবে সঙ্গে ?'

'আমি ভাবলাম তোর মামা নিয়ে আসবে তোকে।'

'তাঁর কাজকর্ম থাকতে পারে। তাছাড়া আমি তো আর বাচ্চা নই।' দীপা হাসল, 'আমার চিঠি পাওনি তোমরা ?'

'পেয়েছি।'

'কি হয়েছে ? এমন করে কথা বলছ কেন ?' দীপা সন্দেহ বোঝাল।

এবার হঠাৎ মনোরমা আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন। শব্দটা ঢাকার চেষ্টা সত্ত্বেও সেটা একবার ছিটকে বেরুল। সেটা শুনতে পেয়েই সম্ভবত অঞ্জলি রান্নাঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এল, 'আপনি আবার কাঁদছেন মা ? আমি না আপনাকে কাঁদতে নিষেধ করেছি।'

॥ ৩৪ ॥

দীপা অঞ্জলির দিকে তাকাল। কথাগুলো শেষ করে অঞ্জলি আবার রান্নাঘরে ঢুকে যাচ্ছিল। মেয়ের সঙ্গে চোখাচোখি করার বিন্দুমাত্র বাসনা তার ছিল না।

দীপা তার দিকে এগিয়ে যেতেই মনোবমা বললেন, 'থাক। তুই আগে হাতমুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নে।'

দীপা ঠাকুমার দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছিল সে এই বাড়ির কেউ না এই কথাটা অঞ্জলি বারংবার বুঝিয়ে দিচ্ছে। বারান্দার শেষ ধাপে বসে পড়ল সে সিঁড়িতে পা রেখে। মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আহা, ওখানে বসলি কেন ?'

দীপা জবাব দিল না। সে দুহাতে মাথার দুটো পাশ চেপে ধরল। মনোরমা আর কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে ঢুকে গেলেন। এখন বাড়ির বিভিন্ন গাছে বসা পাখিরা মহানন্দে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। গোয়াল ঘর থেকে হাম্বা ডাক ভেসে এল। এই বাড়ি আর তার পরিবেশ, শব্দ, একই রকম বয়ে গেছে। এমন কি উঠোনে নেমে আসা কাঁঠাল গাছের ছায়াটাও সেইরকম গভীর। শুধু মানুষগুলোই আর এক নেই।

হঠাৎ এক ঝাঁকুনি দিয়ে নিজেকে তুলে উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরের দরজায় চলে এল দীপা। উনুনের খানিকটা দূরে মাটিতে বসে হাঁটুতে চিবুক রেখে কিছু ভাবছিল অঞ্জলি। পায়ের শব্দেও মুখ ফেবাল না। দরজায় হাত রেখে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'মা, এখনই কি চলে যাব ?'

অঞ্জলি জবাব দিল না। একই ভঙ্গীতে বসে রইল।

দীপা বলল, 'মা, তুমি কথা বল !'

'তোমার যা ইচ্ছে !' অঞ্জলি মুখ ফেরাল।

'তোমার ইচ্ছেটা জানতে চাই !'

'আমি তো দরজা খুলেই দিয়েছি।'

'তাহলে এমন ব্যবহার করছ কেন ?'

ঝট করে মুখ ফেরাল অঞ্জলি, 'কিরকম ব্যবহার করব ? তুমি এসেছ বলে আহ্লাদে গলে যাব ? এসেছ ভাল, আমাকে জ্বালাতে এসো না।'

'আচ্ছা, আমি কি করেছি যে তুমি এমন ব্যবহার করছ ?'

'যখন তুমি ছোট ছিলে, তোমার অভিভাবকের দরকার ছিল তখন তোমাকে বোঝালে বুঝতে। এখন ডানা গজিয়েছে, সাবালিকা হয়েছে, পুরুষ বন্ধু হয়েছে, নিজের স্বার্থ বুঝে নিতে শিখেছ এখন তোমাকে বোঝাতে যাওয়ার মত গাধা আমি নই।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। আমি বড় হয়েছি এটাই আমার অপরাধ ? আমি কি তোমাকে কখনও অসম্মান করেছি ?'

'করোনি ?'

'না।'

'ভাল। যদি তুমি মনে করো করোনি তাহলে তো চুকে গেল। আমাকে আর প্রশ্ন করার কি আছে! শুধু একটা কথা বলে দিচ্ছি ওঁকে একদম বিরক্ত করবে না। সামান্য উত্তেজনা আমার জীবনের চূড়ান্ত সর্বনাশ এনে দিতে পারে। খুব ভাল হয় যদি উনি জানতে না পারেন যে তুমি এসেছ!'

'সে কি ?' চমকে উঠল দীপা।

অঞ্জলি কিছু না বলে মুখ ঘুরিয়ে হাঁটুতে চিবুক রাখল। দীপা খুব অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, 'বাবার কি হয়েছে ?'

'বাঁ দিকটা ভাল কাজ করছে না। তেমন শক্তি নেই। পাঁচ মিনিট দাঁড়ালে মাথা ঘোরে। একটু উত্তেজনা হলে বুকের ব্যথা বাড়ে ?' হঠাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল অঞ্জলি। তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল কান্নার দমকে।,কথা জড়িয়ে গেল। দীপা আর পারল না, ছুটে রান্নাঘরে ঢুকে অঞ্জলিকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, 'মা, মাগো।'

অঞ্জলি কাঠ হয়ে গেল মেয়ের আলিঙ্গনে। তার মাথাটা বুকের ওপর টেনে নিয়ে দীপা কেবলই বলতে লাগল, 'মা তুমি কেঁদো না। মাগো, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না, আমি সেই আগের মত আছি। মাগো, বাবা ভাল হয়ে যাবে। আমি এসেছি, দেখো, বাবা ভাল হয়ে যাবে।'

এবার একটু একটু করে কান্না থামল। কিছুক্ষণ বাদে অঞ্জলি অন্যরকম গলায় বলল, 'যা, জামাকাপড় ছেড়ে একেবারে স্নান করে নে। আমি ভাত বাড়ছি।'

দীপা উঠে দাঁড়াল। তার শরীরে বিন্দুমাত্র খিদে নেই। শরীর গোলাচ্ছে এখন। সেই সঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। তবু সে রান্নাঘরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সূর্য মধ্যগগন ছাড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সেই পরিচিত আকাশ, গাছপালার দিকে হঠাৎ এক ঝলক আরাম যেন মনে এসে লাগল। মনোরমার ঘরের দরজা খোলা কিন্তু তিনি চোখের সামনে নেই। সে ধীরে ধীরে বড় বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল।

স্নান সেরে পরিষ্কার কাপড় পরে বারান্দায় এসে দীপা দেখল মনোরমা উঠোনে মোড়া পেতে বসে আছেন। শেষবার যখন মনোরমা এখানে ছিলেন তখন সে তাঁর কাছেই খেয়েছে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, 'যা, বিকেল হবার আগে কিছু খেয়ে নে। অঞ্জলিও খায়নি।'

'কেন ?'

'ও তো আজকাল এরকম বেলা করে। বললেও শোনে না।'

খাওয়ার ঘরে ভাত বেড়ে বসেছিল অঞ্জলি। দীপা সিঁড়িতে বসে বলল, 'তোমারটা নিয়ে এস। আমি একা খাবো না।'

অঞ্জলি মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিজের থালাটা নিয়ে এল। ভাত ডাল টেঁকির

শাকের চচ্চড়ি আর আলু পটলের দম। মুখে দিয়ে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। কতকাল যেন এমন রান্না খায়নি সে। ঢেঁকির শাক বস্তুটি কলকাতায় পাওয়া যায় কিনা তাই বা কে জানে। হোস্টেলের ঠাকুরের এক ঘেয়ে অপরিচিত রান্না খেতে খেতে পেটে যেন চড়া পড়ে গিয়েছিল। এমন কি আলুর দম থেকেও যে চেনা মিষ্টি গন্ধটা ভেসে আসছে তা থেকে এতকাল বঞ্চিত ছিল সে। তারপরেই দ্বিতীয় চিন্তা মাথায় এল। ঢেঁকির শাক, সজনের ডাঁটা এঁচোড় থোড় অথবা মোচা এ বাড়িতে কখনও কিনতে হয়নি। প্রায় জঙ্গলের মতই। চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ওগুলো। ঢেঁকির শাক ছাড়া বাকিদের ঋতু অনুযায়ী পাওয়া যায়। আর শাকটা তো সারা বছর। তরকারি বলতে আলু পটল। পটলের দাম এখন কম হবার কথা। এই পদগুলো থেকে বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থাটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মাছ আগেও রোজ হত না। রবিবারের হাট থেকে কেনা মাছে মঙ্গলবার পর্যন্ত চলত। তারপর বিকেলে আসাম রোড থেকে মাছ ধরে ফিরে আসা মেছুয়াদের কাছ থেকে ছোট মাছ কেনা হত। কিন্তু দু-এক দিন তাদের ঝুড়িতেও ভাল মাছ না থাকায় নিরামিষ হত। স্কোয়াশের তরকারিটা ছিল তখন বাঁধা। কিন্তু খেতে বসলে বোঝা যেত মাছের অভাব পূর্ণ করার একটা চেষ্টা হয়েছে।

খেতে খেতেই গা গুলানি ভাবটা চলে গেল। হঠাত দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বুধুয়াকে দেখছি না কেন?'

'নেই বলে।' নির্লিপ্ত গলায় জবাব দিল অঞ্জলি।

'নেই মানে? বাগানে কাজ পেয়েছে?'

'জানি না।'

'তাহলে?'

'ওকে রাখতে পারলাম না। মাইনে দেওয়া সম্ভব নয়।'

হাঁ হয়ে গেল দীপা। বুধুয়াকে সে কোনকাল থেকে দেখে এসেছে এই বাড়িতে। ওকে নিশ্চয়ই মাইনেপত্র দেওয়া হত কিন্তু সেসব কখনও মাথায় নেয়নি দীপা। এ বাড়ির গাছপালা দরজা জানলা মেঝে এবং মানুষের মত বুধুয়া এবাড়িরই একজন বলে বোধহয় ভেতরে গেঁথে গিয়েছিল। খাওয়ার তৃপ্তিটা এক লহমায় উধাও হয়ে গেল যেন। সে থালা তুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

এ-বাড়িতে আজ পর্যন্ত তাদের এঁটো বাসন মাজতে হয়নি এমন কি পাত তুলতে দিত না অঞ্জলি। কিন্তু আজ বলে দিতে হল না এই কাজ নিজেকেই করতে হবে। বুধুয়া কত মাইনে পেত? খরচ কমানোর জন্যে অঞ্জলি নিজের কাঁধে কাজের বোঝা চাপিয়ে কতটা স্বস্তি পাবে? কিন্তু এসব প্রশ্ন করার অধিকার তার নেই। দীপার মনে হল সে যদি এই মুহূর্তে একটা চাকরি পেত তাহলে এ বাড়ির আর্থিক অবস্থা আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যেত। যে যেমন ছিল সে তেমন থাকত। এতদিন জানা ছিল টাকা পয়সা অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস কিন্তু ওই বস্তুটি যে জীবনের কাঠামো, সম্পর্কের সূত্রগুলো ধরে এমন নির্দয় টানাটানি করে তা তার জানা ছিল না। এইসময় অঞ্জলি বলল, পেছন থেকে, 'ভাল করে ধোয়া হয়নি, থালাটা রেখে মুখহাত মুছে নে।'

সরে দাঁড়াল দীপা। কলতলায় বসতে বসতে অঞ্জলি বলল, 'ডাকার দরকার নেই। যদি দ্যাখো জেগে আছেন তাহলে কথা বলতে পারো। এমন কিছু বলো না যাতে উনি উত্তেজিত হয়ে পড়েন। যাও।'

হাত ধুয়ে মনোরমার দিকে তাকাল সে। রোদের তেজ নেই। ডুয়ার্সের এইসব অঞ্চলে

পুজোর আগেই বাতাসে টান ধরে, রোদের উগ্রতা কমে যায়। এখনও বৃষ্টির দিন ফুরোতে অনেক দেরি। সেই ফাঁকে বৃষ্টিভেজা রাতগুলোতে শীত ঢুকে পড়ে চুপিসাড়ে। দীপা বারান্দা পেরিয়ে শোওয়ার ঘরে পা দিতেই স্থির হয়ে গেল। অমরনাথ তাকিয়ে আছেন তার দিকে। চোখে চশমা নেই, মুখ শুকনো, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি কদমফুলের মত ছেয়ে রয়েছে দুই গাল, মুখ। চোখ যেন গর্তে ঢুকে গিয়েছে। সুন্দর চুল ছিল তাঁর। এখন যেন চৈত্রের বাগান। দীপা কি করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। অঞ্জলি জেগে থাকলে কথা বলার অনুমতি দিয়েছে এইমাত্র কিন্তু এ কি রকম জেগে থাকা? দৃষ্টি সরছে না, মুখেও অভিব্যক্তি নেই।

'বাবা!' মৃদুস্বরে ডাকল দীপা।

ধীরেধীরে দৃষ্টিতে যেন প্রাণ এল, চোখের পলক পড়ল। দীপা এগিয়ে গেল বিছানার পাশে। অমরনাথ মুখ ফিরিয়ে মেয়ের মুখ দেখার চেষ্টা করলেন। দীপা নিজেকে সংযত করে প্রশ্ন করল, 'তুমি কেমন আছ বাবা?'

'তুমি কখন এলে?' শব্দগুলো ছাড়া ছাড়া, ঈষৎ জড়ানো।

'এই তো একটু আগে।' দীপা জবাব দিয়েই জানতে চাইল, 'তুমি কেমন আছ?'

'ভাল।' দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইলেন অমরনাথ। দীপা বলে উঠল, 'তুমি উঠছ কেন? শুয়ে থাকাই তো ভাল।'

'তোমার মায়ের মত কথা বলো না। আমাকে শুইয়ে রাখলে তাব কি লাভ হয় বলতে পারো? তোমার তো পেটে বিদ্যে আছে, তুমি ওকে সমর্থন কবছ?' কথা বলতে অমরনাথের কষ্ট হচ্ছিল। শরীরে কাঁপুনি চলে এল এইটুকুতেই। দীপা ভয় পেযে বলে উঠল, 'ঠিক আছে। তুমি আরাম করে বসো।'

'গুড।' মুখে হাসি ফুটল অমরনাথের, 'বসতে তো কোন অসুবিধে হয় না। একটু বেশী যদি হাঁটাহাঁটি করি তাহলে মাথা ঘোরে। শরীরটা আর আমার নেই।'

'তোমার নেই মানে?' দীপা হাসবার চেষ্টা করল।

'যখন শরীর মনের ইচ্ছায় চালিত হয় না তখন কি আর আমাব বলে দাবি করা যায়? একটার পর একটা যন্ত্রপাতি বিদ্রোহ করছে। কলকাতায় গিয়ে একটা বিদ্রোহদমন কবা মাত্রই আর এক দিকে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। ছেড়ে দে আমাব কথা। তুই কেমন আছিস বল? কদ্দিনের ছুটি?' অমরনাথ সাগ্রহে তাকালেন।

'লক্ষ্মীপুজোর পরেই খুলবে।'

'পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

'ভালই।'

'আমি ওই ভালই শব্দটার মানে বুঝি না। হয় বলবি ভাল, নয় খারাপ।'

'খারাপ হতে যাবে কেন? আমি তো কলকাতায় পড়াশুনা করতেই গিয়েছি।'

'এমন কোন কথা বলবি না যার মধ্যে ইতস্তত ভাব আছে।' অমরনাথ চোখ বন্ধ করলেন, 'টাকা পয়সা ঠিকমত যাচ্ছে তো? ব্যাঙ্ক খেয়াল রাখছে?'

'হ্যাঁ।' দীপা মাথা নিচু করল।

'কি হল?' অমরনাথের গলায় সন্দেহ।

'কিছু না।'

'শোন, ভাল রেজাল্ট করতেই হবে। সত্যসাধন মাস্টারকে চিরদিন মনে রেখ। এতদিন শুনেছি মানুষ ভাগ্য নিয়ে জন্মায়। ভাগ্য যেমন ফেরায় তেমনি ফেরে। কর্ণের মত অতবড়

বীর ভাগ্যের হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু এখন সময় পাল্টাচ্ছে। মানুষ যদি জেদী আর পরিশ্রমী হয় তাহলে নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে নিতে পারে। তোমাকে তার প্রমাণ দিতে হবে।'

অমরনাথ কথা শেষ করা মাত্র অঞ্জলি ঘরে ঢুকল, 'একদিনেই সব কথা শেষ না করলে নয় ? ও তো কিছুদিন এখানে থাকবে। ডাক্তার তোমাকে কথা বলতে নিষেধ করেছেন এটা ভুলে যাও কেন ?'

'তোমরা বড় কথা বিকৃত করো। কথা বলতে নিষেধ করেনি, বেশী কথা বলতে নিষেধ করেছেন।'

'আমি তো তখন থেকে শুনে যাচ্ছি তোমার গলা।'

অমরনাথ মাথা ঝাঁকালেন, 'রোদ পড়ে গিয়েছে ?'

'হ্যাঁ।' অঞ্জলি ভেতরের ঘরে চলে যাচ্ছিল।

'আমি একটু বাইরে গিয়ে বসব ?'

'আবার মাথা ঘুরবে !' অঞ্জলি দাঁড়াল।

অমরনাথ নিজেই বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করলেন। দীপা তাঁকে ধরল, 'আমাকে ধরো। আস্তে আস্তে চল।'

অল্প হাঁটতে অমরনাথের এখনও অসুবিধে হয় না; বাইরের ঘরের বারান্দায় তিনি দীপার কাঁধে ভর রেখে চলে এলেন। পেছন পেছন আসছিল অঞ্জলি। সে বাইরের ঘর থেকে একটা চেয়ার টেনে বারান্দায় দিতেই অমরনাথ তাতে বসলেন, 'আঃ। কি আরাম। এই মাঠটাকে না দেখতে পেলে বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না। এমন সুন্দর চাপড়াবাঁধা ঘাস তুমি কোথাও পাবে না।'

দীপা অমরনাথের পায়ের কাছে সিঁড়িতে পা রেখে বসল। সমস্ত মাঠ, শিউলি ফুলের গাছের ওপর নরম রোদ এখনও তিরতির করছে। চা-বাগানের বাচ্চারা বোধহয় সবাই বড় হয়ে গিয়েছে কারণ মাঠে মাঝে মাঝে চোরকাটা মাথা তুলছে। দেখলেই বোঝা যায় এই মাঠে নিয়মিত ফুটবলখেলা আর হয় না। আসাম রোড দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে হুসহাস।

হঠাৎ অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'গ্রাজুয়েশন করার পর কি করবে কিছু ভেবেছ ?'

'হ্যাঁ। আমি আই এ এস দেব।'

'আই এ এস ? মানে যা আগে আই সি এস ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'মেয়েরা আই সি এস দিতে পারে ?'

'কেন পারবে না। আমি খবর নিয়েছি একজন বাঙালি মহিলা আই এ এস হয়েছেন। তিনি পারলে আমিই বা পারবো না কেন ?'

'ওটা একদম পুরুষদের চাকরি। ডি এম, ডি সি তো ওদের মধ্যে থেকেই হয়। চব্বিশ ঘণ্টার চাকরি। কোথায় কি হল অমনি ছুটে যেতে হবে।'

'আমার তাই ভাল লাগবে।'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, ওই চাকরিতে অবশ্য ক্ষমতা উপভোগ করতে পারবে। পাঁচজনে খুব মান্য করবে। আমাদের চা-বাগানের বড় সাহেব একবার ডি এমের সঙ্গে দেখা করতে জলপাইগুড়ি গিয়েছিলেন। তিন ঘণ্টা বসে থেকেও দেখা পাননি। মিটিং করছিলেন ডি এম।'

অঞ্জলি পেছনে দাঁড়িয়েছিল। কথাগুলোর মানে বুঝতে চেষ্টা করছিল সে। এবার বলল,

'কিরকম মাইনে দেবে ?'

দীপা বলল, 'ভালই।'

অমরনাথ বিরক্ত হলেন, 'তুমি ফট করে মাইনের কথা জিজ্ঞাসা করলে। আরে চাকরিটা কি তা জানো ? ভারতবর্ষের সেরা মেধাবী ছাত্ররা ওই পরীক্ষায় বসে। তারপর তাদের মধ্যে ওপরের দিকের কয়েকজনকে বেছে নিয়ে ইন্টারভিউ করে। তারও পরে অনেকদিন ধরে ট্রেনিং চলে। এত কাণ্ডের পর যে চাকরি দেওয়া হয় তাতে এই দেশটাকে শাসন করার ক্ষমতা পাওয়া যায়।'

'ওদের খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোমার মেয়েকে এমন চাকরি দেবে ? ও কি জানে দেশের ?' অঞ্জলি কথা শেষ করে আর দাঁড়ালো না।

অমরনাথ মুখ ঘুরিয়ে স্ত্রীর যাওয়া দেখলেন। তারপর বললেন, 'তা এখনও তো অনেক দেরি আছে। ধীরে ধীরে তৈরী হও।'

দীপা বলল, 'বাবা, তুমি অনেকক্ষণ কথা বলছ কিন্তু।'

অমরনাথ চুপ করে গেলেন। অনেকদিন এক নাগাড়ে এত কথা বলেননি তিনি। ফলে এর মধ্যে বেশ কাহিল লাগছিল যদিও মুখে কিছু বললেন না। চুপ করে যাওয়ার পর ঝিমুনি এল। এই মাঠ রাস্তা হঠাৎ হঠাৎ অস্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে। তিনি তবু চুপ করে রইলেন। ধীরে ধীরে সব কিছু আবার ঠিক হয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি। পায়ের কাছে বসে থেকেও দীপা এসবের কিছুই টের পেল না।

এইসময় অমরনাথের ছোট ছেলেকে আসাম রোড থেকে আসতে দেখা গেল। মাথায় বেশ লম্বা হয়ে গেছে। সিঁড়িতে দিদিকে বসে থাকতে দেখে রীতিমত অবাক। দীপা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখন ছুটি হল ?'

সে হাঁটতে হাঁটতেই জবাব দিল, 'হুঁ।'

'দাদা কোথায় ?'

'জানি না। শব্দটা বলে ও ও-পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

অমরনাথ দেখছিলেন, 'ছেলে চলে গেলে বললেন, 'এদের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয় দেওয়ালে ধাক্কা দিচ্ছি। আমার সঙ্গে মেলে না।'

দীপা চুপ করে গেল। ভাইদের সঙ্গে তারও কখনও গলায় গলায় ভাব জমেনি।কিন্তু একে দেখে মনে হল সে বাড়িতে আসায় একটুও খুশি হয়নি। বিকেল ফুরোচ্ছিল। আসাম রোডে সেজেগুজে কিছু মেয়ে দলবেঁধে বেড়াতে বেরিয়েছে। ললিতাদিব কথা মনে পড়ল। ললিতাদি সেজেগুজে বারান্দায় বসে থাকত। ললিতাদির বাড়িতে গেলে কেমন হয় ? এখন তো শ্যামলদার বাড়ি মানে ললিতাদির বাড়ি।

হঠাৎ অমরনাথ বললেন, 'আমার কয়েকটা ইচ্ছে আছে।'

দীপা বলল, 'বল।'

'তুই যখন চাকরি করবি তখন তোর বাড়ির বারান্দায় এইভাবে বসে থাকব!'

'একটা হল, আরগুলো ?'

'হুঁ। আমি মরলে কাউকে খাওয়াবি না।'

'এটা আমার অধিকারে নেই।' দীপা হাসল।

অমরনাথ আবার কথা বন্ধ করলেন। এইসময় মনোরমা এসে দাঁড়ালেন, 'অমর, সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এবার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। অনেকক্ষণ বসা হয়েছে।'

'এখানে বসতে ভাল লাগছে মা।'

'ওদিকে অঞ্জলি গজগজ করছে।'

দীপা বলল, 'ঠাকুমা, তোমাকে একটা মোড়া এনে দেব ?'

'নাঃ। আমার খুব অম্বল হয়ে গিয়েছে। বসতে ভাল লাগছে না।'

মনোরমা আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। এবার দীপা উঠে দাঁড়াল, 'বাবা, তুমি আমার একটা কথা রাখবে ? তুমি যদি রাজি হও তাহলে আমার খুব ভাল লাগবে।'

'কথাটা কি ?'

'আগে কথা দাও।'

অমরনাথ হাসার চেষ্টা করলেন, 'আচ্ছা, দিলাম।'

দীপা মুখ খুলতে গিয়েই থেমে গেল। বড় ভাই আসছে। এত অল্প বয়সেই গোঁফের রেখা গাঢ় হয়েছে। কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'কখন এলে ?'

'এই তো ?'

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎ মানে ?'

'মা বলেছিল তুমি আর আমাদের বাড়িতে আসবে না !'

'মা রেগে গিয়েছিল খুব।' দীপা হাসার চেষ্টা করল।

'কিন্তু বাবার অসুখ তোমার জন্যে হয়েছে।' ছেলেটা কথা বলছিল খুব গম্ভীর গলায়। ভীষণ জেদী দেখাচ্ছিল ওকে।

এবার অমরনাথ জবাব দিলেন, 'এই ভেতরে যা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলার স্পর্ধা হল কি করে তোর ?'

'যা সত্যি তাই বলছি।'

'আবার কথা ? চড়িয়ে তোর মুখ ভেঙে দেব হতভাগা। পড়াশুনার কোন বালাই নেই, এই বয়সেই ট্যারাবাঁকা কথা বলছিস ! দূর হ।' অমরনাথ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তাঁর চোখ বিস্ফারিত হল। দীপা দ্রুত তাঁকে জড়িয়ে ধরল, 'বাবা, কি করছ তুমি ? শান্ত হও। এখন তোমার উত্তেজিত হওয়া একদম উচিত নয়।' ছেলেটি চলে যাওয়ার পরেও অমরনাথ স্বাভাবিক হচ্ছিলেন না। তাঁর গলাব স্বর ভেতরেও [illegible]চ্ছিল। মনোরমা এবং অঞ্জলি দৌড়ে বাইরে এলেন। মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে ? অমর ওভাবে চিৎকার করল কেন ?'

অঞ্জলি বলল, 'সর। আমাকে দে।' প্রায় জোর করেই দীপাকে সরিয়ে দিয়ে সে অমরনাথের বুকে ম্যাসাজ করে দিতে লাগল। মনোরমা আবার প্রশ্নটা করলেন। জবাব দিতে একটুও ইচ্ছে করছিল না দীপার। সে ইশারায় মনোরমাকে বলল, 'পরে বলব। মালিশ করে দেওয়ার পর অমরনাথ একটু শান্ত হলেন। অঞ্জলি বলল, 'বুকের শব্দ খুব বেড়ে গিয়েছে। মা, ওদের কাউকে বলুন তো ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনতে।'

মনোরমা দ্রুত ভেতরে চলে গেলেন। আর তারপরেই ছোট ভাই মাঠের ভেতর দিয়ে ছুটে গেল। অঞ্জলি বলল, 'ঘরে গিয়ে শুতে পারবে ?'

অমরনাথ মাথা নাড়লেন, 'না।'

এবার অঞ্জলি দীপার দিকে তাকাল, তোকে বলেছিলাম ও যেন উত্তেজিত না হয়— !'

'আমি কিছু করিনি মা।'

'তাহলে এমন হল কেন ?'

দীপা জবাব দিল না। দিলে যে কথাটা বলতে হয় তা অঞ্জলির ভাল লাগবে না।

অমরনাথ নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর দুর্বল গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কথাটা বল।'

অঞ্জলি ঝুঁকে দাঁড়াল, 'কি কথা ?'

অমরনাথ দীপার দিকে ইশারা করলেন। প্রথমে ধরতে পারেনি সে। তারপর খেয়াল হতে অস্বস্তিতে পড়ল। অঞ্জলি দীপাকে বলল, 'যা জিজ্ঞাসা করছেন তার জবাব দে। প্রশ্ন করে উত্তর না পেলে আবার উত্তেজিত হয়ে পড়বেন।'

দীপা দেখল অমরনাথ তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে এগিয়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরল, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়। পরে বলব।'

'পরে কেন ? এরা আছে বলে সঙ্কোচ করো না।'

মনোরমা বললেন, 'বল না। কি এমন কথা যা আমাদের সামনে বলা যাবে না।'

দীপা বলল, 'তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ আমাকে।'

অমরনাথ হেসে ঘাড় নাড়লেন। দীপা বলল, 'দ্যাখো, আমার তো আর মোটে দুই আড়াই বছর ব্যাঙ্কের টাকাটার ওপর নির্ভর করতে হবে। তার মধ্যে নিশ্চয়ই চাকরি পেয়ে যাব। এই কটা বছর চালাতে হাজার পাঁচ ছয় টাকা হলেই চলবে। তাই আমার ইচ্ছে, ব্যাঙ্কে যে টাকা রয়েছে তা থেকে ওই টাকাটা কলকাতার ওদের কোন ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার করে নিয়ে যাই। বাকি চল্লিশ হাজার তুলে মায়ের হাতে দিই যাতে তোমার পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসা বা সংসারের কোন অসুবিধে না হয়।'

অমরনাথ কিছু বলার আগেই মনোরমা বললেন, 'বাঃ, এ তো খুব ভাল কথা।' অঞ্জলি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি ওই সময়ের মধ্যে চাকরি না পাও ?'

'পাব।'

'তখন কেউ তোমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়াবে না।'

'এ কি বলছ ?' অঞ্জলি প্রতিবাদ করল, 'আমরা থাকতে ও কি জলে ভেসে যাবে।'

'আমার ভাল লাগছে না.। তবে কথা আদায় করে নিয়েছ যখন তখন তাই হবে। ব্যাঙ্কের চেকবই আনো। আমি এখনই সই করে দিচ্ছি। তোমার ভাই আমি বেঁচে থাকতেই তোমাকে দায়ী করছে, মরে গেলে কি হেনস্থা করবে কে জানে।'

সন্ধ্যের পরে হ্যারিকেনের আলোয় জলপাইগুড়ির ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে নির্দেশ দিয়ে ইংরেজিতে একটা চিঠি লিখে অমরনাথকে পড়ে শোনাল দীপা। তিনি মাথা নাড়লেন। বিছানায় বসে চিঠিটাকে হাতে তুলে নিয়ে একবার দেখে সই করে দিলেন। চেকে আগেই সই করা ছিল। দীপার মন এবার হালকা হল।

বিকেল বেলায় ডাক্তারবাবু এসে অমরনাথকে দেখে বলে গেছেন, 'কোন ভয় নেই। মেয়ে এসে গিয়েছে, এবার ওষুধের চেয়ে বেশী কাজ হবে।' রাত্রে যাতে ভাল ঘুম হয় তার ওষুধ অবশ্য দিয়ে গিয়েছেন। দীপা যখন এগিয়ে দিতে গিয়েছিল তখন বলেছিলেন, 'প্রেসারটা আজ বেশী দেখলাম। হার্টবিটও নর্মাল নয়। একদম কথা বলতে দিও না।'

'একটা চিঠি সই করাতে পারি ?'

'তা পারো। কিসের চিঠি ?'

'ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে লিখতে হবে।'

'শুধু সই করাবে, তার বেশী কিছু নয়।' ডাক্তারবাবু জানিয়েছিলেন। চিঠিটা চেকের সঙ্গে ভাঁজ করে দীপা উঠে পড়ছিল, অমরনাথ ইশারা করলেন, দীপা দাঁড়াল। অমরনাথ বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলি, পৃথিবীতে কোন সম্পর্ক কখনই অটুট থাকে

না। নিজেরটা বুঝে নেবে সবার আগে। তেমন ছেলে পেলে তুমি আবার সংসারী হবে, এ আমার আদেশ।'

অঞ্জলি বকুনি দিল, 'থাক! এসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সকালে ঘুম থেকে উঠে মনোরমার পাশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল দীপা ।এখনও দিন ফোটেনি। খালি পায়ে উঠোনে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল। টিনের দরজা খুলে মাঠে পা দিতে চেনা গন্ধটা পেল। ঘাস সাদা করে শিউলিফুল ঝরেছে পুজোর আগেই। সেই ছেলেবেলার মত একছুটে গাছতলায় পৌঁছে গেল সে। তাজা শিশিরমাখা শিউলিগুলো কিরকম আদুরে। উবু হয়ে কয়েকটা তুলে নিতে গিয়েই ছবিটা ভেসে উঠল। মাস্টারবাবুর বাড়িতে আসা ছেলেটা এইরকম একটা সময়ে তাকে বলেছিল সুচিত্রা সেনের মত দেখতে। খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। আজ কিন্তু অসীমের কথা মনে পড়ল। সত্যি ভাল। নইলে তাকে পৌঁছে দিতে ও এত দূরে আসতো না। শিলিগুড়িতে অসীম এখন কি করছে? হঠাৎ অসীমের জন্যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এমন কি শিউলির গন্ধ সেই খারাপ লাগাটাকে বাড়িয়ে দিল। আজ সকালে জলপাইগুড়িতে যাবে সে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে চিঠি দিয়ে টাকার ব্যবস্থা করতে। জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি তো মাত্র একঘণ্টার রাস্তা। বুকের মধ্যে একটা ইচ্ছে টলটল করতে লাগল দীপার।

গত রাত্রে কথা হয়েছিল অঞ্জলি দীপার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে যাবে। অত টাকা একা নিয়ে আসা ঠিক হবে না। অঞ্জলির ইচ্ছে টাকাটা চা-বাগানের পোস্ট অফিসে রেখে দেবে। তুলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু সকালে উঠে অঞ্জলি জানাল তার শরীর খারাপ। অতএব মনোরমা সঙ্গে এলেন। কলকাতা থেকে ঘুরে এসে মনোরমা এখন বেশ চটপটে হয়েছেন। মনোরমাকে নিয়ে শিলিগুড়িতে অসীমের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। ভাল লাগছিল না একটুও।

ব্যাঙ্কে যখন পৌঁছাল তখন এগারটা। সেই ম্যানেজার এখনও বদলি হননি। চিঠিটা পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত টাকা নিয়ে যেতে পারবেন?'

দীপা জানতে চাইল, 'আর কোন উপায় আছে?'

'কয়েকটা ইনস্টলমেন্টে নিতে পারেন।'

'বার বার আসা সম্ভব হবে না।'

'তাহলে দশ হাজার টাকা ক্যাশ দিচ্ছি, বাকিটা ড্রাফট নিয়ে যান। পোস্টঅফিসে অ্যাকাউন্ট খুলে জমা দিয়ে দেবেন। অবশ্য এর জন্যে আমাদের নোটিস দেওয়া দরকার। দেখি, কি করতে পারি।'

দশ হাজার টাকা আর ড্রাফট নিয়ে ওরা যখন ব্যাঙ্ক থেকে বের হল তখন বেলা একটা। রিক্সায় উঠতে উঠতে মনোরমা বললেন, 'হ্যাঁ রে, প্রতুলবাবুর বাড়িটা কোনদিকে?'

বিরক্ত হল দীপা, 'কেন?'

'তুই জানিস না?'

'কি জানব?'

'কোর্ট থেকে কিসব কাগজপত্র এসেছিল তোর নামে।'

'কিসের কাগজ?'

'জানি না বাবা। শুনছিলাম প্রতুলবাবুর বিষয়সম্পত্তি নিয়ে। আমাকে তো আজকাল তোর মা কিছু খুলে বলে না।'

মাথা গরম, কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। অমরনাথ তো এসব কথা একবারও

বলেননি। অঞ্জলিও না। অমরনাথ অসুস্থ কিন্তু এত কথার মধ্যে এটা বলতে অসুবিধে ছিল কোথায় ? কিভাবে কথাটা তুলবে ভেবে পাচ্ছিল না সে।

কোয়ার্টার্সের সামনে বাস থেকে নামতেই অবাক হয়ে গেল ওরা। বাড়ির সামনে অনেক লোক। মনোরমা শিউরে উঠলেন, 'কি হল ?'

কয়েক পা বাড়াতে উত্তরটা পেতে অসুবিধে হল না। অঞ্জলির বুক ফাটা বিলাপ কানে আসতেই মনোরমা টলতে লাগলেন। দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরল দীপা।

॥ ৩৫ ॥

অমরনাথ শুয়ে আছেন তাঁর খাটে। যে খাটটা কখনই তাঁর নিজস্ব ছিল না। বিয়ের পর অঞ্জলি ওই খাট নিয়ে এসেছিল। দীপা কিংবা তাঁর অন্য ছেলেদের অনেক বাল্যস্মৃতি রয়েছে ওই খাটকে ঘিরে। খাটের ওপাশে বসে অঞ্জলি মাঝেমাঝেই অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান ফেরা মাত্র সে তীব্র চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অমরনাথের বুকে। চা-বাগানের অন্যান্য বাবুদের স্ত্রীরা তাকে সামলাতে চেষ্টা করছে প্রাণপণে। একজন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন মনোরমাকে। নিজেকে তিনি কোনমতে বহন করে এনেছিলেন এই ঘরে, ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনিও অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তাঁকে সেবা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কয়েকজন। দূরের দরজায় দীপা দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মত। তার সঙ্গে হাজার হাজার টাকা এবং একটি ব্যাঙ্ক ড্রাফট।

অমরনাথকে খুব শান্ত দেখাচ্ছিল। যেন প্রশান্ত মনে ঘুমাচ্ছেন। তাঁর পরনে এখনও লুঙ্গি আর গেঞ্জি। সেদুটিও ধোপদুরস্ত। ডাক্তারবাবু এগিয়ে এলেন দীপার কাছে, 'হবে জানতাম কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হবে ভাবতে পারিনি। প্রচণ্ড লড়াই করেছিলেন, চেষ্টা করলাম।'

দীপার শরীর এখন চৈত্রের আকাশ। একটা গরম হলকা যেন পাক খাচ্ছে শরীরময়। কথা বলতে গিয়ে আবিষ্কার করল জিভ নড়ছে না। আর সেই সময় অঞ্জলির জ্ঞান ফিরে এল। স্বামীর বুকের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হতেই তার নজর পড়ল দীপার দিকে. সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর পাল্টে গেল তার। হিমশীতল গলায় যদি উপহাস মেশে তাহলে এমনভাবে শব্দ উচ্চারণ করা যায়।

অঞ্জলি বলল, 'এসো, অত দূরে কেন, এসে দ্যাখো, যাকে এতকাল বাবা বলতে, যিনি তোমার সর্বনাশ করেছিলেন বলেছিলে, তিনি কি সুন্দর ঘুমিয়ে আছেন। কাছে এসো।'

নাড়া খেল দীপা। ঘরে যারা ভিড় করে ছিল গম্ভীর মুখে তারা এবার পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। অঞ্জলি টলতে টলতে খাট থেকে নামলো। ওকে আটকাবার চেষ্টা কেউ করল না। তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছিল। কয়েক পা এগিয়ে এসে চিল-চিৎকারে অঞ্জলি বলে উঠল, 'জন্মমাত্র মাকে খেয়েছিল বিয়েমাত্র স্বামীকে গিলেছিল, তবু তোর নোলা ভরল না রে, ওকে শেষ না করলে তোর কিছুতেই কি পেট ভরছিল না ?'

হঠাৎ তারস্বরে চিৎকার করে উঠলেন মনোরমা, 'বউমা। না, এমন কথা বোলো না, বোলো না। পাপ হবে, পাপ হবে।'

'পাপ হবে ?' ফুঁসে উঠল অঞ্জলি, 'কিসের পাপ ? আর পাপ হলে কে ভয় পাচ্ছে ? আমার আর কি রইল ? কি হবে পাপে ? এতদিন মানুষটা ভাল ছিল। খেতো ঘুমাতো, তবু তো ছিল। যেই ইনি এলেন কলকাতা থেকে— ।' দাঁতে দাঁত লেগে গেল অঞ্জলির। তার

শরীর টলতে লাগল। দুজন মহিলা দুপাশ থেকে ধরে মেঝেতেই শুইয়ে দিলেন তাকে। সবাই খুব অপ্রস্তুত।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে ছিল দীপা। এখন তার চৈতন্য পরিষ্কার। কথাগুলো গরম লোহার মত তাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়ে গেল আচমকা। সে নড়তে পারছিল না।

ডাক্তারবাবু পাশে দাঁড়িয়েছিলো। এবার তিনি দীপার কাঁধে হাত রাখলেন, 'আপসেট হয়ো না।' এইসময় অনেক মানুষ নার্ভ হারিয়ে ফেলে, সেন্স কাজ করে না। উনি কি বলছেন তা নিজেই জানেন না।'

দীপা দেখল মনোরমাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল অমরনাথের কাছে। ছেলের মাথার পাশে ধপ করে বসে পড়লেন তিনি। ওর খুব ইচ্ছে করছিল অমরনাথের কাছে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয় হচ্ছিল জ্ঞান ফিরে আসামাত্র অঞ্জলি যদি আবার চিৎকার শুরু করে। ওই খারাপ কথাগুলো যদি আবার শুনতে হয়। ডাক্তারবাবু ওর পিঠে হাত দিয়ে তখনও দাঁড়িয়েছিলেন। দীপার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। সে হঠাৎ জড়িয়ে ধরল ডাক্তারবাবুকে এবং সেইসঙ্গে কান্না ছিটকে উঠল। এতক্ষণের চাপা যন্ত্রণা শোক এবং আহত হবার অনুভূতি মিলে মিশে একাকার। এই কান্না অমরনাথের জন্যে যতটা নিজের জন্যে তার চেয়ে কিছু কম নয়। ডাক্তারবাবু মাথায় হাত বোলাচ্ছিলেন 'বি স্টেডি। তুমি আর পাঁচটা মেয়ের মত নও। তোমার নার্ভ খুব শক্ত, আমি জানি; বি স্টেডি।'

কান্নার বেগ সামান্য কমলে দীপাব অনুভবে একটা পুরুষালি গন্ধ ছড়ালো। এই গন্ধ অমরনাথ জড়িয়ে ধরলে সে অনুভব করত। পলকেই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে ছুটে গেল অমরনাথের কাছে। মৃত মানুষের হাত টেনে নিয়ে নিজের মুখ রাখল সে এখানে। আর তখনই খাটের এক কোণে দাঁড়ানো বড় ভাই বলে উঠল, 'এই দিদি, তুই বাবাকে ছুঁবি না।'

কেউ একজন প্রতিবাদ করল, 'এই, তুই কি যা তা বলছিস?'

'ঠিক বলছি। দিদির জন্যে বাবা মাবা গিয়েছে।'

দীপার কানে কথাগুলো ঢুকছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছিল সে। যেন অমরনাথের স্পর্শের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে বাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই হাত কতবার তাকে ছুঁয়ে গিয়েছে। এখনও উত্তাপ চলে যায়নি চামড়ার। মানুষ মরে গেলে সম্পর্কও মরে যায়?

ডাক্তারবাবুর গলা কানে এল, 'শ্যামল, আর দেরি করে কোন লাভ নেই।'

শ্যামলদা বলল, 'নিয়ে গেলেই হয়। সাহেব আসবেন শুনছিলাম।'

'এসে পড়লেন বলে। তৈরী হও তোমরা।'

মনোরমা কোন কথা বলছেন না। ওরা অমরনাথকে পোশাক পরানোর জন্যে হাত লাগাতেই তিনি দীপাকে নিয়ে নেমে এলেন উঠোনে। একটানা কেঁদে যাচ্ছিল দীপা। তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন রান্নাঘরের সিঁড়িতে। তাঁর দৃষ্টি শূন্য। দীপাকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকা ছাড়া এই মুহূর্তে তার যেন কিছুই করার ছিল না।

একসময় ললিতাদি এগিয়ে এল কাছে। নিচু গলায় বলল, 'দীপা, তোমাকে ওঁরা ডাকছেন। একবার এসো।'

দীপা মাথা ঝাঁকালো, 'আমি যাব না, কোথাও যাব না।' মনোরমার কোল থেকে মুখ তুলতে তার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না।

ললিতা বললেন, 'ওঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সাহেব এসেছেন। এই সময় তোমার গিয়ে দাঁড়ানো উচিত। লক্ষ্মীটি, উঠে এসো।'

অমরনাথকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দীপা শক্ত হয়ে গেল। আর তখনই মনোরমা

শুকনো স্বরে বললেন, 'যা।' দীপা ধীরে ধীরে উঠল। ললিতা তার হাত ধরল।

অঞ্জলিকে ধরে রাখা মুশকিল হচ্ছিল। তার পৃথিবীতে আর কেউ নিজের বলে রইল না এইরকম একটা বোধে আক্রান্ত হয়ে সে বেসামাল হয়ে গিয়েছিল। দীপাকে ছেড়ে দিয়ে ললিতাদি তার কাছে গিয়ে বলল, 'কাকিমা, নিজেকে একটু সামলান। ছেলেরা সামনে আছে, ওদের কথা ভাবুন।'

একসময় অমরনাথকে নিয়ে ওরা রওনা হল। শিউলি গাছের পাশ দিয়ে মাঠ ডিঙিয়ে আসাম রোডের দিকে মিছিলটা চলে গেল হরিধ্বনি দিতে দিতে। মেয়েদের শ্মশানে যাওয়ার চল এখনও এ-বাগানে হয়নি। শুধু ছেলে না থাকলে এবং মেয়ে যদি অবিবাহিতা হয় তাহলে তাকে মুখাগ্নির জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সে-সব ক্ষেত্রে মৃতের দাদা ভাই বা ওই রকম আত্মীয় যদি না থাকে তবেই।

সবাই মিলে অঞ্জলিকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে গেলে, দীপা একা মাঠে দাঁড়িয়ে আসাম রোডে শবমিছিল দেখছিল। কিছু বয়স্ক মানুষ যাঁরা শ্মশানে যাননি তাঁরা এখন ফিরে যাচ্ছিলেন যে যাঁর বাড়িতে। এই চা-বাগানের ম্যানেজার তাঁর গাড়িতে চেপে রওনা হচ্ছিলেন শ্মশানের দিকে। ওঠার মুখে জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েরা যদি যেতে চায় তিনি লিফট দিতে পারেন। কিন্তু কেউ কিছু জবাব দিল না।

যে মানুষটির সঙ্গে তার সবচেয়ে অপ্রীতির সম্পর্ক তৈরি হত বারংবার অথচ যে মানুষটির ভালবাসা সে অনুভব করত প্রতিটি মুহূর্তে এই পৃথিবীতে যে ছিল তার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, তার এগিয়ে যাওয়ার পথে সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নিজের কথা চিন্তা না করে, আজ আর তিনি কোথাও রইলেন না।

দীপা ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। শ্মশানযাত্রীদের থেকে অনেক দূরে, একা একা। তার পায়ে জুতো নেই, চোখে জলের দাগ। আঙরাভাসা নদী, বাজার, চৌমাথা পেরিয়ে সে যখন পুলের ওপর এসে দাঁড়াল তখন শ্মশানযাত্রীরা নেমে গিয়েছে নিচে। চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে অনেক দূর থেকে মানুষটিকে ছাই হয়ে যেতে দেখল সে। মানুষটি মরে যাওয়ার পর আগুনের স্পর্শেই শুধু ছাই হয়ে যায়? জীবন্ত মানুষও তো কারো কারো কাছে ছাই হতে পারে! জন্মাবার পর তাকে যে দুটো মানুষ স্নেহ-ভালবাসায় আপ্লুত হয়ে নিয়ে এসে নিজের সন্তানের মত মানুষ করতে চেয়েছিল, বাবা ও মা বলতে শিখিয়েছিল তার একজন যদি চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় অন্যজন জ্বালা ঈর্ষার সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব লোপ পাবার আশঙ্কায় মরীয়া হয়ে এতদিনের সম্পর্কই শুধু পুড়িয়ে ছাই করে দেয়নি নিজেকে অনেক নিচে নামাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

দীপা আবার বাড়ির পথ ধরল। চৌমাথায় সবাই তাকে এখন লক্ষ্য করছে। এই চেনা জায়গাটাকে এখন তার অচেনা মনে হচ্ছে। চৌমাথা, পোস্ট অফিস, স্কুলের মাঠ, বাজার, আঙরাভাসা নদী সব যেন অচেনা, অপরিচিত। অথবা তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্মৃতিগুলো এই মুহূর্তে অবশ হয়ে গিয়েছে। আসাম রোড দিয়ে কোয়ার্টার্সের সামনে পৌঁছে স্থির হল সে। এখন সে ওই বাড়িতে থাকবে কি করে? যে চারজন মানুষ ওই বাড়িতে বাস করবে তাদের তিনজন তাকে আর পছন্দ করছে না। অঞ্জলি যে ভাষা প্রকাশ্যে ব্যবহার করেছে, বড় ভাই যে কথাগুলো উচ্চারণ করতে সাহস পেয়েছে তারপর আর ওখানে থাকার কোন মানে হয় না। যদি এটা মেনে নিতে হয় তাহলে অনেক দিন আগে সে প্রতুলবাবুর বাড়িতে সব মেনে নিয়ে বিধবা হয়ে থাকতে পারত। কিন্তু কোথায় যাবে সে? এই পৃথিবীতে তার যাওয়ার জায়গা নেই। হোস্টেল খুলতে দেরি আছে। আর দুদিন বাদেই

পুজো। এবার মা দুর্গা অদ্ভুতভাবে আসছেন তাদের পৃথিবীতে।

বারান্দায় উঠে এল দীপা। ললিতাদি এবার তার সামনে দাঁড়িয়ে। যে ললিতাদি একসময় শ্যামলদাকে পাওয়ার জন্যে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল, যে-কারণে শ্যামলদার বাবা আত্মহত্যা করেছিলেন, যাকে এই চা-বাগানের সবাই খারাপ মেয়ে বলে একসময় এড়িয়ে চলত সেই ললিতাদি আজ তাদের বাড়ির সমস্যা সামলাচ্ছে। সময় সব কিছু খুব সহজেই পালটে দিয়ে যায়। ললিতাদি জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় গিয়েছিলে দীপা?'

'শ্মশানের রাস্তায়।'

'দাহ হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এখনই শ্মশানযাত্রীরা ফিরে আসবে। ওদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। বুধুয়াকে পাঠিয়েছি মিষ্টি আনতে বাজারে। এলে মিষ্টি জল দিতে হবে।'

'বুধুয়া? বুধুয়া এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'খবর পেয়ে চলে এসেছে।'

'কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবে কেন?'

'নিয়ম।' ললিতাদি বলল, 'মানুষগুলোর তো অনেক পরিশ্রম হল। আর হ্যাঁ, তুমি একবার ভেতরে যাও। তোমার মা বারংবার তোমার খোঁজ করছেন।'

দীপা শক্ত হয়ে গেল। ঠোঁট কামড়াল। ললিতাদি বলল, 'যাও।'

অগত্যা দীপা পা বাড়াল। আর এক প্রস্থ আক্রমণ আর একগাদা নোংরা কথায় তাকে স্নান করতে হবে এখন। তখন অমরনাথের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা বলেনি কিন্তু এবার জানতে চাইবে কেন তাকে এসব বলা হচ্ছে। কি দোষ তার?

বড় ঘরটায় মেঝেতে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অঞ্জলি। তার একপাশে কয়েকজন মহিলা। একজন তাকে ডাকল, 'এসো। ওই তো দীপা এসে গিয়েছে।'

অঞ্জলি উঠে বসতে চাইলে একজন মহিলা বাধা দিলেন, 'না, না, আপনি উঠবেন না। অত মাথা ঘুরছে—।'

কিন্তু অঞ্জলি শুনল না। হাত বাড়িয়ে সে ডাকল, 'দীপা, কাছে আয়।'

একেবারে অন্যরকম গলা। দীপা হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু তখনই তার নজর পড়ল অঞ্জলির ওপর। ইতিমধ্যেই হাত থেকে শাঁখা নোওয়া খুলে নিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। হঠাৎ যেন শরীরটাকে রক্তশূন্য দেখাচ্ছে। অঞ্জলি এবার কান্না মেশানো গলায় ডাকল, 'রাগ করিস না মা, কাছে আয়।'

যেন শেকড়ের শেষ প্রান্তে টান পড়ল। দীপা নিজেকে সামলাতে পারল না। একরকম টলতে টলতেই সে অঞ্জলির কাছে পৌঁছে গেল। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিয়ে অঞ্জলি ডুকরে কেঁদে উঠল, 'তোকে ও সবচেয়ে ভালবাসত রে। তোর জন্যেই শুধু দিনরাত চিন্তা করত। তোর অত বড় ক্ষতি হওয়ার পর ভীষণ মুষড়ে পড়েছিল মানুষটা। তোকে ও পাগলের মত ভালবাসত।'

দীপা কেঁদে ফেলল। এই সত্যি কথাটা বুকের সমস্ত আড়াল যেন এক টানে সরিয়ে ফেলল।

কান্না চলল কিছুক্ষণ। অঞ্জলি সেই অবস্থায় বলতে লাগল, 'আমি পাগল হয়ে গিয়েছি রে। আমার মাথার কোন ঠিক নেই। তোকে তখন কি বলতে কি বলেছি, মানুষটার প্রাণ

ছিল না শুনে গেল তো সব, কি করে প্রায়শ্চিত্ত করি।'

দীপা চিৎকার করে উঠল, 'মা।'

'আমি তোর সঙ্গে সৎমার মত ব্যবহার করেছি। কি করে করলাম—।'

এই সময় শ্মশানযাত্রীরা ফিরে এল। বুধুয়াও এল মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে। অঞ্জলির ছোট ছেলে ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে বড় ছেলে এল, 'মা!' একটি কিশোরের গলা থেকে যুবকের স্বর বের হল যেন।

অঞ্জলি কেঁপে উঠল। তার কান্না থেমে গেল। দীপাকে জড়িয়ে ধরেই সে আবার অমরনাথের উদ্দেশে বিলাপ শুরু করল। বড় ছেলে যেন হতবাক। দিদি যে আবার মায়ের এত কাছাকাছি পৌঁছে যাবে সে সম্ভবত আশাই করেনি।

পুত্রের মৃত্যুশোকে একটা মানুষ যে কতটা পাথর হয়ে যেতে পারে তা মনোরমাকে না দেখে বোঝা দীপার পক্ষে সম্ভব ছিল না। জলপাইগুড়িতে যে কাপড়ে গিয়েছিলেন সেই এক কাপড়ে তিনি বসেছিলেন মধ্যরাত পর্যন্ত। সন্ধের মুখে প্রায় জোর করে দীপা তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধা বিছানায় শোননি। ঠাকুরের ছবির দিকে পেছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন তিনি। বারংবার বলা সত্ত্বেও কথার জবাব দেননি। মনোরমা সামান্য সুস্থ আছেন আর তাঁর ঠাকুরের সামনে প্রদীপ জ্বলেনি এমন একটা সন্ধ্যার কথা দীপা কখনও কল্পনাও কবতে পারেনি। রক্ত মাংসেব শরীরটা যেন বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

আজ রাত্রে এ বাড়িতে রান্না হবার কথাও নয়। দুই ছেলে হবিষ্যি করবে। কিন্তু মেয়েদের জন্যে সামান্য খাবার ডাক্তারবাবুর স্ত্রী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অঞ্জলি সেটা ছুঁয়েও দ্যাখেনি। রাত বাড়লে দীপার হঠাৎ খিদে পেল। অথচ আবহাওয়া এমন যে সেই খাবাব খেতে যেতেও খারাপ লাগছিল। অমবনাথকে সে ভালবাসত। অমরনাথেব কাজেব প্রতিবাদে সে একসময় জলপাইগুড়ির হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছিল। নগ্ন একটা সত্য বলেছিল বলে অমরনাথ সেদিন অপমানিত বোধ করেছিলেন। কিন্তু এর বাইরে অমবনাথই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র মানুষ যিনি তাকে বুঝতে পারতেন। সেই অমরনাথেব চলে যাওয়াটা তার কাছে যেমন কষ্টের তেমনই এই রাত্রে খিদেবোধটাও সমান সত্যি।

বড় বাড়ির দরজা বন্ধ। উঠোনের ওপাশে রান্নাঘরেব দরজাও খোলা হয়নি। সে মনোরমার ঘর থেকে বেরিয়ে কলতলার দিকে গেল। টিউবওয়েল টিপে জল বেব করে বেশ খানিকটা গিলে ফেলতেই শরীর যেন গুলিয়ে উঠল। মাথায় মুখে জল দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই সে চমকে উঠল। রান্নাঘরের বারান্দায় কেউ একজন বসে আছে। কে? চোর? অনেকগুলো চিন্তা একসঙ্গে পাকিয়ে ওঠামাত্র সে চিৎকাব করে উঠল, 'কে?'

'হাম। আমি।' বুধুয়ার গলা।

সহসা যেন নিঃশ্বাস সহজ হল, 'ওখানে কি করছিস?'

'এইস্যাই। বইঠা হ্যায়।' বুধুয়ার গলায় নির্লিপ্ততা।

'বাড়ি যাসনি কেন?'

'এইস্যাই।'

'খেয়েছিস কিছু?'

'নেহি। ভুখ নেহি লাগতা।'

'তোর ঘুম পাচ্ছে না?'

'নেহি।'

দীপা অবাক হয়ে গেল। অমরনাথের সঙ্গে বুধুয়ার সম্পর্ক প্রভু এবং ভৃত্যের। হাটের

দিন ব্যাগ হাতে পেছন পেছন যেত। অমরনাথের বাজার করা নিয়ে সে অঞ্জলির সঙ্গে তর্ক করত। কিন্তু কখনই অমরনাথের মুখের ওপর কথা বলার স্পর্দ্ধা দেখায়নি। এই বাড়ির চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়ে নিশ্চয়ই খুব কষ্টে ছিল বেচারা। আজ এই রাত্রে একা রান্নাঘরের বারান্দায় ওইভাবে যে মানুষ বসে থাকে তার মনটাকে এ বাড়ির কেউ কখনও বুঝতেই চায়নি। দীপা বলল, 'বুধুয়া তুই রান্নাঘরে গিয়ে শুয়ে পড়।'

বুধুয়া জবাব দিল না। এবং দীপা আবিষ্কার করল তার সমস্ত খিদেবোধটা এক মুহূর্তেই উধাও হয়ে গিয়েছে। পায়ে পায়ে মনোরমার ঘরে ঢুকে সে দরজা দিল। তারপর দুহাতে মনোরমার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল, 'ঠাকুমা, ঠাকুমা এবার উঠে বস।'

মনোরমা চোখ তুলে তাকালেন। তারপর শুকনো গলায় জানতে চাইলেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলি ?' দীপা বলল, 'বুধুয়া। রান্নাঘরের বারান্দায় বসে আছে। তুমি ওঠো। শুয়ে পড়। তুমি না শুলে আমি ঘুমাতে পারব না।'

মনোরমা উঠলেন, 'আমি বাথরুম থেকে আসছি। তুই আমাব বিছানা নিচে করে দে।'

'নিচে কেন ?'

'ছেলেদুটো আজ নিচে শোবে, আমি খাটে শুতে পারব না।' মনোবমা বাইরে বেরিযে গেলেন। আর তার কয়েক সেকেণ্ড বাদে হঠাৎ একটা কান্না বাজল উঠোনে। এ নিশ্চয়ই বুধুয়া। দীপা দরজা ফাঁক করে দেখার চেষ্টা করল। মনোরমা দাঁড়িযে আছেন উঠোনে আর তার পায়ের ওপর মাথা রেখে বুধুয়া কেঁদে যাচ্ছে, 'বাবু দেওতা থা, মা, বাবু হামকো তিনশো রুপিয়া দেকে বোলা বুধুয়া আজসে তুম কিসি কো গোলাম নেহি হ্যায়, তুম ব্যবসা করো। লেকিন হাম জিন্দেগি ভর বাবুকো গোলাম—'

অমরনাথের মৃত্যু যেন একটি পরিবাবের বিশেষ কারো চলে যাওয়া নয়, চা-বাগানের সমস্ত মানুষের আত্মীয়বিয়োগ বলে ক্রমশ মনে হচ্ছিল। দুবেলা মানুষজন আসছেন। ডাক্তাববাবুর পরিবার বিশেষ করে দেখাশোনা কবছেন। শ্যামলদা এবং ললিতাদি দুবেলা খবর নিচ্ছেন। অঞ্জলি যত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়েছিল তত তাড়াতাড়ি সামলে উঠেছে।

পুজো এসে গেল অমবনাথেব শ্রাদ্ধের আগেই। এ বাড়িতে পুজোব আবহাওযা নেই। এখনও পুজো হচ্ছে বাজারে। চা-বাগানেব একমাত্র পুজো কালীঠাকুরের। দুই ভাই থাকা সত্ত্বেও অমরনাথের কাজের ব্যাপারে দীপাকেই সব দায়িত্ব নিতে হচ্ছে। দুজনের সঙ্গে সম্পর্ক একটুও স্বাভাবিক হয়নি তার। কিন্তু সেটা নিযে মোটেই ভাবছে না সে। অঞ্জলি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে এখন। ব্যাঙ্ক ড্রাফট পোস্ট অফিসে জমা দেওয়া হয়ে গিয়েছে অঞ্জলির নামে। সেইটে পাওয়ায় তাব দুশ্চিন্তা সামান্য কমেছে।

এসব সত্ত্বেও মনোরমা কিন্তু মোটেই স্বাভাবিক হননি। ঠাকুমাকে বোঝাবার কিছু নেই। যে মানুষ জীবনে অনেক অভিজ্ঞতাব মধ্যে দিয়ে এসেছে তাঁকে নতুন করে উপদেশ দিতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তবু এক রাত্রে দীপা তাঁকে বলেছিল, 'তুমি কেন এত চিন্তা করছ ঠাকুমা। আমার ওপব তোমার একটুও ভরসা নেই ?'

মনোরমা জবাব দেননি। এখন তিনি একবেলা খাচ্ছেন। প্রায হবিষ্যান্নই বলা চলে। একা থাকলেই উদাস চোখে তাকিয়ে থাকেন। দীপা দ্বিতীয়বার কথাটা তুলতে মুখ খুলেছিলেন, 'আমার শৈশব কেটেছিল বাবা-মায়ের কাছে, সবার যেমন কাটে। অল্প বয়সে বিয়ে হল। স্বামীকে পেলাম। তাঁর বাড়িতে গেলাম। বাবা মায়ের হাত থেকে তিনি আমার দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে নৌকাডুবি হল, পেটে তোব বাবাকে নিয়ে ফিরে

এলাম আবার সেই বাবার কাছে। তারপর বাবা গেলেন। ভাই দায়িত্ব নিল আমার। ছেলে হল, মানুষ করলাম। উপযুক্ত ছেলে চাকরি পেয়ে নিয়ে এল কাছে। এবার সে নিল দায়িত্ব। জীবনে এত স্বস্তি কখনও পাইনি। তা সেই ছেলেও চলে গেল। এবার দায়িত্ব নেবে ছেলের বউ ? হয়তো নেবে। কিন্তু আমি কে ? আমি কি একটা মানুষ ? এইভাবে একজনের পর একজনের কাঁধে ভর করে বেঁচে থাকাকে কি মানুষের জীবন বলে ? তোর মাকে কি আমি কখনও চিনতাম ? অথচ এখন তার ভরসায় আমাকে জীবন কাটাতে হবে। এই হল বিধিলিপি।'

দীপা অবাক হয়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। আত্মসম্মানবোধ প্রতিটি মানুষের আছে। যারা নিজেকে উন্মোচিত করতে অক্ষম তারা সেটাকে চেপে রাখে, মুখ বুজে সয়ে যায়। কিন্তু মনের মধ্যে মাঝেমাঝেই সেই বোধটা নিশ্চয়ই ঠোকর মারে। তারা হয়তো দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী দিগম্বরী দেবী হতে পারেন না কিন্তু জ্বালা তো সবার সমান। সে বলেছিল, 'ঠাকুমা, আমি তো তোমাদের বংশের কেউ নই। তোমাদের রক্ত আমার শরীরে নেই। কিন্তু জ্ঞান হবার পর থেকেই আমি তোমার গায়ের গন্ধ নিয়ে প্রতিটি রাত্রে ঘুমিয়েছি। মেয়ে হিসেবে কি করা উচিত তা শিখেছি তোমার কাছ থেকে। এখন বল তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি রক্তের সম্পর্কের চেয়ে কম দামী ?'

মনোরমা দীপার হাত জড়িয়ে ধরলেন। সেই স্পর্শে অনেক কথা বলে ফেললেন তিনি।

দীপা বলল, 'তুমি আর কয়েকটা বছর অপেক্ষা কর ঠাকুমা, আমি চাকরি পাওয়ামাত্র তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাব। তুমি আর আমি থাকব।'

দীপা যাই বলুক মনোরমার কোন পরিবর্তন ঘটল না। অঞ্জলি ব্যাপারটাকে যেন লক্ষ্যই করছিল না। এমন কি অমরনাথের কাজের ব্যাপারে সে যখন মনোরমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলুন। আমি আমাদের সাধ্যমত সব করার চেষ্টা করছি।' মনোরমা তখন জবাব দিয়েছিলেন, 'তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।'

শ্রাদ্ধের কাজে যোগ দেবার জন্যে বাবুদের বাড়িতে গিয়ে ছেলেরা বলে এসেছে। বাজার এবং অন্যান্যদের জানানো হয়েছে। দূরের আত্মীয়দের চিঠিতে সংবাদ জানানোর কাজ সারা। কলকাতায় সুভাষচন্দ্রকে অঞ্জলি নিজে চিঠি লিখেছে। সুভাষচন্দ্র টেলিগ্রামে দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়েছেন যে তাঁর শরীর এত খারাপ যে আসা সম্ভব হচ্ছে না। অঞ্জলি শ্রাদ্ধের দুদিন আগে দীপাকে বলল, 'তুই অফিসে গিয়ে সাহেবকে নেমন্তন্ন করে আয়।'

'আমি ? আমি কখনও ওদিকে যাইনি।'

'যাইনি বলে কখনও যাবি না এমন তো কথা নেই।'

'কি বলব ?'

'আসতে বলবি। এখন ওই লোকটার ওপর সব নির্ভর করছে।'

'তার মানে ?'

'বড় হয়েছিস অথচ বাস্তবজ্ঞান হচ্ছে না কেন ? তোর বাবার চাকরি যতদিন ছিল, অফিসে না গেলেও, এই বাড়িতে থাকার হক্ ছিল আমাদের। এখন তো যে কোন মুহূর্তে বলে দিতে পারে বাড়ি ছেড়ে দাও। অবশ্য যদ্দিন সব প্রাপ্য টাকা না হাতে দিচ্ছে তদ্দিন তাড়াতে পারবে না। কিন্তু দিয়ে দিলেই তো অন্য বাবুকে ঢুকিয়ে দেবে এখানে। যদি পারিস এ ব্যাপারে কথা বলিস একবার।'

'কি কথা বলব ?'

'বড় খোকা পাস করা পর্যন্ত যদি এখানে থাকা যায় !' অঞ্জলি মরীয়া হয়ে বলল। দীপা

কিছু বলল না।

চা-বাগানের ভেতর দিয়ে নুড়ি বিছানো পথ দিয়ে অফিস এবং ফ্যাক্টরির দিকে যাওয়া নিষেধ ছিল ছেলেবেলায়। দীপা সেই পথে ফ্যাক্টরির সামনে আসতেই মালবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আসার কারণ। দীপা উদ্দেশ্যটা জানাতেই নিজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিয়ে গেলেন অফিস বাড়িতে। গিয়ে বড়বাবুকে ব্যাপারটা বললেন। বড়বাবু দীপাকে নিয়ে গেলেন বড়সাহেবের ঘরে। পরিচয় করিয়ে দেবার পর বড়সাহেব ওকে বসতে বললেন। দীপা বসল।

বড়সাহেব বললেন, 'এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার। মিস্টার মুখার্জী এই চা-বাগানের অ্যাসেট ছিলেন। কোম্পানি তাঁর চিকিৎসার জন্যে সব রকম সহযোগিতা করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। ওয়েল, নিশ্চয়ই যাব আমি। কখন যেতে হবে ?' ভদ্রলোক কথা বলছিলেন যে ইংরেজিতে তার উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না দীপার।

দীপা বলল, 'এগারটা নাগাদ এলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। তুমি তো কলকাতায় পড় ? কোন কলেজে ?'

'স্কটিশ চার্চ।'

'আচ্ছা ! ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছ ?'

'আমার থার্ড ইয়ার চলছে।'

'গুড। ঠিক আছে, আমি যাব।'

শ্রাদ্ধের দিন যে ব্যাপারটা ঘটবে তা দীপা আন্দাজ করেনি। একগাদা মানুষের সামনে বড়সাহেব বড়বাবুকে দিয়ে অঞ্জলিকে ডেকে আনলেন। দীপা দাঁড়িয়েছিল। বড়সাহেব হিন্দীতে বললেন, 'আপনার মেয়ের সঙ্গে কথা বলে আমার ভাল লেগেছে। ও ইংরেজি বলতে এবং বুঝতে পারে। আমাদের কোম্পানিতে এখনও মেয়েদের ক্লার্ক হিসেবে নেওয়া হয়নি। ইন ফ্যাক্ট কেউ অ্যাপ্লাই করেনি। কিন্তু মিস্টার মুখার্জীর মেয়ে হিসেবে আমি ওর নাম হেড অফিসে সুপারিশ করব যাতে এখানে ওকে চাকরি দেওয়া হয়। ওর যা কোয়ালিফিকেশন তাতে কোন অসুবিধে হবে না। আপনার আপত্তি আছে ?'

অঞ্জলি বিগলিত হন, 'আপনার দয়া। ওর চাকরি হলে আমরা বেঁচে যাব। এই বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাব ভেবে পাচ্ছিলাম না।'

'না, না। ও চাকরি করলে আপনাদের এখান থেকে কোথাও যেতে হবে না।' বড়সাহেব দীপার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কালই আমাকে অ্যাপ্লিকেশন দিও।'

দীপা কি বলবে বুঝে উঠছিল না। এই চা-বাগানে চাকরি করা মানে সমস্ত জীবন একটা কুয়োর মধ্যে আটকে থাকা। যে স্বপ্ন সে দেখছে তা থেকে লক্ষ মাইল ছিটকে-যাওয়া। একটা কেরানির জীবন কি তার কাম্য ? কখনই না। অমরনাথ বলেছেন, অনেক ওপরে উঠতে হবে, অনেক বড় হতে হবে তাকে।

বড়সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ভাবছ তুমি ?'

'আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন গ্র্যাজুয়েট হই।'

'আচ্ছা ! কিন্তু তুমি এখনই চাকরি করতে পার।'

'বাবার ইচ্ছেটাই আমার ইচ্ছে।'

'ওয়েল, সেটা তোমার ব্যাপার। কতদিন লাগবে ?'

'দু বছর।'

'আমি জানি না কোম্পানি এতটা দিন তোমাকে ডিস্টার্ব না করে থাকবে কিনা ! দেখি,

কি করতে পারি। তুমিও ভেবে দ্যাখো।' সাহেব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

সেই রাত্রে তুমুল হল। অঞ্জলি যেন পাগল হয়ে গেল। প্রথম দিকে বোঝাতে চেয়েছিল ভাল কথায়, শেষে শ্লেষ এল গলায়, 'বিদ্যেধরী হবে। গ্র্যাজুয়েট হয়ে দুটো ডানা নেড়ে ঘুরে বেড়াবে? তখন কেউ দেবে চাকরি? তোমার বাবা এই করেই তোমাদের মানুষ করেননি? আমি কোন কথা শুনতে চাই না।'

'আমি আগে পড়াশুনা শেষ করব। আই এ এস দেব।'

'তাতে আমার কি হবে? আমি তো তখন পথে বসব। একটু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তোর। জন্ম দিয়ে মা মরে গেল, বাপ দায়িত্ব নিল না, আমরাই তোকে এত বড করেছি, আর আমাদের দুর্দিনে তুই পাশে দাঁড়াবি না?'

দীপা বলল, 'মা, যে টাকা পোস্ট অফিসে আছে, যা কোম্পানি থেকে পাবে তাতে তোমরা তিন চার বছর বাড়ি ভাড়া করে ভালভাবে থাকতে পাববে। তদ্দিনে আমার চাকবি হয়ে যাবেই। আমাকে এই বদ্ধ জায়গায় সারাজীবন কাটাতে হবে না। তখন তোমরা আমার কাছে থাকতে পারবে।'

'বাঃ। সেই সময় যদি তোমার মতিগতি পাল্টে যায় তাহলে জমানো টাকা শেষ করে কোথায় দাঁড়াবো আমরা?'

'মতিগতি তো এখানে থাকলেও পাল্টাতে পাবে।'

'না। এখানে তোমাকে মন্ত্রণা দেবাব কেউ নেই।' অঞ্জলি বলল, 'এখানকাব সবাই জানবে তুমি বাবার জন্যে চাকরি পেয়েছ।'

দীপা কোন জবাব দিল না। চা-বাগানের এই জীবন অমবনাথদের কি পছন্দ ছিল? কোন উচ্চাশা নেই, শুধু দিনগত পাপক্ষয় করে যাওয়া! অসম্ভব। সে মবে গেলেও এখানে থাকতে পারবে না। তাকে অনেক বড হতে হবে। এই পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু সে কি অকৃতজ্ঞ হচ্ছে? না। কখনই নয়। অঞ্জলির ব্যবহার যাই হোক সে কখনই কর্তব্য থেকে সরে যাবে না।

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করল, 'চুপ করে কি ভাবছ?'

'বড়সাহেবের কাছে তো আমি সময় চেয়েছি।'

'সময় যদি না দেয়?'

'তখন দেখা যাবে।'

'এটা তো পাশ কাটানো কথা। তোর ব্যাপাব কি বলতো?'

'কি ব্যাপারে?'

'কলকাতার কোন ছেলে কি তোর মাথা ঘুরিয়েছে?'

'কি যাতা বলছ?'

'ঠিকই বলছি। তোর মামা একবার লিখেছিল এমন কথা। শোন দীপা, যে ছেলেব সঙ্গে তুমি ঘুরে বেড়াও সে মজা লোটা ছাড়া কিছু কববে না। যদি কুমাবী হতে তাহলে হয়তো বিয়ে থা করত। চারধারে যখন এত কুমারী মেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন সাধ করে কেউ বিধবাকে বিয়ে করে? ওসব মতলব ছেড়ে দে।'

'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ মা। আমি যাই কবি কখনও অকৃতজ্ঞ হব না।'

এই সরল স্বীকারোক্তিতে আস্থা পেল না অঞ্জলি। সমানে সে আক্রমণ চালিয়ে গেল কদিন ধরে। শেষপর্যন্ত ঘোষণা করল, 'ঠিক আছে, যদি দুই আড়াই বছর সাহেব অপেক্ষা না করে, যদি আমাদের এই বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করে তাহলে যেন এ জীবনে তোর মুখ

আমাকে দেখতে না হয়। আমি লোকের বাড়িতে বাসন মেজে খাবো তাও ভাল তবু তোর পয়সায় মুখে ভাত তুলব না।'

'তুমি কি আমাকে এখনই চলে যেতে বলছ ?'

'তোকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'বেশ, আমি চলে যাচ্ছি।'

'তাই তো যাবি। নিজের আখের গুছিয়ে চলে যাবি না ?'

আর তখন বড় ছেলে বলল, 'মা, তুমি কেন এত খোসামোদ করছ। দু বছর পরে আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে যাব। তখন সাহেবকে বলব আমাকে চাকরি দিতে।'

এই বিতর্কে মনোরমা অংশ নিলেন না। তিনি যেন এসব ব্যাপারের অনেক উর্ধ্বে চলে গিয়েছেন। যে দিন দীপা কলকাতায় যাবে তার আগের রাত্রে তিনি কথা বললেন, 'দীপা, তোর মনে আছে, অনেকদিন আগে তেজেনবাবু আমাকে নিয়ে হরিদ্বার যেতে চেয়েছিলেন। তোর বাবা অভিমান করেছিল, আমি যেতে চাইনি !'

'মনে আছে। খুব মজা হয়েছিল।' দীপা বলল।

'এখন মনে হয় তখন গেলে পারতাম।'

'কেন ?'

'যদি সেই মানুষটার দেখা পেতাম তাহলে বলতাম আমার এত বড় সর্বনাশ কেন করল ?'

'কে ?'

'যে একটা রাত্রে এসেছিল দায় মেটাতে।'

'ঠাকুমা !'

'হ্যাঁ রে। যে সন্ন্যাসী সে তো সংসারের কাছে মৃত। আমার কাছেও। আমার বৈধব্য তাই সত্যি। কিন্তু সেই মানুষটা তো বেশ বেঁচে আছে।'

'তুমি তো কখনও সেটা স্বীকার করোনি।'

'স্বীকার করলে তোর বাবা খুব কষ্ট পেত।'

'ঠাকুমা, তুমি আমার সঙ্গে হরিদ্বারে যাবে ?'

'কেন ?'

'ওঁকে খুঁজতে।'

'হিমালয় তো এটুসখানি জায়গা নয়। এত বড় একটা পর্বতে কাউকে খুঁজতে যাওয়া বোকামি।' মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর দুহাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরে পাশ ফিরে বললেন, 'মা গো, জীবন হিমালয়ের চেয়ে অনেক বড়। সেখান থেকে যেটা খুঁজে নিতে চাইবি সেটা খুঁজবি আন্তরিকভাবে। কারো সঙ্গে আপোস করবি না। আমার বয়সে কিছু খোঁজা যায় না, খুঁজে পাওয়া যায় না, কিন্তু তোর বয়সটা ঠিকঠাক খোঁজার বয়স।'

॥ ৩৬ ॥

অমরনাথের মৃত্যুর আশঙ্কায় এবং মৃত্যুর ঠিক পরে অঞ্জলি যেরকম আচরণ করছিল তা কাজ মিটে যাওয়ার পর পাল্টে গেল। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রচণ্ড অসহায়তাবোধ থেকে সে যেন কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিল। আর এর পুরো ঝাঁঝটা গিয়ে পড়েছিল দীপার ওপরে। মায়ের এমন আচরণে প্রভাবিত হয়েছিল ছেলেরা। অবশ্য তারা আর মুখের ওপর

কিছু বলছিল না কিন্তু অবহেলা করতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হচ্ছিল না।

অমরনাথের কাজ মিটে যাওয়ার পর দেখা গেল অঞ্জলি নিজেকে দারুণভাবে গুটিয়ে নিয়েছে। বেশী কথা বলার বদলে অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যে নিজেকে আড়াল করে ফেলল সে। বুধুয়া, অমরনাথের মৃত্যুর খবর পেয়ে আবার এ বাড়িতে চলে এসেছিল, তাকে ডেকে বলে দিল, 'আমার এমন পয়সা নেই যে তোর মাইনে দেব। তুই এখানে সময় নষ্ট করিস না।'

অতএব বুধুয়া আবার ফিরে গেল লাইনে।

তিরিশ বছর আগে চা-বাগান আর তার লাগোয়া বাজার, কাঠের মিল নিয়েই ছিল জনবসতি। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই সেটা বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে বাজারের এলাকাটা। আঙরাভাসা নদীর ধার দিয়ে কলোনি তৈরী হচ্ছিল। এক সকালে দুই ছেলেকে নিয়ে অঞ্জলি বীরপাড়ার রাস্তায় সে-রকম একটা জমি দেখে এল। হাজার চারেকের মধ্যে সাত কাঠা জমি পাওয়া যাচ্ছে আসাম রোড থেকে এক মিনিটের দূরত্বে। এখনও কাঠ শস্তা এখানে। জমি কিনে দু-তিন ঘরের বাড়ি তৈরী করে নিলে আর রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে না। মাথার ওপরে একটা ছাদ থাকলে কে কি খাচ্ছে তা নিয়ে লোকে মাথা ঘামাবে না। কথাটা শুনে মনোরমা অবাক হলেন, 'সেকি! ওদিকে তো শ্মশান!'

'এখন তো শ্মশানেই বাস করার সময় এসেছে আমাদের।'

মনোরমা অঞ্জলির দিকে অবাক হয়ে তাকালেন, 'সাহেব তো এ বাড়ি ছেড়ে দিতে বলেনি!'

'আজ বলছে না! আগামীকাল যে বলবে না এমন তো কথা নেই। আর মানুষের কথায় আমি বিশ্বাস করি না। দু বছর ধরে অপেক্ষা করার মত বোকামি আমি করব না।'

'ওখানে ফাঁকা মাঠ, মানুষজন নেই—'

'এখন নেই, হতে কতক্ষণ। যেমন অবস্থা তেমন ভাবেই থাকতে হবে।'

'বউমা!'

'বলুন।'

'তুমি আমার কথা কিছু ভেবেছ?'

'আপনার কথা? মানে বুঝলাম না।'

'আমি বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত।'

'আপনি এ কথা আপনার ছেলে থাকলে বলতে পারতেন। আমার যা অবস্থা হবে আপনারও তা না হবার কোন কারণ নেই।'

মনোরমা আর কথা বাড়াননি। অমরনাথ চলে যাওয়ার পরে অঞ্জলি সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারেও পরিবর্তন এসেছে। এখন তিনি ওকে অত্যন্ত সমীহ করে কথা বলেন। একদিন যে অল্পবয়সী মেয়েকে বাড়ির বউ করে এনেছিলেন সে-ই এখন কর্ত্রী হয়ে গিয়েছে। বৈধব্যের পরে যে কাঠিন্য অঞ্জলি অর্জন করেছে নিজের জীবনে তার সঙ্গে কোন পরিচয় তাঁর কখনও ঘটেনি। দীপারও মনে হয় মনোরমা পাল্টে গিয়েছেন। অধিকারবোধ থেকে যে আচরণে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন তা রাতারাতি উধাও।

অঞ্জলির এই ব্যবহার দীপাকে মন স্থির করতে সাহায্য করল। প্রতি মুহূর্তে এ-বাড়িতে নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগছে। অঞ্জলি তার সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন বোধ করছে না। অন্যান্য কোয়ার্টার্স থেকে মহিলারা এসে দীপার চাকরির কথা তুললে প্রকাশ্যে বলতে পারছে, বিধবা মেয়ের উপার্জনে জীবন যাপন করার কোন বাসনা তার নেই। অঞ্জলির স্বভাব থেকে সবরকম নরম বোধই যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। কলেজ খুললে দীপা

কলকাতায় চলে গেলে যেন স্বস্তির আবহাওয়া ফিরে আসবে এমন মনে হচ্ছিল ক্রমশ।

অতএব এ-জন্মের মত এ-বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হতে চলেছে আগামীকাল। সকালবেলায় সে রওনা হবে জলপাইগুড়ি শহর থেকে ট্রেন ধরতে। এই ভাল হল। এখন একমাত্র মনোরমা ছাড়া এ-বাড়ির কোন মানুষ তাকে আর টানছে না। কিন্তু প্রকৃতি তাকে টানছে। এই চা-বাগান, দেবদারু গাছ, চাঁপা ফুলের মাঠ, আসাম রোড—আর কোনদিন হয়তো সে এদের কাছে ফিরে আসবে না। হঠাৎ দীপার মনে হল এখনও তার মনে এদের সম্পর্কে স্মৃতি বেঁচে আছে বলেই এরা তাকে টানছে। কিন্তু এই টান তেমন সক্রিয় নয় যেমনটা ছিল সে যখন এখানেই দিনরাত কাটাতো। হয়তো বছর গেলে, স্মৃতির ওপর অন্য স্মৃতি জমা হলে একদিন আসবে যখন কোন টানই সে বোধ করবে না। সবরকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কথাটা প্রযোজ্য। এবার প্রথম দিন এসে অমরনাথের পাশে বসে থেকে যে অনুভূতি হয়েছিল আজ তা এর মধ্যে কিছুটা ফিকে হয়ে কি যায়নি? এমন জীবনের গল্প সে অনেক পড়েছে যেখানে মানুষ সম্পূর্ণ একা হয়ে পৃথিবীর সমস্ত বাধার সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে; তাহলে সে পারবে না কেন?

রাত্রে মনোরমার পাশে শুয়ে কিন্তু তার মন কেমন করতে লাগল। মনোরমার চোখেও আজ ঘুম নেই। কেবলই উসখুশ করছেন। হঠাৎ দীপা চাপা স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুমা, আমি চিঠি লিখলে তুমি জবাব দেবে তো?'

মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন, 'যদ্দিন খাম পোস্টকার্ড কেনার সামর্থ্য থাকবে তদ্দিন দেব।'

দীপা আরও কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'আমি চাকরি করলে তোমাকে যদি নিয়ে যেতে চাই তুমি আমার কাছে গিয়ে থাকবে তো?'

আচমকা মনোরমা ডুকরে উঠলেন, 'তুই আমাকে নিয়ে যাস, যত তাড়াতাড়ি পারিস নিয়ে যাস। আমার আর এখানে থাকতে একদম ইচ্ছে করছে না।' দীপা পাশ ফিরে মনোরমাকে জড়িয়ে ধরল দুহাতে। তার হাতের বাঁধনে মনোরমা থরথর করে কাঁপছিলেন।

অনেক অনেক সময় চলে গেলে, একমাত্র কুলি লাইনের মাদলের আওয়াজ ছাড়া পৃথিবী যখন নিস্তব্ধ তখন মনোরমা উঠলেন। হ্যারিকেনের টিমটিমে আলোটাকে বাড়িয়ে মিটসেফের মত আলমারিটাকে খুললেন। দীপা উঠে বসেছিল। সামান্য খোঁজাখুঁজি করে মনোরমা একটা খাতা বের করলেন, 'এইটে তোর বাবার। কলকাতার হাসপাতালে শেষদিকে যখন ভাল হয়ে উঠেছিল তখন লিখত। এখানে এসে একদিন আমাকে বলল, তোমার কাছে রেখে দাও। কেন বলেছিল তখন বুঝতে পারিনি। তুই রাখ, তোর কাছে রেখে দে।'

দীপা হাত বাড়িয়ে বাঁধানো ছোট্ট খাতাটা নিল। মনোরমা ফিরে এলেন বিছানায়, 'এককালে তোর বাবা খুব পড়তে ভাল বাসতো। অনেক পত্রিকা কিনত। আনন্দবাজার, দীপালী, সচিত্র ভারত। বিয়ের আগে গল্প লেখার চেষ্টা করত।' মনোরমা নিঃশ্বাস ফেললেন।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি লেখা আছে এতে?'

'পড়ে দেখিস।' মনোরমা পাশ ফিরে শুলেন।

'মা জানেন খাতার কথা?'

মনোরমা জবাব দিল না। হ্যারিকেনটাকে মাথার পাশে একটা টুলের ওপর তুলে দীপা খাতার পাতা ওল্টালো। অমরনাথের হাতের লেখা প্রায় ছাপার মত। কিন্তু এখানে যেন

সামান্য কাঁপুনি এসেছে অক্ষরগুলোয়। প্রথম পাতায় লেখা, 'করুণাধারা কোথায় ? কবির কাছে যা সহজে আসে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে ? কেন ?' বাকি পাতাটা একদম সাদা। দ্বিতীয় পাতায় লেখা, 'মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এলাম। কিন্তু মনে এবং শরীরে মরণের গন্ধ লেগে গেছে। হাজার ওষুধেও সেই গন্ধ মুছবে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে তাই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, আমি কেন বেঁচে আছি ? উত্তর পাই না। বেঁচে থাকার জন্যেই বেঁচে থাকা—এ আর এখন ভাল লাগে না।'

তৃতীয় পাতায় নজর দিল দীপা, 'অকালে বিয়ে দিয়ে মেয়েটার যতটা সর্বনাশ করেছিলাম, ওর জন্যে টাকা নিয়ে নিজের সর্বনাশ ততটাই করলাম বলে একসময় মনে হয়েছিল। স্নেহের মানুষের কাছে অশ্রদ্ধা পাওয়া তো চরম সর্বনাশ। এই হয়, মানুষ করতে যায় এক ভেবে, হয়ে যায় উল্টো। কিন্তু আমার বিশ্বাস আছে মেয়ে নিজের জীবনকে গড়ে নিতে পারবে। ওর মধ্যে একটা তেজ আছে যা আমার ছিল না। অঞ্জলির সঙ্গেও ওর কোন মিল নেই। অঞ্জলি সংসার ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। বরং মাঝে মাঝে মনে হয় মায়ের সঙ্গে ওর কিছু মিল আছে। বুকে দুঃখের আগুন যাদের নিরন্তর তাদের তো মিল থাকাই স্বাভাবিক।'

সকালে বেরুবার আগে মনোরমাই জোর করে খাওয়ালেন দীপাকে। অঞ্জলি বসেছিল বাইরের ঘরে। তাকে প্রণাম করল দীপা, বলল, 'আসছি।'

অঞ্জলি কথা না বলে ঘাড় নাড়ল। এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল দীপা। বড় ভাই বারান্দায় ছিল, দিদিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল মনোরমা তাকে জিনিসগুলো রাস্তায় বয়ে নিয়ে যেতে বললে দীপা বাধা দিল, 'আমি একাই পারব। সারাটা পথ তো আমাকেই বইতে হবে ঠাকুমা।'

আসাম রোড পর্যন্ত মনোরমা সঙ্গে এলেন। দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে জায়গাটাকে শেষবার দেখে নিল। মনোরমা বললেন 'সাবধানে থাকিস। শরীরের প্রতি যত্ন নিস।'

'হ্যাঁ।'

'তোকে খুব বড় হতে হবে।' মনোরমার গলায় যেন অমরনাথের আকুতি।

'হুঁ!'

'কখনও কোন প্রলোভনে ভুলিস না। তোর বয়স কম। যাচাই না করে কোন পথে পা বাড়াস না। বাবার কথা সবসময় মনে রাখবি।'

'তোমার কথা ?' দীপা মুখ ফেরাল।

থতমত হয়ে গেলেন মনোরমা, 'আমার কি আছে বল! সারাজীবন ধরে পরের দয়ায় বেঁচে আছি। মনে কোন সাধ এলেও মুখ ফুটে চাইতে পারিনি। আমি তো তোর জন্যেও কিছুই করতে পারিনি। বরং এক সময় খুব কষ্ট দিয়েছি।' মনোরমা এই সব কথা বলছিলেন অদ্ভুত একটা সুরে। তাতে কান্না ছিল এবং দীপার মন খুব খারাপ করে দিল। এই সময় জলপাইগুড়ির বাস এল। নির্জন রাস্তায় হাত দেখালেই এই রুটের বাস দাঁড়িয়ে যায়। বাসটাকে হাত দেখাতে হল না আজ। মালপত্র কণ্ডাক্টর তুলে নিল। সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেতরে উঠতে না উঠতেই বাস গড়াতে আরম্ভ করল। বসার জন্যে সিট খুঁজে নেওয়ার আগে দীপা নিচু হয়ে মনোরমাকে দেখতে চাইল। এক ঝলক, জানলার একটা ফ্রেমের মধ্যে মনোরমার মুখ। ডান হাতে আঁচল তুলে দাঁতে চেপে ধরেছেন। সেই মুখ মিলিয়ে গিয়ে দেবদারু আর পাইনের গাছগুলো ছুটে আসতে লাগল জানলায়। দীপার চোখ ঝাপসা। আর সেই ঝাপসা চোখের ভেতর মনোরমার ওই ভঙ্গীটি চিরকালের জন্যে গাঁথা হয়ে গেল।

কণ্ডাক্টার তাকে সিট দেখিয়ে দেওয়ার পর নিজেকে সেখানে ছেড়ে দিল দীপা। এখন বাসের সমস্ত মানুষ তাকে লক্ষ্য করছে কিন্তু সে ভ্রূক্ষেপ করল না। সিটে বসে নিজের মুখ দুহাতে ঢেকে শক্তি খুঁজতে চাইল প্রাণপণে। সে জানে বাস তার চেনা চৌহদ্দী ছাড়িয়ে চলেছে। চোখ থেকে হাত সরালেই সেটা দেখতে হবে। কিন্তু আজ একদম দেখতে ইচ্ছে করছিল না। তার মন জুড়ে এখন মনোরমা, এক নিঃসঙ্গিনী বৃদ্ধার মুখ।

কিছুদিন আগেও বুক কেঁপে উঠত, পাঁজরে ব্যথা হত। এত বড় পৃথিবীতে সে একদম একা। অসুস্থ হলেও কেউ এসে পাশে দাঁড়াবে না। বস্তুত, কলকাতা শহরে অসুস্থ না হলে তেমন করে একাকিত্ব বোঝা যায় না। আত্মীয় স্বজনহীন তার মত মেয়ে নিশ্চয়ই একা পৃথিবীতে বেঁচে আছে। রোজ খবরের কাগজ খুললেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের গল্প পড়তে হয়। সেই গল্পে অল্পবয়সী মেয়ে আছে যারা জীবনের কাছে ধর্ষিতা। পালিয়ে আসার পথে মা বাবা ভাই বোন জমি এবং সতীত্বকে হারিয়ে এসেছে। আসতে বাধ্য হয়েছে। এসে এখানকার শরণার্থী ক্যাম্পে আরও অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। এদের কথা ভাবলেই মনে সাহস আসে। নিজেকে অনেক স্বাধীন মনে হয়। কিন্তু একটা শব্দের অর্থ তার মাথায় কিছুতেই পরিষ্কার হয় না। মায়া এবং মায়ার মায়ের সঙ্গেও কথা বলেছে। তাঁদের ধারণা অনেকটা একরকমও। আবার গ্লোরিয়া সম্পূর্ণ উল্টো ধারণা পোষণ করে। শব্দটা হল সতীত্ব। সতী মানে সাধ্বী, পতিব্রতা, সচ্চরিত্রা। আর সতীত্ব হল পতিব্রতা, সতী স্ত্রীর ধর্ম। যে মেয়ে সৎ চরিত্রের তাকে যদি কোন লোভীর দল গায়ের জোরে ধর্ষণ করে তাহলে সে অসহায় অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু ওই কাজের জন্যে তার সতীত্ব চলে যাবে কেন? সে নিজে তো অসৎ নয়। দ্বিতীয়ত, পতিব্রতা নারী অথবা স্বামীর প্রতি আনুগত্য যদি সতীত্বের ব্যাখ্যা হয় তাহলে বলতে হবে বস্তুটি হল এক ধরনের প্রশ্নহীন আত্মনিবেদন। পতিদেবতার কাছে আত্মসমর্পণ। সেটা করতে আপত্তি নেই যদি পতিদেবতাও একই রকম ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু যদি শব্দটাকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়, দুই নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি ভালবাসায় নিবিড় হয়ে থাকে মন এবং শরীর নিয়ে—, দীপা মাথা নাড়ে, না, এটাও ঠিক হল না। এই শরীর এবং মন তার—যাকে আমার এক জন্মের ভালবাসা দিয়েছি। এই বোধ হয় সতীত্বের ব্যাখ্যা হওয়া উচিৎ। অসীম এসব শুনে দীপার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এসব নিয়ে এত ভাবো কেন?'

দীপা বলল, 'বাঃ, কিছু কিছু শব্দ বা ভাবনা আদিকাল থেকে চলে এসেছে যা মেয়েদের আচরণকে বেড়ি পরিয়ে রেখেছে পুরুষদের স্বার্থে তা যে কি ফালতু সেটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।'

'সতীত্ব শব্দটি তাহলে ফালতু?'

'নিশ্চয়ই যদি সেটা পুরুষদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার না করা হয়। দশজন মহিলার ওপর বলাৎকার করলে কি কেউ বলে ওই পুরুষটার সতীত্ব চলে গেছে?'

'তা বলে না; কিন্তু লম্পট বলতে দ্বিধা করে না।'

'সেরকম শব্দ তো মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়। দুশ্চরিত্রা। কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে সতীত্ব ব্যবহার করা হয় খুব নিচু ভাবনা নিয়ে। সেক্স জড়িয়ে থাকে তাতে।

একটি মেয়ে দশটি ছেলেকে নাচাচ্ছে, ঘুরছে, ঘর ভাঙছে কিন্তু কাউকে শরীর পর্যন্ত পৌঁছাতে দিচ্ছে না। সেই মেয়ের যখন বিয়ে হল তখন স্বামীই একমাত্র পুরুষ যার সঙ্গে তার শারীরিক সম্পর্ক হল। এই মেয়েটিকে কি সতী বলবে?'

অসীম স্বীকার করল, 'সমাজ তাই বলবে।'

দীপা শব্দ করে হাসছিল। শ্যামবাজার থেকে সার্কুলার রোড ধরে ওরা হেঁটে আসছিল। তখন বিকেল শেষ হয়েছে। খান্না সিনেমার সামনে টিকিট প্রার্থীদের ভিড়। অনেকে মাথা ঘুরিয়ে সেই হাসির শব্দে তাকাল। দীপা সেটা উপেক্ষা করল। কিন্তু অসীমকে একটু আড়ষ্ট দেখাল। গ্রে স্ট্রিটের মোড় ছাড়াতে বাঁ দিকের ফুটপাথে বেশ কিছু স্বৈরিণীকে দেখা গেল যে যার মত সেজে খদ্দের ধরার জন্যে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে। অসীম মনে মনে প্রার্থনা করছিল দীপার দৃষ্টি যেন ওদিকে না পড়ে। জায়গাটা পেরিয়ে এসে যেই সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে যাচ্ছে তখনই দীপা বলল, 'আচ্ছা, ধর, ওই যে মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের একজন প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত একই ভঙ্গীতে দাঁড়ায়, কেউ চাইলে তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়, গল্প করে, গান শোনায়, খায়দায় কিন্তু তার বেশী এগোতে দেয় না। শরীরের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সচেতন। কোন পুরুষ আজ পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে পারেনি। তুমি কি এই মেয়েটিকে সতী বলবে? তার তথাকথিত সতীত্ব কিন্তু সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রয়েছে।'

অসীম মাথা নাড়ল, 'না। তা বলা যাবে না।'

'বেশ। যদি উল্টো হয়। একটি মেয়ে তার প্রিয়জনের জন্যে জীবন দিতে দ্বিধা করে না, সমস্তরকম ঝড় থেকে প্রিয় মানুষকে আগলে রাখে কিন্তু শরীর সম্পর্কে সে বড়ই উদাসীন এবং সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যে ভাবে না তাহলে তাকে কি সতী বলবে?'

অসীম হেসে ফেলল, 'বলা যাবে কি?'

দীপার খুব রাগ হয়ে গেল। হোস্টেল পর্যন্ত এল চুপচাপ। ওর কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না। মুখ দেখে অসীমও সেটা বুঝতে পেরেছিল। গেট থেকে ফেরার আগে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল তাহলে যাচ্ছ?'

'কোথায়?'

'বাঃ, আমাদের বাড়িতে। ভুলে গেলে?'

'না।'

'সে কি? মা তোমায় দেখতে চেয়েছেন।'

'কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'আচ্ছা, সতীত্ব অসতীত্ব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কি দরকার?'

'কাল কলেজের পর কথা বলব।' দীপা দাঁড়াল না। এবং অনেক পরে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল তার। ওভাবে রেগে যাওয়ার কোন মানে হয়? কিন্তু অসীম যদি প্রতিবাদ করত, যদি তর্ক চালাতো তাহলে তার ভাল লাগত। যুক্তিহীন অস্বীকার থেকেই তার মেজাজ গরম হয়েছিল। তাহলেও তার নিজেকে সংযত রাখা উচিত ছিল। অসীম ভাল ছেলে। এখন আর ব্যাপারটা চাপা নেই। কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে এই নিয়ে কানাকানি করেছে। একসঙ্গে, রাস্তায় হাঁটা কখনও কফি হাউসে গিয়ে বসা আর অনর্গল কথা বলে যাওয়া—এসবে মানুষের চোখ এখনও তেমন অভ্যস্ত নয়। গল্প তো হবেই। জলপাইগুড়ি শহর হলে হয়তো কলেজ থেকেই চাপ আসতো, পোস্টার পড়ত দেওয়ালে। কিন্তু কলকাতার বাগবাজারে বৃষ্টি হলে শ্যামবাজারে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু অসীম এখন তার বড় কাছের মানুষ। এই পৃথিবীতে সে একা এমন বোধ আর তীব্র হয়ে বুকের হাড়ে কাঁপুনি ধরায় না।

মাঝরাত্রে হোস্টেলের গেটে খুব গোলমাল হল। চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল দীপার। ঘরে সে একাই ছিল। গ্লোরিয়া সাত সকালে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গিয়েছে।

জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে দারোয়ানের গলা পেল। যে গেট খুলতে বলছে তাকে দারোয়ান ধমকাচ্ছে। এত রাত্রে গেট খোলা সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত সুপার বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। দারোয়ান তার কাছে নালিশ করল। বহিরাগতের সঙ্গে কথা বলে সুপার দারোয়ানকে গেট খুলতে আদেশ দিলেন। সাদা পোশাকের একজন পুলিশ অফিসার ভেতরে ঢুকে নিজের পরিচয় দিলেন। সুপারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গ্লোরিয়া নামে একটি আফ্রিকান নিগ্রো মেয়ে এখানে কি থাকত?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?'

'আপনি সুপারিনটেনডেন্ট?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আপনাকে একবার আসতে হবে। ওকে খুন করা হয়েছে।'

'খুন?' চমকে উঠলেন সুপার। আর জানলায় দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল দীপা। পুলিশ অফিসার বললেন, 'বর্ধমান পুলিশ ওর ডেডবডি পেয়েছে। বাস রাস্তার ধারে ক্ষেতের ওপর পড়েছিল। ব্যাগে যেসব কাগজপত্র পায় তা থেকেই আমাদের জানিয়েছে। ডেডবডি এখনও আছে বর্ধমানে।'

'আমাকে কি সেখানে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার প্রিন্সিপালের সঙ্গে আগে কথা বলা দরকার। তাছাড়া মেয়েটি জাম্বিয়ার নাগরিক। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'মেয়েটি ওরকম জায়গায় গেল কি করে বলুন তো?' অফিসার জানতে চাইলেন।

'আমি বুঝতে পারছি না।'

'কি আশ্চর্য! হোস্টেলের একটা মেয়ে যে বাইরে আছে সেই খবর রাখেন না?'

'তা রাখব না কেন? ও তো আমার অনুমতি নিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল।'

'কার সঙ্গে?'

'তা আমি জানি না।'

অফিসার একটু ভাবলেন, 'মুশকিল হল মেয়েটি ভারতবর্ষের নাগরিক নয়। এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হবে। দিল্লী থেকে প্রশ্ন করবে। কাল সকালে এই খবর চিফ মিনিস্টারের কানে পৌঁছাবে। সাধ করে কি মাঝরাতে আপনাদের ঘুম ভাঙাতে এলাম। মেয়েটি কোন ঘরে থাকত?'

'ওপরে।'

'চলুন। ঘরটাকে বন্ধ করে যেতে হবে। ওর জিনিসপত্রে কেউ যেন হাত না দেয়! এনক্যুয়ারি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওইরকম থাকবে।'

'কিন্তু ওর রুমমেট আছে ওঘরে।'

'জাম্বিয়ান?'

'না বাঙালি।'

'ওকে অন্য ঘরে শিফট্ করান। চলুন আমার সঙ্গে।'

জানলা থেকে সরে এল দীপা। গ্লোরিয়ার বিছানা জিনিসপত্র ঘরের একটা দিকে ছড়ানো। অথচ মেয়েটি আর বেঁচে নেই। কাল রাত্রে গ্লোরিয়া বলেছিল, 'শরীর নিয়ে আমি মোটেই ভাবি না, মানুষের হৃদয়ই আমার কাছে বেশী মূল্যবান।' দুহাতে মুখ ঢেকে দীপা যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে তখন সুপার পুলিশ অফিসারকে নিয়ে দরজায় এলেন। দরজা

বন্ধ ছিল। ওপারে ওঁদের কথাবার্তা এবং কড়া নাড়ার শব্দ হল। দীপা দরজা খুলতেই সুপার বললেন, 'শোন, গ্লোরিয়ার একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ এই ঘর সিল করে দিতে চাইছে। তুমি আপাতত আমার গেস্ট রুমে চলে এস জিনিসপত্র নিয়ে।' দীপা মাথা নাড়ল। হোস্টেলের কাজেব লোকদের তুলে দীপার জিনিসপত্র ঘর বদল করা হল। এবাব পুলিশ অফিসার ঘরে তালা লাগিয়ে সেটা সিল করে দিলেন। এখন সমস্ত মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। গ্লোরিয়ার মৃত্যুসংবাদ শোনামাত্র সবাই স্তব্ধ। গ্লোরিয়াব বান্ধবী দুই জাম্বিয়ান ছাত্রীকে নিয়ে পুলিশ চলে গেল থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে। হঠাৎ দীপার মনে পড়ল ভালবাসাহীন জীবন অর্থহীন, এমন কথা গ্লোরিয়া বলেছিল প্রেমে আঘাত পেয়ে। কিন্তু তারপর অনেকদিন চলে গিয়েছে। গতকালও তো মেয়েটা ছিল হাসিখুশি। ঘুম এল না, বাকি রাতটায় চুপচাপ জেগে থাকল দীপা পাথরের মত। মৃত্যু কি সহজ, কি নিঃশব্দে আসে অথচ মানুষ চিরকালই জীবন নিয়ে গর্ব করে যায়।

পরের দিন খবরের কাগজে ঘটনাটা ছাপা হল। বর্ধমানেব কাছে একটা গ্রামেব পাশে জাম্বিয়ার মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। সম্পূর্ণ নগ্ন ছিল সে। যদিও তার পোশাক, ব্যাগ প্রায় অটুট অবস্থায় মৃতদেহের কাছেই পড়েছিল। মেয়েটি জাম্বিয়া থেকে কলকাতায় পড়তে এসেছিল। তাকে ধর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল। মেয়েটি বাধা দিতে আততায়ীবা তাকে হত্যা করে। এমন একটি জায়গায় মেয়েটি কি করে পৌঁছাল তা বিস্ময়ের। গ্রামবাসীরা বলছে বিকেল নাগাদ মেয়েটি তিনটে ছেলের সঙ্গে নামে। বিদেশিনী বলে স্থানীয় লোকদেব কৌতূহল ছিল। কিন্তু তারা গ্রামান্তরে চলে যায়। সেই তিনজনই সম্ভাব্য হত্যাকারী ধবে নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। সকালবেলায় হোস্টেলে এই খবরে তোলপাড় হয়ে গেল। যদি বলাৎকারই হয় তাহলে ওর পোশাক পাশে অটুট অবস্থায় পড়ে থাকবে কি কবে?

কলেজ ছুটি হয়ে গেল। দীপা কলেজে যায়নি। সাড়ে বারোটাব সময় বাধা এল হোস্টেলে। এসে দীপার পাশে চুপ করে বসল। দীপা বলল, 'আমি ভাবতে পাবছি না রে। কালও সকালে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।'

রাধা বলল, 'ব্যাটাছেলেগুলা এইরকমই। একদম বাচ্চা আব একেবারে থুত্থুড়া বুড়া ছাড়া ওদের বিশ্বাস করা যায় না।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'তা হবে কেন? তোমার আমার দাদা কাকা ভাইকে এই দলে ফেলা যায় কি?'

'যখন আমার দাদা কাকা ভাই তখন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য মেয়ের সঙ্গে তো একই সম্পর্ক না। পাকিস্তান থেকে আসার সময় যে-সব পশু মেয়েদেব ইজ্জত জোর করে নিয়েছে তারাও তো কোন মেয়ের দাদা কাকা ভাই।' বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল রাধাকে। দীপা জবাব দিল না। হঠাৎ রাধা বলল, 'আর দোষ দিবই বা কাকে? আজ কলেজে এসে শুনি ছুটি হয়ে গেছে ওর জন্যে। বাড়ি চলে যেতে হবে বলে কয়েকটা মেয়ের কি দুঃখ। একজন বলল, নিগ্রোরা খুব সেক্সি হয়। তাই ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। একজন দুজন হলে ওর কিছু হত না। তুমি ভাব দীপা, মেয়ে হয়ে একটা মেয়ের সম্পর্কে এমন কথা এরা বলে গেল?'

দীপার মনে পড়ে গেল, 'তুমি অসীমকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ। গেটে দাঁড়িয়েছিল।'

'তোমাকে কিছু বলেছে?'

'না তো। কেন?'

'নাঃ, এমনি।'

আধঘণ্টা থেকে রাধা চলে গেলে দীপা পোশাক পাল্টালো। আজ সকাল থেকেই খাওয়া-দাওয়ার ইচ্ছেটা একেবারে চলে গিয়েছে। মাথা এবং শরীরে একটা ভারী অনুভূতি যেন ঝুলে রয়েছে একভাবে। কিছু ভাল লাগছে না, কিচ্ছু না।

কলকাতায় নভেম্বরে শীত নামে না। কিন্তু বাতাসে টান এসে যায়। হোস্টেল থেকে বেরিয়ে এই দুপুরবেলাতেও সেরকম বাতাসের স্পর্শ পেল দীপা, পেয়ে আরাম লাগল। কলেজের দিকে হাঁটছিল সে। এখন অসীমের সেখানে থাকার কথা নয়। ছুটি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। অসীম কোথায় থাকতে পারে এমন স্পষ্ট ধারণা তার নেই। অথচ সকাল থেকে ওর কথা একবারও মনে আসেনি। অসীম কলেজে অপেক্ষা করবে ঠিক ছিল। কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে সব এলোমেলো করে দিল। অথচ দীপার ক্রমশ মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে অসীমের দেখা পাওয়া তার খুব দরকার। কেন, কি জন্যে, তা জানা নেই, ওর পাশে একটু হাঁটলেই মনের ভার দ্রুত কমে যাবে এমন একটা বোধ হচ্ছিল। আচ্ছা, অসীম যদি গতকাল গ্লোরিয়ার সঙ্গে গ্রামের নির্জনে থাকত তাহলে একই কাণ্ড করতে পারত? বাধা তো অনাত্মীয় ছেলের চরিত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করে না। হেসে ফেলল দীপা। উদ্ভট ভাবনা। অসীম কখনও এমন কাজ করতে পারে না।

কলেজের গেট বন্ধ, সামনে কেউ নেই। কসমসের সামনে কিছু ছেলে আড্ডা মারছে। দীপা চুপচাপ পেরিয়ে এল। অসীমকে কোথায় পাওয়া যায়? খুব আফসোস হচ্ছিল তার। ঠিক সময়ে কলেজে গেলেই সে ওর দেখা পেত। এতবড় শহরে অসীমকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। হেদুয়ার মুখে ফিরে এসে দীপা যখন অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছে ঠিক তখনই পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'কফি খাবে?'

চমকে ফিরে তাকাতেই অসীম হাসল।

দীপা বিস্ময় এবং খুশিতে একাকার হল, 'তুমি?'

'দাঁড়িয়েছিলাম।'

'এতক্ষণ?' দীপা কি বলবে স্থির করতে পারছিল না, তারপর মনে হতেই বলল, 'যাঃ, হতেই পারে না। একটু আগে আমি এখান দিয়ে কলেজে গিয়েছি।

'দেখেছি।' মিটিমিটি হাসছিল অসীম।'

'দেখেছ? আর তুমি আমাকে ডাকোনি?' হাঁ হয়ে গেল দীপা।

'দেখছিলাম তুমি আমাকে খুঁজেছ কিনা?'

'কি দেখলে?'

'মুখটা যখন কালো হয়ে গেল তখন বুঝলাম যা বোঝার।'

'তুমি তো খুব নিষ্ঠুর।'

'আর তুমি? এতক্ষণ ধরে কেউ দাঁড়াবে যখন আদৌ আসবে কিনা তার ঠিক নেই। কলেজ তো অনেকক্ষণ ছুটি হয়ে গিয়েছে।'

'তাহলে তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'আমার মন বলছিল তুমি আসবেই।'

দীপার মনে হচ্ছিল তার শরীর একটু হালকা হয়ে গেল। সে বলল, 'জানো, কাল রাত্রে যখন গ্লোরিয়ার খবর পেলাম তখন আমার সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। ওরকম একটা মেয়ে দুম করে মরে গেল? মানুষ এত নৃশংস হয়?'

'আমি তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি দীপা।'

'মেয়েটার সঙ্গে আমার কোন মিল নেই, প্রথম প্রথম ওর অনেক আচরণ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না, পৃথিবীর দুটো আলাদা দেশের মানুষের আচরণ তো উল্টো হবেই। কিন্তু ওর কথাবার্তায় আমি একসময় বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল এদেশের মেয়েরা অনেক বাড়তি অভ্যাস অকারণে বয়ে নিয়ে চলেছে। এদেশের মেয়েরা কেন করব এই প্রশ্নটা এখনও করতেই শেখেনি!'

'সেকি! তুমি তো জ্ঞানদানন্দিনী ঠাকুরের ভক্ত। তিনি তো সত্তর আশি বছর আগে দারুণ দারুণ কাণ্ড করেছেন।'

'করেছেন। কিন্তু সেটা এদেশের মেয়েকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারেনি, উনি তাঁব পরের প্রজন্মের ছেলেদের প্রশংসা পেয়েছেন। ছেলেরা যেন একটু অনুকম্পা দেখিয়ে বলে, উঃ, কি তেজী মেয়ে ছিলেন।'

অসীম জবাব দিল না। কসমসের সামনে থেকে রকবাজদের জমায়েতটা এবার এগিযে আসছে ট্রাম লাইনের দিকে। উল্টো ফুটপাত থেকেই ওরা সিটি দিতে পারে, মন্তব্য ছুঁড়তে পারে। সে বলল, 'এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে হাঁটা যাক। তুমি খাওয়া-দাওয়া করেছ?'

হাঁটা শুরু করে দীপা বলল, 'না। ভাল লাগছিল না।'

'সে কি! চল, কিছু খাবে। এই ট্রামটায় ওঠো।'

'ট্রামে? কোথায়?'

'চলই না।'

ওরা ট্রামে উঠল। দুপুরের এইসময়ে ট্রামে বেশী যাত্রী নেই। লেডিস সিট ছেড়ে দীপা এগিয়ে গিয়ে বসতেই এক প্রৌঢ় বললেন, 'পেছনে লেডিস সিট খালি।'

দীপা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তাতে কি? এটার গায়ে কি জেন্টস্ সিট লেখা আছে।'

লোকটি থতমত হয়ে মুখ ফেরাল। অসীম দীপার পাশে বসে বলল, 'চমৎকাব।'

'এত বাজে কথা গায়ে পড়ে বলতে ভালও লাগে লোকেব।' দীপা বলল।

'চল, কফিহাউসে গিয়ে কিছু খেয়ে সময় কাটিয়ে আমাদেব বাডিতে যাবে। ও হো আজ যা তোমার মনের অবস্থা তাতে মায়ের সঙ্গে কথা বলা ঠিক হবে?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। আমি আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমার সঙ্গে?' অসীম অবাক।

দীপা নিচু গলায় জবাব দিল, 'আমার জীবন সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি?'

॥ ৩৭ ॥

তিনতলার ব্যালকনির একেবারে শেষ টেবিলটা খালি পেয়ে গিয়েছিল অসীম। সরু এক ফালি প্যাসেজের মত জায়গায় পর পর টেবিল পাতায় যে ফ্যানটির দরকার হয়েছে তাব অবস্থান ওই টেবিলের শেষে। ফলে ঝড়ের মত হাওয়ায় দীপার চুল উড়িয়ে দিচ্ছিল বারে বার। নাজেহাল হয়ে সে বলল, "আমি এদিকে মুখ করে বসব।"

ওরা চেয়ার বদল করল। টেবিলে টেবিলে ছেলেমেয়েদের কথা বলার শব্দ এক হয়ে সামুদ্রিক গর্জনের মত শোনাচ্ছে। বাঁ দিকে তাকাতেই পুরো দোতলার মেঝে জুড়ে থাকা টেবিলগুলো এবং মানুষের মাথা দেখা যাচ্ছে। দীপা দেখল অনেকেই চোখ তুলে তাদের দিকে, তার দিকে তাকিয়ে আছে। খাবারের অর্ডার দিয়ে অসীম একটু ঝুঁকে এল। এখন হাওয়ার ঝাপটা সরাসরি লাগছে তার মুখে, দীপার পেছন থেকে ওটা আসায় সে দু হাতে

কানের পাশের চুল চেপে রইল। একটু অসুবিধে হলেও আরাম লাগছে এভাবে বসতে। অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'তারপর ?'

'তুমি আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

'দেখাতে।'

'মানে ?'

'আমার বন্ধু কিরকম স্বভাবের, তার চেহারা কি রকম—।'

'বি সিরিয়াস অসীম।'

'আমি তো সিরিয়াস হয়েই আছি।'

'দেখিয়ে কি লাভ হবে ?'

অসীম সোজা হল, 'কি ব্যাপার বল তো ? গ্লোরিয়ার মৃত্যু তোমাকে বদলে দিয়ে গেল নাকি ? এবার তোমাকে বুঝতে পারছি না।'

'তবে ! দ্যাখো। এখনই বুঝতে পারছ না।'

'বুঝতে চাই।'

দীপা চট করে সিদ্ধান্ত নিল : সে বলল, 'অসীম তোমাকে আমার খুব ভাল বন্ধু বলে মনে হয়। তুমি কখনও মুখে বলনি সরাসরি, তুমি আমাকে চাও ?'

অসীম কোন কথা না বলে মাথা দোলালো, সে চায়।

'কি ভাবে ?'

'আশ্চর্য ! যেভাবে পুরুষ নারীকে চায় : স্ত্রী হিসেবে।'

'কবে ?'

'আর বছর তিন চার অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের পড়াশুনা শেষ হলেই।'

'শেষ হবার পর যদি আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না হয় ?'

'বোকার মত কথা বল না। এদেশে বেকারের সংখ্যা যতই বাড়ুক দুজনে একসঙ্গে ভেসে বেড়াবো না। তুমি কল্পনা করতে পারো আমি পড়াশুনা শেষ করে না খেয়ে মরছি !'

দীপা হাসল, 'বালাই ষাট ! তা কি ভাবতে পারি।'

'তোমার ব্যাপারটা কি বল তো ?'

অসীমের প্রশ্নের জবাব দেবার আগেই বেয়ারা মোগলাই পরোটা নিয়ে এল। নুন মরিচ ছড়িয়ে তার একটা ছোট টুকরো মুখে ফেলে দীপা জবাব দেয়, 'খুব খিদে পেয়েছে। আগে খেয়ে নিই, তারপর বলছি। এই যে আমি তোমার সঙ্গে বসে খোলা রেস্টুরেন্টে মোগলাই পরোটা খাচ্ছি তা চা-বাগান দূরের কথা জলপাইগুড়ি শহরেও ভাবতে পারতাম না।'

'তুমি যখন ওখানে নেই ভাবার কি দরকার ?'

দীপা জবাব দিল না। চুপচাপ খাওয়া শেষ করল। জল খেল। তারপর বলল, 'অসীম, তুমি জানো, আমি আই এ এসে বসব।'

'বসলেই যে তুমি সুযোগ পাবে তার কি স্থিরতা আছে ? এখন পর্যন্ত কটা মেয়ে আই এ এসে সুযোগ পেয়েছে ?'

'পেয়েছে। তুমি খবরের কাগজ পড়োনি ?'

'হ্যাঁ। একজন। নামটা ভুলে গিয়েছি।'

'রমা মজুমদার।'

'কিন্তু তুমি নিজে কি করে নিশ্চিত হলে যে পাবে।'

'আমি আর হারতে রাজি নই।'

'আর মানে ?'

'আমি জীবনের শুরুতে ভাগ্যের কাছে বড় রকম হেরে গিয়েছিলাম অসীম। সেই হারের পর আমার মাস্টারমশাই-এর কথাই একমাত্র আদর্শ, আমাকে ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিততে হবে, কক্ষনো পেছন ফিরে তাকাব না।'

'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না !'

'তোমাকে কিভাবে বলি ?'

'সহজ ভাবে। যেভাবে মানুষ কথা বলে !'

দীপা চোখ তুলে তাকাল, 'আমার মা মারা গিয়েছিলেন আমি জন্মানো মাত্র। মানুষ হয়েছি মাসী এবং মেসোমশাই-এর কাছে। তাঁদেরই মা বাবা বলতাম এতদিন। আমার নিজের বাবাকে আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

'হুঁ। তুমি কি এর জন্যে দুঃখিত ?'

'একদম না।'

'তাহলে আমারও কিছু এসে যায় না।'

দীপা কিছুক্ষণ অসীমের দিকে তাকাল। অসীম চোখ সরাল না। দীপা খুব নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের বাড়িতে কোন বিধবা মহিলা আছেন ?'

অসীম ঝুঁকে এল, 'হাওয়ায় শুনতে পেলাম না, জোরে বল।'

দীপা প্রশ্নটা আবার উচ্চারণ করল। অসীম মাথা নাড়ল, 'আছেন ! পিসিমা।'

'তিনি কি মাছ মাংস ডিম খান ? রঙিন শাড়ি পরেন ?'

'মাথা খারাপ !'

'কার ?'

'মানে, এদেশের বিধবাদের ওসব বললে তারা পাগল হয়ে যাবে।'

'তাই !'

'আমি তোমার রহস্য বুঝতে পারছি না। এমন সব প্রশ্ন করছো কেন ?'

'তোমার পিসিমা যদি পাগল না হয়ে যান ?'

'দ্যাখো, ছেলেবেলা থেকেই আমি তাঁকে ওইভাবে দেখতে অভ্যস্ত। অন্য কোন ছবি আমি ভাবিনি।' অসীম বলল।

'ভাবোনি কেন ?'

'স্রেফ অভ্যেস।'

'ধর, তিনি যদি ওইসব নিয়ম যা আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা আর না মানেন ? তুমি কি মানতে পারবে ?'

'পিসিমার ব্যাপারের সঙ্গে তুমি আমি কিভাবে জড়িত হচ্ছি ?'

'আমার প্রশ্নের জবাব দাও আগে, বলছি।'

অসীম চোখ বন্ধ করল, করে হেসে ফেলল, 'সত্যি কথা হল, মানতে পারছি না বললে নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাব আবার উল্টোটা ভাবতে স্বস্তি পাচ্ছি না।'

দীপা খুব খুশি হল। অসীম এভাবে সত্যি কথা বলবে সে আশা করেনি। সে ঠিক করে নিল, অকপট হওয়াই এক্ষেত্রে উচিত কাজ হবে। এইসময় কফি এল। বেয়ারা ব্যবহৃত প্লেটগুলো তুলে নিয়ে গেল। কফির গরম কাপ টেনে নিয়ে দীপা বলল, 'চা-বাগানের বাড়িতে আমরা কখনও কফি খাইনি।'

অসীম বলল, 'কফি বাগানের লোকেরাও চা খেতে উৎসাহী নয়, হয়তো।'

দীপা হাসল, একটু মাথা ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'জানো অসীম, আমি যখন ছোট, সেই এগার বারো বছর বয়েসে, যাঁদের আমি মা বাবা ঠাকুমা বলতাম তাঁরা আমার ভালোর জন্যে খুব বড়লোকের একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।' খুব সহজ গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করল সে।

অসীম কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে যেন ছ্যাঁকা খেল। চট করে সোজা হয়ে বসল সে। তার দুই চোখ, মুখে বিস্ময় ঠিকরে বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না অসীম। যেন তার নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দীপা দেখল টেবিলে রাখা হাত কাঁপছে। সে আবার কথা শুরু করল, 'বিয়ে হয়েছিল। চা-বাগান থেকে আমায় নিয়ে আসা হল জলপাইগুড়ি শহরে। দুটো দিন একটা রাত কাটল কালরাত্রি আর নিয়মকানুন মেনে। ওই বয়সের আমার বোধ-বুদ্ধির কথা নিশ্চয়ই অনুমান করছ। তারপর এল ফুলশয্যা। যার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল তার শরীরে অল্পবয়সেই মৃত্যু বাসা বেঁধেছিল। তাকে দিয়ে কোনমতে একটি সন্তান উৎপাদন করে নিতে পারলেই বংশরক্ষা হয় এমন চিন্তা ছিল— ।'

হঠাৎ কানে হাত দিয়ে চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল অসীম, 'আঃ, আর আমার শুনতে ভাল লাগছে না, প্লিজ।'

'না। শুনতে তোমাকে হবেই।' দীপা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, 'একটা বীভৎস রাতের স্মৃতি আমার জন্যে রেখে ছেলেটি সকালবেলায় হাসপাতালে গেল। না, তার শরীরে এমন শক্তি ছিল না যা দিয়ে সে তার বাবার ইচ্ছে পূর্ণ করে। এখনও চোখ বন্ধ করলে একটি ক্লীব পুরুষের গোঙানি শুনতে পাই, সমস্ত শরীর ঘিনঘিন করে ওঠে। আমি কুমারী অবস্থায় পালিয়ে এসেছিলাম চা-বাগানে আর আমার স্বামী মারা গিয়েছিল সেই দিনই, হাসপাতালে। আমি বিধবা হলাম বিয়ের বাহাত্তর ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই। প্রথম দিকে বিধবার যা যা করণীয় তাই আমাকে করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে এক ভয়ঙ্কর জীবন।'

'কারা বাধ্য করেছিল ?'

'আমার হিতাকাঙ্ক্ষীরা।' দীপা হাসল, 'মজার কথা হল, শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলাম আমি কিন্তু এই সমাজ আমাকে বিধবা বলে যাবে আমৃত্যু। শ্বশুরবাড়ির কেউ আজ বেঁচে নেই, আমার কারো কাছে কোন দায় নেই— ।' এই অবধি বলে থেমে গেল আচমকা দীপা।

'থামলে যে ?'

'দায় নেই কথাটা সত্যি নয় অসীম। অন্তত একজন মহিলার কাছে আমি দায়গ্রস্ত। যাঁকে আমি ঠাকুমা বলি, যার পাশে শুয়ে শৈশব, বাল্যকাল এবং কৈশোর কাটিয়েছি।'

অসীম কি বলবে প্রথমে বুঝতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত সে বলতে পারল, 'দীপাবলী, তুমি চমৎকার একটা গল্প শোনালে !

'গল্প ?' হতভম্ব দীপা।

'নয়তো কি ? তোমার মত স্মার্ট, পরিষ্কার মনের মেয়ের জীবনে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে না। যদি ঘটতো তাহলে তুমি এখানে পৌঁছতেই পারতে না। আসল কথা হল, এসব বলে তুমি আমায় পরীক্ষা করছ ! তাই তো ?'

দীপা অপলক তাকাল, 'যদি করি ?'

'তাহলে জেনো আমি বিশ্বাস করছি না।'

দীপা বলল, 'অসীম, কাউন্টারে গিয়ে এসবের বিল দেওয়া যায় না ?'

অবাক হল অসীম, 'কেন যাবে না ? কিন্তু একথা বলছ কেন ?'

'আমি উঠব। আমার শরীর ভাল লাগছে না।'

'কি হল তোমার ?'

'বললাম তো, শরীর ভাল লাগছে না।'

'হঠাৎ ?'

'হঠাৎই।'

'আমি কি কিছু খারাপ বললাম ?'

'না। তুমি যা স্বাভাবিক তাই বলেছ। চল।' দীপা উঠে দাঁড়াল। সে কফি স্পর্শ করেনি। অসীম আর একবার বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে হাল ছাড়ল। প্যাসেজ পেরিয়ে দীপা সোজা চলে গেল কাউন্টারে। তার পেছনে জোরে পা ফেলে অসীম বলল, 'তুমি দিচ্ছ কেন ? প্লিজ।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না, আজ আমাকে দিতে দাও।'

দাম মিটিয়ে সিঁড়ি ভেঙে নামার সময় অসীমের দিকে তাকিয়ে দীপা বলল, 'জানো, আমি একটা বিরাট ঋণের বোঝা বয়ে চলেছি। এখন পর্যন্ত যা খরচ করছি তা ওই ঋণ থেকেই নেওয়া। এসবই আমাকে শোধ করতে হবে।'

'কিসের ঋণ ? তুমি কার কাছ থেকে টাকা ধার করেছ ?'

'টাকা তো বটেই। আরও অনেক, অনেক ঋণ ?'

'কি হেঁয়ালি করছ বল তো, আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জবাব না দিয়ে নিচে নেমে এল দীপা, তারপর ঘুরে দাঁড়াল, 'অসীম, এবার আমি যাই। বন্ধু হিসেবে তুমি খুব ভাল, খুব।'

'বেশ। চলে যেতে চাইলে তুমি যাবে। কিন্তু আমার ভুলটা বলে যাও।'

'তোমার কোনো ভুল নেই।'

'না। তুমি আমায় একটা গল্প বললে। আমি জানি নিজেকে তুমি অনেক বেশী মূল্যবান বলে মনে কর। আই· এ· এস দেবে, জীবনের অনেক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠবে, আমার মত একটি সাধারণ ছেলের ভালবাসায় আটকে থাকতে তুমি চাও না। কিন্তু এই ভাবনাটা মুখ ফুটে বলনি কেন এতদিন ? কেন আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটা মিথ্যে গল্প সাজাতে হল ?'

অসীমের গলার স্বর এতটা উঁচুতে উঠেছিল যে পাশ দিয়ে যাওয়া কয়েকজন দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপা কি করবে বুঝতে পারছিল না। অসীমকে খুব ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে। যে কেউ বুঝবে খুব গোলমাল হয়েছে। সে শুধু বলতে পারল, 'তুমি ভালভাবে কথা বল অসীম। আমি কোন গল্প শোনাইনি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'হঠাৎ ?'

'এটা বানানো গল্প।'

'খামোকা তোমাকে বলতে যাব কেন ? আচ্ছা ! তুমি আমার সঙ্গে হোস্টেলে চল। প্রমাণ পেয়ে যাবে সেখানে।'

'কিসের প্রমাণ ?' অসীম নড়ছিল না। দীপা দেখল ভিড় বাড়ছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর উচিত হবে না। সে কথা না বলে হাঁটতে শুরু করল। এইসময় পেছন থেকে হাসি ভেসে এল। যারা কৌতূহলী ছিল তারা হাসছে এখন। রাগ অপমান আচমকা অসহায় করে তুলল দীপাকে। ট্রামে ওঠার কথা খেয়ালে এল না। এবং তখন অসীম ওর পাশে চলে এল,

এভাবে চলে যাচ্ছ যে !'

'তুমি আমাকে ছেড়ে দাও অসীম, প্লিজ লিভ মি। আমি একা থাকতে চাই।'

'কেন ?'

'তুমি হাসিগুলো শোননি ? এভাবে আমাকে অপমান নাই বা করলে।'

'অদ্ভুত ! আমি তোমাকে অপমান করলাম ?' অসীমের গলা ভাঙল, 'তুমি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছ না ?'

'এখন চাইছি। কারণ আমি বিধবা এটা তুমি মানতে পারছ না।'

অসীম খুব অসহায় হয়ে পড়ল। দীপার চেহারায় বিবাহিতা মেয়ের কোন চিহ্ন নেই। বিবাহিতা মেয়েদের শরীরে যে পরিবর্তন আসে তা নিয়ে বন্ধুবান্ধবরা নানান গল্প করে থাকে। কলেজে যে কোন বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে কুমারী মেয়ের প্রভেদ সাদা চোখে বোঝা যায়। সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি মানতে পারছি না। তোমার আচরণ কথাবার্তায় সেটা কখনও বোঝা যায়নি বলেই আচমকা শুনে মানা যে কোন মানুষের পক্ষেই অসম্ভব।'

'বাঃ, আমি তোমাকে বানিয়ে গল্প বলব ?'

অসীম জবাব দিল না। ওরা হাঁটছিল। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'হোস্টেলে গেলে তুমি আমাকে কি দেখাবে ?'

'হোস্টেলের খাতায় আমার বাবার উপাধি মুখার্জী দেখতে পাবে।'

'সেটা অসম্ভব নয়। তিনি তোমার নিজের বাবা ছিলেন না।'

হকচকিয়ে গেল দীপা। কখনও ব্যাপারটা তার মাথায় আসেনি।

অসীম হাসল, 'তুমি বরং অন্য কোন জোরদার কিছু প্রমাণ হিসেবে দাও যা আমি বিশ্বাস করতে পারি। ধর, বিয়ের কার্ড, ওই সময় তোলা ছবিটবি—।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'যে ব্যাপারটা ভুলে যেতে চেয়েছি প্রাণপণে তার স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে বেড়াব এমন ভাবছ কি করে ? আর এর পর, বিশ্বাস কর অসীম, প্রমাণ দিয়ে সম্পর্ক জিইয়ে রাখার কোন ইচ্ছে আমার নেই। দেখা হলে কথা বলব, বন্ধু না হোক পরিচিতের সঙ্গেও তো লোকে কথা বলে। চলি।'

দীপা পা চালালো। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল অসীম তার পেছনে আসছে। দূরত্ব বাড়াবার জন্যে সে জোরে পা চালালো। না সে কোন ভাবে অসীমকে দোষী করতে পারছে না। একটা ভাল লাগা তৈরী হয়েছিল। অসীম সেটাকে ইতিমধ্যে ভালবাসায় নিয়ে গিয়েছিল, প্রায় নিঃশব্দে সে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে বলেছিল। ওরা কখনও মুখ ফুটে উচ্চারণ করেনি ভালবাসি কিন্তু সেটা ব্যবহারে অপ্রকট তো ছিল না। এই অবস্থায় অসীমের ধারণা তো খুব স্বাভাবিক ভাবে তৈরী হতে পারে সে আর পাঁচটা মেয়ের মত স্বাভাবিক, অবিবাহিতা।

কিন্তু এই ভাল হল। বিদ্যাসাগর মশাই-এর কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর চাননি তাঁর পরিবারের বিধবা বউ-এর পুনর্বিবাহ হোক। সেই মানসিকতা আজও অসীম এবং অসীমদের মত প্রগতিবানরা যদি বয়ে বেড়ায় তাহলে কিছু করার নেই। গত আশি বছরে কবে কে কোথায় বিধবা বিবাহ করেছিল বলে আজ দেশে সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে এমন আশা করা বোকামি। বরং একটা গভীর খাদের একদম কিনারা থেকে সে ফিরে আসতে পারল বলে অসীমকে ধন্যবাদ দেবে সে। নিজের সঙ্গে এইসব কথা বলতে বলতে সে হেদুয়ায় চলে এল। এখন বিছানা টানছে তাকে। নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকতে পারলে আর কিছু চায় না। না, সে পেছন ফিরে

তাকাবে না, কিছুতেই না।

হোস্টেলের গেটের কাছে পৌঁছে সে থমকে দাঁড়াল। উল্টো ফুটপাথ থেকে কেউ তাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। দীপা অনেক কষ্টে মুখ ফেরাল। তার কষ্ট হচ্ছে কেন, কেন শরীর এমন ভারী হয়ে যাচ্ছে, এই চিন্তায় ফেরার অবকাশ পেল না। সে দেখতে পেল সুভাষচন্দ্র তাকে হাত উঁচিয়ে দাঁড়াতে বলছেন।

সুভাষচন্দ্র ওখানে দাঁড়িয়ে কেন ? ওঁর পাশে একজন মাঝবয়েসী মহিলা। ইদানীং খোঁজ খবর করা সুভাষচন্দ্র একদম ছেড়েই দিয়েছেন। ট্রাম বাস দেখে রাস্তা পেরিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, 'অনেকক্ষণ এসেছি ; কোথায় গিয়েছিলি, শুনলাম কে খুন হয়েছে বলে নাকি আজ কলেজ বন্ধ ছিল।'

'হ্যাঁ। একটু দরকারে বেরিয়েছিলাম।'

'হুটহাট কলকাতা শহরে বেরুনো ঠিক নয়। লোকে বাঙাল ভাববে।'

'বাঙাল ?'

'হ্যাঁ, পাকিস্তান থেকে আসা রিফ্যুজি। এদেশের মেয়েরা অমন হুটহাট বের হয় না।'

প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল দীপার। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই সুভাষচন্দ্র গলা নামিয়ে নিচু স্বরে বললেন, 'তোর হোস্টেলের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল। পুলিশে পুলিশে থিক থিক করছে। দারোয়ান বলল যে মেয়েটা খুন হয়েছে সে নাকি তোর ঘরেই থাকত। দেখিস পুলিশে ছুঁলে ছত্রিশ ঘা।'

ভাবনাটা এক লহমায় ঘুরে গেল। পুলিশ হোস্টেলে এসেছে তদন্ত করতে ? কিন্তু বাইরে কোন গাড়ি দেখতে পাচ্ছে না তো। ওরা নিশ্চয়ই জেরা করবে তাকে। করলে ক্ষতি কি ! গ্লোরিয়ার সম্পর্কে সে যা জানে বলে দেবে। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'তোর সঙ্গে খুব জরুরী কিছু কথা ছিল। কোথায় বসে বলা যায় বল তো ?'

'গেস্টরুমে আসুন।'

'দূর ! পুলিশের সামনে কথা বলব কি করে ?' বলতে বলতে সুভাষচন্দ্র মুখ তুললেন, 'কিছু চাই ভাই ? অনেকক্ষণ থেকে দেখছি দাঁড়িয়ে আছ ?'

দীপা মুখ ফেরাতেই অসীমকে দেখতে পেল। অসীম সেখানে দাঁড়িয়েই হাসল, 'হ্যাঁ, দীপাবলীর সঙ্গে একটু কথা আছে !'

সুভাষচন্দ্র দীপাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চিনিস নাকি ?'

'হ্যাঁ। কলেজে পড়ে।'

'নে, কি কথা বলবে বলছে সেরে নে, তারপর আমরা বলব।'

দীপা কিছু বলার আগেই অসীম মাথা নাড়ল, 'না, না, আমার সময় লাগবে। আপনারাই বরং শেষ করে নিন।'

সুভাষচন্দ্র গম্ভীর হয়ে গেলেন, 'দিস ইজ নট গুড। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলা তোর বাবাও, মানে অমরনাথ মুখুজ্যেও পছন্দ করত না।'

দীপা ঘুরে দাঁড়াল, 'অসীম, আর কি কোন জরুরি কথা থাকতে পারে ?'

অসীম নির্দ্বিধায় মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

দীপা কি করবে বুঝে উঠল না। সেইসময় দারোয়ান গেট থেকে বেরিয়ে এল। দীপাকে দেখতে পেয়ে সে তড়বড় করে বলে উঠল, 'আরে দিদি, পুলিশ আপনাকে খুঁজতেছিল।'

দীপা সুভাষচন্দ্রকে বলল, 'তোমরা গেস্টরুমে এসে বসো। আমি আসছি।'

সে সোজা গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল। থিক থিক করা পুলিশ নজরে এল না। সুপারের

ঘরে দুজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। তাকে দেখতে পেয়ে সুপার বললেন, 'এই যে, তুমি এসে গিয়েছ! এঁরা তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান। এর নাম দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়।'

দীপা তৃতীয় চেয়ারটিতে বসতেই একজন অফিসার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আর গ্লোরিয়া একই ঘরে থাকতেন?'

'হ্যাঁ।' দীপা মাথা নাড়ল।

'ও কেন বর্ধমানে গিয়েছিল জানেন?'

'না। আমি জানতাম ও শান্তিনিকেতনে গিয়েছে।'

'হুম্! মেয়ে হিসেবে ও কেমন ছিল?'

'ভাল।'

'কি রকম ভাল। বাঙালিদের মত স্বভাব ছিল না নিশ্চয়ই।'

'বাঙালিদের স্বভাব বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন?'

প্রশ্নটা শোনামাত্র দুই অফিসার নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে নিলেন। এবার দ্বিতীয় জন প্রশ্ন করলেন, 'গ্লোরিয়াকে কেন খুন করা হল এ ব্যাপারে কোন সূত্র দিতে পারেন?'

'আমি জানি না।'

'ও মদ সিগারেট খেত? পুরুষবন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতো।'

'মদ খেতো না। সিগারেট খেতে দেখেছি। ওর দেশের কিছু ছেলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওর বন্ধুত্ব ছিল। তাদের কারো সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিছুদিন আগে ভেঙে গিয়েছিল।'

'কি রকম সম্পর্ক?'

'মনে হয় তাকে গ্লোরিয়া ভালবাসতো।'

'গুড। কি নাম তার?'

'আমি জানি না।'

'কেন?'

'ও আমাকে বলেনি, আর কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাইনি।'

'হুম। মেয়ে হিসেবে সে কেমন ছিল?'

'ভাল। প্রথম প্রথম ভাষা এবং অভ্যেসগুলো আলাদা বলে কিছুটা অসুবিধে হত আমার। কিন্তু পরে মনে হয়েছে ও খুব সোজা ধরনের মেয়ে।'

'কোন দুষ্টচক্রের সঙ্গে তার সংযোগ ছিল বলে মনে হয়?'

'না। থাকলেও আমি জানি না।'

'গ্লোরিয়াকে আপনি এখানে এসে প্রথম দ্যাখেন?'

'হ্যাঁ। আমি জলপাইগুড়ির মেয়ে আর ও জাম্বিয়ার মেয়ে।'

'ঠিক আছে। যদি প্রয়োজন হয় আপনাকে আবার বিরক্ত করব। এবার যেতে পারেন।'

মাথা নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল দীপা। একজন অফিসার বলছেন, 'খুব শক্ত মেয়ে তো, এই বয়সে এমন উত্তর আশা করা যায় না।'

সুপার বললেন, 'হ্যাঁ, মেয়েটি একটু অন্যরকম।'

'অন্য রকম মানে?' অফিসারের গলায় কৌতূহল।

'খুব সিরিয়াস টাইপের কোন কোন মেয়ে থাকে, ওই ধরনের।'

দীপা আর দাঁড়াল না।

গেস্টরুমে এসে দেখল সুভাষচন্দ্র আর সেই মহিলা পাশাপাশি বসে আছেন। সে

পৌঁছানো মাত্র সুভাষচন্দ্র বললেন, 'খুব বদ ছোকরা। কম্যুনিস্ট নাকি ?'

'কার কথা বলছেন ?'

'আরে যে তোর সঙ্গে কথা বলার জন্যে দাঁড়িয়েছিল। কথা শুনে তো মনে হয় না ওদেশের। মুখে মুখে তর্ক করছিল।' খুব বিরক্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে।

'কোথায় গেল অসীম ?'

'অসীম ? ওর নাম অসীম ! ঘুরে আসতে বলেছি। এখানে হুটহাট ছেলেরা চলে এলে দেখা করতে দেয় ? মেয়েদের হোস্টেলে নিয়মকানুন নেই ?'

'এখন ভিজিটিং আওয়ার্স চলছে। কি ব্যাপার বলুন।' দীপা বসল।

মুহূর্তেই পাল্টে গেলেন সুভাষচন্দ্র, 'তুই তো আর এই বুড়ো মামার খোঁজখবর নিস না। মাসের কুড়ি দিনই অসুস্থ থাকি। হাই ব্লাডপ্রেসার তার ওপর আমাশা লেগে আছে। অমরনাথ মুখুজ্যের চলে যাওয়ার সময় বিছানায় পড়েছিলাম। খুব বড় ধাক্কা পেয়েছিলাম খবরটা শুনে। তোর সঙ্গে যে এসে দেখা করব এমন মনের জোর ছিল না। কি অকালেই না চলে গেল লোকটা।'

দীপা জবাব দিল না। সে মহিলাকে দেখল। রোগা ছোটখাটো চেহারা। এক দৃষ্টিতে তিনি দীপাকে দেখে যাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র মাথা নাড়লেন শোকার্ত ভঙ্গীতে, 'তবে অঞ্জলির সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। চিঠিপত্র দেয়। এখনও ওদের কোয়ার্টার্স ছাড়তে হয়নি তবে ঘরবাড়ি তুলে ফেলেছে। কারো জন্যে তো কিছু আটকে থাকে না এই পৃথিবীতে, মাঝখান থেকে তুই একদম একা হয়ে গেলি। তোরা দুজনেই ঠিক, আমি আর কাকে সমর্থন করব !'

'আপনি বলছিলেন খুব জরুরি কথা আছে।'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই তো এলাম। কিন্তু এই পুলিশের ঝামেলা চুকেছে ?'

'হ্যাঁ।'

'বাঃ, চিন্তা হচ্ছিল খুব। এক ঘরে ছিলি, মেমসাহেব তার ওপর নিগ্রো, স্বভাবচরিত্র তো এদের খুব একটা ভাল হয় বলে শুনিনি।'

'মামা, আমার শরীর ভাল নয়। আপনি কি বলতে এসেছেন বলুন।'

সুভাষচন্দ্র মহিলার দিকে তাকালেন। মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, ওকে অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি আমরা।' তারপর দীপার দিকে তাকালেন, 'তোমার নাম খুব মিষ্টি।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনতে পারছি না। মামা এখনও পরিচয় করিয়ে দেননি।' কিছুটা বিস্ময় নিয়ে বলল দীপা।

সুভাষচন্দ্র একটু আড়ষ্ট হলেন, 'মানে পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ পাইনি এখনও। ইনি হচ্ছেন তোমার মা, এঁকে প্রণাম কর।'

হকচকিয়ে গেল দীপা। বিস্ময়ে সে কথা বলতে পারল না।

সুভাষচন্দ্র মাথা নাড়লেন, 'শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ। কিন্তু এটাই সত্যি। অঞ্জলি তোমার সম্পর্কে মাসী হয়। তাকে তুমি মা বলতে। আসলে তোমার গর্ভধারিণী গত হওয়ার পর তোমার জন্মদাতা বিবাগী হয়ে যান। পরে যখন সংসারী হন তখন এঁকেই বিবাহ করেন। তার মানে, ইনি যেহেতু তোমার জন্মদাতার স্ত্রী তাই এঁকেই মা বলে ডাকা উচিত। নাও, প্রণাম করো।'

দীপা চুপ করে আছে দেখে মহিলা বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই খুব অবাক হচ্ছ। অবাক হবার কথাই। হঠাৎ এভাবে কেন তোমার কাছে এলাম তা ভাবা খুবই স্বাভাবিক।'

দীপা কোন কথা বলল না। হঠাৎ মনে হল তার মাথা আর নিতে পারছে না। কেমন যেন টালমাটাল লাগছে নিজেকে। পঞ্চাশ বছর পরে সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে আসা ঠাকুর্দার গল্পটিকে ঠাকুমা বলেছিলেন ভূতুড়ে। এক সময় তো কিছুতেই স্বীকার করতে পারেনি। সে পরে যাকেই ওই গল্প শুনিয়েছে সে-ও মাথা নেড়েছে, ইম্পসিবল। ভূত কিংবা ভণ্ড ছাড়া এমন হতে পারে না। অথচ জীবন অদ্ভুত। এই মহিলাকে নিয়ে এসে মামা বলছেন প্রণাম করতে কারণ ইনি তার সৎমা।

সুভাষচন্দ্র বললেন, 'তোর বাবার খুব ইচ্ছে ছিল এখানে আসে। কিন্তু—।' কথা শেষ করলেন না তিনি, অপরাধীর ভঙ্গী নিয়ে তাকালেন।

'কিন্তু কি ?' খুব নিচু গলায় জানতে চাইল দীপা।

'তুই কিভাবে নিবি তা বুঝতে পারছিল না। আসলে আমার কাছেই শুনেছে যে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের সঙ্গে তোর কোন মিল নেই।' সুভাষচন্দ্র বোঝাতে চাইলেন।

কিন্তু মহিলা মাথা নাড়লেন, 'আহা ' সত্যি কথাটাই বলুন ওকে। শুনেছি তুমি জন্মাবার পরই দিদি মারা যান। তোমার মাসী দায়িত্ব নেওয়াতে তোমার বাবা মুক্ত করে ফেলেন নিজেকে। আজ তাঁর অনুশোচনা হতেই পারে। কিন্তু যে মানুষটা বাবা হয়ে তোমার জন্যে কোন কর্তব্য কখনও করেনি সে কোন মুখ দিয়ে একদম প্রথমে এসে দাঁড়ায় সামনে।'

'তাই আপনি এসেছেন ?' দীপার গলার স্বর পাল্টাচ্ছিল না।

'হ্যাঁ। আমার সঙ্গে তো তোমার কোন শত্রুতা নেই, তুমি আমাকে দ্যাখোনি আমিও না।'

'ভালই। আপনারা কলকাতায় থাকেন ?'

'হ্যাঁ গো। পাকপাড়ায়, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডে। এখান থেকে বেশী দূর নয়।'

'আমার কথা আপনারা কিভাবে জানলেন ?'

এবার সুভাষচন্দ্র জবাব দিলেন, 'আমিই বলেছি।'

'ওঁদের কথা আপনি জানতেন ?'

'না, না। জানলে তোমাদের নিশ্চয়ই জানাতাম। হঠাৎ যোগাযোগ হয়ে গেল। পাকপাড়ায় তোমার মামীমার সেজো পিসি থাকেন। তাঁর ছেলের বিয়ে দেবেন বলে স্থির করেছিলেন। এক ঘটক সম্বন্ধ নিয়ে এল, মেয়ে স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে, পাকপাড়াতেই বাড়ি। আমি এসবের কিছুই জানতাম না। মেয়ে দেখা হয়েছে, এখন দেনাপাওনা নিয়ে কথা হচ্ছে। ছেলে ব্যাঙ্কে চাকরি করে তো ! সেই সময় তোমার মামীমার সেজো পিসে একদিন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলেন, মেয়েটি ভদ্রলোকের দ্বিতীয় পক্ষের, প্রথম পক্ষের বিয়ে হয়েছিল নাকি মালবাজারে। আমরা মালবাজারে এককালে থাকতাম তা তিনি জানতেন। কৌতূহল হল, গেলাম আলাপ করতে। ব্যাস, দেখি তোমার বাবাই মেয়ের বাবা।' হাসলেন সুভাষচন্দ্র।

'তারপর ?'

'তারপর আর কি হবে ? অনেক মান অভিমানের কথা হল। বুঝলাম স্রেফ লজ্জায় তোমার খোঁজখবর করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ওঁর পক্ষে করা হয়ে ওঠেনি। আমার কাছে তোমার খবর পেয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তখনই দেখা করতে আসবেন। আমি তাঁকে

কোনমতে শান্ত করলাম। তোমার কথা সব বললাম। খুব কষ্ট পেলেন। তারপর থেকেই বলতে আরম্ভ করেছেন, সে কি আমার মুখ আর দর্শন করবে ! আমার বড় মেয়ে, যে নেই বলে বিবাগী হয়েছিলাম তার রক্ত ওর শরীরে, ও কি আমাকে কখনও বাবা বলে ডাকবে। খুব নরম মনের মানুষ হে।'

এবার ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি জানি, তোমার অভিমান হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে দিদিকে উনি এত ভালবাসতেন যে ওঁর মৃত্যু সহ্য করতে পারেননি। কিন্তু যতই হোক বাবা সবসময়ই বাবা। আমি কথা দিয়ে এসেছি আজ তোমাকে ওঁর কাছে নিয়ে যাব।' দীপার হাত ধরলেন মহিলা বেশ আবেগ নিয়েই। ধীরে ধীরে হাত ছাড়িয়ে নিল দীপা, 'আজ তো সম্ভবই নয়। আমার শরীর খুব খারাপ।'

'শরীর খারাপ ? কি হয়েছে ?' সুভাষচন্দ্র জানতে চাইলেন।

'খুব দুর্বল লাগছে।' উঠে দাঁড়াল দীপা।

'তা তো হবেই। এত পড়ার চাপ, তার ওপর পুলিশ-টুলিশের ঝামেলা। মহিলা মাথা নাড়লেন, 'তাহলে আজ থাক। কাল কিংবা পরশু ? মুশকিল হল, তার বেশী দেরি করলে ওঁকে আটকে রাখা যাবে না। এখানে এসে উনি যদি কান্নাকাটি করেন তাহলে পাঁচজনে কি বলবে বল তো ? তাছাড়া তোমার বোনেরাও আলাপ করতে উৎসুক।'

দীপা জবাব দিল না। মহিলা সুভাষচন্দ্রকে বললেন, 'চলুন। ওকে একটু বিশ্রাম নিতে দিন। দেখে মনে হচ্ছে সারাদিনে ওর ওপর খুব ধকল গিয়েছে।'

সুভাষচন্দ্র উঠলেন, 'ঠিক আছে। কাল আমি বিকেল পাঁচটায় এসে তোকে নিয়ে যাব। শরীরের ওপর যত্ন নিস। অমরনাথ মুখার্জী নেই বলে ভাবিস না তোর সঙ্গে কেউ নেই। আমরা তো আছি।' বাইরে পা বাড়ালেন তিনি। দীপা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদের চলে যেতে দেখল। গেট পেরোবার আগে মহিলা মুখ ফিরিয়ে একবার মিষ্টি করে হেসে যাই বললেন। দীপা নড়ল না। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না। সুভাষচন্দ্র যেন বেশ কিছুটা বদলে গিয়েছেন। এখন তাঁর কথাবার্তার মধ্যে খুব চেনা একটা লোকের আদল আসছে। লোকটা কে তা সে মনে করতে পারছে না। কিন্তু আজ সুভাষচন্দ্রকে কিছুতেই ভাল লাগছিল না তার। যে ভদ্রমহিলা তাকে জন্ম দিয়েই দেহ রেখেছেন তাঁর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে সম্পর্ক ছিল অঞ্জলির সঙ্গেও একই সম্পর্ক। মনে পড়ছে অমরনাথের চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আসার প্রস্তাব দিয়ে অঞ্জলি যখন চিঠি দিয়েছিল তখন সুভাষচন্দ্র জানিয়েছিলেন, সাতদিনের জন্যে কোন অসুবিধে নেই। খুব খারাপ লেগেছিল তখন। পরে কলকাতায় এলে তিনি অনেক করেছেন। আবার অমরনাথের অসুস্থতা, আর্থিক দুর্গতি আরম্ভ হবার পর থেকেই তিনি যেন নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সেই একই মানুষ আবার মৃত বোনের পালিয়ে যাওয়া স্বামীর সঙ্গে এতদিন পরে সম্পর্ক তৈরি করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলে অবাক হতেই হয়। দীপা চোখ বন্ধ করল। অসম্ভব। বাবা বলে কাউকে চিন্তা করলেই অমরনাথের মুখ মনে আসছে। যিনি তাকে জন্ম দিয়েছিলেন তাঁর সম্পর্কে কিছুদিন ধরে একটা কৌতূহল তৈরি হচ্ছিল বটে। কিন্তু তাঁকে অমরনাথের জায়গায় বসানোর বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। আর কাউকে সে কখনও বাবা বলতে পারবে না। কিন্তু এই মহিলা, সম্পর্কে যিনি তার সৎমা, ব্যবহার করলেন বেশ ভাল। একেই হয়তো বুদ্ধিমতীর ব্যবহার বলে।

হোস্টেলের ভেতরে পা বাড়াতে গিয়ে গেটের দিকে নজর গেল। অসীম বলে গেছে কিছু বাদেই ঘুরে আসবে। এর মধ্যে অনেকটা সময় গিয়েছে, কিন্তু ও আসেনি। সুভাষচন্দ্র ওকে পছন্দ করেননি। সে সামনে থাকতেই যে ধরনের ব্যবহার করেছিলেন তাতে বোঝাই

যাচ্ছে পরে ভাল কিছু করতে পারেন না। অসীম যদি সেই কারণে অপমানিত বোধ করে তাহলে এই মুহূর্তে তার কিছু করার নেই। মানুষের যদি জরুরি কিছু কথা বলার থাকে তাহলে সে একটা সময় বলবেই।

আজ তাকে বিকল্প জায়গায় থাকতে হবে। দীপা পা বাড়াল। হোস্টেলের ভেতরে আজ ছোটছোট জটলা। মেয়েরা হয়তো ঘুরে ফিরে গ্লোরিয়ার কথাই আলোচনা করছে। কেউ কেউ দীপাকে দেখতে পেয়ে ডাকল। দীপা হাত নাড়ল, মুখে বলল, শরীর খারাপ।

নিজের বিছানা নয়, পুলিশ তালা খুলে না দিলে নিজের ঘরে যাওয়াও যাবে না, তবু বিছানা তো, শুয়ে মনে হল শরীর এতক্ষণ এই আরাম চাইছিল। চোখ বন্ধ করে কিছু মনে করতে চাইতেই সে হতভম্ব, কিছুই মনে করতে পারছে না। মাথার ভেতরটা যেন একদম ফাঁকা। কোন কিছু ভেবে সামনে নিয়ে আসার শক্তি তার এক ফোঁটাও নেই। এই অবস্থায় মনে হল কেউ বা কারা ঘরে ঢুকছে। চোখ খোলার প্রয়োজন মনে করল না দীপা। পারফিউমের গন্ধটা নাকে এল এবং সেইসঙ্গে লুসাকার গলা, 'শী ইজ স্লিপিং!'

চোখ খুলল দীপা। লুসাকা আর সেই খটমটে নামের মেয়েটি। অদ্ভুত করুণ ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছে ওরা। সে উঠে বসল, 'ইয়েস!'

লুসাকা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল, 'প্লিজ হেল্প আস!'

'কি হয়েছে?' কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছিল না দীপার। এইসময় দরজায় শব্দ হল। দীপা বলল, 'কে?'

দারোয়ান সামনে এল! 'অসীম নামে একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'বলে দাও আমার শরীর খারাপ, আমি শুয়ে আছি।'

দারোয়ান চলে যেতেই সে লুসাকার দিকে তাকাল। লুসাকার বদলে খটমটে জবাব দিল, 'সবাই আমাদের দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। এভরিবডি।'

'আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'তুমি আমাদের সাজেস্ট কর ওই ছেলেটার কথা পুলিশকে বলব কি না। ওরা আমাদের অনেক জেরা করেছে কিন্তু ছেলেটার কথা আমরা ভয়ে বলিনি। এখন সবাই যখন আমাদের সন্দেহ করছে তখন ওর কথা বলে দিতে চাইছি আমরা। কিন্তু খুব ভয় করছে।'

'ভয় কিসের?'

'সে লোকাল বয়। আমাদের ক্ষতি করতে পারে। আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই! পুলিশ যদি ওকে কিছু না করে তাহলে আমরাই বিপদে পড়তে পারি।'

'কোন ছেলে? কার কথা বলছ?'

'তুমি জানো না? গ্লোরিয়া তোমাকে কিছু বলেনি?'

'আমি মনে করতে পারছি না।' দীপার সত্যি মনে পড়ছিল না। গ্লোরিয়া এমন কোন স্থানীয় ছেলের গল্প তার কাছে করেনি যাকে এতটা জড়ানো যায়! সে জিজ্ঞাসা করল, 'কি নাম ওর?'

'ভিমল সেইন।' খটমটে বলল, 'হি ইজ ওয়ান ইয়ার সিনিয়ার।'

বিমল সেন! দীপা আবছা মনে করতে পারল একটি ছেলেকে। গাড়ি চালিয়ে কলেজে আসে মাঝেমাঝে, ভাল স্বাস্থ্য। স্কটিশে বড় লোকের কিছু ছেলে আসে সময় কাটাতে, তাদের একজন বলে মনে হয়েছিল বিমলকে। গ্লোরিয়ার চেহারায় যে চটক ছিল তাতে জাম্বিয়ার বন্ধুরা ছাড়াও শেষের দিকে কিছু বাঙালি ছেলে ওর সঙ্গে যেচে আলাপ করেছিল। কিন্তু এ গল্প করলেও কোন বিশেষ নাম গ্লোরিয়া তার কাছে উল্লেখ করেনি।

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বিমল কি করেছে ?'

'ও গ্লোরিয়াকে নিজের গ্রামে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল ।'

'সে কি ? ও শান্তিনিকেতনে যায়নি ?' চমকে উঠল দীপা ।

'ওরা গ্রাম দেখে সেখানে যাবে বলে ঠিক করেছিল ।'

'তোমরা এসব কথা পুলিশকে বলোনি কেন ? ওরা তো নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করেছিল ?'

'হ্যাঁ । আমরা ভয় পেয়েছিলাম । কিন্তু— !'

দীপা উঠে পড়ল । আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ঠিক করে নিয়ে বলল, 'এসো তোমরা !'

সুপারের ঘরে গিয়ে ওরা শুনল তিনি নেই, সম্ভবত প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন । দীপা চিন্তা করল । তারা ইচ্ছে করলে সোজা থানায় যেতে পারত । কিন্তু সেটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছে না সে । না, ব্যাপারটা প্রথমে সুপারকেই জানান উচিত । দারোয়ানের কাছ থেকে প্রিন্সিপালের বাড়ির ঠিকানা জানতে চাইল সে । তিনি কলেজের পাশেই কোয়ার্টার্সে থাকেন জেনে ওরা বেরিয়ে পড়ল । ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে গিয়েছে । রাস্তায় একজনও ভদ্রঘরের মহিলা একা নেই । কালো মেয়েদুটি মাথা নিচু করে হাঁটছিল । যেন গ্লোরিয়ার মৃত্যুর জন্যে তারাই অপরাধী হয়ে পড়েছে । দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বিমলের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল ?'

'খুব না । কিছু কিছু ছেলে থাকে যারা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চায় শরীরের জন্য, ও সেই ধরনের ছেলে । চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারতাম । ওকে সাবধানও করে দিয়েছিলাম ।'

'তাহলে ?' দীপা অবাক হচ্ছিল, একই ঘরে থেকেও সে এসব কিছুই জানে না । 'ও শোনেনি । আসলে ভালবাসার ব্যাপারে একদম ঠকে গিয়ে ও বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল ।'

দীপা কথা বাড়াল না । জেনেশুনে বিষ খাওয়া তো আত্মহত্যা । প্রেমে ব্যর্থ হলে মানুষ দেবদাস হবেই ? পৃথিবীর সব দেশের মানুষ । দেবদাস মদ খেয়েছিল আর গ্লোরিয়া নিজেকে নষ্ট করার অন্য পথ বেছে নিল । কিন্তু মূলে তো কোন তফাত নেই । হঠাৎ অসীমের কথা মনে পড়ল দীপার । অসীমকে সে পছন্দ করে । অসীমকে কি সে ভালবাসে ? ভালবাসা কারে কয় ? যদি তার প্রথম শর্ত হয় কষ্ট না দেওয়া, কষ্ট পেতে দেখলে আড়াল করে রাখা তাহলে কি সে চুপ করে বসে থাকতে পারবে ? চট করে এই প্রশ্নের উত্তর যে তৈরি হচ্ছে না । অথচ আজ অবধি, একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও কম ছেলের সঙ্গে আলাপ হল না । কিন্তু তাদের কেউ তাকে টানেনি । কেন টানেনি ? তার অবস্থা কি সেই মানুষের মতো যার শৈশবেই এডে লেগে গিয়েছিল ! কোনওদিন আর স্বাভাবিক হতে পারল না ! সেই এক রাত্রের স্মৃতি কি ভালবাসার মনটাকে উপড়ে নিয়ে গেল ? দীপার খুব ইচ্ছে করছিল এখন অসীমের সঙ্গে দেখা করতে ।

সাধারণত প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলার কোনও প্রয়োজন ছাত্রছাত্রীদের হয় না । তিনি থাকেন দূরত্ব নিয়ে তাই ছেলেমেয়েরা এড়িয়ে চলে । এই বিদেশী প্রিন্সিপাল যে খুব শৃঙ্খলা মেনে চলতে ভালবাসেন তা সবাই জানে । সুপার তাঁর কাছেই ছিলেন । সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি সুপারের দিকে তাকালেন । সুপার একটু ইতস্তত করে বললেন, 'চট করে একটা ছেলেকে না জড়িয়ে ফেলে প্রথমেই একটু খোঁজখবর করলে বোধ হয় ভাল হয় । এরা যা বলছে তা সরাসরি অভিযোগ করা ।'

প্রিন্সিপাল জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি গ্লোরিয়ার রুমমেট । পুলিশ যখন তোমাকে প্রশ্ন করেছিল তখন এসব কথা তাদের জানাওনি কেন ?'

দীপা বলল, 'আমি একটু আগে এদের মুখে ঘটনাটা প্রথম শুনি ।'

প্রিন্সিপাল এবার লুসাকাদের দিকে তাকালেন। তারা মুখ নিচু করল। দীপা বলল, 'ওরা প্রথমে ভয় পেয়েছিল। কলকাতায় থাকতে হবে ওদের তাই এখানকাব ছেলেকে অভিযুক্ত করতে ঠিক সাহস পায়নি। এখন অবস্থা দেখে আমাকে বলেছে। আপনি যদি ওদের আড়াল করেন তাহলে ভাল হয়।' দীপা সত্যি কথা বলে ফেলল।

'তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ আছে ওদের একসঙ্গে বর্ধমানে যাওয়ার?'

লুসাকা মাথা নাড়ল, 'না। কিন্তু আমরা তাই জানতাম। এখন আমরা চাই গ্লোরিয়াকে যে খুন করেছে তাব শাস্তি হোক। যদি তাব জন্যে আমাদের এই শহর থেকে পড়াশুনা বন্ধ করে চলে যেতে হয় তাতেও রাজি আছি।'

'ধন্যবাদ।' প্রিন্সিপাল খুশি হলেন, 'কিন্তু তোমবা বিমল সেনের ঠিকানা জানো?'

না ওবা কেউ জানে না। তবে কলেজের খাতায় নিশ্চযই পাওযা যাবে ঠিকানা। প্রিন্সিপাল টেলিফোন তুলে নম্বব ঘোরালেন। দ্বিতীয়বারে লাইন পাওয়া গেল। নিজেব পবিচয দিয়ে প্রিন্সিপাল বললেন, 'গ্লোরিযাব পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে? যাযনি? কেউ ধবা পড়েনি এখনও? শুনুন, আমাকে একজন বলল ওকে আমার কলেজের ছেলে বিমল সেনের সঙ্গে ঘোবাফেবা কবতে দেখা গিয়েছে। কে বলল? অফিসাব, আপনাকে আমি নিশ্চযই নাম বলব কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে সোর্স ডিসক্লোজ কববেন না। কি বললেন? হ্যাঁ, আপনাবা যদি প্রশ্ন করতে চান তাহলে আমাব এখানে চলে আসুন।'

রাত সাড়ে নটা নাগাদ ওরা মুক্তি পেল। পুলিশ অফিসাব লুসাকাদের প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন। যেহেতু এ ব্যাপারে ওবা কোনভাবেই জড়িত নয তাই ওদের প্রসঙ্গ কোথাও তুলবেন না বলে কথা দিলেন। সেই রাত্রেই কলেজেব অফিসঘব খুলিয়ে খাতা থেকে বিমল সেনেব ঠিকানা বাব কবা হল। অফিসাব সতর্ক করে দিলেন যেন এই ব্যাপাবটা মেয়েরা হোস্টেলে ফিরে গিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা না করে।

প্রিন্সিপাল সুপারকে বললেন, 'ওদেব সঙ্গে আপনি ফিববেন না, কিন্তু দারোযানকে বলুন ওদেব হোস্টেলে পৌঁছে দিতে। অনেক রাত হয়ে গিয়েছে।'

দীপা বলল, 'স্যাব, এখান থেকে হোস্টেল বেশী দূরে নয়, এটুকু পথ আমরা নিজেবাই যেতে পারব।'

প্রিন্সিপাল অবাক হলেন, 'তোমাদেব অস্বস্তি হবে না?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। তিনজনে গল্প কবতে করতে চলে যাব।'

সুপারেব ইচ্ছে ছিল না কিন্তু দীপা লুসাকাদেব নিযে বেরিয়ে এল। রাস্তা নিঝুম। কসমস রেস্টুরেন্টেব সামনে ফাঁকা। দীপাব মনে হল এই কলকাতা অন্যবকম। হোস্টেলে চলে আসতে একটুও অসুবিধে হল না। শুধু বসন্ত কেবিনের সামনে দাঁড়ানো তিন জন প্রৌঢ় চাপা গলায় কথা বলেছিল। তারা হাঁ কবে ওদের দেখল। পেবিযে আসাব সময় কানে এল, 'দিনকাল কি হল, অ্যাঁ! মেয়েছেলে রাতদুপুরে চরতে বেবিয়েছে! আর কত কি দেখব!' দীপা কিছু বলল না। ওর ঘুম পাচ্ছিল। মাথা আড়ষ্ট হয়ে আসছিল।

যাহোক কিছু মুখে দিয়ে নিজেব বিছানায় চলে এল সে। চা-বাগানে থাকতে মনোরমা এবং অঞ্জলিব শেখানো কিছু অভ্যেস এখনও বয়ে গিয়েছে। বাইরের জামাকাপড়ে বিছানায় শোয়া নিষেধ ছিল। এইটে দীপা আর মানছে না। কিন্তু রাত্রে ঘুমাবার সময় কাচা জামাকাপড না পবলে অস্বস্তি হয়। হোস্টেলে কেউ সকালের বাসি কাপড় ঘুম থেকে উঠেই ছেড়ে ফেলে না। সেটা কলেজে যাওয়ার আগে স্নানের সময় করে। কিন্তু এই স্নানটা দীপা

সেরে নেয় ঘুম থেকে উঠেই। ফলে বাসি কাপড়ের ঝামেলা বইতে হয় না। দরজা বন্ধ করে কাপড় পাল্টানোর সময় তার মনে হল স্নান করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এখন শরীর একদম বইছে না। টেবিলের ওপর নজর পড়ল। একটা খাম। চিঠি নিশ্চয়ই বিকেলে ডাকে এসেছিল, তারা বেরিয়ে যাওয়ার পর দারোয়ান এখানে রেখে গিয়েছে।

বিছানায় বসে খাম খুলল দীপা। হাতের লেখা চেনা লাগছিল, চিঠির নিচে নাম দেখে সে থমকে গেল। মনোরমা। আজ অবধি কখনও ঠাকুমা তাকে চিঠি দেননি। গোটা গোটা অক্ষরে সুন্দর করে নাম ঠিকানা লেখা। খামের ওপর ঠিকানা লেখা দেখে সে বুঝতে পারেনি অভ্যস্ত না থাকায়। এখন ভাল লাগল। চিঠি পড়া আরম্ভ করল দীপা সেই ভাল লাগা নিয়ে। 'পরমা স্নেহাস্পদা মা দীপা, আশা করি ঈশ্বর তোমাকে সর্বাঙ্গীন কুশলে রাখিয়াছেন।' দীপা হেসে ফেলল। এই বাংলায় ঠাকুমা যদি কথা বলতেন তাহলে কেমন হত ? কেন বাঙালিরা কথা বলা আর চিঠি লেখার ভাষা আলাদা করত ? সে মনোরমার মুখখানা মনে করে মাথা নাড়ল। 'সর্বদা শরীরের প্রতি যত্ন রাখিও। তোমার শিক্ষাগ্রহণে যেন কোন ত্রুটি না হয়। তোমার বয়সের যুবতীর নিকট নানান প্রলোভন আসিবে। কলিকাতা শহরের এই ব্যাপারে অত্যন্ত দুর্নাম আছে। কিন্তু তোমাকে সততার সহিত দিন অতিবাহিত করিতে হইবে। তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবতী তাই পড়াশুনার সুযোগ পাইয়াছ। আমার তো সারাজীবন পোড়া কপালের দাগ লইয়াই থাকিতে হইল। ঈশ্বর তোমাব আরও মঙ্গল করিবেন।

এই পত্র পাইয়া নিশ্চয়ই তুমি খুব অবাক হইয়া গিয়াছ। তোমাকে পত্র লিখিবার এক.. বিশেষ কারণ আছে। বউমা নতুন জমিতে বাড়ি তৈরী করিযাছেন, এই খবব এখানকার সবাই জানে। বড় সাহেবের কানে সেই খবর তুলিয়া দিবার মানুষের তো অভাব নাই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন আগামী মাসের প্রথম তারিখের মধ্যে এই কোয়ার্টার্স আমাদের খালি করিয়া দিতে হইবে। যেহেতু বাসস্থানের সমস্যা নাই তাই তাঁহার এই আদেশ। অবশ্য তিনি জানাইয়াছেন যে অমরনাথের কন্যা অথবা পুত্র যদি কখনও চাকরিপ্রার্থী হয় তাহা হইলে সে চাকরি পাইবে। তুমি চাকরি করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, তোমার ভ্রাতারা এখনও উপযুক্ত হয় নাই, এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোয়ার্টার্স ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে।

এদিকে বাড়ি বাসযোগ্য করিতে যে অর্থ খরচ হইয়া গিয়াছে তাহা অঞ্জলি পূর্বে কল্পনা করে নাই। ওইসব স্থানে কিছুদিন পূর্বেও শিয়াল চরিত। জঙ্গল বলিয়া কেহ ওইদিকে যাইত না। পাকিস্তানের লোকেরা আসিয়া ওই স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করিলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু শ্মশানের নদীর জল পেটের পক্ষে খুব খারাপ। তোমার মা একটি কুয়া তৈরি করাইয়াছে। কিন্তু একটু বৃষ্টি হইলেই কুয়ার জল উপরে উঠিয়া আসে। আমার পেটে ওই জল সহ্য হইবে না। তোমার মায়ের ইচ্ছা একটি গভীর নলকূপ খনন করানো। কিন্তু তাহার হাত এই মুহূর্তে প্রায় শূন্য। ওই বাড়িতে যাওয়ার পর সংসার চালাইবার চিন্তায় সে উন্মাদ-প্রায়। আমার কাছে সঞ্চিত যাহা ছিল তাহা তোমার মাকে দিয়াছি। কিন্তু গরিব বিধবার সঞ্চয় আর কি হইতে পারে।

এইরকম পরিস্থিতিতে তোমাকে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেছি। তুমি তোমার পড়াশুনা চলাকালীন সময়ের জন্য সমস্ত খরচ আগাম লইয়া গিয়াছ। আগামী বৎসর যে টাকা খরচ হইবে তাহা এই মুহূর্তে তোমার নিশ্চয়ই প্রয়োজন নাই। তুমি বলিয়া গিয়াছ উপার্জন শুরু করিলে ওই টাকা ফিরাইয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইবে। তাই তোমায় লিখি, অবিলম্বে তিন হাজার টাকা তোমার মায়ের নামে ওই সঞ্চয় হইতে তুলিয়া পাঠাইয়া দাও।

এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই তোমার বাবার অফিসের পাওনা টাকা আদায় হইয়া যাইবে। তখন তোমার মা আবার ওই টাকা তোমার কাছে পাঠাইয়া দিবে। ইহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবার কথা নয়। আশা করি, তুমি আমার এই কথার মর্ম বুঝিবে।

যদি তুমি পত্রপাঠ টাকা পাঠাও তাহলে পুরানো ঠিকানায় পাঠাইও। আমি বিশ্বাস করি তুমি বিলম্ব করিবে না। আমরা অত্যন্ত কষ্টে বাস করিতেছি। অর্থাভাব কি জিনিস তাহা এমন করিয়া কখনও উপলব্ধি করি নাই। আমার শরীর এবং মন বিন্দুমাত্র ভাল নাই। তোমাকে ছাড়া আর কাহাকে এইসব কথা লিখিব!

তোমার অনেক উন্নতি হোক, দিবারাত্র ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি। তোমার মা নিচু হইয়া তোমাকে পত্র লিখিবেন না। তাহার কাছে সব শুনিয়া আমি এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি তুমি বিরক্ত হইতেছ না।

তোমার কুশল সংবাদ জানিতে পারিলে আমি এবং তোমার মা খুশি হইব। ইতি, আশীর্বাদিকা, তোমার ঠাকুমা।'

চিঠিটা পড়ে পাশে রেখে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল দীপা। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তার। শরীর আনচান করছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এই চিঠি মনোরমা লেখেননি। কেউ তাঁকে বলে গিয়েছে—এবং তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন। অঞ্জলির কণ্ঠস্বর যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সে। কিন্তু দীপা চিঠিটা তুলে নিল চোখের সামনে। অমরনাথ বেঁচে থাকলে কি করতেন? আড়ষ্টতা সরিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

কদিন ধরে বিমল সেনের গ্রেপ্তার এবং গ্লোরিয়ার মৃত্যু নিয়ে কলেজে খুব হইচই হয়েছিল। কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের প্রাবল্যে সেসব চাপা পড়ে যেতে দেরি হয়নি। বিধানচন্দ্র রায়ের বিরোধীরা সম্ভবত এই প্রথম একত্রিত হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন পশ্চিমবাংলায়। খাদ্যের দাবিতে ট্রামবাস পুড়ল, কিছু মানুষ মারা গেল। ছাত্ররা চিরকালই সরকার বিরোধী হয়। বামপন্থী ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকল। কদিন কলকাতায় রাজপথে সংঘর্ষ চলল। তারপর যে কে সেই। একটা বুদবুদ তুলে থিতিয়ে যেতে লাগল জল।

টাকা পাঠানোর প্রাপ্তি রসিদ ঠিক সময়ে এসেছিল। তারপরে মনোরমার পোস্টকার্ড, 'তুমি যাহা করিলে তাহা কোনকালেই ভুলিব না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।' দীপা কোন চিঠি দেয়নি। অতএব ওখান থেকে কোন চিঠিও সে আশা করেনি। ব্যাপারটা আচমকা ঘটে আচমকাই মিলিয়ে গেল। কলকাতার রাজনৈতিক আন্দোলন, কলেজ বন্ধ, খবরের কাগজের উত্তাপ অনেকটা সময় ঘিরে থাকায় দীপার মন কিছুটা চাপা পড়েছিল। হোস্টেলের মেয়েদের সেই কয়েকটা দিন প্রায় বন্দীদশায় কাটাতে বাধ্য করেছিলেন সুপার। গ্লোরিয়ার মৃত্যুর পরেই অনেকরকম আইনকানুন চালু হয়েছিল। স্বাধীনতা পেতে অভ্যস্ত মেয়েদের মনে যতই অসন্তোষ জমুক কিছু করার ছিল না।

রাজনীতি দীপাকে মোটেই টানে না। আন্দোলনের শুরু এবং শেষ একদম নির্লিপ্ত হয়ে যখন সে দেখছিল তখন মায়া সক্রিয় হয়ে রাস্তায় নেমেছে। মিটিং মিছিল একদিকে অন্যদিকে নাটকের দল করে গিয়েছে একই তালে। দীপা খুব বিস্ময় বোধ করে কিন্তু ওই জীবন তাকে টানে না। আন্দোলন শেষ হয়ে গেলে, জায়গার জল জায়গায় ফিরে এলে সে একদিন মায়াকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি লাভ হল? যখন তোমরা শুরু করেছিলে তখন শেষ জানতে না?' মায়া হেসে ফেলল, 'সত্যি কথা হল, জানতাম। কিন্তু স্বাধীনতার পরে শাসকদের একটা ধাক্কা দেওয়া জরুরি ছিল। ওরা জানল, যা ইচ্ছে তাই করতে পারবে না

আর। দেশের মানুষ বুঝতে পারল ইংরেজদের তাড়িয়ে ফেলেই সব কাজ শেষ হয়ে যায় না। অর্থনৈতিক কাঠামো না পাল্টালে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সেইজন্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত।'

'চলল না কেন?'

'আমাদের শক্তি সীমিত বলে। যদি কখনও কম্যুনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসে তখন দেখবে দেশের মানুষের অবস্থা পাল্টে যাবে।'

'তুমি কি মনে কর বিধানচন্দ্র রায়ের ইমেজ, কংগ্রেসের ইতিহাস ভুলে গিয়ে দেশের মানুষ কম্যুনিস্টদের কখনও ক্ষমতায় আসার সুযোগ দেবে?'

'এখনই হয়তো নয়। কিন্তু একদিন হবেই।'

'কম্যুনিস্টরা এলে সব পাল্টে যাবে?'

'একটা রাজ্য কম্যুনিস্ট পার্টির সরকার হলে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে নিশ্চয়ই কাজ করবে। মুশকিল হল ভারতবর্ষের সবকটি রাজ্য একই মানসিকতায় নেই। হলে অন্যরকম হত। তবে তার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে থাকা বোকামি!'

দীপা জানে এই তর্কের শেষ নেই। কিন্তু ছায়ার বিশ্বাস ওর কাছে সত্যি। আর কেউ যদি বিশেষ আদর্শে বিশ্বস্ত হয়ে কাজ করে যায় তাহলে তার সঙ্গে তর্ক করার কোন মানে হয় না। ছাত্র-ইউনিয়ন করার দৌলতে মায়ার একটাই সুবিধে হয়েছে। সবাই দূর থেকে ওকে নিয়ে নানান গালগল্প করে বটে কিন্তু সামনাসামনি কেউ ঘাঁটায় না। একটি সুন্দরী মেয়ে সমস্ত নিয়ম ভেঙ্গে মাথা তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর সঙ্গলোভী ছেলের দল অথবা ছিদ্রান্বেষীরা ওকে এড়িয়ে যায়। সাধারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে ওরা কিন্তু সাহসী হয়। হয়তো মায়ার সম্পর্কে কোন রহস্য কেউ বোধ করে না বলেই অক্ষমতা ঢাকতে এড়িয়ে যাওয়া সুবিধে বলে মনে করে।

অসীমের সঙ্গে চেষ্টা করেও দীপা কথা বলতে পারেনি। সাধারণত যেখানে অসীম তার জন্যে অপেক্ষা করত সেখানে ভুলেও আসে না। তাছাড়া ফাইনাল ইয়ারের ছেলেরা আর নিয়মিত কলেজে আসছে না। ওদের পরীক্ষার দেরি নেই। অতএব কলেজে দেখা হবার জন্যে মন ছটফট করত। সেই সময় অসীম তাকে এড়িয়ে গিয়েছে। দেখা করার বাসনাটা প্রায় জেদে পৌঁছে যাচ্ছিল দীপার। সে ঠিক করেছিল ঠিকানা যোগাড় করে অসীমের বাড়িতে চলে যাবে। এখন পর্যন্ত কলকাতাতেও কোন সহপাঠিনীর ছেলেদের বাড়িতে একা যাওয়ার চল নেই। কিন্তু ছাত্র আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির জন্যে শহরটার অবস্থা পাল্টে যাওয়ায় যে কদিন সময় চলে গেল তার মধ্যেই ওই জেদটা মরে গেল। বরং তার মনে হতে লাগল কেউ যদি তাকে এড়িয়ে যেতে চায় তাহলে তার পেছনে ধাওয়া করা অত্যন্ত বোকামি। আত্মসম্মান থাকলে কোন মানুষ সেটা করতে পারে না।

কিন্তু অসীমের কথা ভাবলেই তার কষ্ট হয়। এসব কথা বলার মতো বন্ধু তার কেউ নেই। এখন পুরনো ঘরে ফিরে গিয়েছে সে। তার নতুন রুমমেট এসেছে। মেয়েটির নাম শান্তা। হোস্টেলে জায়গা পায়নি বলে এতকাল এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিল। মেয়েটির নামের সঙ্গে স্বভাবের মিল খুব; এবং বাঙালি মেয়েদের যে স্বভাব সচরাচর দেখা যায় সেটা ওর মধ্যে একদম নেই। অকারণে কৌতূহল দেখায় না, অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোন প্রশ্ন করে না। দীপার পক্ষে ব্যাপারটা ভালই হয়েছে। কলেজে মায়ার সঙ্গে একধরনের বন্ধুত্ব তার আছে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত কথা বলার নয়। বরঞ্চ ব্যক্তিগত কথা বলা যায় মায়ার মায়ের সঙ্গে। এখন মাসে একবার ওঁর কাছে যায় দীপা। একদিন গল্প করার সময়

সে বলে ফেলল, 'জানেন মাসীমা, আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত।'

মায়া যথারীতি বাড়িতে নেই। পাশের ঘর থেকে তামাকের গন্ধ ভেসে আসছে। মায়ার মা বললেন, 'ওরে বাবা। তোমাদের আমলের সমস্যা কি আমি বুঝতে পারব? অবশ্য আমার শুনতে আপত্তি নেই, তুমি বলতে পারো।'

অসীমের সঙ্গে পরিচয়ের পরে যা ঘটেছিল প্রায় অকপটেই দীপা বলে গেল। প্রথম দিকে তার কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু মাসীমার মুখটা যখন বন্ধুর মত হয়ে গেল তখন আর আটকালো না। পুরোটা শুনে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা পরিষ্কার বল তো, তুমি কি ছেলেটাকে ভালবাসো?'

দীপা জানতো এই প্রশ্নটা তাকে শুনতে হবে। সে নিচু গলায় বলল, 'বিশ্বাস করুন মাসীমা, ওর সঙ্গে যতদিন দেখা হত কোনরকম প্রতিক্রিয়া হয়নি। ওকে একজন ভাল বন্ধু বলেই মনে হত। এমন কি ও যখন আমার সঙ্গে শিলিগুড়িতে গিয়েছিল তখনও আমি ওর জন্যে কোনও টান অনুভব করিনি।'

'এখন?'

দীপা জানলার দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল, 'আমার শুধু মনে হচ্ছে ও আমাকে ঠিক বুঝতে পারেনি। ও বিশ্বাস করতে চাইছে না আমার বিয়ে হয়েছিল।'

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন 'ওকে বিশ্বাস করানোর জন্যে তুমি এত ব্যগ্র কেন?'

দীপা চুপ করে রইল। মাসীমা হাসলেন, 'তোমার উচিত এখন ওর সঙ্গে দেখা না করা। ভালবাসা এমন জিনিস লুকিয়ে রাখা যায় না নিজের কাছে। অনেকটা পক্সের মতো, ওষুধ খেলেও চামড়ায় ফুটে বের হবেই। তেমনি নিজেই টের পেতে তুমি। বরং, এই ব্যাপারটা এখন যেমন চলছে চলুক। সময় বয়ে যেতে দাও। যদি তোমার ভেতর কিছু তৈরী হয়ে থাকে তাহলে সময় চলে গেলেও সেটা মুখ তুলবে। তোমার সম্পর্কে ওর আগ্রহ কতটা সত্যি সেটাও বুঝতে পারবে তখন।'

এসব কথা দীপার অজানা ছিল না। কিন্তু মাসীমার সঙ্গে কথা বলার পর মন বেশ শান্ত হল। জানা জিনিসই অন্যের মুখে বন্ধুর মত শুনতে পেলে আর এক রকম মানে তৈরি হয়। হয় তো নিজের মন যা ভাবছে সেটা সঠিক কিনা তাতে একটা গোপন সন্দেহ থাকে। অন্যের সমর্থন পেলে এক ধরনের স্বস্তি তৈরী হয়। এই কারণে মানুষের জীবনে একজন বন্ধুর দরকার। তার জীবনে তেমন কোন বন্ধু ছিল না, মাসীমা আজ সেই কাজটা করলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, 'তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি বড্ড ভাবো। এটা তোমার স্বভাব। মায়াকে নিয়ে আমি তো কোন দুশ্চিন্তা করি না। ও যা করছে তা বাঙালি মেয়েরা করে না। তাই ধরাবাঁধা নিয়মে ওকে বেঁধে কি লাভ? আমার আত্মীয়স্বজনরা এ নিয়ে কম কথা বলছেন না। ওদের মতে মেয়েটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি তবু মায়াকে কিছু বলছি না। এত ছেলের সঙ্গে মিশছে, কাউকে মন দিয়েছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করিনি।'

'আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

'কি বলেছিল?'

'বলেছিল, মন নেবার মত যোগ্যতা কারো থাকলে তবে দেবার কথা ওঠে।'

'বোঝ। এ মেয়েকে আমি কি বোঝাব। ওরে কি জানো, আমাদের এই সমাজব্যবস্থায় নিয়মের বাইরে গিয়ে বেশিদিন নিজেকে ঠিক রাখা মুশকিল

মনের বোঝা অনেকটা কমে গিয়েছিল মাসীমার সঙ্গে কথা বলে। হালকা হয়ে হোস্টেলে

ফিরে এসেছিল দীপা। এসে দেখল সুভাষচন্দ্র একজন বয়স্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন। দীপা দাঁড়িয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারছিল আর একটা ঢেউ উঠতে চলেছে। নিজেকে শক্ত করার চেষ্টা করছিল সে প্রাণপণে।

॥ ৩৯ ॥

সুভাষচন্দ্র এগিয়ে এলেন। তাঁর ভাবভঙ্গীতে বেশ ব্যস্ততা ফুটে উঠেছে, 'দীপা মা, আমরা অনেকক্ষণ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। দ্যাখো, কে এসেছেন ?'

অনুমান তীব্রতর হচ্ছিল কিন্তু মুখে কিছু বলল না দীপা। সুভাষচন্দ্র তার দিকে তাকিয়ে কি বুঝলেন তিনিই জানেন, বললেন, 'আচ্ছা! আমরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা না বলে যদি ভেতরে গিয়ে গেস্টরুমে বসি তাহলে কি অসুবিধে হবে ?'

'আসুন।' দীপা মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকল। গেস্টরুমে আর একটি মেয়ের বাড়ির লোকেরা এসেছেন। এ কেমন আছে ও কি বলল সেসব কথা চলছে। দীপা কোণের দিকে তিনটে চেয়ার টেনে নিল।' সুভাষচন্দ্র ভদ্রলোককে নিয়ে তার দুটিতে বসলেন। দাঁড়িয়ে রইল দীপা। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'তোমার মায়ের সঙ্গে এর আগের দিন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তোমাকে নিতে যেদিন এসেছিলেন সেদিনই কলকাতায় গোলমাল শুরু হয়েছিল। তারও পরে দুবার এসে তিনি তোমাব দেখা পাননি।'

দীপা মাথা নাড়ল, এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। হঠাৎ সেই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর দুটো হাত দীপার দিকে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল, 'মা গো!' গলায় জমাট কান্না যা ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও পারছে না। ঘরের ওপাশে যাঁরা কথা বলছিলেন তাঁদেব সংলাপ আচমকা থেমে গেল। দীপা চাপা গলায় বলল, 'আপনি এমন কবছেন কেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে কান্নার সঙ্গে মিশে শব্দগুলো বেরিয়ে এল, 'ওরে, আমাকে তুই তুমি বল। আমি তোর জন্মদাতা বাবা। সারাজীবন জ্বলেপুড়ে মরছি পরিতাপে।'

এখন আর কিছু করার নেই। এই শব্দগুলো গেস্টরুমে বসে থাকা হোস্টেলের মেয়েটিব কানে না যাওয়ার কোন কারণ নেই। অতএব আজ রাত্রে হোস্টেলে যে গল্প চালু হবে তা কাল ছড়িয়ে পড়বে সমস্ত কলেজে। দীপা নিজেকে গুটিয়ে নিল, 'আপনি বসুন, নইলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন।'

ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে গেলেন। কিছু বুঝতে না পেরে সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকালেন। সুভাষচন্দ্র তাঁর হাত ধরে আবার বসিয়ে দিলেন। জামার হাতায় চোখ মুছলেন ভদ্রলোক, 'আমি যে কিভাবে তোমার কাছে মুখ দেখাবো ভাবতে পারিনি।'

'আপনি যখন এসে গিয়েছেন তখন আর এসব কথা কেন ?' সুভাষচন্দ্র বাধা দিলেন, 'মানুষ যা ভুল করে তা যদি নিজেই সংশোধন করে নেয় তাহলে সব সমস্যা মিটে যায়। আপনি সংশোধন করুন।'

'তা করতেই তো এলাম। তুই আমার সঙ্গে চল মা।'

'কোথায়।'

'আমার বাড়িতে। রাজকন্যার মত রাখতে পারব না হয়তো কিন্তু যত্নের অভাব হবে না।'

'আমি তো এখানেই ভাল আছি।'

'হোটেল মেসে কি ভাল থাকা যায় ? তার ওপর পাঁচ জাতের মেয়ের সঙ্গে থাকা। কে

একজন খুন হয়েছে বেলেল্লাপনা করতে গিয়ে তার জন্যে নাকি তোকে পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে। না, না, এখানে থাকার দরকার নেই। পড়াশুনা করতে হয় আমার কাছে থেকে নিশ্চিন্তে করবি।' খুব আন্তরিক গলায় কথাগুলো বললেন ভদ্রলোক।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি ঠিক আছি।'

'কিন্তু আমি যে তোর বাবা। বাবার মনের অতৃপ্তি দূর করবি না মা ?'

'কিছু যদি মনে না করেন তাহলে একটা প্রশ্ন করব ?'

'একটা কেন ? তুই মা আমাকে হাজারটা প্রশ্ন কর।'

'আজ মামা যদি আপনাকে না নিয়ে আসতেন তাহলে আমি কি করে বুঝতে পারতাম আপনি আমার বাবা ? রাস্তায় দেখা হলে কি আপনি চিনতে পারতেন ?'

থমকে গেলেন ভদ্রলোক। অবাক হয়ে তিনি সুভাষচন্দ্রের দিকে তাকালেন। তারপরে হঠাৎই কথা খুঁজে পেলেন, 'আমি চিনতে পারতাম। তোর মুখে তাঁর মুখ বসানো। চোখ পড়লে আমার কিছুতেই ভুল হত না। এমনকি চাহনিটাও তোর মায়ের কাছ থেকে পেয়ে গেছিস।'

'কিন্তু আমি আপনাকে চিনতে পারতাম না।' দীপা হাসার চেষ্টা করল, 'আজ আপনি এসেছেন। নিশ্চযই খারাপ লাগছে না আমার। মাঝে মাঝে দেখা করতে যাব। কিন্তু আমি এখন যে জীবনযাপন করছি তা থেকে সরে যেতে বলবেন না আমাকে।'

'তুই বাবার প্রাণে শান্তি দিবি না মা ?'

'শান্তি ? আমার অবস্থাটা বুঝুন। আপনারা আজ এতদিন বাদে এসে বলছেন বলে আমি জানছি আপনি আমার জন্মদাতা। জ্ঞান হবার পর কেউ সে-কথা বলেনি। হতে পারে এটা সত্যি। আমি তো আপনাকে কখনও চোখে দেখিনি।'

সুভাষচন্দ্র চুপচাপ শুনছিলেন। এবার বললেন, 'একি কথা বলছ দীপা মা। সন্তান কি কখনও জন্মদাতা বাবার পরিচয় নিজে জানতে পারে ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'সে জেনে নেয়। এই শিক্ষা সে অনুভূতি দিয়ে আবিষ্কার করে। এত বছর পরে হঠাৎ চাপিয়ে দিলে— ।'

সুভাষচন্দ্র থামিয়ে দিলেন, 'তুমি নিশ্চযই অস্বীকার করবে না যে তুমি জানো না তোমার মা জন্ম দিয়েই মারা গিয়েছেন, তোমার বাবা বিবাগী হয়ে গিয়েছিলেন। অঞ্জলি আর অমরনাথ তোমাকে সেইদিন থেকে পালন করেছিল ?'

'হ্যাঁ। আমি জানি। কিন্তু অনেক পরে আমি জেনেছি।'

'তাহলে ? এঁর কষ্ট তুমি বুঝতে পারছ না কেন ?'

'পারছি না। কারণ আমি মনে করি শুধু জন্ম দিলেই বাবা বা মা হওয়া যায় না। একদিনের শিশুকে যিনি ফেলে চলে গিয়েছিলেন তাঁকে আমি শুধু ওই কারণে বাবা বলে ডাকতে পারব না। সন্তানকে যিনি লালন করেননি, তার বোধ-বুদ্ধির উদয়ের সময়ে যিনি নিজের অভিজ্ঞতা দান করেননি তিনি কিছুতেই সেই সন্তানের বাবা হতে পারেন না। আমার কাছে অন্তত নয়।'

'তুমি খুব পাকা পাকা কথা বলছ দীপা !' সুভাষচন্দ্র বিরক্ত হলেন।

'কথাগুলো বলার জন্যে আমি আপনার কাছে যাইনি মামা, আপনারা এসেছেন বলেই বলতে বাধ্য হচ্ছি। হতে পারেন ইনি আমার জন্মদাতা কিন্তু এঁকে দেখে আমার মনে একটাই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।' দীপা ঠোঁট কামড়াল।

সুভাষচন্দ্র ভদ্রলোকের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারণ করলেন না।

দীপা সামান্য অপেক্ষা করে বলল, 'ইনি হয়তো আমার জন্ম দিয়েছেন কিন্তু সেই আমি যে এই আমি তাও ইনি জানতেন না। এঁকে আমি কি করে বাবা বলব ? বাবা হবার জন্যে ইনি কি করেছেন ? আমি যাঁকে বাবা বলে মনে করি তিনি কিন্তু সেই কাজটা করে গিয়েছেন।'

সুভাষচন্দ্র কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ঠিক কথা। একশবার ঠিক কথা।'

তখন বুঝিনি কিন্তু এখন স্বীকাব করতে লজ্জা নেই আমি অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছি। তোমার জননী মারা যাওয়ামাত্র মনে হয়েছিল পৃথিবীর সব আলো মুছে গিয়েছে। কোনরকম ভাবনা চিন্তা না কবে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তারপব কিভাবে ভাসতে ভাসতে আবার ঈশ্বরের ইচ্ছায় নতুন জীবন শুরু করলাম সেটা অন্য কথা। কিন্তু যা সত্যি তা হল আমি আমার কর্তব্য করিনি। মা, এব জন্যে তুমি যে শাস্তি দেবে তা আমি মাথা পেতে নেব।' ভদ্রলোকের গলার স্ববে কান্না জমছিল।

নিজেকে সংযত রাখা দীপাব পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সে বলল, 'আপনি এভাবে কথা বলবেন না। আমি তো একটু আগে বললাম, কলকাতায যতদিন আছি মাঝে মধ্যে দেখা করব।'

'তুই আমাকে বাবা বলে ডাকবি না মা ?'

'আমাকে ক্ষমা করবেন। দ্বিতীয় কোন মানুষকে আমি বাবা বলতে পাবব না।'

'ও।' ভদ্রলোক থতমত হয়ে গেলেন। কিন্তু সেটা সামলে নিলেন চটপট, 'বেশ তাহলে তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি। অমরনাথ কি পিতার কর্তব্য করেছে ?'

'নিশ্চয়ই। এই আমি এখানে পৌঁছেছি ওঁরই সাহায্যে।'

'হুঁ। কিন্তু ওই অল্প বয়সে নিজেব ঘাড় থেকে নামাতে তোব বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল অমরনাথ। আমি পাবতাম ? সত্যিকারেব কোন বাবা পাবত ?'

'উনি নিশ্চয়ই আমাব ভাল কবতে চেয়েছিলেন। জেনেশুনে আমার ক্ষতি করেছেন এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারব না।'

'তোমাব হোস্টেলে পিতৃপরিচয় না শ্বশুরবাড়িব পবিচয় দিয়েছ ?'

'কেন ?' দীপা অবাক হল।

'সেইটে জানা দবকার।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমার উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায। বিয়েব আগে আমি মুখোপাধ্যায ছিলাম। বাবা হয়তো সংস্কারের জন্যেই বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন আমাব ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এ-বিষয়ে আপনার কৌতূহল কেন ?'

'যদি বন্দ্যোপাধ্যায় লেখ তাহলে তো চুকেই গেল-। মিথ্যে কিছু লিখছ না। তুমি কেন কোনদিন বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করোনি, বুঝতে পারছি না। আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী বলে মনে হচ্ছে তোমাকে। অমরনাথের পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়। সে ছিল আমাব ভায়রাভাই। আমার পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মেয়েকে পালন করেছিল অমরনাথ। কিন্তু জন্মসূত্রে যাব পদবী হওয়া উচিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে সে কোন সাহসে মুখোপাধ্যায করে দেয় আমি জানি না। তোমাকে নিশ্চয়ই দত্তক নেয়নি অমরনাথ ? জন্মসূত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় আবার বিয়ের পরেও তাই। তোমার পদবী বদল হয়নি। কি বল ?'

অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিল দীপা। এবার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি চান ?'

'বাবা মেয়ের কাছে কি চাইতে পারে মা ? তুই আমার কাছে চল, ওখানে গিয়ে থাকবি।'

'অসম্ভব।'

'কেন ?'

'আমার এখানে কোন অসুবিধে হচ্ছে না।'

'পড়াশুনা থাকার খরচ কে চালাচ্ছে? যা শুনলাম তাতে অমরনাথের পক্ষে তো এত সব দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব ছিল না। অঞ্জলির অবস্থাও এখন ভাল নয়। তুই কি শ্বশুরবাড়ির টাকা পেয়েছিস হাতে ?'

'আপনি এ ব্যাপারে অযথা চিন্তা করছেন।'

এবার সুভাষচন্দ্র কথা বললেন, 'প্রসঙ্গ যখন উঠল তখন বলি। তোমার শ্বশুর মারা যাওয়ার পর শুনেছি ওঁর কোন আপনজন বিষয়সম্পত্তি দখল করতে পারেনি। যদ্দিন তুমি বেঁচে থাকবে তদ্দিন আইনসঙ্গত অধিকার তোমার থাকবে। হয় তোমাকে লিখিতভাবে কাউকে দান করতে হবে নয় নিজেই ভোগ করবে। এ নাহলে পড়ে থাকতে থাকতে একসময় সবকিছু সরকারের হয়ে যাবে। তোমার কি মনে হয় সেইটে খুব কাজের কাজ হবে।'

'মামা, এ ব্যাপারে বাবার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। আমি আর ও বাড়ির কিছুতেই একদম আগ্রহী নই।' দীপা গম্ভীর মুখে জানাল।

'কিন্তু সে-সব তো তোমারই। আচ্ছা, তুমি আমাকে একটা লিখিত অধিকার দাও যাতে আমি সেখানে গিয়ে সব কিছুর সুন্দর বিলিব্যবস্থা করে আসতে পারি।'

'তার মানে ?'

'সরকারি গহ্বরে না গিয়ে জমি টাকা গয়না যা যেখানে আছে সব যাতে যোগ্য পাত্রে পড়ে তার আয়োজন করা আর কি।'

'যোগ্য পাত্র মানে ?'

'যাদের কাছে তোমার কোন ঋণ আছে যা চেষ্টা করলেও শোধ করা যায় না। যেমন ধর অঞ্জলি আর অমরনাথের মা। ওরা তোমাকে পরম মমতায় মানুষ করেছে। সেই সময় যদি ওরা না এগিয়ে আসত তাহলে তোমার কি হত কে বলতে পারে!' চোখ বন্ধ করলেন সুভাষচন্দ্র, 'অঞ্জলির কাছে তোমার এক মাস্টারের কথা শুনেছিলাম। খুব সাহায্য করেছেন ভদ্রলোক। তিনি কি মারা গিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ।' দীপা ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতেই পারছিল না।

'গরীব মাস্টারের স্ত্রী তো আছেন। তোমার গুরুপত্নী। তাঁকে কিছুটা দিতে পার। তাছাড়া তোমার জন্মদাতার পরিবারে, যাঁদের রক্ত তোমার শরীরে রয়েছে, যে ঋণ হাজার চেষ্টা করেও কখনও শোধ করা যায় না, তাঁদের দিলে ভগবান খুশি হবেন।'

সুভাষচন্দ্র থামতেই ভদ্রলোক বললেন, 'না, সুভাষ, এখানে থেমো না। মামা হিসেবে তুমি কম করোনি। তাছাড়া এই বিলিব্যবস্থা করতে তোমারও কম পরিশ্রম হবে না। দীপা মায়ের উচিত তোমাকেও কিছু দেওয়া।'

সুভাষচন্দ্র একটু লজ্জিত ভঙ্গী নিয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়েও থেমে গেলেন। তাঁর মুখভাবে ফুটে উঠল, সবাই মিলে তাঁকে নিতে অনুরোধ করলে তিনি আর কিভাবে না বলতে পারেন। এতক্ষণে দীপা একটু স্বস্তি পেল। যে সম্পত্তি তার নয় তা দান করবার অধিকার সে পাবে কি করে—এমন কথা বললে এঁরা শুনবেন না। কিন্তু এটাও ঠিক অঞ্জলি, মনোরমা প্রচণ্ড অর্থকষ্টে আছেন। মনোরমার চিঠির প্রতিটি শব্দ তার মনে আছে। এসব করলে যদি ওঁরা একটু ভাল থাকেন তাহলে তার কি ক্ষতি।

দীপা চুপ করে আছে দেখে সুভাষচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁ রে, প্রতুলবাবুর

স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ কত তা কি তুই জানিস ?'

'না। কখনও আগ্রহ বোধ করিনি।'

'দশ বারো লক্ষ টাকা বলে শুনেছিলাম।' সুভাষচন্দ্র তাঁর ভগ্নিপতির দিকে তাকালেন,

'ওরে বাবা।' ভদ্রলোক বললেন, 'এত ?'

'হুঁ।' সুভাষচন্দ্র মাথা নাড়লেন, 'তাহলে তুই কি বলিস ?'

'আমার তো কিছু বলার নেই। যা বলার আপনারাই বলছেন।'

'তুই বড্ড ক্যাট ক্যাট করে কথা বলিস। আমরা ছাড়া তোর আর কে আছে ? আচ্ছা, ধরে নিলাম অমরনাথ তোর কাছে বাবার মত ছিল কিন্তু এখন তো নেই। এখন আমরাই তোর নিকট আত্মীয়। আমরা যদি তোকে ভাল উপদেশ না দিই কে দেবে ?'

দীপা হাসল, 'আমাকে কি করতে হবে ?'

সুভাষচন্দ্র খুশি হলেন, 'আমি একটা ওকালতনামা নিয়ে আসব তাতে তুই সই করে দিবি। আমি জলপাইগুড়িতে গিয়ে সব কিছু উদ্ধার করব। তারপর না হয় ডিড অফ গিফ্‌ট তৈরী হবে।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'উকিল জানাশোনা আছে ?'

'প্রচুর। আমি উকিলকে দিয়েই কাগজপত্র করিয়ে নেব।'

'তাহলে চার ভাগ হবে ?'

'চার ? না, না, মাস্টারের বউকে সমান সমান ভাগ কেন দেওয়া হবে। এই ধরুন, তিরিশ তিরিশ তিরিশ আর দশ। এইরকম ! কি রে দীপা ?'

দীপা চুপ করে রইল। সেইটে দেখে সুভাষচন্দ্র বললেন, 'ওই যা ! বয়স হলে মানুষের মাথা ঠিক কাজ করে না। ভাগ হওয়া উচিত, চারটে সাড়ে বাইশ করে আর একটা দশ। তাহলেই যুক্তিযুক্ত কাজ হবে।'

ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন, 'চারটে সাড়ে বাইশ কেন ?'

'আমরা দুজন, অঞ্জলি আর দীপা। ওর নিজের জন্যে তো একটা অংশ থাকা দরকার। পরে ও তাই নিয়ে যা খুশি করতে পারবে। যদি কাউকে দিয়ে দিতে হয় ওই দেবে। আমার কাছে কোন অবিচার পাবেন না।' সুভাষচন্দ্র মাথা দোলালেন।

দীপা হাসল, 'আপনি মিছিমিছি এত চিন্তা করছেন। আমার জন্যে কোন ভাগ রাখতে হবে না। মা-ঠাকুমার জন্যে যে ভাগটা করছেন সেটাই বাড়িয়ে দিন। এবার যা করণীয় করে আমার কাছে নিয়ে আসবেন আমি সই করে দেব।'

'ও। তুই যা ভাল মনে করছিস তাই হবে। অমরনাথের কাছে দেখছি তুই এইটে পেয়েছিস। নিজের ভবিষ্যতের কথা একদম ভাবিস না। হিন্দুঘরের বিধবা, টাকা পয়সা থাকলে তারা দুর্গে বাস করে। কেউ কাছে ঘেঁষতে সাহস পায় না। যাক, যা ভাল বুঝবি তাই করবি। আমরা তোর ভাল চাই বলেই বললাম। ও হ্যাঁ, অঞ্জলির কাছে শুনেছিলাম বন্যাতে নাকি প্রতুলবাবুর বাড়িঘর ধসে পড়েছে। কিছু কি আর সেখানে দাঁড়িয়ে নেই ?'

'কি আছে কি নেই তা আমি জানি না।'

'সেই মেয়েছেলেটাও তো মরে গেছে বন্যার সময় ?'

দীপা জবাব দিল না। আনার মুখ মনে পড়ল। হরদেবকে আনা সবসময় শেয়াল শকুনের সঙ্গে তুলনা করত। হরদেবও কি তার সঙ্গে বাড়ি চাপা পড়ে বন্যার সময় মরে গিয়েছে। কিন্তু কখনও কি হরদেবরা মারা যায় ?

ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা অনেকক্ষণ দীপা মাকে বন্দী করে রেখেছি সুভাষচন্দ্র। এবার

ওঠা যাক। তা দীপা মা, মানলাম তুমি এখানে থাকবে, কিন্তু কথা দিতে হবে নিয়মিত আমায় দেখতে যাবে।'

দীপা উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা এখানে এসে আমায় অনেক কথা বললেন। আমি বোধ হয় তার অনেকটাই মেনে নিয়েছি। তাই না ?'

সুভাষচন্দ্র চেয়ার ছেড়ে সোজা হলেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু নিজের জন্যে কিছু রাখলে না ভাবতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'আপনি তো বললেনই, বাবার কাছ থেকে স্বভাবটা পেয়েছি। যা হোক, প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয় সম্পত্তি আপনারা ভাগাভাগি করে নিন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে আমার যা করণীয় বললে নিশ্চয়ই করব। কিন্তু এর পরে আমার একটা অনুরোধ আছে আপনাদের কাছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। নিঃসঙ্কোচে বল মা।'

'আমি আপনাদের কথা রেখেছি। যা চেয়েছেন মেনে নিয়েছি। কিন্তু তার বদলে আমি আপনাদের কাছে একটা কথা চাইছি।'

'বল।'

'আপনারা আর আমায় বিরক্ত করবেন না। এত বছর যখন আমাকে না দেখে আপনার চলে গিয়েছিল তখন বাকি জীবন স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারবেন। আপনার বাড়িতে যাওয়ার কোন আগ্রহ আমার নেই। আমি তো মামার বাড়িতেও যাইনি। আজ যে প্রয়োজনে আপনারা আমার কাছে এসেছিলেন আমি সেটা মিটিয়ে দিয়েছি। এবার আমাকে আমার মত থাকতে দিন। মামা, শুধু আপনি কাগজপত্র তৈরী করে আমার কাছে আসুন আমি সই করে দেব।' দীপা কথা শেষ করেই উল্টো দিকে হাঁটতে লাগল। দুই প্রৌঢ় বিস্ময়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে যে পারছেন না তাও দেখার প্রয়োজন সে অনুভব করল না। তার কেবলই মনে হচ্ছে সে মুক্ত, একদম মুক্ত। নিজের বিছানায় গিয়ে উপুড় হতেই তার বুক খালি করে বাতাস বেরিয়ে এল।

বিষয় সম্পত্তি মানুষকে নির্লজ্জ করে। বিশেষ করে আর্থিক দুরবস্থায় পড়লে এবং সামনে কোন নির্দিষ্ট উপায় না থাকলে সে অসহায় হয়ে পড়ে। তরুণ বয়সে যা সহনীয় হয় যৌবন পেরিয়ে তা হয়ে দাঁড়ায় পীড়াদায়ক। তখন ডুবন্ত মানুষের পায়ের মত মানুষের মন কিলবিল করতে থাকে একটু শক্ত জমির জন্যে। ন্যায় নীতি স্নেহ ভালবাসা ইত্যাদির ওপর নিজেকে স্তোক দেওয়া পোশাক পরিয়ে দিতে সে মোটেই দেরি করে না। সুভাষচন্দ্রের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না কিন্তু তিনি কখনই সেই অর্থে ডাকাবুকো ছিলেন না। উৎসাহ পেতে শুরু করায় তিনি হয়ে উঠলেন বেপরোয়া। মুখে ভদ্রতার বুলি রেখে দীপাকে দিয়ে সেই-সব কাগজে সই করিয়ে নিয়ে গেলেন যার জোরে তিনি জলপাইগুড়িতে গিয়ে লাঠি ঘোরাতে পারবেন। যা ছিল চার বছর আগে দশ বারো লাখ তা নিশ্চয়ই এতদিনে বেড়ে গিয়েছে অনেক এমন ভাবনায় তিনি বুঁদ হয়ে রইলেন অথচ মুখে সেটা প্রকাশ করলেন না। ভঙ্গীটা ছিল যা করছেন তা পাঁচজনের উপকারের জন্যেই।

জন্মদাতা আর আসেননি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে। এসে বলেছেন, 'কি কথা হয়েছে গো তোমাদের মধ্যে জানি না কিন্তু এখান থেকে যাওয়ার পর থেকেই ওঁর কেবলই দীর্ঘশ্বাস বেরুচ্ছে, খেতে বললে খাচ্ছেন না, রাত্রে ঘুম নেই। মাঝরাত্রে উঠে দেখি জানলা দিয়ে আকাশ দেখছেন।'

'ওঁকে ডাক্তার দেখিয়েছেন ?'

'ডাক্তার ? ডাক্তার কি করবে ? তুমি ওঁকে এখানে আসতে নিষেধ করেছ, আমাদের বাড়িতে যাবে না বলেছ তাই বুকে দুঃখ বেজেছে। আমি কিন্তু তোমাকে জোর করব না।' মহিলা হাসলেন, 'তবে আমি যদি মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে দেখা করি তাহলে কি রাগ করবে ? এই হাতিবাগানের দিকে মাঝেমাঝেই সিনেমা দেখতে আসি তো।'

'দরকার থাকলে আসবেন।'

এবার ওঁরা বেশী সময় নেননি। কিন্তু দীপা বুঝে গিয়েছিল দানপত্র সই না করা অবধি একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ওরা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে যাবে। কিছু করার নেই। কিন্তু দীপা ঠিক করল নিজের জায়গা থেকে তার সরে আসার কোন কারণ নেই। যে যার ইচ্ছে করে যাক।

একমাত্র পড়াশুনা ছাড়া যার অন্যকিছু করার ছিল না। তাকে আজকাল দুটো চিন্তা নিয়ত খুঁচিয়ে যায়। যত দিন যাচ্ছে অজান্তেই অসীমের মুখ কারণে অকারণে ভেসে উঠছে সামনে। ঈশ্বরের পৃথিবীতে নাকি শুধু ভাল অথবা কেবলই মন্দের স্থান নেই। কিন্তু তার ক্ষেত্রে এমনটা হচ্ছে কেন ? চারপাশের মানুষগুলোর হিসেব করল সে। অমরনাথ এবং মাস্টারমশাই ছাড়া প্রত্যেকেই যে ব্যবহার করেছেন তা ভাল ব্যবহার বলা যায় কি ? অঞ্জলি এমন পাল্টে গেল যে মনেই হয় না এত বছর সে তাকে মা বলে ডেকে এসেছে। মনেই হয় না ওই মহিলা তাকে পড়াশুনা করানোর জন্যে অনেক ত্যাগ করেছে। তার পরীক্ষার সময় জলপাইগুড়িতে গিয়ে থেকেছে। কিন্তু যেই স্বার্থে সংঘাত লাগল তখন সম্পর্কটা মুচড়ে গেল এক পলকেই। প্রতুলবাবু, তাঁর স্ত্রী, আনা, হরদেব থেকে আরম্ভ করে সুভাষচন্দ্র অথবা জন্মদাতার চেহারা নিয়ে যিনি এলেন প্রত্যেকেই নিজের আখের গোছাতে আগ্রহী। এতগুলো মুখ অথচ মুখোস এক। একটি মানুষের জীবনে শুধুই স্বার্থান্বেষীদের ভিড়, নিঃস্বার্থ বন্ধুর এত অভাব হবে ? মাঝে মাঝে তার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ে মনোরমার ওপর। এত সব কাণ্ড হয়ে গেল অথচ তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। একবারও দীপার পক্ষ নিয়ে অঞ্জলির মুখোমুখি হলেন না। এর একটিই কারণ। মনোরমা অঞ্জলির সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করতে চান না। এই মুহূর্তে তাঁর নিজস্ব কোন জায়গা নেই, অঞ্জলির আশ্রয়েই তাঁকে থাকতে হবে। এটাও তো এক ধরনের স্বার্থ। আর এই সব সময়েই মনে পড়ে অসীমের কথা। ওই একমাত্র মানুষ যে নিঃস্বার্থে তার সঙ্গে মিশেছিল। জলপাইগুড়িতে যাওয়ার সময় ওর সঙ্গ দেবার কোন কারণ ছিল না। ওর কাছে অকপটে সব কথা বলা যেত। ও বিশ্বাস করেনি প্রথমে যে সে বিধবা, পরে বিশ্বাস হওয়ায় দূরে সরে গিয়েছে। এ কারণে ওকে দোষী ভাবতে ভাল লাগত একসময়। মানুষের মনে যদি ঔদার্য না থাকে তাহলে সে কিসের মানুষ ? কিন্তু এখন মনে হয় তার নিজের তরফ থেকেও কিছু ত্রুটি ঘটেছিল। অসীমকে যদি বন্ধু বলে মনে হয়েই থাকে তাহলে এত বেশী সময় নিল কেন ওকে জানাতে নিজের কথা। সে জানে না হয়তো এটাই অসীমের মনে অভিমান তৈরী করেছে। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় অসীম কি সত্যিই নিঃস্বার্থ ছিল ? ওর বাড়ির লোকেদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ওর ইচ্ছেটা বুঝতে অসুবিধে ছিল না। অর্থাৎ সেখানেও তো বিশেষ চাওয়া কাজ করছিল। চাওয়া মানে স্বার্থ মেটানো। তাহলে ? আজ মনে হচ্ছে ভালবাসার মানে নানান ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে কোন মেয়ে যদি প্রেমে নিমজ্জিতা হয় তাহলে লোকে তাকেই দায়ী করে। কিন্তু বেচারার তো কিছুই করার নেই। তার হৃদয়ে যে প্রেম ছিল এটাই হয় তো সে জানত না। ছেলেটি এসে সেখানে স্পর্শ করল বলে জেগে উঠল। এবং সেই ছেলেটি

অবলীলায় তা নিয়ে চলে গেল। কেউ যদি কিছু নিয়ে যায় তাহলে আকৃতি ফুটে উঠবেই। আজ মনে হয় অসীম কি তার মন নিয়ে গিয়েছে নইলে এত মনে পড়ায় কেন ?'

এসবের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় চিন্তাটাও মাথা তুলছে। বিলিব্যবস্থা মত যে টাকা সে নিয়ে এসেছিল তাতে কয়েকবছর টেনেটুনে চলে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মনোরমার চিঠি পাওয়ার পর সে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন আজ না হলেও কাল তাকে আর্থিক সমস্যায় পড়তেই হবে। এর একমাত্র সমাধান কিছু রোজগার করা। কিন্তু কিভাবে সেটা করবে ? কাজের জন্যে বেশী সময় কলেজ করার পর দিতে গেলে পড়াশুনা হবে না। সে একই সঙ্গে গ্রাজুয়েশন আর আই এ এসের কোর্স ফলো করছে। কোথাও কোথাও মিল থাকলেও তৈরী হতে হচ্ছে আলাদা ভাবে। রাধাকে সে সমস্যাটা খুলে বলল।

রাধার ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্ববঙ্গের শব্দ সে সচেতনভাবে বর্জন করতে আরম্ভ করেছে কলেজে কথা বলার সময়। শুনে বলল, 'তুমি তো বিকেলবেলায় টিউশনি করতে পার। তোমাদের নর্থ ক্যালকাটায় অনেক বাড়িতে মাস্টার হিসেবে ছেলেদের ঢুকতে দেয় না। মেয়ে মাস্টারনি পেলে সঙ্গে সঙ্গে পড়াতে ডাকবে।'

'কিন্তু আমি তো কখনও কাউকে পড়াইনি।'

'কোন প্রব্লেম হবে না ! একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই পড়াতে পারবে।' রাধা আজকাল কিছু কিছু বাংলা শব্দের বদলে ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করছে। মায়া বলে এটা নাকি পূর্ববঙ্গের মানুষদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এতে ওরা স্বচ্ছন্দ বোধ করে। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'মুশকিল হল আমি তো কাউকে চিনি না, আমাকে কে পড়াতে বলবে ?'

রাধা হাসল, 'তাবও একটা উপায় আছে। চল, এখনই সেটা করে ফেলি।'

দীপা দেখল রাধা তার লম্বা খাতার মাঝখানের পাতা পিন থেকে সাবধানে খুলে বের করে নিল। তারপরে কলম দিয়ে মোটা করে লিখতে লাগল, 'গৃহশিক্ষিকা। উত্তর কলকাতায় মেধাবী এবং মাঝারি মানের ছাত্রীদের সপ্তাহে তিনদিন যত্ন লইয়া পড়াইব। ছাত্রীর পিতা বা মাতা যোগাযোগ করুন। শ্রীমতী দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডানডাস হোস্টেল, স্কটিশচার্চ কলেজ। বিকাল চারটে হইতে পাঁচটা।'

'এটা কি হবে ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল দীপা।

'আঠা যোগাড় করতে হবে। চল, অফিসে পেয়ে যাব।' রাধার সঙ্গে কলেজের অফিসরুমে এসে কিছু গদের আঠা যোগাড় হয়ে গেল। দীপা তখনও বুঝতে পারছিল না রাধার মতলব। এবার রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'বেথুনে তো স্কুলও আছে, না ?'

'হ্যাঁ। কলেজ আর স্কুল একসঙ্গে।'

'চল। বেথুনে গিয়ে গেটের ওপর এই কাগজটাকে আটকে দিই। ছুটির সময় গার্জেনরা যখন মেয়েদের নিতে আসবে তখন দেখতে পাবে। নিশ্চয়ই এতে কাজ হবে।' দীপা উৎসাহী হল রাধার কথা শুনে। এভাবে বিজ্ঞাপন করা যায় তা তার জানা ছিল না। কিন্তু তার পরেই এক ধরনের সংকোচ হল। পাঁচজনে তার নাম জানবে। সে কাজ চাইছে টাকা রোজগারের জন্য এটা চাউর হয়ে যাবে। ব্যাপারটা শুনে রাধা বলল, 'তাতে কি হয়েছে ? তোমার যখন অভাব হবে তখন তো কেউ এক পয়সা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। যদি কেউ কিছু বলে এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আর এক কান দিয়ে বের করে দেবে। প্রথমে যখন এই কলেজে পড়তে এসেছিলাম তখন কত মেয়ে আমাকে বাঙাল বিফ্যুজি বলে খোঁটা দিত। আমি যদি কেয়ার করতাম তাহলে আর আমার পড়াই হত না। কই, এখন তো কেউ আর আগের মত বলে না।'

দীপার মনে হল রাধা ঠিক কথাই বলছে। সে তো অন্যায় পথে টাকা রোজগার করতে যাচ্ছে না। টাকার প্রয়োজন তার হবেই। কিন্তু গেটের ওপর কাগজটা সেঁটে দিলে তো অনেক আজেবাজে ছেলে দেখে এসে তাকে বিরক্ত করতে পারে। দীপা রাধাকে এটা বলতে সে মাথা নাড়ল, তা হতে পারে। তুমি হোস্টেলের দারোয়ানকে বলবে কোন অল্প বয়সী ছেলে যদি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় তবে তাকে ঢুকতে না দিতে।'

কিন্তু গেটের বদলে একটা ভাল জায়গা পাওয়া গেল। গেট পেরিয়ে বাঁ দিকে বাড়িটার পাশে একটা দেওয়াল পেয়ে গেল সেখানে ইতিমধ্যেই অনেক বিজ্ঞপ্তি টাঙানো আছে। কারও কলম হারিয়েছে, কেউ বই খুঁজে পাচ্ছে না আবার কোন মেয়ে একটা পার্স খুঁজে পেয়ে অফিসে জমা দিয়ে গিয়েছে। রাধা তাদেরই একপাশে এই বিজ্ঞপ্তিটা সেঁটে দিয়ে বলল, 'এখানে সবার নজরে পড়বে, কি বল ? সাতদিন অপেক্ষা কর, তাতেও যদি কোন কাজ না হয় তাহলে আর একটা মেয়েদের স্কুলে যাওয়া যাবে। তুমি খোঁজ নিয়ে রেখ এদিকে আর কোন ভাল স্কুল আছে।'

বেশ উত্তেজনা নিয়ে ফিরে এসেছিল দীপা। রাধাকে অনুরোধ করেছিল প্রথমদিন চারটে থেকে পাঁচটা ওর সঙ্গে হোস্টেলে থাকতে। দারোয়ানকে বলে রেখেছিল কেউ যদি ওই সময়ের মধ্যে তার খোঁজ করে তাহলে গেস্টরুমে পাঠিয়ে দিতে।

যেটা নিয়ে সমস্যা হল সপ্তাহে তিনদিন পড়ানোর জন্যে দীপা কত টাকা চাইতে পারে। রাধা বলল, 'আমি কলোনি এলাকার মেয়েদের পড়াই। দশ টাকা দিতে তাদের বাবার খুব অসুবিধে হয়। বেথুনে যেসব বাবা মেয়েকে পড়াচ্ছে তাদের ক্ষমতা নিশ্চয়ই ভাল।'

'কিন্তু যখন জিজ্ঞাসা করবে কত দিতে হবে তখন কি জবাব দেব ?'

রাধা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'পঞ্চাশ টাকা বলো।'

'দূর !' হেসে ফেলল দীপা, 'পঞ্চাশ টাকা কি মুখের কথা ? আমাকে অত দেবে কেন ? তার জন্যে স্কুলের মাস্টার কলেজের প্রফেসার আছে।'

রাধা বোঝালো, 'ঠিকই। কিন্তু তারা পুরুষ। তাদের তো অন্দরমহলে ঢোকাবে না ঘটিরা। এই জন্যেই তোমাকে দেবে।'

কিন্তু প্রথম দিন কেউ এল না খোঁজ করতে। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলে রাধা চলে গেল। দুজনেরই মন খুব খারাপ হয়ে গেছে। প্রতিক্রিয়া যে এমন হবে তা দুজনেই ভাবতে পারেনি। পরদিন কলেজে রাধা বলল, 'বেথুনের মেয়েদের গার্জেনরা বোধহয় খুব কৃপণ, পড়াশুনার জন্যে বাড়তি খরচ করতে চায় না। আজ আমার টিউশুনি আছে তাই পারব না, কাল অন্য স্কুলে যেতে হবে।'

কিন্তু পরদিন দীপার মাথা খারাপ হবার উপক্রম এল। প্রায় একই সঙ্গে চার পাঁচজন চলে এলেন। প্রত্যেকেই দীপার ঠিকুজি জানতে চান। তাঁদের মেয়েরা কেউ ওয়ান টু বা ফাইভে পড়ে। বাড়িতে পুরুষ শিক্ষক রাখতে অসুবিধে আছে। কিন্তু হোস্টেলের মেয়ে বলে মহিলারা দ্বিধা করছেন। তাই পুরো বৃত্তান্ত জানতে চাইছেন তাঁরা। পরপর তিনজনকে খুব বিরক্ত হয়েই দীপা জানিয়ে দিল, 'হোস্টেলের মেয়ে সম্পর্কে এই ধরনের মানসিকতা থাকলে তার পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়।' চতুর্থজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সম্পর্কে কি জানতে চান ?'

'আপনার বাড়ি কোথায়, কে কে আছেন, তাঁরা কি করেন ?'

'এগুলোর সঙ্গে পড়ানর কি সম্পর্ক ? তাঁরা তো পড়াতে আসবেন না।'

'না, না। আসলে অজ্ঞাতকুলশীলা কাউকে অন্দরমহলে—।'

আমি তো বানিয়ে বলতে পারি।'

ভদ্রলোক এমন আশা করেননি। পঞ্চমজনের ক্ষেত্রে সমস্যা কম হল। তিনি শুধু দীপার বাড়ি কোথায় জানতে চাইলেন। বললেন, 'আমরা খুব রক্ষণশীল পরিবারের মানুষ। মেয়েরা এর আগে পড়াশুনা করেনি। আপনি কত নেবেন ?'

দীপার বিরক্তি তখন আকাশছোঁয়া। বলল, 'পঞ্চাশ।'

যেন ভূত দেখলেন ভদ্রলোক। তারপরে বললেন, 'ঠিক আছে পরে খবর দেব।'

ঠিক পাঁচটার সময় এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধা, এলেন গায়ে চাদর জড়িয়ে। এই প্রথম কোন মহিলাকে আসতে দেখে দীপা আরও কঠিন অভিজ্ঞতার জন্যে তৈরী হল। বৃদ্ধা বেশ সংকোচ নিয়ে বললেন, 'আমার নাতনি ক্লাশ ফোরে পড়ে। তাকে কি তুমি পড়াবে ?'

'পড়াতে চাই বলেই তো বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি।'

'ও। কিন্তু আমার একটা সমস্যা আছে।'

'বুঝতে পেরেছি। আপনি আমার ঠিকুজি চাইবেন ?'

'অ্যাঁ ? না না। সেসব কেন জানতে চাইব। তুমি যখন কলেজের হোস্টেলে থাকো তখন তো পড়াবার জন্যে যোগ্যতা আছেই।'

এবার অবাক হল দীপা, 'তাহলে সমস্যাটা কি ?'

'দ্যাখো, আমার বা আমার মেয়ের পেটে বিদ্যে নেই। তবে পড়তে পারি চিঠিপত্তর লিখতে পারি। কিন্তু নাতনিকে পড়াশুনা শেখাতে চাই।'

'খুব ভাল কথা।'

'তোমাকে কি করে বলি। আসলে আমার ইতিহাস ভদ্রলোকের মেয়ের নয়। আমি থাকি সোনাগাছির মুখের বাড়িতে।'

'সোনাগাছি ? সেটা কোথায় ?'

'ও। তোমার বাড়ি নিশ্চয়ই অনেক দূরে ?'

'হ্যাঁ। জলপাইগুড়িতে।'

'সোনাগাছি হল সেই জায়গা যেখানে ভদ্রমানুষেরা তাঁদের প্রবৃত্তি মেটাতে যান। আমার বয়স বুঝতেই পারছ। এক বাবু আমাকে যৌবনে বাড়িটা দিয়েছিলেন। আমার মেয়ে এই লাইনেই ছিল। বাচ্চা হবার সময় মারা যায়। ওই নাতনিকে আমিই বড় করছি। নিজে তো, ব্যবসা ছেড়েছি অনেককাল কিন্তু প্রাণ থাকতেও নাতনিকে আমি ব্যবসায় নামাবো না। তাই ওকে লেখাপড়া করাতে চাই।'

দীপা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখে ভেসে উঠল খান্না সিনেমার পাশে রঙ মেখে দাঁড়ানো মেয়েগুলোর মুখগুলো। অসীমের সঙ্গে সেদিন সে তর্ক করেছিল খুব। তাকে কথা না বলতে দেখে বৃদ্ধা বললেন, 'অনেকেই এসব শুনলে ঘেন্না করবে। নাতনিকে স্কুলে ভর্তি করিয়েছি মিথ্যে কথা বলে। বাবা মা মরে গেছে বলেছি। কেউ জানে না, জানলে স্কুল কি করবে কে জানে। কিন্তু ওকে ভাল লেখাপড়া শেখাতে হলে বাড়িতে পড়ানো দরকার। কিন্তু ভাল মাস্টার হয়তো চাইলে পাওয়া যায়, মেয়ে মাস্টার কোথায় পাব ? শুনলে কেউ যাবে না ওখানে।'

'মাস্টার রাখছেন না কেন ?'

'প্রথম কথা পাড়াটা তো ভাল না। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ওপর হলেও। তাছাড়া আমি চাই মেয়েটা একটি শিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ থাকুক। তাতে পরিবেশ অন্যরকম হবে আর ওর মনটাও ভাল থাকবে।' বৃদ্ধা দীপার হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'তোমার কখনও অসম্মান

হবে না। তুমি কি রাজি হবে ?'

প্রথমে দীপা বুঝতে পারছিল না কি করবে। হঠাৎ তার মনে হল অনেক বছর আগে মালবাজারে তাকে জন্ম দিয়ে এক ভদ্রমহিলা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেদিন যদি ওই ঘটনা না ঘটত তাহলে হয়তো ঈশ্বর তার কপালে অন্য কিছু লিখতে বাধ্য হতেন। সে নড়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, আমি আপনার নাতনিকে পড়াব।'

॥ ৪০ ॥

মেয়েটির নাম লাবণ্য। পুরোনো কালের চেয়ারে বসে নাম শুনে চমকে গেল দীপা। দশ বছরের মিষ্টি চেহাবার মেয়েটি বলল, 'আমার নাম লাবণ্য মিত্র।'

মেয়েটির পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন তার দিদিমা। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি খুব খুশি, নাতনির জন্যে মাস্টারনি যোগাড় কবতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। দীপা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করল, 'ওর নাম কে রেখেছিল ?'

'আমি।' বৃদ্ধা খুব গর্বিত ভঙ্গীতে জবাব দিলেন।

'কিছু মনে করবেন না, ওর মাযেব নাম কি ছিল ?'

'ওমা, মনে করা কেন ? ওর মাকে আমি দুলু বলে ডাকতাম, ভাল নাম ছিল গোলাপ, গোলাপবালা। একেবারে গোলাপের মত বঙ ছিল তো !'

হঠাৎ লাবণ্য ঘাড় শক্ত করে বলে উঠল, 'মায়ের কথা আমার সামনে বলবে না।'

দীপা আবার অবাক, 'কেন ?'

'না। যে আমার জন্ম দিয়ে চলে গেছে ভগবানেব কাছে তাব নাম কববে না।'

দীপা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। সেই ভদ্রমহিলা যিনি তাকেও জন্ম দিয়ে মাবা গিয়েছিলেন তাঁব নাম জেনেছে সে অনেক বড হয়ে, বিয়ের আগে। কিন্তু সেটা জানার পব তার তো এমন প্রতিক্রিয়া হয়নি। সে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল, 'লাবণ্য নামটা আপনি কোথায় পেলেন ? কেউ তো চট করে রাখে না।'

'কোথায় আব পাব মা ! আগে চাইতাম মেয়ে সুন্দরী হোক, রূপসী হোক, দেখে পাঁচজনের চোখ পুড়ে যাক। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে দেবার পব মনে হত সুন্দবী রূপসী মানে তো হাজাব সমস্যা। তার চেয়ে হাত পা চোখ মুখ নিখুঁত হোক আব মুখে লাবণ্য থাক। যত বড সুন্দরী হোক যদি লাবণ্য না থাকে তাহলে সব রূপ মাঠে-মারা যাবে। তা ওর মা যখন মারা গেল তখন কোলে নিয়ে ভাবছি এ মেয়েব কি নাম দেওয়া যায়। একটু আলাদা রকম, মানে আমাদেব থেকে আলাদা। রেখে দিলাম লাবণ্য।' বৃদ্ধা হাসলেন, 'প্রথমে অবশ্য লাবণ্যপ্রভা রেখেছিলাম। তা এখানে একটা সিডিঙ্গে লোক আছে, আমাকে দিদির মত দেখে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে গায়, মেয়েদের ববিঠাকুরেব গান শেখায় যে শিখতে চায়, সে শুনে বলল, ওসব প্রভা-ট্রভা ছেঁটে দাও। তুমি একেবারে রবি ঠাকুরের বুকেব খাঁচায় হাত ঢুকিয়ে দিয়েছ !'

'খুব ভাল বলেছেন উনি। আপনি রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন তাহলে ?'

'ওমা, শুনব না কেন ? এই তো, ওই গলি দিয়ে সোজা গেলে চিৎপুর-গণেশ টকি আব তারপরেই রবিঠাকুরের বাড়ি। ওর কত গান কঞ্চি ভাই-এর কাছে শিখেছিলাম !'

'কঞ্চি ভাই ?'

'ওই যে সিড়িঙ্গে, যে হারমোনিয়াম বাজায়।' বৃদ্ধা ভেতরে চলে গেলেন।

প্রথম দিন লাবণ্যাকে জানতেই চলে গেল। ও কি পড়তে ভালবাসে, বইপত্তরগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে সময় নিল দীপা। সেই সঙ্গে লাবণ্যের সঙ্গে আলাপ। মেয়েটাকে প্রথমে একটু জেদী ধরনের মনে হয়েছিল কিন্তু কথা বলে ধারণা পাল্টাল। জানার আগ্রহ আছে খুব। একমাত্র লাবণ্য বলল, 'জানো, দিদিমা যখন এসে বলল মাস্টারনি ঠিক হয়েছে তখন আমি খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। আমার ক্লাসের অঙ্কদিদির মত যদি তুমি হও!'

'কেন? অঙ্কদিদি কেমন?'

'পাহাড়ের মত। রাগলে আগ্নেয়গিরি হয়ে যান।'

'গুরুজনদের সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে নেই।'

'বাঃ। উনি নিজেই বলেন। রাগলে আমি আগ্নেয়গিরি!'

ভঙ্গীটা নকল করে দেখাল লাবণ্য। হেসে ফেলল দীপা, 'তা হোক, তুমি বলবে না। শোন লাবণ্য, আমি তোমাকে যা পড়াব তা যদি তুমি বুঝতে না পার তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে। কক্ষনো লজ্জা করবে না। তুমি স্কুল থেকে ফেরো চারটের সময়?'

'হ্যাঁ। দশটার সময় যাই।'

'দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কে নিয়ে যায়?'

'দিদিমা।'

'কাল কি পড়া আছে?'

'কালকের পড়া হয়ে গিয়েছে।'

'বাঃ, তুমি দেখছি খুব ভাল মেয়ে। আমি আসব সোম বুধ আর শনি।'

'তুমি যদি রোজ আমাদের বাড়িতে আসো তাহলে খুব ভাল হয়।'

'কেন?'

'তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। এখানে যেসব মেয়ে থাকে তারা কেউ স্কুলে যায় না, বই পড়ে না। ওদের কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।'

'শুনো না।'

'শুনি না তো। আমি কারো সঙ্গে মিশি না।'

'ঠিক আছে, যদি দেখি তোমার প্রয়োজন হচ্ছে তাহলে অন্য দিনও আসব।'

'তুমি কলেজে পড়, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যে কবে কলেজে পড়ব!'

দীপা হাসতে গিয়ে থেমে গেল। সত্যসাধন মাস্টারের মুখ হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। একদিন সে সত্যসাধন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করেছিল একই কথা। তিনি বলেছিলেন, 'কাজ কইর‍্যা যাও মন দিয়া, সময় হইলেই ফল পাইবা।'

মনটা কেমন ভিজে উঠল। সে ঠিক করল সত্যসাধনবাবু যে পদ্ধতিতে তাকে পড়াতেন সেই একই পদ্ধতিতে সে লাবণ্যাকে পড়াবে। এইসময় দুহাতে দুটি থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধা। সেদিকে নজর যেতে চমকে উঠল দীপা, 'একি!'

'এ সামান্য। একটু জলখাবার।'

এক থালা লুচি বেগুনভাজা আর অন্যটিতে তিন-চার রকমের মিষ্টি। দীপা তীব্র প্রতিবাদ করল, 'অসম্ভব। আমি এ সময়ে এত খাই না।'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না মা, খেতে তোমাকে হবেই, আজ প্রথম দিন এ-বাড়িতে তুমি এলে। না খেয়ে চলে গেলে লাবণ্যর ঘোর অকল্যাণ হবে।'

'আপনি এসব একদম বিশ্বাস করবেন না। আমার খাওয়ার ওপর ওর কল্যাণ নির্ভর করবে না। ও যা কাজ করবে সেই মত ফল পাবে।' দীপা ওঠার জন্যে তৈরী হল।

'মা, একটা কথা বলব।' বৃদ্ধা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'তুমি যা বললে তা যদি সত্যি হয় তাহলে কাজের জন্যে ফল ভোগ করছি আমি। তুমি কি সেই কারণেই এই বাড়িতে খেতে চাইছ না ?' বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'তাহলে আমি তোমাকে জোর করব না।'

কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল বুঝতে। এবং বোঝামাত্র দীপা প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসব আপনি কি বলছেন ? আমার মাথায় অমন ভাবনা একবারও আসেনি। তাছাড়া আপনার অতীতের পরিচয় আমার জানার দরকার নেই। আপনি আমার ছাত্রীর দিদিমা, এইটুকুই যথেষ্ট।'

এইসময় লাবণ্য বলল, 'তুমি একটুও খাবে না ?'

দীপা মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল, 'আচ্ছা, দাও। তবে এতগুলো নয়। আমি খুব অল্প খাই।' তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধার মুখে হাসি ফুটল।

তিনি একটি দাসীকে নির্দেশ দিতে খালি থালা এল। দীপা লক্ষ্য করল থালার চেহারা আয়নার মত পরিষ্কার। এর গঠনও অভিনব। বৃদ্ধা সেটা বুঝতে পেরে বললেন, 'এগুলো অনেক যুগ ধরে তোলা ছিল। আমরা ব্যবহার করিনি কখনও। তুমি আসবে বলে নামিয়ে মাজিয়ে রেখেছিলাম।'

'এরকম আর করবেন না। আমাকে আলাদা না ভাবলেই ভাল হত।'

'ওমা ! তুমি আলাদা না ?'

'নিশ্চয়ই না। আমার সঙ্গে লাবণ্যর তফাত কোথায় ?'

কথাটা শুনে বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন। লাবণ্যকে একটা কাজের অছিলায় অন্য ঘরে পাঠিয়ে বললেন, 'সবসময় খুব ভয়ে ভয়ে থাকি মা। স্কুলে যদি জানতে পারে কোন বাড়ি থেকে এসেছে তাহলে তো ছাড়িয়েও দিতে পারে। কোন বন্ধুর বাড়িতে যেতে দিই না, কাউকে আসতেও বলে না। এরই মধ্যে ওইটুকুনি মেয়ে সব বুঝে গিয়েছে।'

'আপনারা কি মিত্র ?'

'না গো। যে মানুষটির সঙ্গে ওর মা শেষ এক বছর ছিল সে হল মিত্র। তা সত্যি কথা বলব মা, মেয়ের মৃত্যুর পর মিত্তির এসে বলে গিয়েছিল লাবণ্যর জন্যে যখন যা প্রয়োজন হবে তাকে বলতে। লোক তো খারাপ নয়। স্কুলে ভর্তির সময় সঙ্গে গিয়ে বাপ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছে। তাই বা কে দেয় ?'

'তিনি এখানে এখন আসেন ?'

'না। সে বিয়ে থা করেছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে। তবে খবর দিলে বাইরে দেখা করে। লাবণ্য তাকে দেখেছে স্কুলে ভর্তির দিন।'

'কিছু বলেনি ?'

'কি বলবে। তখন ও এত বাচ্চা ছিল ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি।' বৃদ্ধা হাসলেন।

'কিছু মনে করবেন না, আপনার এখন চলে কি করে ?' প্রশ্নটা করা উচিত না তবু না করে পারল না দীপা। তার কৌতূহল বাড়ছিল।

'কুঁজো গড়িয়ে। যা আছে তাতে এ মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে। তারপর তো সব ফক্কা। আমি যখন থাকব না তখন কুঁজো শুকিয়ে গেলে ক্ষতি কি। আচ্ছা মা, তুমি তো নাতনির সঙ্গে কথা বললে, কি মনে হল ?'

'কি ব্যাপারে ?'

'বি এ এম এ চাই না, ম্যাট্রিকটা পাশ করতে পারবে তো ?'

'আপনি যেভাবে সামলে রাখছেন তাতে ও এম এ পাশ করে যাবে, দেখবেন ।'

'না মা । অত আশা করি না । অতি বড় বিদ্যেধরীও না পায় বর । ভাল একটা ছেলে দেখে বিয়ে দেব যে ওকে হেনস্থা করবে না । পেটে যদি সামান্য বিদ্যে থাকে তাহলে সমাজে চলতে ফিরতে পারবে । আমরা যা পাইনি ও তা পেলেই আমি খুশি ।'

যে বুড়ো চাকরটি দরজা খুলেছিল তাকে বৃদ্ধা বললেন বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে । দীপা আপত্তি করল, 'এখান থেকে সবাসরি কোন বাস নেই আমার হোস্টেলে যাওয়ার । ওকে পাঠাতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব ।'

বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না মা । সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে । তোমাকে কেউ যদি অসম্মান করে তাহলে আমি শান্তি পাবো না ! হরি সঙ্গে যাক । ও তোমাকে ছাতুবাবুর বাজারেব কাছে পৌঁছে দিয়ে আসবে । হবি, সাবধানে যাবি ।'

হরি বলল, 'তুমি তো আমাকে চল্লিশ বছব ধরে দেখছ কোন ভয় নেই । চলুন ।'

আজ বিকেলে যখন সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু দিয়ে এই এলাকায় এসে বাড়ি খুঁজছিল তখন অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল । লোকগুলো জুলজুল করে দেখছিল তাকে । পানেব দোকান, বাড়ির রোয়াকে বসা মানুষগুলোব একজন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি চাই বলুন তো ?'

দীপার বক্তব্য শুনে লাবণ্যদেব বাড়িব দরজায় পৌঁছে দিয়ে বারে বারে ঘুরে দেখছিল ; লাবণ্যদেব বাড়িতে ওঠাব সিঁড়ি আলাদা । সিঁড়ির মুখে লেখা বয়েছে 'গৃহস্থদের বাড়ি' । অর্থাৎ এ পাড়ায় নোটিস ঝুলিয়ে বলতে হয়, আমি গৃহস্থ । কিন্তু এখানে আসাব সময় খান্না সিনেমাব সামনে দাঁড়ানো মেয়েগুলোব মত কাউকে নজবে পড়েনি ।

হরিব সঙ্গে বাস্তায় নেমে দীপাব চোখে তেমন কিছু পড়ল না । শুধু উল্টো দিকেব রকে বসা একটা লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'ও হবিদা, যাচ্ছ কোথায় ?'

'দিদিমণিকে পৌঁছে দিতে ।'

'বাড়িউলিব নাতনিকে পড়াবে বুঝি ?'

'তোর এত খববে কি দরকাব ?'

'না, না । অনেক উটকো মেয়ে তো রোজ আসছে । তা তোমাদের ঝি-এব কাছে শুনলাম বাড়িউলি মাস্টাবনি রেখেছে । এ পাড়ায় তো কোনদিন দেখিনি ।'

'দেখে রাখ । পাঁচজনকেও বলে দিবি । অন্যবকম কিছু হলে চোখ গেলে দেব ।'

কথাগুলো বলে হরি সসম্ভ্রমে বলল, 'চলুন দিদিমণি । দাঁড়াবেন না ।'

হাঁটতে হাঁটতে দীপা জিজ্ঞাসা কবল, 'লোকটা কে ?'

'দালাল । আর কেউ আপনাকে বিরক্ত কববে না । ওই বলে দেবে সবাইকে । আসুন রাস্তা পার হই ।' বাস গাড়ি সামলে পার্কের ফুটপাতে পৌঁছে হরি বলল, 'এই ফুটপাত দিয়ে ভদ্রলোকের মেয়েরা হাঁটে । বিকেলে আপনি এই ফুটপাত দিয়ে এসে এখান থেকে রাস্তা পার হবেন । কেউ কিছু বলবে না, তবু যদি বলে ফেলে আমার নাম কববেন ।'

'আমার কিন্তু জায়গাটা দেখে কলকাতার অন্য রাস্তার মতনই মনে হচ্ছে !'

'আমাদের বাড়িটা তো মুখে তাই অমন মনে হচ্ছে । ভেতরে চিৎপুর পর্যন্ত এখন মচ্ছব বসে গিয়েছে । মা খুব চেষ্টা করেছিল বাড়ি বিক্রি করে ভদ্রপাড়ায় উঠে যেতে । কিন্তু যারা কিনবে তারা দামই দিতে চায় না ।' হরি মাথা নেড়ে কথা বলছিল ।

ছাতুবাবুর বাজারের সামনে এসে দীপা বলল, 'এবার তুমি চলে যাও।'

হরির বোধ হয় ইচ্ছে ছিল আর একটু যাওয়ার কিন্তু দীপা আমল দিল না। বাঁ দিকের ফুটপাত ধরে সে হনহনিয়ে হেঁটে এল হেদোর সামনে। এসে স্বস্তি হল। কিন্তু তখনই কানে এল একটা গলা, 'নিশ্চয়ই হোস্টেলের মেয়ে।' দ্বিতীয় গলা বলল, 'বাঙালও হতে পারে।'

সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কয়েকজন লোক ফুটপাতে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল, গলা দুটো শোনা গেছে তাদের মধ্যে থেকেই। খামোকা গায়ে পড়ে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। এরা নিশ্চয়ই উত্তর কলকাতার মেয়েদের সন্ধের পর একা দেখতে অভ্যস্ত নয়। ফুটপাত পার হয়ে ওপারে যাওয়ার জন্যে রাস্তায় নামতে দীপার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। ধীরে ধীরে ট্রামবাস দেখে রাস্তাটা পার হয়ে এল।

বাস স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে ছিল অসীম। দীপা যখন রাস্তা পার হচ্ছে তখন সে দেখতে পেয়েছিল তাকে। কি করবে বুঝে ওঠার আগেই দীপা সামনে এসে দাঁড়াল।

অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি? এত রাত্রে?'

'পড়াতে গিয়েছিলাম।' দীপা আবিষ্কার করল তার কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে। অনেক দিন পরে অসীমকে দেখল সে। এখন মনে হচ্ছে অনেক-অনেক দিন।

'পড়াতে? তুমি টিউশনি করছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'সোনাগাছিতে। সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুর ওপরে।' সবল গলায় বলল দীপা।

অসীম হাঁ হয়ে গেল। সে অবাক চোখে দীপাকে দেখল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? কি করে এই টিউশনিটা পেলে?'

'পেয়ে গেলাম।' দীপা হাসার চেষ্টা করল, 'তখন জিজ্ঞাসা করলে এত রাতে? রাত তো সবে শুরু হয়েছে। আর মাথা যে খারাপ হয়েছে তা কেউ বলেনি। তুমি এখানে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।'

'আমার সঙ্গে?'

'গিয়ে শুনলাম তুমি হোস্টেলে নেই।'

'তাই এখানে দাঁড়িয়ে আছ?'

'আমি কি তোমার জন্যে এর আগে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকিনি?'

'থেকেছ। তখন সময়টা অন্যরকম ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

'তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে।'

'কিন্তু আমি এখন খুব ক্লান্ত।' কথাটা বলার আগে দীপা বিন্দুমাত্র ভাবেনি। বলে ফেলে মনে হল ঠিক বলেছে। এতদিন যে স্বেচ্ছায় দূরে থেকেছে তার খেয়ালখুশি মত সে কথা বলবে কেন? দীপা ঘুরে দাঁড়াল, 'তোমার দরকারটা যদি খুব জরুরি হয় তাহলে পরে দেখা করতে পার। আগামীকাল আমি কলেজে থাকব।'

অসীম তাড়াতাড়ি চলে এল সামনে, 'দীপা, প্লিজ। এত নিষ্ঠুর হয়ো না।'

'নিষ্ঠুর আমি! চমৎকার!'

'তুমি আজ আমাকে একটু সময় দাও।'

'বাঃ, একটু আগে বললে এত রাত্রে ফিরছি কেন? এত রাত্রে সময় দেব কি করে?'

'কিন্তু আমার যে আজই বলা দরকার।'

'তোমার ইচ্ছেমত সবসময় কাজ হবে এমন ভাবছ কেন?'

'বুঝতে পারছি আমি তোমার ওপর জোর করছি!'

'জোর করতে যে অধিকার-বোধ প্রয়োজন হয় তা তোমার নেই। তুমি নিজেই তা হারিয়েছ। যেদিন আমার মামা হোস্টেলে এসেছিলেন সেইদিন তুমি উধাও হয়ে গিয়েছিলে। আমার সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করোনি। তারপর আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গিয়েছে তার কোন খবর নেবার ইচ্ছেও হয়নি তোমার। আবার আজ বলছ আমি নিষ্ঠুর।'

'আমি কেন উধাও হয়েছিলাম তুমি জানো না?'

'আমার আর জানার দরকার নেই। আমাকে হোস্টেলে যেতে দাও।'

'দাঁড়াও। সেদিন তুমি যখন দারোয়ানের সঙ্গে ভেতরে চলে গেলে তখন তোমার মামা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কে? আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? উনি নিজের পরিচয় দিতে আমি বলেছিলাম আমরা বন্ধু। উনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন এদেশে ছেলে মেয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। এটা বিলেত আমেরিকা নয়। আমি বলেছিলাম, সময় পাল্টাচ্ছে, আপনাদের ধারণাটাও বদলে নেওয়া দরকার। উনি খুব ক্ষেপে গেলেন। বললেন তিনি তোমার গার্জেন। তোমার সঙ্গে যদি আমি মিশি তাহলে তিনি স্টেপ নেবেন। কারণ এতে তোমার ক্ষতি হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিসের ক্ষতি? উনি বললেন, তুমি বিবাহিতা। তোমার স্বামী কিছুদিন আগে মারা গিয়েছে। তোমার শ্বশুরবাড়ির সমস্ত সম্পত্তি দখল পেতে যাচ্ছ। কিন্তু এসময় যদি একজন হিন্দু বিধবার চরিত্রে কলঙ্কের ছাপ পড়ে তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি যদি সত্যি তোমাকে বন্ধু বলে মনে করি তাহলে তোমার উপকারের জন্যে আর কখনও যেন দেখা না করি। সেদিন তুমি নিজেকে বিধবা বলেছিলে। বলেছিলে বিয়ের রাত্রে তোমার স্বামী মারা গিয়েছিলেন। আমি বিশ্বাস করতে চাইনি। ভেবেছিলাম তুমি আমাকে পরীক্ষা করার জন্যে একটা গল্প বানিয়ে বলছ। পরে একা দাঁড়িয়ে ভেবেছিলাম যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কি? আমি তো তোমাকে ভালবাসি, তোমার অতীত নিয়ে আমার কি হবে; কিন্তু তোমার মামা যখন বললেন কিছুদিন আগে তোমার স্বামী মারা গিয়েছেন তখন সব এলোমেলো হয়ে গেল। বুঝলাম তুমি মিথ্যে বলেছ আমাকে। আমি সহ্য করতে না পেরে চলে গিয়েছিলাম।'

পাথরের মত দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনছিল দীপা। তার সমস্ত শরীর যেন ধীরে ধীরে রক্তশূন্য হয়ে যাচ্ছিল। কোনরকমে সে জিজ্ঞাসা করতে পারল, 'তাহলে আজ এলে কেন?'

'না এসে উপায় ছিল না।'

'আমি একটু বসব। দাঁড়াতে পারছি না।'

'তোমার হোস্টেল অবধি যেতে পারবো না?' দীপার বলার ভঙ্গীতে ব্যস্ত হয়ে উঠল অসীম।

'এখন আর তোমাকে ঢুকতে দেবে না।' অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল দীপাকে।

এইসময় একটা ট্রাম আসছিল শ্যামবাজারের ডিপো থেকে। অসীম দীপাকে বলল, 'এটায় ওঠো।'

'কেন?'

'বসতে পারবে।'

অসীমকে উঠতে দেখে দীপা অনুসরণ করল। ট্রামে যাত্রী ছিল হাতে গোনা। ওরা একেবারে সামনে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভারের পেছনে বসল। দীপার মনে হল সে বেঁচে গেল। হঠাৎ সমস্ত শরীর থেকে ঘাম বেরুচ্ছিল, ভিজে যাচ্ছিল এবং সেইসঙ্গে মাথা ঘোরা। বসতে

পেরে তাই আরাম হল। ট্রাম চলতে শুরু করলে বাতাস লাগল মুখে। সে চোখ বন্ধ করল, হঠাৎ এভাবে শরীর খারাপ করছে কেন?

'রুমালে ঘাম মুছে নাও।' নিচু গলায় বলল অসীম যদিও তার কোন দরকার ছিল না। পেছনের সিটগুলো একদম খালি। ট্রাম চলার সময় যে শব্দ হয় তাতে কথা বেশী দূরে যেতেও পারে না। দীপা খুব দুর্বল হাতে ঘাম মুছল। একটা গা গুলানি ভাব পাক খাচ্ছে পেটে। শিরাগুলো ঝিমঝিম করছে। আচমকা সে আবিষ্কার করল যদি সে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তাকে দেখার কেউ নেই। হোস্টেল থেকে হয়তো হাসপাতালে ভর্তি করে বাড়িতে চিঠি দেবে। কিন্তু কেউ আসবে না দায়িত্ব নিতে। এই পৃথিবীতে যতক্ষণ শরীর ঠিক থাকে ততক্ষণ সব সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করে বাঁচা যায়। কাউকে তোয়াক্কা না করে একা থাকা সম্ভব যতক্ষণ শরীর তাজা থাকে। কিন্তু অসুস্থ হলেই একজন সঙ্গী দরকার হয় যে খুব কাছের মানুষ। অসীম জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন লাগছে এখন?'

একটু সময় নিয়ে দীপা বলল, 'ভাল।'

'ডাক্তারের কাছে যাবে?'

'ডাক্তার? দীপা মাথা নাড়ল, 'না, না। আমি ঠিক আছি।'

সারাটা পথ অসীম কোন কথা বলল না। কি কবে যে ট্রামটা ধর্মতলায় পৌঁছে গেল তা টের পায়নি দীপা। চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে থাকতে একটু আচ্ছন্নের মত হয়ে গিয়েছিল। কাছে কেউ চিৎকার করতেই তার চোখ খুলে গেল। দেখল ট্রামটা দাঁড়িয়ে আছে কার্জন পার্কে। কামরায় তার পাশে অসীম ছাড়া কেউ নেই। শরীরের ক্লান্তি অনেক কমে গেছে, গা-গুলানি ভাব আর নেই। সে কথা বলল, 'ট্রাম যাবে না?'

'সামনের ট্রাম ছাড়লে এটার চান্স। আমরা ডিপোতে বসে আছি। শরীব কেমন?'

'ভাল লাগছে।'

'কি হয়েছিল বল তো?'

'জানি না?'

'অনেকক্ষণ খাওয়া দাওয়া করোনি?'

'না তো। সন্ধে নাগাদ একথালা খেয়েছি।'

'অম্বল হয়ে গিয়েছে?'

'না।'

'তুমি তো বললে টিউশনি থেকে আসছ!'

'হ্যাঁ। ওখানেই খেয়েছি।'

'কিরকম বাড়ি?'

'সে তোমার শুনে দরকার নেই। এখন একটু চা খেলে ভাল হত।'

'ভাঁড়ে চা বিক্রি করছে। খাবে?'

'আমি কখনও খাইনি।'

'গঙ্গাজলে গুড় আদা দিয়ে চা করে।'

'গঙ্গাজলে? যাঃ।'

পাশের ছাউনির নিচে একটা লোক জ্বলন্ত উনুনে কেটলি বসিয়ে চা বিক্রি করছে। অসীম তাকে ডেকে দুটো ভাঁড় দিতে বলল। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আদার গন্ধ পেল দীপা। কিন্তু ভাল লাগল। শরীরটা একটু একটু করে তাজা হয়ে যাচ্ছে।

চায়ের ভাঁড় জানলা ঘেঁষে ফেলে দিয়ে অসীম বলল, 'এত অল্প পয়সায় বসার জায়গা, চা

খাওয়া পৃথিবীর কোন রেস্টুরেন্টে পেতে না। সেই সঙ্গে বেড়ানোটা উপরি।'

'দেখছি তাই।'

'তোমার কি এরকম হঠাৎ হঠাৎ শরীর খারাপ হয় ?'

'কখনও হয়নি।'

'আজ হল কেন ?'

'জানি না। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে— ।'

'আই অ্যাম সরি।'

'কেন ?'

'আমি না দাঁড়িয়ে থাকলে শরীর খারাপ হত না।'

দীপা চুপ করে গেল। সামনের ট্রামটা এখন ডিপো ছেড়ে যাত্রা শুরু করেছে। সে লক্ষ্য করল অসীম বসেছে তার সঙ্গে স্পর্শ বাঁচিয়ে। এটা ভাল লাগল। দীপা কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করল। অসীমের মুখে টানা ঘটনাগুলো শুনতে শুনতে তার অস্বস্তি শুরু হয়েছিল। মামা যে ওভাবে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে পারে—শোনামাত্র যে উত্তেজনা মনে জন্ম নিয়েছিল তাই তার শরীর খারাপ করে দিল। শুধু মামা নয়, একই সঙ্গে অসীমের ওপর রাগ জন্মেছিল তার। মামার মুখে যা শুনেছে তাই বিশ্বাস করে দূরে সরে গিয়েছিল অসীম। মামাকে সে সেইদিন প্রথম দেখল। তার উচিত ছিল দীপাকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করা এই দায়িত্বটুকু পালন করার কথা ওর একবারও মনে এল না। পুরুষ জাতটা কি সন্দেহ আঁকড়ে থাকতে এত ভালবাসে ? দীপা ভেবে পাচ্ছিল না।

ট্রাম আবার শ্যামবাজারের দিকে ফিরছে। সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এবার বেশ কিছু যাত্রী উঠেছেন। হোস্টেলের গেট বন্ধ হবার আগে না পৌঁছালে ঝামেলা হবেই। গ্লোরিয়ার ঘটনাটা ঘটার পর থেকে কড়াকড়ি খুব বেড়ে গিয়েছে। অসীম বসে আছে চুপচাপ। মুখ ফিরিয়ে কথা বলল দীপা, 'কি বলতে এসেছিলে ?'

'না, থাক।'

'কেন ?'

'তুমি অসুস্থ— ।'

'এখন ঠিক হয়ে গিয়েছি।'

অসীম নিঃশ্বাস ফেলল, 'আমি একটা চাকরি পেয়েছি।'

'বাঃ, খুব ভাল খবর।' সব কিছু ভুলে গিয়ে উচ্ছল হল দীপা।

'তুমি খুশি ?'

'নিশ্চয়ই।' দীপা অসীমের হাতে হাত রাখল, 'কোথায় ?'

'দিল্লীতে। বাবার এক বন্ধুর সোর্সে। ভাল চাকরি। এখনই তিন শো টাকা পাওয়া যাবে।'

'তিন শো বাপ্‌স ! অনেক টাকা !'

'হ্যাঁ, অনেক।'

'আরে, এভাবে বলছ কেন ?'

'তুমি কি চাও আমি এই চাকরি করি ?'

'আমার চাওয়ার সঙ্গে তোমার চাকরি করার কি সম্পর্ক ?'

অসীম মুখ ফিরিয়ে নিল। দীপা ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। ট্রামটা খালি রাস্তা পেয়ে বেশ জোরে ছুটছে। দোকানপাট বন্ধ হতে আরম্ভ

করেছে। শেষপর্যন্ত অসীম বলল, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না ?'
'কেন ?'
'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম।'
'কি ব্যাপারে ?'
'আমি তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম।'
'সেটা যে সত্যি নয় তার প্রমাণ কি তুমি পেয়েছ ? মামার কথা সত্যি নয় তাই বা ভাবলে কি করে ? আর এসবের সঙ্গে তোমার চাকরি করারই বা কি সম্পর্ক ?'
'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই দীপা !'
নড়ে উঠল দীপা। একরাশ ভাল লাগার ঢেউ যেন তাকে নিয়ে লোফালুফি করছে।
ট্রাম ততক্ষণে মাঝপথ পার হয়ে গিয়েছে। দীপা অসীমের দিকে না তাকিয়ে বলল। কিন্তু আমি তো তোমাকে মিথ্যে বলেছিলাম।'
'আমি সব ভুলে যেতে চাই দীপা। তোমার সঙ্গে দেখা না করে আমি একটুও ভাল ছিলাম না। আমি জানি না তোমার কষ্ট হয়েছে কিনা ?'
'হয়েছে।'
'তাহলে ?'
'কি তাহলে ?'
'ওসব কথা তুলছ কেন ?'
'তুমি এখনই বিয়ের কথা তুলছ কেন ?'
'আমি একা দিল্লীতে যাব না।'
'কেন ?'
'না। তোমাকে কলকাতায় ফেলে রেখে আমি দিল্লীতে গিয়ে ভাল থাকব না।'
'কিন্তু তোমাকে তো অপেক্ষা করতে হবেই অসীম।'
'ও, তোমার সেই আই এ এস ? ওটা এখনও মাথায় ঢুকে আছে ?'
'আছে। সহায় সম্বলহীন বাঙালি মেয়ের ওপরে ওঠার একমাত্র পথ হল এইসব কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নেওয়া অন্তত মামা কাকার রেফারেন্স এখনও লাগে না।'
'তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করছ ?'
'আমি, তোমাকে, কিভাবে ?'
'ওই যে দিল্লীর চাকরি বাবার বন্ধুর মারফত পেয়েছি বলে। আমি জানি আমার অনেক বন্ধুর কথাটা শোনামাত্র বুক টাটাচ্ছে। এই বাজারে তিন শো টাকা মাইনে কজন পায় ?'
'তুমি কি আমাকে তোমার ওইসব বন্ধুর দলে ফেলছ ?'
'না, না। কিন্তু তোমার কথা বলার ধরন এমন— !'
'অসীম, তুমি আমার একটা কথা শুনবে ?' ওর হাত আবার স্পর্শ করল দীপা।
'নিশ্চয়ই !'
'তুমি দিল্লীতে চলে যাও। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার মিলছে না। যে কোন বিষয়ে কথা বললে মনে হয় আমাদের ঝগড়া বেধে যাবে এই অবস্থায় বেশীদিন আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব না। ভালবাসা এক জিনিস আর পরস্পরকে বুঝতে পারা আর এক জিনিস !'
'তুমি আবার আমার সঙ্গে খেলা করছ !'
'খেলা ! তুমি খেলা বললে ?'

অসীম চট করে উঠে দাঁড়াল, 'শোন, আমি শুনেছি আই এ এসে ম্যারেড মেয়েরা চান্স পায় না। অতএব তোমার কোন চান্স নেই।' বলে কোন জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হনহন করে গেটের কাছে চলে গেল। ট্রামটা বিবেকানন্দ রোডে থামতে অসীম নেমে পড়ল। তারপর একবারও না তাকিয়ে অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল। দীপার মাথায় তখন কিছুই ঢুকছিল না। অসীমের শেষ কথাটা তাকে যেন অসাড় করে দিয়েছে। ট্রাম ছাড়ল।

॥ ৪১ ॥

বিছানায় টান টান দীপা ফিস ফিস করে বলল, 'আমি কি ঠিক করছি ?' এই বলাটা এমন নিঃশব্দে যে তার শরীরও যেন শব্দগুলো টের পেল না।

ঘর অন্ধকার। হোস্টেলের অন্যত্র একটু হাসির আওয়াজ, চিৎকার করে কোন সিরিয়াস ছাত্রীর পড়া চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং সামনের রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির শব্দ ছাড়া পৃথিবী এখন ঘুমের দিকে চলছে। নিজস্ব ঘরে, নিজস্ব বিছানায় শুয়ে চোখ বন্ধ করে দীপা নিঃশব্দে ওই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করল, করতেই অসীমের মুখ মনে পড়ল এবার।

বিবাহিতা মেয়েরা ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে পারবে না! কেন ? অসীম খবর নিয়েছে ? কেন নিল ! কেন নিয়েছে তার জবাব অবশ্যই সরল। মানুষ মানুষকে আটকাতে চায়। সে যদি আই এ এস হতো তাহলে কি অসীম অসুবিধায় পড়ত ? হয়তো। তাই খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বুক ফুলিয়ে কথাগুলো বলে ট্রাম থেকে নেমে গিয়েছে। আমার কথায় যখন রাজি হচ্ছো না তখন মরো গিয়ে। এ কি রকম চাওয়া ! কাউকে বাধ্য করে কি ভালবাসা আদায় করা যায় ? তোমার চারপাশে সব দেওয়াল তুলে যে ফাঁকটুকু রেখেছি তাই গলে আমার রাস্তায় চলে এসো !

কিন্তু অসীমের কথাবার্তায় মিল থাকছে না কেন ? স্পষ্ট মনে পড়ছে প্রথম আলাপের দিনগুলোতে অসীম নিজের ভবিষ্যত পরিকল্পনা অন্যরকম বলেছিল। ওরা তিন ভাই। বাবা কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। বড়বাজারে বড় ব্যবসা আছে। দাদারা সেই ব্যবসা থেকে খুব কালো টাকা রোজগার করছে। অসীমের ওসব ভাল লাগে না। সে জীবনটাকে অন্যভাবে দেখতে চায় বলে বাড়িতে তার অবস্থা খুব আদরের নয়। ব্যবসা না করে সে এম এ পড়বে, রুচি, শিক্ষা এবং সৌজন্য দিয়ে একটা জীবন গড়বে।

হ্যাঁ, ঠিক এসব কথা বলেছিল অসীম। কফিহাউস থেকে ফেরার পথে এইসব কথা হয়েছিল। নাকি কফিহাউসে বসেই ? সেই অসীম আজ নিজের সম্পর্কে উল্টো কথা বলল। দিল্লী যাচ্ছে চাকরি নিয়ে। সেই চাকরি যিনি দিচ্ছেন তিনি ওই মাইনেতে অসীমকে দিয়ে যাচ্ছেন পারিবারিক বন্ধু হিসেবেই। কেন ? চাকরি কেন করবে অসীম পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ? যাদের পৈতৃক ব্যবসায় অত কালো টাকা তাদের তো সাদাও কিছু থাকে। সেই সাদাতে নিশ্চয়ই অংশ রয়েছে অসীমের। সেসব ছেড়ে দিয়ে কেন খামোকা ও দিল্লী যেতে চাইছে ? হঠাৎ মনে হল অসীমের এই দিল্লী যাওয়ার ব্যাপারটাই বানানো নয়তো ? স্রেফ তার ওপর একটা চাপ তৈরী করার জন্যে অভিনয় করে গেল হয়তো। এতদিন আড়ালে থেকে এমন কথা বলার জন্যে যখন কেউ আসে তখন— ! চোখ বন্ধ করেই মাথা নাড়ল দীপা। না, সে যাচাই করবে না। অসীমের বাবা আছেন কিনা, দাদারা ব্যবসাদার কিনা এসব যাচাই করে সত্যি জেনে তার কোন লাভ হবে না। সত্যি হলেও যা, না হলেও তা। আজ যার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল বুকের ভেতরে অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে তার

সম্পর্কেই যদি এত তাড়াতাড়ি সন্দেহ গুঁড়ো লঙ্কার মত জড়িয়ে যায় তাহলে চোখ কানের তৃপ্তির কোন দরকার নেই। মানুষ চোখ কান মুখ নিয়ে সারাদিন যুদ্ধ করে যেতে পারে কিন্তু মনের শান্তি ছাড়া রাতের ঘুম খুঁজে পায় না।

কিন্তু আই এ এস পরীক্ষায় যদি বসার সুযোগ সে না পায় তাহলে কি করবে ? বি এ পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত জীবনটা সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চোখ বন্ধ করেও এই কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু তারপর ? এম এ পাশ করে একটা স্কুলে অথবা কলেজে চাকরি খোঁজা, ভাগ্য কতটা সাহায্য করবে, পরিস্থিতি কতটা অনুকূলে থাকবে ? আজ টিউশনিতে সে একধরনের নতুন শক্তি আবিষ্কার করেছে। যে শক্তি থাকলে জীবনের সবরকম অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। নিজের ওপর আস্থা আসছে। একটায় না কুলোলে দুটো, প্রয়োজন হলে আরও বেশী ছাত্রী পড়াবে সে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে রাধা যদি এতটা লড়াই করতে পারে তাহলে সে পারবে না কেন ? ফুলশয্যার রাত্রে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তার বোধ হয় কোন শেষ এ জীবনে নেই। কিন্তু তাকে যেতে হবে জীবনের অনেক ওপর তলায়। যেখানে পৌঁছে মেয়ে হিসেবে কারও অনুকম্পা পাওয়ার বদলে মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। এতকাল তার মনে হয়েছিল আই এ এস পরীক্ষায় পাস করে চাকরিতে ঢোকা সেই ইচ্ছেটাকে সহজ করার অন্যতম পথ। কিন্তু অসীম আজ সবকিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল। যেন গভীর জলের মধ্যে ডুব সাঁতার দিতে দিতে বুকের ভেতর অক্সিজেন ফুরিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা আবিষ্কার করল দীপা। না, ভেবে কোন লাভ নেই। তাকে যেতে হবে সেই বালকের মত যে পাহাড়ি রাস্তায় চলার সময় শুধু সামনের বাঁকের দিকে চোখ রাখে। বাঁ কিংবা ডাইনে মোড় নিতে নিতে ওপরে ওঠার সময় আগে থেকেই দ্বিতীয় অদেখা বাঁকটির কথা যে চিন্তা করে না। ওপরে ওঠার সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপায়। সমস্যা যা আসবে তাই নিয়ে ভাবা, তারই মোকাবিলা করা। সুদূরের কথা আগাম চিন্তা করা বোকামি। কাল প্রথম কাজ হবে খোঁজ নেওয়া, সত্যি সে আই এ এস পরীক্ষায় বসতে অক্ষম কিনা। সেইটে সঠিক জায়গায় না জানা পর্যন্ত কোন চিন্তা নয়।

জীবন মানেই সুখের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো, বেঁচে থাকা মানেই দুঃখের সঙ্গে অজান্তেই সহবাস করা। অবিমিশ্র সুখ মানুষের ভাগ্যে কখনই লেখা হয় না। সুখ বাঁচিয়ে রাখতে সবচেয়ে বেশী অস্বস্তি অনুভব করে মানুষ। যে কোন ছলছুতোয় সে দুঃখকে ডেকে নিয়ে আসে। সুখের চেয়ে দুঃখের সঙ্গে বাস করতে মানুষ বড় আরাম বোধ করে। কারণ অতি সুখে হাহাকার থাকে না। সন্দেহ, জ্বালা অথবা নিজেকে বঞ্চিত ভাবার যন্ত্রণা পাওয়া যায় না। কোন এক মুহূর্ত, অথবা কিছু দিনের বুকে খুশির সূচীকর্ম সারা জীবন টাঙিয়ে রাখার নাম জীবন। মানুষ তাতেই অভ্যস্ত। দীপা নির্ঘুম রাত্রে এমন কোন সুখের কথা ভাবছিল যার স্মৃতি লালন করা যায়। একমাত্র সেই চা-বাগানের ছেলেবেলার দিনগুলো ছাড়া আর কোন সুখের ছবি মনে আসছে না। চোখ বন্ধ করেও একটা ভরাট দিন মনে তুলে আনতে পারছে না। দীপা উঠে বসল। না, সে অসীমকে ভালবাসেনি। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষকেই সে ভালবাসেনি। বেঁচে থেকে যদি নারী কোন পুরুষকে ভাল না বাসে অথবা ভালবাসা না পায় তাহলে তার জন্যে কোন সুখের স্মৃতি জমানো থাকে না। তার মানে জীবন মানে এক্ষেত্রে সুখের স্মৃতি বয়ে বেড়ানো নয়। কিন্তু নিয়ম যা তা চিরকালই নিয়ম, তার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবার কোন কারণ নেই। তাহলে দুঃখ আসার আগে তো যত ক্ষণস্থায়ী হোক, সুখ তার জীবনে আসবেই আর এলে সে নিশ্চয়ই টের পাবে। হেসে ফেলল দীপা, তারপর পাশ

ফিরে চোখ বন্ধ করল।

সকালটা কেটেছিল ছটফটানি নিয়ে। দুপুরে সেটা কেটে গেল। কেটে যাওয়ার পর, যেন সমস্ত ময়লা থিতিয়ে যাওয়া টলটলে দিঘির মত হয়ে গেল মনটা। অদ্ভুত আরাম, কারো জন্যে কোন আক্ষেপ নেই। এমন কি সেটা যদি অসীমও হয়, তবু। অসীমকে তার মোটেই খারাপ লাগছে না। একটুও শত্রু বলে মনে হচ্ছে না। স্বাধীনতার পর পর ভারতীয় বিবাহিতা মেয়েদের আই এ এস পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হত না, কিন্তু এই অন্যায় নিয়মটা যে তুলে দেওয়া হয়েছে তা অসীম জানত না। জানত না বলেই হাতিয়ার করেছিল। কেউ ভুল অস্ত্র নিয়ে লড়াই করছে জানার পর তার জন্যে একধরনের মায়া হয়।

কলেজ স্ট্রীটে নেমে দীপা একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে তাকাল। এখানে এলেই সত্যসাধন মাস্টারমশাই-এর মুখ মনে পড়ে। ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল সে ওই কলেজে পড়ে। ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি বলে এখন কোন আফসোস নেই দীপার। কিন্তু একটা কথা খুব মনে পড়ে, মাস্টারমশাই বলতেন, যখন কোন কিছু শুরু করবে তখন এক নম্বর থেকে করবে। জীবনের যা কাজ তা সেরা জিনিসে দাঁড়িয়ে করবে। এর একটা আলাদা প্রভাব আছে। হয়তো আছে। কিন্তু ভাবনা আর বাস্তবের মধ্যে যে মাঝে মাঝেই কোন সেতু থাকে না। এই কলকাতা শহরে তার একটা নিরাপদ থাকার জায়গার দরকার ছিল।

জীবনে প্রথমবার একা কফিহাউসে উঠল দীপা। সমুদ্রের পাশে কোনদিন যায়নি সে। পড়া, শোনা এবং ছবিতে দেখা বর্ণনার সঙ্গে এই আওয়াজটা মিলিয়ে নিয়ে সমুদ্র গর্জন ভাবতে খারাপ লাগে না। ভেতরে ঢুকতেই অনেক টেবিল থেকে তার দিকে নজর ছুটে এল। এবং এইসময় সে অসীমকে উঠে দাঁড়াতে দেখল। কোণের টেবিলে তিনটি ছেলের সঙ্গে অসীম বসেছিল। তাকে দেখে যে খুব অবাক হয়েছে বুঝতে অসুবিধে হল না। দীপা এগিয়ে গেল। অসীম ঠিক বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত। দীপা হেসে বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।'

'কি ব্যাপার?' অসীম কোনক্রমে প্রশ্নটা করল। তাকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল।

'কোন ব্যাপার নেই। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, মনে হল তুমি থাকতে পার তাই চলে এলাম। বসতে বলতে অসুবিধে আছে?' দীপা আবার হাসল।

পঞ্চম চেয়ার নেই। অসীম ব্যস্ত হয়ে পাশের টেবিল থেকে একটা চেয়ার চেয়ে টেনে এনে বলল, 'বসো।' কিন্তু দীপা ততক্ষণে অসীমের খালি চেয়ারটির দিকে এগিয়ে গিয়েছে। আরাম করে সেটায় বসতে অসীমকে পঞ্চম চেয়ারে বসতে হল। এখন দেখলেই বোঝা যায় ওই চেয়ারটি পরে সংযোজিত হয়েছে। অসীমকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দেওয়া হল।

দীপার দিকে অসীমের বন্ধুরা তাকিয়েছিল। অসীম তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে মুখ খুলতেই দীপা বলল, 'আমার নাম দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কটিশে পড়ি। অসীম আমার সিনিয়ার। কিন্তু বন্ধু হিসেবে খুব সিনসিয়ার। আপনারা নিশ্চয়ই ওর বন্ধু?'

দীপা লক্ষ্য করল তার এরকম কথা বলার ধরন দেখে তিনজনেই বেশ চমৎকৃত। আর অসীম যেন আরও নিবে গেল। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'কফি খাবে?'

অসীমের বন্ধু সুজন বলল, 'কি রে? কফি খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করছিস?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না ঠিকই করেছে। ও জানে আমি কফি পছন্দ করি না। ঠিক অভ্যেসে নেই বলে রাত্রে ঘুম হয় না। গ্রাজুয়েশনের পর আপনাদের পরিকল্পনা কি?'

তিনজন যুবক পরস্পরকে একবার দেখল। একজন বলল, 'এম এ পড়ব।' মনে হল বাকি দুজনেরও একই বক্তব্য। দীপা বলল, 'অসীম, তুমি কি সত্যি দিল্লী চলে যাচ্ছ ? কি দরকার ? বন্ধুরা যখন এম এ পড়ছে তখন তোমার চাকরি করতে ভাল লাগবে ?'

রঞ্জন আঁতকে উঠল, 'তুই দিল্লীতে চাকরি করতে যাবি, বলিসনি তো ?'

দীপা বলল, 'ওমা আমি কি গোপন খবর ফাঁস করে দিলাম।'

হঠাৎ অসীম উঠে দাঁড়াল, 'দীপা, তুমি একটু বাইরে আসবে ?'

'কেন ? এইতো এলাম।'

'তোমার সঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই।' অসীমের মুখ খুব শক্ত, সে একবার ঠোঁট কামড়ে নিল।

'এখানে বসে বলা যায় না ?'

'গেলে আমি উঠে দাঁড়াতাম না।'

'আমার তো মনে হয় না তোমার এমন কিছু কথা আছে যা শুনতে এখান থেকে উঠে যেতে হবে। তুমি বরং বসো।' দীপা হাসল।

অন্যান্য টেবিলে অসীমের উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলাব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অনেকেই এদিকে তাকাচ্ছে। রঞ্জন অসীমের হাত ধরে টানল, 'বস। সিন ক্রিয়েট করিস না। তুই আজকাল বড্ড অল্পে রেগে যাচ্ছিস।'

খুবই অনিচ্ছা ছিল, ঘাড় গোঁজ করে বসল অসীম। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। অসীমের তৃতীয় বন্ধু যার নাম অতীন, জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, নিজেরটা বলেননি।'

'আমি চাকরি করব।'

'চাকরি ?' সুজন চমকে উঠল, 'কি ধরনের চাকরি ?'

'একদম ওপর থেকে চেষ্টা করব। যা পাই। একটু আগে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। ও অসীম তুমি আমাকে ভুল খবর দিয়েছিলে। আই এ এস-এ বসার ব্যাপারে এখন ওই বিধিনিষেধ নেই। স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই উঠে গিয়েছে। যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গীতে কথাগুলো বলে দীপা অসীমের মুখের দিকে তাকাল। শোনামাত্র অসীমের কপালে ভাঁজ পড়েছে। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে।

অতীন বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি আই এ এস দেবেন ?'

'ইচ্ছে আছে।'

'আই এ এস দিতে গেলে দারুণ পড়াশুনার দরকার হয়। খুব ব্রিলিয়াণ্ট না হলে চান্স পাওয়া যায় না। আমার তো কখনও সাহসই হয়নি।'

'ফর্ম ভর্তি করে পরীক্ষায় বসতে সাহসের প্রশ্ন কেন আসবে। তিন চার মাস নিয়মিত পড়ে পরীক্ষা দিলে ফল খারাপ কেন হবে ? আসলে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে বি এ এম এ পরীক্ষার আগে যা পড়ে তার সিকি ভাগ এসব পরীক্ষার আগে পড়ে না। তাই রেজাল্ট খারাপ হয়। ব্যাপারটা আকাশকুসুম নয় তার প্রমাণ প্রতিবছর তো অনেকেই পাস করে চাকরি পাচ্ছে।'

'মেয়েরা আই এ এস হয়েছে ?' রঞ্জন প্রশ্ন করল।

'কেন হবে না ? আপনারা খবর রাখেন না তাই।' দীপা চারপাশে তাকাল, 'অসীম, আমাকে একটা ব্যাপারে সাহায্য করতে পার ?'

অসীম তাকাল। মুখে কিছু বলল না।

'ছুটি আসছে। হোস্টেল বন্ধ থাকবে মাসখানেক। এই এক মাস থাকার জন্যে একটা জায়গা চাই। কি করা যায় বলতো ? দীপা খুব সিরিয়াস হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

সুজন জানতে চাইল, 'কেন, আপনার আত্মীয়স্বজন নেই ?'

'কাছের বলতে কেউ আর নেই এখন, যাঁর কাছে গিয়ে থাকা যায়।'

'কি বলছেন ? এই পৃথিবীতে আপনার আপনজন কেউ নেই ?' রঞ্জন বলে উঠল।

'এক এক সময় সত্যিটা খুব অস্বস্তিকর হয়।'

'হোস্টেলে আসার আগে কোথায় ছিলেন ?'

'এই রে, এর মধ্যেই আপনারা জেরা শুরু করে দিলেন।' দীপা হাসল, 'তখন সব ছিল, এখন কেউ নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে চিরকাল এক থাকবে এমন তো নাও হতে পারে। কলকাতায় আমার তেমন জানাশোনা নেই, তাই আপনাদের বললাম।'

অতীন বলল, 'মুশকিল হল, এক মাসের জন্যে কেউ আপনাকে বাড়ি ভাড়া দেবে না।'

'বাড়ি ভাড়া ? ওরে ব্বাস, বাড়ি ভাড়া দেবার টাকা পাব কোথায় ?'

'তাছাড়া পাবেনও না। প্রথম কথা এক মাস আর দ্বিতীয় কথা আপনার সঙ্গে কেউ নেই।'

'কেউ নেই মানে ?'

'একা মেয়েকে কলকাতা শহরে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয় না।'

'সে ভাড়া দিতে সক্ষম হলেও নয় ?'

'না।'

'কেন ?'

'হয়তো বাড়িওয়ালারা বিশ্বাস করে না।'

'কিসের বিশ্বাস ?'

অতীন থতমত হল, 'মানে একা মেয়ে দেখলেই লোকে তার চরিত্র সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবতে আরম্ভ করে। এদেশে মেয়েরা কখনও একা থাকে না বলেই এটা হয়েছে।'

সুজন বলল, 'আমি শুনেছি হোটেলেও কোন ভারতীয় মেয়ে একা গেলে তার নামে ঘর দেওয়া হয় না। বিদেশিনীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নেই।'

দীপা বলল, 'বুঝলাম। এখন এ নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই।'

অতীন বলল, 'আপনাকে আমি আগামীকাল একটা খবর দিতে পারি।'

'কি রকম ?'

'আমার মাসীমার একটা ফ্ল্যাট আছে এলগিন রোডে। ওঁরা থাকেন সিমলায়। চাবি থাকে মায়ের কাছে। মাকে আপনার প্রব্লেম বললে তিনি যদি রাজি হন !' অতীন কথাগুলো শেষ করল না। বোঝা গেল যে উৎসাহ নিয়ে সে কথা শুরু করেছিল, বলতে বলতে সেই উৎসাহ সে হারিয়ে ফেলছে।

'আমি তো ডানডাস হোস্টেলে থাকি। যদি আপনার মায়ের আপত্তি না থাকে তাহলে খবর দিলে খুশি হব।' কথাগুলো বলতে বলতে দীপা দেখল মায়া একটি ছেলের সঙ্গে কফিহাউসে ঢুকে এপাশ ওপাশে তাকাচ্ছে। কাউকে খুঁজতে এসেছে কিন্তু পেল না। দীপা উঠে দাঁড়াল, 'আমি চলি। অসীম, আমরা বন্ধু। এর বেশী পরস্পরের কাছে আশা করা ঠিক নয়। তোমার দেখা পেতে পারি এমন আশা ছিল বলে কফিহাউসে এসেছিলাম। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই, তুমিও আমাকে ভুল বুঝো না। অন্তত আবার যখন দেখা হবে তখন মুখোমুখি যাতে কথা বলতে পারি তেমন সম্পর্কই রাখতে চেষ্টা করা

উচিত।' দীপা অন্যদের দিকে তাকাল, 'চলি।'

দীপাকে আসতে দেখে মায়া অবাক হল। সে চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, চোখ বড় করে বলল, 'তুই ! এখানে ?'

'এসেছিলাম। কাউকে খুঁজছিস ?'

'হ্যাঁ। আমাদের মেকআপ ম্যান।'

'মেকআপ ম্যান মানে ?'

'আরে মেকআপের জিনিসপত্র যার কাছে থাকবে। কথা ছিল ও এখানে থাকবে আর আমরা যাওয়ার সময় ওকে তুলে নিয়ে যাব।' মায়া ঘড়ি দেখল।

'রিহার্সাল আছে ?'

'রিহার্সাল নয়, শো। যাবি ?'

'কোথায় ?'

'পাকপাড়ায়। একটা কল শো পেয়ে গেছি আমরা।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল মায়া। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'পাকপাড়ায় থিয়েটার হল আছে ?'

মায়ার সঙ্গী হো হো করে হেসে উঠল। মায়া তাকে ধমকালো, 'এই শংকর, অমন গাধার মত হাসবি না। দীপা কিছু জানে না বলে জানবে না এমন মানে নেই।'

শংকর বলল, 'থিয়েটারের হল থাকলেই আমরা শো করতে পারতাম নাকি ? হাসলাম তাই। আজ সকালে বোন বলছিল তোমরা হলে থিয়েটার কর না কেন ? সেই কথাটাই মনে পড়ে গেল এঁর প্রশ্ন শুনে।'

'এতে হাসির কি হয়েছে ?' দীপাব খুব খাবাপ লাগছিল।

'অক্ষমতা বলে একটা শব্দ আছে, জানেন ?' শংকর ঘুরে দাঁড়াল, 'আমাদের চেষ্টা আছে, ক্ষমতাও, কিন্তু পয়সা নেই। ধার করে হল ভাড়া করলে কেউ টিকিট কাটবে না। কয়েকবার সেই চেষ্টা করে এখন হোঁচট খাচ্ছি। মাঠে ঘাটে শো করার সুযোগ না পেলে নাটক রিহার্সাল রুমেই থেকে যেত।' শংকরের বলার ভঙ্গীতে যে আন্তরিকতা ছিল তা স্পর্শ করল দীপাকে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'মাঠে ঘাটে অভিনয় করলে আপনাদের লাভ হয় ?'

'খুব সামান্য। আমাদের ডেকে লোকে বেশী টাকা দেবে কেন ? কিন্তু ওই সামান্য লাভ জমিয়ে জমিয়ে যদি থিয়েটারের হলে দু-একটা শো করতে পারি সেই আশা নিয়ে থাকা।'

'আপনাদের নাটক লোকে টিকিট কেটে দেখতে চায় না কেন ?'

মায়া এতক্ষণ শুনছিল কথাবার্তা আর তার চোখ সেই মেকআপ ম্যানের সন্ধানে রাস্তায় ঘুরছিল। সে বলল, 'এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে তোমাকে আমাদের নাটক দেখতে হবে। আমরা প্রফুল্ল কিংবা দুই-পুরুষ অভিনয় করতে চাই না, বঙ্গে বর্গী অথবা কেদাব বায করার যুক্তি খুঁজে পাই না। এখনও বাংলাদেশে এইসব নাটকের প্রচুর দর্শক আছে।'

'কিন্তু নবান্ন, পথিক, রক্তকরবী, বিসর্জন ?' দীপা নামগুলো মনে করছিল।

এবার জবাব দিল শংকর, 'বিসর্জন দেখতে কটা দর্শক যাচ্ছেন ? বহুরূপীর মত অত বড় শক্তিশালী অভিনেতাগোষ্ঠী থাকতেও এই অবস্থা। ওই যে এসে গিয়েছে।'

দীপা দেখল একটি মাঝবয়সী মানুষ একটা বড় বাক্স নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছে। মায়া বলল, 'যাবে নাকি ?'

দীপা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। লোকটা ততক্ষণে কাছে এসে গিয়েছে, 'দেরি হয়ে গেল। তোমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ, না ? খুব দুঃখিত !'

'আপনার তো দেরি হয় না দেবেশদা ?' শংকর হাঁটতে শুরু করল।

'হুম। তোমার বউদির সকাল থেকে এক শো তিন-চার জ্বর। আমি ছাড়া তো সামলাবার কেউ নেই। মাথায় জল ঢেলে ঢেলে একটু জ্বর কমিয়ে এলাম।'

'ডাক্তার দেখাননি ?'

'প্রথম দিন তো, প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে।' দেবেশবাবু দীপাকে দেখল, 'এটি কে ?'

'আমার বন্ধু। দীপাবলী।'

'চমৎকার নাম। উঠে পড়, বাস আসছে।'

একটা মাঝারি ভিড়ের বাসে ওরা উঠে পড়ল। লেডিস সিটে এক ভদ্রলোক বসে ছিলেন। ওদের দেখে উঠে পড়তেই দীপা মায়াকে বলল, 'বসে পড়। তুই অভিনয় করবি।'

মায়া মাথা নাড়ল, 'না। আমি লেডিস সিটের অ্যাডভানটেজ নিই না।'

দীপা অবাক হয়ে গেল, 'ও মা, কেন ?'

'নিজেকে খুব দুর্বল মনে হয়। অন্যের অনুকম্পা নিচ্ছি ভাবতে খারাপ লাগে।' মায়া হাসল, 'শংকরের সঙ্গে আমার কোন ফাবাক নেই, তাহলে ও বসতে পারবে না যেখানে সেখানে আর একটা মানুষকে উঠিয়ে আমি বসতে যাব কেন ?'

কথাগুলোর মধ্যে জোরালো যুক্তি দেখতে পেল দীপা। সে উঠে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে বলল, 'আপনি বসুন। আমরা বসব না।' বলামাত্র ভদ্রলোক ধপাস করে বসে জানলা দিয়ে চোখ মেলে দিলেন বাইরে। কিন্তু বাসের অন্যান্য যাত্রীরা ঘুরে ফিরে তাদের দেখছে এখন। এমন ব্যাপার যেন কেউ আগে দেখতে পায়নি। আর তাই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। বিদেশে নাকি লেডিস সিট বলে কিছু নেই। আর একজন গলা চড়ালো, 'বিদেশে কি বলছেন, বম্বেতে গিয়েছিলাম, সেখানেও বাসে লেডিস সিট দেখতে পাইনি।'

মায়া ঠোঁট টিপে হাসছিল, নিচু গলায় বলল, 'বাঙালি পরের ছেলেমেয়ের ওপর এক্সপেরিমেন্ট করতে খুব ভালবাসে, বুঝলে !'

শংকর বাসের ভাড়া দিয়েছিল। বিকেল ফুরাবার আগে ওরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। অবশ্য এর মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে শ্রীনাথ মুখার্জী লেনটা কোথায় ? শেষপর্যন্ত গলি বন্ধ করে তৈরী করা মঞ্চ নজরে পড়ল। সামনে গোটা পঞ্চাশেক চেয়ার পাতা আছে। ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়। ওদের দেখে গুঞ্জন উঠল, 'হিরোইনরা এসে গিয়েছে।' সঙ্গে সঙ্গে আরও কৌতূহলী কিছু মানুষ মুখ বাড়াল।

মঞ্চের পেছনে আসামাত্র শমিতের গলা শোনা গেল, 'দেবেশদা, আপনাকেও যদি ডিসিপ্লিন শেখাতে হয় তাহলে তো মুশকিল। কটার সময় আসার কথা ছিল আর এলেন কখন ? শংকর মায়া না হয় বড় অভিনেতা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আপনাব কাছ থেকে এটা আশা করিনি। যান, সবাই বসে আছে মেকআপ রুমে।'

সেই দাড়িওয়ালা ছেলেটি যে মণি কলেজে পড়ে, একদিন যার সঙ্গে মায়া তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, সেই শমিত এবার এগিয়ে এল সামনে, 'কি ব্যাপার ? আপনি ?'

দেবেশবাবু ততক্ষণে চলে গিয়েছেন চোখের আড়ালে। মায়া দাঁড়িযেছিল পাশে, 'কৌতূহল দেখাল, নিয়ে এলাম।'

'চমৎকার ! তোমরা এইসব করছ আব আমরা উনুন জ্বেলে বসে আছি। কাদের নিযে নাটক করব ? দ্যাখো মায়া, এই জিনিস আর কখনও যেন না হয়।' শমিত ঘুরে দাঁড়াল।

দীপার মনে হল সে এসে অন্যায় করেছে। শমিত পছন্দ কবছে না তার এভাবে আসাটা। সে মায়াকে বলল, 'আমি যাই।'

শমিত ঘুরে দাঁড়াল, 'যাই মানে ? যাবেন তো এলেন কেন ?'

'আমার মনে হচ্ছে আমি এসে আপনাকে বিব্রত করেছি !'

'নিজেকে এত মূল্যবান ভাবা ভাল, তবে এক্ষেত্রে নয়। আমরা পয়সা নিয়ে নাটক করতে এসেছি। এটা যাত্রার দল নয়। ভাল নাটক করতে হলে প্রত্যেকের আচরণ ভাল করতে হয়। এটাই বোঝাতে চেয়েছি আমি। আমাদের নাটক তো কখনও দ্যাখেননি ?'

দীপা মাথা নেড়ে না বলল।

'বহুরূপীর নাটক দেখেছেন ?'

'সুযোগ পাইনি।'

'সুযোগ ? এইতো গত সপ্তাহে নিউ এম্পায়ারে বিসর্জন হয়ে গেল। আসলে এসব দেখার মত মনই আপনাদের তৈরী হয়নি। যাও মায়া, দাঁড়িয়ে থেকো না।' শমিত হন্তদন্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেল। এইসময় সুজয় এল। দীপার মনে পড়ল, সুজয় নাটক লেখে। এই অনুবাদ করেছে সুজয়। তাকে দেখে মায়া জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলতো ? মাথা গরম হয়ে আছে খুব ! কিছু হয়েছে নাকি ?'

'শো-এর সময় এটাই তো ওর স্বাভাবিক অবস্থা। তার ওপর উদ্যোক্তারা যে টাকা দেবে বলেছিল তা থেকে পঞ্চাশ টাকা কম দিয়েছে আমদানী হয়নি বলে। ইনি ?'

'আমার বান্ধবী, দীপাবলী।'

'ওহো, আপনার সঙ্গে তো এর আগে একদিন আলাপ হয়েছিল। গ্রুপে জয়েন করলেন ?' এক মুখ হাসি নিয়ে প্রশ্ন করল সুজয়।

'না। ও আমার সঙ্গে নাটক দেখবে বলে এসেছে। আয় দীপা।'

পর্দা টাঙিয়ে মেকআপ রুম হয়েছে। ছেলেরা সংখ্যায় বেশী, তাদের জন্যে বড় জায়গা। নারী চরিত্র একটি। ছোট্ট ঘেরা জায়গায় কাঠের বাক্সের ওপর বসল মায়া। দেবেশদার কাছ থেকে চেয়ে আনা মেকআপের সরঞ্জাম নিয়ে সে নিজেই নিজের মেকআপ কবতে বসে গেল। অবাক হয়ে দেখছিল দীপা। জিজ্ঞাসা করল, 'এসব শিখলি কোথায় ?'

'সাজগোজ মেয়েদের স্বভাবেই থাকে। কিছু কিছু কায়দা দেবেশদার কাছে জেনেছি।'

'উনি তখন অত বকুনি খেয়েও শমিতবাবুকে কিছু বললেন না কেন ?'

'কি বলবে ?'

'ওঁর স্ত্রীর অসুখ।'

'দেবেশদার কাছে এটা কোন যুক্তি নয়। শমিতের কাছে তো নয়ই। নাটক হল প্রথম ভালবাসা, তার আগে কিছু নেই। মাস ছয়েক আগে শো-এর দুপুরে শমিতের মা মারা গিয়েছিলেন। বাড়িতে মৃতদেহ রেখে এসে শো করে ফিরে গিয়ে দাহ করেছিল। দেবেশদাও একই ঘরানার মানুষ।'

'তুই ?'

'জানি না। এখনও তেমন সমস্যায় পড়িনি। পড়লে হয়তো একই কাজ করব।'

'কিন্তু নাটকের জন্যে তোদের এত ভালবাসা কেন ?'

'মা তো মাঝে মাঝে আমাদের পাগল বলে।'

'শুনেছি অভিনয়ের একটা নেশা আছে।'

'হয়তো আছে। কিন্তু দীপা, দেবেশদা কখনও স্টেজে নামেননি। ব্যাক স্টেজের কাজকর্ম নিয়ে থাকেন। ওঁর ক্ষেত্রে কি বলবি ?'

মায়া মেকআপ করতে লাগল। দীপা চুপচাপ হয়ে গেল। কিছু শিক্ষিত ছেলেমেয়ে কোন উন্মাদনায় এমন কাণ্ড শুরু করেছে তা তার বোধগম্য হচ্ছিল না। শমিত যেভাবে

ধমকালো তা একমাত্র মালিকরাই পারে। কিন্তু কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। অথচ দল থেকে টাকা পাওয়া দূরের কথা পকেট থেকে টাকা দিতে হচ্ছে সবাইকে। এরই নাম কি ডিসিপ্লিন ? তাহলে বলতে হবে এই ডিসিপ্লিন মিলিটারির চেয়ে অনেক মূল্যবান। কারণ মিলিটারিরাও মাইনে পায়।

মায়ার মেকআপ নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করল, 'খুব চড়া হয়নি তো ?'

'খুব।'

'আমি কিন্তু কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি না। দর্শকের সঙ্গে আমার ব্যবধান থাকবে অনেকখানি। তার ওপর আলো পড়বে। দূরত্ব বাড়লে যে রেখাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় সেগুলোকে একটু প্রমিনেন্ট করতেই হয়। এবার বল।'

দীপা হেসে ফেলল, 'আমি বলতে পারছি না।'

মায়া ওই ঘেরার মধ্যে বসেই গলা তুলল, 'দেবেশদা ! একবার আসবেন !'

দেবেশদার গলা পাওয়া গেল, 'আসছি।'

একটু বাদেই পর্দা সরিয়ে দেবেশদার মুণ্ডু দেখা গেল, 'ঠিক আছে, বাঁ দিকটা সামান্য মেরে নাও আর কিছু ?'

মায়া মাথা নেড়ে না বলতে মুণ্ডু অদৃশ্য হল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'উনি তোর মেকআপ করে দেন না কেন ? সেটাই তো ভাল হত।'

'যারা একদম পারে না তাদের দেখিয়ে দেন। আমাদের থিয়েটারে পেশাদারী মেকআপ ম্যান রাখা সম্ভব নয় বলে সবাইকে এটা শিখতে হয়। তাছাড়া দেবেশদাকে পোশাকটাও দেখতে হয়। আমরা ঠাট্টা করে বলি লণ্ড্রিবাবু।'

'উনিও এই কাজের জন্যে পয়সা পান না ?'

'দূর। দেবেশদা দলের মেম্বার। কর্পোরেশনে চাকরি করেন। এর মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে দলকে দিয়েছেন।'

মায়া পোশাক পাল্টাতে শুরু করল। ব্যাপারটা এত দক্ষতার সঙ্গে সে শেষ করল যে দীপার একটুও অশ্লীল বলে মনে হল না। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এই নাটকে স্ত্রী চরিত্র একটাই ?'

'হ্যাঁ। তার বেশী থাকলে নাটক হবে না।'

'কেন ?'

'মেয়েই পাওয়া যায় না। শমিত বাইরে থেকে ভাড়া করে অভিনেত্রী আনবে না। আর সেটা দলের পক্ষে সম্ভবও না। পেশাদারী মানুষদের পক্ষেও আমাদের মত দলের সঙ্গে মানিয়ে চলা সম্ভব নয়। একটা নাটকে দুটো চরিত্র ছিল মেয়েদের। তার একটা কাজের লোকের। আমি ডাবল রোল করেছিলাম। কাজের মেয়ের ঘোমটা ছিল নাক অবধি।'

নাটক শুরু হল। এই মায়া চোখের সামনে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে গেল। শমিতকে যেন একটুও রাগী বলে মনে হল না। মানুষের সুখদুঃখ কি সাবলীলভাবে টুকরো টুকরো ছবি এঁকে ফুটিয়ে তুলল ওরা। এই ছবি আঁকাতে কোথাও কোন কিছু জোর করে চাপানো নেই। দীপার মনেই হচ্ছিল না সে থিয়েটার দেখছে। দর্শক ও মঞ্চের মধ্যে ব্যবধান তো থাকবেই কিন্তু মঞ্চের মানুষগুলো সাজানো গলায় কথা বলছে না, সাজানো সমস্যা নিয়ে দাপাদাপি করছে না। এ তার নতুন অভিজ্ঞতা।

নাটকের শেষেও দলের অনেক কাজ থাকে। হোস্টেলে ফিরতে দেরি হয়ে যাবে বলে বিদায় নিতে এল দীপা। শমিত তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন লাগল।'

'ভাল। খুব ভাল।' দীপা জবাব দিল।

'আশ্চর্য! সেটা মুখ ফুটে বলতে পারেন না? শুনলে উৎসাহ পাই।' শমিত যেভাবে কথাগুলো বলল তার অভিব্যক্তিটা দীপা বুঝতে পারল না।

॥ ৪২ ॥

কলেজের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে মায়া বলল, 'দূর, এটা কোন প্রব্লেমই না। তুই ছু।৩৩। আমাদের বাড়িতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারিস। তুই নিজেই মাকে বল না।'

মায়াদের বাড়িতে থাকার কথা দীপার মাথাতেও এসেছিল। ওদের ভাগে যে ঘরগুলো তাতে লোক বলতে মাত্র তিনজন। সে থাকতে চাইলে মাসীমা আপত্তি করবেন না। কিন্তু ছুটির অতগুলো দিন ওখানে থাকলেও মাসীমা নিশ্চয়ই তার কাছে টাকা চাইবেন না এবং সে-ও দিতে পারবে না। এইটেই অস্বস্তির। মায়া বলল, 'তুই সামনের রবিবার বাড়িতে এসে কথা বলে যা।'

'একটু ভাবি।' দীপা বলল।

'একটাই শুধু প্রব্লেম, সেটা স্নান করা।'

'কেন?'

'প্রথম দিকে আমি সবাইকে দেখে মেনে নিতাম। পরে আপত্তি করতেই তুলকালাম কাণ্ড হয়েছিল। এখন যেগুলো না মানলে বাড়ির ইজ্জত নষ্ট হয় সেগুলো মানি।'

'সেটা কি?'

'চৌবাচ্চায় বালতি চোবানো যাবে না, ধোয়া মগ দিয়ে জল তুলতে হবে, স্নান করে গায়ে গামছা জড়িয়ে ঘরে এসে কাপড় পাল্টাতে হবে, পিরিয়ডের সময় বাথরুমে ঢোকা চলবে না।' মায়া হাসতে লাগল।

'সেকি?' দীপা বলল, 'তোদের কি কমন বাথরুম?'

'পুরোন বাড়ি। আদ্যিকালের বাথরুম। আগে একটা ছিল কিছু দিন হল দুটো। নিচতলায়। একটা ছেলেদের আর একটা মেয়েদের। চৌবাচ্চার ওপর থেকে দেখা যায় নিচে এক ইঞ্চি পুরু কাদা পড়ে আছে। সপ্তাহে একদিন পরিষ্কার করা হয়।'

'তুই গামছা জড়িয়ে বাথরুম থেকে বের হোস?'

'মাথা খারাপ। তিরিশ দিনই সভ্যভব্য হয়ে বাথরুম থেকে বের হই।'

'ওইসময়ে বাথরুমে যাওয়া বারণ, মানে, আগের নিয়ম এখনও চলছে ও বাড়িতে।'

'ইয়েস ম্যাডাম। এসব কলকাতার বনেদী ব্যাপার। আমার জেঠিমা অল্পবয়সে বিধবা। তিনিই নিয়মরক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন। জেঠতুতো দাদার মেয়ে শরীর খারাপ হলে আর স্কুলে যায় না, ঘরে স্নান না করে বসে থাকে।'

'পাগল নাকি! তুই বোঝাস না কেন?'

'নিজে মানছি না এটাতেই আমরা মেমসাহেব হয়ে গিয়েছি। ওদের বোঝাতে গেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তুই বালতি আর মগের ব্যাপারটা মেনে চলবি, তাতেই কাজ হয়ে যাবে।' মায়া প্রসঙ্গ ঘোরাল, 'সেদিন নাটক দেখার পর আমরা ভেবেছিলাম তুই নিশ্চয়ই একদিন আসবি।'

'একদম সময় পাচ্ছি না রে। টিউশনি করছি সন্ধেবেলায়, পড়ার চাপও বেড়েছে।'

'তোর কথা খুব জিজ্ঞাসা করছিল সুজয়।'

'কেন ?' দীপা সত্যি অবাক হল।

'পরের নাটকে তোকে মানাবে এমন একটা রোল আছে।'

'আমি যে অভিনয় করবই এমন ধারণা ওঁর হল কেন ?' দীপা প্রশ্নটা করতেই মায়া হেসে ফেলল, 'বাব্বাঃ। তুই সুচিত্রা সেনের ছবি দেখিস, না ?'

'মানে ? হঠাৎ কোত্থেকে এ প্রসঙ্গ এল ?'

'তুই যে ভঙ্গীতে কথাগুলো বললি তা দেখে অবিকল ওরকম মনে হল !' মায়া ওর হাত ধরল, 'শোন। একদিন আয় না, রিহার্সাল দে। না পারলে আর যাস না।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'আমি যে কাজ করব সেখান থেকে হেরে ফিরব না।'

'বাঃ। খুব ভাল। তাহলে ?'

'দাঁড়া। ভেবে দেখি। মন চাইলে যাব।' দীপা সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

মায়া অবাক হয়ে তাকাল। কলেজের যে সমস্ত মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ আছে তাদের বুঝতে কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু দীপার কথাবার্তা তার কাছেও বড় বয়স্ক বলে মনে হয়।

ব্যাপারটা জেনে রাধা বলল, 'তুমি কি করবে ঠিক করেছ ?'

'বুঝতে পারছি না। মাসীমা, মানে মায়ার মা বললেন, ওঁদের ওখানে চলে যেতে। কোন অসুবিধে হবে না। মায়া পারলে আমিও পারব। তবে টাকা পয়সা নিতে পারবেন না। আর সেইটে হয়েছে মুশকিল। কারো বাড়িতে ওভাবে থাকা আমার পোষাবে না।' দীপা হেদুয়ার বেঞ্চিতে রাধার পাশে বসে কথাগুলো বলল। রাধা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কষ্ট করতে পারবে ?'

'কিরকম কষ্ট ?'

'এই একা থাকা, একা রান্না করে খাওযা ?'

'এতে কষ্ট কি ?'

'তাহলে আমাদের কলোনিতে আসতে পারো। ঠিক আমাদের ঘরের পাশেই একটা ঘর খালি আছে। এখনও ভাড়া হয়নি। আমরা বললে তোমাকে একমাসের জন্যে ভাড়া দেবে।'

'অত দূরে ?'

'দূব কোথায় ? আমি তো রোজ আসছি।'

'কত ভাড়া ?'

'পনের টাকা।'

'ঘরের জিনিসপত্র ? আমার যে কিছুই নেই।'

'কিছু লাগবে না। আগের ভাড়াটে খাট টেবিল চেয়ার ফেলে গেছে। মানে ভাড়া দিতে পারেনি বলে বাড়িওয়ালা নিয়ে যেতে দেয়নি।'

'কিন্তু আমাকে কি ভাড়া দেবে ? একা মেয়েকে কলকাতায় কেউ ভাড়া দেয় না।'

'তুমি নেবে কিনা ভেবে দ্যাখো তারপর ওসব চিন্তা— ! তোমাদেব এই কলকাতার নিয়মকানুন ওই কলকাতায় চলে না। পেটে ভাত না থাকলে ঠুনকো সম্মান নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কার থাকে বলো ? আজ গিয়ে দেখে আসবে ?' রাধা জিজ্ঞাসা করল।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল দীপা। ছুটির সময় রোজ কলেজে আসার দরকার নেই। শুধু টিউশনিটা নিয়ে মুস্কিলে পড়বে সে। সপ্তাহে তিনটে দিন তাকে আসতেই হবে। সন্ধের

পরে এখান থেকে বেরিয়ে কলোনিতে ফিরতে রাত হয়ে যাবে। তবু মায়াদের বাড়িতে অত অস্বস্তি নিয়ে থাকার চেয়ে এ ঢের ভাল। সে উঠল। রাধার মুখ খুব শুকনো। কদিন থেকেই সেটা লাগছিল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি শরীর খারাপ? কেমন দেখাচ্ছে।'

'না, না। ঠিক আছে। চার আনা পয়সা আছে? বাদাম খাওয়াও।'

উল্টোদিকে বেথুন কলেজের ফুটপাতে একটা বাদামওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে। রাধার এভাবে বাদাম কিনতে বলা খুব ভাল লাগল দীপার। আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে তাকে সরাসরি কিছু খাওয়াতে বলেনি। বাদাম কিনে ওরা সেখানেই দাঁড়িয়ে খোসা ছাড়াচ্ছে যখন তখন রাধা চাপা গলায় বলল, 'এই কনকবাবু আসছেন।'

দীপা দেখল স্কটিশ থেকে বেরিয়ে লম্বা ফর্সা প্রৌঢ় মানুষটি ধবধবে পাঞ্জাবি ধুতি পরে রাস্তা পেরিয়ে এদিকে আসছেন। ফুটপাথ বদল করে ওদের দেখতে পেয়ে মিষ্টি হেসে ট্রামের জন্যে দাঁড়ালেন। মানুষটির পোশাক, চেহারা এবং চালচলনে এমন একটা অভিজাত ব্যাপার আছে যে চেয়ে থাকতে হয়। ট্রাম এল। ওরা অবাক হয়ে দেখল ভদ্রলোক সেকেণ্ড ক্লাসে উঠলেন। অথচ ফার্স্ট ক্লাসে বসার জায়গা ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসে উঠে উনি জানলার পাশে বসলেন। রাধা দীপার দিকে তাকাল। মানুষটাকে আরও ভাল লেগে গেল দীপার।

শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে চেপে দীপার জলপাইগুড়ির কথা মনে এল। সেই ট্রেন আর এই ট্রেন অবশ্য একই চেহারার নয় কিন্তু চলতে আরম্ভ করলে আলাদা অনুভূতি হয় না। স্টেশন থেকে নেমে অনেকটা যাওয়ার পর একতলা বাড়ি, মাঠ চোখে পড়ল। এখানে এসে আর কলকাতা বলে মনে হচ্ছে না। জলপাইগুড়ির নতুন গড়ে ওঠা পাড়াগুলোর সঙ্গে ভাল মিল আছে। পিচের রাস্তা পাল্টে গিয়ে মাটির রাস্তা হয়ে গেল। রাধা বলল, 'স্টেশন থেকে কিন্তু বেশী সময় লাগে না। ট্রেন ধরার সময় আমি অবশ্য আরও জোরে হাঁটি।'

বাড়িগুলো গায়ে গায়ে নয়। প্রত্যেকেরই একটুখানি জমি আছে। তাতে নতুন গাছ গজিয়েছে। বাড়ির ছাদ টিনের, জলপাইগুড়ির মতনই। রাধা বলল, 'ওইটে আমাদেব বাড়ি।'

দীপা দেখল কয়েকটা বাচ্চা মার্বেল খেলছে কাঁচা রাস্তায়। যে বাড়িটা রাধা দেখাল তার চারপাশে কোন দেওয়াল নেই। দুটো কাঁঠাল গাছ ঝাঁকড়া হয়ে উঠছে। বাড়ির পাশ দিয়ে উঠোনে ঢুকতেই সে তিনজন মহিলাকে দেখতে পেল। উঠোনের ওপর একটা চৌকিতে বসেছিলেন তাঁরা। রাধা বলল, 'মা, আমার সঙ্গে পড়ে, দীপা।'

'অ। তোমার কথা খুব শুনছি। আসো। বসো এখানে।' বয়স্কা রোগা ভদ্রমহিলা মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে সস্নেহে ডাকলেন। অন্য মেয়েদের সঙ্গে রাধা তার পরিচয় করিয়ে দিল। একজন কাকিমা অন্যজন পাশের বাড়িতে থাকেন। রাধার মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি তো হোটেলে থাকো?'

'ওঃ মা, হোটেল নয় হোস্টেল। গার্লস হোস্টেল।' রাধা শুধরে দিয়ে ভেতরে পা বাড়াল। এরপর অবধারিত ভাবে এসে পড়ল সেইসব প্রশ্ন যা এখন দীপার কাছে খুব অস্বস্তিকর। বাবা মা ভাই বোন বাড়ি ইত্যাদির খবর নিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, জলপাইগুড়িতে তাঁর বোন থাকেন। পাকিস্তান থেকে আসার সময় তাঁরা এসেছিলেন কলকাতায় আর তাঁর বোন ভগ্নিপতি গিয়েছিল জলপাইগুড়ির দিকে। শুনেছেন জলপাইগুড়ি শহরেই বাড়িঘর দোকান করে বেশ গুছিয়ে বসেছেন ভগ্নীপতি। নাম বলে জিজ্ঞাসা করলেন দীপা চেনে কিনা। দীপার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। কথা বলার সময়

মহিলা ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরেছিলেন, 'কি কষ্ট, বুঝলা। আমরা এখানে কি কষ্ট কইর‍্যা থাকলাম। আমার মাইয়ার মত মাইয়া হয় না। সব নিজে করছে। পাঁচজনে কত কি কইল। আমি কই, আমার মাইয়া কোন অন্যায় কইরতে পারে না। নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পার্স করছে, কলেজে পড়তেছে। কি কষ্টই না করে! অথচ দ্যাশে আমাদের কি না ছিল। গোয়ালে আটখান গাই, যা ধান আসতো তাতে সারা বৎসর খাওয়া দেওয়া বিক্রী সব হইত। আর মাছ? কত খাইবা তুমি? খাও না। সে সব স্বপ্নেব মত ছিল।'

এইসময় ফিরে এল রাধা। চটপট শাড়ি পাল্টে নিয়েছে সে। এখন ওর পরনে অনেকটা রঙ চটা শাড়ি। বোধ হয় আজকের পরা শাড়িটাই কাল কলেজে যাওয়ার সময় পরবে। রাধা হেসে বলল, 'হয়ে গেল। তোমার এইসব গল্প শুনলে দীপা ভাববে ওই কথাটাই ঠিক।'

'কোন কথা?' ওর মা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন।

'পাকিস্তানের সমস্ত মানুষের পুকুরভরা মাছ আর খেতভরা ধান ছিল।'

'সঙ্গে সঙ্গে তর্ক উঠে গেল। সমস্ত মানুষের না থাক অনেকের তো ছিল। এই বিতর্কে বাকি দুজন মহিলাও সোৎসাহে অংশগ্রহণ কবলেন। তাঁদের থামিয়ে রাধা দীপার আসার আসল কারণ জানাল। রাধার মা বললেন, 'একা মাইয়া থাকতে পারবা?'

'কেন পারব না?' দীপা পাল্টা জানতে চাইল।

'তাইলে তো কোন মুশকিল নাই। ও আরতি, যাও, তোমার বাপরে কও, দীপা যখন রাধার বন্ধু তখন তো আপত্তির কোন কারণ দেখি না।'

'পনের টাকা ভাড়া কিন্তু, বাবা ছাড়ব না।'

'সেটা আমি দিতে পারব।' দীপা হেসে বলল।

রাধা এবং দীপা আরতিকে অনুসরণ করল। কাঁঠাল গাছ পেরিয়ে ওদের এলাকা। সেটা একটা বাখারির বেড়া দিয়ে আলাদা করা। সামনের রাস্তা ঘরে ঢুকতে হয়। এ বাড়িব সামনে বাখারির আড়াল রয়েছে। ভেতরে বড উঠোন। বাঁ দিকে ইটের দেওয়াল টিনের চালওয়ালা তিনখানা ঘর। ডানদিকে একটা ছোট ঘর। মাঝখানে কুয়ো আর ওপাশে বাথরুম পায়খানা। তিনঘরের বারান্দায় একজন বৃদ্ধ বসে হুঁকো খাচ্ছিলেন। আরতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটা রাখল।

বৃদ্ধ একবার দীপাকে আর একবার রাধার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কেউ সঙ্গে থাকব না?'

রাধা বলল, 'না। ও হোস্টেলে থাকে। ছুটির সময় একমাস এখানে থাকতে চায়।'

'একমাসের জন্যে?' বৃদ্ধ তামাক খেতে খেতে প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ।' রাধা মাথা নাড়ল।

'ভাড়াটা অগ্রিম দিতে হইব। আমার আর ঝামেলা ভাল লাগে না।'

এবার দীপা বলল, 'আমি রাধার হাতে কাল পাঠিয়ে দেব।'

'কি মুশকিল। আগে তো ঘর দ্যাখবা, পছন্দ হইলে তবে তো এসব কথা—।'

আরতি তাদের নিয়ে এল উল্টোদিকের একঘরের বাড়িতে। আসতে আসতে বলল, 'এই ঘর প্রথম হইছিল। আমরা সবাই তখন একসঙ্গে থাকতাম।' সে ভেজানো দবজাব শেকল খুলে ভেতরে ঢুকে জানলায় হাত দিল। মাঝারি সাইজের ঘব। জানলা খুলতেই হাওয়া এল। একটা তক্তাপোশ আর টেবিল চেয়ার ছাড়া ঘরে কোন সম্পত্তি নেই। জানলাব ওপারে বাখারির বেড়া, বেড়ার ওপরে আকাশ। এই ঘবটা তাব একাব হবে। আরতি বলল,

'তুমি কি রান্না করবা এখানে ? তাইলে বারান্দায় করতে হবে। রান্নাঘর তো এখন নাই। আর স্টোভে করলে ঘরের ভেতর করতে পারবা। অনেক জায়গা আছে।'

ঘর পছন্দ হল দীপার। এখানে একদম নিজের মত থাকা যাবে। একমাত্র ঝামেলা রান্নাবান্না করা। অঞ্জলি বা মনোরমা তাকে কখনও রান্না শেখাতে চাননি। কিন্তু ভাত ডাল সেদ্ধর ধারণা যে কোন বাঙালি মেয়েরই থাকে। কিন্তু সে রাঁধবে কিসে ? তার তো কোন সরঞ্জামই নেই। এটা নিয়ে অবশ্য চিন্তা করার সময় পাওয়া যাবে। সে বাইরে বেরিয়ে এসে বৃদ্ধকে জানাল, 'আমার পছন্দ হয়েছে। আমি কালই টাকা পাঠিয়ে দেব।'

'কবে থেকে আসবা ?'

দীপা তারিখটা বলল। বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, 'ভাঙ্গা মাস। এ মাসের ভাড়া আর্ধেক, সামনের মাসে পুরা। একটা নিয়ম যখন আছে তখন তো মানতেই হইব।'

আরতি রাধা আর সে ফিরে এল রাধাদের বাড়িতে। সেখানে তখন জলখাবার তৈরি। মুড়ি নারকোল আর চা। খেতে খেতে দীপার মনে হল মায়াদের বাড়ির পরিবেশের সঙ্গে রাধাদের বাড়ির কত পার্থক্য। মায়ার মা অবশ্যই আন্তরিক। কিন্তু প্রথমদিনেই মনে হচ্ছে এখানে সে বাইরের লোক নয়। খাওয়া শেষ হতে রাধার মা বললেন, 'শোন, তোমরা এখন গল্প কর। তুমি এখানে ভাত খাইয়া তবে যাইবা।'

'ভাত্! অসম্ভব!' চেঁচিয়ে উঠল দীপা।

'ক্যান ? তুমি ভাত খাও না ?'

'খাই। কিন্তু এখন। এই বিকেলে!'

'এখন কেন ? সন্ধ্যার পর খাইবা।'

'অসম্ভব। তখন খেয়ে আমি আর হোস্টেলে ফিরতে পারব না।'

'ঠিক পারবা। প্রথম দিন এখানে আইয়া ভাত না খাইয়া যাইবা ? হয় নাকি ?'

দীপা কাতর চোখে রাধার দিকে তাকাল। রাধা হাসল, 'মা, সত্যি ওর খুব অসুবিধা হইব। হোস্টেলের তো নিয়ম আছে। যখন তখন ঢোকা যায় না। ও তো এখানে আসতেছে, তখন একদিন ভাল করে ভাত খাওয়াইও।'

ভদ্রমহিলার মন ভাল হল না। চলে আসার সময় দীপাকে জড়িয়ে ধরে রাস্তা পর্যন্ত এলেন, 'তোমাদের দেইখ্যা আমার খুব গর্ব হয়। আমার তো বিয়া হইছিল পোলাপান বয়সে। পড়াশুনা কি জিনিস জানি না। স্বামী সংসার কইর‍্যা বুড়া হইলাম। একা একা আজ পর্যন্ত কোথাও যাইতে পারি নাই। এখন তো আরও না, ভয় লাগে।'

দীপার মন খুব ভাল হয়ে গেল।

অনেক অনেকদিন বাদে এইভাবে কেউ স্নেহ দিয়ে পৃথিবী আড়াল করল। রাধার সঙ্গে স্টেশনের দিকে যাওয়ার সময় তার মনে হল এখানে এসে সে ভাল থাকবে। রাধা বলল, 'মা ওইরকমই। কেউ এলে তাকে ভাত খাওয়াতে না পারলে ভাবে কিছুই করা হল না। অথচ এই জন্যে মাঝে মাঝে খুব বিপাকে পড়তে হয়। অভ্যেস যাবে কোথায়!'

'কেন ? বিপাক কেন ?'

'ধরো, আজ যদি তুমি খেতে রাজি হতে তাহলে ভাত ডাল পেঁয়াজের বড়া আর চিংড়ি মাছের বাটিচচ্চড়ি ছাড়া মা কিছু দিতে পারত না। এই দিয়ে কোন নতুন মানুষকে খাওয়ানো যায় ?'

দীপার মনে হল ভদ্রমহিলাকে সে যতটা ভাল ভেবেছিল তার চেয়েও ভাল। সে বলল, 'আমার যদি হোস্টেলের ব্যাপারটা না থাকত তাহলে ওই খাবার খেয়ে যেতাম খুশি হয়ে।'

ভ্রূ কুঁচকে দীপাকে একবার দেখে রাধা বলল, 'তুমি তাহলে আলাদা।'

রাত্রে নিজের বিছানায় শুয়ে দীপা এলোমেলো ভাবছিল। বাঙালদের ওপর মনোরমা বা অমরনাথ কোনদিনই তুষ্ট ছিলেন না। মনোরমার সুযোগ ছিল না কিন্তু মনে হয় অমরনাথ ওঁদের সঙ্গে মেশেননি। এই উত্তাপ সে কোন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে গিয়ে পায়নি। আবার সত্যসাধন মাস্টারের মুখ মনে পড়ল। ওই মানুষটির শরীরের ঘেমো গন্ধ ছাপিয়ে আন্তরিকতা এইভাবেই ঝরে পড়ত।

এখন সে একা ঘর ভাড়া নিয়ে কলকাতায় থাকবে! ভাবা যায়! দু বছর আগে সে ভাবতে পারত। বেঁচে থাকলে অমরনাথ হতভম্ব হয়ে যেতেন। একটা মানুষের খেতে কত খরচ হয়? হিসেবটা কষতে পারল না দীপা। যদি ঘরভাড়া আর খাওয়ার খরচ হোস্টেলের দক্ষিণার চেয়ে কম বা সমান হয় তাহলে এক মাসের বদলে অনেকদিন সেখানে থাকতে পারে। তার এখন পয়সা জমানো দরকার। বেশী খরচ করার কোন সুযোগই তো নেই। কিন্তু জায়গাটা অনেক দূর। রাধার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, সে কি পারবে! আজ সন্ধের পর ট্রেনে উঠে সে বেশ অস্বস্তিতে ছিল। একগাদা লোক সমানে তাকে লক্ষ্য করে গেছে, ট্রেনের কামরায় দ্বিতীয় কোন মেয়ে ছিল না। শিয়ালদা স্টেশনে নেমে বাস ধরার জন্যে যখন হাঁটছিল তখন তিনটে লোক পাল্লা দিয়ে তাকে অনুসরণ করেছে। দিনের বেলায় যে রাস্তায় সহজ হয়ে হাঁটা যায় রাত্রে তার চেহারা পাল্টে যায়। ঠিক হল না, রাস্তার মানুষগুলোর আচরণ বদলে যায়। অথচ এরা কারো দাদা বাবা অথবা ছেলে। রাস্তায় একটা মেয়েকে দেখলে এরা জন্তুর মত আচরণ করে কেন?

লাবণ্যকে পড়িয়ে উঠে আসার সময় ওর দিদিমা আজ দীপাকে খুব অবাক করে দিলেন। দীপা বলল, 'একি করছেন আপনি?'

'না বললে শুনব না। এটুকু নিতেই হবে নইলে মনে খুব কষ্ট পাব।'

'কিন্তু আমি তো অনেক কম টাকা চেয়েছি।'

'এটা এমন কিছু বেশী নয়। আসলে নাতনীকে এত যত্ন নিয়ে পড়াতে দেখে আমার প্রাণ ভরে গিয়েছে। এর কম দিলে অবিচার হবে। না বললে শুনছি না।'

অতএব টাকাগুলো নিতে হল দীপাকে। নোটগুলোর চেহারা এবং সংখ্যা দেখে সে অনুমান করেছিল লাবণ্যর দিদিমা ভুল করছেন। না গুনেই ব্যাগের ভেতর রেখে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে আসতে মনে হয়েছিল যোগ্যতার থেকে বেশী সম্মান পেল আজ। যেন অনেক বড়মাপের পোশাক ছোট শরীরে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন? কোন মধ্যবিত্ত বাঙালির বাড়িতে গেলে তিনি কি এত টাকা দিতেন?

বিডন স্ট্রীটে পৌঁছে কিন্তু আর এক ধরনের স্বস্তি হল। এই টাকায় তার বাড়ি ভাড়া, খাওয়া দাওয়া মায় কলেজের মাইনের অনেকটাই মেটানো যাবে। ব্যাঙ্কের টাকা খুব সামান্য তুলতে হবে এই টাকা নিয়মিত পেলে। সেক্ষেত্রে এখনই কোন আর্থিক বিপদে পড়তে হচ্ছে না। রাধার জন্যে এমনটা হল। ও যে কি উপকার করল তা নিজেও জানে না।

'এই যে ম্যাডাম! এখানে, এই সময়ে?'

গাঁক গাঁক করে গলাটা এত জোরে বেজে উঠল যে চমকে উঠেছিল দীপা। এমন কি রাস্তার লোকগুলোও। পাজামা পাঞ্জাবি যথেষ্ট কোঁচকানো, চুল উস্কোখুস্কো, কাঁধে ঝুলে থাকা কাপড়ের ব্যাগ থেকে কাগজ উঁকি মারছে, শমিত হাসিমুখে এগিয়ে এল, 'ভূত দেখলে নাকি?'

সে একা নয়, রাস্তার লোকজনও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়েছে। শমিত সে-সবের তোয়াক্কা না করে একই গলায় বলল, 'বাকশক্তি রহিত হয়ে গেছে যে !'

দীপা বলল, 'আপনি নিচু গলায় কথা বলতে পারেন না ?'

আবার শব্দ করে হাসল শমিত, 'বেস ভয়েসে ওই ফুটপাথ থেকে তোমাকে ডাকলে তুমি শুনতে পেতে ? আমি কি শম্ভু মিত্র যে ফিসফিসিয়ে বললেও লাস্ট রো-এর দর্শক প্রতিটি শব্দ বুঝতে পারবে ? তার জন্যে প্রতিভা দরকার।'

'আজ রিহার্সাল নেই ?'

'নাঃ। সন্ধেটা একদম ফাঁকা লাগছে। যে ঘোড়ার গলায় একবার লাগাম উঠেছে সে যদি টান অনুভব না করে তাহলে কি অনুভূতি হয় বুঝতে পারছি !'

'হল না।' দীপা হাসল, 'বলা উচিত ছিল, যে পাখির ডানা গজিয়েছে তাকে আকাশে উড়তে না দিয়ে বাসায় বসে থাকতে বললে কি হয়— !'

হো হো করে হেসে উঠল শমিত দীপাকে কথা শেষ করতে দিয়ে, 'ওয়েল সেইড। আচ্ছা, এই লাগামের কথাটা বার বার মনে পড়ে কেন বলতো। শালা, গোলামের জাতে জন্মেছি বলে আকাশ টাকাশের কথা চট করে মাথায় আসে না।'

'গোলামের জাত !'

'দুশ বছর ব্রিটিশের, তার আগে মোগলদের, তার আগে, নাঃ, তার আগে বাঙালির কোন ইতিহাস নেই। চা খাবে ?'

'চা ?' দীপা আপত্তি করতে যাচ্ছিল। ঘন্টাখানেক আগে লাবণ্যদের বাড়িতে নিয়মিত জলখাবারে তার পেট ভরে গিয়েছে। কিন্তু শমিত যেন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করতে জানে না, 'হোস্টেলের খুকিদের জন্যে গেট কখন বন্ধ হয়।'

'খুকি। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হল। এখনও দেরি আছে !'

'তাহলে বসন্তে চল। হেভি খিদে লেগেছে।' হাঁটতে শুরু করল শমিত হাঁটতে হাঁটতেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি করছিলে এদিকে ?'

'ছাত্রীকে পড়াতে গিয়েছিলাম।'

'অ্যাঁ। হোস্টেলের মেয়ে, নর্থ ক্যালকাটার মেয়ে টিউশুনি করে নাকি !'

'পেটে টান পড়লে করে। আপনার পড়েনি বলে নাটক করছেন।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল শমিত, 'আমার পড়েছে কিনা জানো ?'

'তাহলে আপনিও রোজগারে বেরুতেন।'

'আমি বেরিয়েছি কিনা সে খবর রাখো ?'

'না।' থতমত হয়ে গেল দীপা।

'তাহলে না জেনে মন্তব্য করবে না। এটা তোমার দোষ নয়, বাঙালি জাতটার এটা একটা জন্মগত অভ্যেস। নিজের মনে যা আসে তাকেই সত্যি বলে ভেবে নেয়।'

বসন্ত কেবিনে সন্ধের পরে মেয়েরা ঢোকে না। তখন সেখানে ছাত্র নয়, বয়স্কদের জমাটি আড্ডা। তাঁরা মুখ ঘুরিয়ে এদের দেখলেন। কোণার এক খালি টেবিলের দিকে যেতে যেতে শমিত উঁচু গলায় বলল, 'গৌরাঙ্গ, দুটো ডাবল হাফ আর চারটে টোস্ট।' চেয়ারে বসে শমিত হাসল, 'একমাত্র এখানেই সন্ধের পরে টোস্ট পাওয়া যায়।'

'বললেন প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে— ।'

'টোস্টেই হয়ে যাবে।'

'না হবে না। আমি একটু আগে পেট পুরে খেয়েছি। আপনি ভারি কিছু নিন।'

'পাগল। পকেটে দুটো টাকা পড়ে আছে।'

'আমি দেব। আজ জীবনের প্রথম রোজগার হল। টিউশনির টাকা পেয়েছি।'

'আরে কি আশ্চর্য! এতক্ষণ বলনি কেন! তাহলে এখানে ঢুকতাম না। অবশ্য বড় কোথায়ই বা যেতাম! অভ্যেস নেই।'

'অর্ডারটা পাল্টে দিন। আপনার জন্যে রুটি মাংস বলুন।'

'সত্যি খাওয়াবে? চমৎকার! বেঁচে থাকুন শরৎচন্দ্র। বাঙালি মেয়ের ছবি যা এঁকে গিয়েছেন ভদ্রলোক যতই ব্যাকডেটেড বলি ঠিক জিতে যাচ্ছেন। গৌরাঙ্গ?'

'আপনার পকেটে টাকা থাকলে আমাকে খাওয়াতেন না?'

'ভাবতাম। চা টোস্টের ওপরে উঠতাম কিনা সন্দেহ। খোঁচা লেগেছে নাকি?'

'স্বাভাবিক। আমি আপনাকে পাত পেতে বসিয়ে পাখার হাওয়া করতে করতে খাওয়াচ্ছি না। আর শরৎচন্দ্র যে ছবি এঁকেছেন তা কোন ছেলের খারাপ লাগে বলুন তো!' দীপা হাসল, 'বউ যদি মায়ের কিছু গুণ পায় তবে ছেলেরা বর্তে যায়। যায় না?'

খাবার এল। বারংবার বলা সত্ত্বেও দীপা চা ছাড়া কিছু নিল না। নিঃশব্দে খাবার শেষ করল শমিত। সেটা দেখে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি কথা বলুন তো, শেষ কখন খেয়েছেন?'

গম্ভীর হতে গিয়েও হেসে ফেলল শমিত, 'সকাল সাড়ে আটটায় দুটো রুটি খেয়ে বেরিয়েছিলাম। দশটায় স্কুলে ঢুকে সময় পাইনি। আমি বাগুইহাটিতে একটা স্কুলে ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে ঢুকেছি। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে সাহিত্য পরিষদ লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম একটা বই খোঁজ করতে। কখন সময় কেটে গিয়েছিল বুঝতে পারিনি।'

'এখন কোথায় যাচ্ছিলেন? বাড়ি?'

'নাঃ। সুজয়ের বাড়িতে। ও একটা নাটক লিখেছে, অ্যাডাপ্টেশন, ওটা নিয়ে অনেক আলোচনার আছে। বিদেশী নাটকের পরিবেশ মেজাজ সংলাপ আমাদের মাটির সঙ্গে খাপ খায় না। আক্ষরিক অনুবাদ একদম চলবে না। নাটকের যে সমস্যা আমাদের ভাবাচ্ছে সেইরকম সমস্যা যদি এদেশের মানুষের জীবনেও থাকে তাহলে শুধু থিমটাকে রেখে এদেশের জীবনের সঙ্গে সবকিছু সাজিয়ে নিতে হবে।'

'সাজানো বলে মনে হবে না।'

'সেটাই তো নির্ভর করছে এলেমের ওপর। ইবসনের ডল্‌স হাউজ তাই 'পুতুল খেলা' হলেও একদম বিদেশী বলে মনে হয় না।'

'আপনি কি শুধু নাটকই করবেন?'

'শেষ নিঃশ্বাস ফেলা পর্যন্ত। বাঙালি লেখক পেয়েছে, অভিনেতা পেয়েছে, গায়ক পেয়েছে অনেক দেরিতে, বেঁচে বর্তে থাকতে হলে এইসব পাওয়াকে কাজে লাগাতে হবে। তুমি ভাবো, রবীন্দ্রনাথ গল্প উপন্যাস, কবিতা লিখেও তৃপ্তি পাননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে নাটক করতে হল, ছবি আঁকতে হল।'

'পয়সা কড়ি?'

শমিত সোজা হয়ে বসল, 'দূর মশাই! তোমাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমি শাড়ি গয়নাগাঁটির দলের মেয়ে নও।'

'কেন এমন মনে হল?'

'জানি না। ভুল তো মানুষেরই হয়।' বলতে বলতে হঠাৎই মনে পড়ে গেল শমিতের। 'মায়া বলছিল তুমি আই এ এস দেবে।'

'হঠাৎ এ কথা কেন ?'

'বোনাফায়েড গোলাম হতে চাইছ কেন ?'

'মানে !'

'গলায় হিরের বকলস পরার এই ইচ্ছে কেন হল ?'

'বকলস পরতে হলে সেটা হিরের হলে ভাল হয় না ?'

'চমৎকার ! আই এ এস হয়ে সরকার যেমন চাইবে তেমন করবে। মানুষ খেতে না পেয়ে মিছিল করলে তুমি পুলিশকে বলবে গুলি চালাতে ! নিজের সবরকম মনুষ্যত্ব বিবেক শিকেয় তুলে যারা ক্ষমতায় আসবে তার পুতুল হয়ে নাচবে !'

'আপনি কম্যুনিস্ট ?'

'পাগল ! সে-যোগ্যতা আমার আছে ! আমি যদি মরার আগে একটা মানুষ হতে পারি, একটা গোটা মানুষ, তাহলে খুশি হব।'

'গোটা মানুষ !'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি ওপরে উঠতে চাই। যেখানে উঠলে পুরুষ জাতটা মেয়ে বলে আমাকে অবহেলা করবে না। যেখানে আমি মাথা উঁচু করে থাকব ?'

'আই এ এস হয়ে ! ফুঃ। খেতে না পাওয়া মানুষগুলোর সামনে তুমি দৈত্য হবে আর যে দল ক্ষমতায় থাকবে তার চুনোপুঁটিরা যখন ধমকাবে তখন তোমাকে কেঁচোর মত নুইয়ে পড়তে হবে। সেটা খেয়াল আছে। নিজের কাছে কি জবাব দেবে মেমসাহেব ?' মুখ বিকৃত করল শমিত, 'যে মেয়ে টিউশনি করে নিজের খরচ চালায় তার কি ব্যুরোক্রাট হওয়া মানায় ?'

থমথমে হয়ে গেল দীপার মুখ। শমিতের কথাগুলোর জবাব সে দিতে পারছে না। অথচ কথাগুলো মানতে মোটেই ইচ্ছে করছে না। দাম মিটিয়ে দেওয়া মাত্র শমিত বলল, 'বহুত দেরি হয়ে গিয়েছে। এবার উঠতে হবে।'

দীপা বলল, 'দেশের সেরা ছেলেমেয়েরা আই এ এস হয় দেশকে ভাল করে সেবা করার জন্যে। এটা বলছেন না কেন ?'

'বিশাল কোয়ার্টার্স, বিরাট লন, গেটে পাহারাদার নিয়ে জনসাধারণের থেকে তিন মাইল তফাতে থেকে দেশসেবা ! পাগলা সাপে কামড়েছে !' শমিত বাইরে পা বাড়াল। দীপা অনুসরণ করল তাকে।

খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে শমিত বলল, 'চমৎকার খেলাম। সবাইকে বলতে হবে। কিন্তু দীপা, তুমি একটু ভাবো তো। মানুষ হিসেবে অন্য কিছু তুমি করতে পারো কিনা। কোথায় যেন পড়েছিলাম, মানুষ যত ক্ষমতার সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠে তত সে বন্ধুহীন হয়ে পড়ে। তুমি তাই হতে চাও ? চলি।' কথা বলার অবকাশ না দিয়ে হনহনিয়ে চলে গেল শমিত।

হোস্টেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দীপা কেঁপে উঠল। কিসে মানায় তাকে ? কিসে ? শমিত কেন ঝড়ের মত এসে তার সবকিছু এমন ভাবে নাড়িয়ে দিল ?

কলকাতা শহরে কিছু মানুষ খুন হলেন।

বিধান রায় পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভালবাসে। ডাক্তার হিসেবে তাঁর খ্যাতি প্রবাদের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। দেশ গড়ার কাজে মানুষটি নিত্যনতুন চিন্তাভাবনা করে তাকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আর সবার ওপরে ওই অবিবাহিত মানুষটির চেহারায় এমন একটা ব্যাপার আছে যা সাধারণ বাঙালিকে তাঁর অনুগামী করে তুলতে বাধ্য। এই মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের কোন শক্ত মাটি পশ্চিমবাংলায় নেই। পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ার পর তাদের কার্যাবলী নিয়ে দেশের মানুষের নানারকম ধন্দ ছিল। আবার কার্যকরী অবস্থায় ফিরে গিয়ে সামান্য কিছু আন্দোলন করা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারেনি এখনও।

শরণার্থীদের স্রোত পশ্চিমবাংলার ওপরে আছড়ে পড়ছে। দেশের দ্রব্যমূল্য হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। ক্রয়ক্ষমতা এবং আয়ের মধ্যে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। এবং এই পটভূমিতে কিছু মানুষ অন্ধকার পথে তাদের পুঁজি বাড়িয়ে চলেছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠরা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যাচ্ছেন। আর এসবই হচ্ছে শাসক দলের কিছু অসৎ নেতার প্রত্যক্ষ মদতে। এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের ওপরতলার নেতাদের মধ্যে শ্রমজীবী মানুষের উপযুক্ত প্রতিনিধি খুঁজতে গেলে হয়রান হতে হবে। বিধান রায় এবং দুই তিনজন তাঁর অনুগামী নেতার পক্ষে এই কৌরবদের সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক এই সময় কলকাতার ওপরে কয়েকটি আন্দোলনের ঢেউ তুলতে পারলেন বিরোধীরা। কোন রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত নয়, বিরোধীরা সাধারণ মানুষেব অত্যন্ত বাস্তব সমস্যাকে মূলধন করায় তাঁদের সক্রিয় সমর্থন পেয়েছিলেন। এব একটি হল খাবারের দাবি অন্যটি হল ট্রাম বাসের ভাড়া বৃদ্ধি। এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে প্রথমে উদ্বুদ্ধ হল ছাত্রবা যারা বেশীরভাগ সময়েই শাসক দলের বিরোধিতা করতে চায়। একমাত্র পাইয়ে দেবার লোভ অথবা আদর্শের প্রতি আনুগত্য দাবি করে অন্ধ করে দেওয়া ছাড়া ছাত্রনেতাদের হাতে রাখা অসম্ভব। তারা চিরকাল অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্রের দাবি করবেই। শাসকদলে বেশীদিন থাকলে যে স্বৈরাচারী মানসিকতা তৈরি হয়ে ওঠে তা ছাত্রদের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। আব এই সময়ের কংগ্রেসী শাসকদের একাংশ তাঁদের কাজের মাধ্যমে ছাত্রদের বিক্ষুব্ধ হতে সাহায্য করেছিলেন। এই ছাত্রদের সমর্থন পেয়েছিলেন বিরোধীরা। মূলত সি পি আই-এর নেতৃত্বে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাব প্রকাশ সর্বত্র যে অহিংস হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কলকাতার রাস্তায় ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার এক যুগের মধ্যে ট্রাম বাস যখন পুড়ল তখন পুলিশ গুলি চালালো। আর সেই গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন কিছু মানুষ। শুধু কলকাতা নয় শিকার হলেন পশ্চিমবঙ্গের জেলায় আরও কয়েকজন। হয়তো বিধান রায়, হয়তো স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা, সদ্য মৃত গান্ধিজীর প্রভাব ওই আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিয়েছিল কিছু দিনের মধ্যেই। এবং হয়তো অনেককাল ধরে এর প্রতিক্রিয়া চলবে যা এই মুহূর্তে স্পষ্ট নয়। হয়তো ভাবীকালের অনেক আন্দোলনে কাঁটা পড়ে গেল। শুরুটা যদি শেষ হবাব জন্যে না হয় তাহলে সেটাই অভ্যেসে না দাঁড়িয়ে যায়!

এই খুন হওয়া চোখের ওপর দেখল দীপা। গুলি ছুটে এল মানুষটির বুক বরাবর। গোড়া থেকে কেটে ফেলা কচুর ডাঁটির মত খসে পড়ল মাটিতে। একটা জীবন একটু আগে

প্রতিবাদে মুখর ছিল, এই মুহূর্ত থেকে আর নেই। হোস্টেলের ছাদ থেকে দৌড়ে নেমে এসেছিল দীপা। নিজের বিছানায় মুখ চেপেও পড়ে যাওয়া মানুষটিকে ভুলতে পারছিল না। কি সহজে একটি মানুষকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়! এক পলকে বর্তমানকে ইতিহাস করে দেওয়া আর শুধু সময়ের হিসেবেই নয় মানুষের হাতযশেও। যে পুলিশগুলো গুলি চালিয়েছিল তারা দেখতে বীভৎস নয়। তারাও জামা পাল্টালে জনতা হয়ে যেতে পারত। যে খুন হল সে ট্রাম বাস পোড়ায়নি, রাস্তার একধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

আন্দোলন চলেছিল কয়েক দিন। বিরোধী নেতারা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলেন। সরকার থেকে এসব খুনের জন্যে কোন দুঃখপ্রকাশ করা হল না। পাল্টা যুক্তি তাঁদের ছিল। চোখের সামনে যদি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, জনসাধারণের জিনিস ধ্বংস করে কেউ তাহলে সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। কেউ খুন করলে তার মৃত্যুদণ্ড স্বাভাবিক। যে বিচারক সেই দণ্ড উচ্চারণ করেছেন বা যে জহ্লাদ তা কার্যকর করবে তাঁদেব কেন শাস্তি হবে? অতএব একসময় দু'পক্ষই শান্ত হল। জীবন যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। সরকারি সম্পত্তি যা ধ্বংস হয়েছিল তার বদল করতে সরকার আবার কর বসাবেন, জিনিসের দাম যা বেড়েছিল তা কমার কথা নয়। আগে শীতকালে দাম কমত, গ্রীষ্মে বাড়ত। আন্দোলন এভাবে শেষ হবার পর সেটা বারো মাসের জন্যে স্থির জায়গা পেয়ে গেল।

ছুটির পরেও এই কারণে কয়েকদিন হোস্টেল খোলা রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। দীপার চোখের সামনে সেই নাম-না-জানা মানুষটি যেন পাকা জায়গা নিয়ে নিয়েছে। একটু শান্ত হতেই সে ছুটে গিয়েছিল মায়ার বাড়িতে। গিয়ে দেখল সে শুয়ে আছে। তার হাতে প্লাস্টার। মাসীমা বললেন, 'হাত ভেঙেছে পুলিশের লাঠিতে। ভালই হয়েছে, কদিন বাড়িতে বিশ্রাম পাবে।'

দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল?'

'কি আর হবে। ভারতবর্ষের পুলিশ লাঠি দিয়ে একটু আদর করল।'

'তুই ট্রাম পোড়াতে গিয়েছিলি?'

'তাহলে তো গুলি খেতাম। আমাদের পরে যারা গিয়েছিল তারা ট্রাম পুড়িয়েছে।'

'কি লাভ হল এতে?'

'লাভ? সরকার জানল আমাদের মেরুদণ্ড আছে। এখন থেকে কোন কাজ করার আগে দু'বার ভাববে। আর প্রতিবাদ করতে পেরেছি, এটুকুই লাভ।'

'তোদের নেতাদের কেউ গুলিতে মরেছে? কারও হাত ভেঙেছে?'

'কেন বল তো?' অবাক হল মায়া।

'ভাঙলে ভাল লাগত। মনে হত ওরাও জনসাধারণের সঙ্গে ছিলেন।'

মাসীমা শুনছিলেন ওদের কথা। হেসে বললেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরা একদম পেছনের শিবিরে থাকে দীপা যেখানে কোন বিপদ হুট করে আসে না।'

মায়া মাথা নাড়ল, 'এসব কথা না বলে আগে বল তোর প্রব্লেম সল্‌ভ হয়েছে কিনা! থাকার জায়গা পেয়েছিস? মা, তোমাকে যেটা বলেছিলাম!'

মাসীমা বললেন, 'হ্যাঁ, মায়া বলছিল বটে। তুমি এখানেই থাকতে তো পারো। ছুটি আর ক'টা দিন। স্নানটানের সময় না হয় একটু সাবধান হতে হবে, ওপরে উঠে এলে তো কোন কথা নেই। চলে এস এখানে।'

'না মাসীমা, দরকার নেই।' দীপা হাসল, 'একটা ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে।'

'কি ব্যবস্থা?'

'আমি একটা ঘর ভাড়া পেয়েছি। খুব সস্তায়। সেখানেই থাকব।'

মায়া অবাক হল, 'তোকে কেউ ঘর ভাড়া দিল ?'

'দিয়েছেন। তবে শ্যামবাজার ভবানীপুরে নয়। যাদবপুরের ওদিকে কলোনিতে।'

সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা বললেন, 'ও মা! সেখানে তুমি একা থাকবে ?'

'ঠিক একা নয় মাসীমা, আমাদের সঙ্গে পড়ে রাধা, ওর বাড়ির পাশে।'

'কিন্তু কলোনির জীবনযাত্রা, মানে শুনেছি উদ্বাস্তুদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি—।'

'আমি তো ঘুরে এসেছি। ওঁদের তো আলাদা বলে মনে হয়নি। বরং পূর্ববঙ্গের মানুষদের বুকে আমাদের চেয়ে বেশী উত্তাপ আছে বলে মনে হয়েছে। জানেন মাসীমা, চা-বাগানে আমাকে যিনি পড়াতেন তিনি ছিলেন যাকে বলে কাঠ-বাঙাল। সেই মানুষটির উৎসাহে আমি আজ এখানে পৌঁছেছি। তাই আমার কোন অসুবিধে হয়নি কলোনিতে গিয়ে। ছেড়ে দিন এসব কথা, মায়া, তোর নাটক কি হবে ?'

শুয়ে শুয়ে মাথা নাড়ল মায়া, 'সেইটেই হয়েছে মুশকিল। হাত ভাঙার জন্যে মা আমাকে কিছু বলেনি কিন্তু শমিত যাচ্ছেতাই বলে গেল। এ মাসে তিনটে শো পেয়েছে দল. তিনটেই কল-শো। শমিতের রেগে যাওয়া অন্যায় নয়, দলের সবাই আমার জন্যে নাটক করতে পারবে না এতে আমারই খারাপ লাগছে।'

'শমিত আন্দোলনে অংশ নেয়নি ?'

'না। ও সক্রিয় রাজনীতি করে না। ওব চিন্তাভাবনা অবশ্যই প্রতিক্রিয়াশীলতার শোষকের বিরুদ্ধে, বামপন্থী মানসিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু ও বলে যুদ্ধ অনেক রকমের হয়। সবাইকে যে একরকম যুদ্ধ করতে হবে তার কোন মানে নেই।'

'ভাল লাগল কথাটা শুনে।'

চোখ বন্ধ করল মায়া, 'দেখিস বাবা, ভাল লাগাটাকে ডাল পালা মেলতে দিস না, শমিত হল সূর্যের মত, দূর থেকে ভাল, উপকারী, কাছে গেলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে।' কথা শেষ করে মায়া হাসল। মাসীমা উঠে গেলেন।

হোস্টেলের গেটে মালপত্র রেখে দীপা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়েছিল দারোয়ানকে। শ্যামবাজার থেকে অতদূর টানা ট্যাক্সিতে যাবে না সে। শেয়ালদা হয়ে ট্রেনে চেপে যাবে মালপত্র নিয়ে। এই সময় গেটের ফাঁক দিয়ে কেউ আসছিল দারোয়ান পেছন থেকে আটকাল তাকে। দীপা দারোয়ানের গলা শুনতে পেল, 'আরে, আবে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন। এখন দেখা করার সময় নয়। আর হোস্টেলে কেউ নেই, দিদিমণিরা যে যাব বাড়িতে চলে গিয়েছেন।'

'কেউ নেই ?'

'না। বিকেলে আসবেন যদি বড়দির সঙ্গে দেখা করতে চান।'

দারোয়ানকে গেটের এপাশে আসতে দেখা গেল, 'ট্যাক্সি এসে গেছে।' মালপত্র সে-ই বয়ে নিয়ে গেল বাইরে। গেটের বাইরে এসেই বিস্মিত হল দীপা। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে দুই হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে শমিত। দাঁড়িয়ে উল্টোদিকেব ফুটপাতের কিছু লক্ষ্য করছে। দীপা তাড়াতাড়ি কাছে গেল, 'কি ব্যাপার ? এখানে ?'

'আরে, তুমি, ও যে বলল হোস্টেল খালি। সবাই চলে গিয়েছে।' ট্যাক্সির ডিকিতে জিনিসপত্র রাখছিল দারোয়ান, তাকে দেখাল শমিত।

'চলেই তো যাচ্ছিলাম। আর সবাই চলে গিয়েছে। কিন্তু আপনি এখানে কি জন্যে ?'

'আশ্চর্য। লেডিস হোস্টেলে আমি আবার কার জন্যে আসব ? তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তা তুমিও তো চলে যাচ্ছ।' শমিত চিন্তিত হল।

'নিশ্চয়ই কোন দরকার ছিল। বলুন কি ব্যাপার।'

'কোন লাভ নেই ফালতু বকে। আমি স্মৃতিচারণ বা হা-হুতাসে মোটেই বিশ্বাস করি না। চলি।' শমিত হাসল। দীপা তাকে বাধা দিল, 'আমার হোস্টেল ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে ?'

'তুমি যদি কলকাতায় থাকতে—, আবার সেই যদি বলছি।'

'আমি তো কলকাতাতেই থাকব।'

'তার মানে ? মালপত্তর নিয়ে যাচ্ছ কোথায় ?'

'হোস্টেল বন্ধ। আমার একটা থাকার জায়গা দরকার তাই ঘর ভাড়া করেছি যাদবপুরের দিকে। সেখানেই যাচ্ছি।' দীপা হাসল।

'তাই বল। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর কে থাকছে ?'

'আশ্চর্য। আপনিও নারীকে এত অসহায় ভাবেন ?' দীপা প্রশ্ন করা মাত্র ট্যাক্সিওয়ালা হাঁক দিল, 'দিদি, তাড়াতাড়ি করুন একটু।'

দারোয়ান দাঁড়িয়ে ছিল গেটের সামনে। তার দিকে মাথা নেড়ে দীপা একটু অস্বস্তি নিয়ে শমিতকে বলল, 'আমি আদৌ বড়লোক নই। ট্যাক্সির মিটার উঠছে।'

'ঠিক হ্যায়। আমরা তো ট্যাক্সিতে বসেই কথা বলতে পারি। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে, চল।' দীপা দেখল অনুমতির জন্যে বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করে ট্যাক্সির দরজা খুলল শমিত, 'উঠে পড়।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই হঠাৎ একটু শক্ত হয়ে গেল দীপা। এই এইরকম একটা জায়গা থেকে অসীম ট্যাক্সিতে উঠে শিয়ালদায় গিয়েছিল। শিয়ালদা থেকে শিলিগুড়ি। সেই দিন এবং সেই রাত একটু একটু করে স্বপ্নের মত হয়ে গিয়েছিল। আজ অসীম নেই কিন্তু শমিত একই ভূমিকা নিচ্ছে। অবশ্য দু'জনের কথাবার্তা স্বভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। ঈশ্বর এক একজনের জন্যে আলাদা ছাঁচ তৈরি করেন। কিন্তু সে একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে। মাথা নাড়ল দীপা, যে কোন ঘটনাই কোন না কোন ইতিহাসকে নকল করে। এ নিয়ে এত ভাবার কি আছে। অসীমকে সে বন্ধু ভেবেছে, এখনও ভাবে। শমিত ঠিক কি তা বুঝে উঠতে পারছে না, তফাৎ এটুকু। ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'শিয়ালদায় যাবো তো ?'

'শিয়ালদা মানে ?' শমিত বলে উঠল, 'যাবে যাদবপুরে।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'ট্রেনে যাব।'

'ট্রেনে ? ওই মালপত্তর নিয়ে। লোকাল ট্রেন তোমার জন্যে থেমে থাকবে যতক্ষণ ওগুলো না নামানো হয় ?'

এইটে ভাবেনি দীপা। তার একার পক্ষে সব জিনিস নামিয়ে ফেলা অন্তত একবারে একদম অসম্ভব। স্টেশনে নেমে পড়তে পারলে কুলি দিয়ে রিকশায় তুলে সে ওগুলো নিয়ে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু তার ভাবনা শেষ হবার আগেই শমিত বলল, 'না না, দাদা, আপনি সোজা যাদবপুর চলুন। মানুষের স্বভাব হল কোন না কোনভাবে সরল জিনিসকে জটিল করে তোলা। ট্যাক্সি থেকে নামা, কুলি ধরা, টিকিট করা, ট্রেনে ওঠা, ট্রেন থেকে নামানো, তারপর আরও কত কি আছে কে জানে। সুখে থাকলে লোককে ভূতে কিলোয়।'

দীপা প্রতিবাদ করতে চাইল, 'ট্যাক্সিতে যাদবপুর পর্যন্ত কত ভাড়া দিতে হবে জানেন ? ট্রেনে গেলে অনেক কমে হয়ে যাবে না ?'

'সামান্য কম। কিন্তু পরিশ্রম আর সময় অনেক গুণ বেশী। বাঃ, তুমি তো বেশ হিসেব করে চলতে পার দেখছি। খুব ক্যালকুলেটিভ।' শমিত শব্দ করে হাসল।

শব্দটা কানে যাওয়া মাত্র রাগ হয়ে গেল দীপার, 'পরিশ্রম না করলে যাকে একটা পয়সা দিয়ে কেউ সাহায্য করবে না তাকে হিসেব করে চলতেই হবে। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করা যদি ক্যালকুলেটিভ মানসিকতার প্রমাণ হয় তাহলে বলব আপনাদের মত ভ্যাগাবণ্ড-জীবনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই।'

'কি ? আমি, আমরা ভ্যাগাবণ্ড ?' সোজা হয়ে বসল শমিত।

'নিশ্চয়ই। আপনারা স্রেফ আবেগে ভাসছেন। একজন মানুষ স্ত্রীর শরীরে অতখানি জ্বর দেখেও ছুটে আসছেন নাটক করতে। কি না, শিল্প হচ্ছে। যে নাটক তাকে একটা পয়সা দেবে না যা দিয়ে তিনি স্ত্রীর জন্যে ওষুধ কিনতে পারবেন। আপনারা যা করছেন তা স্রেফ আত্মহত্যা। কোন কনস্ট্রাক্টিভ পরিকল্পনা আপনাদের কাজে নেই। ধার করে নাটক করছেন, লোকে এসে সেই নাটক দেখছে না কিন্তু নিজেদের নাটকের লোক বলে নিজেরাই বাহবা দিচ্ছেন। অথচ ধার শোধ করার কোন রাস্তা আপনাদের জানা নেই। এটা আত্মহত্যা নয় ?'

শমিত হাততালি দিল, 'সাবাস্।'

'আমি কিন্তু খুব সিরিয়াসলি বলছি।'

শমিত ঘুরে বসল, 'দেখুন মশাই, স্রোতের বাইরে দূরে পারে দাঁড়িয়ে লোকে অনেক কথা ভাবতে পারে। নদীতে ময়লা আছে আবর্জনা আছে। জলে না নেমে যারা সাঁতার সম্পর্কে জ্ঞান দেয় তাদের কোন উপদেশ শুনতে আমি রাজি নই।'

'এটা আপনাদের জেদের কথা। গোঁয়ারতুমি।' দীপা লক্ষ্য করল উত্তেজিত হয়ে শমিত তাকে 'দেখুন' বলল। অর্থাৎ এই মুহূর্তে শমিত তাকে প্রতিপক্ষ ভাবছে।

'ইয়েস। জেদ। জেদ না থাকলে কোন কাজ করা যায় না। আমরা তবু কিছু করছি। নাটক করছি। অন্য ধরনের নাটক। আমরা চেষ্টা করছি দেশের মানুষের মোটা দাগের রুচি পাল্টে ফেলতে। আপনারা কি করছেন ? ভারতবর্ষের নব্যনাগরিকরা ? সমালোচনা ! কাজ করে দেখান, মাঠে নেমে তারপর জ্ঞান দিন।'

'নিশ্চয়ই আপনারা কিছু করছেন। কেউ যদি মনুমেন্টের ওপরে উঠে বলে আমি একটা কাজ করছি আর তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কাজটা দেখায় তাহলে সে হয়তো কাজ করল কিন্তু তার পরিণতি কি হবে তা ভেবে দেখুন।' দীপা হাসল।

'দূর মশাই। আপনার মত হতাশবাদী লোকের সঙ্গে কথা বলাই বিপদ।'

শব্দ করে হাসল দীপা, 'আপনি কিন্তু আমাকে একটু আগে পর্যন্ত তুমি বলছিলেন। দেখুন, উত্তেজনা মানুষকে কিভাবে পাল্টে দেয়।'

চমকে ফিরে তাকাল শমিত। তারপর বলল, 'আই অ্যাডমিট। এই একটি কথা ঠিক বললে। দ্যাখো, যেসব জ্ঞান দিলে সেগুলো আমার বিশদ জানা। আমি নাটক করতে চাই। আমি মরে যাওয়া পর্যন্ত নাটক করব। কিন্তু আমি কালিন্দী, দুই পুরুষ করতে পারব না। ওই নাটক সম্পর্কে আমার কোন অশ্রদ্ধা নেই। কিন্তু আমি যে নাটক করব তা আমার সময়ের মানুষের সমস্যার কথা বলবে। আমি যদি প্রাচীন বিষয় নিয়ে নাটক করি তাহলে তার বিশ্লেষণ হবে আজকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। নাটক মানে আমার কাছে শুধু গল্পো শোনানো নয়, সেই সঙ্গে ভাবানো। কে আমাকে এই নাটক করতে দেবে ? কলকাতার পেশাদারী থিয়েটারগুলো ফিল্ম স্টার দেখিয়ে আর গল্পো শুনিয়ে হাউসফুল করে। তারা কোন ঝুঁকি নেবে না। অতএব আমাদেরই চেষ্টা হবে দর্শক তৈরি করতে। আমরা যদি কাছিমের মত

কামড়ে পড়ে থাকি একদিন না একদিন আমাদের নাটক দেখতে দর্শক আসবেই। সেই সময় পর্যন্ত আমি লড়ে যাব। তোমার যা মনে হয় তুমি মনে করতে পার।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। ট্যাক্সি মধ্য কলকাতা পেরিয়ে দক্ষিণে ঢুকল। হঠাৎ শমিত বলল, 'তোমার মত সাহসী মেয়ে কিন্তু খুব কম আছে।'

'বেশী প্রশংসা করলেন। আপনি মায়ার কথা ভুলে যাচ্ছেন।'

'মায়া? ওর তুলনা ও। কিন্তু ও নিজেই জানে না কি করবে। নাটক না রাজনীতি? তবু ওর পায়ের তলায় মাটি আছে যার ওপরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করা যায়।'

'তার মানে?'

'কলকাতা শহরে ওর একটা বাড়ি আছে, বাড়িতে মা আছেন, দু'বেলা খাওয়া পরার চিন্তা ওকে করতে হয় না। অন্তত মালপত্তর নিয়ে ঘর খুঁজতে ওকে বেরুতে হচ্ছে না।'

'ঠিক হল না। আপনি যা বললেন বাংলাদেশের মেয়েদের তার সবই রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার এই এক যুগের মধ্যেও তারা মায়ার দিকে আতঙ্কের চোখে তাকিয়ে থাকে।' দীপা মাথা নাড়ল, 'মায়া ঠিক করছে না ভুল তার বিচার পরে হবে। কিন্তু ও যে মেয়েলিপনা আঁকড়ে নেই এটা সবচেয়ে বড় সত্যি।'

শমিত কোন কথা বলল না। সে যে খুব স্বস্তিতে বসে নেই তা বোঝা যাচ্ছিল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিন্তু এখনও বলেননি আমার কাছে কি জন্যে এসেছিলেন!'

শমিত নড়ে চড়ে বসল, 'দূর। সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন আর বলে কোন লাভ নেই। আমাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে।'

'তবু শোনাই যাক না।'

শমিত তাকাল, 'মায়ার অবস্থা তো জানেন। দেখতে গিয়েছিলেন শুনলাম। এদিকে আমরা পর পর কয়েকটা কল-শো পেয়েছি। ওই হাত নিয়ে তো ও অভিনয় করতে পারবে না। এখন একজন অভিনেত্রী না পেলে শো-গুলো ছেড়ে দিতে হয়।'

'কলকাতায় অভিনেত্রীর অভাব?'

'দু'টো অসুবিধে আছে। প্রথমটা টাকা। যারা অ্যামেচার অফিস ক্লাবে করছেন তাঁদের নিতে গেলে যে টাকা দিতে হবে তাতে হাতে কিছুই থাকবে না। দলে একটা শৃঙ্খলা আছে। এই পেশাদারী মহিলা তা যখন মানতে বাধ্য নন তখন তাঁর আচরণ দলে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবেই। দুই, খেপখাটা অভিনয় করে করে এরা যে অ্যাক্টিং-এর প্যাটার্ন তৈরি করে গলায় বসিয়ে ফেলেছেন তা ভাঙা অসম্ভব। ওই অ্যাক্টিং আমাদের থিয়েটারে চলবে না। এ ছাড়া আর একটি আছে। ওঁরা যেসব নাটক করেন তাতে শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। শিক্ষিতা মহিলাদের মুখ চোখে যে ছাপ থাকে তা এঁদের নেই। আমার নাটকের সব চরিত্রই শিক্ষিত অভিনেতা অভিনেত্রীর জন্যে।'

'শিক্ষিত বলতে?'

'বোধ এবং বুদ্ধির মধ্যে সেতু তৈরি করে যিনি সেই সেতু ব্যবহার করতে পারেন।'

'তা আমাদের হোস্টেলে তেমন কেউ আছেন নাকি?'

'ভেবেছিলাম আছেন কিন্তু ভাবাটা ভুল হয়েছিল।'

দীপা হাসল, 'তাহলে তো সব চুকেই গেল।'

ট্যাক্সিওয়ালা পথের নির্দেশ চাইল। এদিক দিয়ে দীপা সেদিন যায়নি। সে চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'আপনি যাদবপুর স্টেশনে চলুন, সেখানে গেলে চিনতে পারব।'

'অনেক ঘুরতে হবে তো!' ট্যাক্সিওয়ালা বলল।

শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিকানাটা বলুন তো ?'

দীপা ব্যাগ খুলে ঠিকানা লেখা একটা কাগজ দিল ওর হাতে। সেটা পড়ে দু-তিনজনকে জিজ্ঞাসা করে যে এলাকায় পৌঁছাল ওরা সেখানে যাওয়া মাত্র দীপা চিনতে পারল, 'ওই রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে ডান দিকে বেঁকুন।'

শমিত হাসল, 'সবসময় কেন প্রথম থেকে শুরু করতে হবে ?'

দীপা বলল, 'বুঝতে পেরেছি।'

রাধাদের বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থামতেই কিছু কুচো ছুটে এসে জানলা দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল। শমিত বলল, 'আরে! এ যে দেখছি মফস্বলে চলে এলাম।'

ট্যাক্সিওয়ালা যখন জিনিসপত্র নামিয়ে দিচ্ছে তখন রাধা ছুটে এল বাড়ির ভেতর থেকে, 'ওমা, তুমি ট্যাক্সি করে এসেছ ? আমি আবার একজনকে স্টেশনে পাঠালাম।'

'কাকে ? সে আমাকে চিনবে কি করে ?'

'সেদিন দেখেছে। আর মালপত্র থাকবে যখন তখন বুঝতেই পারত।'

দীপা দেখল রাধাদের বাড়ির সবাই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সে রাধার মা-কে জিজ্ঞাসা করল, 'মাসীমা, আপনি ভাল আছেন।'

'আছি। শোন, জিনিসপত্র সব আমাগো বাড়িতে থাক, পরে সেখানে নিয়া যাইবা। আর আজ তুমি এখানেই ভাত খাইবা।' প্রৌঢ়া সস্নেহে বললেন।

দীপা হেসে শমিতের দিকে তাকাল, 'পায়ের তলায় মাটির কথা বলছিলেন না ? কেউ জন্মসূত্রে পায়, কেউ অর্জন করে।'

'কি ব্যাপার ?' রাধা জিজ্ঞাসা করল

'কিছু না। তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। ইনি শমিত, মায়া যে দলে নাটক করে ইনি তার পরিচালক। আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, শিফ্ট করছি জেনে সঙ্গে চলে এলেন। আর এ হল রাধা, আমার বন্ধু, ও-ই ঘর পেতে সাহায্য করেছে।' দীপা কথাগুলো বলে ড্রাইভারের কাছে এগিয়ে গেল। যে টাকাটা মিটারে উঠেছিল তা দিতে বেশ গায়ে লাগল। ভাড়া নিয়ে ড্রাইভার ট্যাক্সি ঘুরিয়ে চলে যেতেই দীপা শুনল, রাধা বলছে, 'আসুন না, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।'

'কোন আপত্তি নেই। জিনিসগুলো তো ভেতরে নিয়ে যেতে হবে।'

ধরা-ধরি করে ওরা দীপার জিনিসপত্র উঠোনের একপাশে নিয়ে গিয়ে রাখল। রাধা ভেতর থেকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এল উঠোনে, 'আমাদের বসার ঘর নেই। উঠোনেই বসতে হবে।' চেয়ারটা নিয়ে শমিত বসে পড়ল, 'দারুণ, এভাবে আকাশের নিচে একা চেয়ারে কখনও বসিনি।'

দীপা বলল, 'রাধা, জিনিসপত্রগুলো আমার ঘরে রেখে এলে হত না ?'

'মায়ের ধারণা, তুমি ওখানে চলে গেলে আমাদের বাড়িতে ভাত খাবে না।'

'সে কি ? কেন ?'

হাসল রাধা, 'কি করে বুঝব বল। কেউ এলে তাকে ভাত খাওয়াতে পারলে উনি আনন্দ পান। কলকাতায় আসার আগে আমাদের বাড়িতে চা হত না। এখনও দু'তিনজনের বেশী কেউ এখানে চা খায় না।'

রাধার মায়ের সঙ্গে শমিতের আলাপ করিয়ে দিল দীপা। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি কর বাবা ?' শমিত হেসে জবাব দিল, 'আমি নাটক করি আর স্কুলে পড়াই।'

'কি কর ? নাটক ? ভদ্রমহিলা বিস্মিত।'

'হ্যাঁ। আমাদের একটা দল আছে।'

'পালাগানের দল ?'

শমিত হাসল, 'না, না। আপনাকে না দেখালে আপনি বুঝবেন না।'

'তোমার বাড়িতে কে কে আছে ?'

'মা আর আমি।'

'বিয়াসাদী হয় নাই ?'

'না, না। আমি তো সবে পাস করলাম। আপনি আমার বয়স খুব বেশী ভাবছেন নাকি ?' প্রশ্নটা করে শমিত মজার চোখে দীপাকেও দেখল।

এই সময় রাধা বলল, 'মা। তোমার এসব কথা থামাও তো !'

এবার ভদ্রমহিলা সরে গেলেন। সম্ভবত শমিতকে তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। একটু আড়ালে গিয়ে তিনি একটা কুচোকে দিয়ে দীপাকে ডেকে পাঠালেন। দীপা রাধার দিকে তাকাল। রাধা হেসে বলল, 'যাও। তোমাকে ডেকেছে মানে মায়ের খুব পছন্দ হয়ে গিয়েছে।'

দীপা উঠোন পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দেখল আর একজন মহিলা চায়ের ব্যবস্থা করছেন। মাসীমা একটা পিড়িতে বসেছিলেন, 'বসো। তোমাকে একটা কথা কই।'

বাধ্য মেয়ের মত বাড়িয়ে দেওয়া আর একটা পিড়িতে উবু হয়ে বসল দীপা। এই রান্নাঘর ছোট্ট চা-বাগানের বাড়ির সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না, তবু কলকাতা শহরে বসে সেই স্মৃতি এনে দেয়। রাধার মা বললেন, 'অরে তুমি কতদিন চেন ? নাটক টাটক করা মানুষের সঙ্গে মিশা ঠিক না।'

ভদ্রমহিলা যে এই কথা বলতে ডেকে এনেছেন তা আন্দাজ করতে পারেনি দীপা। এবার হেসে ফেলল, 'না, না। ওরা ভাল নাটক করে। লোক খারাপ না।'

'কলকাতার মানুষ তো ?'

'তাই মনে হয়।'

'খবর নাও। কলকাতার মানুষকে আমি বুঝতে পারি না। তোমার মন নরম কিন্তু সবাই তোমার মত না।'

এইরকম কথা চলল কিছুক্ষণ। একজন মা যিনি সন্তানের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা করেন তাঁর ভয়ের ব্যাপারগুলো অকপটে বলতে বাধে না, দীপার খারাপ লাগছিল না। এইভাবে বলতে পারেন এমন মানুষও তো নেই তার আশেপাশে। শেষপর্যন্ত ভদ্রমহিলা বললেন যেহেতু এটা কলোনি, সবাই সবাইকে চেনে, তাই অনাত্মীয় কোন পুরুষকে সঙ্গে আনা ঠিক নয়। দীপা যে একা থাকবে তা লোকে জেনে গেছে এরই মধ্যে। অনাত্মীয় কোন পুরুষ এলে কথা উঠবে। মনে পাপ না থাকলেও ঝামেলা ডেকে এনে লাভ কি !

দীপা শক্ত হয়ে গেল। সে কার সঙ্গে মিশবে, কে তার কাছে আসবে তা কলোনির লোকেরা ঠিক করে দেবে ? সে কি শিশু ? কোন ছেলের ক্ষেত্রে কেউ এমন কথা বলত ? রাধার মা সম্ভবত বুঝলেন দীপার মনের কথা। বোঝানোর ভঙ্গীতে তিনি বললেন যে মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এই যে শমিত এসেছে তার মনের ভেতরে কি আছে তা কেউ জানে ? আত্মীয়তা হল একটা বেড়ার মত যা কিছু চোরা স্রোতকে বাঁধ দিয়ে আটকে রাখে। আর দীপারা তো তাঁর মত পরাধীন নয়, বাইরে যাচ্ছে, তা বাইরের মানুষকে বাইরে রাখলেই হয়, ঘরে আনার দরকার কি। সে যখন আত্মীয় নয়। তা ছাড়া দীপা যে ঘর ভাড়া নিয়েছে তার বাড়িওয়ালা যদি আপত্তি করে কেউ আসার জন্যে তাহলে ঘর ছেড়ে দেওয়া

বুদ্ধিমতীর কাজ হবে না। আগে নিজের স্বার্থ সামলে রাখো তারপর অন্য ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে যাও।

একেই কি বলে অ্যাডজাস্টমেন্ট ? আধুনিক মানুষের যেটা শেখা সবচেয়ে জরুরী ? এক্ষেত্রে বিদ্রোহ করলে বাড়িওয়ালা তাকে ঘর ভাড়া নাও দিতে পারেন। সে কোন অন্যায় করছে না জেনেও এই ব্যবস্থা মেনে নেওয়া কি ঠিক হবে ? দীপা গম্ভীর হয়ে আছে দেখে রাধার মা বললেন, 'এখানে তো তুমি একা থাকবা না। আমরা আছি। বাইরের বন্ধুদের যদি বাসায় না আনো তাহলে কি এমন ক্ষতি ?'

না, তেমন কিছু ক্ষতি নেই। তার বেঁচে থাকার পক্ষে ব্যাপারটা জরুরীও নয়। অতএব এক্ষেত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট করলে কোন ক্ষতি হচ্ছে না তার। দীপা বাইরে বেরিয়ে এল। এসে দেখল একগাদা কুচো এবং রাধাকে গল্প শোনাচ্ছে শমিত। সবাই খুব মন দিয়ে শুনছে। এই সময় রান্নাঘর থেকে চা এল।

গল্প শেষ হলে চা খেতে খেতে শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নতুন ঘর-প্রবেশ কখন হবে ? দেখে যাব নিশ্চয়ই !'

'না। আপনার দেখা হবে না। কারণ আমি এখন যাচ্ছি না ওখানে।'

'কেন ?'

'অসুবিধে আছে। দেরি হবে একটু।'

চায়ের কাপ প্লেট নিচে নামিয়ে রেখে শমিত বলল, 'তাহলে চলি। অনেক পথ একা যেতে হবে। লঙ্ ওয়ে টু গো।'

'আপনি কিন্তু এখনও বলছেন না কেন এসেছিলেন ?'

শমিত ঘুরে দাঁড়াল, 'দীপা, আমাদের দলে নাটক করবে ? মায়া পারছে না, এই তিনটে শো করা দলের জন্যেই খুব জরুরী।'

'আমি ?' বুকে হাত রাখল দীপা, 'আপনাকে যদি বলা হয় প্লেন চালাবেন, পারবেন ? কোন প্রস্তুতি নেই, কোন অনুশীলন নেই, মন তৈরি নেই, এত সোজা ?'

'এরকম কথা যে ভাবতে পারে সে কিন্তু সাধারণ নয়।'

'তা ছাড়া আমার বাসস্থান থেকে আপনার রিহার্সালরুমের দূরত্ব ভাবুন !'

'হুম্।' শমিত আর দাঁড়াল না। তার বিশাল শরীর সোজা হেঁটে যাচ্ছিল। রাধা বলল, 'কিরকম যেন, না ? সবার সঙ্গে মেলে না। মনে মুখে কোন ঢাকাঢাকি নেই।'

হঠাৎ দীপার খুব রাগ হয়ে গেল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, এখন তো ও চলে গিয়েছে। এবার আমি জিনিসপত্র নিয়ে আমার ঘরে যেতে পারি তো ?'

॥ ৪৪ ॥

কেমন একটা সংসার-সংসার ভাব। এই সংসার নিজের, একদম একার। অথচ বাজার করা থেকে আরম্ভ করে বাসনমাজা সবই আছে। এসব করতে গিয়ে বেশ নেশাও ধরে। সময় কিভাবে বয়ে যায় টের পাওয়া যায় না।

প্রথম রাত্রে রাধাদের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া হয়েছিল। কলকাতার হোস্টেলের ঠাকুরের রান্না খেয়ে মুখে যে অরুচি হয়েছিল তা এক রাত্রেই দূর হয়ে গিয়েছিল। রাধার মা চমৎকার রান্না করেন। অঞ্জলিও খারাপ রাঁধে না। তার রান্না খেতে অসুবিধে হয় না, ভালই লাগে। কিন্তু রাধার মায়ের রান্না খেয়ে মনে হয়েছিল ব্যাপারটা প্রায় শিল্পের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

অমরনাথ প্রায়ই বলতেন পূর্ববঙ্গের মহিলারা পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের চেয়ে চমৎকার রাঁধেন। ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে কিন্তু রাধার মায়ের রান্না সে অনেককাল মনে রাখবে।

প্রথম সকালে বাজার করে রান্না করার সময় ভাগ্যিস রাধা সঙ্গে ছিল। স্টোভ ধরিয়ে রান্না করতে সে বেশ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল। অঞ্জলি তাকে কোনদিন রান্না করতে দেয়নি। মন দিয়ে লেখাপড়া কর, তাতেই আমি কৃতার্থ হব এই ধরনের কথা বলত। হোস্টেলে আসার পর তো সেই প্রশ্ন ওঠে না। শুধু দেখার চোখ দিয়ে যেটুকু, ভাত সেদ্ধ আর মাছ কিংবা ডিমের ঝোল। কখনও সেদ্ধর বদলে ভাজা। দুঃসাহসী হলে কোন কোন দিন খুব খারাপ স্বাদের তরকারি। একবেলায় রান্না করে দুবেলায় খাওয়া। প্রথমদিকে রান্না শেষ করতে প্রায় দুপুর। দেখা গেল রাধা তার চেয়ে অনেক পটু এ ব্যাপারে। কিন্তু মেয়েদের যে-সহজাত প্রবণতা আছে তা থেকেই ব্যাপারটা রপ্ত হয়ে যাচ্ছিল।

রাত্রে একা থাকতে ঠিক ভয় নয়, অস্বস্তি হচ্ছিল। দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে সামান্য শব্দ হলেই এক ধরনের উৎকণ্ঠা হচ্ছিল। অন্য সময় অস্বস্তি। যেন এই মাত্র কেউ এসে দরজায় শব্দ করবে। রাধার মা বলেছিলেন প্রয়োজন মনে করলে সে রাধাকে নিয়ে শুতে পারে। দীপা রাজি হয়নি। তার জন্য রাধা কেন কষ্ট করবে। আর ঘর ভাড়া নিয়ে যে একা থাকতে চাইছে তার কারো ওপর নির্ভর করা উচিত নয়। রাতে শুয়ে দীপা ভাবছিল, সব ভাল, শুধু রান্নার পর বাসনপত্র হাঁড়ি ধোয়ার ব্যাপারটা না থাকলে ঠিক হত। রাধা বলেছিল সে ইচ্ছে করলে একটা কাজের লোক রাখতে পারে যে, পাঁচ টাকার বিনিময়ে দুবেলা বাসনপত্র মেজে ঘর পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে। কিন্তু পাঁচ টাকা খরচ করার বিলাসিতা এই মুহূর্তে সে করতে পারে না।

রাত্রে শুয়ে আর একটা জিনিস হল। ঘুম আসছিল না কিছুতেই। এপাশ ওপাশ করতে করতে হঠাৎ অমরনাথের মুখ মনে পড়ল তার। আর তারপরেই চা-বাগানের বাড়ির সামনের মাঠ, আঙরাভাসা নদী, সবুজ গালিচার মত চায়ের গাছের সারি এবং সব শেষে অঞ্জলির মুখ। সঙ্গে সঙ্গে বুক কাঁপিয়ে কান্নার ঝড় উঠল। বালিশে মুখ চেপেও সেই কান্না থামানো যাচ্ছিল না। হঠাৎই এটা হল। ফেলে আসা ছেলেবেলার জন্যে তার মন উথালি-পাথালি করতে লাগল। এই সময় সবাইকে তার ভাল লাগছিল। এমন কি অঞ্জলিকেও। নিজেকে ভীষণ নিঃস্ব বলে মনে হচ্ছিল।

অথচ দিন সাতেকের মধ্যেই সব কিছু অভ্যেসে এসে গেল। রান্না থেকে একা থাকা। এই সাতদিন এলাকার বাইরে যায়নি সে। এমন কি টিউশনিতেও না। প্রথম দিনেই লাবণ্যর দিদিমাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল একথা। দিন সাতেকের ছুটি চাই। এখন লাবণ্যর স্কুল বন্ধ। অতএব তেমন অসুবিধে হবার কথা নয়। বাড়ি বদলের জন্যে এই ছুটি নিতে বাধ্য হচ্ছে বলে সে চিঠিতে দুঃখ প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় চিঠি সে লিখেছে মনোরমাকে। হোস্টেল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে একটি বাসা ভাড়া করে আছে। জীবনে প্রথম নিজে রান্না করে খাচ্ছে। এরকম সময়ে মনোরমাদের কথা খুব মনে পড়ছিল। নিজের নতুন ঠিকানা জানিয়ে লিখেছে তার পড়াশুনা ভালই চলছে। চিন্তার কোন কারণ নেই।

কলকাতায় এসে বস্তি নজরে পড়ছিল দীপার। একেবারে শহরের বুকের ওপরে বড় বড় বাড়ির ফাঁকে কিছুটা জমির উপরে ভাঙাচোরা ঠাসঠাস একতলা টিন সিমেন্টের সঙ্গে টালির ঘর। ভীমরুলের চাকের মত ওই বস্তিতে মানুষ কিভাবে থাকে সেটা ভাবতে অবাক লেগেছিল। তারপর যখন জেনেছিল কলকাতার বুকের বেশিরভাগ বস্তিতে পশ্চিমবঙ্গীয় মানুষেরাই থাকেন, তখন গোলমাল লেগেছিল। কলোনিতে এসে সে দেখল পূর্ববঙ্গের

উদ্বাস্তু মানুষেরা নিজেদের বাসস্থান খুবই সাধারণভাবে নতুন জায়গায় গড়ে তুললেও তা বস্তির পরিবেশের মত দমবন্ধ করা নয়। যথেষ্ট ফাঁকা, গাছপালা লাগানো, নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে এই কলোনিগুলো গড়ে উঠেছে। রাধার সঙ্গে কথা হয়েছিল একদিন। রাধা বলেছিল, আমরা তো মার খাওয়া মানুষ, বাঁচার জন্যে আমাদের এখনও চেষ্টা আছে। সবাই চেষ্টা করি আবার আগের জীবন ফিরিয়ে আনতে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের শুধু আলস্য আছে, সেটা দূর করার জন্যে কোনও চেষ্টা নেই।

তিনদিনের মাথায় পড়াশুনা শুরু করেছিল দীপা। কলেজের পড়ায় তার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু সে আবিষ্কার করল মাথার ভেতর থেকে আই এ এসের চিন্তাটা অনেক সরে গিয়েছে। কলোনিতে ঝগড়া হয়, এর সঙ্গে ওর মারপিটও হচ্ছে। এই মানুষই এখন পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ প্রতিনিধি। শমিতের দেওয়া আই এ এসের ব্যাখ্যাটা এখন বড় সত্য বলে মনে হচ্ছে। নিজেকে যাচাই করার সহজ রাস্তাটা ছেড়ে দিতেও তার মন চাইছিল না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করল ফর্ম ভর্তি করে পরীক্ষায় বসবে। নিজের যোগ্যতা দেখবে। তারপর ঠিক করবে চাকরি করবে কি করবে না।

কিন্তু চাকরি দরকার। এদেশে যেসব চাকরি গ্রাজুয়েট হয়েই করা যায় সেগুলোর জন্যে চেষ্টা করতে হবে। তদ্দিন খরচ চালানোর জন্যে রোজগারের পথ হিসেবে টিউশনি, তো রয়েছেই। লাবণ্যকে পড়াবার দায়িত্ব নেবার পরও তার কাছে অন্তত সাত আটজন ওই প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। অতএব না খেয়ে মরে যেতে হবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় আসতেই চোখে পড়ল বাড়িওয়ালা তাঁর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। এই মানুষটাকে তার আর পছন্দ হচ্ছে না। ওঁর চোখের দৃষ্টিতে কেমন একটা চটচটে ব্যাপার আছে, চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। দেখামাত্র ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু লাগে নাকি? এনি প্রব্লেম?'

দীপা মাথা নেড়ে না বলে ভেতরে ঢুকে গেল।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর পরিষ্কার হয়ে দীপা দরজায় তালা লাগিয়ে বের হল। উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নামার মুখে বাড়িওয়ালার সঙ্গে আবার দেখা, 'কই যাও?'

'কাজ আছে।' দীপা গতি কমাল সামান্য।

'অ। বেশী রাত না করাই ভাল, বুঝ না? মাইয়া মানুষেরে রাতের বেলায় লোকে ঠিক চোখে দ্যাখে না। কথাটা বুঝ না?'

'একা এসে থাকতে পারি যখন তখন এটুকু নিশ্চয়ই বুঝি।' দীপা আর দাঁড়াল না। রাধা বলেছে লোকটার স্বভাবই এই। আগ বাড়িয়ে কথা বলে। আর তাতেই নাকি মনের সুখ মেটায়। আসলে মনে মনে বেজায় ভীতু। ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে এই সাতদিনে তার একবারও দেখা হয়নি। দু-একবার চোখে পড়েছে—চোখ পর্যন্ত ঘোমটা টেনে কাজ করছেন। বারো তেরো বছরের মেয়েদের খুব ভিড় হয় বাড়িওয়ালার কাছে। স্ত্রীর তৈরী মোয়া নাড়ু নিজের হাতে খাওয়ান তাদের। অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি ওঁর বিরুদ্ধে। বরং কলোনির মানুষ এই স্বভাবের জন্যে হাসাহাসি করে। করুক। কিন্তু যে-মানুষের চোখের দৃষ্টি অত চটচটে তার সামনে দাঁড়াতে গা ঘিনঘিন করে।

রাধাদের বাড়িতে ঢুকে ওর দাদার সঙ্গে দেখা। পাজামা আর হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবী পরে বের হচ্ছে। দেখলেই বোঝা যায় পরিশ্রম করে। কাঁঠাল গাছের সামনে ওকে দেখেই বলল, 'রাধা নেই। টিউশনিতে গিয়েছে।'

'এই সময়?'

'ওর ছাত্রীর বাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় সত্যনারায়ণ পূজা তাই।'

দীপা লক্ষ্য করেছে তার সঙ্গে কথা বলার সময় রাধা আজকাল কলকাতার ভাষা ব্যবহার করে। রাধার দাদাও দু-একবার যা বলেছে তা এদেশের ভাষায়। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ওরা দেশের ভাষা ব্যবহার করে। রাধার মা কিন্তু এই চেষ্টা করে না।

'ও। তাহলে ঠিক আছে।' দীপা পেছন ফিরল। এখান থেকে স্টেশনে হেঁটে যাবে সে। ট্রেন ধরে শিয়ালদায়। শিয়ালদায় নেমে সেন্ট্রাল এভিন্যুতে, লাবণ্যদের বাড়ি। সে বুঝতে পারল রাধার দাদা যেহেতু বেরিয়েছে তাই খানিকটা তফাতে আসছে। ভদ্রলোকের নাম অনিল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের কোনও যুবককে অবশ্য ভদ্রলোক বলা যায় কিনা তা বুঝতে পারল না দীপা কিন্তু পরিচিত একজন একই রাস্তায় যাচ্ছে অথচ সে কথা বলছে না—এটা ভাবতে খারাপ লাগল। সে ঘুরে পেছন ফিরে তাকিয়ে হাসল।

অনিল সামান্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'পড়াতে। সেন্ট্রাল এভিন্যুতে।'

'সে তো অনেক দূর।'

দীপা জবাব না দিয়ে আবার হাসল। অনিল বলল, 'আপনার সাহস আছে। মাকে একথাই বলছিলাম। একা এসে থাকছেন। কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো ?'

'না, না। রাধা যা সাহায্য করেছে তারপর আর অসুবিধে থাকে।'

মাটির রাস্তা ধরে আরও খানিকটা পথ চুপচাপ চলা। আশেপাশের বাড়ির মানুষজন তাদের দেখছে। অবশ্য এর মধ্যেই দীপা বেশ দ্রষ্টব্য হয়ে গিয়েছে।

অনিল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কিসে যাবেন ?'

'ট্রেনে। আপনি ?'

'আমি তো গড়িয়াহাটে যাব। বাসে। ওখানে আমার দোকান, জানেন তো !'

'হ্যাঁ, শুনেছি। কিসের দোকান যেন ?'

'কাটা কাপড়ের। চার বছর ধরে অনেক চেষ্টা করে একটু দাঁড় করিয়েছি। এখানে জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। ঘর ভাড়া করার পয়সা কোথায় ? যা সেলামি চায়। তাই ফুটপাতের ওপর কোনরকমে···মূলধনও তো কম।'

'খুব খাটতে হয়।'

'খাটনির জন্যে ভাবি না। সাড়ে আটটায় যাই, সাড়ে বারোটায় ফিরি। ভাত খেয়ে এই যে যাচ্ছি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে দশটা। এমনিতে খারাপ না, শুধু ঝামেলা করে দুটো জিনিস। বৃষ্টি আর পুলিশ।'

কথাটা এমন ভঙ্গীতে বলা যে হেসে ফেলল দীপা, 'বৃষ্টির ব্যাপারটা না হয় বুঝলাম কিন্তু পুলিশ কেন ? আপনাদের ব্যবসা কি আইনসঙ্গত নয় ?'

'ফুটপাত দখল করা দোকান তো। আসবেন একদিন দেখে যাবেন।' তারপরেই খেয়াল হল যেন, 'আপনি সেন্ট্রাল এভিন্যুতে যাবেন বলছিলেন না ?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ট্রেনে কেন যাচ্ছেন ? বার বার গাড়ি বদলানো। এখান থেকে নয় নম্বর বাসে উঠে বসুন, সোজা সেন্ট্রাল এভিন্যুতে নামবেন। ভাড়াও কম পড়বে।'

ট্রেনে তাড়াতাড়ি কলকাতার মাঝখানে পৌঁছানো যায়। কিন্তু আজ তো তার তেমন তাড়াহুড়ো নেই। অতএব সে স্টেশনের পথ ছেড়ে দিল। অনিলের পাশাপাশি সে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, একসঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছায় অনিল তাকে বাসে যাওয়ার

প্রস্তাব দিল না তো ! সঙ্গে সঙ্গে চিন্তাটাকে বাতিল করল সে। কলেজে বা রাস্তাঘাটে যে সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মতলব নিয়ে মেশে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা এবং চেহারায় অনিলের আকাশ পাতাল পার্থক্য। ওকে দেখলেই মনে হয় একজন সৎ মানুষ সংসার বাঁচানোর জন্যে মরণপণ পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ফুটপাতের দোকান এমন কিছু দর্শনীয় নয়, মনে মতলব থাকলে সেই দোকান দেখতে যেতে বলত না।

'রাধা বলছিল আপনি আর এখানে এসে পড়াশুনা করেননি।'

'আর পড়াশুনা ! এখানে আসার পর পেটের ভাত যোগাড় করতেই হিমসিম খাচ্ছিলাম। দেশে আই এ পাশ করেছিলাম ফার্স্ট ডিভিসনে। এর মধ্যেই সব ভুলে গিয়েছি। রাধাকে তাই বলেছি, খাওয়াপরার চিন্তা করতে হবে না, টিউশনির টাকায় তুই তোর পড়া চালিয়ে যা।' অনিল হাসল।

'আপনি এত পরিশ্রম করেন, আপনার রিক্রিয়েশন কি ?'

'রিক্রিয়েশন ?' হাসল অনিল, 'সারাদিন দোকানে এত লোক আসে, কতরকমের লোক, তাদের সঙ্গে কথা বলেই সময় কেটে যায়।'

ওরা বাসস্ট্যাণ্ডে এসে গিয়েছিল। দোতলা বাস। দীপা একতলার লেডিস সিটে বসল। জনা দশ-বারো যাত্রী এখন। অনিল সামনের দিকের একটা সিটে বসে পড়ল। মিনিট পাঁচেক বাদে বাস ছাড়ল। দীপার মনে পড়ল এই রাস্তায় সেদিন তারা ট্যাক্সি করে এসেছিল। মিনিট তিনেকের মধ্যে বেশ ভিড় হয়ে গেল বাসে। ঢাকুরিয়া, গোলপার্ক ইত্যাদি জায়গার নাম কণ্ডাক্টারের মুখে শুনে দেখে নিচ্ছিল দীপা। হঠাৎ দেখল একটা হাত সামনে দাঁড়ানো মানুষের ফাঁক গলে তার দিকে এগিয়ে আসছে আর সেই হাতের আঙুলে টিকিট ধরা। সে মুখ তুলে অনিলকে দেখতে পেল। অনিল বলল, 'আমার নামার জায়গা এসে গিয়েছে। এটা রাখুন।'

'ওমা, আপনি আমার টিকিট কাটলেন কেন ?'

'রাখুন তো। একসঙ্গে বাসে উঠে একটা টিকিট আলাদা কাটা যায় নাকি ? চলি।' টিকিটটা নিতেই অনিল সরে গেল সামনে থেকে। দীপা জানলা দিয়ে তাকাল। এইভাবে অনিলের পয়সা, তা যত সামান্য হোক, খরচ করাতে ভাল লাগছিল না তার। কিন্তু সেইসঙ্গে আর একটা কথা মাথায় এল। অনিল খুব সহজ। এত সহজভাবে নিজের কথা বলতে কাউকে শোনেনি। অসীম বন্ধু হিসেবে ভাল কিন্তু কেমন একটা ব্যবধান রেখে চলত। শমিতের উত্তাপ আছে। ও যখন কথা বলে তখন খুব সিরিয়াস হয়ে বলে। বক্তব্যের মধ্যে হালকা কিছু থাকলেও তাতে বুদ্ধি ব্যবহার করতে চায়। পিয়ানদেল্লো থেকে শম্ভু মিত্র, আলোচনায় যেন স্বস্তি পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত সমস্যার কথা কখনও বলে না। বলার কথা ভাবেও না। যে-যার গণ্ডীতে নিশ্চয়ই ভাল। কিন্তু অনিলের সঙ্গে এই এতটুকু কথা বলার মধ্যেই যেন ওর দোকানের কাটা কাপড়ের যে ওম পাওয়া গেল তা অন্যদের কাছে পাওয়া যায়নি।

প্রায় সমস্ত কলকাতা ঘুরেই বাস ধর্মতলা পার হচ্ছিল। স্টেটসম্যান অফিসের উল্টোদিকে বাস থামতেই শমিতকে দেখতে পেল সে। শমিত আর একটা মেয়ে। বাসের দিকে তাকিয়ে তাকে দেখতে পেয়েই শমিত চিৎকার করল, 'আরে, এই দীপা। নেমে পড়। নেমে এসো। চটপট।'

ডাকটা এমন যে বাসের অন্য যাত্রীরা তার দিকে তাকাল। প্রায় বাধ্য হয়েই দীপা নেমে এল। শমিত হাসল, 'একেই বলে যোগাযোগ। তোমার কথা একটু আগে ভাবছিলাম আর

অমনি তুমি চলে এলে এখানে।'

'কি ব্যাপার ? ডাকলেন কেন ?'

'যাচ্ছ কোথায় ?'

'ছাত্রী পড়াতে।'

'ও। ঘণ্টাখানেক বাদে গেলে অসুবিধে হবে না। কফি খাবে ?'

দীপা দেখল মেয়েটি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শমিতের কথাবার্তায় বোঝাই যাচ্ছে না ওরা একসঙ্গে ছিল কিনা। শমিত সেটা বুঝতে পেরে বলল, 'এসো, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি শেফালী দত্ত। অ্যামেচারে অ্যাক্টিং করেন। অফিস ক্লাব। আর এ হল দীপা। কলেজে পড়ে।' শেফালী মুখ ফিরিয়ে হাসল। নমস্কারের চেষ্টা করল না। দীপা চুপ করে রইল। শমিত বলল, 'চল, কফি খাই।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। আপনারা যান। আমি এইমাত্র ভাত খেয়ে আসছি।'

শমিত বলল, 'আমি গিয়েছিলাম শেফালী দেবীর বাড়িতে। যদি এই তিনটে শো করে দেন। গিয়ে শুনলাম ওই অফিসে রিহার্সালি দিতে এসেছেন। বলে এলাম। আর আসা মাত্র এখানেই দেখা হয়ে গেল।'

'তাহলে তো আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।'

'আরও বাড়ল।'

'মানে ?'

'উনি তিনটের বেশী রিহার্সালি দিতে পারবেন না আর চার শো তিরিশ দিতে হবে। একটা কথা ওঁকে বোঝাতে পারছি না যে আমরা ফুর্তি করার জন্যে নাটক করছি না।'

এই সময় শেফালী কথা বলল। গলার স্বর বেশ মোটা, 'আমি চলি। দেরি হয়ে গেছে। যদি আপনার পোষায় তাহলে আজ রাত্রে বাড়িতে খবর দেবেন।' শেফালী চলে গেল। ফর্সা কিন্তু শুকনো চেহারা। মুখে পুরু পাউডার।

তার যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'এনারা মাসে কটা শো করেন ?'

'জানি না। চার পাঁচ ছটা হবে। অফিস ক্লাবে ওঁরা বেশী টাকা পান। আগে অফিসের নাটকে ছেলেরা মেয়ে সাজতো। এখন এরা সুযোগ পাচ্ছে। তাই যারা একটু ভাল করে তাদের ডিম্যাণ্ড বাড়ছে।' ক্লান্ত গলায় বলল শমিত।

'কিন্তু আমায় ডাকলেন কেন ?'

'তোমার কি মনে হয় সময় দিতে পারবে না ?'

'সময় দেবার প্রশ্ন নয়। আসলে পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে আমার এলেমের ওপর। কোনদিন নাটক করিনি, সে-ভাবে নাটক দেখিনি। নাটক নিয়ে একটুও পড়াশুনা নেই। একদম নভিস আমি। এক্ষেত্রে প্রথমেই বড় চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে একটা হাস্যকর কিছু করে ফেলা নির্বোধের ব্যাপার হবে।'

'তুমি আত্মবিশ্বাস পাচ্ছ না ?'

'এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আমার কথা হয়ে গিয়েছে একদিন।'

'তাহলে আর কি করা যাবে।' নিঃশ্বাস ফেলল শমিত, 'শো তিনটে ক্যানসেল করে দিতে হবে। ধার করে টাকা এনে শেফালিকে দিয়ে হয়তো করাতে পারতাম কিন্তু তাতে না ভরতো মন আর কল শো করারও কোন মানে থাকত না।'

দীপার খুব খারাপ লাগতে আরম্ভ করল। শমিতের অন্যসময়ের কথাবার্তার সঙ্গে এখন কোনও মিল নেই। ভেঙ্গে না পড়লে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না। সে জিজ্ঞাসা

করল, 'টাকার কথা না হয় বাদ দিলাম, আপনি যে আমাকে করতে বলছেন আমি তো এই ভদ্রমহিলার ধারে কাছে যেতে পারতাম না। উনি তো প্রফেশন্যাল।'

শমিত মাথা নাড়ল, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি যদি সিনসিয়ার হও তাহলে তোমার এই স্বাভাবিক কথা বলার ভঙ্গীটাকেই কাজে লাগাব। অভিনয় মানে গলা কাঁপিয়ে সুর করে কথা বলা নয়। চরিত্রটি যে-কথা বলছে তার মানে বুঝে সেই মত প্রকাশ করতে হবে। শুধু কথায় নয়, মঞ্চে যতক্ষণ চরিত্রটি থাকবে তার যেভাবে চলাফেরা করা উচিত, হাত-পা নাড়া উচিত সেই ভাবটাকেই স্পষ্ট করতে হবে। চেষ্টা করবে?'

দীপা হেসে ফেলল, 'জানি না কি হবে। কিন্তু আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে রিহার্সাল করতে অসুবিধে হবে না?'

'একটু হবে। তবে তোমাকে সাড়ে আটটার মধ্যে ছেড়ে দেব যাতে দশটার আগে বাড়ি ফিরে যেতে পার। শুধু শো-এর দিন একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে।' শমিতের মুখের চেহারা পাল্টে যাচ্ছিল। খুব উজ্জ্বল লাগছিল ওকে, 'আজ চলে এস।'

'আমি তো টিউশনিতে যাচ্ছি।'

'কখন ছাড়া পাবে?'

'সাড়ে ছটা।'

'সাড়ে পাঁচ করো। ছটা থেকে তোমাকে নিয়ে বসব।'

কথা ছিল বিডন স্ট্রীট আর সেন্ট্রাল এভিন্যুর মোড়ে শমিত অপেক্ষা করবে। লাবণ্যকে পড়িয়ে দীপা ঠিক সময়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সেখান থেকে রিহার্সাল রুম। রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে ঢুকে মাঝারি ঘর। দশজন ছেলে এর মধ্যে এসে গিয়েছে সেখানে। শমিত বলল, 'এ হচ্ছে দীপা, মায়ার বন্ধু। আজ ওকে নিয়ে বসব। যদি দীপা পারে তাহলে কল শোগুলো হবে নইলে নয়। চা খাবে?'

দীপা মাথা নাড়ল। ঘরে সতরঞ্চি পাতা। শমিতের সামনে সেখানেই সে হাঁটু মুড়ে বসল। ঘরের অন্য ছেলেরা তার দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল দীপার। এই সময় মনে হচ্ছিল এখানে আর একজন মহিলা থাকলে সুবিধে হত। সময় নষ্ট করল না শমিত। নাটকের খাতা খুলে বলল, 'দীপা প্রথমে আমি তোমাকে চরিত্রটা কি, তার অভ্যেস চলাফেরা মানসিকতা কি রকম বলে নিই। তারপর এই নাটকে তার ভূমিকা কি এবং কোন সমস্যায় সে পড়েছে? শোনার পর তোমার যদি প্রশ্ন করার কিছু থাকে করতে পার।'

দীপা মাথা নাড়ল। শমিত শুরু করল। ওর বলার ধরন এত সহজ এবং স্পষ্ট যে সেই মেয়েটির ছবি পরিষ্কার হয়ে উঠল দীপার সামনে। চুপচাপ সে শুনে গেল। শমিত শেষ করে জানতে চাইল, 'বুঝতে অসুবিধে হল?'

'না। কিন্তু—।' দীপা চুপ করে গেল।

'হ্যাঁ। বল। প্রব্লেমটা কি?'

'এই মেয়ে কাঁদবে না কেন?'

'কারণ ভেঙ্গে পড়তে সে পারে না। তার আত্মমর্যাদায় লাগবে।'

'ঠিকই। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওর কাঁদা উচিত।'

'ওহো, দীপা, যেসব মেয়ে অল্পে কেঁদে ভাসায় ও তাদের দলে নয়। আমি জানি বাংলা নাটকের দর্শক স্টেজে কান্না দেখতে ভালবাসে কিন্তু আমরা—।'

মাঝপথেই থামিয়ে দিল দীপা। সঙ্গে সঙ্গে অন্য শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। শমিত হাত তুলতে ওরা থেমে গেল। শমিত বলল, 'আমাদের এখানে ডিসিপ্লিনটা মেনে চলা হয়। যে সময়ে দলে আসতে বলা হয় তারপরে এলে সেদিন বাইরে থাকতে হবে। কেউ কথা বললে তাকে সেটা শেষ করতে দিতে হয়। এইগুলো আমরা সবাই মেনে চলি।'

'ও।' দীপা লজ্জা পেল।

'ঠিক আছে, এবার বল।'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছি মেয়েটি সবার সামনে কেঁদে পড়তে পারে না। কিন্তু ও কাঁদবে ভেতরে ভেতরে। যদি তেমন কোন সুযোগ থাকে যখন মঞ্চে ও একা তখন এক মুহূর্তের জন্যেও যদি দর্শক সেই ভেতরের কান্না দেখতে পান তাহলে খুব ভাল হবে।'

শমিত মুখ ঘুরিয়ে ঘরের কোণায় তাকাল, সেখানে সুদীপ বসেছিল, চুপচাপ। শমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল, 'উনি খুব ভাল বলেছেন কিন্তু মুশকিল হল পরের দৃশ্যে ঘটনা অন্যদিকে বয়ে গেছে।'

'তা যাক। দীপার আইডিয়াটা আমার ভাল লাগছে। আমরা নাটক করছি দর্শকের জন্যে। দর্শককে যদি বুঝতে না দিই চরিত্রটির মনের চেহারা কি তাহলে ঠিক কাজ হবে না। দেখা যাক কোন নতুন দৃশ্য বের করা যায় কিনা। থ্যাঙ্ক ইউ দীপা, তুমি ব্যাপারটা ভেবেছ বলে খুশী হলাম।'

রাত আটটায় তাকে ছুটি দিল শমিত। এর মধ্যে পুরো নাটকটা গড়গড় করে পড়ে গিয়েছে সে। একবার দেখা ছিল তাই বুঝতে অসুবিধে হল না। শেষ আধ ঘণ্টায় ওর হাতে খাতা দিয়ে শমিত বলল, 'তুমি মেয়েটির সংলাপ বল। দেখে দেখেই বলবে। আমাদের মুখস্থ আছে।'

সংলাপে চোখ রেখে দীপা আবিষ্কার করল তার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। কান গরম হয়ে উঠল। বসে বসেই শমিতরা যেখানে সংলাপ শুরু করল সেখানে মেয়েটি নেই। হয়তো দীপাকে তৈরী হতে সময়টা দিল। কিন্তু দীপার মনে হল কথা বলতে গেলেই গলায় স্বর ফুটবে না। তার জায়গা এসে গেলেও সে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। অন্য সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। দীপা মুখ তুলল, 'আমি এটা নিয়ে গিয়ে বাড়ি থেকে যদি তৈরী হয়ে এসে বলি?'

বিরক্ত হল শমিত, 'তার জন্যে অনেকটা সময় পরে পাবে। এখন যা বললাম তাই কর।' দীপার খেয়াল হল শমিতকে প্রশ্নটা করার সময় তার গলা আটকে যায়নি। কিন্তু একটু যেন কাঁপুনি এসেছিল। আবার নতুন করে পড়া শুরু হল। তিনটে পুরুষ-চরিত্র কথা বলছে। হঠাৎ হাত তুলল শমিত, 'বাসব। হোয়াট ইজ দিস?'

'ভুল হল?' রোগা মত একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

'আমি হাজারবার বলেছি কারো গলা নকল করবে না। কটা শো করেছ এর মধ্যে? এখনও নিজের গলায় কথা না বললে তো মুশকিল।'

ছেলেটি মাথা চুলকে বলল, 'তাহলে এসে গিয়েছে।'

'আসে কেন? এর কোন ক্ষমা নেই কিন্তু। যার গলা নকল করছ সেটা তাঁকেই মানায়। অন্য কেউ বললে ক্যারিকেচার বলে মনে হয়। আমি কিন্তু পরের বার এটা মেনে নেব না। নাও, আবার আরম্ভ কর।'

দীপা ব্যাপারটা ধরতে পারল না। যদিও ছেলেটির সংলাপ বলার ধরনের সঙ্গে ওর কথা বলার কোন মিল নেই। সংলাপে একটা সুর আনছিল।

আবার বলা শুরু হল। পর পর চোখ রেখে নিজের জায়গায় এলে দীপা : 'আপনি জানেন না, জানার আগ্রহও যখন হয়নি তখন আপনাকে নিজে থেকে বলার প্রয়োজন বোধ করছি না।'

'এরকম নাটুকে ভাষায় কথা বলছ কেন ?' শমিত জিজ্ঞাসা করল।

'নাটক। তার আলাদা কোন ভাষা থাকে নাকি। নাটক তো জীবন থেকেই নেওয়া।'

'কিন্তু জীবন মানেই নাটক নয়।'

'মানছি। কিন্তু আমি আমার কথা বলছি।'

'বেশ। তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এবার বল, তোমার কষ্ট কি ? কি তোমার দুঃখ ? আমি সব জানতে চাই।'

'কি আশ্চর্য। আমি খামোকা আপনাকে আমার কথা বলতে যাব কেন ?'

হঠাৎ একটা হাততালি বাজল। দীপা খাতা থেকে চোখ সরাল। শমিত বলল, 'গুড। এই তেজটা চাই। উইদ দিস ডিগনিটি। দীপা তোমার গলা ঠিক আছে কিন্তু রেওয়াজ করতে হবে।'

'রেওয়াজ ?' দীপা অবাক।

'হ্যাঁ। শুধু গায়কদের গলা ঠিক করার জন্যে রেওয়াজ করতে হয় এই ধারণা ভুল। অভিনয়ের জন্যেও ওটা দরকার। তোমার গলার স্বর মিষ্টি এবং পরিষ্কার। কিন্তু গলায় কাজ আনতে গেলে অনুশীলন দরকার। বাড়িতে সঞ্চয়িতা আছে ?'

'আছে।'

'বিদায় অভিশাপ আর কর্ণকুন্তী সংবাদ রোজ সকালে জোরে জোরে পড়বে। গলা যতটা তুললে কষ্ট হয় না ভেঙ্গে পড়ে না ততটা তুলে অর্থ অনুযায়ী সংলাপ বলবে। যেখানে বেস ভয়েস দরকার সেখানে সামান্য নিচে গলা নামাবে। পড়ার সময় মনে রাখবে চরিত্রটি যে কথা বলছে তার ভেতরের আবেগ যেন তোমার বলায় স্পষ্ট হয়।'

দীপা হেসে বলল, 'পাড়ার লোকজন চলে আসবে যে।'

বিরক্ত হল শমিত, 'প্রথম দিন আসবে, হয়তো দ্বিতীয় দিনেও কিন্তু তারপর আর আসবে না। সবাই জেনে যাবে তুমি অনুশীলন করছ। কোনদিন হারমোনিয়াম বাজিয়েছ ?'

'না। সেই সুযোগ পাইনি।'

'ঠিক আছে, আপাতত দরকার নেই। তোমার দেরি হয়ে গেছে তুমি যেতে পার। আর হ্যাঁ, কাল ছটায় আসবে। ঠিক ছটা।'

'আমাকে কি রোজ আসতে হবে ?'

এমন নির্বোধের মত প্রশ্ন যেন কখনও শোনেনি শমিত, 'না এলে তুমি পারবে কি করে ? মাত্র তো দু ঘণ্টা, বাইশ ঘণ্টা অন্য কাজ করো। নাটক হবে দলগত শিল্প। প্রত্যেকে সমান ছন্দে বাজবে। তাল কেটে গেলেই ঝুল। তোমাকে এই চরিত্রে নিয়ে আমি বিরাট ঝুঁকি নিচ্ছি। দিনে অন্তত দশ ঘণ্টা রিহার্সাল দিলে হয়তো একটা আদল পেতাম। কি আর করা যাবে।' অখুশী মনে কথাগুলো বলল শমিত।

দীপা বলতে যাচ্ছিল, আমি কিন্তু যেচে আপনার কাছে আসিনি, আপনি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছেন। যেহেতু কথাটা বলা মানে পরিবেশটাকে নষ্ট করা তাই সে উঠে দাঁড়াল। শমিত বলল, 'সুদীপ ওকে বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দিতে হবে।'

'না, না। কোন দরকার নেই।'

'বাজে বকো না। প্রথম দিন কেউ যাক।'

সুদীপ বলল, 'আমিই যাচ্ছি।'

ওরা রিহার্সালের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে সুদীপ জিজ্ঞাসা করল, 'চরিত্রটা আপনার ভাল লাগেনি?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'ভালই তো।'

'আসলে যে দৃশ্যটা অ্যাড করার কথা আপনি বললেন সেটা প্রথমে আমি ভেবেছিলাম কিন্তু শমিতের তখন পছন্দ হয়নি। আপনি এত ভাল ভাবতে পারেন দেখে খুশি হলাম।'

দীপা সুদীপের দিকে তাকাল, কিছু বলল না। বাস স্ট্যাণ্ডে এসে সুদীপ বলল, 'ঘাবড়াবেন না, আমি শুধু বলতে পারি প্রথমবারে আপনার মত ভাল মায়াও করতে পারেনি।'

দীপা হাসল, 'আমাকে এখন অনেক দূরে যেতে হবে।'

'ও। এই কদিন না-হয় একটু কষ্ট করুন। আমরা তো সন্ধ্যেটা কিরকম তা ভুলেই গিয়েছি রিহার্সাল রুমে থেকে। আপনার বাস আসছে।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না, এই বাস নয়, অত দূরে এই বাস যাবে না।'

॥ ৪৫ ॥

বেলা দুটোর সময় রাধা চলে এল। সেজেগুজে। তার দিকে তাকিয়ে হাসল দীপা। মুখে পাউডারের দাগ স্পষ্ট, কানের পাশেও। সে বলল, 'মুখটা চট করে ঠিক করে নাও। আমার হয়ে গিয়েছে।'

রাধা আয়নার সামনে গেল, 'আমাদের ঘরটা এমন অন্ধকার না! ভূতের মত দেখাচ্ছিল, ভাগ্যিস তখন বললে!'

দরজায় তালা দিয়ে দীপা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের স্ট্র্যাপটা ধরে বলল, 'জানো, খুব নার্ভাস লাগছে। কাল রাত্রে নাটকের ওপর লেখা এক সাহেবের বই পড়েছি। সেটা পড়ার পর আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছি।'

রাধা হাসল, 'প্রথমবার বলে এমন হয়॥ কলেজে যেদিন প্রথম গিয়েছিলাম সেদিনও আমি, খুব নার্ভাস ছিলাম। যদি খারাপ হয় আর ক'রো না, ব্যাস।'

দীপা চুপচাপ হাঁটল। মনে মনে কথাটা মানতে পারছিল না। যে কাজে হাত দেবে তা শেষ না করে পালিয়ে আসার মেয়ে সে নয়। যতই নাভার্স হয়ে যাক শেষ মুহূর্তে নিশ্চয়ই সে এটা কাটিয়ে উঠতে পারবে।

রাধা ওর সঙ্গে যাচ্ছিল। আজ তাকে অন্যরকম লাগছে। একটু সাজলেই কোন কোন মেয়ের চেহারা পাল্টে যায়। দীপার মনে হচ্ছিল আটপৌরে রাধাকেই অনেক ভাল দেখায়। মোড়ের মাথায় বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা হল। হাতে একটা সাদা কাপড়ের থলে নিয়ে তিনি ফিরছিলেন। ওদের দেখতে পেয়ে একগাল হাসলেন, 'দুই সখী যাও কোথায়?'

'নাটক!' রাধা এক চিমটি হাসল।

'না, না। নাটক দেখা এই বয়সে ঠিক না। মন বিপথে যায়। আর দুইজন একা একা নাটক—সঙ্গে কোন পুরুষ মানুষ নাই, এটাও ঠিক না।' ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগলেন ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর চোখ দীপার মুখের ওপর থেকে সরছিল না।

রাধা বলল, 'আমরা কি বাচ্চা মেয়ে, আপনি কি ভাবেন আমাদের?'

'সেটাই তো সমস্যা। সবাই আমারে জিগায় একটা আকাশ থিকা পড়া মাইয়াকে ঘর

ভাড়া দিলা তুমি, সে আবার একা থাকে। আমি কই কোন মানুষ মন্দ কোন মানুষ ভাল তা বুঝতে পারি আমি। তোমরা বাচ্চা হইলে তো এইসব কথা কওয়ার কোন প্রয়োজনই হইত না। কি রাঁধলা আজ ?'

রাধা হাসল, 'আপনি খাবেন একদিন ? বাড়ি থেকে খেতে দেবে ?'

'আর কইও না। কি কষ্টে যে আছি আমি !' নিঃশ্বাস ফেললেন উনি।

রাধা আর দাঁড়াল না। দীপার হাত ধরে টেনে বাড়িওয়ালাকে পেরিয়ে চলে এল। খানিকটা দূরত্বে এসে বলল, 'এই বুড়োর মনে এখনও রঙ আছে !'

দীপা বলল, 'উনি যদি শুনতেন আমি অভিনয় করছি তাহলে হয়তো ঘর ছেড়ে দিতে বলতেন। কিন্তু জানো, এরকম আচরণ করেন তো, তবু ওঁকে দেখে আমার একটুও ভয় করে না। মাঝে মাঝে এসব শুনতে খারাপ লাগে না।'

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে রাধা যেন একটু আড়ষ্ট হল। একটা খালি বাস ছাড়ছিল কিন্তু তার যেন ওঠার ইচ্ছেই ছিল না। দীপা বলতে মুখ নিচু করল, 'একটু দাঁড়াও না।'

'আরে শো-এর অন্তত দুঘণ্টা আগে যেতে বলেছে শমিত। না গেলে যেভাবে বকে তা আমি শুনেছি। দেরি করতে চাই না মোটেই।'

'আর পাঁচ মিনিট। পরের বাসে যাব।' রাধা মুখ ঘোরাল।

দীপার সন্দেহ হল, 'তুমি কি কারো জন্যে অপেক্ষা করছ ?'

'হুঁ !' হঠাৎ রাধার শ্যামলা মুখেও রক্ত জমল।

'কে ?'

'আছে, একজন ! ও তোমার নাটক দেখতে চায়।'

'তোমার বন্ধু ?'

'বন্ধু ঠিক না, অনেক বড়।'

'বাঃ, বড় বলে বন্ধু হতে পারবে না ?'

'তা না— !'

দীপা ভাল করে দেখল রাধাকে। ওর এই সাজ, দাঁড়াবার ভঙ্গী, মুখের রঙ পাল্টে যাওয়া—এসবই একটা সত্যি বোঝাচ্ছে। সে সবাসরি জিজ্ঞাসা করল, 'যার জন্যে অপেক্ষা করছ তাকে তুমি ভালবাসো ?'

কথা না বলে মাথা নেড়ে উত্তরটা সে বলে উঠল, 'কাউকে ব'লো না, দাদাকেও না। বাড়ির লোকে শুনলে আমাকে মেরে ফেলবে।'

'কেন ?'

'ওরা নিচু জাতের। আমাদের পাশের গ্রামে থাকত। ওই যে এসে গিয়েছে।'

রাধার কথা শেষ হতেই দীপা দেখল দূরে একটি যুবক এগিয়ে আসতে আসতে থমকে গেল। কাছে আসবে কিনা সেই চিন্তা করছে এখন। চেহারা মোটেই সপ্রতিভ নয়, ববং, বেশ অশিক্ষার ছাপ রয়েছে। সে বলল, 'ডাকো ওকে।'

চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে রাধা মাথা নেড়ে ডাকল নিঃশব্দে। তারপর বলল, 'ওর নাম গৌরাঙ্গ। তুমি নিজে ওর সঙ্গে কথা বল, আমি চুপ করে থাকব।'

দীপা অবাক হল। যে মেয়েটিকে এতদিন সে সংগ্রামী বলে মনে করেছিল, অন্যসময় যে সোজা কথা মুখের ওপর বলে দিতে সঙ্কোচ করে না তার এমন পরিবর্তন ভাবতে পারা মুশকিল।

গৌরাঙ্গ এগিয়ে এল, এসে বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল।'

দীপা বলল, 'ওর মুখে শুনলাম আপনিও নাটক দেখতে চান। চলুন।'

'কি বই?'

'বই?'

এবার রাধা নিচু গলায় বলল, 'নাটকের নাম জানতে চাইছে।'

সিনেমার ব্যাপারে মফস্বলে এখনই বই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এইরকম সময়ে দীপার মনে হয় কলকাতার সঙ্গে মফস্বলের কোন ফারাক নেই।গৌরাঙ্গকে নাটকের নাম বলতে তিনি খুব উৎসাহিত হল বলে মনে হল না। একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করল, 'ঐতিহাসিক বই?'

দীপা হেসে ফেলল, 'না, সামাজিক।' তার মনে হল শমিত থাকলে এই লোকটাকে কিছুতেই দর্শক হিসেবে চাইত না।

গৌরাঙ্গ বলল, 'আমি রাধাকে বলছিলাম, ও তো রোজ ওদিকে যায়, বিশ্বরূপা কিংবা স্টারের টিকিট কেটে আনতে। ওর আর টাইম হয় না।'

'আহা। টাইম হয় না! সবসময় আমার কাছে অত টাকা থাকে নাকি?'

'টাকা তো আমি দিতে চেয়েছিলাম। তখন তো নিতে চাওনি।'

এইসময় আর একটি বাস ছাড়ার জন্যে তৈরী হলে দীপা বলল, 'আর দেরি করা যাবে না। ওঠ।'

বাস খালি ছিল। গৌরাঙ্গ এগিয়ে গিয়ে বসল, দীপার কাছে এল রাধা। দীপা তাকে বলল, 'ও একা যাবে কেন, তুমি ওর পাশে গিয়ে ব'সো।'

'না, ও বসবে না।' দীপার দিকে না তাকিয়ে বলল রাধা।

'কেন? তোমরা যখন অন্যসময় দেখা কর তখনও বসে না?'

'উহুঁ। যদি কেউ দেখে ফেলে তাহলে ওর বাড়িতে খুব ঝামেলা হবে।'

'আশ্চর্য!

'এতে আশ্চর্য হচ্ছ? ওর বাড়ির লোককে একবার কাউকে দিয়ে আমার কথা বলিয়েছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে নাকি নাক সিঁটকেছে, খারাপ খারাপ কথা বলেছে।'

'কেন?'

'আমি নাকি বাঙাল, বাঙাল মেয়েকে ঘরের বউ করে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যায় না। বাঙালরা নাকি সভ্যতা ভব্যতা জানে না, অবাধ্য হয়।'

'গৌরাঙ্গ প্রতিবাদ করেনি?'

'আমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে ওরও এরকম ধারণা ছিল।'

দীপা মুখ ফিরিয়ে রাস্তা দেখল। শমিত বলেছে শো-এর দিন মাথায় অন্য কোন চিন্তা না ঢোকাতে। কিন্তু এইসব কথা শুনে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। সে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাকে গৌরাঙ্গবাবু বিয়ে করবে? নাকি তোমরা এমনি বন্ধু।'

'বাঃ, বিয়ে না করলে আমি মিশবো কেন?'

'গৌরাঙ্গবাবু কথা দিয়েছেন?'

'না, এখনও দেয়নি। ওই তো বাড়িতে গোলমাল হল—।'

'যদি বাড়ির চাপে কোনদিন কথা না দিতে পারেন, রাখা তো দূরের কথা। তাহলে তুমি কি করবে? ভেবেছ?'

'হুঁ। কিন্তু ওকে যে আমার খুব ভাল লাগে।'

দীপা বলল, 'রাধা, তুমি খুব ভাল মেয়ে। কিন্তু এটা আমার পছন্দ হচ্ছে না।

রাধা নিঃশ্বাস ফেলল। তার সামান্য আওয়াজ যেন বলে দিল সে দ্বিমত নয়।

আজ ম্যারাপ বেঁধে নয়। যারা নাটক করতে ডেকেছে তারা রীতিমত মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়েছে। নাটকের আগে কয়েকটা উৎসব হবে, গান বক্তৃতা আবৃত্তির। তার জন্যে স্বেচ্ছাসেবীরা ছুটোছুটি করছে। সুদীপ তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছেন। সোজা এই পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যান। ওখানে সবাই আছে।'

দীপা একটু ইতস্তত করল, 'আচ্ছা, যদি আমার দুজন গেস্ট নাটক দেখতে চান তাহলে কি অসুবিধে হবে ? ওরা আমার পাড়ায় থাকে।'

'আচ্ছা ! ঠিক আছে, ওঁদের দাঁড়াতে বলুন। আমি দেখছি।'

দীপা রাধাকে ইঙ্গিত করে রওনা হল। পা বাড়াবার আগে চোখে পড়ল গৌরাঙ্গ বেশ কিছুটা দূরে থেকে চালু নাটকের হোর্ডিং দেখছে। পুরুষরা যদি মেয়েদের মত ভান করে তাহলে আর তাকে পুরুষ বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না। মনে হল রাধা ভুল করছে।

মেয়েদের আলাদা সাজঘর আছে এখানে। সেখানে বসে আয়নায় নিজেকে দেখছিল সে। এতখানি স্পষ্ট করে সে নিজেকে কখনও দ্যাখেনি। চোখ নাক চিবুক যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে কি সুন্দর বলা চলে ? মাথা নাড়ল সে। মনটা কিছুতেই সহজ হচ্ছে না, বারংবার মনে হচ্ছে রাধা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এইসময় দেবেশদা নক করে ভেতরে ঢুকলেন, 'কি ব্যাপার ? আমাকে হাত লাগাতে হবে নাকি ? না, প্রথম কাজটা নিজের হাতেই করে ফেল। আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। মুখ গলা হাত পরিষ্কার করে প্রথম পাউডারটা নিজেই লাগিয়ে নাও। তোয়ালে আছে সঙ্গে ?'

দীপা মাথা নাড়ল, 'পরিষ্কার গামছা এনেছি।'

'বাঃ। তাহলে তো কথাই নেই। তবে পরে একটা ছোট্ট তোয়ালে কিনে নিও। আমি দেখিয়ে দেব, নিজের মেকআপ নিজেই শিখে যাবে।' দেবেশদা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমাদের তো এখনও অনেক দেরি আছে শমিত। আগে বাবুরা খেলা করে নিন।'

'হ্যাঁ, দেরি আছে। কিন্তু তোমার কি হয়েছে দীপা ?' শমিত সামনে এল।

'কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে ?'

'হুম্। শো-এর আগে মনে কিছু রাখা উচিত নয়। বলে ফেল।'

'আমার কিছু হয়নি।'

'কার হয়েছে ?'

'রাধার। আপনি চেনেন।'

'হ্যাঁ। কি হয়েছে ওর ?'

দীপা দেবেশদার দিকে তাকাল। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, চলে যাচ্ছি, আমার সামনে তোমাকে কিছু বলতে হবে না।'

'না, না।' দীপা তাঁকে থামাল, 'আপনি থাকুন।' তারপর সমস্ত ঘটনাটা মোটামুটি সংক্ষেপে বলে গেল। শেষ করল, 'জানেন, আমার একদম এই ব্যাপারটা ভাল লাগছে না।'

শমিত দেবেশদার দিকে তাকাল। ওরা একসঙ্গে হেসে ফেলল।

'আপনারা হাসছেন ?' দীপা অবাক হল।

শমিত বলল, 'ওঃ, দীপা। তুমি বড্ড আগে জন্মে গিয়েছ।'

'মানে ?'

'বাঙালি ছেলেরা প্রেমে পড়লে সাহসী হবেই এমন কোন ফর্মুলা নেই আবার প্রেম চলার সময় যে সব ছেলে পিছিয়ে থাকে তারা সেই মেয়েকে বিয়ের পর খারাপ স্বামী হবে এমন ভাবার কোন কারণ নেই।'

'তার মানে এইসব ছেলে শেষপর্যন্ত বিয়ে করে ?'

এবার দেবেশদা বললেন, 'এই অধম তার প্রমাণ ভাই। আমার বাবা ছিলেন সিংহ আর তোমার বউদির বাবা যাকে বলে শঙ্খচূড়। ভয়ে কাছে ঘেঁষতে পারতাম না তোমার বউদির। অবশ্য তখন বউদি হয়নি সে। স্কুলে যেত ঝি-এর সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। আর আমি একপায়ে সেই যাওয়ার পথে দাঁড়িয়ে থাকতাম। একবার চোখাচোখি, ব্যস। তিন বছর বাদে এক সপ্তমীর বিকেলে কথা বলেছিলাম।'

শমিত বলল, 'সংলাপ দুটো বলে দাও।'

দেবেশদা হাসল, 'মণ্ডপে খুব ভিড়। সেই সুযোগে কোনমতে পাশে পৌঁছে গিয়ে শুকনো গলায় বলতে গেলাম, "আমি—।" কিন্তু তখনই গলার স্বর আটকে গেল। তার উত্তরে মুখ মাটির দিকে নামিয়ে তিনি বলেছিলেন, "জানি!" তারপরও সিংহ আর শঙ্খচূড়ের সঙ্গে লড়াই করতে অনেক সময় লেগেছিল। আর এখন জামাই হিসেবে শঙ্খচূড় আমাকে মাথায় নিয়ে নাচলেও তোমার বউদির সার্টিফিকেট হয়তো এ জীবনে পাব না।' কথা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ এই ঘরে হাসি থাকল।

শমিত বলল, 'অতএব দীপাবলী, তোমার ধারণা যে জীবনের সবক্ষেত্রে সত্যি হবে তা ভেবো না। রাধার আর তোমার মানসিকতা তো এক নয়। বাঃ, এই তো মুখের চেহারা পাল্টে গেল। এবার নিজের চরিত্রটি ভাবো।'

শমিত বেরিয়ে গেল। দেবেশদাও চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই যে খুকী, তোমাকে একটা কথা বলি। জীবনে আজ প্রথম স্টেজে নামছ, তাও বড় চরিত্র নিয়ে, কিন্তু সবসময় মনে রাখবে তুমি যা করছ তাই ঠিক। মঞ্চে ঢোকার আগে বাবা মাকে স্মরণ করবে আর শমিতের কাছে আশীর্বাদ নেবে।'

'কেন ?' খুব অবাক হল দীপা।

'বাবা মা তোমার জন্মগুরু আর শমিত শিক্ষাগুরু। এদের আশীর্বাদ না থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায় না।' দেবেশদা চলে গেলেন। মনে মনে হাসল দীপা। আর আবিষ্কার করল রাধার ব্যাপারটা মাথা থেকে চলে গিয়েছে।

মেকআপ হয়ে যাওয়ার পর চুপচাপ বসে নিজের সংলাপ পড়ছিল দীপা। একটা কথা এক এক রকম করে বললে তার অর্থও পাল্টে যায়। শমিত বলেছে, 'মনে রাখবেন নাটক একজন অভিনেতা অভিনেত্রীর ওপর নির্ভর করে না। আপনার সহঅভিনেতাকে সমান সুযোগ দেওয়া আপনার কর্তব্য। দুজনের মধ্যে যেন সমঝোতা নষ্ট না হয়। তাই রিহার্সালের সময় একভাবে সংলাপ বলে শো-এর সময় অন্যভাবে বলবেন না।'

গতকাল রিহার্সালে যাওয়ার আগে মায়ার বাড়িতে গিয়েছিল। বেচারার জ্বর হয়েছে। দীপা করছে জেনেছিল আগেই। খুব খুশী। জড়িয়ে টড়িয়ে ধরেছিল। ডাক্তার এখনও দিন সাতেক বাড়ি থেকে বেরুতে নিষেধ করেছে। পারলে আজ বলে আসত দীপার অভিনয় দেখতে। কিন্তু যতই খুশী হোক দীপার মনে হয়েছিল শরীরের জন্যে সে অভিনয় করতে পারছে না বলে গলায় একটা আফসোস ফুটে উঠেছিল ওর।

ডাক পড়ল। মঞ্চের একপাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। প্রথম পনের মিনিট তার কোন ভূমিকা নেই। এখন পর্দা পড়ে আছে। মাইকে ঘোষণা চলছে। হঠাৎ নিজের নাম কানে এল, 'দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়।' সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। আর তার পরেই মনে হল যদি সমস্ত সংলাপ ঠিকঠাক মনে না আসে। যদি পরের সংলাপ আগেই বলে ফেলে। শমিত বলেছে, 'কোন প্রম্পটার থাকবে না। আধুনিক নাটকে সংলাপ শুনে

বলা হয় না ওতে অভিনয় যান্ত্রিক হয়।' অতএব ভুল হলে ধরিয়ে দেবার কেউ থাকবে না।

এইসময় একটি ছেলে তার কাছে এসে চাপা গলায় বলল, 'দীপাবলীদি, আমি ওই উইংসে থাকব। খেয়াল রাখবেন।'

'কেন ?'

'শমিতদা বলেছেন আপনার গোলমাল হয়ে ধরিয়ে দিতে। একটু কান খাড়া রাখবেন। আমি ঠিক ম্যানেজ করে দেব।'

দীপার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল। শমিত কি ধরেই নিয়েছে সে ডোবাবে। তাই সবার ক্ষেত্রে যা যান্ত্রিক বলে করা হচ্ছে না তার ক্ষেত্রে সেটা করতে দ্বিধা করছে না। ছেলেটিকে সে বলল, 'আগে থেকে কিছু বলার দরকার নেই তোমার। আমার ভুল হবে না।'

পর্দা ওঠার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হলে সে শমিতকে দেখতে পেল। শমিতের পায়ের ধুলো নিতে বলেছিল দেবেশদা। সে এগিয়ে গেল, 'আশীর্বাদ করুন যেন দলের নাম রাখতে পারি।'

শমিত যেন খুব ঘাবড়ে গেল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

নাটক শুরু হয়ে গেল। সংলাপ শুনতে শুনতে দীপা সব কিছু ভুলে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে কেউ একজন বলল, চাপা গলায়, 'রেডি তো ?'

'হুঁ।' সে চোখ বন্ধ করল। জন্মগুরু কে ? কার আশীর্বাদ চাইবে এখন ? হঠাৎ বন্ধ চোখের পাতায় সত্যসাধন মাস্টারের মুখ ভেসে উঠল। হেঁকে যেন বলছেন, 'তোমারে জিততেই হইব দীপাবলী, কখনও কোন কাজে তুমি হারবা না।' দীপা চোখ খুলে ফেলল। বুক যেন খালি হয়ে গেল। দীপা তারপরেই অমরনাথের মুখ ভাবল। নিঃশব্দে বলল, 'বাবা, আমাকে আশীর্বাদ ক'রো।'

তখনই পিঠে কেউ আলতো চাপ দিল। সে শুনল তার ঢোকার আগের সংলাপ বলছে অভিনেতা। শেষ হওয়া মাত্র সে ধীরে ধীরে মঞ্চে পা বাড়াল।

উত্তেজনা ছিল। কিন্তু তার লাগাম ছিল শক্ত হাতে ধরা। ফলে পেটে একটু চিনচিনে ব্যথা জন্ম নিয়েছিল। অবশ্য এসবই অবহেলা করতে পেরেছিল দীপা। সংলাপ বলার সময়ে শব্দের অর্থ স্পষ্ট করতে সচেষ্ট ছিল। সংলাপের বাইরে হাত মুখ চোখের ভূমিকা দর্শককে খুশী করেছিল। আজ ইন্টারভ্যাল দিতে চায়নি শমিত। টানা নাটক শেষ হওয়া মাত্র হাততালিতে লক্ষ পায়রা উড়ল প্রেক্ষাগৃহে। পর্দা পড়ার পরে যখন সবাই সারি দিয়ে দাঁড়াল দর্শকের সামনে, পর্দা উঠল আবার, তখন সেই একই হাততালি। আর সেই শব্দ দীপার মনে নতুন রোমাঞ্চ আনল।

সাজঘরে এসে বসামাত্র শমিত ঢুকল উদ্ভাসিত মুখে, 'দারুণ। আমি কোন ত্রুটি পাইনি। আর শেষ রিহার্সালে যা করেছিলে তার পাঁচ গুণ ভাল আজ। আমি জানতাম দীপাবলী, তুমি পারবে। আমি গর্বিত কারণ তোমাকে আবিষ্কার করতে পেরেছি।'

দেবেশদা থেকে অনেকেই এসে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছিল। এত প্রশংসায় ডুবে গিয়ে দীপা লজ্জায় যেন মাথা তুলতে পারছিল না। এইসময় রাধা চলে এল সাজঘরে। ঢুকেই দু'হাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'উঃ, তুমি এত ভাল অভিনয় কর ? আমি ভাবতেই পারিনি।'

রাধার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েও দীপা হঠাৎ কেঁপে উঠল। সে ভাল অভিনয় করতে

পারে ? কার সঙ্গে ? যারা অভিনয় করেন তাঁরা অভিনেত্রী। সে তো অভিনেত্রী হতে চায়নি কখনও। ভাগ্য তার সঙ্গে অভিনয় করেছে বারংবার। তাহলে ? কিন্তু এই ভাবনা বেশীক্ষণ থাকল না। অন্যেরা কথা বলছিল। রাধা তাড়া দিচ্ছিল, দেরি হয়ে গিয়েছে বেশ। সঙ্গে গৌরাঙ্গ থাকলেও বেশী রাত্রে কলোনিতে ফেরা ঠিক নয়। শমিত জিজ্ঞাসা করেছিল দীপাকে পৌঁছে দিতে হবে কিনা। দীপা মাথা নেড়ে বলেছিল 'তিনজন একসঙ্গে আছি।'

'কাল সন্ধ্যে ছটায় রিহার্সাল।'

'আবার কাল ?'

'বাঃ। একদিন শো করেই হয়ে যাবে ?'

'কিন্তু আমি এই তিনটে শো-এর পর আর করব না।

'কেন ? একথার মানে কি ?' শমিত হকচকিয়ে গেল।

'আমার ক্ষতি হচ্ছে। এখন না হয় কলেজ ছুটি। খোলা থাকলে সকালে বেরিয়ে রাত দশটায় বাড়ি ফিরলে পড়ব কখন ? আমি তো কলকাতায় পড়তে এসেছি।'

'কেন যে চুল বাঁধে সে রাঁধে না ? মায়া পড়াশুনা আর নাটক একসঙ্গে করছে না ?' শমিত বিড়বিড় করল, 'ঠিক আছে, এ নিয়ে পরে কথা হবে।'

কলোনিতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। গৌরাঙ্গ বাস স্ট্যান্ড থেকে সরে গিয়েছে। দীপার বেশ মজা লাগছিল। নাটক দেখতে বসে ওদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জানা নেই কিন্তু এই যাওয়া আসার পথে দুজন যেন কেউ কাউকে চেনে না এমন ভান করে বসেছিল। এমন কি বাস থেকে নেমেও গৌরাঙ্গ শুধু একবার 'চলি' ছাড়া কিছু বলেনি। দীপা আগে বলে এই আড়ষ্টতা কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। বাস স্ট্যান্ড থেকে কয়েক পা এগোতে না এগোতে একটা মাতালের দেখা পেয়েছিল ওরা। ভয় পেয়েছিল দুজনেই। পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছোট রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাতালটা বকর বকর করছিল। ওদের দেখতে পেয়ে বলে উঠল, 'আসুন আসুন মা লক্ষ্মীরা, কি সৌভাগ্য, মধ্যরাত্রে লক্ষ্মীর আগমন।'

রাধা দীপার দিকে তাকাল। দীপা বিরক্ত হয়ে বলল, 'সরে যান সামনে থেকে।'

'সরেই তো আছি। বউ ভেগেছে বন্ধুর সঙ্গে, আমি সরে ছিলাম। এই দেখুন সরে যাচ্ছি। এক দুই তিন।' সরতে সরতে একেবারে নর্দমায় গিয়ে দাঁড়াল লোকটা 'দেখুন যমুনায় চলে এলাম। রাস্তাটাকে নিয়ে আপনারা চলে যান।'

জোরে পা চালিয়েছিল ওরা। পাড়া নিঝুম। বাড়ির সামনে পৌঁছে রাধা বলল, 'আজ খুব বকুনি খাব। দরজা না খোলা পর্যন্ত তুমি একটু দাঁড়াবে ?'

দীপার খুব খিদে পাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে চিনচিন ব্যথা পেটে ছড়িয়ে পড়ছিল। তবু সে দাঁড়াল। উঠোনে ঢুকতেই ওর মায়ের গলা পাওয়া গেল, 'এইযে, আইছে', এক তুর দাদারে নিয়ে আমি পাগল, রাইত দুপুর না হইলে সে ঘরে ফেরে না দোকান বন্ধ কইরা, তার উপর তুই আইলি এখন। ভাবছিস কি ? আমি মইর‍্যা না যাইতেই এই অবস্থা ? কুথায় ছিলি, ক আমারে ?'

'দীপার সঙ্গে নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। শ্যামবাজার।'

'সেখানেই থাকলে পারতিস তো। মাইয়া মানুষ রাত দুপুরে ঘরে ফেরে, পাঁচজনে এখন মুখ বন্ধ কইর‍্যা থাকব, না ?'

দীপা আর দাঁড়াল না। নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গা ছমছম করছে। রাস্তা থেকে নেমে বাড়ির ভেতরে ঢুকে দেখল সব অন্ধকার। বাড়িওয়ালাদের কেউ জেগে নেই। তার

বারান্দার ওপর একটা সাদা বেড়াল বসে আছে। তাকে এগোতে দেখে সে ম্যাও বলে ডেকে সামান্য সরে বসল। তালা খুলে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল দীপা। বাইরের পোশাকেই বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল কিছুক্ষণ। খিদে, পেটের ব্যথা, ক্লান্তি ছাপিয়ে আর একধরনের কষ্ট যেন ডালপালা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এই ঘরে, ওই রাস্তায় শুধু নয় সমস্ত পৃথিবীতে সে একা, একদম একা। রাত করে বাড়িতে ফিরলেও কেউ দুটো কথা শোনাবার নেই। শাসন শুনতে যতই খারাপ লাগুক যে মানুষের জীবনে শাসন করার মানুষ না থাকে তার মত অভাগা আর কে আছে!

সকালবেলায় ঘুম ভাঙল বেশ দেরি করে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে দীপা আবিষ্কার করল কাল যে অবস্থায় ঘরে ঢুকে খাটে শুয়েছিল সেই অবস্থায় রয়েছে এখনও। কাপড় ছাড়া খাওয়া দাওয়া কোন কিছুই হয়নি কাল। ছোট আয়নায় মুখ দেখল সে। কুৎসিৎ দেখাচ্ছে বলে মনে হল। কাল রাতের মেকআপের অবশিষ্টাংশ এখনও লেগে আছে নাকের পাশে, ওপর-কপালে। কেমন তেল চিটচিটে হয়ে আছে পুরো মুখ। বাসি মুখেই স্টোভ ধরিয়ে জল বসিয়ে দিয়ে গামছা নিয়ে দরজা খুলে সে কলতলায় গেল। দরজা খুলে যাওয়া নিয়ে এখানে কোন সমস্যা হয়নি এখন পর্যন্ত। পরিষ্কার হতে গিয়ে হঠাৎ একধরনের স্বস্তি পেল দীপা। কাল রাত্রে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তার একটা লাভ হয়েছে। গরম তেমন নেই এখন। তরকারি ভাত নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। এখনই একটু গরম করে রাখলে দুপুরে দিব্যি চলে যাবে। অন্তত আজকের সকালে রান্না করার ঝামেলা রইল না। ভাবতেই বেশ আরাম লাগছে।

চা খাওয়া শেষ হবার পর বই নিয়ে বসেছিল। পাতায় চোখ রাখতে না রাখতেই বারান্দায় কেউ গলা খাঁকারি দিল। সে উঠে বসল, 'কে?'

'আমি।' বাড়িওয়ালার গলা।

দীপা ঠোঁট কামড়ালো। তারপর উঠে ভেজানো দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। বাড়িওয়ালার মুখে হাসি, 'কাল আর পারলাম না। ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। কখন ফিরলা তোমরা?'

'একটু রাত হয়ে গিয়েছিল।'

'এত রাতে আসা যাওয়া ঠিক না।কার কি মতলব জানো না তো। এখন তোমাদের উঠতি বয়স, ভরা যৌবন, এখনই তো বাঁধ দেওয়া দরকার। বুঝলা?

মাথা নাড়ল দীপা, না।

'আরে এখন একটু নিয়মকানুন মানা দরকার। মাইয়া মানুষ মাইয়া মানুষের মত থাকলে কোন বিপদ হয় না। অত্যন্ত চিন্তায় ফেলছিলা আমারে।'

'আমি চেষ্টা করব যাতে এত দেরি না হয়।'

'বাঃ, গুড। এই দ্যাখো, যে জন্যে আইছিলাম, নাও, চিঠি আইছে।' হাত বাড়িয়ে একটা খাম দিলেন বাড়িওয়ালা। দিয়ে ফিরে গেলেন।

এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম চিঠি এল। খামের মুখ খুলতে খুলতে মনোরমার মুখ মনে পড়ল তার। কিন্তু চিঠির তলায় চোখ রেখে সে অবাক। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে 'অঞ্জলি'।

এই প্রথম, কলকাতায় আসার পর এই প্রথম মায়ের চিঠি এল। মা! অঞ্জলি মা শব্দটি লিখতে পারেনি। দীপা চিঠির গোড়ায় চোখ রাখল। 'স্নেহের দীপা। আশাকরি কলিকাতায়

তোমার মন বসিয়া গিয়াছে। আগে এক পত্রে জানিয়াছিলাম যে তুমি হোস্টেল ছাড়িয়া বাসা ভাড়া করিয়া আছ। ভাল। তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারলে তাঁহার আত্মা সুখী হইবেন। আমাদের পছন্দ অপছন্দের কথা আজ নতুন করিয়া কিছু বলার নাই।

যাহোক, তোমাকে একটি দুঃসংবাদ দিবার জন্য এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইতেছি। ইচ্ছা ছিল তোমাকে বিরক্ত করিব না কিন্তু তোমার ঠাকুমা প্রতিনিয়ত তোমাকে খবর পাঠাইতে বলিতেছেন। দিন চারেক আগে আমাদের নতুন বাড়ির উঠানে পা পিছলাইয়া তিনি পড়িয়া যান। তাঁহাকে কেউ উঠোন নিকাইতে বলে নাই তবু তিনি ওই কাজ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া আমি ডাক্তার ডাকিতে বাধ্য হই। ডাক্তার আসিয়া বলিল সম্ভবত তাঁহার পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহার ছবি তুলিতে হইবে। এইস্থানে ছবি তুলিবার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং জলপাইগুড়িতে লইয়া যাইতে হইবে। প্রয়োজনে অপারেশন করিতেও হইতে পারে। তাঁহাকে জলপাইগুড়ি শহরে লইয়া যাওয়ার জন্যে আলাদা গাড়ি ভাড়া করা প্রয়োজন। হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে যথেষ্ট অর্থ দরকার। আমার পক্ষে এই ব্যয়ভার একা বহন করিবার শক্তি নাই। তোমার মামা এক পত্রে জানাইয়াছিল যে তুমি নাকি ছাত্রী পড়াইয়া রোজগার করিতেছ। তোমার মৃত শ্বশুরমহাশয়ের অর্থ নিশ্চয়ই সঞ্চয়ে আছে। এই ঠাকুরমার সহিত তোমার খুব ভাব ছিল। তাই লিখি, যদি সম্ভব হয় অন্তত তিন শ' টাকা অবিলম্বে পাঠাইয়া দিলে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত হয়। এখন তোমার বিবেক যাহা বলে তাহাই করিও। ইতি আশীর্বাদিকা, অঞ্জলি।'

নাতিদীর্ঘ চিঠিটি পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দীপা। তারপর চিঠির তারিখ দেখল। তিনদিন আগে লেখা। তার মানে মনোরমা অসুস্থ হয়েছেন দিন সাতেক আগে এবং এই সাতদিন তেমন কোন চিকিৎসা হয়নি।

কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না দীপা। ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই টিকিট কেটে চা-বাগানে চলে যেতে। মনোরমার এমন কিছু হলে অমরনাথ স্থির থাকতে পারতেন না। কিন্তু অঞ্জলি একবারও তাকে চলে আসার কথা লেখেননি। তার কাছে কত টাকা আছে এবং তাতে কতদিন চলতে পারে এ ধারণাও নিশ্চয়ই ওঁর আছে। তা সত্ত্বেও তিনি টাকা চাইতে দ্বিধা করেননি। মামা এর মধ্যে কবে হোস্টেলে এসেছেন, কার কাছ থেকে টিউশনির খবর পেয়েছেন তা ঈশ্বর জানেন। সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো চা-বাগানে জানিয়ে দিতে ইতস্তত করেননি। পড়াশুনা মাথায় উঠল। টাকা পয়সা, মানুষের ব্যবহার ইত্যাদি ছাপিয়ে মনোরমার মুখ মনে পড়ছিল বারেবারে। তার জীবনে অনেক অসঙ্গতি এসেছে হয়তো এই ভদ্রমহিলার জন্যে। বিয়েটাই তো মনোরমা না থাকলে শেষ পর্যন্ত হত কিনা সন্দেহ। বিধবা হবার পর তিনিই বাধ্য করেছিলেন ওইসব নিয়মকানুন মেনে চলতে। বাঙালির যা কিছু অন্ধত্ব তাই নিয়ে বাস করেন ওই প্রায়-বৃদ্ধা মহিলা। এ-সবই সত্যি। কিন্তু দিনের পর দিন বছরের পর বছর একসঙ্গে থেকে, প্রায় প্রতিটি রাত শরীরের একই গন্ধ পেয়ে পেয়ে যে সম্পর্ক ভেতরে ভেতরে তৈরী হয়ে গিয়েছিল তাকে অস্বীকার করবে সে কি করে? অন্তত এই মুহূর্তে পৃথিবীতে একটি মানুষের কাছে তার চাহিদা আছে। একটি মানুষ বিপদে পড়লে তার কথা ভাবে। আজকেই তার চলে যাওয়া উচিত।

তারপরেই মনে পড়ল শমিতের কথা, নাটকের কথা। সে কথা দিয়েছে অন্তত তিনটে শো সে করে দেবে। গতকাল দলের ছেলেদের মুখে সে যে হাসি, কাজে যে উৎসাহ দেখেছে তা এক দমকায় নিবে যাবে এই সিদ্ধান্তে। চা-বাগানে গিয়ে ওই প্রতিকূল পরিবেশে সে বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মনোরমাকে ওই বাড়িতেই থাকতে হবে। অথচ চলে

গেলে এখানে কথার খেলাপ করতে হবে। কথা দিয়ে কথা না রাখা মানুষই প্রকৃত চরিত্রহীন।

তিন শ' নয়, পাঁ শো' টাকা মনিঅর্ডার করল দীপা মনোরমার নামে। ফর্মের নিচে সে কোন শব্দ লিখল না।

॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয় অভিনয় হয়ে যাওয়ার পরে তিনদিন রিহার্সালে যায়নি দীপা।

তিনদিন আগে এক দুপুরে রাধার দাদা আর মা তার কাছে এসেছিলেন। তখন সবে স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছিল সে। আগের রাতেই দ্বিতীয় অভিনয় হয়েছে ঢাকুরিয়ায়। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরতে মোটেই রাত হয়নি। কিন্তু একটা কাণ্ড হয়েছে শো-এর পরে। কার্টেন কল-এর পরে সে যখন গ্রীনরুমে যাচ্ছিল পোশাক বদলাতে তখন একটি ছেলে এসে বলল, 'আপনাকে একজন ডাকছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'কে?' দীপা জিজ্ঞাসা করল।

'নাম জিজ্ঞাসা করিনি।'

সুদীপ যাচ্ছিল পাশ দিয়ে, শুনতে পেয়ে বলল, 'নাম জিজ্ঞাসা না করে ডাকতে এসেছ কেন? তোমাদের তো বলা হয়েছে উটকো লোক যেন শো-এর পরে ভিড় না করে। চল, আমি দেখছি।' সুদীপ ছেলেটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে স্বস্তি পেয়েছিল দীপা। তখন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কথা বলার ইচ্ছেও ছিল না। গ্রীনরুমের মুখে শমিতের সঙ্গে দেখা, 'আজ তিনটি জায়গায় একটু ঝুলেছে। কাল রিহার্সালে এলে বলব।'

'খুব খারাপ হয়েছে?'

'খারাপ বলিনি। প্রথম রাতে যে হাইটে উঠেছিল তা থেকে নেমেছে। অবশ্য এটাই নিয়ম। সেকেন্ড শো-এ সবসময় এইরকম হয়। যদিও হবার কোন কারণ নেই। যাও, চেঞ্জ করে নাও, বেশী রাত করো না।' শমিত কথাগুলো যখন বলছিল তখনই সুদীপ ফিরে এল, 'যে ভদ্রলোক দেখা করতে চান তিনি বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক সুবিনয় সেনের সহকারী। ওঁরা আগামী ছবির নায়িকা খুঁজছেন। আপনার অভিনয় দেখে খুব ভাল লেগেছে তাই কথা বলতে চান।'

শমিত বলল, 'সুবিনয় সেন?'

'না, ওঁর সহকারী।' সুদীপ জানাল।

শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি দেখা করার আগ্রহ আছে?'

'দীপা মাথা নাড়ল, না। শমিত আর দাঁড়াল না। সুদীপ বলল, 'তাহলে কি বলব? আপনার অসুবিধে আছে?'

'না। বলুন ইচ্ছে নেই।' দীপা গ্রীনরুমে ঢুকে গিয়েছিল।

সকাল থেকেই এই ব্যাপারটা মাথায় পাক খাচ্ছিল। দলের অনেকেই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করেছে। সুবিনয় সেন খুব নামকরা চিত্র-পরিচালক। তাঁর সব ছবিই দর্শকদের ভাল লাগে। এরকম একজনের কাছ থেকে অফার পেয়েও কথা বলতে না যাওয়া মানে বিরাট সংযমের পরিচয়। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গিয়েছে অনেকেই নাটক করতে এত ভালবাসেন যে সিনেমার যান্ত্রিকতায় পা বাড়ান না। এসবই তার ক্ষেত্রে প্রশংসা হয়ে আসছিল কিন্তু তখন তার মন ছিল না এতে। আজ সকালে মনে হল ওরা ওকে অযথা বড়

করেছে। নাটক করার আগ্রহ তার কখনও ছিল না। দু'টো শো কোনমতে করে ফেলেছে। এর মধ্যে একদিন কৌতূহলী হয়ে লাইব্রেরি থেকে অভিনয়ের ওপর লেখা একটা বই নিয়েছিল সে। খানিকটা পড়ে মনে হয়েছিল সে কিছু না জেনেই স্টেজে নেমেছিল। 'যেন আন্দাজে মশলা দিয়ে হঠাৎ রান্না করতে গিয়ে মোটামুটি সুস্বাদু করে ফেলার মত ব্যাপার। ব্যাপারটা সুদীপকে বলেছিল। সে লক্ষ করেছিল সুদীপের সঙ্গে সহজ গলায় কথা বলা যায়। হোঁচট খেতে হয় না। কিন্তু শমিতের কথাবার্তায় কেমন যেন খোঁচা থাকে, মন খুলে কথা বলতে অসুবিধে হয়।

সুদীপ বলেছিল, 'অভিনয়রীতি, প্রযোজনা, সেট, আলো নিয়ে অনেক বই বেরিয়েছে আজকাল। বিখ্যাত সব পরিচালকের অভিজ্ঞতা সেইসব বই-এর মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি। ঠিক কথা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোনটে বেশী কাজে লাগে? বই-এর শিক্ষা না জীবন থেকে নেওয়া অভিজ্ঞতা? আমার তো মনে হয় দ্বিতীয়টাই জরুরি।'

এই সময় শমিত ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'দু'টোই।'

অতএব তর্ক উঠল। সুদীপ বলেছিল, 'গিরিশ ঘোষ কোন বই পড়ে অভিনয় করেছিলেন? দানীবাবু? এঁদের অভিনয় দেখতে হাজার হাজার মানুষ ছুটে যেত।'

শমিত হেসেছিল, 'তুমি আমি যাইনি। কারণ যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু গিরিশ ঘোষের নাটক পড়। আজ যদি অভিনয় করতে হয় ওই নাটকগুলো তাহলে অনেক ঝাড়াই বাছাই করতে হবে। যেটি নির্বাচিত হবে তার ওপর অনেক কলম চালাতে হবে। কারণ পাতায় পাতায় আবেগের বন্যা বইছে, যুক্তি চাপা পড়ে গিয়েছে। তাঁর অভিনয় দেখার সুযোগ পাইনি কিন্তু লেখা পড়ে মনে হয় অভিনয়ের সময় আবেগ খুব বড় জায়গা নিত। আর কে না জানে একজন অভিনেতাকে আজকাল শুধু আবেগসর্বস্ব বলে ভাবতে পারি না। তাকে সংযত এবং বিশ্লেষণধর্মী হতে হবে। এর জন্যে শিক্ষা দরকার। প্রকৃত অভিনেতাকে অনুশীলন করতে হবে নিয়মিত, পড়াশুনা করে নিজেকে শিক্ষিত করতে হবে আর সেই সঙ্গে আশেপাশের মানুষ এবং তাদের আচরণকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যে অভ্যেস একজন স্কুল শিক্ষকের মধ্যে দেখা যায় তা চায়ের দোকানের বয়ের থাকতে পারে না। আবার এক চায়ের দোকানের বয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে যদি তুমি সেইরকম একটি বাস্তব চরিত্রকে নকল কর তাহলে হাস্যকর হয়ে যেতে পারে যদি না শিক্ষালব্ধ ভাবনা প্রয়োগ করে তার কোনটা নেবে কোনটা বাদ দেবে স্থির করতে না পারো।'

শমিত কথা শুরু করলেই সব তর্ক একসময় থেমে যায়। সেদিনও গিয়েছিল। কিন্তু দীপার ধারণা বদ্ধমূল হল সে অশিক্ষিত অভিনয় করছে। মায়ার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছিল একদিন। মায়া বলেছিল, 'দুর! অত সময় কোথায় কলেজের পড়া, রিহার্সাল, ইউনিয়ন করার পর আলাদা করে নাটকের ওপর পড়াশুনা করার? শমিত যা দেখিয়ে দেয় তাই করি। ও আমার থেকে অনেক ভাল বোঝে।'

হ্যাঁ, শমিত বোঝে। নাটক নিয়ে দিনরাত পড়ে আছে সে। কিন্তু একেবারে অন্ধের মত অনুকরণ করার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না দীপা। তাই মনে হচ্ছে এইভাবে অভিনয় করাটা ঠিক হচ্ছে না। দ্বিতীয় শো-এর পরে এইটে বেশী করে মনে হচ্ছে। আর কাল রাত্রে সুবিনয় সেনের সহকারী যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন সেটা ভাবতেই একটা অস্বস্তি প্রবল হচ্ছিল। সিনেমায় অভিনয় করতে যাওয়া মানে অভিনয়কেই প্রফেসন হিসেবে নেওয়া। তার দ্বারা সম্ভবত নয়। এসব সত্ত্বেও মনের মধ্যে একটা গুনগুনানি তৈরি হয়েছিল। মনে পড়েছিল অনেককাল আগে এক কাকভোরে শেফালি তুলতে গিয়ে মালবাবুর বাড়িতে আসা এক

তরুণ তার দিকে তাকিয়ে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। সেদিন সুচিত্রা সেনের কোন ছবি সে দেখেনি। কিন্তু কলকাতা শহরে এখন উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন যেভাবে রাজত্ব করছেন তা এড়িয়ে বাস করা মুশকিল। নিজের চেহারার সঙ্গে ভদ্রমহিলার কোন বাহ্যিক মিল নেই। তবু ছেলেটি বলেছিল কেন ? আজ সিনেমার পরিচালক খোঁজ নিতে আসায় সেই সকালটা যেন নতুন করে ফিরে এল। ফলে খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল দীপার।

চুল আঁচড়ানো শেষ হতেই বারান্দায় শব্দ হয়েছিল। মনে হয়েছিল রাধা এসেছে। গতকাল থেকে ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলেই সে অবাক হল। এখানে আসার পর মাসিমা একদিনও এ-বাড়িতে আসেননি। চোখাচোখি হতেই ভদ্রমহিলা কেমন যেন হয়ে গেলেন। দীপা বলল, 'আরে, কি আশ্চর্য ! আপনি এখানে ? আসুন, আসুন।' হাত ধরে সে ঘরে নিয়ে আসতে আসতে পেছন ফিরে রাধার দাদাকে বলল, 'আসুন।'

বিছানায় বসিয়ে একমাত্র চেয়ারটি রাধার দাদার দিকে এগিয়ে দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল আছেন আপনি ?'

'আর কি করে ভাল থাকব মা ! কপাল তো একবার পুইড়াই ক্ষান্ত হয় না, বারে বারে পোড়ে। কত পাপ যে করছিলাম তার শাস্তি পাইতেছি এখন।' বলতে বলতে ভদ্রমহিলা ডুকরে কেঁদে উঠে আঁচলে চোখ ঢাকলেন।

রাধার দাদা চাপা গলায় বলল, 'মা, শান্ত হও।'

'আর আমারে শান্ত হইয়া থাকতে কইস না তোরা। শান্ত হইয়া করুমটা কি ? ভগবান আমার কথা শুনব ? শুনব না।' তার কান্না থামছিল না।

হকচকিয়ে গিয়েছিল দীপা। নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে মাসিমা ?'

'কি হয় নাই তাই কও। তুমি তো সব জানো, জানো না ?'

'আমি বুঝতে পারছি না মাসিমা।'

এবার রাধার দাদা বলল, 'মা, তুমি আমাকে কথা বলতে দাও।'

'বল। যত ইচ্ছা বল। আমি আর পারি না !' ভদ্রমহিলা নিঃশ্বাস ফেললেন শব্দ করে। দীপা কোন কূলকিনারা ভেবে পাচ্ছিল না।

রাধার দাদা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাকে রাধা কিছু বলেছে ?'

'কি ব্যাপারে বলুন !'

'গৌরাঙ্গ নামের একটি ছেলেকে নিয়ে কোন কথা ?'

দীপা শক্ত হল। তাহলে ঘটনা এই। তাহলে তার উচিত সত্যি কথা বলা। যা সত্যি তাই বললে রাধার উপকারই হবে। সে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল, 'হ্যাঁ।'

'কি বিপদ বলুন তো ! আমি সারাদিন ব্যবসা নিয়ে থাকি, কিছুই দেখতে পারি না সংসারের আর এই ফাঁকে ও এমন একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসল !'

'কি কাণ্ড। রাধার মত মেয়ে কোন অন্যায় করতে পারে না।'

'আমিও তাই ভাবতাম !'

'আমি জানি না কাউকে ভালবাসা আপনাদের চোখে অন্যায় কিনা।'

রাধার মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে রাধার দাদা বলল, 'এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে যেদিন রাধা নাটক দেখতে গিয়েছিল সেদিন গৌরাঙ্গ সঙ্গে ছিল ?'

বিপদ কোন দিক দিয়ে আসবে ঠাওর করতে পারছিল না দীপা, তবু সে সত্যি কথাটাই বলল, 'হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে বাসস্ট্যান্ডে দেখা হয়ে গিয়েছিল।'

'না, ওটা হঠাৎ দেখা হওয়া নয়।'

'আমি জানি না। কিন্তু কি হয়েছে বলবেন তো?'

'আপনার এই ঘরে কখনও গৌরাঙ্গ এসে রাধার সঙ্গে দেখা করেছে?'

'আমার এখানে? না। কক্ষনো নয়।'

রাধার মা অবাক হয়ে তাকালেন ছেলের দিকে। তারপর বললেন, 'তুমি সত্য কথা বল মা।'

'বিশ্বাস করুন, এখানে গৌরাঙ্গবাবু কখনও আসেননি। আমি শুনেছিলাম জাত নিয়ে আপনাদের আপত্তি আছে। কিন্তু ওকে পড়াশুনা করার সুযোগ দিয়েছেন, নিজেরটা বুঝতে পারে ও। তখন—।'

'নিজেরটা যদি বুঝতে পারত তাহলে কোন কথাই উঠত না। পাকিস্তান থেকে যখন এসেছিলাম তখন সব ছেড়ে আসতে হয়েছিল। এ দেশে এ অবস্থায় থেকে জাত নিয়ে ক'দিন পড়ে থাকতে পারতাম?'

রাধার মা বললেন, 'ওরে সব কথা বল, সব কথা খুইল্যা বল, ও যদি বন্ধুরে বুঝাইতে পারে, আমি তো আর কোন পথ দেখি না।'

রাধার দাদা অন্যদিকে মুখ ফেরালো, 'রাধার বিয়ের জন্যে মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ছেলে দেখা হচ্ছিল। কিন্তু কাল দুপুরে রাধা স্পষ্ট বলে দিল সে গৌরাঙ্গ ছাড়া অন্য ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না। মা মেনে নেয়নি। চিৎকার, বকাঝকা চলছিল। দুপুরে খেতে এসে আমি সব শুনে মাকে বোঝালাম অনেক করে। তার মেয়ে যদি এই করে শান্তি পায়, পাক। নিজের ভবিষ্যৎ নিজে বুঝে নিতে চাইছে যখন তখন তাই নিক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন গৌরাঙ্গরা থাকে বাসস্ট্যান্ডের ও-পাড়ায়। খেয়ে দেয়ে দোকানে যাচ্ছি এমন সময় গৌরাঙ্গর বাবার সঙ্গে দেখা। দু-একটা কথার পর ওঁকে বললাম যে সামনের রবিবার ওঁদের বাড়িতে আমি যাব। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন বললাম, মনে হয় আপনার ছেলের সঙ্গে আমার বোনের ভাব হয়েছে। দু'জনেই যখন প্রাপ্তবয়স্ক তখন বিয়েটা দেওয়া দরকার।'

'তারপর?' দীপার মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক বেশ আধুনিক। উদার।

'উনি কথাটা শুনে খুব খেপে গেলেন। বললেন, এদেশে এসে আমরা অধঃপতনে গিয়েছি। ছেলে ধরার জন্যে মেয়েকে লেলিয়ে দিচ্ছি, এইসব। আমারও রাগ হয়ে গেল। দু-একটা কথা শুনিয়ে দিলাম। জাতটাতের কথাও এসে পড়ল। উনি বললেন জাত ধুয়ে জল খেতে। জাত-ফাত ছিল পূর্ববঙ্গে। এখানে শুধু টাকা দিয়ে পরিচয় হয়। তার ছেলের জন্যে যেসব সম্বন্ধ আসছে তারা এত দেবে অত দেবে। ওই টাকা পেলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন। আর কথা না বাড়িয়ে আমি দোকানে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাজে মন দিতে পারছিলাম না। বোনটার জন্যে খুব কষ্ট হচ্ছিল। তাই সন্ধের পরে দোকান বন্ধ করে আবার ওঁর সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। তিনি স্পষ্ট বলে দিলেন কুড়ি ভরি সোনা, বিশ হাজার টাকা নগদ না পেলে ছেলের বিয়ে আমার বোনের সঙ্গে দেবেন না। অনেক অনুরোধেও নরম হলেন না। আমি তখন গৌরাঙ্গর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। সে এল। সব শুনে বলল, তার বাবা যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। রাধার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাত্র, তার বেশী কোন ঘনিষ্ঠতা নেই। শুনে আমি হতভম্ব।'

'তারপর?' দীপার গলার স্বর পাল্টে গেল। সমস্ত শরীর রাগে জ্বলতে শুরু করেছে এর

মধ্যে। রাধার দাদা বলল, 'ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গেলে কিছু বলার ছিল না। বাড়িতে ফিরে এসে সেই যে রাধা ঘরে ঢুকে দরজা দিয়েছে তা এখন পর্যন্ত খোলেনি। কি করব ভাবতে পারছি না!'

'সে কি! কাল থেকে খাওয়া দাওয়া করেনি?'

'না। অনেক ডাকাডাকি হয়েছে সাড়া দিচ্ছে না। একটু একটু করে পাড়ার লোক এই নিয়ে ফিসফিসানি শুরু করেছে। তাই মাকে বললাম আপনার কাছে আসতে। আপনি যদি এই ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'ও হো, আমাকে খবর দিলেই আমি চলে যেতাম। চলুন এখনই।'

'আপনার খাওয়া দাওয়া হয়েছে?'

'ছেড়ে দিন তো! আগে দেখি রাধা কি করছে?'

রাধার মা বললেন, 'সকাল থিকা তো বাসায় উনান ধরাই নাই। ভাত খাইয়া আইতে কমু তারও তো উপায় নাই।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না তো! আমার এখানে সব তৈরি আছে।'

রাধার দাদা বলল, 'আপনারা আসুন, আমি এগিয়ে যাচ্ছি।'

দীপা বুঝল একসঙ্গে রাস্তায় হাঁটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্যেই এই ব্যবস্থা। ভাল লাগল, অন্তত এই সময়ে পাড়ার লোকজনের কৌতূহল না বাড়াতে এটাই দরকার ছিল। মাসিমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজায় তালা দিয়ে কয়েক পা এগোতেই বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা। ভদ্রলোকে মুখ করুণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, 'কথাটা সত্যি নাকি?'

'কি কথা?' রাধার মা মুখ নামালেন।

'আপনার মাইয়ার নাকি অসুখ হইছে?'

রাধার মা কিছু বলার আগেই দীপা বলল, 'ঠিকই শুনেছেন। তবে খারাপ কিছু না, একটু জ্বর সর্দি এই আর কি। চলুন মাসিমা।'

জায়গাটা পেরিয়ে এসেই ভদ্রমহিলা কাতর গলায় বললেন, 'শোনলা তো? তুমি না কইলে কি জবাব দিতাম কি জানি! এখন তো দেখা হইলেই সবাই এক কথা জিগাইবো। ভগবান! কেন মরণ হয় না!'

'আপনি মন শক্ত করুন মাসিমা। কে কি বলল তাতে একদম কান দেবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। রাধা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে না।'

উঠোনে ঢুকেই দীপা বুঝল বাড়িটা কাঁটা হয়ে আছে। এদের বাড়িতে আরও কিছু মহিলা এবং কাচ্চা বাচ্চা আছে। তাদের মুখ চেনা কিন্তু কথাবার্তা হয়নি। রাধা বলে মাঝে মাঝেই কিছু জ্ঞাতি ট্রানজিটে এখানে আসেন। এরাও উদ্বিগ্ন। দীপা মাসিমাকে ছেড়ে এগিয়ে গেল একটা বন্ধ দরজার দিকে। তারপর সেখানে মৃদু শব্দ করে ডাকল, 'রাধা, আমি দীপা, দরজা খোল, তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

দীপা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল এ বাড়ির সবাই খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে।

মিনিট খানেক গেল। এর মধ্যে দীপা আর একবার ডেকেছে। তার ধারণা হল রাধা দরজা খুলবে না। কী করবে মাথায় আসছিল না। মরিয়া হয়ে তৃতীয়বার ডাকতে যাওয়ার সময় দরজা খুলল। অল্প। দীপা চট করে ঘরে ঢুকে আবার দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। একটা তক্তাপোশ ঘর ভর্তি জিনিস। দরজা খুলে দিয়েই রাধা আবার সেই তক্তাপোশে

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে কাছে গিয়ে রাধার পিঠে হাত রেখে দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এমন করছ কেন ? সত্যি বল তো, তুমি কি চাও ?'

'মরতে।' শুকনো গলা, অনেক কান্নার পরে শুকিয়ে যাওয়া গলা।

'ওঠ তো, উঠে বসো।'

রাধা নড়ল না। একই ভঙ্গীতে পড়ে রইল। দীপা বলল, 'তুমি ওঠ, রাধা।'

এবার একটু সময় নিয়ে ধীরে উঠে বসল সে। দীপা ওর মুখ দেখে চমকে উঠল। বারো তেরো ঘণ্টাতেই এমন শুকিয়ে যায় কেউ ? সে পাশে বসে দু'হাতে ওর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'তুমি এত বোকা, ছি ! আমি ভাবতে পারিনি। আমি তোমাকে আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের থেকে আলাদা বলে জানতাম। এমন করছ কেন ?'

ঠোঁট কামড়ালো রাধা। তার ডান চোখ দিয়ে একটা জলের ধারা গড়িয়ে এল।

'তোমার বন্ধুত্ব গৌরাঙ্গবাবু অস্বীকার করছে। লোকটার মেরুদণ্ড নেই যে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সত্যি কথা বলবে। এমন একটা লোকের জন্যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ ?'

রাধা জবাব দিল না মুখে, তার মাথা দু'বার নড়ে উঠল।

'গৌরাঙ্গ তোমার যোগ্য নয়। তার জন্যে কেন চোখের জল ফেলবে ?'

'আমি, আমি ওকে ভালবাসি !' খুব নিচু, কান্না মেশানো শব্দগুলো, রাধার গলা থেকে বেরিয়ে এল।

দীপা বলল, 'কাকে ভালবাস ? একটি স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতককে ?'

রাধা উত্তর দিল না। দীপা সময় নিয়ে বলল, 'কিছু মনে করো না রাধা, ওর সঙ্গে মিশে, কথা বলে বুঝতে পারোনি ওর চরিত্র কি ! ও তোমাকে সত্যি ভালবাসে কিনা ! নিজের মন এভাবে মুক্ত করার আগে জানতে চাওনি ?'

'ভাবিনি। কথা কম বলা ওর অভ্যেস। আমি কি করব ?'

'যাক গে। যা হবার হয়েছে। এখন তো সব বুঝতে পারছ। কাল থেকে দরজা বন্ধ করে আছ। তুমি নিজে যেমন কষ্ট পাচ্ছ বাড়ির সবাইকে আরও উদ্বিগ্ন করে রেখেছ। মাসিমার কথা ভাব। ওঠ, বাথরুমে যাও।'

'না।'

'কেন ?'

'আমার মরে যাওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই দীপা।' হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রাধা। তারপরেই ঘরে দু'হাতে দীপাকে জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল দীপা। কাঁদতে কাঁদতে রাধা জড়ানো গলায় বলল, 'আমি মরে গেছি দীপা, আমি মরে গিয়েছি।'

'মরে গিয়েছ মানে ?'

'ও যদি আমাকে বিয়ে না করে তাহলে আর আমার বিয়ে হবে না।' এবার কথাগুলো এমন আর্তনাদ হয়ে বাজল যে কেঁপে উঠল দীপা। আমচকা সমস্ত শরীরে একটা শিহরন বয়ে গেল। এই শিহরন বরফের স্রোতের মত। তবু কোনমতে সে উচ্চারণ করল, 'কেন, কি হয়েছে ? এ কথা বলছ কেন ?'

'ওকে ছাড়া আমি কাউকে ছুঁতে পারব না।' কান্না আর থামছিল না।

দীপা পাথর হয়ে গেল। যৌবন শুরু হবার আগেই যে আতঙ্ক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র একটি রাত্রে তার মনে বপন করেছিলেন তা তো উপড়ে ফেলা হয়নি। শুধু সময়ের ধুলো জমেছে

পুরু হয়ে। তারপরে কেউ তাকে বলেনি নরনারীর শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে কোন কথা। কোন বইতেও বিশদ পড়ার অবকাশ হয়নি। কিন্তু শরীর এবং মনের বয়স বাড়ার সঙ্গে কখন কেমন করে এ বিষয়ে সচেতনতা এসে গিয়েছে তা সে জানে না। সেই বোধ থেকেই ওর মনে হল রাধা চূড়ান্ত সর্বনাশ করে বসে আছে। বিয়ের পর যেটা পাঁচজনের কাছে স্বাভাবিক, যা তার নিজের কাছে ভয়ঙ্কর, বিয়ের আগে তার অভিজ্ঞতা মানে অনেক বড় কিছু হারানো।

'কবে হয়েছে?' দীপা রাধার হাত ছাড়িয়ে তক্তাপোশের ওপর বসে পড়ল।

'তিনবার।'

'কিন্তু কবে?'

'শেষবার যেদিন তোমার নাটক দেখতে গিয়েছিলাম।'

দীপা হতভম্ব হয়ে গেল। নাটক দেখতে যাওয়া এবং আসার সময়ে সে ওদের সঙ্গে ছিল। শুধু সে ভেতরে চলে যাওয়ার পর ঘণ্টা চারেক ওরা আলাদা একসঙ্গে কাটিয়ে ছিল। তারমধ্যে— ? ওরা নিশ্চয়ই হল থেকে বেরিয়ে কোথাও গিয়েছিল। কিন্তু রাধা তো নাটকের ব্যাপারে বিস্তারিত বলেছে। গেলে জানবে কি করে?

'নাটক দ্যাখোনি তোমরা?'

'হুঁ। তার মধ্যেই, ওকে মানা করেছিলাম, শোনেনি।'

'কি বলছ তুমি? ও তোমাকে কি করেছে খুলে বল তো?'

'আমি বলতে পারব না।'

'আঃ, না বললে আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

একটু সময় নিল রাধা। তারপর বলল, 'আমার বুকে হাত দিয়েছিল। এর আগে দু'বার চুমু খেয়েছে। স্বামী ছাড়া কেউ এসব করে না। আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে তাই স্বামী বলে ভাবতে পারব না।'

কথা না বলে চুপচাপ রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল দীপা। এবং একই সঙ্গে সেই শীতল স্রোত যেন হুড়মুড়িয়ে নেমে গেল শরীর থেকে। তারপরেই হালকা গলায় বলল, 'উঃ, তুমি আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!'

'তার মানে?'

দীপা বলল, 'একসঙ্গে ক্লাস করেছি, কত কথা বলেছি তোমার সঙ্গে কিন্তু তুমি এত সেনসিটিভ কখনও ভাবিনি। ভেবে দ্যাখো, তুমি বোকামি করছ কিনা। এককালে কোন পুরুষ বাঙালি মেয়ের হাত ধরলে তার সতীত্ব যেত। আমি জানি না, তারও আগে অবিবাহিতা মেয়েকে কোন পুরুষ দেখে ফেললে তার বিয়ে হত কিনা! আজ থেকে একশ বছর আগে জন্মালে তুমি কোন ছেলের সঙ্গে করমর্দন করতে না। করলে এই অবস্থা হত।'

'যাঃ, এই দু'টো ব্যাপার এক হল?'

'না, এক নয়। কিন্তু একজনকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছিলে, সে তোমাকে আদর করেছিল, ওই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তোমার আদর বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখলে সেই লোকটা বিশ্বাসঘাতক। একমাত্র মনের ওপর আঘাত দেওয়া ছাড়া সে তোমার কি ক্ষতি করেছে? তুমি যেভাবে শুরু করেছিলে তাতে আমি ভয় পেয়েছিলাম নরনারীর সম্পর্কের চূড়ান্ত মিলন তোমাদের হয়ে গিয়েছে, তুমি ওর সন্তানের মা হতে যাচ্ছ। অদ্ভুত।' দীপা কথাগুলো বলে হেসে উঠল।

'যাঃ, অসভ্য।' রাধার মুখ লাল হয়ে গেল, 'আজেবাজে কথা বলছে।'

'ওঠ তো। যাও বাথরুম থেকে ঘুরে এসো। চেহারার কি হাল করেছ আয়নায় দেখলে বুঝতে পারবে। এই করেই বাঙালি মেয়েরা মরল।'

'কিন্তু আমি যে ওকে ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না।'

'কেন ? তোমার শরীরে হাত দিয়েছে বলে ?' আচমকা কঠোর হয়ে গেল দীপা।'

'না, মানে, সব মিলিয়ে—।'

'শোন রাধা, তুমি তৈরি হয়ে নাও। তারপর আমার সঙ্গে বের হবে।'

'কোথায় ?'

'তুমি গৌরাঙ্গর সঙ্গে কথা বলবে।'

'যদি দেখা না করতে চায় ?'

'করবে। তুমি যেটা দাদার মুখে শুনেছ সেটা সরাসরি জেনে এসো।'

রাধার মুখ উজ্জ্বল হল। দীপা ওকে ঘরের বাইরে নিয়ে আসতেই উদ্বিগ্ন মুখগুলো দেখতে পেল। রাধা বাথরুমে চলে যেতেই ওর মা ছুটে এলেন কাছে, 'কি বলল ?'

দীপা হাসল, 'ঠিক আছে, কোন ভয় নেই।'

'কোনরকম— ?' প্রৌঢ়া শব্দটি উচ্চারণ করতে যেন সাহস পাচ্ছিলেন না।

'না।' নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন ধারণা দীপার এর আগে হয়নি।

এই ব্যাপারটা নিয়ে দীপা পরে অনেক ভেবেছে। পনের থেকে একুশের মধ্যে বাঙালি মেয়েদের পঞ্চাশ শতাংশ অন্য ছেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মায়া বলেছিল বেশিরভাগ রক্ষণশীল বাড়ির মেয়েদের প্রেম-ধারণা তৈরি হয় তুতোদাদাদের মাধ্যমে। ওসব ক্ষেত্রে গুরুজনদের সন্দেহ চট করে আসে না। কিন্তু প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রে এইসব মেয়েরা যেরকম সিরিয়াস হয় তা বিচার করলে কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের তুলনায় ছেলেদের অধিকাংশ অনেক বাস্তব। ফলে সামান্য কারণে মেয়েরা যে আঘাত পায় তা তাদের অনেককেই চিরদিনের জন্যে নড়বড়ে করে দেয়। শরীরের পরিবর্তন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের হাওয়া বদলের এই ঝাপটা এড়াতে পারে না অনেকেই। চোরাগোপ্তা, লুকিয়ে চুরিয়ে ঘটনা ঘটানোর কারণে দুঃখটা বোধহয় বেশী করে বাজে। রাধাকে নিয়ে গৌরাঙ্গর কাছে গিয়েছিল সে। গৌরাঙ্গ মুখের ওপর অস্বীকার করতে পারেনি কিন্তু জানিয়েছিল ঠিক ওই মুহূর্তে বাবা মাকে অস্বীকার করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নির্জন মাঠে বসে রাধা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঁদেনি। উল্টে গালাগাল দিয়েছিল। সেটা মাথা নিচু করে হজম করেছিল গৌরাঙ্গ। ব্যাপারটা সেখানেই চুকে গেল। এই ঘটনাই অন্য চেহারা নিতে পারত যদি সেদিন দীপা না যেত। এখন রাধা স্বচ্ছন্দে উচ্চারণ করতে পারে, 'আমি কি বোকামি করেছিলাম, না।'

তৃতীয় শো হল দক্ষিণ কলকাতার একটি মঞ্চে। এটিও কল শো। এখন মায়া নিয়মিত রিহার্সালে আসছে যদিও তার শরীর পুরো সুস্থ হয়নি। তৃতীয় শো-এর পরে দীপা আর অভিনয় করবে না জেনে সে অনেক বুঝিয়েছে ওকে। কিন্তু দীপা বলেছে অভিনয় সে মোটেই করতে পারছে না। শুধু মুখস্থ করা সংলাপ আওড়ে যাচ্ছে। দক্ষতা না নিয়ে কোন কাজ করা উচিত না। তা ছাড়া অভিনয় করতে সে কলকাতায় আসেনি। মায়া যখন সুস্থ হয়ে উঠেছে তখন দলের সমস্যাও মিটে যাওয়া উচিত। সে শুধু শূন্যস্থান পূর্ণ করতে এসেছিল। রিহার্সালের দিন তবু ম্যানেজ করা যায় কিন্তু শো-এর রাতে বাড়ি ফিরতে খুব মুশকিল হয়। দীপা ঠিক করল এটাই তার শেষ অভিনয়। এসব কথা শমিত ভাল জানে।

কিন্তু ইদানীং এ নিয়ে কোন কথা বলেনি সে। কাজের কথা বলেছে নির্লিপ্তভাবে। রিহার্সালে কোন কিছু দেখানোর সময় অবহেলা করেনি এই ভেবে যে এটাই দীপার শেষ শো।

আজ রাধাকে নিয়েই গিয়েছিল দীপা। যেহেতু দক্ষিণ কলকাতায় মঞ্চ তাই রাধার দাদাকে অনুরোধ করেছিল শো-এর পরে সেখানে আসতে। নাটক দেখার সময় তার নেই, কিন্তু ওই সময় তার অসুবিধে হবে না। পাড়ায় কয়েকদিন হল বেশ গোলমাল হচ্ছে। জমি নিয়ে ঝগড়া অনেক দূরে পৌঁছেছে। রাত করে একা ফিরতে নিষেধ করেছিল অনেকেই।

রাধা দীপার সঙ্গে গ্রীনরুমেই বসেছিল। মায়া সাহায্য করছিল দীপাকে। আজ যেন অনেকেই খুব গম্ভীর হয়ে পড়েছে। এমন কি সুদীপ পর্যন্ত দেখা হলে ভাল করে কথা বলল না। ফার্স্ট বেল পড়ার পর দেবেশদা এসে দেখে গেল। 'ঠিক আছে' ছাড়া তৃতীয় শব্দ উচ্চারণ করেনি। মায়া কথা বলছিল সহজভাবে। দীপা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে সবার ?' ঠোঁট ওলটালো মায়া, 'কি জানি !'

আজ প্রথম থেকেই অভিনয় করতে ভাল লাগছিল। সংলাপ বলার সময় অথবা যেখানে কথা নেই সেখানেও সে ছিল অনবদ্য। শো-এর পরে সাজঘরে এলে মায়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে যখন তখন শমিত এল, 'দীপা, একটু বাইরে এস।'

অবাক হয়ে সাজঘরের দরজা পেরিয়ে এসে দীপা দেখল শমিতের পাশে দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। শমিত পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই হল দীপাবলী আর ইনি সুবিনয় সেন, বুঝতেই পারছ, আর উনি প্রযোজক।'

সুবিনয় সেন নমস্কার করে বললেন, 'আমার সহকারীর কাছে শুনেছিলাম আজ নিজের চোখে দেখে যাকে বলে মুগ্ধ তাই হয়ে গিয়েছি। অপূর্ব— । খুব ভাল লেগেছে ভাই। তুমি অনেক ছোট, তোমাকে তাই তুমি বলছি।'

'অনেক ধন্যবাদ।' দীপা নিচু গলায় বলল।

'আমি শুনেছি তুমি ফিল্মের অভিনয় করতে চাও না। কথাটা কি ঠিক ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন ?' সুবিনয় সেন বললেন, 'এ তো ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা। এর ব্যবহার না করার কোন কারণ আছে ? তোমার বাড়িতে আপত্তি আছে ?'

'এটা আমিই ঠিক করেছি।'

'কিন্তু কেন ?'

'এসব নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। আপনারা আমাকে প্রশংসা করছেন কিন্তু আমি জানি যদি কিছু করে থাকি সেটা এমনি হয়ে গিয়েছে, আমি জেনে-শুনে করিনি। এই ঘটনা বারে বারে ঘটে না।'

'ঠিক আছে, তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি জানি না তুমি আমার কোনো ছবি দেখেছ কিনা। আমি তোমাকে চরিত্রটি পড়ে শোনাবো। তারপরেও যদি না বলতে ইচ্ছে করে বলো।'

'আমি আপনাকে কথা দিতে পারছি না। তবে এত করে বলছেন যখন তখন আমি ভেবে দেখব।'

কলোনি থেকে কলেজ পাড়ায় যাতায়াতে প্রচুর সময় যাচ্ছিল। তার ওপর বৃষ্টি হলে কথাই নেই। আজকাল ঘরে ফিরে এত কাহিল লাগে যে তারপর আর বই নিয়ে বসতে ইচ্ছে করে না। পড়াশুনায় অবহেলা এসেই যাচ্ছে এই কারণে। কি করবে বুঝতে পারছিল না দীপা। হোস্টেল খুলছে শিগগিরই। যদি সিট ছেড়ে দেয় তবে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতে হবে কর্তৃপক্ষকে। আজ লাইব্রেরি হয়ে লাবণ্যকে পড়াতে যাবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু সকালে উঠেই বেশ জ্বর জ্বর লাগল। সেইসঙ্গে গলায় ব্যথা। মুখটুখ ধোওয়ার পর নিজে যে চা বানাবে সেই ইচ্ছেটাও হল না। গায়ে চাদর টেনে চুপটি করে শুয়ে থাকতে বেশ আরাম লাগছিল। দীপা বুঝতে পারল আজ কোথাও বেরুতে পারবে না।

আধো ঘুম আধো জাগরণে সকাল কাটল। রাধা এলে ওকে না হয় কিছু ওষুধ নিয়ে আসার কথা বলা যেত। কিন্তু সেই ঘটনার পর জোর করে নিয়ে না গেলে মেয়েটা বড় একটা বাড়ি থেকে বের হয় না। সকালে মুখ ধুতে যাওয়ার সময় বাড়িওয়ালা তাকে দেখে তাঁর দৈনিক হাসিটি হেসে ফেলেছেন। অতএব তিনিও আর এদিকে আসবেন না। বেলা যত বাড়তে লাগল জ্বরও যেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে পড়েছিল দীপা। হঠাৎ মনে হল ব্যস্তসমস্ত হয়ে অমরনাথ ঘরে ঢুকলেন। খাটের পাশে বসে কপালে হাত রেখে চমকে উঠে বললেন, 'হাত পুড়ে যাচ্ছে যে। ওষুধ না খেয়ে শুয়ে আছিস? কি ভেবেছিস তুই? সবাইকে ছেড়ে একা একা থাকবি? আমাকে একটা খবর দেবারও প্রয়োজন মনে করিসনি?'

সেই গলায় এমন স্নেহ জড়ানো যে পাশ ফিরে কেঁদে উঠল দীপা। তার ঘুম ভাঙল এবং তখনই একটা মোটকা টিকটিকি দেওয়ালের গা ধরে টিকটিক করে উঠল। কান্নাটা থেমে গিয়েছিল আচমকা। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে। শূন্য ঘর। কেউ কোথাও নেই। ব্যাপারটা যে স্বপ্ন তা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। অমরনাথ যে আর কখনও আসতে পারে না এই বোধ-স্পষ্ট হওয়া মাত্র আর এক ধরনের যন্ত্রণা তাকে অধিকার করল। এই সময় টিকটিকিটা দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল।

কেউ নেই। এই বিশ্বচরাচরে সে একা। এই মুহূর্তে অসুস্থতা যদি আরও বেড়ে যায়, যদি সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে তাহলে কেউ তার কপালে হাত রাখবে না। এই চার দেওয়ালের মধ্যে মুখ গুজে পড়ে থাকা যে কি যন্ত্রণার তা সে টের পাচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। শরীর সুস্থ থাকলে তবু এই একাকিত্ব নস্যাৎ করা যায়। ইচ্ছে মত বাইরে বেরিয়ে পাঁচজনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফেরা যায়। তখন রাতটা কিভাবে কাটবে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। কিন্তু এখন? বাইরের লোক আর ঘরের লোকের প্রভেদ বড্ড স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিঃসঙ্গ এই চার দেওয়ালের মাঝখানে থেকে মনে হয় সে যেন একটা জেলখানায় রয়েছে যেখান থেকে কখনও মুক্তি পাবে না। ঈশ্বর মানুষকে চরম শাস্তি দেন যখন তিনি তাকে নিঃসঙ্গ করেন।

সারাদিন একইভাবে পড়েছিল। মাথায় যন্ত্রণা, গলায় ব্যথা আর সেইসঙ্গে ধূম জ্বর। কলোনিতে রাত্রে মশারি না টাঙিয়ে শোওয়া যায় না। আগের রাতের টাঙানো মশারি সকালে তোলার ইচ্ছে না হওয়ায় শাপে বর হল এখন। একটা সময় এল যখন জ্বর এবং কষ্টগুলো একটু একটু করে নেশার মত হয়ে গেল। আজ আর ওই শারীরিক কষ্টগুলো খুব বড় হয়ে উঠছিল না।

মধ্যরাত্রে একবার চোখ মেলল সে। ঘরে আলো জ্বলছে। কয়েকটি মুখ। একটা দুটো। এরা কারা ? চোখ বন্ধ করল সে। কপালে আরাম। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা স্পর্শ। কেউ একজন জিজ্ঞাসা করল, 'এই, দীপা, এখন কেমন লাগছে ?'

সে ঘাড় নাড়ল, ভাল। খুব ভাল আছে। কি আরাম। আবার যেন নরম তুষারে পা রাখা। ধীরে ধীরে তুষার খাদে তলিয়ে যাওয়া, মাথার ওপরে আশেপাশের সব তুষার জড়ো হয়ে আড়াল করে দিল পৃথিবীটাকে।

প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে কাটানোর পর যখন দীপা চোখ খুলল তখন সামনে একটি গম্ভীর মুখ দেখতে পেল। শোকসংবাদ পেয়ে যে মুখ নিয়ে মানুষ মৃতের বাড়িতে আসে অবিকল সেই মুখ। দীপা হেসে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ার গলা পেল, 'কিরে, কেমন আছিস ? এই দীপা ?'

দীপা মুখ ঘোরালো। এবার সে মায়াকে চিনতে পারল। মায়ার পাশে রাধা। ঘাড় নেড়ে বাচ্চা মেয়ের মত ভাল বলল নিঃশব্দে।

রাধা বলল, 'উঃ, যা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দাদা কাল রাত্রে ডাক্তার ডেকে এনেছেন। তিনি আজ সকালেও এসেছিলেন। বলেছিলেন যদি দুপুরের মধ্যে জ্ঞান না আসে তাহলে হাসপাতালে পাঠাবে।'

দীপার চিন্তাশক্তি কাজ করছিল না। মায়া এখানে কি করে এল তা সে ভাবতেই চাইল না। সে মুখ ফিরিয়ে সামনে বসা গম্ভীর লোকটিকে দেখল। ঝাপসা লাগছে মুখ। অমরনাথ ? না। এত শক্ত মুখ অমরনাথের না। এইসময় মুখটা কাছে এগিয়ে এল, 'ভয় নেই, আমরা এসে গিয়েছি। এখন তুমি ভাল হয়ে যাবে।'

গলাটা চিনতে সামান্য সময় লাগল। কিন্তু আর কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছিল না। মায়া দেখল ওর চোখ আবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধীরে ধীবে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

রাধার দাদা দাঁড়িয়েছিল দরজায়। এবার এগিয়ে এসে বলল, 'আমাব মনে হয় ওঁকে এখানে ফেলে না রেখে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।'

মায়া মাথা নাড়ল, 'না। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওকে আমাদেব বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই। মা আছেন, ভাল ডাক্তারও আছে পাড়ায়।'

রাধার দাদা বলল, 'আমাদের এতে কি আপত্তি থাকবে ? তবে অতদূর যেতে পারবে তো ! আর ওব আত্মীয়স্বজনদেরও এই খবরটা দেওয়া দরকার।'

রাধা বলল, 'কলকাতায় আত্মীয়স্বজন থাকলে কেউ ঘর ভাড়া করে একা থাকে ?'

রাধার দাদা বলল, 'কলকাতায় না থাকুক কোথাও না কোথাও আছে তো। আমি বলছি, এঁব যা অবস্থা তাতে পরে ওঁরা যেন কোন অভিযোগ না করেন।'

হাসপাতাল নয়, দীপা বুঝল সে মায়াদের বাড়িতে শুয়ে আছে। কয়েকঘণ্টা তার চেতনা সক্রিয় ছিল না। নতুন ডাক্তারবাবু সযত্নে পরীক্ষা করে প্রেসক্রিপশন লিখে চলে গেলেন। এখন মায়ার মা আর মায়া তার পাশে বসে আছে। মায়া তার মাকে বলল, 'এবাব তুমি যাও। এতক্ষণ ঠায় বসে আছ। ডাক্তারবাবু তো বললেন আর ভযের কোন কারণ নেই।'

মায়ার মা বললেন, 'চিঠিটা তুই লিখবি না আমি লিখব ?'

'তুমিই লেখ। আর একটা দিন অপেক্ষা করলে অবশ্য ভাল হত।'

'কেন ?'

'মনে হয় আগামীকাল ও মোটামুটি কথা বলতে পারবে। তখন ওকে জিজ্ঞাসা কবে না হয় লেখা যেত।' মায়া বলছিল।

'ঠিক আছে, যা ভাল মনে হয় কর।' ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন পাশ থেকে। এসবই এখন স্পষ্ট টের পাচ্ছিল। বাড়িটা মায়াদের এবং সে নিরাপদ এমন একটা বোধ তাকে বেশ আরাম দিচ্ছিল। মায়া ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সে ধীরে ধীরে চোখ খুলতেই মায়া ঝুঁকে এল, 'কেমন লাগছে এখন ?'

'ভাল।' ফিস ফিস করে বলল দীপা।

'উঃ, যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। কাল তোকে আনার পর ডাক্তারবাবু দুবার এসে দেখে গিয়েছেন। কি করে বাধালি এত বড় অসুখ ?'

দীপা জবাব দিল না। সে খুব নিস্তেজ চোখে তাকাল।

মায়া বলল, 'শোন, তোর অসুখের কথা রাধার দাদা এসে জানাতে আমরা তোকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। ওখানে জিনিসপত্র পড়ে আছে শুধু জামা-কাপড় আর টাকা পয়সা নিয়ে এসেছি। তুই অত টাকা ওই ঘরে রাখতিস ? পাগল। নে, এখন ঘুমো। আর কোন চিন্তা নেই।'

মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। ঘরে সে এখন একা। একটা গা গুলানো ভাব ছাড়া শরীরে কোন অস্বস্তি নেই। জ্বর এখনও ছেড়ে যায়নি। মাথা তুলতেই ঘুরে যাচ্ছিল। সে ঘরটাকে দেখল। এই ঘরে সে আগে কখনও আসেনি। হঠাৎ আর একটি সমস্যার কথা মনে এল। শেষবার কখন বাথরুমে গিয়েছিল মনে পড়ছে না। কিন্তু এ বাড়ির বাথরুম সে ব্যবহার করবে কি করে ? অন্য শরিকরা তো ছোঁয়াছুঁয়ির বাদ বিচার করবেন। সুস্থ অবস্থায় যে কারণে সে এখানে আসতে চায়নি অসুস্থ অবস্থায় তো সেটা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। এর চেয়ে হাসপাতালে গেলে ভাল হত, সেখানে ভালবাসা না থাক বাদবিচার নেই।

আবার ঘুম। আবার জাগরণ। এবার মায়ার মা সামনে বসে। সে চোখ খুলতেই প্রশ্ন হল, 'কেমন আছ দীপাবলী ?'

'ভাল।'

'তুমি উঠতে পারবে ?'

'কেন ?'

'বাথরুমে যেতে হবে।'

দীপার চোখে মুখে অস্বস্তি ফুটল।

মায়ার মা বললেন, 'তোমাকে বেশীদূরে যেতে হবে না। এই ছাদের ঘরের পাশে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরনো বাথরুম। ব্যবহার করা হত না। এখন কাজে লাগবে। আমাকে ধরো।'

দুপুরের পরে যখন ঘুম ভাঙল তখন বাইরে রোদ্দুর। মাথাটা বেশ হালকা লাগছে। একটা কাক সমানে ডেকে যাচ্ছে কাছেই। এই ঘর ছাদের ঘর। খুব ভাল লাগল। ঘরে অনেক জিনিসপত্র রয়েছে ছড়ানো। খাটে বিছানা সম্ভবত তার জন্যেই পাতা হয়েছে। পায়ের দিকে যে জানলাটা তার ওপারেই আকাশ। এরকম একটা ঘর মায়াদের বাড়িতে আছে তা সে জানতো না। দুপুরে মাসীমা সুপ জাতীয় কিছু খাইয়ে গিয়েছেন। রাধার কথা খুব মনে পড়ছিল। এরা সবাই তার জন্যে এত করছে অথচ সে নিজেকে একা ভাবছিল। শরীর এত দুর্বল যে উঠে বসতে ইচ্ছে করছে না অথচ শুয়ে থাকার আরামটাও চলে গিয়েছে। বিকেল চারটের সময় ওষুধ-খাওয়ার কথা। মায়ার মা বলছেন তার মধ্যেই ফিরে আসবে মায়া।

এইসময় বাইরে মাসীমার গলা পেল, 'না, আর জ্বর বাড়েনি। অল্প একটু খাওয়াতেও

পেরেছি। মুখের স্বাদ তো থাকার কথা নয়। বেশী কথা ব'লো না। এসো।'

দীপা দেখল মাসীমার পেছন পেছন শমিত ঢুকছে। চোখাচোখি হতেই শমিত হাসল, 'কি খেলটাই না দেখালে। জেদি মেয়েদের এমন ভোগান্তি মাঝে মাঝে ভোগা উচিত।'

মায়ার মা বললেন, 'আচ্ছা, অসুস্থ মেয়েটাকে এমন কথা বলতে আছে ? বসো।'

খাটের পাশের চেয়ারটাতে বসে শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ এখন ?'

'খুব খারাপ।' সরু গলায় বলল দীপা।

'খারাপ ? কেন ? কি অসুবিধে হচ্ছে ?' চিন্তিত হল শমিত।

'আপনি এসেছেন, তাই।' মুখ ঘোরাল দীপা, চোখ বন্ধ করল। মাসীমা হেসে উঠলেন, 'বাঃ, কেমন জব্দ! আর ওর পেছনে লাগবে !! তুমি বসো, মায়া এখনই ফিরবে, তখন সবার চা একসঙ্গে করব।' দরজার দিকে যেতে যেতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, 'ওকে বেশী কথা বলিও না। এখনও জ্বর একদম চলে যায়নি।'

মাসীমা চলে গেলেই শমিত অন্তত মিনিট তিনেক চুপচাপ বসে থাকল। দীপা তাই দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল ? নির্বাক কেন ?'

হঠাৎ শমিত অন্যরকম গলায় জানতে চাইল, 'আমি আসি তা তুমি চাও না ?'

'আপনার কি মনে হয় ?'

'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না।'

'আপনার অক্ষমতার দায় আমার ওপর চাপাচ্ছেন কেন ?'

শমিত অবাক হয়ে দীপার মুখ দেখল। তারপর হেসে বলল, 'উঠি।'

'কেন ? এই দুপুরেও কি রিহার্সাল রেখেছেন ?'

'এখন আর দুপুর নেই। আচ্ছা, তুমি কি আমাকে নাটক-রিহার্সাল এসবের বাইরে ভাবতে পারো না ? আমি আড্ডা মারতেও যেতে পারি।'

'তাহলে জানলাম আমার সঙ্গে আড্ডা মারা যায় না।'

'বাঃ, মাসীমা একটু আগে বলে গেলেন আমি যেন তোমাকে বেশী কথা না বলাই। এর মধ্যেই সেই অন্যায়টা করে ফেলেছি।'

'না, আপনি একটু বসুন।'

'বেশ। বসছি, কিন্তু তুমি কথা বলবে না।' শমিত ঠিক করল যতটা সম্ভব কথা না বলে দীপার পাশে বসবে। সে দেখল দীপা তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। ওর ফ্যাকাশে মুখ, রুক্ষ চুল অসুস্থতাকে ধরে রাখলেও চোখ দুটিতে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কথা না বলে থাকতে পারল না সে, 'হাসছ কেন ?'

'এটা তো মানা নেই !'

শমিত নিঃশ্বাস ফেলল। ক্রমশ তার অস্বস্তি হল। একজন নিঃশব্দে হেসে গেলে তার সামনে চুপচাপ বসে থাকা যায় না। বিছানায় নেতিয়ে পড়ে থাকা দীপার হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল সে। নখগুলো যেন বড্ড বেশী সাদা। নখপালিশ ব্যবহার করেনি নিশ্চয়ই অনেকদিন। কিংবা আদৌ ব্যবহার করে না।

'কি ভাবছেন ?'

'তুমি আমাকে এখনও আপনি বল কেন ? তোমার বন্ধু মায়া কিন্তু তুমি বলে। বয়সে তো খুব বেশী বড় নই। একসঙ্গে কাজ করলে তুমি বলাটাই স্বাভাবিক।'

'ভেতর থেকে আসেনি, এলে বলতাম।'

'আমি উঠি। তোমার যদি খুব অসুবিধে না হয় কাল আসব।' শমিত উঠে দাঁড়াল

দীপা চুপ করে রইল। কিন্তু কিন্তু করেও শমিত ডান হাত বাড়িয়ে জ্বর দেখার ভঙ্গীতে দীপার কপাল স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল দীপা। পায়ের শব্দে বুঝল শমিত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সে চোখ খুলছিল না। হঠাৎ ওই স্পর্শের কথা মনে আসায় সা.া গায়ে কাঁটা ফুটল তার। এই রোগক্লিষ্ট শরীরে ক্লান্তি ছাপিয়ে অন্য এক নবীন অনুভূতি। বন্ধ চোখ খুলছিল না সে। যেন ওই অনুভূতি চোখ খোলামাত্র হারিয়ে যেতে পারে। কয়েক সেকেণ্ড বাদে তার বাঁ চোখ উপচে বন্ধ পাতার কোণ দিয়ে একটা অবাধ্য জলের ধারা গড়িয়ে গেল কানের দিকে। দীপা মোছার চেষ্টা করল না।

কোন স্থির ভাবনা মনে নেই, কিছুক্ষণ এইভাবে থাকার পর একসময় মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল চুপচাপ। এইসময় তার বোধশক্তিও কাজ করছিল না। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যেন এক মুহূর্তে লয় পেয়ে গিয়েছিল। এইসময় কেউ যেন তাকে গভীর জলের তলা থেকে টেনে তুলল। চোখ খুলল দীপা। খুলতেই দেখল মায়া তার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে।

তাকে চোখ মেলতে দেখে মায়া দুই কাঁধ-আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোর ? কখন থেকে ডেকেই যাচ্ছি, সাড়া দিচ্ছিস না কেন ?'

দীপা তখন শব্দ খুঁজছিল। কথা বলতে গেলে পরিচিত শব্দ দরকার। অথচ ওই মুহূর্তে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। মায়া ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল, 'কি ভাবছিস ? খুব কষ্ট হচ্ছে ?'

মাথা নাড়ল দীপা, তার বন্ধ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ এল, 'না।' এবং সেই মুহূর্তে তার নাকে তেলের গন্ধ লাগল। পরিচিত গন্ধ কিন্তু তার সঙ্গে শারীরিক সুবাস মিশে থাকায় সেটা বেশ অস্বস্তির হল। মায়া তাকে যেভাবে দুহাতে জড়িয়ে রেখেছে এইসময় তাতেও তার স্বস্তি হচ্ছিল না।

'কষ্ট না হলে কেউ কাঁদে ? তোর চোখের কোণ থেকে একটা জলের দাগ এখনও শুকিয়ে আছে। তুই খুব ভাল মেয়ে।' দীপার গালে গাল রাখল মায়া, রেখে বলল, 'না, জ্বর বোধহয় নেই। আমার মুখে ছ্যাঁকা লাগছে না।'

'ঠিক আছে।' দীপা নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল।

'কি ঠিক আছে ?' মুখ তুলল মায়া, 'কিছুই ঠিক নেই। মায়ের কাছে শুনলাম শমিত এসেছিল। কি বলেছে ও ? তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ?'

'না তো।' দীপা ওই অবস্থায় মাথা নাড়ল।

'তাহলে কাঁদছিলি কেন ?'

দীপা এ প্রশ্নের জবাব দিল না। মায়া ওর কাঁধে আবার চাপ দিল। মায়াকে যেন এইসময় আর মেয়ে ভাবতে ইচ্ছে করছে না। সে জবাব দিল, 'কাঁদিনি, কখন জল বেরিয়েছে আমি নিজেই জানি না।'

'বাঃ ! এটা কোন কথা হল। দ্যাখ দীপা, আমি তোর বন্ধু তোকে সাবধান করে দেওয়া আমার কর্তব্য। শমিতকে দেখে যে কোন মেয়ে টালমাটাল হয়, ওর মধ্যে এমন একটা সর্বনাশা ঝড়ের স্বভাব আছে যে না হয়ে পারে না। তুই যেন এই ভুল করিস না। শমিত তোর জন্যে নয়। বুঝলি ?'

দীপা মাথা নাড়ল। নেড়ে চোখ বন্ধ করল। আর তখনই সে দুই ঠোঁটে চাপ অনুভব করল। চুমু খেয়েই মায়া উঠে বসল, 'গুড গার্ল। লক্ষ্মী মেয়ে।'

ঠিক পনের দিন পরে স্নান এবং ভাত খেয়ে দীপা এক বিকেলে ছাদে গিয়ে দাঁড়াল। মায়া

তখনও কলেজ থেকে আসেনি। ক্লাস হয়ে গেল বেশ কিছুদিন। এবার এখান থেকে তার যাওয়া উচিত। কলোনির ঘরে তালা দেওয়া রয়েছে। রাধা এসেছিল তিন দিন। সে অবশ্য বলেছে ও ব্যাপারে কোন চিন্তা না করতে। চাবি আছে তাদের বাড়িতে। রাধার দাদা প্রতি রাত্রে সেখানে শুতে যায়। শমিত যেভাবে সহজ হয়ে এই বাড়ির অনেক সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ছাদের ঘরে আসতে পারে রাধার দাদা তা পারে না। কারণ একদিন নাকি বোনের সঙ্গে এসেও নিচে অপেক্ষা করেছে। তখন দীপা মোটামুটি আচ্ছন্ন ছিল, পরে শুনেছে। এই মানুষটিকে তার খুব সহজ বলে মনে হয়। দীপা ভেবেছিল হয়তো একদিন দেখা করতে আসবে। এলো না।

কলোনির ঘরে অবশ্য এমন কিছু দামী সম্পত্তি নেই যে পাহারা দিতে একজনকে রাত্রে সেখানে শুতে হবে। তার বিছানায় একজন অনাত্মীয় পুরুষ রোজ রাত্রে শুচ্ছে ভাবতে ভাল লাগছিল না। এবার সেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখানে মাসীমার স্নেহ, মায়ার যত্ন আর মাঝে মাঝে শমিতের গল্প করে যাওয়ার সঙ্গে বেশ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। এরা কেউ তাকে চলে যেতে বলেনি। কিন্তু সুস্থ হবার পর প্রত্যেকের দুশ্চিন্তা চলে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছে। এর বেশী থাকলে হয়তো বোঝা হয়ে যাবে।

এই বাড়ি মায়াদের একার নয়। এই ঘরটিও। দীপার কারণে মায়ার মা কিছুদিন ব্যবহার করার অনুমতি পেয়েছেন। কাল সন্ধেবেলায় অবশ্য অন্য কারণে এ বাড়িতে বেশ কিছুক্ষণ দাপাদাপি হয়ে গিয়েছে। নারী এবং পুরুষকণ্ঠে অনেকক্ষণ আস্ফালন গর্জন চলছিল একনাগাড়ে। মায়া হেসে বলেছিল ওটা জল নিয়ে বিবাদ। সেই বিবাদের জের ছাদেও উঠে এসেছিল। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল দীপার। কিন্তু মনে হয়েছিল যে কোন মুহূর্তে ছাদে কেউ খুন হয়ে যেতে পারে। ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল সে।

এখন এই বিকেলে এবাড়ির নির্জনতায় গতকালের উত্তাপ ধরা পড়বে না। কিন্তু তার উচিত অবিলম্বে সরে যাওয়া। হঠাৎ পায়ের শব্দ হল। একজন বয়স্কা মহিলা ছাদে উঠে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফরসা লম্বা, গায়ে জামা নেই, থান জড়ানো রয়েছে। মহিলা হাসলেন, 'ও, তুমি বুঝি ওঘরে আছ ?'

মাথা নাড়ল দীপা। একি ফ্যাসাদ হল।

'শুনেছি একটা মেয়ের খুব অসুখ। ওঘরে আছে। মেমগিন্নি বলে কয়ে ঘরটা কদিনের জন্যে নিয়েছে। তা এখন কেমন আছ ?'

'একটু ভাল।'

'অবশ্যি আমি বুঝতে পারলাম না এত চুলো থাকতে এই ঘরে কেন ? তিন কুলে কোন আত্মীয়স্বজন নেই ?'

না বলতে গিয়ে সামলে নিল দীপা, 'অনেক দূরে থাকেন।'

'অ'। অনেকটা টেনে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধা, 'তা এখানে থাকা হয় কোথায় ?'

'হোস্টেলে।'

'তাই বল। মাথার ওপর লাঠি ঘোরাবার কেউ নেই। শুনেছি হোস্টেলের মেয়েদের নানান বদ অভ্যেস থাকে। মাথার ওপর ব্যাটাছেলে না থাকলে মেয়েছেলের যা হয় আর কি। অবশ্যি কাকে আর বলব। এই বাড়িই তো এখন রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জবন হয়ে গিয়েছে। হুটহাট দামড়া ছেলে বাড়িতে ঢুকছে। স্নান করে যে স্বস্তি নিয়ে বের হব তার উপায় নেই, কান পেতে পায়ের আওয়াজ শুনতে হয়। কি জানি বাবা, আমাদের বাড়িতে এর আগে কেউ কলেজেও পড়েনি তাই অসভ্যতাও করেনি।'

দীপা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধা একটা ঢেঁকুর তুললেন, 'জ্বলে গেল, বুক জ্বলে গেলে। উঃ, এই হল আমার রোগ। সারাদিনে একবার খাই তবু অম্বলে বুক জ্বলে যায়। হিন্দু বেধবা তো, যমেরও অরুচি। হ্যাঁ, তা যেকথা বলছিলাম, এই বাড়ির হাল এমন হয়েছে বছর দশেক হল। যখন কর্তা বেঁচেছিলেন তখন তো আর ভাগাভাগি ছিল না। কারো ট্যাঁ ফুঁ করার ক্ষমতা ছিল না। বাইরের লোক কি ঘরের ব্যাটাছেলেরাই অন্দরে ঢুকত না। আমার শাশুড়ি তো গায়ে জামা রাখতে পারতেন না, মাঝে মাঝে কাপড়ও ফেলে দিতেন, কিন্তু ব্যাটাছেলেরা কেউ সেটা দেখতে পেয়েছে? কেউ না। তিনি গিয়ে আমাকে মেরে দিলেন। একবার বুঝলে সৌদামিনী নামে এক উঠতি বয়সের ঝি এল কাজে। রাত বেরাতে ছাদে আসত। আমার সন্দেহ হয়েছিল। যখন জানলাম তখন ছয়মাসের পেট। মেরে ফেলতে তো পারি না। তা সেই মেয়ে চারমাস ভাঁড়ার ঘরে থেকে বাচ্চা বিইয়ে সেই বাচ্চা নিয়ে দেশে চলে গেল। কাকপক্ষীতেও কি টের পেল? পেল না। তা তুমি ছাদে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'এমনি, ঘরে বসে থাকতে থাকতে—।'

'উহুঁ। মেমসাহেব শুনলে হয়তো বলবে অন্য শরিকের লোক হয়ে আমি নাক গলাচ্ছি, কিন্তু তোমাকে বলি, ছাদে দাঁড়িও না। এ ছাদের হাওয়া বড় খারাপ। কখন গায়ে লেগে যাবে টের পাবে না। আমারই এত বয়স হল তবু ছাদে উঠলে আশে পাশের ব্যাটাছেলে যেন গিলে খায়। আর চুল খুলে দাঁড়ানো হয়েছে, মরণ!' কথা শেষ করে বৃদ্ধা টুক টুক করে ছাদের কোণে চলে গেলেন। সেখানে একটা ছোট টবে আধমরা তুলসী গাছ দাঁড়িয়ে আছে। বৃদ্ধা সেখানে পৌঁছে কাক পাখিদের বাপান্ত করতে লাগলেন। দীপা চলে এল ঘরের মধ্যে। এবং তার মনে পড়ল সেই কথাগুলো, 'বাঙালি নারী জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু নারীরাই। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তি হতাশা তাঁহারা বুকে বহন করিয়া চলেন যতদিন না আর কোন নারীর ওপর তাহা বর্ষণ করিতে সক্ষম হইতেছেন।'

অথচ এই বাড়িতেই মায়া মানুষ হয়েছে। বৃদ্ধা তার মাকে মেমসাহেব বলে ব্যঙ্গ করলেন। মায়ার মধ্যে এসবের প্রভাব বিন্দুমাত্র পড়েনি। সেটা অবশ্যই ওর মায়ের কৃতিত্ব।

মায়ার কথা মনে পড়তেই অন্য ধরনের অস্বস্তি এল। সেদিন তাকে চুমু খাওয়ার পর মায়া যেন বড় বেশী তার গায়ে পড়ছে। কথায় কথায় তাকে জড়িয়ে ধরছে। ওর এই ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না দীপার। খাটের ওপর পা মুড়ে বসে হাঁটুতে মুখ রেখে এই ছায়া ছায়া ঘরে সে হেসে উঠল নিঃশব্দে। আমাদের সম্পর্কগুলো ভারি মজার। প্রেমিক প্রেমিকা, স্বামী স্ত্রী মনের তাগিদে বা শরীরের আকাঙ্ক্ষায় আলিঙ্গন বা চুম্বন করলে সেটাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় ধারণায় ওসব করতে হবে তৃতীয় মানুষের চোখের আড়ালে। চুপি চুপি। যুক্তি দুটো। একটি, যা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার তা কেন পাঁচজনকে দেখাবে। দ্বিতীয়টি প্রকট, আইনের সাহায্য নিয়েও নরনারী প্রকাশ্যে ওরকম আচরণ করলে পাঁচজনের কাছে অশ্লীল বলে মনে হবে। ওদের ক্লাসের একটি মেয়ে বাবার সঙ্গে মেট্রো সিনেমায় ইংরেজি ছবি দেখতে গিয়েছিল। সেখানে আচমকা নায়ক নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে যখন চুম্বন করে তখন মেয়েটির কান লাল হয়ে গিয়েছিল। আড়চোখে সে দেখেছিল তার বাবা চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। ওই দৃশ্য মেয়ের সঙ্গে বসে তিনি দেখতে চাননি অথবা পারেননি। একা যা উপভোগ করতেন পাঁচজনের সঙ্গে মেয়ে সঙ্গে থাকায় তা অশ্লীল বলে মনে হয়েছিল তাঁর। দীপার মনে হল, যদি কোন স্বামী-স্ত্রী অনেক বৃদ্ধ বয়সে, যখন তাঁদের হাঁটা চলার ক্ষমতাও লোপ পেতে চলেছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন চুম্বন করেন

তাহলে তাঁদের ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীরা সেটা কি চোখে দেখবে ? তার মন বলল, ব্যাপারটা তাদের কাছে কখনই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আবার একই ব্যাপার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কেমন পাল্টে যায়। যাবা বলেন, স্নেহ ভালবাসা কোন ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁরা অন্ধ। মায়ের ভালবাসা তার সন্তানের ওপর শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত যে অবস্থায় থাকে পরে তা থাকে না। পাঁচ বছর বয়স হয়ে গেলে মা কেন তার সন্তানকে আর ঠোঁটে চুম্বন না খেয়ে গালে বা কপালে ঠোঁট ছোঁয়ান ? সেই মা কেন ওই সন্তানের বিশ বছর বয়সে চুম্বনের কথা ভাবতে পারেন না। শরীরের পরিবর্তন তাঁর সোচ্চার ভালবাসার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ? যা ছিল অত্যন্ত মধুর তা হয়ে দাঁড়ায় অশোভনীয়। তাহলে স্নেহ খোলস পাল্টায়। এক মাত্র কন্যাকে যে পিতা শৈশবে বা বাল্যকালে প্রতিদিন চুম্বনের মাধ্যমে স্নেহ প্রকাশ করেন যৌবন এলে তিনিও তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরতে সঙ্কোচ বোধ করেন। মানুষের এ এক অদ্ভুত অসহায়তা এবং মানুষ যেহেতু সামাজিক প্রাণী তাই সেটা মেনে নেয়। মায়া তাকে চুম্বন করেছে এই অভিযোগ কাউকে করলে সে হাসবে। এদেশে এখনও নারীর সঙ্গে নারীর এমন ঘনিষ্ঠতায় কেউ দোষ দ্যাখে না। অথচ মায়ার বয়সী কোন পুরুষ যদি ওই কাণ্ড করত তাহলে— ! হঠাৎ মুখ চোখ লাল হয়ে গেল দীপার। ব্যাপারটা ভাবতেই তার রোমাঞ্চ হল। কেন এমন হচ্ছে ভেবে পাচ্ছিল না, ভাবতে আর ইচ্ছেও করছিল না। সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়ল। আর তখনই এই ঘরে এতদিন চুপ করে থাকা টিকটিকিটা শব্দ করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিল।

বিকেলে শেষ হবার আগেই মায়া এল, সঙ্গে শমিত। খাটের একপাশে সরে বসল দীপা। মায়া পাশে চলে এল, 'কেমন আছিস ?'

'ভাল হয়ে গিয়েছি। আজ ছাদে বেড়িয়েছি কিছুক্ষণ।'

শমিত বলল, 'চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে।'

মায়া বলল, 'ভাল হয়ে গেছি মানে পুরোপুরি সুস্থ তা ভাবিস না। তুই যদি ওই কলোনির ঘরে আবার গিয়ে একা থাকিস তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়তে বেশী সময় লাগবে না।'

'বাঃ, আমি থাকব কোথায় ? যেখানেই থাকি একাই থাকতে হবে।'

'কেন ? এই ঘরটিকে কি খুব খারাপ মনে হচ্ছে ?'

'পাগল ! অসুস্থ অবস্থায় এখানে এতদিন থাকলাম সুস্থ হয়ে এই ঘরে বন্দী থাকব নাকি ? আর এখানে যে আমার পাকাপাকি থাকা সম্ভব নয় তা তোরাও জানিস। হওয়ার হলে তুই আগে বলতিস না ?'

'বেশ পাকাপাকি না সম্ভব হলে মাঝেমাঝে হতে পারে। হোস্টেলে এখনও তোর নাম আছে। তুই ওখানেই থাকবি। ছুটিছাটায় এই ঘর রইল। আপত্তি আছে ?'

শমিত এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, 'দীপা, রাধার পক্ষে যেটা সম্ভব তুমি সেটা করতে পারো না। তাছাড়া রাধাকে বাড়িতে ফিরে রান্না করতে হয় না, মা-মাসী পাশে থাকে। ওই বাড়ি থেকে অতটা হেঁটে বাসস্ট্যান্ড, তারপর এতটা সময় রোজ দুবার গাড়িতে বসে থাকার ধকল তোমার শরীরের পক্ষে বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমি মনে করি হোস্টেলেই তোমার থাকা উচিত।'

'সেটা ভুল বলেননি। মুশকিল হল বছরে দুবার দুমাস বন্ধ থাকে হোস্টেল। তখন কোথায় যাবো ? মায়াদের এখানে কি বারবার আসা যায় ?'

'কেন যায় না ?' গলা তুলল মায়া।

শমিত হাত তুলল, 'কলেজ হোস্টেল ছাড়াও তো এখানে মেয়েদের থাকার জায়গা আছে। সেগুলোকেও তো হোস্টেল বলে।'

'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল। কিন্তু আমি তো চাকরি করি না।'

'মানলাম। কিন্তু চেষ্টা ক'রে দেখতে দোষ কি। ওরকম একটা জায়গা পেলে পরেও কোন অসুবিধে হবে না। অন্তত একই সঙ্গে তোমার শরীর আর আত্মসম্মানে কোন চিড় ধরবে না। বুঝলে খুকী ?'

এখন শুধু ক্লাস লাইব্রেরি আর হোস্টেল। গত একমাস দীপা অন্য কোনদিকে তাকায়নি। অসুস্থতার কারণে সে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল পড়াশুনায়। শুধু বিকেলে লাবণ্যকে পড়াতে যায় নিয়ম করে। অসুস্থতার সময় একরকম অন্ধকারেই রেখেছিল সে ওদের। সেইসময় মনেও পড়েছিল লাবণ্যর কথা। সে অসুস্থ ওই খবরটা ওদের দেওয়া দরকার মনে করেছিল। কিন্তু কাকে দিয়ে দেবে ? যাকেই যেতে বলল সে-ই ফিরে এসে চোখ কপালে তুলল।

অসুখের পর প্রথম দিন যাওয়ামাত্র লাবণ্য হই হই শুরু করে দিয়েছিল। বাচ্চা মেয়েটা চোখ ঘুরিয়ে গাল ফুলিয়ে অভিমান জানিয়েছিল। কথা শুনতে হবে এমন ধারণা নিয়ে গিয়েছিল দীপা।

দেখা হওয়ামাত্র ওর দিদিমা চোখ বড় করে বলেছিলেন, 'একি চেহারা হয়েছে তোমার ? কি করে এমন হল ?'

'অসুখ করেছিল।' দীপা অপরাধীর মত হেসেছিল।

'কি অসুখ ? বসো বসো।' দুহাত ধরে চেয়ারে বসিয়েছিলেন বৃদ্ধা, 'এবার আমি তোমায় বকব। ওইটুকু শরীরে এত কষ্ট করা পোষায় ? সেই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে গিয়ে বাসা নিলে। মেয়েটা আসছে না দেখে গেলাম হোস্টেলে খবর নিতে। সেখানে কেউ নেই। ছুটি হয়ে গিয়েছে। তারপর হোস্টেল খুলতে সব মেয়ে এল, তুমি এলে না। আর নাতনীতো হেদিয়ে ম'লো তোমার জন্যে।'

'এখন আমি হোস্টেলেই ফিরে এসেছি।' দীপা লাবণ্যর হাত ধরল।

'আমি একটা কথা বলব ?'

'বলুন।'

'বলতে খুব সঙ্কোচ হয়। না, থাক।' লাবণ্যর দিদিমা কথা ঘোরালেন, 'শরীর ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এখানে রোজ আসতে হবে না।'

'আপনি কি বলবেন বলেছিলেন ?'

'ও কিছু না। দাঁড়াও আসছি।' খুব দ্রুত সামনে থেকে সরে গেলেন মহিলা। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার খুব অসুখ করেছিল ? '

'হ্যাঁ। খু-উ-ব।'

'মন কেমন করছিল তখন ?' মেয়েটি বড় চোখে তাকাল, 'আমার কথা ভাবতে ?'

হঠাৎ খোঁচা খেল দীপা। মিথ্যে কথাটা বলতে পারল না। সত্যি কথাটা বলতে জিভে আটকাল। সে হাসল। হঠাৎ লাবণ্য ছুটে গিয়ে টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে এল, 'তুমি এই বইটা পড়েছ ?' দীপা চমকে উঠল, 'কোথায় পেলে তুমি ?'

'আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে দিয়েছে। ওদের বাড়িতে ছিল। এখানে না আমার নামের একটা মেয়ে আছে, তাই। আমি বইটা পড়ব ?'

'শেষের কবিতা' হাতে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলল দীপা, 'এখন পড়লে তুমি বুঝতে পারবে

না।'

লাবণ্য মাথা নাড়ল, 'আমার বন্ধুও বলছিল। তুমি বুঝতে পারো?'

দীপা ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, 'না। ভাল পারি না। কেমন রক্তমাংসহীন লাগে লাবণ্যকে। এভাবে জড়িয়ে ধরা যায় না।'

॥ ৪৮ ॥

খবরটা কে কাকে বলেছিল ঈশ্বর জানেন, কিন্তু স্কটিশ চার্চ কলেজে জানাজানি হয়ে গেল বিখ্যাত চিত্রপরিচালক সুবিনয় সেন দীপাবলী ব্যানার্জিকে নায়িকা করতে চেয়েছিলেন তাঁর পরের ছবিতে কিন্তু সে রাজি হয়নি। ছেলেমেয়েদের কাছে এক লহমায় যেন সে নায়িকা হয়ে গেল। কালচারাল সেক্রেটারি এসে ক্লাসের বাইরে তাকে একদিন বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন সামনের শনিবার মহাজাতিসদনে কলেজ সোস্যাল। সবাই চাইছে আপনি এই অনুষ্ঠানটা কনডাক্ট করুন। মানে, যেসব শিল্পী গান গাইবেন তাঁদের নাম ঘোষণা করবেন।'

'সেকি! আমি তো এমন কাজ কখনও করিনি। তাহলে আমাকে বলছেন কেন?'

'কাউকে তো করতে হবে। আর এই মুহূর্তে আপনি খুব উপযুক্ত।'

কেন?'

'সুবিনয় সেনের ব্যাপারটার জন্যে।'

'এসব কথায় আপনি কেন কান দেন! আমাকে মাপ করবেন।'

মুখে যাই বলুক সহপাঠিনীরা যে তাকে ঈর্ষা করছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। নিজের ভাগ্য ক্রমশ নিজের কাছেই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠছে। যে কোন সাধারণ অসাধারণ মেয়ের চেয়ে ঈশ্বর তাকে অনেক বেশী শাস্তি দিয়েছেন। কষ্ট কি জিনিস তার মত আর কটি মেয়ে বুঝতে পেরেছে কে জানে। অন্তত এই বয়সে। কলেজে এমন কোন মেয়ে পাওয়া যাবে না যে পৃথিবীতে তার মত একা। অথচ মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে সে সবার আলোচনার অথবা ঈর্ষার বস্তু হচ্ছে।

হোস্টেলে ফিরতেই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। এত ঝড় জল বয়ে গেল তবু কখনও সুভাষচন্দ্র বা তার জন্মদাতার কথা মনে আসেনি। সুভাষচন্দ্র আজ অন্যরকম। বেশ হাসি-খুশী। বললেন, 'তোর মামীমা প্রায়ই বলেন মেয়েটা কেন আসে না, এত কাছে থাকে। তুই তো মাঝে মাঝে যেতে পারিস।'

'আমাকে আপনি এর আগে কখনও বলেননি।' দীপা হাসল।

'যাক গে! শোন, তোর পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি নিয়ে প্রতুল বাঁড়ুয্যের সম্পত্তি উদ্ধাব করতে অনেকটা এগিয়েছি, বুঝলি? লাখ লাখ টাকার ব্যাপার। স্বনামে যা রেখেছিল তাই এই, বেনামে যা ছিল তা আর উদ্ধার করা যাবে না। এখন তুই মন খুলে বল তো, তোর কি ইচ্ছা?'

'আপনি একটু পরিষ্কার করে বলুন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাপার হল, তুমি প্রতুল বাঁড়ুয্যের উত্তরাধিকারিণী। সব সম্পত্তি তোমার। কিন্তু তুমি বলেছ ওসব নেবার ইচ্ছে নেই। তাহলে কে নেবে? এই কিছুদিন আগে যখন জলপাইগুড়িতে গিয়েছিলাম তখন ভাবলাম চা-বাগানে গিয়ে ওদের দেখে আসি। তোমার মা ঠাকুমা যে কষ্টে আছে তা চোখে দেখা যায় না। মনে হল তোমার আপত্তি না থাকলে

ওদের কিছু দেওয়া উচিত। আমারও বয়স বেড়েছে। কিছুই জমাতে পারিনি এ পর্যন্ত। অথচ দায়দায়িত্বও কম নয়। কি করে সেসব মাথা থেকে নামাবো বুঝতে পারছি না। তাছাড়া এসব কাজে যাওয়া আসা কোর্ট কাছারিতে কম খরচ হচ্ছে না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে বলিনি খরচ করতে।'

'আহা! তুমি বলবে কেন ? আমি আমার গরজেই করেছি। বলছিলাম কি, তরী প্রায় কূলে এনে ফেলেছি। এখন তোমার কি ইচ্ছে আছে ওদের কিছু দেওয়ার ?'

'কাদের কথা বলছেন ?'

'তোমার জন্মদাতা বাবা আর সৎমায়ের কথা বলছি।'

'আপনিই ওঁদের নিয়ে এসেছিলেন আমার কাছে।'

'হুঁ। পরে ভেবে দেখলাম ঠিক হয়নি। তোমার মা মারা যাওয়ার পরই তো আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল সে। আবার বিয়ে করে সে নিজেই সব সম্পর্ক অস্বীকার করেছে। আমার নিজের বোন যখন নেই আর তার স্মৃতি যখন মানুষটা নষ্ট করেছে তখন তাকে কেন তুমি আর এখন অনুগ্রহ করবে ?'

'কি ব্যাপার বলুন তো ?'

'মানে ?'

'আপনার সঙ্গে কি ওদের ঝগড়া হয়েছে।'

'না না, ঝগড়া-ঝাঁটি নয়। আমার বুঝতে একটু সময় লাগল।'

'আপনার এই মত ওঁরা জানেন ?'

'না, আমার জিনিস নয়, আমি কেন বলর্ব ? বলবে তুমি !'

'ওঁরা যদি বলেন আপনাকে কিছু না দিতে। ভাগ্নীর সম্পত্তিতে মামার কোন অধিকার নেই। একথা তো আইনও বলবে।'

'বলতে আরম্ভ করেছে। তোমার বাবা যাকে বিয়ে করেছেন, মানে যাকে নিয়ে আমি এখানে এসেছিলাম তার কথাবার্তায় আমি ভুলে গিয়েছিলাম সব। কিন্তু তোমার সম্মতি পাওয়ার পর তার ব্যবহার পাল্টে গিয়েছে। আমাকে তো বলেই দিল বাবার চেয়ে মামা বড় হতে পারে না।'

'তাই বলুন। আপনারা এখন আর এক দলে নেই। ঠিক আছে, আপনি যা করছেন করুন। এ ব্যাপারে যত খরচ হচ্ছে লিখে রাখবেন। যখন আমাকে প্রয়োজন হবে খবর দেবেন। ঠাকুমা এখন কেমন আছেন ?'

'ওই আর কি। '

'আপনি বললেন চা-বাগানের বাড়িতে গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ। তোমার মায়ের সঙ্গে কথা বলেছি এসব ব্যাপার নিয়ে।'

'ঠাকুমাকে দ্যাখেননি ?'

'শুনলাম ওঁর শরীর খারাপ। বৃদ্ধা মানুষ। নিজের ঘরে ছিলেন। তাই আর বিরক্ত করিনি। কেন, কি হয়েছে বলতো ?'

দীপা জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ঠাকুমার পা ভাঙার খবরটা নিয়ে সে আর কিছু ভাবতে চাইল না। সুভাষচন্দ্র সেটা ধরতে পারলেন না। দীপা বলল, 'আপনি ওখানে গিয়ে ঠিক কি কি কাজ করেছেন বলুন তো ?'

সুভাষচন্দ্র যেন এবার বলার মত বিষয় খুঁজে পেলেন। সোৎসাহে বলতে লাগলেন, 'প্রথমে পাড়ায় গিয়ে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। ঠিকঠাক সম্পত্তির পরিমাণ কেউ

বলতে পারল না। প্রতুল বাঁড়ুয্যের বাড়ির তো অবশিষ্ট কিছু নেই। বন্যায় পলি পড়ে সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পাড়ার লোকে জানলা দরজাও খুলে নিয়ে গিয়েছে। গাছগাছালিরও খারাপ অবস্থা। প্রতুল বাঁড়ুয্যের ভাইপোর সঙ্গে দেখা করলাম। সে তো প্রথমে আমায় সাফ কথা বলতেই চায় না। তোমার সই করা কাগজ দেখাতে বলল তার কোন ইন্টারেস্ট নেই, সে জানেও না কি কি সম্পত্তি আছে। উঃ, সে যে কি হ্যাপা তা তোমাকে কি বলব।' মাথা নাড়লেন সুভাষচন্দ্র। দীপা কথা বলল না। কিন্তু লক্ষ করল হঠাৎ হঠাৎই সুভাষচন্দ্র তুই থেকে তুমিতে উঠে যাচ্ছেন।

সুভাষচন্দ্র আবার শুরু করলেন, 'আমি তো ছাড়ার পাত্র নই। গেলাম জলপাইগুড়ির কোর্টে। জমিজমার রেকর্ড দেখতে চাইলাম। সে তো হিমালয়ে একটা লতা খোঁজার মত ব্যাপার। কিন্তু খুঁজতে জানলে কি না হয়। যে ভদ্রলোক প্রতুলবাবুর বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করতেন, মানে ওঁর উকিলবাবু, তিনি তো সব মেরে দেবার তালে ছিলেন। আমায় দেখে মোটেই খুশী হলেন না। কিন্তু তাঁর মুহুরিকে টাকা পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে সব বের করলাম রেকর্ড থেকে। বুঝতেই পারছ যা ছিল ওটা তার আর্ধেকও না। ওঁর সম্পত্তির বেশীর ভাগই তো বেনামে। কোর্টে তার রেকর্ড থাকবে কেন? যা পেয়েছি সব লিখে নিলাম। এরপর গেলাম ব্যাঙ্কে। অ্যাকাউন্ট নাম্বার জানি না, কোন ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন তাও না। যে কটা ব্যাঙ্ক জলপাইগুড়িতে আছে সব চরতে লাগলাম। সেখান থেকে তিনটে অ্যাকাউন্টের সন্ধান পেলাম। তার ব্যালান্স অ্যামাউন্ট, অ্যাকাউন্ট নম্বর লিখে এনেছি। তুমি চাও তো তার কপি দিতে পারি তোমাকে।'

'দেবেন তো!'

'ও, আচ্ছা, দেব।' একটু হকচকিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্র, 'এখন কোর্ট থেকে অর্ডার বের করতে হবে যে তুমিই তাঁর উত্তরাধিকারিণী। অর্ডার পেলে ওগুলো তোমার নামে ট্রান্সফার করা যাবে। মুশকিল হল, এসব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার আর তা করতে আমাকে জলপাইগুড়িতে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে।' সুভাষচন্দ্র মুখ বিমর্ষ করলেন।

'ও, আচ্ছা।' মাথা নাড়ল দীপা।

'ইয়ে, তোমার জন্মদাতা তো কোনকালে দায়িত্ব নেননি। এতে যে পয়সাকড়ি খরচ হচ্ছে তা যাচ্ছে আমার পকেট থেকেই। অথচ পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা নিতে তার জিভ লকলক করছে। এসব আমার সহ্য হয় না। আর তাঁর স্ত্রীর কথাবার্তা শুনলে মনে হয় তিনি যেন কুইন ভিক্টোরিয়া।' সুভাষচন্দ্র আক্রোশ বোঝালেন, 'কিন্তু মুশকিল হল আমার তো অবস্থা ভাল নয়। কলকাতায় সংসার রেখে জলপাইগুড়িতে যাওয়া মানে একই সঙ্গে দু'জায়গায় খরচ চালানো। এ আমি পারব কি করে? তাছাড়া কোর্ট কাছারির খরচাও আছে। তাই আমি বলছিলাম যদি তুমি এখন হাজার টাকা আমাকে দাও, মানে তাতেই সব হয়ে যাবে, তাহলে প্রতুল বাঁড়ুয্যের টাকা পাওয়ামাত্রই তোমাকে শোধ করে দেব।'

এরকম প্রস্তাব যে সুভাষচন্দ্র করতে পারেন চিন্তাও করেনি দীপা। মামার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'আমি কি করে দেব?'

'আমি সব জানি। অঞ্জলি বলেছে আমাকে। অমরনাথ যাওয়ার আগে প্রতুল বাঁড়ুয্যের টাকা থেকে তোমার ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে গিয়েছে। বিচক্ষণ মানুষ ছিল তো! তা বেশী দিন তো নয়, কয়েক মাসের মধ্যেই টাকাটা ফেরত পাচ্ছ মা!'

দীপা মাথা নাড়ল, 'আপনি ভুল শুনেছেন। তাছাড়া যে সামান্য টাকা আমাকে দেওয়া হয়েছিল তা থেকেও আমি চা-বাগানে সাহায্য করেছি। এখন আমাকে টিউশনি করতে হয়

নিজের খরচ চালানোর জন্যে। আপনার যদি খুব অসুবিধে হয় তাহলে এসব করার দরকার নেই। আপনারা নিজেরাই এমন প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, আমার এতে কোন আগ্রহ ছিল না, এখনও নেই।'

সুভাষচন্দ্র যখন দেখলেন দীপা নরম হবার পাত্রী নয় তখন দেখি কি করা যায় গোছের কথা বলে বিদায় নিয়েছিলেন। হোস্টেলে নিজের খাটে শুয়ে দীপা নিঃসাড়ে হাসল। যতই সে ভাবুক অতীত ভুলে গেছে, তার বিবাহিত দুদিনের স্মৃতি কি তাকে চিরকাল এভাবে বিব্রত করে যাবে? তার মনে হল সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা হয়ে গেলে সে রক্ষা পেতে পারে। সুভাষচন্দ্রের মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি সে। চারপাশের আত্মীয়স্বজনের অর্থনৈতিক অবস্থা এত খারাপ যে তাঁরা কিছু চাইলে সরাসরি না বলা মুশকিল হয়ে ওঠে। ওই সম্পত্তিটাকে ওঁরা পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা বলে মনে করছেন। যদি সম্পত্তি না থাকত, যদি দীপা নিজের পরিশ্রম এবং বুদ্ধিতে খুব বিত্তশালী হয়ে উঠত তাহলেও ওঁরা একইভাবে সাহায্যের জন্যে আসতেন। মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের কোনকালেই বিনাশ্রমে পাওয়ার লোভ দূর হবে না। হঠাৎ ভাবনাটা মাথায় এল। প্রতুল বাঁড়ুয্যের ভাই-এর ছেলে সুভাষচন্দ্রকে বলেছেন ওইসব সম্পত্তিতে তাঁর আগ্রহ নেই। বংশের সূত্র ধরলে তিনিই প্রকৃত উত্তরাধিকারী। দীপা দু-রাতের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সেই উত্তরাধিকার অর্জন করতে বাধ্য হয়েছে। সে যদি ভদ্রলোককে সমস্ত দাবি লিখিতভাবে প্রত্যাহার করে অনুরোধ জানায় তিনি তাঁর ইচ্ছেমতন বিলিব্যবস্থা করুন তাহলে আর এইসব অনুরোধ-উপরোধের মুখোমুখি হতে হবে না দীপাকে। কিন্তু ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা সে জানে না। শুধু রায়কত পাড়ার কথা মনে আছে। দীপার মনে পড়ল রায়কত পাড়ায় তার এক সহপাঠিনী থাকত। প্রতুলবাবুর দাদা তো জেলার নামকরা কংগ্রেস নেতা। তাই সেই সহপাঠিনীকে লিখলে নাম ঠিকানা পেতে অসুবিধে হবে না। যেন মাথার ওপর থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গেল এমন একটা অনুভূতি হচ্ছিল দীপার।

দুদিন বাদে বিকেলে, হোস্টেলে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল দীপা এমন সময় খবর এল তার ভিজিটার এসেছে। নিচে নেমে দেখল শমিত আর একজন ভদ্রলোক।

শমিত ওকে দেখেই বলল, 'কি ব্যাপার, একদম ডুমুরের ফুল, মায়ার কাছেও খবর পাচ্ছি না। আমাদের একদম ত্যাগ করলে?'

শমিতকে দেখামাত্র কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাব চলে এল শরীর এবং মনে। যেন একটা ভারি কিছু হঠাৎই ঝুলে পড়ল সেখানে। সে হাসার চেষ্টা করল, 'তা কেন? অসুখের জন্যে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলাম, তাই— ।'

শমিত বলল, 'আগে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ করো। ইনি আমাকে খুঁজে বের করেছেন তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে।'

দীপা ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। শমিত যখন নিয়ে এসেছে তখন নিশ্চয়ই আনার পেছনে যুক্তি আছে। সে বলল, 'বলুন।'

ভদ্রলোক দুহাত জড়ো করে নমস্কার করলেন, 'আমাকে সুবিনয় সেন পাঠিয়েছেন। উনি চেষ্টা করেও অনেকদিন যোগাযোগ করতে পারেননি। উনি আপনার সিদ্ধান্তের জন্যে এখনও অপেক্ষা করছেন।'

দীপা মাথা নাড়ল, 'না। সিনেমায় অভিনয় করার কোন বাসনা আমার নেই।'

ঠোঁট কামড়ালেন ভদ্রলোক, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারণটা জানতে পারি?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।'

ভদ্রলোক যেন স্বস্তি পেলেন। তিনি বারংবার দীপার মুখ শরীর দেখছিলেন। এবার ঘরে দাঁড়িয়ে তিনি শমিতকে বললেন, 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আসলে সুবিনয়বাবু এত ব্যস্ত হয়েছিলেন যে আমাকেই আসতে হল। আসলে উনি বোঝেন না ভদ্রঘরের সব মেয়েই যে ফিল্মে অ্যাক্টিং করার সুযোগ পেলেই চলে আসবে তা নয়। আপনাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। চলি।'

ভদ্রলোক চলে গেলে শমিত হাসল, 'ব্যাপারটা লক্ষ করলে?'

'কি ব্যাপার?' দীপা এত সহজে নিষ্কৃতি পয়ে খুশী হয়েছিল।

'সুবিনয়বাবুর আগামী ছবির প্রযোজক যেন তোমার না শুনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। একটু আগে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় উনি বলেছিলেন এত টাকা খরচ করে ছবি তৈরী হবে, নতুন নায়ক নায়িকা নিলে বেশ ঝুঁকি হয়ে যায়। নেহাত সুবিনয়বাবু খুব নামজাদা পরিচালক তাই তিনি কিছু বলতে পারছেন না। নইলে সুচিত্রা সেনকে নেওয়া পাকা হয়ে গিয়েছিল।'

দীপার মুখে রক্ত জমল, 'যাঃ। যে চরিত্রে আমায় ভেবেছে সেই চরিত্রে উনি করবেন কি করে? মানাবেই না। উনি আমার থেকে কত বড়।'

শমিত মাথা নাড়ল, 'ওটা ফিল্ম লাইন। চল্লিশ বছরেও নায়ক নায়িকা কলেজের ফার্স্টইয়ারের ছাত্রছাত্রী হয়। নাটকে তো আকছার। সেদিন কম্বাইন শো বিষবৃক্ষের বিজ্ঞাপন দেখলাম। কুন্দনন্দিনীর চরিত্রে পঞ্চান্ন বছরের এক বৃদ্ধ নায়িকা নামছেন। অতএব সব হয়। কিন্তু তুমি করছ না বলে প্রযোজক যেন বেঁচে গেলেন।'

'বেঁচে গেলেন!'

'হুঁ। তাঁর আর কোন ঝুঁকি রইল না।'

'আমি করলে ঝুঁকি হতো?'

'হতো না! তোমাকে কে চেনে? এক পয়সাও টিকিট বিক্রী হতো না তোমার নামে। লোকে অন্য কারণে হলে এসে তোমার অভিনয় দেখে ভাল লাগলে তোমাকে নিয়ে কথাবার্তা বলতো। না লাগলে তোমার কপাল পুড়লো। সবাই বলত তোমার জন্যেই ছবি ফ্লপ করেছে। যাক, ছেড়ে দাও এসব কথা।'

'না, দাঁড়ান। আপনার মনে হয়েছে লোকটি আমায় অবহেলা করল?'

'অবহেলা করেছে কিনা জানি না তবে বেঁচে গিয়েছে। ভাবখানা দেখে তাই তো মনে হল।' শমিত হাসল।

দীপা আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তোমার শরীর কেমন আছে? বেশ রোগা হয়ে গিয়েছ।'

'ভালই তো আছি। আচ্ছা, সেই ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের কোন খবর পাওয়া গেল? আমি মানিকতলায় একটা হোস্টেলের খবর পেয়েছি কিন্তু ওখানে কোন সিট খালি নেই।'

'তুমি কবে থেকে যেতে চাও?'

'এমন করে বলছেন যে এখনই যেতে পারি?'

'আমি বলে রেখেছি। মাস তিনেক বাদে একটা সিট খালি হবে বাগবাজারের একটা হোস্টেলে। ওখানকার ব্যবস্থা খুব ভাল।'

'আমি কিন্তু চাকরি করি না।'

'চাকরির সংজ্ঞা কি? তুমি তো টিউশনি করেও রোজগার কর। আর এ নিয়ে ওরা

কোন কড়াকড়ি করবে না। হোস্টেলের কিছু স্বাভাবিক নিয়ম আছে। এক মাস ওরা দেখবে তুমি সেই নিয়ম মেনে চলছ কিনা। তারপর বোর্ডার হিসেবে পার্মানেন্ট করে নেবে।' শমিত বলল।

'আপনি আমার একটা বড় উপহার করলেন।'

'তুমি আমাকে না বললে করতাম না।'

'ঠিক হল না। ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের প্রস্তাব আপনিই দিয়েছিলেন।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো।' বলেই হাসতে শুরু করল শমিত। দীপাও সেই হাসিতে যোগ দিল। এটা এল খুব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই। হাসি থামলে দীপা বলল, 'আপনাকে আর একটা উপকার করতে হবে আমার।'

'শোনা যাক।'

'আজ কি রিহার্সাল আছে আপনার?'

'কেন বলতো?'

'জিজ্ঞাসা করছি।'

'রিহার্সাল নেই। তবে গ্রুপে যাব। সাতটা নাগাদ যাওয়ার কথা।'

'তাহলে এখনও অনেক সময় আছে। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

'কোথায়?'

'সুবিনয় সেনের বাড়িতে।'

'সে কি? সেখানে যাবে কেন?'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

'আশ্চর্য। সেটা ওই ভদ্রলোককে বলে দিতে পারতে।'

'ওঁকে তো বলার নয় কথাগুলো।'

'দ্যাখো দীপা, আমি সুবিনয় সেনের বাড়ি চিনি না। খোঁজ করে বের করতে হবে। আজ না গিয়ে কাল যদি যাও তাহলে ভাল হয়।'

'না, আজই। কাল গেলে ব্যাপারটার গুরুত্ব থাকবে না।'

'বেশ চল। স্টুডিও পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করতে হবে।'

'আমি আপনার বেশ অসুবিধে করলাম—।'

'দীপা, দূরত্ব নিয়ে কথা বললে আমাকে অনুরোধ করো না।'

সুবিনয় সেনের বাড়িতে যেতে হল না। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ঢুকে শমিত এবং দীপা এক ঝাঁক দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীদের দেখতে পেল। সবাই এমন ভাবভঙ্গী করছেন যেন সবে মর্তে পা দিয়েছেন। গেটে দারোয়ানকে সুবিনয় সেনের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল শমিত। জেনেছিল তিনি এই স্টুডিওতে একটা অফিসঘর ভাড়া নিয়ে রোজ সন্ধে ছটা অবধি কাজ করেন।

দোতলা বাড়ির একতলায় সুবিনয় সেনের অফিস। বাইরে নেমপ্লেট এবং পিওন আছে। দেখা করতে চায় জেনে সে জেরা করতে লাগল। ফিল্মে নামতে চাইলে সেনসাহেব দেখা করবেন না। এইসময় একটি লোক দীপাকে দেখে এগিয়ে এল, 'আরে আপনি! আসুন আসুন, দাদার সঙ্গে দেখা করতে চান?'

ওরা চিনতে পারল। সুবিনয় সেনের সহকারী ইনি, শো দেখতে গিয়েছিলেন।

পিওন আর কথা বাড়াল না।

সুবিনয় সেন একজনকে কিছু বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ ওদের ঢুকতে দেখে চোখ ছোট করলেন, কথা থামালেন। সহকারী তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে পরিচয় দিতেই তিনি সামনে বসা লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে ওদের বসতে বললেন, 'বলুন কি ব্যাপার?'

দীপা চেয়ারে বসে বলল, 'আজ এক ভদ্রলোক আমার কাছে গিয়েছিলেন, বোধহয় আপনার ছবির তিনি প্রযোজক—'।

'হ্যাঁ। উনি আমাকে এসে বলেছেন আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের কথা। কিন্তু ওঁকে তো আপনি জানিয়েই দিয়েছেন, তারপর—। আপনি কি মত পরিবর্তন করেছেন?'

'আমি আপনার কাছে একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি।'

'কি ব্যাপার?'

'দেখুন, এখন এই মুহূর্তে আমার পক্ষে পড়াশুনা ছাড়া আর কিছু করা একেবারেই অসম্ভব। আমাকে রেজাল্ট ভাল করতেই হবে।'

'তা করুন। তবে থিয়েটার করলে রেজাল্ট ভাল থাকবে আর ফিল্ম করলে খারাপ হয়ে যাবে এটা আমি মেনে নিতে পারছি না। তাছাড়া আপনার অভিনয় দেখার পর আমি কয়েকজন সাংবাদিককে বলি যে পরের ছবিতে নতুন মেয়েকে নায়িকা করব। বুঝতেই পারছেন এ নিয়ে এখন কথা হবে।'

'পরীক্ষা পর্যন্ত আমি নাটকও করছি না।'

'বলুন, আপনার অনুরোধ কি?'

'পরীক্ষার পরে যদি আমাকে একটা সুযোগ দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

শুধু সুবিনয় সেনই নন শমিত পর্যন্ত চমকে উঠল। ও যে এই কথা বলতেই এতদূরে আসতে পারে এমন ভাবনা শমিত ভাবতেই পারেনি।

'তুমি বলছি', সুবিনয় সেন বাঁ হাতে চশমা খুললেন, 'তুমি তো ফিল্মে অভিনয় করতে চাও না, তাহলে আর পরীক্ষার পরে আসতে চাইছ কেন?'

'প্রথমে বলুন, একবছর বাদে আপনি আমাকে সুযোগ দিতে পারেন কিনা। তাহলে আমি আমার কথা বলব।

'দিতে পারি না বলব না, পারি তাও না। সামনের বছর যে ছবি করব সেখানে তোমার বয়সী কোন মেয়ের ভূমিকা নাও থাকতে পারে।

'এই ছবিতে এখন যিনি আমার ভূমিকায় করবেন তাঁর বয়স কত?'

'ও হো! তুমি বড্ড বেশী কথা বল। একজন বড় অভিনেত্রী জানেন বেমানান-বয়সী কোন চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে কি করতে হয় যাতে দর্শক তাঁর অভিনয়টাই দেখবে বয়সটা বিচার করবে না। এটা করতে গেলে অভিজ্ঞতা দরকার হয়। তবে, একথা বলছি, যদি ঠিকঠাক চরিত্র পাই, যদি প্রযোজক আমার বিরোধিতা না করেন তাহলে তোমার কথা নিশ্চয়ই ভাবব। সেদিন তোমার অভিনয় ভাল লেগেছিল, শুধু এই কারণেই ভাবব।'

'এতেই হবে। আজ আপনার এই ছবির প্রযোজক গিয়েছিলেন আমার কাছে। আমি করব না শুনে তিনি যেন নিষ্কৃতি পেলেন। নতুন একজনকে নিয়ে ছবি করার ব্যাপারে ওঁর অনাগ্রহ হয়তো স্বাভাবিক কিন্তু আমি একটি ছবিতে অভিনয় করে প্রমাণ করতে চাই যে আপনি ভুল নির্বাচন করেননি।'

'মনে হচ্ছে ওঁর ব্যবহারে তুমি একটু ধাক্কা খেয়েছ। গুড। মানুষের যদি আত্মসম্মানবোধ না থাকে তাহলে সে কিসের মানুষ। আর শিল্পীর তো সেটা আরও বেশী থাকা উচিত। আমি মনে রাখব তোমার কথা। তুমি তোমার পরীক্ষা শেষ হলেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ

ক'রো।'

সুবিনয় সেনের অফিস থেকে বেরিয়ে স্টুডিওর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা একটাও কথা বলল না। স্টুডিওর বাইরে এসে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে শমিত মুখ খুলল, 'আমি এমন অবাক খুব কম হয়েছি।'

'ওমা, কেন?'

'তুমি যে এই কথা বলতে আসবে কে জানত!'

'আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কেউ আমায় উপেক্ষা করছে দেখলে আমি স্থির থাকতে পারি না।'

'বাঃ, তাহলে কাজ হাসিল করতে হলে তোমায় উপেক্ষা করতেই হবে।

'ড্যাট, ইয়ার্কি হচ্ছে!'

'তবে তুমি অতবড় একটি নামী মানুষের সঙ্গে যেভাবে কথা বলে গেলে তা অনেক ছেলে পারত না।' শমিত দেখল দূরে বাস আসছে, 'চল, ওঠা যাক, রিহার্সাল না থাকলেও তো যেতে হবে।'

বাসটি এসপ্লানেড পর্যন্ত এল। শমিত ঘড়ি দেখল, এখনও কিছুটা সময় আছে। জিজ্ঞাসা করল, 'চা খাবে? খিদে পেয়েছে।'

'আমি খাওয়াবো।'

'কারণ?'

'কোন কারণ নেই।'

ধর্মতলা স্ট্রীটের মুখটায় একটি বাঙালি-রেস্টুরেন্টে ঢুকল ওরা। বেশ ভিড়। দোতলায় জায়গা মিলল। এখানে মিষ্টি খুব বিক্রী হয়। ওরা নোনতা আর চা বলল। শমিত মিষ্টি খেতে চাইল না। ছোট টেবিলে মুখোমুখি বসে শমিত বলল, 'ভুল করেছি। তোমাকে অবহেলা করে কিছু বললে অন্তত পরীক্ষার পর নাটক করতে। জানা ছিল না তাই ভুলটা হল।'

দীপা চোখ তুলে উজ্জ্বল হাসল। তারপর বলল, 'এই যে তুমি দিনরাত নাটক নিয়ে থাকো, তোমার অ্যাম্বিশন ভাল নাটক করা এটাই তোমাকে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করেছে। স্বপ্নেও তুমি নাটকের ছবি দ্যাখো, না?'

'এটা নিন্দে না প্রশংসা বুঝতে পারছি না।'

'মানে?'

'হঠাৎ তুমি বলতে আরম্ভ করলে?'

দীপা জিভ বের করল, মাথা নাড়ল শমিত, 'দয়া করে আর আপনি বলো না। তাহলে সেটাই প্রমাণ করবে তুমি আমার নিন্দে করছিলে।'

দীপা আর কথা বলল না। খাবার এলে চুপচাপ খেতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে ওরা যখন চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছে তখন শমিত বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি না জেনে বিরাট একটা অপরাধ করে ফেলেছ।'

'না, তা কেন?' দীপা ওপর থেকে নিচের কাউন্টারের দিকে তাকাল।

'তাহলে এমন মুখ করে আছ কেন? আমাকে বন্ধু ভাবতে পার না?'

'ভাবি না কে বলল?'

'কি আনন্দ!'

'শুধু ইয়ার্কি!'

'কি রকম বন্ধুত্ব বল। ইয়ার্কি তো আসবেই। আমি কেরিয়ারের কথা না ভেবে আজ নাটক নিয়ে পড়ে থাকতে চাই। এতেই আনন্দ পাই। সুদীপ ইংরেজিতে এমে করছে, কলেজে পড়াবে। সেইসঙ্গে নাটক। অর্থাৎ পাশাপাশি অন্যকিছু ভাবছে। আমাকে মা মাসীরা বাউণ্ডুলে বলেন। এক কাকা ঘোষণা করেছেন যে আমার ভবিষ্যৎ ঝরঝরে। আর তুমি সিরিয়াসলি পড়াশুনা করে কেরিয়ার তৈরী করতে চাও। আই এ এসে বসতে যাচ্ছ। জিরো আর একশ'তে বন্ধুত্ব হল। দুটোতেই অবশ্য জিরো আছে, অবস্থান এদিক ওদিক।'

'এতে তোমার আফসোস হচ্ছে?'

'নাঃ। যাই বল, পাওয়াটাই বড় কথা, কতটা পাচ্ছি সেই বিচার করতে গেলে কষ্ট বাড়ে। আমি যেচে কষ্ট পেতে রাজি নই?'

'আর যার ওপর কষ্ট চাপিয়ে দেওয়া হয়? অনবরত যার ওপর কষ্টের বৃষ্টি হচ্ছে আর যে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে তার আড়ালে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে তাকে কি বলবে?'

'আমি জানি।'

'কি জানো? চমকে যেও না, তুমি জানো, আমি বিধবা?'

'এটাকে কি তুমি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করো?' শমিত গম্ভীর হল।

'মানে!' দীপা অবাক হয়ে গেল।

'তোমার সমস্ত ঘটনা আমি মায়ার কাছে শুনেছি। বিধবা বলে ঘোষণা করলে অনেকের কৌতূহল থেকে আড়াল নিশ্চয়ই করতে পারো। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতো, তুমি নিজেকে বিধবা ভাবো?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দীপা মাথা নাড়ল, না।

'তাহলে? কথাটা আমাকে শোনালে কেন? শুনে আমি তোমার সঙ্গে আর মিশতে চাই কিনা পরীক্ষা করতে?'

'যদি বলি তাই!'

'তাহলে ভুল হয়েছে তোমার।'

'আর পাঁচটা অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে আমার কোন মিল নেই!'

'সেটা তোমার আচরণে বোঝা যায়!'

'তার মানে?'

'ওরা কেউ তোমার মত প্রতিবাদী নয়। বোধহয় এই কারণেই নাটক করবে না জানার পরেও আমি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারিনি।'

চা এল। ওরা চুপচাপ খেল। দীপাকে দাম দিতে দিল শমিত। বাইরে বেরিয়ে এসে শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি হোস্টেলে যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ট্রামে ওঠো। আমি বাস ধরি। আর বেশী সময় নেই।'

'ঠিক আছে। তুমি এগোও, সামনেই তো ট্রাম গুমটি, আমি উঠে যাবো। তোমাকে সময় নষ্ট করতে হবে না।' দীপা হাসল।

'কবে দেখা হবে?'

'টিউশনির দিনগুলোর বাইরে হোস্টেলেই থাকব।'

'কি হয়েছে তোমার? এমন গম্ভীর হয়ে কথা বলছ?'

'কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল আজ। ভাবনাটাবনাও যেন আচমকা হাতের বাইরে

চলে যাচ্ছে। কিছু নয়, সামলে নেব।' দীপা কথা শেষ করা মাত্র একটি মেয়েলি গলা ভেসে এল, 'আরে, দীপাবলী না ?'

ওরা দুজনেই মুখ ফিরিয়ে দেখল এক মধ্যবয়সী মহিলা এগিয়ে আসছেন। তাঁর হাতে সদ্য কেনা জামাকাপড়ের প্যাকেট। দীপার গলা একদম পাল্টে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ওমা, আপনি। এখানে!'

'আমি তো এখন কলকাতায়।' কাছে এসে হাত ধরলেন মহিলা।

শমিত বলল, 'তাহলে আজ আমি চলি দীপা।' শমিত দাঁড়াল না। দীপা তার চলে যাওয়া দেখল। এভাবে না গেলে সে আলাপ করিয়ে দিত। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে দীপাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছেন, 'তুই কি বড় হয়ে গেছিস।'

দীপা ওঁর মুখের দিকে তাকাল। রমলা সেনের সিঁথিতে সিঁদুরের লম্বা দাগ।

॥ ৪৯ ॥

ও মা, তুই কত বড় হয়ে গেছিস, একদম লেডি।' বলতে বলতে একহাতে এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন রমলা সেন যে দীপার কান লাল হয়ে গেল। সে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে বলল, 'বাঃ, চিরকাল ছোট থাকব নাকি ?'

রমলা সেন যেন কথাগুলো শুনলেনই না। দীপাকে বুকে টেনে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলে যাচ্ছিলেন, 'কতদিন বাদে তোকে দেখলাম। সত্যি, ভাবতেই পারিনি তোকে এভাবে দেখতে পাব। কি মিষ্টি দেখতে হয়েছিস তুই।'

কথাগুলো মোটেই নিচু গলায় ছিল না। ফুটপাতে যাতায়াত করা মানুষজন, হকাররা তার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকাচ্ছে। যেন মজার দৃশ্য দেখছে সবাই। কোনমতে রমলা সেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দীপা বলল, 'আপনি এখানে ?'

'বাজার করতে এসেছিলাম। এদিকে তো বেশী আসি না তাই গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, ভাগ্যিস এলাম তাই তোকে দেখতে পেলাম। তুই কবে কলকাতায় এলি ?'

'অনেকদিন। কলেজে পড়ছি।'

'তাই নাকি ? কি ভাল। কোন কলেজ ?'

'স্কটিশ চার্চ। হোস্টেলে থাকি।'

'ও, তাই কলেজ ফাঁকি দিয়ে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?'

'বয়ফ্রেন্ড ?'

'ওই যে, একটা ছোকরা আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে গেল!'

'ও শমিত। বয়ফ্রেন্ড হতে যাবে কেন ?'

'আরে ছেলেবন্ধু তো বাবা। কোন ইয়ার ?'

'এবার ফাইন্যাল।'

'এদিকে সরে আয়, এখানে বড় লোক যাচ্ছে', হাত ধরে টেনে একপাশে সরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, রমলা সেন, 'বাবা মা কেমন আছেন ?'

'বাবা নেই। হার্ট অ্যাটাকে— ।'

'সেকি। কবে ?'

'একবছর হয়নি।'

'বেশী বয়স তো নয়। আহা, মানুষটার কথা কোনদিন ভুলব না আমি। ইস্। মনে

আছে, জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি খারাপ হলে ওঁর সাইকেলে চেপে তোদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। নিয়ে তো গিয়েছিলেন অত রাত্রে। তুই অবশ্য তখন এই এতটুকুনি ছিলি।' হাত দিয়ে নিজের হাঁটুর মাপ দেখালেন তিনি।

'অসম্ভব ! আমার সব কথা মনে আছে।'

'মনে আছে ?'

'স্পষ্ট।'

রমলা সেন একটু উদাস হলেন, 'কি সব দিন ছিল রে। কি ডানপিটে মেয়ে ছিলাম তখন। একেই বলে বয়স, বুঝলি। চল তুই আমার সঙ্গে।'

'কোথায় ?'

'বললাম না বাজার করতে বেরিয়েছি !' রমলা সেন ওর হাত ধরে হাঁটা শুরু করলেন। ধর্মতলার মোড়ের বাস ট্রাম গাড়ির স্রোতে একটু ভয় পেয়েই দীপা বলল, 'হাত ছাড়ুন নইলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে।'

রমলা সেন হাত ছাড়লেন। চালচলন, কথাবার্তায় রমলা সেন আর আগের মত নেই। ছটফটানি এমনভাবে আগে ছিল না। তার চেয়ে বড় কথা ইনি বিয়ে করেছেন। সেই রমলা সেন যিনি বাংলাদেশের সমাজকে অস্বীকার করে বন্ধুর সঙ্গে বাস করতে ইচ্ছুক ছিলেন বলে একসময় দীপার মনে বিভ্রম এসেছিল। সে কৌতূহল চেপে না রেখে বলল, 'আপনি বিয়ে করেছেন ?'

'হ্যাঁরে, করে ফেললাম। এখন তো আর বাচ্চাকাচ্চা হবার ঝামেলা নেই।' যেন এটাই বিয়ে করার একমাত্র যুক্তি এমন গলায় কথাগুলো বললেন তিনি। হাঁ হয়ে গেল দীপা। যে রমলা সেন নারী স্বাধীনতার কথা বলতেন, যিনি মনের চারপাশে চাপানো বেড়ায় বিশ্বাস করতেন না, সেই রমলা সেন বলছেন বাচ্চা হবার সময় পেরিয়ে গিয়েছে বলে বিয়ে করলেন ! দীপার রাগ হল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বুঝি বাচ্চাকাচ্চা একদম ভাল লাগে না ?'

'কে বলেছে ? খুব ভালবাসি। বাচ্চা আর ফুল কে না ভালবাসে।' বলেই একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা নিউ মার্কেটটা এদিকে, না ?'

লোকটা মাথা নাড়লো। রমলা সেন হাঁটতে হাঁটতে মন্তব্য করলেন কলকাতার রাস্তার মানুষ মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেলেই কেমন বর্তে যায়। যত্তসব !'

'আপনি কি এখন কলকাতায় ?'

'হ্যাঁ। ও তো এখানেই চাকরি করছে। আমিও এসেছি ইন্টারভিউ দিতে। চাকরি হয়ে গেলে এখানেই পাকাপাকি থেকে যাব।'

'সেকি ? আপনি বিয়ের পরেও শিলিগুড়িতে আছেন ?'

'বিয়ের পর ? দুর ! বিয়ে তো হয়েছে পরশুদিন। তারপর আর যাওয়ার সময় পেলাম কোথায় ! ওহো, তোকে তো বলিইনি, আমরা পরশুদিন বিয়ে করলাম।'

হনহনিয়ে হাঁটছিলেন রমলা সেন। তাজ্জব হয়ে গেল দীপা। সেই সঙ্গে মজাও লাগছিল, 'পরশু বিয়ে হলে আজ ফুলশয্যা হওয়া উচিত।'

'আর জ্বালাসনে। ফুলশয্যা ! আমার ওসব আসে টাসে না। সই করলাম, বিয়ে হয়ে গেল, আর আমার কোন দায় নেই। তবে সকালে যখন মনে করিয়ে দিল তখন ভাবলাম আমার উচিত কিছু দেওয়া। ধুতি পাঞ্জাবি কিনেছি, বাকিগুলো মার্কেট থেকে কিনব। মুখে যাই বলুক স্বভাবে একদম ভেতো বাঙালি ; বুঝলি ?'

দীপা সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, শিলিগুড়িতে যাকে দেখেছিলাম আপনার বাড়িতে—, মানে— ।'

'সুধাময় ?'

'হ্যাঁ, ওঁকেই বিয়ে করেছেন তো ?'

'আর কাকে করব ? ঘাড় থেকে নামলে তো ! যখন আমার বন্ধুত্ব করার শখ ছিল তখন যা বলতাম তাই শুনতো । ইদানীং দেখছিলাম বাবু উড়ু উড়ু করছেন । কথা বললে কানে যায় না । তাই বিয়ে করে ফেললাম ।'

এটা বিয়ে করার পক্ষে দ্বিতীয় যুক্তি ! দীপার সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল । একজন ওই চরিত্রের মহিলা, যাঁকে সে একসময় আদর্শ করতে চেয়েছিল, তিনি এমন পাল্টে যান কি করে !

নিউ মার্কেটে ঢুকে রমলা সেন দাঁড়িয়ে গেলেন, 'দ্যাখ, দীপাবলী, এইসব দোকানপাট দেখলে মন খুব ছোট হয়ে যায়, বুঝলি !'

'কেন ?'

'মনে হয় সব কিনে ফেলি । অথচ কেনার পয়সা নেই । কিছু লোকের পয়সা আছে, আমার নেই । তখনই ঈর্ষা হয় আর মনটা এইটুকুনি হয়ে যায় ।' রুমালে মুখ মুছলেন তিনি, 'সুধাময়টা কিন্তু লোক ভাল, কোন চাহিদা নেই ।'

'এই একটু আগে অন্য কথা বললেন !'

'কি বললাম ?'

'ওই আপনার কাছ থেকে চলে যেতে চাইছিলেন !'

'ওমা, কখন বললাম ?'

'বললেন না উড়ু উড়ু স্বভাব হয়েছিল !'

'হ্যাঁ, তাই বলে চলে যেতে চাইছে বলেছি নাকি ? ধম্মোকম্মে মন যাচ্ছিল । কোথাকার কোন গুরুদেবের পাল্লায় পড়েছিল । আমায় বলছিল দীক্ষা নিতে । আমারও দোষ, বাড়িতে যেমন কুকুর বেড়াল কিংবা গোপাল থাকে আমিও ভেবেছিলাম ও তো আছেই । তলায় তলায় ঠাকুর দেবতা কিংবা গুরুদেব প্রতি আকর্ষণ বাড়া মানে আমার ওপর টান কমে যাওয়া । সেটা হতে দেব না বলেই বিয়ে করলাম ।'

কি বলবে বুঝতে পারল না দীপা ।

রমলা সেন খোঁজ করে করে ছেলেদের আন্ডার গার্মেন্টদের দোকানে পৌঁছে বললেন, 'চারটে আন্ডারওয়্যার আর চারটে গেঞ্জি দিন ।'

দীপা মনে মনে হোঁচট খেল । ফুলশয্যায় কোন স্ত্রী কি তার স্বামীকে এমন উপহার দেন ! ও মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না ।

সেলসম্যান জিজ্ঞাসা করল, 'দিদি, সাইজটা বলুন ।'

'সাইজ !' চোখ বন্ধ করলেন রমলা সেন কিছুক্ষণ, তারপর চোখ খুলে বললেন, 'এই, তুই তো সুধাময়কে দেখেছিস, কত সাইজ হবে বল তো ?'

দীপা চমকে উঠল । রমলা সেনের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে !

সে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দোকানের দিকে তাকাল, যেন কথাগুলো শোনেইনি । সেলসম্যান বলল, 'যার জন্যে কিনছেন তার বয়স কত বলুন আমি আন্দাজে সেপ বলছি ।'

'বয়স বললে কিছু হবে না ।' রমলা সেন মাথা নাড়লেন । 'এই রোগা, ফিনফিনে কিন্তু বেশ লম্বু । মহা জ্বালা । ছেলেদের এসব জিনিস মেয়েরা কি কিনতে পারে ?'

'দিদি, আমি আপনাকে কয়েকটা সাইজ দেখাচ্ছি, আপনি ঠিক করুন কোনটা নেবেন।' প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে পছন্দ চলল। তারপর দাম মেটালেন রমলা সেন। দীপাকে বললেন, 'বড় হলে হবে, নিজে এসে পাল্টাবে, আমি আর আসতে পারব না। চল রে। ওদিকে যাই।'

দীপা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নিউ মার্কেটের সরু গলিতে হাঁটতে হাঁটতে রমলা সেন আবার থমকে দাঁড়ালেন, 'আয় এই দোকানে।' জবাবের অপেক্ষা না করে তিনি যেটায় ঢুকলেন সেটা শাড়ির দোকান। দীপা স্বস্তি পেল। এখানে অস্বস্তিকর কিছু ঘটবে না।

চারটে শাড়ি দেখলেন রমলা সেন। সেলসম্যান আরও ডজনখানেক নামাতে চাইছিল কিন্তু তিনি ধমক দিলেন, 'অত খাটতে কে বলেছে আপনাকে? পঞ্চাশটা শাড়ি দেখালে আমার মাথা ঠিক থাকবে? এই চারটের মধ্যেই নেব।'

সেলসম্যান মিনমিন করল, 'মেয়েরা তো অনেক শাড়ি দেখতে চান!'

'কেনেন কটা?'

'একটা দুটো।'

'তাহলে বুঝুন, আপনি কেমন বোকা। ওদের সময়ের দাম নেই তাই এখানে এসে খেলা করে আর আপনি গদগদ হয়ে সেই খেলায় সাহায্য করেন। এই দীপা, এদিকে আয়, বল তো এই চারটের মধ্যে কোন শাড়িটা ভাল।'

'আপনার জন্যে?'

'কার জন্যে তা নিয়ে তোর দরকার কি? ভাল তো সবসময় ভালই থাকবে।'

দীপা চারটের মধ্যে একটার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'এইটে।'

দাম মিটিয়ে প্যাকেট নিয়ে রমলা সেন বললেন, 'চল কোথাও বসে চা খাই।' বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে এর মধ্যে। দীপা বলল, 'আপনার সঙ্গে যখন দেখা হল ঠিক তখনই আমরা চা খেয়ে বের হলাম।'

'একটা উটকো ছেলের সঙ্গে বসে তুই চা খেলি?'

'উটকো ছেলে!'

'নিশ্চয়ই। তোর বয়ফ্রেন্ড যখন নয় তখন উটকো বটেই। শোন দীপা, এইসব ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবি না। তোর হোস্টেলটা কোথায় বল তো?'

দীপা ঠিকানা দিল। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত সঙ্গে এলেন রমলা সেন। এসে বললেন, 'এক রবিবার দেখে তোর ওখানে হাজির হব। ভালভাবে থাকবি। মন দিয়ে পড়াশুনা করবি। আর মতলববাজ ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশবি না।'

দীপা ঘাড় নেড়ে দেখল একটা দু'নম্বর বাস আসছে। সে বলল, 'চলি।'

'আচ্ছা, এইটে ধর। তোর জন্যে নিয়েছি।'

হাঁ হয়ে গেল শাড়ির প্যাকেটটা দেখে। রমলা সেন জোর করে সেটা ধরতে বাধ্য করলেন। দু' নম্বর বাস ঠিক তখনই এসে দাঁড়াল পাশে। রমলা সেন বললেন, 'এটা আমাদের বিয়ের উপহার, তোকে। যা পালা।' বলে নিজের বাস ধরতে হাঁটা শুরু করলেন।

লেডিস সিট খালি ছিল। সিটে বসে হতভম্ব হয়ে রইল দীপা বেশ কিছুক্ষণ। রমলা সেন যে তার জন্যে শাড়ি কিনবেন তা সে একবারও বুঝতে পারেনি। তড়িঘড়িতে প্যাকেট গছিয়ে দিলেন কিন্তু এখন তার একটুও ভাল লাগছে না। যে রমলা সেন তাকে একদা কিছু বই পাঠিয়েছিলেন সেই রমলা সেন এখন আর নেই। তখন বই নিতে ভাল লেগেছিল।

কিন্তু এখন শাড়ি নিতে মন চাইছে না। উনি এমন বদলে গেলেন কি করে ? দীপার মনে পড়ল কোথায় যেন সে পড়েছিল ঠিক সময়ে বিয়ে না হলে মেয়েরা বয়স চলে গেলে একটু অস্বাভাবিক হয়ে যায়। বিয়ে না হলেও ওঁর তো বন্ধু ছিল, প্রায় বিয়ের মতনই দীপা মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। সে শাড়িটাকে আলতো করে ধরেছিল। যতই অন্যরকম হয়ে যান শাড়িটা দেবার সময় রমলা সেনের গলায় এবং মুখে একটা স্নিগ্ধ স্নেহ উপচে পড়ছিল। অনেক অনেকদিন সে তার স্পর্শ পায়নি। দোটানা বোধহয় সেই কারণেই।

একই সঙ্গে আই এ এস এবং গ্রাজুয়েশনের জন্যে তৈরী হল দীপা। নাটকের দলের সঙ্গে তার আর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। প্রথম কয়েকবার ওদের শো-এর সময়ে সে হাজির থেকে চলে এসেছে। শমিত মাঝে মাঝে আসে হোস্টেলে। দুচারটে কথা হয়, চলে যায়। কোনদিন সে হোস্টেলে ফিরে শোনে শমিত এসেছিল। নিজে উদ্যোগ নিয়ে দেখা করতে যায় না সে। এই ঘটনাহীন নিস্তরঙ্গ মাসগুলোতে দীপা একদম একা। শুধু মাঝখানে রাধা আর তার দাদা এসেছিল সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে। এমন কি তার স্টোভ কড়াই পর্যন্ত। সেগুলোকে আপাতত দারোয়ানের ঘরে জমা রেখেছে সে। দীপা লক্ষ করেছে তার জীবনে যখন ঘটনা ঘটে না তখন ঘটেই না। কিন্তু ঘটলে অনেকগুলো একই সঙ্গে ঘটে যায়। তখন তার টাল সামলানো মুশকিল হয়ে ওঠে।

দুপুরের ডাকে চিঠি এল। খামে। হাতের লেখা অচেনা। কৌতূহলী হয়ে খুলে প্রথমে সম্বোধন দেখল, 'শ্রদ্ধেয় বউঠান।' চমকে উঠল। তড়িঘড়ি নিচের দিকে তাকাল। অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠিটা পড়ল সে।

'শ্রদ্ধেয়া বউঠান। বিশেষ কারণে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। প্রথমে আমার পরিচয় দেওয়া উচিত। আমি ৺প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদার ছেলে যিনি রাজনীতি করতেন। যতদূর জানি আমার বাবাই আপনার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। আমার বাড়ি রায়কত পাড়ায়। বাবা গত বছর পরলোকগমন করেছেন। কিছুদিন আগে আমাদের পাড়ার একটি মেয়ে আমাকে আপনার কথা বলে। সে নাকি একসময়ে আপনার সহপাঠিনী ছিল। আপনি তাকে চিঠি লিখে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করেছেন। জানি না কি কারণ কিন্তু মনে হল, আপনাকে চিঠি লেখা যায়। কাকাবাবুর মৃত্যুর দিনে আপনাকে শেষবার দেখেছিলাম। বিয়েতে আমি যাইনি, বউভাতে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই আমাকে আপনার মনে রাখার কোন কারণ নেই।

'যাই হোক, কাকাবাবুর বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আমি কোনদিন আগ্রহী ছিলাম না। শুনেছি তিনি সোজা এবং বাঁকা পথে প্রচুর আয় করেছিলেন কিন্তু সেগুলোর কি গতি হয়েছে তাও অজানা। লোকে বলে আপনাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিনি প্রচুর অর্থ দিয়েছেন, আপনার পরলোকগত পিতা সেই অর্থ নিয়েছেন, এ ব্যাপারেও কোন সত্যতা আমার জানা নেই। কাকাবাবুর প্রতি আমি কখনই শ্রদ্ধাশীল ছিলাম না। আমার বাবা কেন অতুলের সঙ্গে আপনার বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন এ প্রশ্ন বহুবার করেও জবাব পাইনি। এই কারণে তিনিও আমার শ্রদ্ধা শেষদিকে পাননি। কাকাবাবুর জীবনযাত্রা, কাকিমার মৃত্যু এসব নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।

হঠাৎ সুভাষচন্দ্র নামে এক ভদ্রলোক জলপাইগুড়িতে আসা যাওয়া শুরু করেছেন কাকাবাবুর বিষয় সম্পত্তির তদারকি করতে। যেহেতু আপনি ওই বাড়ির পুত্রবধূ এবং একমাত্র উত্তরাধিকারিণী তাই আপনার দেওয়া ওকালতনামা নিয়ে তিনি এই কাজ করতে সক্ষম হবেন। লোকমুখে শুনেছি তিনি আমাকে শত্রুপক্ষের মানুষ বলে মনে করেন। আমি

লিখছি, এমন ভাবার কোন কারণ নেই। কাকাবাবুর সম্পত্তির প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। আমার সম্পর্কে শঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই।

কিন্তু কৌতূহল জাগছে। আপনার সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয়েছে কাকাবাবুর পরিবারের সঙ্গে আপনি সব সম্পর্ক ত্যাগ করেছেন। তাহলে কেন এই তৎপরতা ? ধৃষ্টতা হলে তা মার্জনা করবেন। ইতি, অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল দীপা। সে চিঠি লিখে সহপাঠিনীর কাছে এর বিস্তারিত ঠিকানা জানতে চেয়েছিল। কারণ দেখিয়েছিল যে, হাকিমপাড়ার সম্পত্তির বিষয়ে লিখতে চায়। ভদ্রলোক হয়তো তাই শুনেছেন এবং এই চিঠি লিখলেন। সে চিঠির উত্তর লিখতে বসল, 'সুজনেষু, আপনার চিঠি পেয়ে একই সঙ্গে অবাক এবং কিছুটা খুশী হয়েছি। খুশীর কারণটা আগে বলি, আমার সম্পর্কে যা শুনেছেন এবং ভেবেছেন তা অকপটে লিখেছেন। এটা সাধারণত কেউ করে না। অবাক হয়েছি কারণ আপনি যে আমাকে চিঠি লিখবেন তা কখনও ভাবিনি। আমি আমার সহপাঠিনীকে লিখেছিলাম আপনার ঠিকানার জন্যে। কারণ চিঠি আমিই লিখতাম। আপনি চমক দিলেন।

আপনার কাকাবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ইচ্ছে আমার কখনই ছিল না বা তাঁর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আমার নেই। আমার স্বর্গত বাবা তাঁর কাছ থেকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়েছিলেন সেটাও আমার অজানা ছিল। শুনেছি সেই টাকা থেকে আমার পিতাকে কমিশন দিতে হয়েছিল আপনার কাকাবাবুর বন্ধুকে। একথা ঠিক, আমি এখনও ওই টাকায় পড়াশুনা করছি কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আছে স্বাবলম্বী হওয়া মাত্র টাকাটা আমার মাকে ফিরিয়ে দেব। আমি মনে করি আপনার কাকাবাবু তাঁদের ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকাটা দিয়েছিলেন।

আমি মনে করি নিজের পায়ে দাঁড়ানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আমি সেই চেষ্টা করছি। আপনার বাবাকে আমি দোষ দিই না।আমার বাড়ির লোক যদি লোভী না হতেন তাহলে আমার জীবন অন্যরকম হতো। অবশ্য এটাও বলা যায়, তিনি অমন কাজ করেছিলেন বলেই আমি আজ এখানে আসতে পেরেছি। যা হোক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আজকাল একটুও হয় না।

কাজের কথা বলি। আমার আত্মীয়স্বজন যাঁরা অর্থকষ্টে আছেন তাঁরা এসে ভিড় করেছেন আপনার কাকাবাবুর সম্পত্তির জন্যে। আমি এঁদের অনুরোধ শুনতে শুনতে স্থির করলাম কাকার সম্পত্তি যা সামনে এবং আড়ালে আছে তার বিশদ উদ্ধার করে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করব। আমি নিশ্চিত ছিলাম না এই কাজের পূর্ণ অধিকার আমার আছে কিনা। তাই মনে হল আপনার অনুমতি নেওয়া দরকার। যাহোক, আপনার চিঠিতে জানলাম আপনি ওই ব্যাপার বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। জেনে ভাল লাগল।

সবশেষে একটা কথা। শত্রু মিত্র জানি না। ওই চিঠি আপনি লিখেছেন বলে আপনার সম্পর্কে চিরকাল শ্রদ্ধা রাখব। আশা করি এই চিঠি আপনার কৌতূহল মেটাবে। আপনাকে চিঠি লেখার সুযোগ করে দেবার জন্যে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ইতি, শুভেচ্ছা সহ, দীপাবলী বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনশ্চ, আমাকে এখনও এই বন্দ্যোপাধ্যায় লিখতে হচ্ছে কারণ স্কুল ফাইন্যালের সার্টিফিকেটে তাই লেখা আছে।'

চিঠি লিখে বেশ স্বস্তি হল। খামের মুখ সেঁটে হোস্টেলের বাইরের পোস্ট বক্সে ফেলে দিয়ে গেট দিয়ে ঢুকতেই দেখল সুভাষচন্দ্র আসছেন। সে ভেতরে ঢুকে ভিজিটার্স রুমের সিঁড়িতে দাঁড়াল। সুভাষচন্দ্র ঢুকে বললেন, 'যাক, তোমার দেখা পেয়ে গেলাম। চল,

ভেতরে বসি।'
'কিন্তু মামা, আমাকে বেরুতে হবে।'
'ওহো। পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।'
অগত্যা বসতে হল। সুভাষচন্দ্র বললেন, 'এতদিন আমি আসিনি বলে ভেবো না চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসেছিলাম। বার দুয়েক জলপাইগুড়ি যেতে হয়েছিল। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাবতীয় সম্পত্তির হিসেব পেয়ে গেছি। তবে এখনও পঁচিশ ভাগ হিসেবের বাইরে আছে এবং তা উদ্ধার করা মুশকিল। যাহোক যা পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে বারো লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে বিক্রী করলে।'
'দেখি, কি পেয়েছেন!'
ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বের করে সুভাষচন্দ্র দীপার হাতে দিলেন, 'এখানে সমস্ত কাগজ আছে। বারো লক্ষ! ভাবতেই আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।'
কাগজপত্র হাতে নিয়ে দীপা বলল, 'মামা, এগুলো পেতে আজ পর্যন্ত আপনার পকেট থেকে কত টাকা খরচ হয়েছে বলতে পারবেন?'
সুভাষচন্দ্রের চোখ ছোট হল, 'কেন, বল তো?'
দীপা গম্ভীর মুখে বলল, 'বলুন না। আমার জানা দরকার।'
সুভাষচন্দ্র বললেন, 'এখনই বলা মুশকিল। কয়েকশ', মানে ধরো দুই আড়াইশো খরচ হলে হতে পারে। ও এমন কিছু না। অন্য লোক হলে অনেক বেশী খরচ করতে হতো। কোর্ট কাছারির ব্যাপার তো! কিন্তু আমাকে বোকা বানাবে এমন লোক বেশী জন্মেনি।' বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে কথাগুলো বললেন সুভাষচন্দ্র।
দীপা মাথা নাড়ল, 'তাহলে ঠিক আছে। আপনি আড়াইশো টাকা পাবেন।'
'না, না, ওই টাকা আর আলাদা করে দিতে হবে না আমাকে!'
'মামা, আপনি ওই টাকাটাই পাবেন। আমার জন্যে যে কাজটা করেছেন তা আমি চিরকাল মনে রাখব। আর এই কাজটা করেছেন বলে আরও আড়াইশো টাকা আপনাকে দেবার ব্যবস্থা করব পারিশ্রমিক হিসেবে। এখনই সময়টা বলতে পারছি না তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাকে পুরো টাকা ফিরিয়ে দেব।' দীপা উঠে দাঁড়াল।
'আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মা।'
'বোঝার তো অসুবিধে নেই মামা।'
'না অসুবিধে হচ্ছে। তুমি প্রতুলবাবুর সম্পত্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেবে এমন কথা আছে। আমি শুধু আড়াইশো আর আড়াইশো পাঁচশো টাকাই পাব এ কেমন কথা? না, না, বুঝিয়ে বল আমাকে।' অস্থির হলেন সুভাষচন্দ্র।
'আপনাকে যে ওকালতনামা সই করে দিয়েছিলাম সেটা কোথায়?'
'ওই যে, ওই কাগজের সঙ্গেই আছে।'
'খুব ভাল হল। আমি স্থির করেছি যেহেতু প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক আমি অস্বীকার করেছি তাই তাঁর সম্পত্তি আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভাগ করে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। আপনারা ভোগ করা মানে পরোক্ষভাবে আমারই ভোগ করা। সেটা আমি হতে দিতে পারি না। সম্পত্তির যে হিসেব আপনি এনে দিয়েছেন তা আমি কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দিতে চাই। মানুষকে অপমান করে কষ্ট দিয়ে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় যে সম্পত্তি তৈরী করেছিলেন তার কিছুটা অন্তত সাধারণ মানুষের উপকারে লাগুক। এ ব্যাপারে আমি আর কথা বলতে চাই না।' কাগজপত্রগুলো তুলে নিল

দীপা স্মিতমুখে।

সুভাষচন্দ্র হাঁ হয়ে গিয়েছিলেন। কোন শব্দই যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। তারপর একসঙ্গে হুড়মুড় করে যেসব কথা বলতে গেলেন তা জড়িয়ে গিয়ে অস্পষ্ট শব্দাবলী ছিটকে উঠল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'অসম্ভব, এ হতে পারে না। কিছুতেই না। তুমি আমাকে কথা দিয়েছ বলেই আমি এসব করেছি। আমাকে বঞ্চিত করতে পারো না তুমি। আমি কোন কথা শুনব না। সম্পত্তির ভাগ আমার চাই চাই।'

সুভাষচন্দ্রের গলার স্বর সপ্তমে ওঠায় দারোয়ান ছুটে এল দরজায়। ইশারায় তাকে চলে যেতে বলে দীপা ঘুরে দাঁড়াল, 'ওইভাবে চিৎকার করে কথা বলবেন না। এটা মেয়েদের হোস্টেল।'

সুভাষচন্দ্র সামান্য গলা নামালেন কিন্তু তাঁর জ্বালা কমল না, 'হোস্টেল ফোস্টেল আমাকে দেখাতে এসো না। কলকাতার জল পেটে পড়ামাত্র খুব চাল চালতে শিখে গিয়েছ, অ্যাঁ ?'

'মামা, আপনি ভদ্রভাবে কথা বলুন।' শক্ত গলায় বলল দীপা।

'ভদ্র। ভদ্রতা শেখাচ্ছ আমাকে ? না, আমার টাকা চাই-ই।'

'আমি আপনাকে কখনও বলিনি যে সম্পত্তির ভাগ দেব।'

'তুমি বলনি ? এত বড় মিথ্যে কথা ?'

'মামা, আবার বলছি ভালভাবে কথা বলুন।'

'কেন, দারোয়ান ডেকে বের করে দেবে নাকি ?'

'এখনও সেটা চিন্তা করিনি। সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা করতে আপনিই আমার কাছে এসেছেন। মনে আছে যেদিন আমি প্রথম জেনেছিলাম বাবা আমার পড়াশুনার খরচ চালানোর জন্যে প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে টাকা নিয়েছেন সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, ছিঃ তুমি এত লোভী। বাবা কষ্ট পেয়েছিলেন, হয়তো সেই কারণে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যা সত্যি তা বলতে আমার বাধেনি সেদিন। আজ তো না বলার কোন কারণ নেই।আপনারা আমার জন্যে কিছুই করেননি, আমি কিভাবে কলকাতায় আছি তার খবরও নেননি অথচ যখন জেনেছেন আমার বাতিল করা সম্পর্কের সূত্র বাঁচালে অনেক সম্পত্তি পাওয়া যাবে তখন ভাগ বসাতে ছুটে এসেছেন।'

সুভাষচন্দ্র মাথা নাড়লেন, 'তুমি, তুমি একথা বললে ! তোমাকে আমি কত স্নেহ করি !'

'কথাটা আজ আপনাকে মুখে উচ্চারণ করে বোঝাতে হচ্ছে। মামা, কলকাতায় তো আমার অনেকদিন হয়ে গেল, এর মধ্যে আপনি আমাকে একবারও আপনার বাড়িতে নিয়ে গেছেন ?'

সুভাষচন্দ্র মাথা নামালেন, 'না মানে, তোমার মামীমা, জানোই তো।'

'আপনি লাখ টাকা পেলে মামী তা ভোগ করবেন না ? আপনাদের আমি খুব ভাল করে চিনে গিয়েছি। যিনি আমার জন্মদাতা, যাঁকে আপনি একসময় যত্ন করে ধরে এনেছিলেন, অবশ্য এখন যাঁকে শত্রু ভাবছেন, তাঁর চরিত্র আপনার থেকে খুব আলাদা নয়। এত বছর পর তিনি শকুনের মত উড়ে এসেছেন ভাগাড় থেকে মাংস খেতে। অনেক হয়েছে, এবার আপনি আসুন। পাঁচশো টাকা আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব আমি।' দীপা সরে দাঁড়াল।

সুভাষচন্দ্র হঠাৎ বুকের বাঁ দিকে হাত রাখলেন। তাঁর মুখে ঘাম জমছিল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে ?'

সুভাষচন্দ্র মাথা নাড়লেন, না। তারপর চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে যেতে যেতে ঘুরে

দাঁড়ালেন। 'আমারই ভুল হয়েছিল। বিধবার গায়ে যখন রঙিন শাড়ি ওঠে তখন তাকে আর বিশ্বাস করতে নেই। অঞ্জলি ঠিক করেছে তোমাকে তাড়িয়ে দিয়ে। ঠিক করেছে।' সুভাষচন্দ্র চলে গেলেন। আর পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল দীপা। মুহূর্তেই তার শরীর অসাড়। ধীরে ধীরে চেয়ারে বসে পড়ল সে।

সুভাষচন্দ্র যে শেষ পর্যন্ত এমন কথা উচ্চারণ করতে পারবেন তা কল্পনাও করেনি সে। তাহলে কি চারপাশের মানুষজন যারা জানে তার অতীতের কথা এই মুহূর্তে আড়ালে একই ভাবনা ভাবছে? মনে এক আর মুখে আর এক কথা বলছে? অসীম মানতে পারেনি তার অতীত, এই হোস্টেলের অন্য মেয়েরা শুনলেই বড় চোখে তাকাবে! সে যদি থান পরে কলেজে ক্লাস করতে যেত তাহলে কি বেশী সহানুভূতি পেত!

কতক্ষণ ওভাবে ঝিম মেরে বসেছিল দীপা জানে না হঠাৎ দারোয়ান এসে দাঁড়াল দরজায়, 'দিদিমণি, এক ভদ্রমহিলা আপনাকে খুঁজছেন!'

সম্বিত এল কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করল না। হঠাৎ দারোয়ানের পেছন থেকে গলা ভেসে এল, 'ওমা, তুই এখানে বসে কি করছিস! আমি ভাবলাম হোস্টেলেই নেই।' বলতে বলতে রমলা সেন একটা বই-এর প্যাকেট নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই সব চিন্তা উধাও হয়ে বিস্ময় পাহাড়ের মত উঁচু হল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না দীপা। রমলা সেনের মাথায় একটা বড় কালো রুমাল বাঁধা। সে সব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল, ' এ কি হয়েছে আপনার?'

'কি হয়েছে?' রমলা সেন অবাক হয়ে গেলেন।

'আপনার মাথায় ওটা কি?'

'ওঃ, তাই বল! এমন করে বললি যে আমি চমকে উঠলাম।' বাঁ হাত দিয়ে রুমালের প্রান্ত টানলেন তিনি। তারপর বললেন, 'তোর ঘর কোনটা?'

'ওপরে। কিন্তু রুমাল বাঁধলেন কেন?'

'সব চুল ফেলে মাথা কামিয়ে ফেলেছি।' চেয়ার টেনে বসলেন তিনি।

'আপনি মাথা কামিয়েছেন?' মুখে হাত চেপে কোনমতে হাসি চাপল দীপা।

'হুঁ। 'আমি কারো খোঁটা শুনতে পারি না।' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

'আমি কিছু বুঝতে পারছি না, সত্যি ভাবতে পারছি না। দূর, হতেই পারে না!' দীপা মাথা নাড়ল।

চটপট রুমালের গিঁট খুললেন রমলা সেন। সেটা সরাতেই কামানো মাথাটা বীভৎস হয়ে উঠল। আর সেই মাথার সামনের দিকে একটা ছোট সিঁদুরের রেখা যা রুমালের চাপে কিছুটা ধেবড়ে গিয়েছে। দীপা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'প্লিজ, রুমালটা বেঁধে ফেলুন।'

রমলা সেন মাথায় রুমাল দিলেন, 'ঘটনাটা শোন। পরশু রাত্রে খুব খাটাখাটির পর শুয়েছি হঠাৎ মনে হল সদর দরজাটা খোলা আছে। মানে আমি খিল দিইনি। বিছানা থেকে নেমে দেখতে আলস্য লাগল। সুধাময় বিছানায় পড়লে কাদা হয়ে যায়। পুরুষমানুষের কি ঘুম বাবা! রাগ হল। খোঁচা মেরে তুললাম। বললাম দরজাটা দেখে আসতে। বলল সে নাকি নিজের হাতে খিল দিয়ে এসেছে। আমি একটা আদর করতে গেলাম। আর আমার মাথার চুল ওর নাকে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে নাক টেনে কি বলল জানিস? বলল, ইস্, তোমার চুলে কি বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ। শুনে অ্যাইস্যা রাগ হয়ে গেল যে বিছানা থেকে নেমে কাঁচি দিয়ে মাথার চুল গোছা গোছা কেটে ফেললাম। ও যদি বাধা দিত তাহলে পুরোটা কাটতাম না, বাবু তখন ওপাশ ফিরে ঘুমাতে শুরু করে দিয়েছেন। এলোমেলো কেটে রাগ কমতে

শুয়ে পড়লাম। সকালে আয়নায় নিজেকে দেখে চক্ষুস্থির। কোন সেলুন ঠিক করতে পারবে না চুল। ফলে নাপিত ডেকে কামিয়ে ফেলতে হল।'

'উনি কিছু বলেননি ?'

'না। কিন্তু বেচারা কেঁদে ফেলেছিল রে। আমি অনেক বুঝিয়েছি। মাথার খুস্কি কিছুতেই যাচ্ছিল না, এই সুযোগে সেটা চলে গেল।'

দীপা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

'এই, তুই অমন করে তাকাচ্ছিস কেন ?'

'আচ্ছা, আপনি এমন পাল্টে গেলেন কি করে ?'

'পাল্টে গেছি ?'

'আগের আপনার সঙ্গে এখনকার আপনার কোন মিল নেই।'

'সুধাময়ও তাই বলে।' হাসলেন রমলা সেন, 'আমি বলি মানুষের জীবন হল নদীর মতন। লছমনঝোলা-হরিদ্বারের গঙ্গার মত কি কলকাতার গঙ্গা ? সবসময় এক চেহারা থাকবে ? ছেড়ে দে আমার কথা। তোর পরীক্ষা কবে ?'

'এই এসে গেল বলে।'

'পরীক্ষার পর কি করবি ! মানে কি পড়বি ?'

'দেখি।'

'দেখি টেখি না। এইটেই হল প্ল্যান করার ঠিক সময়। বাবা নেই, এখন গার্জেন কে তোর ? তার সঙ্গে আলোচনা করেছিস ?'

'আমার এখন কোন গার্জেন নেই।'

'সেকি ?'

'হ্যাঁ, আমি এখন একা।'

দীপার কথা শেষ হওয়ামাত্র দারোয়ান আবার এল, 'সেই বাবু এসেছে।'

'কোন বাবু ?' দীপা জানতে চাইল। দারোয়ান সেখানে দাঁড়িয়েই ইশারা করতে শমিতকে দেখা গেল। ঘরে ঢুকে শমিত রমলা সেনকে দেখে একটু ইতস্তত করে বলল, 'বোধহয় ডিস্টার্ব করলাম।'

'না, না। কি ব্যাপার ?' দীপা হাসল।

রমলা সেন বলে উঠলেন, 'আরে দীপা, একেই না সেদিন পালিয়ে যেতে দেখেছিলাম ?'

দীপা প্রতিবাদ করল, 'না, না। পালিয়ে যাবে কেন ? কাজ ছিল তাই চলে গিয়েছিল।'

'তারপর শমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'হঠাৎ, অনেকদিন বাদে ?'

'হ্যাঁ। তোমার জন্যে ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে একটা সিট পাওয়া গিয়েছে।'

॥ ৫০ ॥

রমলা সেন চোখ ছোট করলেন, 'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেল ? তার মানে ?' দীপা বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি রমলা সেন। আমার জীবনে ইনি প্রথম বড় হবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। কলেজে পড়ান। আর ইনি শমিত, স্কুলে পড়ান, কিন্তু আসল পরিচয় একটি শিক্ষিত নাটকের দলের পরিচালক। নাটক নিয়ে থাকেন, স্বপ্ন দ্যাখেন। নাটকই এঁর সব।'

রমলা সেন বললেন, 'ওমা, এমন নাটুকে লোকের সঙ্গে তোর আলাপ হল কি করে ?'

দীপা হেসে ফেলল, 'হয়ে গেল।'

শমিত চুপচাপ শুনছিল, 'আপনারা দুজনেই একটু বাড়িয়ে বললেন।'

রমলা সেন হোঁচট খেলেন, 'আমি আবার কি বাড়িয়ে বললাম!'

'সত্যি যদি নিজেকে নাটুকে ভাবতে পারতাম তাহলে খুশী হতাম। সেটা ভাবতে গেলে দিনরাত তাই নিয়ে ডুবে থাকতে হয়। আসলে নাটক এমন একটা শিল্প যা একক চেষ্টায় করা সম্ভব নয়। সহ-অভিনেতা থেকে শুরু করে আলো এমন কি যে উইংস টানবে তাকেও নাটকের লোক হতে হবে। ডুবে থাকলে সেসব চোখ মেলে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না। যাঁরা লেখেন বা ছবি আঁকেন তাঁদের সেই সুযোগ আছে।' শমিত হাসল।

রমলা সেন সোজা হয়ে বসলেন, 'এ ছেলে তো বলে ভাল। বাঃ, চমৎকার।'

শমিত বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তো একটা প্রশ্ন করব?'

রমলা সেন নীরবে মাথা নাড়লেন।

শমিত বলল, 'সেদিন আপনাকে এক পলক দেখলেও আমার মনে হচ্ছে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে আপনার। সেদিন ওই রুমালটা নিশ্চয়ই মাথায় বাঁধেননি।'

'উঃ, এই এক প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমার প্রাণ বেরিয়ে গেল!'

'আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি আপনি কিছু মনে করলে বলব না।' বিব্রত হল শমিত।

দীপা শব্দ করে হেসে উঠল। গম্ভীর হয়ে গেলেন রমলা সেন। সঙ্গে সঙ্গে দীপা থেমে গেল। ওর মনে হল যেসব কথা উনি তাকে বলতে পেরেছেন তা নিশ্চয়ই শমিতকে শোনাতে চান না। রমলা সেন শমিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মেয়েদের খুব খুঁটিয়ে দ্যাখো।'

'মেয়েদের বললে ঠিক বলা হবে না। আমি রাস্তা ঘাটে মানুষের চাল-চলন চেহারা দেখি। নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এমন চেহারার মানুষ দেখলে আরও ভাল করে তাকে লক্ষ্য করি। এটা খুব কাজে লাগে।'

'তোমার নাটকে আমার মত কোন চরিত্র আছে নাকি!'

'না। তাই সেদিন ভাল করে দেখিনি।'

'রিয়েল ইনটেলিজেন্ট। ভাল লাগল। হ্যাঁ, সেদিন তুমি আমাব মাথায় রুমাল দ্যাখোনি। কেন দেখনি বলতে পারব না, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

দীপা সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'হোস্টেলটা কোথায়?'

'বাগবাজারে। একটা সিট এ মাসের শেষে খালি হচ্ছে। আমি বলে রেখেছিলাম। তোমার দরখাস্ত কালকের মধ্যে জমা দিতে হবে।'

'টার্মস কি?'

'তেমন কিছু না।'

'আমি চাকরি করছি বলতে হবে তো?'

'না। আমি বলেছি তুমি কলেজে পড় আর প্রাইভেট টিউশনি কর। চাকুরি ঠিক আছে, ফাইন্যাল দিয়েই জয়েন করবে!'

'সেকি! এতো একদম মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে নয়। আমি যে স্কুলে পড়াই তার মর্নিং সেকসনে কিছুদিন পরেই ডেপুটেশন ভ্যাকেন্সিতে লোক নেবে। ইচ্ছে করলে তুমি করতে পার।'

'গ্রাজুয়েট না হয়েই।'

'প্রাইমারি সেকসনে অসুবিধে হবে না।'

'হোস্টেলে কত টাকা লাগবে ?'

'মনে হয় এখানে যা দিচ্ছ তার থেকে বেশী নয় ।'

রমলা সেন চুপচাপ কথাগুলো শুনছিলেন । এবার প্রশ্ন না করে পারলেন না, 'তোর এখানে কি অসুবিধে হচ্ছে । এখানে সবাই ছাত্রী, পড়াশুনার আবহাওয়া আছে— !'

'সবই ঠিক । মুশকিল হয় ছুটি পড়লে সবাই যে যার বাড়িতে চলে যায় । এমন কি ঠাকুর চাকরও । তখন হোস্টেলে থাকা যায় না । তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলে এই হোস্টেল ছাড়তে হবে । তখন কোথায় যাবো ?'

'তুই বাড়িতে যাস না ?'

'কোন বাড়ি ?'

'আঃ, তোর বাবার বাড়ি ।'

'বাবা মারা যাওয়ার পর যাওয়ার সম্পর্ক নেই ।'

'সেকি ? কেন ?'

'অনেক গল্প । শোনাতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে ।'

'সেদিন বলছিলি বটে তুই তোর গার্জেন কিন্তু আমি ব্যাপারটা ধরতে পারিনি । কি করে এমন হল ? তোর মা কি চাননি যে তুই পড়াশুনা করিস ?'

'বললাম তো আরও জটিল ব্যাপার ।' দীপা গম্ভীর হল ।

শমিত জিজ্ঞাসা করল, 'আজ এ্যাপ্লিকেশনটা পেলে ভাল হত । যাওয়ার পথে জমা দিয়ে যেতাম । কাল আসতে পারব না ।'

'তাহলে আমাকে ঠিকানাটা বলুন আমি পৌঁছে দিয়ে আসব ।'

'কাকে ?'

'মানে ?'

'দিতে হবে সেক্রেটারির হাতে । ঠিক আছে, আমাকে একটা ভাল কাগজ এনে দাও, আমি লিখে দিচ্ছি, তুমি সই করে দেবে ।'

মাথা নেড়ে রমলা সেনকে 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল দীপা । রমলা সেন বললেন, 'তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছ । বসো ।'

'ধন্যবাদ ।' শমিত চেয়ার টেনে বসল ।

'তোমরা কি ধরনের নাটক করো ?'

'সাধারণত অ্যাডাপ্টেশন ।'

'কেন ?'

'তাতে দর্শকরা ভাল বিদেশী নাটক সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে পারেন । আর আমরাও ভাল নাটকে কাজ করার সুযোগ পাই ।'

'আমার মনে হচ্ছে দীপাকে তুমি খুব পছন্দ করো ।'

'হ্যাঁ । ওর মধ্যে তেজী ভাব আছে যা আমি পছন্দ করি ।'

'বাঃ, এভাবে উত্তর দিতে পারলে তুমি ?'

'আপনি আমাকে প্রশ্ন যখন করতে পারলেন তখন উত্তর দিতে বাধা কি !'

'তুমি দীপাকে কতটুকু জানো ?'

এইসময় দীপা কাগজ নিয়ে ঢুকল । ঢুকে বলল, 'আমার কথা কি বলা হচ্ছিল !'

রমলা সেন বললেন, 'আমি ওকে জিজ্ঞাসা করছিলাম তোকে কতটা জানে !'

দীপা শমিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি জবাব দেবেন ?'

শমিত হাসল, 'এখনও তো হিসাব করিনি। দিন কাগজটা।' সে কাগজ নিয়ে ঝটপট লিখে ফেলল লাইনগুলো। লিখে বলল, 'পড়ে সই করো।'

ঠোঁট উল্টে দীপা চোখ বোলালো, তারপর সই করে দিল। কাগজটা নিয়ে শমিত উঠে দাঁড়াল, 'চলি, আপনারা কথা বলুন। আজ পুরো রিহার্সাল আছে।' শমিত চলে গেল। ওর যাওয়া দেখলেন রমলা সেন। তারপর বললেন, 'বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। স্কুলে পড়ায় বলল, না ?'

'হ্যাঁ। একটা কাজ করতে হয় বলে করছে।'

'হ্যাঁরে, তুই কি ওকে ভালবাসিস ?'

দীপা রমলা সেনকে এক মুহূর্ত দেখল। তারপর বলল, 'মাথায় আসেনি।'

'মানে ?'

'ভালবাসার যেসব গল্প এতদিন পড়েছি তার নায়িকার মনের ভাব আমার কখনও হয়নি।'

'এ তুই ফাঁকিমারা কথা বললি।'

'সত্যি কথা কিন্তু। আমার চেয়ে বয়সে বড় হলেও শমিতকে বন্ধু হিসেবে পছন্দ হয় আমার। মনে হয় ওর ওপর আস্থা রাখা যায়। হয়তো ওর বয়সী ছেলেদের তুলনায় ব্যক্তিত্ব বেশী বলেই এটা মনে হয়। কিন্তু ওর জন্যে আমার মনে কখনও তোলপাড় হয়নি। তাই তোমাকে কি করে বলব ওকে ভালবাসি।' দীপা অকপটে বলল।

অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি এল। আগের চিঠির বক্তব্যে যদি কোন অসঙ্গতি থাকে তাহলে দীপা যেন তাকে মার্জনা করে। সেই সঙ্গে জানানো, যদি এ ব্যাপারে দীপা মনে করে তার কোন সাহায্য প্রয়োজন তাহলে তা সে করতে প্রস্তুত। চিঠি পড়ে দীপাব ভাল লাগল। সে চিঠি লিখে জানাল, সুভাষচন্দ্র যেসব কাগজপত্র উদ্ধার করেছেন তাতে তাঁর হিসেব অনুযায়ী বারো লক্ষ টাকা হবে। বাস্তবে এই অংক কম বা বেশী হতে পারে। এখন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দান করতে হলে প্রথমে দান করার অধিকার তাকে অর্জন করতে হবে। যেহেতু এই কাজ জলপাইগুড়ির আদালত বা সরকারি অফিসেই করতে হবে তাই যদি অমলকুমার সাহায্য করেন তাহলে সে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। চিঠির উত্তর কলেজ হোস্টেলের ঠিকানায় না দিয়ে নতুন ঠিকানায় যেন দেওয়া হয়। দীপা ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলের ঠিকানাটা জানিয়ে লিখল সামনের মাসের এক তারিখে সে ওই ঠিকানায় উঠে যাচ্ছে।

কিন্তু ওই চিঠির উত্তর এত তাড়াতাড়ি এল যে নতুন ঠিকানার প্রয়োজন হল না। চিঠিতে অমলকুমার লিখেছে যে সে জলপাইগুড়ির প্রোথিতযশা উকিল জীবনগতি রায় মহাশয়ের সঙ্গে কথা বলেছে। রায় মহাশয় খুব বড় মাপের মানুষ। সব শুনে বলছেন এমন একটা কাজ যে মেয়ে করতে পারে তাকে তিনি একটি পয়সা পারিশ্রমিক না নিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু এসব করতে হলে দীপাকে দিন কয়েক জলপাইগুড়িতে থাকতে হবে আইনগত কারণে। দীপা যত তাড়াতাড়ি আসতে পারে তত ভাল হয়।

দীপা ঝুঁকি নিল। সুভাষচন্দ্রের দেওয়া সমস্ত কাগজ সে পার্সেল করে পাঠিয়ে দিল অমলকুমারের নামে। সেই সঙ্গে জানাল সামনের মাসের শেষ দিকে সে যেতে পারবে। কারণ তার তখন ছুটি থাকবে। সমস্যা হল জলপাইগুড়ি শহরে কোন থাকার জায়গা নেই। সেখানকার হোটেলের ব্যবস্থা কিরকম অথবা তারা একা মেয়েকে থাকতে দেয় কিনা তাও সে জানে না। অতএব একটা নিশ্চয়ই সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

কলেজ হোস্টেল ছেড়ে সে যখন ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে এল তখন শমিত আর মায়া সঙ্গে ছিল। এখানকার বেশীর ভাগ মেয়েই শিক্ষিতা। দু'চারজন অফিসে কাজ করে। তাদের সঙ্গে শিক্ষিকাদের মেলামেশা কম। শমিতের ভেতরে ঢোকা নিষেধ, মায়া ওকে ঘরে পৌঁছে দিল। দীপার রুমমেট এক মধ্যবয়সী মহিলা। আর জি কর হসপিট্যালে নার্সের চাকরি করেন। যেমন কালো তেমন ভারী শরীর। দিনটা ছিল রবিবার। মহিলা নিজের খাটে বসে টেবিলে আয়না রেখে সন্না দিয়ে পাকা চুল তুলছিলেন। ওরা ঢুকতেই হাতের আড়ালে সন্না লুকিয়ে জিনিসপত্র নামাতে দেখলেন। ঘরে ঢোকার আগে দীপা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে টাকা পয়সা জমা দিয়ে এসেছিল। মহিলা আচমকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন জেলা ?'

মায়া জবাব দিল, 'জলপাইগুড়ি। আপনি এঘরে থাকেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ, এটা আমারই ঘর। কত রুমমেট এল গেল আমি কিন্তু রয়েই গেছি। এই হোস্টেলে যে কেউ দেবিকার ঘর বললে এই ঘরটাই দেখিয়ে দেবে।'

মায়া হাসল, 'তাহলে তো আমার বন্ধু এখানে আপনার সঙ্গে ভালই থাকবে।'

দেবিকা বললেন, 'ও, তুমি থাকবে ভাই ?'

দীপা বেশ চটে গেল। একে কথায় মাতব্বরীর ভাব স্পষ্ট তার ওপর সরাসরি তুমি বলা তার মোটেই পছন্দ নয়। বয়সে বড় হলেও জিজ্ঞাসা করে তুমি বলা উচিত। সে জবাব দিল না। মায়া ওকে বিছানা পাততে সাহায্য করল। সেটা দেখতে দেখতে দেবিকা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বিয়ে থা হয়ে গেছে না হয়নি !'

মায়া জবাব দিল, 'ওমা, আপনি চোখে দেখে বুঝতে পারেন না ?'

'চোখে দেখে ? সেদিন চলে গিয়েছে। হাসপাতালে চাকরি করছি। যা সব কেস দেখছি রোজ মাথা ঘুরে যাচ্ছে। মাথায় সিঁদুর দিয়ে খালাস করতে এল, স্বামীর নাম দেখালো। স্বামী দেবতাটিকেও দেখলাম। অল্প বয়স দুজনের। বাচ্চা হল সন্ধেবেলায়, ভোর বেলায় মায়ের পাত্তা নেই। খোঁজ খোঁজ। বেড খালি, কোথাও পাওয়া গেল না। পুলিশে খবর গেল। তারা খবর নিয়ে বলল ঠিকানাটা মিথ্যে। ওই নামে কেউ থাকে না। বাচ্চাটার কি হবে ? তা এক দারোয়ানের বউ চেয়ে নিল, তার বাচ্চা হচ্ছে না দশ বছর। তবে ?'

দীপা মায়ার দিকে তাকাল, 'কেন কথা বাড়াচ্ছিস ?'

মায়া আবার হাসল, 'তাহলে আজ চলি। নিচে শমিত দাঁড়িয়ে আছে। কাল কলেজে দেখা হবে।' বলে দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে বলল, 'আমার বন্ধু খুব গম্ভীর, কম কথা বলে, আপনিও বেশী কথা বলবেন না।' বলে বেরিয়ে গেল।

দীপা অনেক কষ্টে হাসি চাপল। সে দেবিকার দিকে পেছন ফিরে বালিস ঠিক করল। টুকিটাকি কাজ সারল। দেবিকা বিছানায় বসে চুপচাপ ওকে দেখছিলেন এবার নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তো ভাই তোমাকে অন্য ঘরে যেতে হবে।'

'কেন ?' ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল দীপা।

'আমি তো কথা না বলে থাকতে পারি না।' মাথা নাড়লেন তিনি।

'ঠিক আছে, আপনি কথা বলবেন।' দীপা একটা বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

'তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেকথা বলছিলাম, দেখে মনে হয় বিয়ে থা হয়নি। বিপদ বল ভয় বল এখানেই। মা বাবা সম্বন্ধ করছে না তো ?'

দীপা কথা বলল না। দেবিকা বললেন, 'করবে না। মেয়ে চাকরি করলে কোন মা বাপ চায় তাকে খরচ করে বিয়ে দিই। যে গরু দুধ দেয় তাকে কেউ বিক্রী করতে চায় ? আর এই

করতে করতে দেখবে একসময় তোমার আমার মত বয়স হয়ে যাবে, আর তখন বিয়ে হবে না। আমি তো এর আগের দুই রুমমেটকে বলে বলে বিয়ে করালাম।'

কথা না বলে পারল না দীপা, 'আপনার খুব বিয়ের শখ ছিল বুঝি ?'

'খুউব। সেই ছেলেবেলায় যখন রান্নাবাটি খেলতাম তখন থেকে। সময়ে কেউ বিয়ে দিল না। দুবার যে নিজে চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু ডাক্তার বল আর রুগী বল, হাসপাতালে ঢুকলে কত মিষ্টি কথা, হাসপাতালের বাইরে চোখ উল্টে দেয়। তাই বলছিলাম, বিপদ বল, ভয় বল, এখানেই।' দেবিকা গলা নামালেন, 'কোথায় চাকরি কর ?'

'করি না, করব। স্কুলে।'

'অ। আমার এক পেশেন্ট ছিল স্কুলের মাস্টারনি। অমন খেঁকুড়ে মেয়েমানুষ আমি বাবা জীবনে দেখিনি। যেমন রোগা তেমনি খেঁকুড়ে। রোজ বিকেলে আয়না বের করে বেড়ে বসে পাউডার মাখত। এক রাত্রে আমায় বলে কিনা, জানান দিয়ে তবে রাত্রে আসবেন নইলে অন্ধকারে আপনাকে বোঝা যায় না। কি আস্পদ্দা !'

দীপা হাসি চাপল। হঠাৎ দেবিকা লাফিয়ে উঠলেন, 'ওরে বাবারে! কথা বলতে বলতে কি দেরি না হয়ে গেল। আমার ডিউটির সময় হয়ে গেছে। আজ আবার নার্সিং সুপার দাঁত দেখাবে।' দীপা মুখ ফিরিয়ে চোখ বই-তে রাখল। মহিলা এই ঘরেই জামাকাপড় পরিবর্তন করছেন। দীপা যে রয়েছে তা যেন খেয়ালেই নেই। পোশাক পাল্টে চুল আঁচড়ে দেবিকা বললেন, 'কাল সকালে আবার দেখা হবে। কি যেন নাম তোমার ? নাম না জানলে কথা বলা যায় নাকি !'

'দীপাবলী।'

'আমি ওই বলী টলি বলতে পারব না। শোন দীপু, আমি চলে যাচ্ছি, আজ রাত্রে তুমি আমার মাছটা খেয়ে নিও। চেয়ে খেও নইলে ঠাকুর দেবে না।'

'আপনি রাত্রে ফিরবেন না ?'

'না। নাইট ডিউটি। নাইট ডিউটি নিই কেন বলতো ? রাত দশটার পর পাঁচটা পর্যন্ত টানা ঘুম। এদিকে সারাদিনেও বিশ্রাম। রাতে হাসপাতালে কপাল খারাপ না হলে কোন ঝামেলা থাকে না তো। চলি।' দুদ্দাড় করে ঘরের বাইরে চলে গিয়েও ফিরে এলেন তিনি। মুখ ঢুকিয়ে বললেন, 'মাছটা মনে করে খেয়ো। টাকা যখন রিফান্ড দেবে না তখন মাছটা আর ছাড়ব কেন ? রোজ ছাড়ি, আজ টাইট।' শব্দ তুলে চলে গেলেন দেবিকা। দীপা উঠে বসল। অদ্ভুত মহিলা। এতক্ষণ ওর ওপর তার বেশ রাগ হচ্ছিল। নিজের বা অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু থাকতে পারে তা এই ধরনের মহিলা ভাবতেও পারেন না। কানের পোকা বের করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আবার মাছ খেতে বলে যাওয়াটা ওঁর ছবিটাকে পাল্টে দিল। সে ওইভাবে চেয়ে মাছ খেতে আগ্রহী নয়। কিন্তু ওই বলার মধ্যে সহজ মন ছিল, এটাও ঠিক।

নতুন হোস্টেলে অসুবিধে হচ্ছে না দীপার একমাত্র দেবিকাদেবীর কথার তুবড়ি ছাড়া। কলেজ হোস্টেলের সঙ্গে এখানকার একটা বড় তফাৎ বাসিন্দাদের বয়স হয়েছে। সেই কারণে হাঁটা চলায় ব্যবহারে একটা ভারি ব্যাপার আছে। দু'দলের আলোচনার বিষয়ও আলাদা। বড়রা অনেকেই স্নেহ করে দলে টানতে চাইছেন। এঁদের মধ্যে যেমন অবিবাহিতার সংখ্য বেশী তেমনি স্বামী পরিত্যক্তা অথবা অর্থের কারণে স্বামীসংসার ছেড়ে আসা মহিলাও আছেন। সমস্ত পশ্চিমবাংলায় এঁদের সংখ্যা যদিও হাতে গোনা যায় যাঁরা

নিজের উপার্জন করে দাঁড়িয়ে আছেন তবু কথা বললে এঁদের হা হুতাশ বুঝতে অসুবিধে হয় না।

. পরীক্ষার জন্যে তিনমাসের ছুটি আরম্ভ হতেই অমলকুমারের চিঠি এল জলপাইগুড়ি থেকে নতুন ঠিকানায়। অমলকুমার জানিয়েছে, জলপাইগুড়ির হোস্টেলে কোন মহিলা সাধারণত একা থাকেন না। হোটেল দুটি খুব উঁচু মানেরও নয়। তাছাড়া জলপাইগুড়িতে এসে হোস্টেলে ওঠার কথা না ভাবলেই ভাল হয়। পুরোনো আত্মীয়তার কথা যদি না তোলা হয় তাহলে যে মন নিয়ে চিঠি জবাব দীপা দিয়েছে সেই মনেই রায়কতপাড়ায় অমলকুমারের বাড়িতে সে থাকতে পারে। এ ব্যাপারে অমলকুমারের মায়ের কোন আপত্তি নেই। অমলকুমার উকিলবাবুকে সমস্যাটা জানিয়েছিল। তিনিও বলেছেন, থাকার জায়গার কোন অভাব হবে না। তাঁর বাড়িতেও বহু জায়গা আছে। জলপাইগুড়ির বিখ্যাত চা-শিল্পপতি শ্রীযুক্ত বীরেন ঘোষ তাদের পাড়ার লোক। ঘোষমহাশয়ের একটি ভাল গেস্ট হাউস আছে। উকিলবাবু তাঁর সঙ্গে কথা বলে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। পত্রপাঠ কবে আসছে জানালে অমলকুমার স্টেশনে অপেক্ষা করবে।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে শমিতের রিহার্সাল রুমে গেল দীপা। গিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে। তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাড়ার একটি ছেলে বলল, 'রিহার্সাল পার্টিদের খুঁজছেন ? পাবেন না। বাড়িওয়ালা ঘর বন্ধ করে দিয়েছে।'

'সেকি ? কেন ?'

'ভাড়া দিতে পারেনি, তাই।'

'কতদিন এমন হল ?'

'দিন চারেক। তবে ওদের সামনের পার্কে পাবেন।'

'পার্কে ?'

'হ্যাঁ। ওখানে কালকেও রিহার্সাল দিয়েছে জানি।'

পার্কে নাটকের রিহার্সাল দেওয়া যায় স্বপ্নেও ভাবেনি দীপা। বেশ কৌতূহলী হয়ে সে ছেলেটির দেখানো পথ দিয়ে পার্কে এল। তখন সন্ধে হব হব। আলো জ্বলে গিয়েছে। পার্কের মাঝখানে অন্ধকার। এদিকে বৃদ্ধ এবং মাঝবয়সীরা আড্ডা মারছে আলোর তলায়। ঘুরতে ঘুরতে এক কোণে সুদীপ এবং আরও চারটে ছেলেকে দেখতে পেল। বেঞ্চি দখল করে তারা বসে আছে। তাকে দেখে সুদীপ বলল, 'আরে, কি ব্যাপার ?'

'এখানে রিহার্সাল হচ্ছে শুনলাম।'

'হ্যাঁ। চার মাস ঘর ভাড়া দিতে পারিনি বলে বাড়িওয়ালা বের করে দিয়েছে।'

'চার মাস ? কত ভাড়া ছিল ?'

'পনের টাকা করে, ষাট টাকা।'

'ষাট টাকা। দেননি কেন ?'

'কত লস্ হচ্ছে এক একটা শো করে জানা আছে ?'

দীপার মুখে এসেছিল লসই যখন হচ্ছে তখন নাটক করছেন কেন ? কিন্তু সে কিছুই বলল না। সুদীপ হাসল, 'এই পার্কে রিহার্সালের আইডিয়া খারাপ না। ওপেন এয়ারে অভিনয় করলে গলা ভাল হয়, গরমে কম ঘামতে হয়। শুধু বৃষ্টি নামলে প্রব্লেম।'

দীপা জানতে চাইল, 'ষাট টাকা পেলে বাড়িওয়ালা ঘর খুলে দেবেন ?'

'জানিনা দেবে কিনা। খুব রাগারাগি হয়ে গেছে। কিন্তু— ।'

'আপনি আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায় ?'

'আপনাদের আগের রিহার্সাল রুমে। কাল টিউশনির টাকা পেয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি পরে আপনারা আমাকে শোধ করে দেবেন।'

'অসম্ভব।'

'মানে ?'

'শমিত আমাকে শেষ করে ফেলবে। ও গিয়েছে এক জায়গায় টাকা জোগাড় করতে। ও ফিরে না আসা পর্যন্ত—, ওই যে, এসে গিয়েছে।' সুদীপের দৃষ্টি অনুসরণ করে দীপা দেখল শমিত আরও দুটো ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছে। সঙ্গে মায়াও আছে। দীপার খেয়াল হল মায়া তাকে এ ব্যাপারে কোন কথা বলেনি। তাকে দেখে শমিত খুবই সাধারণ গলায় বলল, 'কতক্ষণ ?'

'একটু আগে।' দীপা কথা দুটো বলে মায়র দিকে তাকিয়ে হাসল।

এদিকে শমিত গলা তুলেছে ততক্ষণে, 'বন্ধুগণ! একটা সুখবর আছে। আমরা আমাদের ঘর ফিরে পাচ্ছি! এই যে চাবি ফিরে পেয়েছি।' সে চাবি দেখাল।

সুদীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে হল ব্যাপারটা ?'

'বাড়িওয়ালার স্ত্রীর জন্যে। আমি তো মাঝেমধ্যে মাসীমা বলে জল চেয়ে খেয়েছি। স্বামী আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন শুনে উনি তাঁকে খুব তিরস্কার করেছেন। আর তাই স্বামীর মনে হয়েছে কাজটা ঠিক হয়নি। হয়তো পাড়ায় রটে গিয়েছে যে তিনি যেহেতু আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন তাই আমরা পার্কে রিহার্সাল দিচ্ছি। এতে পাড়ার পাঁচজনের কাছে উনি বোধহয় ছোট হয়ে যাচ্ছিলেন। যাহোক, ওসবে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি বাড়িওয়ালাকে কথা দিয়েছি এখন থেকে নিয়মিত ভাড়া দেবই আর বকেয়াটা প্রতি কল শো পিছু এক মাসের করে দেব।'

শমিতের কথা শেষ হওয়ামাত্র হাততালি পড়ল। সুদীপ বলল, 'বাঁচা গেল। তাহলে কি আজ রিহার্সাল এখানে হবে ?'

'সবাই এসেছে ?' শমিত জানতে চাইল।

'না, এখনও আসেনি। আমি বলি কি এখন ঘরে ফিরে যাওয়া যাক।'

সুদীপ প্রস্তাব দিতে সবাই তাকে সমর্থন করল। দল যখন ঘরে ফিরছে তখন শমিত দীপাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার ?'

'আপনার সঙ্গে কথা ছিল।'

'কোন অসুবিধে হয়েছে ?'

'না। কিন্তু এত ব্যাপার ঘটল আমাকে বলেননি কেন ?'

'শুনলে কি করতেন ?'

'কিছু একটা সাধ্যমত চেষ্টা করতাম।'

'তুমি যদি আমাদের দলের একজন হতে তাহলে নিশ্চয়ই বলতাম।'

'ও।' দীপা চুপচাপ হাঁটল। মায়া সুদীপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আগে আগে যাচ্ছে। দীপা বলল, 'এসেছিলাম কারণ আমাকে জলপাইগুড়িতে যেতে হচ্ছে।'

'কেন ?'

'ওখানকার সব সম্পত্তি, যা আমার নয়, অথচ আমার বলে সবার ধারণা তা আইনসঙ্গত করে কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান করে দিতে যাচ্ছি।'

'যদি আইনসঙ্গত হবার পরে দানের ইচ্ছেটা চলে যায় ?'

'আপনি আমাকে এখনও চেনেননি।'
'হুম। কবে যাওয়া হচ্ছে।'
'আগামীকাল।'
'ওখানে থাকার ব্যবস্থা ?'
'হয়ে যাবে।'
'আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি ? সঙ্গে গেলে কাজ হবে ?'
'না।' হঠাৎ চাপা চিৎকার করে উঠল দীপা।
'কি হল ?' অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল শমিত।
সঙ্গে সঙ্গে ধাতস্থ হল দীপা। এবং সেই সঙ্গে লজ্জা পেল। বলল, 'সরি।'
শমিত অদ্ভুত চোখে তাকাল। দীপা বলল, 'আমি চলি।'
'তাহলে এলে কেন ?'
'আপনাকে জানাতে ?'
'চল ঘরে গিয়ে বসবে !'
'অসম্ভব !'
'কেন ?'
'আমি দলের একজন নই।' দীপা উল্টো রাস্তা ধবল।

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস জলপাইগুড়িতে যায় না। কিন্তু একটা লোক্যাল ট্রেন পেয়ে গেল সে শিলিগুড়ি থেকে সেটা হলদিবাড়ি যাবে জলপাইগুড়ি ছুঁয়ে। ট্রেনে আসতে আসতে কেবলই মনে হয়েছে অসীমের কথা। শমিত সঙ্গে আসতে চাওয়ামাত্র সে যেভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিল তার জন্যে কোন প্রস্তুতি ছিল না। অসীম যা করেছিল তা শমিতকে করতে দিতে চায় না সে।

আসার আগে সময় ছিল না ।অমলকুমারকে চিঠি দিলে সেটা এখানে পৌঁছানো হত না তার আসার আগে। চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতে বেলাকোবা পার হওয়ামাত্র চিন্তা শুরু হল। কোথায় উঠবে। কোন ব্যবস্থাই নেই। কি করা যায় ? হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি উঁকি মারল। বেলা দশটা নাগাদ স্টেশন থেকে রিকশা নিয়ে সে সোজা কলেজের হোস্টেলে চলে এল। রিকশা থেকে নামামাত্র দারোয়ান তাকে দেখল। দেখে চিনতে পারল। তার মুখে হাসি ফুটল। দীপা জিজ্ঞাসা করল, 'বড়দি আছেন ?' দারোয়ান মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে তাকে স্যুটকেসটা দেখতে বলে সে ভেতরে ঢুকল।

বড়দি তাকে দেখে অবাক হলেন। সব কিছু জানার পর বললেন সে স্বচ্ছন্দে দিন পাঁচেক হোস্টেলের গেস্টরুমে থাকতে পারে। খাওয়া-দাওয়া এখানেই। পাঁচ দিনের জন্যে গেস্ট ফি বাবদ পনের টাকা দিতে হবে। টাকার পরিমাণটা শুনেই মনে পড়ল তার শমিতদের কথা। ওরা এই টাকাটা দিতে পারলে লজ্জায় পড়ত না।

রিকশা নিয়ে দুপুরের পরে সে রায়কতপাড়ায় এল দিনবাজার ঘুরে । করলা নদীটা দেখে মনটা ভারী হয়ে গেল। রায়কতপাড়ায় ঢুকে অমলকুমারের নাম বললে কেউ চিনতে পারছিল না। দীপা ইচ্ছে করেই অমলকুমারের বাবার নাম বলছিল না। শেষ পর্যন্ত সে জীবনগতি রায় মশাই-এর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে জানল তিনি এখন আদালতে। বাড়িতে ফিরে চেম্বারে বসতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু সেখানে অমলকুমারের খবর পাওয়া গেল। উমাগতি স্কুলের পাশেই ওদের বাড়ি। একটুও ইতস্তত না করে সে অমলকুমারের বাড়িতে

এল। রাস্তার ধারে টিনের দরজা। দরজাটি ভেজানো, ঠেলতেই খুলে গেল। ভেতরে চওড়া পরিষ্কার উঠোন। এক বয়স্কা বিধবা মহিলা উঠোনে মোড়া পেতে রোদ্দুরে চুল শুকোতে শুকোতে বই পড়ছেন। শব্দ শুনে অবাক চোখে তাকালেন। দীপা এগিয়ে গেল, 'অমলবাবু আছেন ?'

'না। ও বাড়িতে নেই। ময়নাগুড়ি গিয়েছে। বিকেলে ফিরবে।'

'ও, আচ্ছা। আপনি ?'

'আমি ওর মা।' ভদ্রমহিলা বলতে বলতে চেনার চেষ্টা করছিলেন। একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নিশ্চয়ই দীপাবলী ?'

'হ্যাঁ।'

'ওমা, কখন এসেছো ? তোমার তো সোজা আমাদের বাড়িতে ওঠার কথা!'

'না, ঠিক সেরকম কথা হয়নি।' দীপার ভাল লাগল মহিলার বলার ধরন, 'আমি আমার পুরোনো হোস্টেলে উঠেছি।'

'কেন ? আমার কুঁড়েঘর কি খুব খারাপ। অন্যায় করেছ।'

'আমি তো আপনাকে আগে চিনতাম না।'

'তা ঠিক।' প্রৌঢ়া মাথা নাড়লেন, 'তা অবশ্য বলতে পার। এসো ভেতরে এসো।কখন এলে ? আজ সকালের ট্রেনে ?'

'হ্যাঁ।' দীপা ওঁকে অনুসরণ করল।

এক ঘণ্টা ধরে বারান্দায় পাশাপাশি বসে অনেক কথা হল। ভদ্রমহিলা একবারও ভুলেও প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর পরিবার সংক্রান্ত কোন কথা বললেন না। তিনি শুধু দীপার কলকাতার জীবনযাপন সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। সেসব নিয়েই কথা হচ্ছিল। একসময় জলখাবারের কথা উঠতে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি মিষ্টি খাও তো ?'

দীপা হাত নাড়ল, 'না মাসীমা, মিষ্টিতে আমার আপত্তি আছে।'

চা এল, সঙ্গে বিস্কুট আর ডিমের ওমলেট। ডিম দেখে দীপা মহিলার দিকে তাকাল একবার।প্রতুলবাবুর দাদার স্ত্রী ইনি। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধা বাড়ল।

পাঁচটার কিছু বাদে অমলকুমার ফিরল। লম্বা, সুগঠিত বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখ দুটো আলাদা ধরনের। গভীর। মাসীমা জিজ্ঞাসা করল, 'বল তো এ কে ?'

অমলকুমার ভাবতে চাইল। কিন্তু দীপা সুযোগ দিল না, 'আমি দীপা।'

'আরে! আপনি ? কখন এলেন ?'

'ও আজ সকালে এসে পুরোনো হোস্টেলে উঠেছে।' মাসীমা বললেন।

'সে কি! মা তো আপনাকে এখানেই রাখতে চেয়েছিল।'

মাসীমা মাথা নাড়লেন, 'না, থাক। এ নিয়ে জোর করিস না। তুই বরং ওকে একবার জীবনগতিবাবুর বাড়িতে নিয়ে যা। যে কাজের জন্যে এসেছে সেটাই আগে করা দরকার।'

টিনের দরজা পেরিয়ে দীপা বলল, 'আপনি খেটেখুটে এলেন, জিরোবার সময় পেলেন না। খারাপ লাগছে খুব।'

'একদম খাটিনি। ময়নাগুড়িতে গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে। কাজ হয়নি।'

'আপনি ব্যবসা করেন ?'

'হ্যাঁ।'

জীবনগতি রায় মহাশয় অত্যন্ত সজ্জন লোক। দীপার এই ভাবনার প্রচুর প্রশংসা করলেন। খুব কম মানুষ পৃথিবীতে আছে যারা এমন কাজ করতে পারে। আগামীকাল

তাকে এগারটার সময় কোর্টে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দিন চারেকের মধ্যে যাতে সব হয়ে যায় তার চেষ্টা করবেন। সেখান থেকে বেরিয়ে দীপা বলল, 'একটা রিকশা ডেকে দেবেন ?'

'আমাদের বাড়িতে যাবেন না আজ ?'

'সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। কাল না হয় যাওয়া যাবে।'

'চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি বউঠান।'

'শুনুন। আপনাকে একটা অনুরোধ করব ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমায় দীপা বলে ডাকবেন।'

অমলকুমার মুখ তুলে তাকাল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি আজ পর্যন্ত আপনার বয়সী কোনো সদ্যপরিচিত মহিলাকে নাম ধবে ডাকিনি।'

'ডাকতে আপত্তি আছে ?'

'না। তবে সেক্ষেত্রে আমাকে অমল বলতে হবে।'

'বেশ। তাহলে আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম।'

'আমি আমৃত্যু এর মর্যাদা রাখব।' অমলকুমার হাত তুলে রিকশা ডাকল।

॥ ৫১ ॥

সুভাষচন্দ্র সম্ভবত কল্পনাবিলাসী ছিলেন। সম্পত্তির মূল্যায়নে আকাশকুসুম মূল্য নির্ধাবণ করে নিজের কল্পিত অংশেব চেহাবা দেখতে ভালবেসে ছিলেন। রায়মহাশয় সমস্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা করে বলেছেন যা শেষ পর্যন্ত আইনসঙ্গত করা সম্ভব হবে তার পরিমাণ ছয় লক্ষ টাকাব বেশী হবে না। এবং এই ছয লক্ষ টাকাও দরাদরিতে বেশ কিছুটা কমে যাওয়া স্বাভাবিক। অর্থাৎ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পত্তিব দামের পবিমাণ সুভাষচন্দ্রের কবা হিসেবের প্রায় অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এতে দীপার কিছু এসে যায়নি। যদি মোট সম্পত্তির দাম এক হাজাব টাকাও হত তাহলে তাব ব্যক্তিগত কারণে মন খাবাপ হত না। হ্যাঁ, জনসাধাবণেব উপকাবেব জন্যে বেশী টাকা দেওযা গেল না, এটাই মনে হত তার।

আমাদের দেশের আইনি ব্যবস্থায় তিন দিন থেকে সব কাজ উদ্ধাব করে যাওয়া সম্ভব না। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রহ করা তালিকা অনুযাযী একটা হিসেব আদালতে দাখিল করে উত্তরাধিকার আইনসঙ্গত কবতে গেলে যেসব বিধিনিষেধ মানতে হবে তাব জন্যে সময দরকাব। এমনিতেই প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যাযেব মৃত্যু এবং এই দবখাস্তের মধ্যে যথেষ্ট সময পার হয়ে গিয়েছে। দখলদাররা ইতিমধ্যে সেইসব সম্পত্তি নিজেদের বলে ভাবতে শুরু করেছেন। অতএব এইসব সম্পত্তিতে কাবও কোন দাবি থাকলে জানান—এই রকম একটা নোটিস জারি কবতে হবে। বায়মহাশয় এবং অমলকুমারকে সে তার হযে সমস্ত করার অধিকার লিখিতভাবে দিয়ে দিল।

এই তিন দিনে একটি ব্যাপার মেনে নিতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল দীপার। কাছাবি বা সবকারি অফিসে যেখানেই সে অমলকুমাব অথবা রায়মহাশয়ের সঙ্গে গিয়েছে সেখানেই প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূর পরিচয় স্বীকার করতে হয়েছে। যে সরকারি অফিসে জমি-জমার হিসেবে রাখা হয় সেখানে হাকিমপাড়াব এক ভদ্রলোক কাজ করেন যিনি প্রতুল

বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতেন। তাঁর পুত্রের বিবাহ নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন বলে দাবি করলেন। তিনি তো বলেই ফেললেন, 'বউমা শেষ পর্যন্ত তুমি এসে শ্বশুরের সম্পত্তি গ্রহণ করছ দেখে খুব খুশি হলাম। আবার কোন বদলোক আমার মত কাউকে দাঁড় করিয়ে না দেয় এই রকম ভয় করছিলাম।'

আপনি স্বর্গীয় প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ? বলতে হয়েছে, হ্যাঁ। আপনার স্বামীর নাম ? স্বর্গীয় অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত মন এবং শরীর প্রতিবাদ করেছিল, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তবু বাধ্য হয়ে দীপাকে ওই সমস্ত সত্য উচ্চারণ করতে হয়েছিল। আর তখনই তার মনে হয়েছিল সত্য কি ? যা ঘটেছে তাই সত্য না যা ঘটার সময় মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল, মনপ্রাণে একবিন্দু সায় ছিল না, ঘটার পরেই যাকে মুছে ফেলে নিজেকে পবিত্র ভাবতে পেরেছিল, তাই সত্য ? নাকি দুটোই সত্যি। তাই তার জের মেটাতে এখনও তাকে এইভাবে মাথা নোয়াতে হচ্ছে। কিন্তু কেন ? একটি মাত্র সান্ত্বনা মলমের মত কাজ করছিল, এই মাথা নোয়ানোতে যদি আশেপাশের স্বার্থলোভী আত্মীয়রা দূরে সরে যায়, যদি কিছু অসহায় মানুষ উপকৃত হয়, তাহলে জীবনে শেষবারের মত না হয় নোয়ানো গেল। দ্বিতীয় যে চিন্তাটা মাথায় এল তা হল কোন বাঙালি মারা গেলে তার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু জুড়ে দেওয়া হয় কেন ? তখন সে কি ঈশ্বর হয়ে যায় ! নিশ্চয়ই নয়, এটা মিথ্যে। এই তিন দিনে দীপা যেমন প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তেমনি অনেকের কাছে বিস্ময়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শাড়ি, চালচলন, কথাবার্তা জলপাইগুড়ির অনেককেই বিস্মিত করেছে। অমলকুমার সঙ্গে থাকায় তারা প্রকাশ্য কিছু বলেনি কিন্তু দীপার বিশ্বাস অমলকুমারকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। কবে বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাদের সপক্ষে আন্দোলন করেছিলেন অথচ বাঙালির মানসিকতার খুব বেশী পরিবর্তন আজও হল না।

অথচ অমলকুমার জলপাইগুড়ি সফরে তার উজ্জ্বল আবিষ্কার। চিঠিপত্রে মানুষ অনেক সাজানো কথা লিখতে পারে। সেদিন কলেজে অধ্যাপক বলছিলেন একটা ঘটনার কথা। একজন শিক্ষিত লেখক বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁর ভারী রচনার কারণে। তিনি নিজস্ব একটি ভাষা, যা ইংরেজি ভাষার অনুকরণে তৈরি, আবিষ্কার করে তাতেই গল্প প্রবন্ধ লিখতেন। এক ধরনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তখন তাঁর চারপাশে ভিড় করেছিল কিন্তু বাঙালি পাঠক তাঁকে আপন করে নেয়নি কখনও। তাঁর কথাবার্তাও নাকি ওই একই স্টাইলে বসানো ছিল। সেই ভদ্রলোক একবার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে নার্সদের সঙ্গে যে ভাষায় তিনি কথা বলতেন তার সঙ্গে তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম অথবা আড্ডায় ভাষার কোন মিল নেই। একজন পড়ুয়া নার্স মন্তব্য করেছিল, শুনেছি উনি খুব বড় লেখক কিন্তু বই পড়তে মোটেই ভাল লাগেনি। এখানে যে ভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেন সেই ভাষায় যদি বই লিখতেন তাহলে কি ভালই না হত। অধ্যাপক ঘটনাটি বলে আক্ষেপ করেছিলেন, 'উনি নিজের ভাষায় লিখলে আমরা কত লাভবান হতাম !'

অমলকুমার অন্তত ওই দলে পড়েন না। সহজ অথচ দৃঢ়, উদার অথচ সংযত একটি মানুষ চিঠি এবং কাজে নিজের চরিত্র আলাদা করেনি। নিজেদের বাড়িতে দীপাকে থাকতে অনুরোধ করেছে আন্তরিকভাবে কিন্তু আপত্তি শোনামাত্র জোর করেনি। সকাল থেকে বিকেল যখনই দীপাকে কোথাও নিয়ে যেতে হয়েছে ঠিক সময় এসেছে, ভদ্রভাবে দূরত্ব রেখেও আন্তরিকতা হারায়নি। আর যে জিনিসটা দীপাকে মুগ্ধ করেছে তা হল ওর পড়াশুনা। পরিষ্কার বলেছিল, 'জানেন দীপাবলী, আমি বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র মায় রবীন্দ্রনাথ

পড়েছি অনেক পরে। মা আমাকে পড়ার অভ্যেস করিয়েছিল সুকুমার রায়, উপেন্দ্রকিশোর আর লীলা মজুমদার দিয়ে। সেই সঙ্গে নির্মল বসু আর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। আর তারপরেই চলে এসেছিলাম বিভূতিভূষণ তারাশঙ্করে। কলেজে উঠে বঙ্কিম শরৎ শেষ করেছি কিন্তু রবীন্দ্রনাথে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

ভাল লেগেছিল দীপার, 'কেন ?'

'আপনি কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? উপন্যাস বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ মানুষের হৃদয় নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে গেছেন। এমন কি গানেও এক একটা শব্দ আচমকা যেভাবে বসিয়ে দিয়েছেন তাতে হৃদ্‌কম্প না হয়ে উপায় নেই।'

'আপনার তাহলে হৃদয় আছে অমল ?'

'সরি। নেই। ওই রবীন্দ্রনাথ নিয়ে নিয়েছেন।'

অমলকুমার কথাগুলো এমন গলায় বলেছিল যে আচমকা শব্দ করে হেসে উঠেছিল দীপা। ওরা তখন দাঁড়িয়ে আছে নেতাজী পুলের কাছে, করলা নদীর ধারে। কোর্ট থেকে রায়মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করে ফিরছে। কিছু মানুষ চমকে এদিকে ফিরে তাকালেন। দীপা বলল, 'সরি ! আমার বোধ হয় এভাবে চেঁচিয়ে হাসা ঠিক হয়নি !'

অমলকুমার বলল, 'আমি তো অপরাধের কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।' আর তখনই দাঁড়িয়ে পড়া একটি রিকশা থেকে ভারী চেহারার মানুষ নেমে এল। দীপা ততক্ষণে চিনতে পেরেছে। সে কিছু বলার আগেই শ্যামলদা বলে উঠল, 'দীপা, তুই এখানে ?'

শ্যামলদা বেশ মোটা হয়েছে এরই মধ্যে। দীপা উত্তর দিলে, 'এই তো, কাজে এসেছি।'

'কবে এসেছিস ?'

'দিন দুয়েক হল।'

'চা বাগানে ?'

'না। এ যাত্রায় জলপাইগুড়িতেই আছি।'

'ও। ওখানে যাবি না ?'

'না। আপনি কেমন আছেন ?'

'আমি ? ভাল। অবশ্য একটু চিন্তায় আছি। ললিতার বাচ্চা হবে. এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু আজই আমাকে একবার চা-বাগানে ফিরে যেতে হবে। জরুরি কাজ, কাল সকালে ফিরে আসব। ও একা রইল, তাই চিন্তা। তা একে চিনলাম না।'

যেন দীপার পরিচিত সমস্ত মানুষকে চেনার অধিকার ওর আছে এমন গলায় প্রশ্নটা করা হল। দীপা খুব সহজ গলায় বলল, 'আমার বন্ধু, অমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'বন্ধু ? ও।' শ্যামলদার মুখটা অন্যরকম লাগল। তারপর 'আচ্ছা চলি' বলে রিকশার দিকে ফিরে গেল। দীপা বলল, 'দেখুন অমল, কথাটা উনি হজম করতে পারলেন না।'

'কে উনি ?'

'আমার বাবা যে চা-বাগানে চাকরি করতেন সেখানেই কাজ করেন উনি। এককালে ভাল ফুটবল খেলতেন। এখন বাগানে ফিরে গিয়ে সবাইকে আমার গল্প করবেন।'

'নাও করতে পারেন।'

'বাঙালিকে আমি যত চিনেছি আপনি তত চেনেননি অমল। আচ্ছা, আমি আপনাকে বন্ধু বলে পরিচয় দিলাম বলে আপনি অসন্তুষ্ট হননি তো ?'

'অভয় দেন তো একটা কথা বলি।'

'নিশ্চয়ই।'

'মাঝে মাঝে আপনাকে দেখে এবং শুনে মনে হয় আর পাঁচটা বাঙালি মেয়ের থে-- আপনি একদম আলাদা। আপনার ব্যক্তিত্ব ভাবনা শ্রদ্ধা আনে। আবার আচমকা এমন ক বলেন যে তার সঙ্গে মেলানো যায় না।'

'একথা কেন?'

'আপনার বন্ধু হতে পারলে আমি খুশি হব। অসন্তোষের কথাই ওঠে না।'

দীপা মুখ ফেরাল। তারপর চেঁচিয়ে একটা রিকশাকে ডাকল। অমলকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন এখন?'

'আপনাদের বাড়িতে?'

'বাঃ, গেলে মা খুশি হবেন। আপনি এগোন, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

'কেন? আমার সঙ্গে এক রিকশায় যেতে অসুবিধে হচ্ছে?'

অমলকুমার হাসল, 'আমি যদি বলি বাঙালির স্বভাব হল যে-কোন ব্যাপারকেই একটু বাঁকা চোখে দেখতে ভালবাসে তাহলে কিন্তু আপনি দায়িত্ব এড়াতে পারবেন না। আমি আমার ব্যবসার কাজে একটু ফণীন্দ্রদেব স্কুলের কাছে যাচ্ছি।'

লজ্জিত হল দীপা। সে কিছু না বলে রিকশায় উঠে বসল। ধড়ধড়া নদী ছাড়িয়ে একটু এগোতেই দীপা হাসপাতালটা দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ললিতাদির কথা মনে পড়ল। বাবার মৃত্যুর সময় ললিতাদি তাদের খুব সাহায্য করেছিলেন এত কাছে এসে ওঁব সঙ্গে দেখা না করে যাওয়াটা ঠিক হবে না। দীপা রিকশা ছেড়ে দিল। ভাড়া দিয়ে হাসপাতালে জিজ্ঞাসা করে মেটারনিটি ওয়ার্ডে চলে এল সে। বড় হল ঘবে এপাশ ওপাশেব বিছানায় শুয়ে আছেন আসন্ন প্রসবা বা সদ্য প্রসূতিরা। একবার চোখ বোলালেই এতগুলো মা হতে যাওয়া শরীরের ভেতর থেকে একটা চমৎকার ছবি উঠে আসে। এখন প্রত্যেকেই যেন ধরিত্রীর যথার্থ প্রতিনিধি। ভাবীকালের মানুষের পাশ দিয়ে সে যেন হেঁটে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ললিতাদির দেখা পেল সে। একেবারে ধাবের বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে ছাদ দেখছেন। একেবারে ললিতাদির পাশের টুলে বসতেই যে শব্দ হল তাতে চোখ নামালেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড়, মুখ হাঁ। দীপা বলল, 'কেমন আছেন?'

'কলকাতা ছেড়ে এখানে কবে?'

'এই তো কদিন হল। কেমন আছেন?'

ললিতাদি মুখটা সামান্য নাড়লেন যার অর্থ স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাবপর বললেন, 'তুমি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছ। খু-উ-ব।'

'শ্যামলদার সঙ্গে দেখা হল। ওঁর কাছেই জানতে পারলাম। উনি তখন চা-বাগানে যাচ্ছিলেন।'

'ভাগ্যিস দেখা হয়েছিল।' ললিতাদি কথা বলে মুখ ফেরালেন

'আপনার শরীর কি ভাল লাগছে না?'

'অ্যাঁ? না না। ঠিক আছি।'

'তবে?'

'ভাল লাগছে না। আমি, আমি এটা মানতে পারছি না।'

'কোনটা?'

'তোমার শুনে দরকার নেই। যাক, পড়াশুনা কেমন হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'জলপাইগুড়িতে কোথায় উঠেছো ?'
'আমার পুরনো হোস্টেলে।'
'চা-বাগানে গিয়েছিলেন ? ওরা তো অমর গ্যারেজের দিকে বাড়ি করেছেন !'
'শুনেছি। আমি যেতে পারিনি।'
'সে কি ? কেন ?'
'সময় হয়নি।'
'তোমার সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়। আমার বিশ্বাস হয় না।'
'কেন ?' দীপা হাসল।
'পুরুষরা গল্প বানায় আর মেয়েরা সেটার ডালপালা তৈরি করে ছড়ায়।'
দীপা কিছু বলল না। এই একটা কথায় ওর মনে হল ললিতাদি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী।
ললিতা বললেন, 'তোমাকে দেখে খুব ভাল লাগছে।'
'আমার সম্পর্কে গল্প শুনেও ?'
'গল্প তো আমার সম্পর্কে হয়েছিল !'
'সেগুলোর কি সবাই গল্প ছিল ?'
'তুমি কিছু জানো ?'

'জানি। আপনাকে আর শ্যামলদাকে একদিন আমি চা-বাগানেব ভেতরে দেখেছি।' হঠাৎই অনেকদিন আগে হাতির তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসার সময় চা-বাগানের ভেতর থেকে ভেসে আসা শ্যামলদা ও ললিতাদির ভেসে আসা কণ্ঠস্বর স্মৃতি উগরে দিল।

ললিতাদি ওর দিকে স্পষ্ট চোখে তাকালেন, 'আমি বিষ খেয়েছিলাম, জানো ?'
'জানি।' দীপার মনে পড়ছিল ঘটনাগুলি।

'লোকে গল্প তৈরি করেছিল আমার শরীরে বিয়ের আগে বাচ্চা এসেছিল বলে আমি বিষ খেয়েছিলাম আত্মহত্যা করতে।' নিঃশ্বাস ফেললেন ললিতাদি।

'গল্পটা তো কদিন বাদে মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল।'
'হয়েছিল। কিন্তু তারপর, বিয়ের পর আমি আর বাচ্চা চাইনি।'
'সে কি ! কেন ?'

'বিয়ের আগে শ্যামলদা আমার জন্যে পাগল ছিলেন। এমন কি আমি যখন হাসপাতালে তখনও। কিন্তু বিয়ের পরে সেই মানুষটা আচমকা বদলে গেল। তাব বাবা আত্মহত্যা করেছে নাকি আমার জন্যে। জানো ভালবাসা হল সকালের মত। স্বার্থব লম্বা ছায়া সূর্য ওঠা মাত্র ছোট হতে আরম্ভ করে। সূর্য যখন মাথার ওপর তখন ছায়া পায়েব তলায়। ভালবাসার পূর্ণতা তখনই হয়ে যায়। তারপর যত বেলা গড়ায়, ছায়া লম্বা হয়, তত ভালবাসার আয়ু ফুরিয়ে আসে। পৃথিবীতে সব কিছুর মত ভালবাসার আয়ু বড় ক্ষণস্থায়ী। ভালবাসাহীন সম্পর্ক বয়ে চলা যে কি কষ্টকর ! এখন আমি তোমার শ্যামলদাকে আর ভালবাসতে পারি না। অথচ তার সন্তান আমাকে বহন করতে হচ্ছে। জানো, প্রতি মুহূর্তে আমি ঈশ্বরকে বলছি যে আসবে সে যেন ভালভাবে আসে কিন্তু তিনি যেন আমাকে সেইমুহূর্তে কাছে টেনে নেন !

'ললিতাদি !'

'হ্যাঁ গো। সত্যি কথা শুনতে খারাপ লাগে। তোমার ওপর অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে, আমি জানি। তবু একটা কথা বলি, যদি কখনও কাউকে ভালবাসো তাহলে তাকে বিয়ে কোরো না। ভালবাসা হল বেনারসী শাড়ির মত, ন্যাপথালিন দিয়ে যত্ন করে আলমারিতে

তুলে রাখতে হয়, তাকে আটপৌরে ব্যবহার করলেই সব শেষ।' ললিতা নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল দীপা। তারপর রলল, 'আপনি এসব মাথায় রাখবেন না। যে আসছে তার দরকার আপনাকে। এটা ভুলে যাবেন না!'

ললিতাদি হাসলেন। বড় বিষণ্ণ সেই হাসি।

দীপা উঠে দাঁড়াল। ললিতাদির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বাইরে। তার শরীরে অস্বস্তি হচ্ছিল। সেই ললিতাদি এবং শ্যামলদা, যারা ভালবাসার উগ্রতায় অন্ধ হয়ে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে সমস্ত চা-বাগানের মানুষকে নস্যাৎ করতে পেরেছিল তারা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! মানুষের সম্পর্ক বড় জটিল। কিন্তু তাই বলে এই জায়গায় পৌঁছাবে তা সে কখনও ভাবতে পারেনি। ললিতাদির জন্যে তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। শেষ হাসিটা ললিতাদির ঠোঁট থেকে বিষণ্ণতা নিয়ে যেন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভালবাসার মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকা অর্থহীন। কিন্তু ভালবাসা মরে যায় কেন।

আচ্ছন্নের মত হেঁটে এল দীপা রায়কত পাড়ায়। অমলকুমারের বাড়ির সামনে এসে তার যেন চৈতন্য ফিরল। টিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। সে দুবার শব্দ করতে ভেতর থেকে মাসীমার গলা ভেসে এল, 'কে ওখানে?'

দীপা গলা তলল, 'আমি দীপাবলী।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দরজা খুললেন অমলকুমারের মা। একগাল হেসে বললেন, 'আরে, তুমি একা কেন? অমল কোথায়?'

'উনি ব্যবসার কাজে গিয়েছেন।'

'দ্যাখো কাণ্ড, তুমি একা এলে?'

'বাঃ, আমি নাবালিকা? জলপাইগুড়িতে কি আমি নতুন?' দীপার কথা শেষ হওয়া মাত্র মহিলা তার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন, 'আজ রাত্রে তুমি এখানে খেয়ে যাবে?'

'আপনার কষ্ট হবে না?'

'মানে! কি কথা বললে? আমরা মায়েরা ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে ভালবাসি। দুজনের জায়গায় তিনজন যদি খায় তাহলে কষ্ট বেড়ে যাবে? তোমরা যখন আমার বয়সে পৌঁছাবে তখন হয়তো মানসিকতা পাল্টাবে কিন্তু আমরা পুরনো দিনের মায়েরা কিন্তু একইরকম রয়েছি!'

সারাটা বিকেল, সন্ধে চমৎকার কাটল দীপার। মাসীমার সঙ্গে রান্নাঘরে বসেও গল্প হল। সন্ধ্যের মাথায় অমলকুমার ফিরল। একটু চিন্তিত। মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হয়েছে রে?'

অমলকুমার দীপার দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'উনি এসে কাকাবাবুর বিষয় সম্পত্তির অধিকার আইনসঙ্গত করতে চান তা অনেকের পছন্দ নয়। যাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগছে তাঁদের কেউ কেউ খেপে উঠেছেন। এমনই একজন আমাকে পোস্ট অফিসের সামনে ধরে শাসাতে চেয়েছিল।'

'কে?' দীপা প্রশ্ন করল।

'আপনি নাম বললে চিনতে পারবেন না। গত দশ বছর ধরে ভদ্রলোক কাকাবাবুর জমি ভোগ করছেন। উনি বেঁচে থাকতে ঠিকঠাক টাকা পয়সা দিতেন। মারা যাওয়ার পর ভেবে নিয়েছিলেন যে জমিটা ওঁরই হয়ে গেল। একবার ভাবনাটা পাকা হয়ে গেলে তা উপড়ে ফেলা মুশকিল হয়ে যায়।' অমলকুমার হাসল।

মাসীমা বললেন, 'কোন গোলমাল হবে না তো ?'

'হলে হবে। যা আইনের মারফত পাওয়া যাবে তাই যথেষ্ট।'

মাসীমা বললেন, 'দেখিস বাবা, মেয়েটা ক'দিনের জন্যে এসছে, কোন বিপদে যেন না পড়ে। মানুষের মন বড় জটিল ব্যাপার। তোরা কথা বল, আমি একটু রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি।'

মাসীমা চলে গেলে অমলকুমার দীপার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'তাহলে কবে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি ছেড়ে ?'

'আগামীকাল। উকিলবাবু তো বললেন এখন আমাকে প্রয়োজন নেই !'

'দীপাবলী, আপনি কাকাবাবুর সমস্ত সম্পত্তি কোনো জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে দান করে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। খুব ভাল কথা। কিন্তু কোন্ প্রতিষ্ঠানকে দেবেন ঠিক করেছেন ?'

'ঠিক করিনি এখনও। তবে রাজনীতির ছোঁয়া নেই এমন প্রতিষ্ঠানকেই বেছে নেব। এই ধরুন, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম, যাঁরা সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান। কিন্তু একটা কথা, আপনি যেন ভাববেন না এই দেওয়াটা আমি দিচ্ছি। সম্পত্তি আমার নয়, এই দেওয়াটা আমার গৌরব বা ব্যক্তিগত অহঙ্কারে নয়। অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করা সম্পদ যাদের জন্যে ব্যয় হওয়া উচিত তাই করা হচ্ছে।'

'কাকাবাবু নিশ্চয়ই অন্যায় পথে রোজগার করেছিলেন কিন্তু কিছু তো পরিশ্রমের বিনিময়ে সৎ পথে আয় করা ছিল। তাই না ?'

'হয়তো ছিল। কিন্তু ঘোলা জলের নদীতে পরিষ্কার জলের ঝরনা এসে পড়লে তাকে কিছুক্ষণ বাদে আলাদা করে চেনা যায় না, যায় কি ?'

'চমৎকার। আপনার কথা বলার ধরনটি বেশ ভাল।'

'বাঃ, শুধু ভঙ্গীর প্রশংসা করছেন, বিষয়ের নয় ?'

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। উঠোনে গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক মায়াবী জ্যোৎস্না কোন ফাঁকে নেমে এসেছে। খুব ভাল লাগছিল দীপার।

অমলকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'পরীক্ষার পর কি করবেন ?'

'বাঃ, খুব ভাল হল। বলুন তো মশাই কি করা যায় ? পড়াশুনা চালানো না চাকরি ? আমি ভেবে কূল পাচ্ছি না।'

'পড়াশুনা চালাবার সুযোগ থাকলে তাই করা উচিত।'

'তাহলে টিউশনি, বাড়াতে হয়।'

'আপনি টিউশনি করেন নাকি ?'

'হ্যাঁ। খরচ চালাতে রোজগার করতে হয়।'

'বাঃ, খুব ভাল।'

'কিন্তু সাধারণ চাকরি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার।'

'কি ধরনের চাকরি চান ? কলেজে পড়াতে গেলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতেই হবে। ইস্কুলের জন্যে আপাতত দরকার নেই।'

'না, পড়ানোর চিন্তা মাথায় নেই। অনেকদিন থেকে ভেবেছি আই এ এসে বসব। যদি পারি তাহলে ছেলেদের সমান কর্তৃত্ব নিয়ে চাকরি করব।'

'ভাবনটায় চিড় ধরল কেন ?'

'ঠিক চিড় ধরেনি, একটু হোঁচট খেয়েছি। সরকারের বড় চাকর হলে এমন অনেক

অপ্রিয় কাজ করতে হয় যা আমি মানুষ হিসেবে করতে চাই না।'

'কর্তৃত্ব চাইলে সেটা উপেক্ষা করতে হবে।'

'সেটাই পারছি না। সমস্যা এখানেই। আপনি বলুন তো কি করি ?'

অমলকুমার মুখ তুলে আকাশ দেখল। তারপর বলল, 'আপনি নিজেকে ছেলে ভাবতে পারলে খুব খুশি হন, না ?'

'ঠিক তা নয়। আমি নিজেকে ছেলেদের থেকে কোনো অংশে দুর্বল ভাবতে রাজি নই ?'

'এতে তো ভবিষ্যতে দ্বন্দ্ব আসতে পারে !'

'মানে ?'

'কোনো ছেলের সঙ্গে বাস করতে গেলে— !'

'ও হো, না, তেমন কিছু এখনও মাথায় আসেনি। আর তাছাড়া ঘর আর বাইরেটা সব সময় আলাদা। আমি কখনও বাইরের জগৎটাকে ঘরে টেনে আনব না। আমি যদি কারো সঙ্গে থাকি তাহলে তাকে প্রথমে আমার বন্ধু হতে হবে তারপরে অন্য কিছু। বন্ধুত্ব থাকলে আর দ্বন্দ্ব লাগবে কেন ?'

'বেশ, আই এ এসে বসুন, দেখুন কি ফল হয়। সেই সঙ্গে অন্য কিছু ভাবুন। কলকাতায় যেসব সুযোগ পাওয়া যায় তা আমি জলপাইগুড়িতে বসে ভাবতে পারব না।'

'আপনার পরিকল্পনা কি ?'

'এই তেমন চলছে।'

'আপনাকে ব্যবসায়ী হিসেবে মোটেই মানায় না।'

'কীসে মানায় ?'

'যদি কলেজে বা স্কুলে পড়াতেন, বইপত্তর নিয়ে থাকতেন ?'

'তাহলে আমি কেমন ছদ্মবেশী বলুন ?'

'বাজে বকবেন না। আচ্ছা, আপনি আমার থেকে কত বড় ?'

'আপনার বয়স জানি না তো !'

'সত্যি, আপনি বুদ্ধিমান.।'

'এটা গালাগালি, না প্রসংশা।'

'বেশ, আমি কুড়ি পেরিয়ে একুশ।'

'আমি পঁচিশ।'

'তাহলে পড়াশুনা করলেন না কেন ?'

'পড়তে হলে কলকাতায় যেতে হত। মাকে একা ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।'

'যাঃ, মাসীমাকে দেখে সেরকম মনেই হয না।'

'দেখে মনে হয় না। মায়ের হাঁপানি আছে। খুব বর্ষায় বা শীতে সেটা যখন জানান দেয় তখন কাছে কেউ না থাকলে—সেই সময়ের মায়ের চেহারা আপনি অনুমান করতে পারবেন না। তাছাড়া পড়াশুনা মানে আমার কাছে আর এম এ ডিগ্রি নয়। অনেক ব্যাপক ব্যাপার। জলপাইগুড়িতে বসে যা বই পাই তাই শেষ করতে পারছি না ! যাই বলুন এমন শহরে আমি অনেক শান্তি এবং স্বস্তিতে আছি। কলকাতায় তো বেঁচে থাকলে হলে প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ করতে হয়।'

খুব তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে দীপা হোস্টেলে ফেরার জন্যে তৈরি হল। অমলকুমারকে মাসীমা বললেন হোস্টেলে ওকে পৌঁছে দিতে। রাত সাড়ে আটটাতেও ওকে একা রিকশায় ছেড়ে দিতে তিনি রাজি নন। টিনের গেট পর্যন্ত তিনি দীপাকে জড়িয়ে ধরে

এগিয়ে দিলেন। যাওয়ার আগে বললেন, 'মা, আমি জানি না তোমার সঙ্গে কখনও দেখা হবে কিনা। কিন্তু তোমাকে খুব ভাল লেগেছে আমার। যদি কখনও তোমার আমাদের মনে পড়ে সটান চলে এসো। আসবে তো?'

'আসব। আপনি আপনার দেওরের পুত্রবধূ হিসেবে আমাকে গ্রহণ করেননি, আমাকে একটা আলাদা মানুষ হিসেবে স্বীকার করেছেন, আপনাকে ভুলব কি করে?' মহিলাকে প্রণাম করল দীপা। তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে চিবুকে আঙুল ছুঁয়ে আদর করলেন। দীপা কোনমতে নিজেকে ছাড়িয়ে রাস্তায় নামল অমলকুমারের সঙ্গে।

সমস্ত জলপাইগুড়ির রাতের রাস্তা এখন চমচমে জ্যোৎস্নায় ঝকঝক করছে। আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো ছাড়া রাস্তায় কোন আলো জ্বলছে না। ওরা দুজন চুপচাপ হাঁটছিল সেই জ্যোৎস্না গায়ে মেখে। দিনবাজার পেরিয়ে ওরা বাঁ দিকে মোড় নিল। সন্ধের পর জলপাইগুড়ি বড্ড তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ অমলকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'না।' দীপা মুখ ফেরাল, 'কিন্তু আপনাকে এত পথ একা ফিরতে হবে!'

'এরকম জ্যোৎস্নার রাত্রে অনেকদিন পরে হাঁটছি, খারাপ লাগার কথা নয়। অবশ্য!' কথাটা বলতে গিয়েও থেমে গেল অমলকুমার।

'কথা শেষ করুন।'

'না, ভাল শোনাবে না।'

'অমল, আমি জীবনে এত খারাপ কথা শুনেছি যে এটুকু বলতে পারি খারাপ লাগার বোধ খুব ধারালো অবস্থায় নেই।'

'বলতে চেয়েছিলাম ফেরার সময় আপনি সঙ্গে থাকবেন না, আমার একা ফিরতে হবে সারাটা পথ।'

'আপনাকে এই পথটুকু একা যেতে হবে কিন্তু আমার কথা ভেবেছেন?'

'আমি অনুমান করতে পারি।'

'কি।'

'আপনিই বলুন।'

দীপা হাসল, অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি, 'আমাকে হেঁটে যেতে হবে অনেকটা পথ, একা, একদম একা। সেটা এখান থেকে কলকাতায় নয়, বেঁচে থাকার প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত হয় জাগরণে, নয় স্বপ্নে একা পার হয়ে যেতে হবে। কিন্তু কই, আমি তো আফসোস করছি না!'

'করছেন না?'

'না। যা স্বাভাবিক যা সত্যি তাই মেনে নিতে হবে।'

'কোনটে সত্যি? আপনি যাকে সত্যি বলে এই মুহূর্তে ভাবছেন তা তো সত্যি নাও হতে পারে! পারে না?'

দীপা চুপ করে রইল। তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল। এই রোমাঞ্চ অসীমের সঙ্গে কথা বলার সময় হয়নি, শমিত কাছে এলেও হয় না। সে কথা বলার সাহস পাচ্ছিল না। যেন কথা বললেই নিজেকে হারিয়ে ফেলবে। হোস্টেলের সামনে পৌঁছে অমলকুমার বলল, 'আমি দাঁড়িয়ে আছি, আপনি দেখুন, ভেতরে যেতে অসুবিধে হয় কিনা!'

দীপা বন্ধ গেটে শব্দ করতেই দারোয়ান দরজা খুলে উঁকি মারল। দীপাকে দেখে সে দরজার একটা পাল্লা ঈষৎ খুলে দিল।

দীপা বলল, 'অমল, আপনি চিঠি দেবেন ?'

অমলকুমার মাথা নাড়ল, 'কাল কখন বেরুচ্ছেন ?'

'সকালে। কিন্তু প্লিজ, আপনি আসবেন না।'

'কেন ?'

'আমার যেতে খারাপ লাগবে।'

'ও।'

'আমাকে কি আপনি বুঝতে পারছেন ?'

'হ্যাঁ।' অমলকুমার বলল, 'আমাকে ?'

'হুঁ।'

'তা হলে ?'

'আমি জানি না। আমাকে সময় দিন।'

'বেশ। তাই হবে। তিন দিনে কেউ এর চেয়ে বেশী আশা করতে পারে না। আমি এলাম। আপনি ভালভাবে থাকবেন, ভাল থাকবেন।' অমলকুমার আর দাঁড়াল না। জ্যোৎস্নায় তার শরীর ফিরে গেল। ক্রমশ আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ার পর দীপা দারোয়ানকে ডেকে বলল, 'এবার তুমি গেট বন্ধ করে দাও।'

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥